ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীসরযূবালা দত্ত

সম্পাদিত

নবম খণ্ড

১৩২০

ঢাকা ;

উয়ারী, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ২৷৵৹ দুই টাকা দশ আনা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ডাক্তার ষ্টীন তক্লামকানের মরুভূমির বালুকারাশি খনন করিয়া একটি নগর বাহির করিতেছেন।

তক্লামকানের বালুকানিম্নে আবিষ্কৃত মন্দির-প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :— স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। } বৈশাখ, ১৩২০ { ১ম সংখ্যা।

নববর্ষের প্রার্থনা।

ওগো শুভে, এস তুমি
ধরণীর তপ্ত বুকে,
আনন্দ কল্যাণ-ধারা
ঢালো ওগো হাসি মুখে।
সিঞ্চিত লোহিত রাগে
উষার অঞ্চলখানি,
আজিকে এনেছ কিগো
ভরিয়ে আশার বাণী ?
তরঙ্গিণী-কূলে কূলে
উথলিছে আশা হাসি,
আনন্দ-হিল্লোল শত
বেলাভূমে চুমে আসি।
ফুলে ফুলে, কিশলয়ে
তরুণ অরুণ কান্তি,
আজি এ ধরণী'পরে
উছলিত সুখ-শান্তি।
চারিদিকে সুখ সাধ
আনন্দ পসরা লয়ে,
আজি কা'র আগমনী
মধুরে ললিতে গাহে ?
সারা বিশ্ব ভরিয়াছে
কি মধুর কল ভাষে,
পূজার অঞ্জলি ল'য়ে
তোমারি চরণে আসে।
আজি ওগো বিশ্বপূজ্যা !
এসো তুমি এসো ধীরে।

কালিমা বিষাদ ব্যথা,
মুছে দাও, অশ্রুনীরে।
হৃদয়-শ্মশানে যথা
দীপ্ত চিতানলগুলি,
লভুক পরম শান্তি,
পরশি ও পদধূলি।

শ্রীসরলা দত্ত।

নারীশক্তির উদ্বোধন।*

অনেকদিন হইল কবি গাহিয়াছিলেনঃ—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

কবিতাটী শুনিতে বেশ, গাহিতে বেশ, এবং আজ পর্য্যন্ত না জানি কত স্ত্রীপুরুষই এই পংক্তি দুইটী উচ্চারণ করিয়াছেন! কিন্তু যাহারা বলিল ও শুনিল, তাহাদের কয়জনের প্রাণকে এই কবিতানিহিত সত্যটী স্পর্শ করিয়াছে? যদি এই বাণী মানুষের মত মানুষ দশজনের হৃদয়কে সত্যভাবে স্পর্শ করিত, তবে আজ দেশের মুখ ফিরিয়া যাইত, ভারত-নারীর নিদ্রিত শক্তি জাগ্রত হইয়া দেশকে শত বৎসর অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিত।

আপনারা বলিতে পারেন, দেশে শত শত বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র বালিকা শিক্ষা-লাভ করিতেছে, তবে কেন বলিতেছি এদেশের নারীশক্তির উদ্বোধনের চেষ্টা কেহই তেমন ভাবে করিতেছেন না?

ভগিনীগণ, যাহারা সর্ব্বদা অন্ধকারে বাস করে, জোনাকীর আলোকই তাহাদিগের নিকট তীব্র বোধ হয়। ভারতের নরনারী আমরা—দীর্ঘকাল অন্ধকার-বাসে অভ্যস্ত হইয়া জোনাকীর আলোকেই পরিতৃপ্ত হইতেছি। শত শত বালিকার মধ্যে ৪।৬টী বালিকা ২য় ভাগ ৩য় ভাগ পড়িয়া পড়া শেষ করিতেছে দেখিয়া আহ্লাদে আমরা উৎফুল্ল হইতেছি। সূর্য্যের জীবনপ্রদ প্রচণ্ড তেজ ভারতের নারীশক্তির অন্তরে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, আর আমরা জোনাকীর আলোকেই তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

প্রভু পরমেশ্বর মনুষ্যত্ব দিয়া, এক একটী অমূল্য আত্মা দিয়া, তাঁহারই সন্তানত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া, আমাদিগকে এই সংসারে পাঠাইয়াছেন, আর আমরা কোথায় পড়িয়া আছি? উন্নত আকাশের সুবিমল বায়ুতে যাহার বিচরণ করিবার কথা, সে আজ কর্দ্দমময় গর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে! আমরা কি প্রতিদিন স্মরণ করি যে, আমরা ভগবানের কন্যা, তাঁহার দেবত্ব, তাঁহার মহত্ব, তাঁহার সৌন্দর্য্য দিয়া, তিনি আমাদিগকে গড়িয়াছেন, আমরা ছোট হইব না, ক্ষুদ্রতা লইয়া তৃপ্ত থাকিব না!

আপনারা সকলেই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর পবিত্র পুণ্যগাথা শ্রবণ করিয়াছেন। দাম্পত্য ধর্ম্মের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথায় আছে! কিন্তু ভারতের আর এক শ্রেণীর নারীর কথা আজকাল তেমন আলোচিত হয় না। অথচ এখনকার দিনে তাঁহাদিগকে স্মরণ করা আবশ্যক, তাঁহাদিগের চরিত্র আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজর্ষি জনক তখন মিথিলার রাজ-সিংহাসনে আরূঢ়। অতুলনীয় ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তিনি তৎকালীন ব্রহ্মবিদ্‌গণের নমস্য। একদিন তিনি একশত গাভীর শৃঙ্গে এক এক খণ্ড সুবর্ণ বাঁধিয়া দিয়া সমবেত শত শত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, তিনি এই গাভীগুলি লইয়া যাইতে পারেন।" পণ্ডিতগণ পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এত পণ্ডিতের মধ্যে কে সাহস করিয়া গাভীগুলি লইয়া যাইবে? অবশেষে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "বৎস, গাভীগুলি আমার গো-গৃহে লইয়া যাও।" তখন অন্যান্য পণ্ডিতগণ আপত্তি করিতে লাগিলেন,—'আপনি কি ব্রহ্মজ্ঞানে সকলের শ্রেষ্ঠ? যদি শ্রেষ্ঠ হন তবে আমাদিগকে আগে তর্কে পরাস্ত করুন!' তখন পণ্ডিতগণ একে একে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অনেকেই যখন পরাস্ত হইলেন, তখন পণ্ডিতগণ বলিলেন, 'এই প্রকারে নানা জনে আর

---

* ময়মনসিংহ মহিলা-সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসবে সম্পাদিকা কর্তৃক পঠিত।

প্রশ্ন না করিয়া বচক্রু মুনির কন্যা পণ্ডিতা গার্গীকে সকলের মুখপাত্রী করিয়া দেওয়া হউক। যাজ্ঞবল্ক্য যদি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবে আর কাহারও প্রশ্ন করা অনাবশ্যক।' গার্গী সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের অনুরোধে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

গার্গী ব্রহ্মতত্ত্বে অভিজ্ঞা হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান-রসেই নিমগ্ন থাকিতেন, তিনি সংসার-ধর্ম্মে প্রবেশ করেন নাই।

বৌদ্ধযুগের কথা আপনারা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অমৃত-বাণী শুনিয়া মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারত-নারীর অবস্থা কিরূপ উন্নত ছিল ইতিহাস তাহার জীবন্ত সাক্ষী। ধর্ম্মের জন্য বহু নারী তখন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের পবিত্র উপদেশ বাক্যে সংসারাসক্তি ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র আস্বাদন লাভ করিয়াছিল। নারীর এরূপ ত্যাগ, সুশিক্ষা, ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহাদের রচনাবলী "থেরীগাথা" নামক গ্রন্থে পালিভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পালিভাষাবিৎ পণ্ডিত Rhys Davids (রীস্ ডেভিড্স্) লিখিয়াছেন :—

It (থেরীগাথা) affords a very instructive picture of the life they (থেরীগণ) led in the valley of the Ganges in the time of Gautama the Buddha. It was a bold step on the part of the leaders of the Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women. But it is quite clear that the step was a great success, and that many of these ladies were as distinguished for high intellectual attainments as they were for religious earnestness and insight.

'গৌতম বুদ্ধের সময় থেরীগণ গঙ্গানদীর উপত্যকায় যেরূপ জীবন যাপন করিতেন, থেরীগাথা হইতে তাহার একটি অতি উপদেশপ্রদ চিত্র পাওয়া যায়। নারীগণকে এত স্বাধীনতা প্রদান করা এবং তাহাদিগকে এত উচ্চস্থান দেওয়া বৌদ্ধসংস্কারের নেতাদিগের পক্ষে সাহসের কাজ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বেশ পরিষ্কার-রূপে বুঝা যায় যে, এই কাজটি খুব সফল হইয়াছিল এবং এই মহিলাগণের অনেকে ধর্ম্মবিষয়ক আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, উচ্চ মনস্বিতার জন্য তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাবতী হইয়াছিলেন।'

(থেরীগাথা)

পুন্নিকা নাম্নী একজন থেরীর ধর্ম্মপ্রচার প্রণালী আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি। পুন্নিকা একজন দাসীর কন্যা ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের উপদেশে পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়া থেরী অর্থাৎ স্থবিরা বা ধর্ম্মজ্ঞানবৃদ্ধা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় এক ব্রাহ্মণ শীতকালে নদীতে স্নানতর্পণ করিতেছিলেন। পুন্নিকা তাঁহাকে বলিলেন :—

তুলিতাম জল, শীতে জলমাঝে নামি
কর্ত্রীদের নিন্দা আর দণ্ড ভয়ে আমি।
কার ভয়ে হে ব্রাহ্মণ! সদা তুমি স্নান
কর আসি এই শীতে হয়ে কম্পমান?

ব্রাহ্মণ—

জান তুমি হে পুন্নিকে, কেন প্রশ্ন তবে?
লভি পুণ্য এইরূপে পাপ নাশি ভবে।
বৃদ্ধ হোক্, যুবা হোক্, পাপী যেই জন
পাপমুক্ত হয় করি সদাবগাহন।

পুন্নিকা—

কেবা সে মূর্খের মূর্খ কহিল তোমায়,
উদকের অভিষেকে পাপ চলে যায়?
মণ্ডুক, কচ্ছপ, শুশু, নাগ আদি যারা
আছে জলচর সবে, স্বর্গে যাবে তারা?
ছাগল, শূকর, মাছ, মৃগ যারা মারে,
চোর নরহত্যাকারী সকলেই পারে
স্বর্গে যেতে, পাপ ধুয়ে উদকেরধারে?

নদীস্রোতে যদি পূর্ব্ব পাপ যায় ভেসে,
পুণ্যও ভাসিয়া যাবে ; কি রহিবে শেষে ?
যার ভয়ে হে ব্রাহ্মণ শীতে স্নান কর,
তাহা না ফেলিয়া, জলে কর্ম্মদোষ হর ?

ব্রাহ্মণ--

দেখাইলে সাধুপথ আজিকে আমায় ;
স্নানের বসন খানি দিতেছি তোমায়।

পুন্নিকা—

ও বস্ত্র তোমারি থাক্, চাহিনা বসন ;
সত্য যদি দুঃখে ভীত হয়ে থাকে মন,
প্রকাশে গোপনে হোক্ মজিওনা পাপে।
কিন্তু যদি কর পাপ, উহার প্রতাপে.
নাহিক উদ্ধার কভু দূরে পলায়নে।
সত্য যদি পাপ-দুঃখে ভয় থাকে মনে,
বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘে তুমি লহগো শরণ ;
শীল অনুষ্ঠানে কর মঙ্গল বরণ।

ব্রাহ্মণ—

বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ আমি করিব শরণ ;
শীল ধর্ম্মে করিব গো মঙ্গল বরণ।
আজিকে ব্রাহ্মণ আমি, তেজিয়া পাতক
ত্রিবিদ্যা লভিনু সত্য ; যথার্থ স্নাতক !

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত নবপ্রকাশিত "থেরীগাথা" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে আপনারা এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। পটাচারা নাম্নী একজন থেরী পাঁচশত নারীকে নবধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া মুক্তির পথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই প্রকার শত শত দৃষ্টান্ত ভারতের অতীত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত আমাদেরই পূর্ব্ব-মাতৃগণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কন্যা হইয়া আমরা কি তাঁহাদের পথ অনুসরণ অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিব ? নারী ব্যতীত ভারতের নারীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে আর' কেহই পারিবে না। গৃহস্থই হউন, আর সন্ন্যাসিনীই হউন, নারীগণকেই সেই চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও আহার নিদ্রা, পতিপুত্রের সেবা, বড় জোর অবসরকালে একটু অধ্যয়ন—ইহাতেই দিন কর্ত্তন না করিয়া চিত্তের দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করুন। প্রাণে আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, সম্মুখে উদ্দেশ্য থাকিলে, আমরা সকলেই সংসারে মহৎ কিছু করিয়া যাইতে পারি।

আমার বিধবা ভগিনীগণের উদ্দেশে আমার কিছু বলিবার আছে। ভগবান আপনাদিগকে সংসারে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই মুক্তিকে আপনারা সার্থক করুন। আমার সঙ্গেই আপনাদের জন্য এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত লইয়া আসিয়াছি। আপনারা জানেন, ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রমের সহিত আমার নামও সংসৃষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু আমি এই আশ্রমের জন্য তেমন কিছুই করিতে পারি না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্পর্কে আমার স্নেহের পাত্রী, কিন্তু ত্যাগ ও মহত্ত্বে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীই ইহার প্রাণ। তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিই দিন দিন আশ্রমটীকে গড়িয়া তুলিতেছে। সংসারে আরাম বিরামের ইঁহার কোনই অভাব ছিল না। স্নেহময়ী জননী, আদরের ভাই ভগিনী সকলেই গৃহে বর্ত্তমান। অর্থেরও অভাব নাই, কিন্তু প্রাণে অতি মহৎ আকাঙ্ক্ষা ধারণ করিয়া, আরাম আয়েস ত্যাগ করিয়া, ইনি এদেশের নারীশক্তির জাগরণের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন বঙ্গদেশে তাহার তুলনা নাই। আপনারা অনেকেই ত এই পথ অবলম্বন করিতে পারেন।

আমার ছাত্রী ভগিনীদিগের প্রতিও আমার নিবেদন আছে। তোমরা শিক্ষা লাভ করিতেছ, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের কথা কিছুই নাই। কিন্তু তোমাদের শিক্ষা যেন উদ্দেশ্যহীন না হয়। জীবনের সম্মুখে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত কর। দেশমাতা এবং দেশের নারীজাতি তোমাদের নিকট অনেক আশা করিতেছে। সংসারের সুখকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া, লোভনীয় বলিয়া মনে করিও না। তোমাদের দ্বারা ভগবান আমাদের মুখ উজ্জ্বল করুন।

বনলতা।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে আজ অনেক দিনের কথা। রাণী এলিজাবেথ তখন ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে ব্রিটিস জাতিকে দিনের পর পর দিন ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিতেছিলেন। ইয়ুরোপের জাতি সমূহের মধ্যে ইংলণ্ড আজ যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে তখন তাহার সে শ্রেষ্ঠতা ছিল না। স্পেন দেশ তখন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, ক্ষমতা ও ধনসম্পদে ইয়ুরোপের শীর্ষ দেশে বিরাজ করিতেছিল। স্বর্ণভূমি আমেরিকা অল্প পূর্ব্বে মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আপনার অপ্রতিহত প্রভাবে, বিপুল নৌ-শক্তি বলে স্পেন তখন নবাবিষ্কৃত দেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন ও তাহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেছিল।

লুথার-প্রচারিত সুসংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের অপরাধে ইংলণ্ড তখন খৃষ্টীয় রাজ্য সমূহের ধর্ম্মগুরু পোপের নিতান্তই বিরাগভাজন। ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশগুলি পোপকে অভ্রান্ত ধর্ম্মগুরু—ধরাতলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিত। ইংলণ্ড তাহা স্বীকার করিত না, এজন্য পোপ তাহার উপর খড়্গহস্ত। এলিজাবেথের বৈমাত্রেয়ী ভগিনী মেরী এলিজাবেথের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বিনী ছিলেন এবং স্পেনের রাজা ফিলিপকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মেরীর মৃত্যুর পর স্পেন-সম্রাট ফিলিপ তাঁহার পত্নীর রাজ্য বলিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবী করিলেন। কিন্তু ইংরাজজাতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী স্পেন-রাজকে কিছুতেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। ধর্ম্মবিরোধে স্পেন ও ইংলণ্ডে তখন অহি-নকুল সম্পর্ক।

ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির তখন উন্মেষ মাত্র দেখা দিয়াছে। জলে স্থলে স্পেনেরই তখন দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ। হকিন্‌স্, ড্রেক প্রভৃতি বিখ্যাত নৌ-সৈনিক তখন সামান্য জলদস্যু মাত্র। ছোট ছোট জাহাজে করিয়া তাঁহারা অল্পসংখ্যক সাহসী যোদ্ধা লইয়া সমুদ্রে বাহির হইত এবং কখনো স্বর্ণরৌপ্যপূর্ণ স্পেনীয় জাহাজ, কখনো বা স্পেনের প্রতিষ্ঠিত ধনরত্নপূর্ণ মার্কিন নগর লুণ্ঠন করিয়া স্পেনীয়দিগকে বিব্রত করিয়া তুলিত। দুরন্ত সাহসে নির্ভর করিয়া অতি অল্পসংখ্যক মাত্র সৈন্য লইয়া তাহারা বাজপক্ষীর ন্যায় স্পেনীয়দিগের উপর আপতিত হইত এবং ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়া তখনি তীরবেগে পলায়ন করিত। এই সকল ধনরত্নের অধিকাংশই ইংলণ্ডের রাজকোষে স্থান প্রাপ্ত হইত। বলিতে গেলে, স্পেনের সহিত বিরোধ ও এই ধনলিপ্সাই ইংলণ্ডকে বর্ত্তমানকালে অদ্বিতীয় নৌ-শক্তি রূপে পরিণত করিয়াছে। এই ধন সঞ্চয়ের লিপ্সা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ইংরাজজাতির মধ্যে দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল, আর দলে দলে লোক সমুদ্র যাত্রা করিয়া নৌ-বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিতে লাগিল।

সেই সমুদ্র যাত্রার উত্তেজনার কালে, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে, একদিন অপরাহ্নে, ইংলণ্ডের ডিভন সায়ারের অন্তর্গত বিডফোর্ড সহরে নদীর ধার দিয়া একটি বালক স্কুল ছুটীর পর বাড়ী ফিরিতেছিল। বালকের দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ, হাতে পুস্তকের বস্তানি। পথের উপরে একটা মদের দোকানের নিকট উপস্থিত হইয়া বালক দেখিল, সেখানে অনেক নাবিকের জনতা। মাঝখানে দাড়াইয়া একজন কি বলিতেছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে জনতার মধ্যে মিশিল এবং ক্রমে বক্তার নিকটস্থ হইয়া বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। বক্তা বলিতেছিল:— "তোমরা যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, যাও— সেখানে যাইয়া নিজের চোখে দেখিয়া আইস। আর তা না হ'লে বাড়ী বসিয়া বসিয়া অলসের মত দিন কাটাও। আমি বলিতেছি শুন,—আমি ভদ্র-সন্তান, মিথ্যা বলিবার আমার কোনই দরকার নাই। এই দুইটি চোখে আমি দেখিয়াছি, আর এই সেলভেসন ইয়ুও দেখিয়াছে। আমি খ্রীষ্টান—মিথ্যা কথা বলিব না; সেই রূপার ঢিবিটা লম্বায় সত্তর ফুট, চৌড়া ছিল দশ ফুট, আর বার ফুট উঁচু। এক একটা রূপার

তাল ওজনে আধ মনের কম হবে না। কাপ্তেন ড্রেক সেই ঢিবিটা আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদিগকে কুবেরের ভাণ্ডারে নিয়া আসিয়াছি, লুট, লুট,—যদি সব লুটিয়া নিতে না পার সে দোষ তোমাদের।"

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল:—"আপনি কয়েকটা রূপার তাল তা'হলে বাড়ী আনিলেন না কেন?"

বক্তা। বহিয়া আনিতে সাহায্য করিবার জন্য তুমি কেন সেখানে ছিলে না? আমরা সমস্ত ঢিবিটাই আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, কাপ্তেন ড্রেক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; তাড়াতাড়ি কাছে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পায়ে অসভ্যদিগের নিক্ষিপ্ত একটা তীর পড়িয়া তিন ইঞ্চি গভীর ঘা হইয়াছে, আর দরদর ধারে রক্ত বহিয়া তাঁহার বুট পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন তোমরাই বল দেখি, মহাত্মা ড্রেকের জীবন বেশী, না ছার সোণারূপা বেশী? রূপার অভাব কি? 'নোম্বার-ডি-ডিয়ো' সহরে কি রূপার অভাব?—সেখানে এত রূপা আছে যে তা দিয়ে আমাদের দেশের সমস্ত রাস্তা মুড়িয়া ফেলা যায়। কিন্তু ভাই, কাপ্তেন ড্রেকের মত মানুষ ঈশ্বর এক সঙ্গে দুই জন সৃষ্টি করেন না! তাঁকে যদি হারাই তবে ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের শেষ হইল জানিবে।

বক্তার চেহারা সুদীর্ঘ, মুখে কৃষ্ণ শ্মশ্রু, বড় বড় চোখ; গায়ে লাল জামা। পার্শ্বে দেশে নানা কাজকরা স্পেনদেশীয় তরবারি। আঙ্গুলে চক্ চকে সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি আংটী, গলায় দুই তিন ছড়া সোনার হার, কাণে বড় বড় ইয়ারিং। মাথায় স্পেনদেশীয় প্রকাণ্ড এক টুপি; টুপির উপরে পাখীর পালকের পরিবর্ত্তে একটি বিচিত্র জীবন্ত পক্ষী। টুপিটা মাথা হইতে নামাইয়া পাখীটির দিকে চাহিয়া বক্তা বলিল, "দেখ তোমরা সকলে। কেমন সুন্দর পাখী। এমন পাখী কি কখনো দেখিয়াছ? মেক্সিকোর রাজারা এই পাখী নিজেদের টুপি ছাড়া আর কাহারও টুপিতে পরিতে দেয় না। সেইজন্যই আমি ইহা পরিয়াছি। —আমি ডিভনবাসী জন অক্সেনহাম—ডিভনের যুবকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইহা পরিয়াছি। স্পেনীয়েরা যেমন ইণ্ডিয়ানদের (আমেরিকার আদিম অধিবাসী) রাজা, আমরা তেমনই স্পেনীয়দের প্রভু।" এই কথা বলিয়া অক্সেনহাম পুনরায় টুপি মাথায় দিল, শ্রোতারা বক্তার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, কিন্তু একজন বলিয়া উঠিল:—"আমাদের তুলনায় স্পেনীয়দের সংখ্যা কত বেশী!"

অক্সেনহাম বলিল:—"বেশী! নোম্বার-ডি-ডিয়ো অধিকার করিতে আমাদের কতজন লোক লাগিয়াছিল? সবে ত তেয়াত্তর জন লোক আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম। তা'র অর্দ্ধেকের বেশী পথেই পীড়িত হইয়া পড়িল। ফিজেন্ট বন্দরে ত্রিশজন লোক লইয়া কাপ্তেন রাউস আমাদের সঙ্গে মিশিলেন। মোটে তেপান্ন জন লোক মিলিয়া আমরা নূতন মহাদেশের চাবি—নোম্বার-ডি-ডিয়ো সহর হস্তগত করিলাম! আমাদের একটী লোক মাত্র মারা গেল—সেও তার নিজের অসতর্কতার জন্য! তোমরা আমার কথা শোন, স্পেনীয়েরা কাপুরুষ—আস্ত কাপুরুষ। হতভাগারা একটা স্ত্রীলোকের উপাসনা * করে—তাহারা স্ত্রীলোকের মতই যুদ্ধ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

একজন দীর্ঘকায় কৃশ ব্যক্তি অক্সেনহামের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিয়া উঠিল, "সাবাস কাপ্তেন, —সাবাস! ঠিক কথা বলিয়াছেন। এক একজন ডিভন-বাসী তিন তিনজন স্পেনীয়কে যুদ্ধে হারাইতে পারে। ধন্য ডিভন, ধন্য ডিভন!

অক্সেনহাম বলিল—"কে আসিবে এস, কে সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে চাও, চল আমাদের সঙ্গে!" সেই কৃশকায় লোকটী আবার বলিতে লাগিল, "আর বিলম্ব নয়! বন্দরে প্লিমাউথের চল্লিশজন লোক একত্র হইয়াছে। আমরা ফিরিয়াই জাহাজ ছাড়িয়া দিব। বিডফোর্ডের এক ডজন লোক হইলেই হয়। এস, এস, কে যাইবে এস। হয় আমরা অতুল ধনের অধিকারী হব, না হয় স্বর্গে যাব।"

---

* যীশুমাতা মেরী রোমান ক্যাথলিকদিগের পরম আরাধ্যা।

অক্সেনহাম বলিল, "দেখ, তোমরা কি প্লিমাউথের লোকের কাছে হারিয়া যাইবে? আর তাহারা ঠাট্টা করিবে যে বিড়ফোর্ডের লোকের সমুদ্রযাত্রার সাহস নাই? কিছু ভয় নাই, সাহস কর। সোজা রাস্তা— পুকুরের মত শান্ত জল। আমি পথের নাড়ী নক্ষত্র সব জানি, এই সেলভেসন ইউও জানে। তাহার নিকট নক্সাও আছে।"

এই কথা বলিতেই সেলভেসন ইউ তাহার বগলের নীচ হইতে একটা মহিষের শিং বাহির করিল। তাহাতে জল ও স্থলের নক্সা আঁকা। ইউ উঁচু করিয়া শিংটা ধরিয়া বলিল, "দেখ সকলে! কি সুন্দর নক্সা। আমি এক পর্ত্তুগীজের নিকট ইহা পাইয়াছিলাম। সে নিজের চোখে স্থানগুলি দেখিয়া এই নক্সা আঁকিয়াছে। তোমরা হাতে লইয়া দেখ। পাঁচ মিনিটে তোমরা নূতন মহাদেশের প্রধান প্রধান স্থানগুলির পরিচয় পাইবে।"

একজনের হাত হইতে আর একজনের হাতে শিংটা ঘুরিতে লাগিল। তাহার কথায় কাজ হইয়াছে দেখিয়া অক্সেনহাম মদের দোকান হইতে মদ লইয়া শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিল। আর, একজনের পর একজন করিয়া অক্সেনহামের নিকটে আসিয়া সমুদ্র যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেই ছাত্রটি এতক্ষণ অতি আগ্রহের সহিত অক্সেনহামের বক্তৃতা শুনিতেছিল। বিস্মিতচক্ষে সে সেই মহিষের শিংটি দেখিতে লাগিল। জনতা যখন কতকটা হাল্কা হইয়াছে, কাপ্তেন নবলব্ধ সঙ্গীদিগকে লইয়া মদের দোকানে প্রকাশ করিতে যাইতেছে, তখন বালকটি আরো অগ্রসর হইয়া সেই বিস্ময়কর শৃঙ্গটি হাতে লইয়া দেখিতে চাহিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

বালক অতি কুতূহলে, অতি আগ্রহে চক্ষু দিয়া যেন শৃঙ্গের উপর অঙ্কিত বিষয়গুলি গ্রাস করিতে লাগিল! কত সমুদ্র, কত দেশ, কত নগর, বন্দর, স্পেনীয় জাহাজ, কত জীবজন্তু সেই শৃঙ্গে খোদিত আছে। ইংরাজীতে স্থানে স্থানে লেখা আছে, "এখানে অনেক সোণা আছে," কোথাও লেখা "অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণ রৌপ্য।" এই ইংরেজী লেখাগুলি নিশ্চয়ই অক্সেনহাম নিজে লিখিয়া রাখিয়াছিল। বালক উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পুনঃ পুনঃ শৃঙ্গটি দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ইহার অধিকারী বুঝি রাজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সে ভাবিতে লাগিল, যদি সে এই শৃঙ্গটি পায় তবে তাহার মতন সুখী ত্রিসংসারে আর কেহ নয়। বালক বলিল—"তোমরা কি এই শিংটা বিক্রী করিবে?"

অক্সেনহাম। নিশ্চয়ই! উপযুক্ত মূল্য পাইলে আমি আমার আত্মা পর্য্যন্ত বিক্রী করিতে পারি, কেন বেচ্‌ব না?

বালক। আমি শিংটা চাই, তোমার আত্মায় আমার কোন দরকার নাই। এই দেখ, আমার নিকট একটা ছ'পেনি (চার আনা) আছে, এতে এই শিংটা দিবে?

অক্সেনহাম। বটে? এর মত কুড়িটা দিলেও নয়!

বালক কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, আমি যুদ্ধে তোমাকে পরাস্ত করিয়া শিংটা জিনিয়া লইব। এস লড়াই করি।" তখনকার দিনে শারীরিক বলের এরূপ ব্যবহার নিত্যই হইত।

অক্সেনহাম। ইউ! এই বোকা ছেলেটার মাথাটা গুড়ো করে দাও ত হে!

বালক। আমাকে ফের বোকা বলবে ত' আমিই তোমার মাথা ভাঙ্গব।

অক্সেনহাম তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার সমবয়সীদের সঙ্গে মারা-মারি কর গিয়া, আমাদের মত ছোট ছোট লোকদের মাপ কর।"

বালক। মহাশয়, আমি বয়সে বালক বটে, কিন্তু আমার মুষ্টি বালকের মুষ্টি নয়! এই মাসেই আমার ১৫ বছর পূর্ণ হবে। আমাকে কেহ অপমান করিলে কি করিয়া তাকে শিক্ষা দিতে হয় আমি তাহা বেশ জানি।

"কি! তোমার বয়স মাত্র পোনর বৎসর? তোমাকে কুড়ি বছরের যুবকের মত দেখায়!" এই বলিয়া অক্সেনহাম বালকের উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সুপুষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সুতীব্র চক্ষু ও সাধুতাব্যঞ্জক মুখের প্রতি প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, "তোমার মত অর্দ্ধ ডজন বালক পাইলে আমি

তাহাদিগকে বীরপুরুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। কি বল ইউ!"

ইউ। কাপ্তেনের মত বীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই বালক মহাবীর হইয়া দাঁড়াইবে।

তারপর অক্সেনহাম বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলত, তুমি এই নক্সাটার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন?"

বালক। কারণ—আমি সমুদ্রে যাইতে চাই। আমি আমেরিকা দেখিতে চাই, আমি স্পেনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাই। যদিও আমি ভদ্রলোকের ছেলে তবু আমি তোমার জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেই সুখী হই।

অক্সেনহাম। আমি বলিতেছি—শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি নিশ্চয়ই নৌযোদ্ধা হইতে পারিবে। তুমি কালে কাপ্তেন হইয়া নিজেই জাহাজ চালাইবে, আর শত শত স্পেনীয়ের মাথা কাটিবে। তুমি কার ছেলে বাছা!

বালক। আমি জন লে'র ছেলে।

অক্সেনহাম। ধন্য মিষ্টার লে! ধন্য তাঁর জীবন! আমি তোমার বাবাকে খুব জানি, তাঁর বাড়ীও আমি চিনি। আচ্ছা বলত, আজ রাত্রে তাঁর বাড়ীতে কারো নিমন্ত্রণ আছে কি?

বালক। হাঁ, সার রিচার্ড গ্রেনভিলের নিমন্ত্রণ আছে।

অক্সেনহাম। বটে! গ্রেনভিল! তিনি যে সহরে আছেন আমি তা জান্‌তাম না। আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ী যাও, তোমার বাবাকে বল গিয়া, যে রাত্রে কাপ্তেন জন অক্সেনহাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে' তোমার যাত্রার বিষয় স্থির করব। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, কোন চিন্তা নাই। আর এই শিঙ্গের কথা? ইউ! এই শিংটা ছেলেটিকে দাও। এর দাম এক নোবল আমি তোমাকে দিব।

"না না কাপ্তেন! আমি আপনার কাছে এক পেনিও চাই না। যদি গরিব নৌ-সৈনিকের উপহার নিতে এই ছেলেটি সঙ্কোচ বোধ না করে তবে তাহার সমুদ্রযাত্রার উৎসাহের জন্য এটি তাহাকে আমার প্রীতি-উপহার!" এই বলিয়া ইউ উৎসাহের সহিত শৃঙ্গটি বালকের হাতে পুরিয়া দিয়া ধন্যবাদের ভয়ে জনতার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল।

তারপর অক্সেনহাম তাহার নূতন সহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমরা অগ্রিম বায়না লইবার পূর্ব্বে আবার চিন্তা কর। আমি সব ভাল লোক চাই, বদলোক একটাও চাই না। কতকগুলি হতভাগা এমন আছে, তারা এ কাপ্তেনের নিকট পাঁচ পাউণ্ড, সে কাপ্তেনের নিকট দশ পাউণ্ড অগ্রিম নেয়, শেষে একবারে চম্পট! তেমন যদি কেহ এখানে থাক, এখনই চলিয়া যাও, তা না হলে শেষে বিপদে পড়িবে। টাকা নিয়ে যদি কেহ পালাও, জানিবে কাপ্তেন অক্সেনহাম তার যম। দুদিন পরে হউক আর দশ বছর পরে হউক, একদিন না একদিন তার দেখা আমি পাইবই—আর তখন তার দেহটা আমার হাতে নিশ্চয়ই দু'টুকরো হবে। আর যদি সত্য সত্যই কেহ আমার ভাই হইতে চাও, আমি তার ঠিক সহোদর ভাইয়ের মতই হব। বিপদ আসুক বা পুরস্কার আসুক, ঝড় তুফান হউক—খাই আর না খাই—আমি তার ভাই!"

বক্তৃতা শেষ করিয়া কাপ্তেন সঙ্গীদিগকে লইয়া মদের দোকানে প্রবেশ করিল। বালক শৃঙ্গটি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। আশা ও নিরাশায় তাহার মন দোলায়মান হইতে লাগিল। আর—একটা দারুণ লজ্জা আসিয়া তাহার চিত্ত অধিকার করিল। দশ বৎসর বয়স হইতে তাহার এই সমুদ্রযাত্রার অভিলাষ। সে আকাঙ্ক্ষা তা'র পিতামাতার নিকটও এতদিন গোপন রহিয়াছে। আর আজ কিনা উত্তেজনার মুহূর্ত্তে একজন অপরিচিতের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল? কি লজ্জার কথা!

এই বালক আমিয়াস এই উপন্যাসের নায়ক, কিন্তু আজকালকার দিনের হিসাবে তাহাতে নায়কোচিত গুণ কিছুই ছিল না বলিলে হয়। উচ্চ বংশে, সম্ভ্রান্ত পিতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলে কি হয়? তাহার চেহারা

সুন্দর ছিল না। লেখা পড়ায় তাহার আদবেই মন ছিল না। অনেক বেত্রাঘাতের সঙ্গে অতি সামান্য বিদ্যা সে হজম করিতে পারিয়াছিল। তবে বাইবেল খানা সে বেশ মন দিয়া পড়িত, আর পড়িত স্পেনীয়দিগের অত্যাচারপূর্ণ আমেরিকার কাহিনী। যত কুসংস্কারে তাহার মস্ত বড় মাথাটা পূর্ণ ছিল। যত পরীর গল্পে, ভূত প্রেতে তার বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস করিত, সূর্য্যই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে। আজকালের ছেলেরা তার সঙ্গে কথা বলিলে তার মূর্খতা দেখিয়া নিশ্চয়ই হাসিয়া কুটি কুটি হইত।

কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর ছেলেরা বিদ্যালয়ে যাহা শিখে না, এমন কতকগুলি বিষয় সে ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। সত্য কথা বলিতে, তীর ছুড়িতে, প্রসন্ন চিত্তে ক্লেশ সহিতে, আর সুভদ্র ব্যবহার করিতে সে উত্তমরূপেই শিখিয়াছিল। ভদ্রতা কথাটার অর্থ সেই ষোড়শ শতাব্দীতে ছিল,—ধনী হউক গরীব হউক, কাহাকেও কষ্ট না দিতে সর্ব্ব প্রযত্নে শিক্ষা করা, আর যাহারা নিজের অপেক্ষা দুর্ব্বল ও অক্ষম তাহাদের জন্য আপনার সুখস্বার্থ বিসর্জ্জন করা। তা ছাড়া বাজপক্ষীর খেলা ও ঘোড়া বশ করা,এই দুইটি বিদ্যাদ্বারা সে অধ্যবসায়, চিন্তাশীলতা এবং স্থৈর্য্য শিক্ষা করিয়াছিল। আর, বর্ত্তমান কালের কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীতে সে যদিও কিছুই শিক্ষা পায় নাই তথাপি সে, সকল প্রকার পাখী, মাছ ও পতঙ্গের নাম জানিত, আকাশের মেঘ দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহার তথ্য বলিতে পারিত। সর্ব্বশেষ কথা—তার বলিষ্ঠ দেহের জন্য সে কিছুদিন যাবৎ তাহাদের পাঠশালার সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কুস্তীতে, মারামারিতে তাহার সমকক্ষ ছেলে বিডফোর্ডে আর একটিও ছিল না। দুরন্ত ছেলেদের সে যমস্বরূপ ছিল। কখনও কোনও বলবান ছেলে কোন দুর্ব্বল ছেলের উপর অত্যাচার করিলে আমিয়াসের বজ্রমুষ্টি অমনি তাহার ঘাড়ে পড়িত। বিডফোর্ডের খালাসীদের ছেলেরা তাহার ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত। নীচ আমোদ প্রমোদে, হাতাহাতি, মারামারিতে খালাসীর ছেলেরা খুবই পটু ছিল, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার তাহাদের অঙ্গের ভূষণ ছিল, সুতরাং আমিয়াসের বজ্রমুষ্টির পরীক্ষা তাহাদিগকে প্রায়ই লইতে হইত।

তাহাকে আজকালের আদর্শে "ধার্ম্মিক" ছেলেও বলা চলে না। কারণ, যদিও সে প্রাতঃসন্ধ্যা জননীর সঙ্গে ঈশ্বরস্তোত্র আবৃত্তি করিত, এবং যদিও সে পিতামাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল যে, অন্যায় আচরণ অতি গর্হিত এবং সদাচার অতি উৎকৃষ্ট, যদিও সে নিয়মিত রূপে ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইত, কিন্তু "ধর্ম্মতত্ত্বের" কোন তথ্যই সে জানিত না। মানবাত্মার গূঢ় রহস্য সে কিছুই বুঝিত না। তবে আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞ থাকিলেও মনুষ্যত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার—এই সকল বিষয়ে সে হীন ছিল না।

শৃঙ্গটি পুনঃ পুনঃ দেখিতে দেখিতে, আর মাতার কাছে কিরূপে সকল কথা বর্ণনা করিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে আমিয়াস বাড়ী চলিয়াছে। এই সমুদ্র যাত্রার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত সে তাহার কোন আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ, জীবনের কোন কথা, তাহার মাতার নিকট গোপন করে নাই। এই কথা সে কেন গোপন করিয়াছে?—জননীর প্রাণে কষ্ট হইবে বলিয়া। আর জানিত, এই অল্প বয়সে যখন সমুদ্রযাত্রা সম্ভবই নয় তখন মিছামিছি মাতাকে এখনই তাহা বলিয়া কষ্ট দিবার আবশ্যক কি?

ভাবিতে ভাবিতে বালক চলিতে লাগিল। নদীর ধারে একটি স্থান দেখিয়া মনে পড়িল, সেদিন গ্রামের বৃদ্ধ নাবিক বলিয়াছিল, কোন্ অতীত কালে, নরমান জলদস্যু এই স্থানে অবতরণ করিয়া দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার অস্ত্রশস্ত্র সমেত দেহ বিডফোর্ডের স্বদেশভক্ত সন্তানদিগের আঘাতে এখানেই জলগর্ভে সমাহিত হইয়াছিল। হায়! কবে সেদিন আসিবে, যখন আমিয়াসও তাহার দেশের শত্রুর বক্ষে এমনি করিয়া অস্ত্র হানিতে পারিবে! ঐ নিকটেই সমুদ্রে জাহাজগুলি দেখা যাইতেছে, কেমন পত পত করিয়া তাহাদের ব্রিটিশ-পতাকা উড়িতেছে! হায়, কবে আমিয়াস এইরূপ জাহাজে সমুদ্র যাত্রা করিবে! আমিয়াস, তোমাতে আমরা ইংলণ্ডের আদর্শ-বালক দেখিতে পাইতেছি। ক্ষুদ্র দ্বীপ-কারার সলিল-প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া ইংলণ্ডের

সুসন্তান মাত্রই দেশ আবিষ্কারের জন্য, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সেবার জন্য, উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতাবিস্তারের জন্য, দিক্‌দিগন্তে ধাবিত হইতেছে।"

সন্ধ্যাকালে মিঃ অক্সেনহাম সান্ধ্য ভোজের জন্য মিঃ লে'র বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভোজনান্তে অক্সেনহাম সার রিচার্ড গ্রেনভিলকে বলিল, "সার রিচার্ড, আপনি মিঃ লেকে বুঝান, আমি তাঁহার পত্নীকে বুঝাইবার ভার লইতেছি।"

গ্রেনভিল। আপনি মহিলাদিগকে বুঝাইতে খুব সুদক্ষ, তাহা জানি। কিন্তু আমাকে আপনি গুরুতর ভার দিতেছেন। মহিলাদের সহিত বাক্যালাপে আপনার যতটা দক্ষতা আছে, পুরুষদের সহিত কথাবার্ত্তায় আমার সে পটুতা একবারেই নাই। বন্ধুবর লে! হার্ডের বড় জাহাজখানা কি সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে?

এই সার রিচার্ড গ্রেনভিল ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সেকালে সভ্যদেশ মাত্রেই তিনি ইংলণ্ডের একজন প্রধান রাজনীতিবিদ্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দেহ স্থুল কিন্তু সুদৃঢ় ও সমুন্নত। ললাট প্রশস্ত, কিঞ্চিৎ উচ্চ; নাসিকা সুদীর্ঘ, সুতীক্ষ্ণ, সুগঠিত। বদনমণ্ডল ক্ষুদ্র শ্মশ্রুরাজি-শোভিত এবং সবিশেষ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। তবে চক্ষু দুটী একটু ছোট, ভ্রূযুগলও সুন্দর নয়। যা হোক, মোটের উপর তাঁহার আকৃতি সুন্দর ও বীরত্বব্যঞ্জক। তাঁহার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যাইত, তিনি শিষ্টের বন্ধু, দুষ্টের যম। তাঁহার সম্মুখে কোন অন্যায় আচরণ করিতে কাহারো সাহস হইত না। ধনে সম্পদে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, কুলে শীলে ও বীরত্বে সার রিচার্ড ইংলণ্ডের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিত—বস্তুতঃ তাঁহার চতুর্দ্দিকে গৌরবের বিষয় অনেক ছিল। তিনি তাঁহার জাহাজের নাবিকদিগের প্রতি কখন কখন কঠোর ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন—কিন্তু সে কখন?—যখন তিনি তাহাদের মধ্যে মিথ্যা ও কাপুরুষতার আভাস দেখিতে পাইতেন। তিনি কখনো কখনো ক্রোধে অভিভূত হইতেন—সে এমন ভীষণ ক্রোধ যে টেবিলের উপর হইতে কাচের গ্লাস তুলিয়া দাঁতে চিবাইয়া তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিতেন, শেষে একেবারে গিলিয়াই ফেলিতেন। কিন্তু কখন তাঁহার এরূপ ক্রোধ হইত?—যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারীর নির্দ্দয় অত্যাচারের বিবরণ শ্রবণ করিতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার ক্রোধ ছিল স্পেনীয়দের উপর। তিনি তাহাদিগকে মানুষ ও ঈশ্বর উভয়ের শত্রু মনে করিতেন।

অক্সেনহাম সার রিচার্ডের এই স্পেনীয় বিদ্বেষের কথা ভাল রূপেই জানিত, সুতরাং সে আশা করিয়াছিল, স্পেনীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় বন্ধুপুত্র আমিয়াসকে তাহার সঙ্গে দিতে নিশ্চয়ই তিনি সাহায্য করিবেন। কিন্তু তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অসম্মত দেখিয়া অক্সেনহাম বিস্মিত হইয়া বলিল:—

"ও সার রিচার্ড! আপনি নিশ্চয়ই সেই পাপিষ্ঠ স্পেনীয়দিগের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই! ড্রেক্‌কে তাহারা বলে জলদস্যু!"

গ্রেনভিল। বন্ধু অক্সেনহাম! কাপ্তেন ড্রেক্ ও হকিন্স্ স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে যে ধনরত্ন কাড়িয়া লয় তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া আমি কখনই মনে করি না। কারণ, বল প্রকাশ করিয়া, অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া, স্পেনীয়েরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে যে ধন কাড়িয়া আনে, তাহাদের নিকট হইতে তাহা পুনঃ কাড়িয়া আনিয়া ইংলণ্ডের জলযোদ্ধারা কিছুমাত্র অন্যায় করে না। ঈশ্বর স্পেনীয়দের এই পাপের শাস্তি অবশ্যই দিবেন।

মিসেস্ লে—আমিয়াসের মাতা—বলিলেন, "নিশ্চয়ই ভগবান এ অত্যাচার সহিবেন না।"

অক্সেনহাম। আপনারা যা বলেন আমিও তাই বলি। তবে আমি এই চাই, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে ঈশ্বর যেন ইংরাজ-জাতিকেই যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেন।

গ্রেনভিল। আমিও আপনার সহিত এবিষয়ে একমত। এই সকল ধনরত্নের অধিকারীগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর রূপে স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অথবা তাহাদের দ্বারা চিরদাসত্বে আবদ্ধ আছে; এ ধন আর তাহারা যখন পাইবেই না, তখন ইহা ইংলণ্ডের রাজ-

কোবেই সজ্জিত হউক, ইংরাজ-জাতিকে প্রতাপান্বিত করিয়া তুলুক, সুসংস্কৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের শক্তি বৃদ্ধি করুক, সমস্ত পৃথিবী তাহাতে উপকৃত হইবে। ওঃ! কি অত্যাচার! কি নিদারুণ পাশবিকতা! এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করা যদি ঈশ্বরের কাজ না হয় তবে আর কি যে ঈশ্বরের কাজ, আমি জানি না।

বলিতে বলিতে গ্রেনভিল মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার জলন্ত চক্ষু অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল।

অক্সেনহাম বলিল, "এই ত ঠিক সার রিচার্ডের মত কথা! তাঁর মতন, মনের ভাবকে ভাষায় এমন সুন্দর করিয়া আর কে প্রকাশ করিতে পারে? কিন্তু হায়, কি দুঃখের কথা, যে এমন মহৎ কার্য্যে যাত্রা করিতেও এই বালককে তিনি সাহায্য করিতেছেন না।"

গ্রেনভিল। আপনি ত ইহার পিতামাতাকে বলিয়াছেন, তাঁহারা কি বলিলেন?

মিঃ লে বলিলেন, "আমার উত্তর এই যে, যদি ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় হয়, যে আমার পুত্র ভবিষ্যতে সার রিচার্ড গ্রেনভিলের মত জলযোদ্ধা হইবে, তবে সে সমুদ্রে যাইবে, ঈশ্বর তাহার সহায় হউন। কিন্তু আগে তাহাকে গৃহে থাকিয়া সার রিচার্ডের মত ভদ্রলোক হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে!"

সার রিচার্ড আত্মপ্রশংসায় মাথা নীচু করিলেন। মিসেস্ লে স্বামীর কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন, "মিঃ অক্সেনহাম, একথায় আপনিও আপত্তি করিতে পারেন না। আর আমার কথা,—যদিও স্ত্রীলোক বলিয়া আমার বুদ্ধি অল্প, কিন্তু মনে রাখিবেন, আমি আমিয়াসের মা। এখন সে-ই আমার কোলের ছেলে। তা'র বড় ভাই, দূরে—সুদূরে—বাস করিতেছে; ঈশ্বর জানেন, কবে আমি বাছাকে আবার দেখিয়া আমার চোখ জুড়াইব। তার বিদ্যার খ্যাতি, তার চরিত্রের প্রশংসা—শুনিয়া আমার খুবই আনন্দ হয়, কিন্তু মিঃ অক্সেনহাম, বাছাকে এতদিন চক্ষে না দেখিয়া প্রাণে যে যাতনা পাই তার সঙ্গে কি এ সুখের তুলনা হয়? আপনি আজ আবার আমার আমিয়াসকে নিয়ে যাবেন না। মিঃ অক্সেনহাম, আমার বোধ হয় আপনার সন্তান নাই: সন্তানের মর্ম্ম আপনি জানেন না, তা না হলে আমার সন্তানকে আপনি এমন করিয়া নিতে চাহিতেন না!"

শেষ কথাটা শুনিয়া অক্সেনহামের মুখ প্রথমে পাণ্ডুবর্ণ, পরক্ষণেই রক্তবর্ণ ধারণ করিল, সে বলিল, "আপনি কি করিয়া তা জানেন মিসেস্ লে!" মিসেস্ লে'র কথা অক্সেনহামের হৃদয়ের এক গুপ্তস্থানে আঘাত করিয়াছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মিসেস লে'র হস্তচুম্বন করিয়া বলিল, "ভদ্রে, আর নয়, আমি এখন আসি। আপনার মত স্ত্রী যেন প্রত্যেক পুরুষ পায়!"

মিসেস লে সহাস্য বদনে বলিলেন, "আর প্রত্যেক স্ত্রী যেন আমার স্বামীর মত স্বামী পায়।"

"এ কথাটী বলিতে আমি প্রস্তুত নই!" এই বলিয়া অক্সেনহাম মিঃ লে'কে অভিবাদন করিয়া বলিল, "বন্ধু লে, এখন বিদায় হই, সার রিচার্ড, বিদায়! ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আমি যখন ফিরিয়া আসিব, তখন আপনাকে যেন হাই এডমিরালের উচ্চ পদে আসীন দেখিতে পাই। হায়! আমি যে ফিরিয়া আসিব, তাই বা কে বলিতে পারে! আপনারা কি আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন?"

এই কথা বলিয়া যেমনই অক্সেনহাম দরজার দিকে মুখ ফিরাইল অমনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন, দেখুন— ঐ দেখুন সেই শ্বেতবক্ষ পাখী!"—যেন পাখীটা ঘরের ভিতরই উড়িতেছে, এই ভাবে সে তাহাকে ধরিবার জন্য ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকলে একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। মিঃ লে বুদ্ধিমান প্রবীণ লোক, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কোথায় পাখী মিঃ অক্সেনহাম! আপনার শত্রুরাই শ্বেতপাখী দেখুক, আসুন আমরা আপনার স্বাস্থ্য পান করি।"

কিছুক্ষণ পরে অক্সেনহাম চলিয়া গেলে মিসেস্ লে বলিলেন, "ভগবান বেচারাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

গ্রেনভিল বলিলেন, "আমি এ সকল কু লক্ষণে বিশ্বাস করি না।"

মিসেস্ লে। কিন্তু সার রিচার্ড! অক্সেনহাম বংশের সকলেই বংশপরম্পরা ক্রমে মৃত্যুর পূর্ব্বে এই শ্বেতপাখী দেখিয়া আসিয়াছে। আমি জানি, যখন

ইহার মা ও ভাই মারা গিয়াছিলেন তখন তাঁহারাও এই পাখী দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গ্রেনভিল। দেখুন, ঈশ্বর যখন মৃত্যু পাঠান তখনই মৃত্যু হইবে; ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা আমাদের মৃত্যুর আর উৎকৃষ্ট সময় কি হইতে পারে?

মিঃ লে। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, এই সকল কু-লক্ষণ আর ভবিষ্যদ্বাণী মানুষের বড় অনিষ্ট করে। ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া মানুষ নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী বা লক্ষণ-নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত হয় এবং নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

গ্রেনভিল। এই অন্ধ নিয়তির উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া তাহারা যদি জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে তবে মানুষ কি না করিতে পারে! বিশ্বাসের বলে মানুষ পর্ব্বত স্থানান্তরিত করিতে পারে, দাবানল নির্ব্বাপিত করিতে পারে, একাকী সহস্র শত্রুসৈন্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে। আমিও জানি,—কি করিয়া যে জানি, তা বলিতে পারি না—যে গৃহশয্যায় আমার মৃত্যু হইবে না।

মিসেস্ লে অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর করুন, তা যেন না হয়।"

গ্রেনভিল। কেন মিসেস্ লে! আমি যদি আমার ঈশ্বর ও আমার রাজ্ঞীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মরিতে পারি তবে যেখানে সেখানে আমার মৃত্যু হোক না! সত্য কথা বলিতে কি, আমি অনেক সময় প্রার্থনা করি, বৃদ্ধ হইয়া, বার্দ্ধক্যের জড়তায় অভিভূত হইয়া আমাকে যেন মরিতে না হয়। যাক এখন এসব কথা। মিঃ লে, আজ আপনি অতি বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন। অক্সেনহাম শুধু একটী উদ্দেশ্য লইয়া এবার সমুদ্রযাত্রা করিতেছে না। আমি ড্রেক ও হকিন্সের সহিত তাহার সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি। মিসেস্ লে যখন তাহাকে সন্তানের কথা বলিয়াছিলেন তখন সে কেন চমকাইয়া উঠিয়াছিল, আমি বোধ হয় তাহার কারণ অনুমান করিতে পারিয়াছি!

মিসেস্ লে। অ্যাঁ! তবে কি আমেরিকায় তাঁহার কোন সন্তান আছে?

গ্রেনভিল। ঈশ্বর জানেন! ঈশ্বর করুন, আমাদিগকে যেন ডিভনের একটী প্রাচীন ভদ্র পরিবারের লজ্জা ও অপমানের কথা শুনিতে না হয়। আচ্ছা, এখন এসকল কথা থাকুক। ওগো আমার সাহসী ধর্ম্মপুত্র (godson),* একবার এদিকে এস ত! অমন বিষণ্ণ হইয়া থাকিও না। আমি শুনিয়াছি, তুমি নাকি সব খালাসিদের ছেলেদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছ?

আমিয়াস বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "সকলের নয়, অনেকের। কিন্তু আমি কি সমুদ্রে যাইতে পাইব না?"

গ্রেনভিল। সব কাজেরই সময় আছে বাছা! তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার পিতা মাতা অথবা আমি, কেহই তোমাকে তোমার মহৎ সংকল্প হইতে চ্যুত করিতে চাই না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই একটা জেলেডিঙ্গির নাবিক হইতে চাও না?

আমিয়াস। আমি অক্সেনহামের মত জলযোদ্ধা হইতে চাই।

গ্রেনভিল। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তুমি তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হবে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ত পশুতেও করে, নিজের সঙ্গে যে সংগ্রাম করিতে পারে সেই ত মানুষ!

আমিয়াস। আজ্ঞে, তা কি করে হয়?

গ্রেনভিল। আমিয়াস! আমাদের কল্পনা, লালসা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা,—এ সকলকে কর্ত্তব্যের খাতিরে পরাজিত করার নামই নিজের সহিত সংগ্রাম। ইহার নামই বীরত্ব, ইহাই বলবানের লক্ষণ। যে নিজেকে শাসন করিতে পারে না, সে কি করিয়া তাহার জাহাজের নাবিকদিগকে, আর তার ভাগ্যলক্ষ্মীকে শাসন করিবে! এস, আমি তোমার নিকট আজ একটা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। তুমি যদি শান্ত ভাবে বাড়ীতে থাকিয়া তোমার পিতামাতার আদেশ অনুসারে, তাঁহাদের শিক্ষা অনুসারে, চরিত্র গঠন কর,—প্রকৃত ভদ্রলোক, প্রকৃত ধার্ম্মিক ও প্রকৃত নাবিকের কর্ত্তব্য শিক্ষা কর, তবে তুমি স্বয়ং রিচার্ড গ্রেনভিলের সঙ্গে, অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন নাবিকের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করিতে পাইবে। আর

* খ্রীষ্টান শিশুর দীক্ষার সময় এক ব্যক্তি তাহার ধর্ম্মপিতা (god father) হন, সার রিচার্ড আমিয়াসের ধর্ম্মপিতা।

ধনসংগ্রহ অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য লইয়াই তুমি সমুদ্রযাত্রায় বাহির হইবে।

মিসেস্ লে। বাছা আমিয়াস, শোন, সার রিচার্ড তোমার নিকট আজ কি প্রতিজ্ঞা করিলেন! নিশ্চয় জানিও, অনেক বড় বড় জমিদারের ছেলে এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে ধন্য হইয়া যাইত।

গ্রেনভিল। আপনারা দু'জন ইহাকে যে শিক্ষা দিতে পারেন, আমিয়াস যদি তাহা অনুসরণ করিয়া চলে তবে আর দশ বৎসর পরে সে অনেক জমিদারপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, সন্দেহ নাই। আমিয়াস, তুমি কি আমার দাদা সার টমাস ষ্টুক্লির কথা শুনিয়াছ? তিনি অতি সাহসী বীর। আমাদের রাজ্ঞী তাঁহাকে প্রথমে খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু একটী মাত্র গুণের অভাবে তাঁর আর সকল গুণ পণ্ড হইয়া গেল।—সেটী এই যে—জগতকে শাসন করিতে যাইয়া তিনি আপনাকে শাসন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি বিলাসিতা ও জাঁকজমকে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিলেন। খ্যাতি লাভের আশায় যা করিতে লাগিলেন তাহাতে খ্যাতি নষ্টই হইতে লাগিল। তারপর নষ্ট বিষয় উদ্ধারের আশায় ফ্লোরিদাতে উপনিবেশ স্থাপনের সংকল্প করিলেন। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তুমি আমি একদিন ফ্লোরিদার উপনিবেশ দেখিতে পাইব, কারণ আমি মহারাণীর নিকট সে বিষয়ে আদেশ পাইয়াছি। কিন্তু ষ্টুক্লি রাজভক্ত প্রজার ন্যায় কাজ করেন নাই, তিনি রাজ্যের সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া আত্মসম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধ হইয়াছিল, তিনিও রাজা হইবেন। মহারাণীকে একথা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই যে, প্রবল প্রতাপান্বিত বিশাল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রজা হওয়া অপেক্ষা তিনি একটা উই ঢিবিতে রাজত্ব করাও শ্রেষ্ঠ মনে করেন!

মিসেস লে। আহা বেচারা! আত্মম্ভরিতাই স্বেচ্ছাচারের জননী। এই আত্মম্ভরিতার বীজ আমাদের সকলের প্রাণেই আছে। "আমি"—"আমার"—এই আমিত্বই আমাদিগকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়।

মিঃ লে। এখন ষ্টুক্লি কোথায় আছেন?

গ্রেনভিল। ইংলণ্ডের বশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি এখন "অভ্রান্ত গুরু" পোপের আশ্রয় লইয়াছেন। পোপের সাহায্যে তিনি আয়র্লণ্ড অধিকারের কল্পনা করিতেছেন। মৃত্যু নিকট হইয়াছে। আচ্ছা, এখন ঢের রাত্রি হইয়াছে, আজ তবে আসি।

সুতরাং আমিয়াস যথারীতি পুনরায় স্কুলে যাইতে লাগিল। অস্লেনহাম সাগর-যাত্রা করিল। (ক্রমশঃ)

বিচিত্র।

কোথায় বসিয়া একেলা আড়ালে
নিতি নিতি নব নব,
ওগো বিচিত্র! নিদ্রা-বিহীন ওগো,
কেমন এ খেলা তব?
আপনার শির ছিন্ন করিছ,
আপন রুধির করিছ পান,
আপনি গড়িয়া করিছ চূর্ণ –
আপনি শুনিছ আপন গান।

আপনি লয়েছ শিশুর জনম,
মা হ'য়ে ধরিছ বুকে,
হাসিছ, খেলিছ, কাঁদিছ আবার
না জানি কি সুখে দুঃখে?
অন্ত তোমার নাই, কোথাও নাই,
কোথাও তোমার পাইনা ভুল,
জগত জুড়িয়া উঠিছে ঢেউ
কোথাও তাহার পাই না কূল।

দুলিছে তোমার লীলার দোল্না
আলোকে বাতাসে হাসে,
কখন লুকাও, সমুখে আবার
ঘুরাইছ আশে পাশে।
হাসিছ তুমিতো আপনার মনে
আপনারে লয়ে আপন খেলা,
একটি সূত্র ঘুরায়ে ফিরায়ে
দোলাও তোমার বিরাট্ দোলা।

ভাবিয়া তোমার মিলেনা তো সীমা
অর্থ কোথাও নাই,
ও বিচিত্র রূপে পরমপুরুষ!
স্তব্ধ হৃদয় তাই।
আপনি তৃপ্ত আপনার প্রেমে
আপনি নিতেছ আপন দান,
আপনি মিলিছ আপনার সনে
গাও আপনারি বিরহ গান।

শত শত ভাগ আপনি হয়েছ
ধরেছ কত না বেশ,
সব ভেঙ্গে পুনঃ দাঁড়াইছ 'এক'
করিছ খেলার শেষ॥

শ্রীসুধাসিন্ধু সেনগুপ্ত।

স্তনদুগ্ধ ও শিশুর আহার।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর, প্রত্যেক জীবের আহারের জন্য, পরমপিতা পরমেশ্বর মাতৃস্তনে অমৃত-ধারা স্বরূপ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন। এই দুগ্ধ পান করিয়া সদ্যোজাত শিশু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু সভ্যতার কি মাহাত্ম্য! আজকালকার প্রসূতি-দিগের অনেকেরই স্তনে দুগ্ধ প্রায়ই থাকে না। অনেক প্রসূতির সন্তান গো-দুগ্ধ বা নানারূপ "পেটেণ্ট ফুড" খাইয়া থাকে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন যে এই প্রকারে শিশুপালন দ্বারা কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। শৈশবাবস্থায় যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার অধিকাংশ আহারের অনিয়ম জন্য ঘটিয়া থাকে।

কি প্রকারে শরীর পালন দ্বারা নিজ নিজ স্তন হইতে সন্তান পোষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিতে পারেন এবং শিশুদিগকে সম্যকরূপে পালন করিতে পারেন এ বিষয় যদি জননীরা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করেন তাহা হইলে শিশুদিগের অকাল-মৃত্যু অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের সংসারে সুখ শান্তি বিরাজ করিতে পারে।

সকল জননীই নিজ নিজ সন্তানকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকেন। কোন্ জননী তাঁর নিজ সন্তানকে মেধাবী ও বলিষ্ঠ দেখিতে চাহেন না?

শিশুকে যেমন করিয়া লালন পালন করিবে, শিশু সেইরূপেই বর্দ্ধিত হইবে। শৈশবাবস্থায়ই পরবর্ত্তী জীবনের আশা ভরসার বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরে যে প্রকার আহার্য্য দেওয়া হইবে, বৃক্ষ সেইরূপই হইবে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর মাতৃস্তনে এই আহার্য্য যোগাইতেছেন। এই স্তনদুগ্ধ সম্যকরূপে শিশুকে না দেওয়াতে কত শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। কত শিশু যে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সংখ্যাতীত। কত লোক আত্মীয়স্বজন ও সমাজের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

শৈশবাবস্থায় উপযুক্ত আহার্য্য অভাবে মনুষ্য বিকলাঙ্গ হইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য মধ্যে অস্থি সকলকে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে বিশেষ উপকরণ থাকে তাহার অভাব জন্য শিশুর অস্থি অসার ভাবে বর্দ্ধিত হয় ও দেহের ভার দ্বারা ক্রমশঃ বক্রভাব ধারণ করে।

আহারের অভাবে কেবল যে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হয় তাহা নহে। দুর্ব্বল শরীরে রোগ অধিক প্রবল হয় এবং সত্বই ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুদিগের শরীরের বৃদ্ধি ও উপযুক্ত পুষ্টি কেবল আহারের উপর নির্ভর করে না। যখন তাহারা ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন মাতার শরীরের অবস্থা, তাঁহার আহার ও শরীরের অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হয়। বারান্তরে আমরা এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শিশুর স্বাভাবিক আহার—সাধারণের ধারণা, যে মাতৃস্তনদুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক খাদ্য। কিন্তু

সকল সময়ে মাতৃস্তনদুগ্ধ দ্বারা শিশুর সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয় না। সেইজন্য যে খাদ্য শিশুর শরীরের অভাবকে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে তাহাকেই আমরা শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া অভিহিত করিব।

এই বিশ্বজগতে প্রাণী মাত্রেরই নিজ নিজ শরীরের বিশেষত্ব দেখা যায়। শিশুদেরও সেইরূপ। ভিন্ন ভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। এইজন্য শিশুর আহার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রত্যেক শিশুর শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সকল অতিশয় যত্নের সহিত পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি? কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব যে শিশুর পরিপাক, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সকলই স্বাভাবিক রূপে সম্পাদিত হইতেছে?

কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আমরা সদ্য সদ্যই বুঝিতে পারি। কতকগুলি প্রতিক্রিয়া বুঝিতে পারা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ।

আহার সম্যক্‌রূপ পরিপাক করিতেছে কি না তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। যদি শিশু আহারের পর তৃপ্ত হয়, বমি না করে, কোন প্রকার বেদনা বা অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ না করে এবং তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে আমরা স্বতঃই স্থির করি, যে শিশুর পরিপাকক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতেছে এবং যে খাদ্য তাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

শিশুর খাদ্য যথেষ্ট এবং উত্তমরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি না হইতে পারে।

উদাহরণ:—শিশুদিগকে ঘন দুগ্ধ (Condensed milk), শুষ্ক দুগ্ধ (Dried milk) বা নানাপ্রকার পেটেণ্ট খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় (Patent infant's food) এবং তাহারা এই প্রকার আহারে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রকারে পুষ্ট শিশুদের রিকেট্‌স ও স্বার্ভি নামক পীড়া হইতে প্রায়ই দেখা যায় এবং তাহারা সদাসর্ব্বদা নানারূপ রোগে ভুগিয়া থাকে।

অধ্যাপক চিডেল (Dr. Cheadle) তাঁহার লিখিত পুস্তকে এবিষয় অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রিনউইচ সহরে এক শিশু প্রদর্শনী হইয়াছিল। যে শিশুটি হৃষ্টপুষ্টতা ও ওজনের আধিক্যের পুরস্কার পাইয়াছিল সে-ই পুনরায় তাঁহার নিকট Great Ormond Streetএর চিকিৎসালয়ে হস্ত ও পদের বক্রতা এবং শরীরের মাংসপেশী সমূহের দুর্ব্বলতার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিল। এই বালকটী কেবলমাত্র বিলাতী দুধ (Condensed milk) এবং কর্ণফ্লাওয়ার(Corn Flour)খাইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শিশুদের স্বাভাবিক খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করিতে হইলে খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক পাইতেছে ও শরীরের সম্যক্‌রূপ পুষ্টি সাধিত হইতেছে কি না, কেবল তাহা নির্দ্ধারণ করিলে হইবে না। কিন্তু এই সঙ্গে যাহাতে শিশুদের পরিপাক-শক্তি বিকাশ পায় তাঁহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে প্রকারে শিশুকে কথা কহিতে, চালাইতে ক্রমশঃ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে সেইরূপই যাহাতে শিশুর পরিপাকের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে ক্রমশঃ পরিপাক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রসকল কার্য্যক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। শিশুর পরিপাক-ক্রিয়া অক্ষত ভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্তনদুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তনে দুগ্ধ আইসে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত এই স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তনের সহিত শিশুর পরিপাক-ক্রিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে।

যদি শিশুদিগকে কৃত্রিম উপায়ে (স্তনদুগ্ধ ব্যতীত) শরীরতত্ত্ব বিধান অনুযায়ী আহার্য্য দিতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়ম যতদূর সম্ভব অনুকরণ করা আবশ্যক।

শিশুকে শরীর-তত্ত্বানুযায়ী আহার্য্য দিতে হইলে তাহার পরিপাক, পুষ্টি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার প্রয়োজনের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য।

স্তন্য পান—সাধারণের বিশ্বাস, যে স্তনদুগ্ধ দ্বারা যে কোন শিশুকেই উৎকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত করা যাইতে

পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিবেচনার কথা আছে। যদি শিশুকে নিয়ম মত স্তনদুগ্ধ দেওয়া হয় তাহা হইলে শিশু যে উত্তমরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রসূতির শিশুকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং তিনি স্বাভাবিক নিয়ম সকল পালন করিতে যত্ন করেন না। এই সকল অনিয়মের জন্য স্তনদুগ্ধ-পুষ্ট শিশুদেরও নানা রোগ হইতে দেখা যায়। স্তনদুগ্ধ যতক্ষণ স্বাভাবিক নিয়ম মত নিঃসারিত হয় ততক্ষণ ঠিক থাকে। মাতার স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার স্তনের দুগ্ধেরও পরিবর্ত্তন দেখা যায়; এবং সময় সময় এই পরিবর্ত্তন শিশুর স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। যখন কৃত্রিম উপায়ে শিশুকে খাদ্য দেওয়া হয় তখন আমরা শিশুর আবশ্যক মত এই খাদ্যের পরিবর্ত্তন সহজেই করিতে পারি। শরীর-তত্বানুমোদিত উপায়ে স্তনদুগ্ধ দ্বারা শিশুকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে, স্তন্যপায়ী শিশুর লক্ষণ সকল কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা বর্দ্ধিত শিশুর লক্ষণের ন্যায় সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

সময়ে সময়ে স্তনদুগ্ধ একেবারেই বন্ধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়ার আবশ্যক হয় এবং এই সঙ্গে প্রসূতির খাদ্য দ্রব্যাদি ও স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম খাদ্যের সংমিশ্রণে অনেকের আপত্তি দেখা যায়। ভিন্ন প্রকারের খাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিবে এ প্রকার ভুল ধারণা হইতেই অনেকে ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের কোনই ভিত্তি নাই।

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক প্রণালীর সংমিশ্রণেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

স্তনদুগ্ধের স্বাভাবিক ও রাসায়নিক গুণ—

প্রসবের পরে স্তন হইতে যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাহা পরবর্ত্তী কালের দুগ্ধ হইতে অনেক বিভিন্ন। প্রসবের পরেই কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাহাকে ইংরাজিতে Colostrum ও চলিত কথায় গাঁজাল দুগ্ধ বলে। পরবর্ত্তীকালের দুগ্ধের সহিত গাঁজাল দুগ্ধের অনেক রাসায়নিক বিভিন্নতা আছে।

(১) গাঁজাল দুগ্ধের আমিষ জাতীয় অংশ যদিও স্তনদুগ্ধের আমিষ অংশের সহিত সমান পরিমাণে থাকে কিন্তু গাঁজাল দুগ্ধে আমিষ অংশ (Lact albumen ও Lact globulin রূপে) অধিক পরিমাণে থাকায় পাকাশয়ে ডেলা বাঁধিয়া যায় না।

(২) গাঁজাল দুগ্ধে যে চিনি বর্ত্তমান থাকে তাহা দুগ্ধশর্করা রূপে থাকে না, অন্য (Dextrose) রূপে থাকে। এই আকারে বিনা পরিপাকে শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে।

(৩) গাঁজাল দুগ্ধে (Colostrum Corpuscles নামক) কতকগুলি কোষ বর্ত্তমান থাকে। গর্ভের বৃদ্ধির সহিত স্তনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং স্তন মধ্যে দুগ্ধকণা সকল উৎপন্ন হয়। গর্ভাবস্থায় দুগ্ধের আবশ্যক থাকে না, এজন্য প্রসবের পূর্ব্বে (Colostrum) কোষ দুগ্ধকণা সমূহকে শোষণ করিয়া ফেলে এবং প্রসবের পরেও যতকাল পর্য্যন্ত না শিশুগণ তেজের সহিত দুগ্ধ টানিয়া নিঃশেষ করিয়া খাইতে পারে, ততকাল পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধে ঐ কোষ (Colostrum) দেখা যায়।

গাঁজাল দুগ্ধ—গাঁজাল স্তনদুগ্ধ স্বাভাবিক স্তনদুগ্ধ হইতে ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং ইহার মৃদু বিরেচক শক্তি থাকায় শিশুর "মেকোনিয়াম" বা প্রথম মল পরিত্যাগের সহায়তা করে।

গাঁজাল দুগ্ধে (Lact albumen ও Lact globulin রূপে) আমিষ বর্ত্তমান থাকে এবং সাধারণ দুগ্ধে এতদ্ব্যতীত Caseinও বর্ত্তমান থাকে। এই কেজিন নামক আমিষ জাতীয় খাদ্য শিশুর পাকস্থলীতে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং পাকস্থলীতে পুনরায় পরিপাক ক্রিয়া দ্বারা দ্রবীভূত হইলে শিশুর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। সদ্যোজাত শিশুর পাকস্থলী এই "কেজিনোজেন" নামক আমিষ পরিপাক করিতে পারে না। সেইজন্য সদ্য গাঁজাল দুগ্ধে কেজিনোজেন দেখা যায় না।

ক্রমশঃ শিশুর বয়সের সহিত দুগ্ধের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যেমন মাতৃস্তন-দুগ্ধের পরিবর্ত্তনের সহিত

কেজিন নামক আমিষ দেখা যায় তেমনি শিশুর পাকস্থলী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ও নূতন পরিপাক শক্তি প্রাপ্ত হয়।

কৃত্রিম উপায়ে শিশুদিগকে লালন পালন করিতে হইলে শিশুর পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক।

প্রসূতি ও ধাত্রীরা শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শিশুকে খাদ্য দেওয়ার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অনেক সময় তাঁহারা সাধারণ দুগ্ধ (যাহা পরিপাকের ক্ষমতা শিশুর একেবারেই নাই) দিয়া থাকেন ও তদ্দ্বারা কষ্ট ও রোগ আনয়ন করেন। প্রসবের পরেই শিশুকে স্তনপান করিতে দেওয়া অতি উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত। এতদ্দ্বারা মাতৃস্তন উত্তেজিত হয় এবং প্রসূতির জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। শিশু যে সামান্য পরিমাণ গাঁজাল দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা তাহার অন্ত্রমধ্যে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া উত্তেজিত হয় এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত "মেকোনিয়াম" পরিত্যক্ত হয়।* (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য সমাচার।

লক্ষ্মণ-উর্ম্মিলা সংবাদ।

(নাট্য)

অযোধ্যার প্রাসাদে—অন্তঃপুরের কক্ষ।

মাণ্ডবী ও উর্ম্মিলা।

মাণ্ডবী। উর্ম্মিলা, আজ তোমাকে এত বিষন্ন দেখছি কেন?

উর্ম্মিলা। কিজানি দিদি, গত রাত্রি হতে মন কেন হঠাৎ এত খারাপ হয়েছে। কিছুই ভাল লাগছে না। থেকে থেকে প্রাণ কেঁদে উঠছে। না জানি আমার বাছা অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু কারুপথ ও মল্লদেশে কেমন আছে?

মাণ্ডবী। স্নেহ চিরকালই অমঙ্গল আশঙ্কা করে। তোমার কোন চিন্তা নাই। কুলদেবতার কৃপায় তোমার বাছারা কারুপথ ও মল্লদেশে সুখে রাজত্ব ক'রছে।

উর্ম্মিলা। আহা, তাই হ'ক! বাছারা আমার কুশলে থাকুক। তোমার তক্ষ ও পুষ্কলের সংবাদ কাল পেয়েছ ত?

মাণ্ডবী। হ্যাঁ। গতকল্য আর্য্যপুত্র গন্ধর্ব্বদেশ হতে ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছেই সংবাদ পেলাম যে ভীষণ যুদ্ধের পর গন্ধর্ব্বেরা রঘুপতির বশ্যতা স্বীকার করেছে। যুদ্ধে আমার বাছারা খুব বীরত্ব দেখিয়েছে।

উর্ম্মিলা। ক্ষত্রিয়-জননীর পক্ষে এর চেয়ে সুখের সংবাদ আর কি হতে পারে?

মাণ্ডবী। তার পর শোন। গন্ধর্ব্বদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তক্ষ ও পুষ্কল এই দুই ভাইকে সেই দুই রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে আর্য্যপুত্র ফিরে এসেছেন।

উর্ম্মিলা। দেবর শত্রুঘ্নও, তাঁর দুই পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতীর সহিত মথুরারাজ্যে সুখে আছেন।

মাণ্ডবী। এদিকে কুশ-লবও সকল বিষয়ে তাদের পিতার তুল্য হয়েছে। এখন সকল দিকেই আমাদের উন্নতি। তবু তুমি আজ এত বিষন্ন কেন বোন্?

উর্ম্মিলা। কিজানি কেন? আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। থেকে থেকে প্রাণ কেঁদে উঠছে। একি কোন ভাবী অমঙ্গলের সূচনা?

মাণ্ডবী। অমঙ্গল দূর হ'ক। এই যে দেবর লক্ষ্মণ আসছেন।

লক্ষ্মণের প্রবেশ ও মাণ্ডবীকে প্রণাম।

মাণ্ডবী। দেবর, বৎস অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর কুশল সংবাদ পেয়েছ ত?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা হ্যাঁ। এই অল্পক্ষণ হল মল্লভূমি ও কারুপথ হ'তে যে সকল দূত এসেছে তাহাদের নিকট অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর কুশল সংবাদ পেয়েছি। তারা নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন ক'রছে।

---

* মূল প্রবন্ধটির ভাষা বড়ই জটিল, আমরা পাঠিকা ভগিনীগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য যথাসম্ভব সরল করিয়া দিলাম।

ভাঃ মঃ সঃ।

মাণ্ডবী। ঐ শোন ভগিনী, তুমি কত ভাবছিলে! তোমার বাছারা কুশলে আছে। আমি এখন চল্লাম।

(প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। তোমাকে এত বিষণ্ণ ব'লে বোধ হচ্ছে কেন?

ঊর্ম্মিলা। কি জানি কেন? কিন্তু তোমাকেও ত প্রফুল্ল ব'লে বোধ হচ্ছে না। একি! তোমার মুখ এত মলিন কেন? তুমি বলছ বাছাদের কুশল সংবাদ পেয়েছ অথচ——

লক্ষ্মণ। অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু কুশলে আছে। তবে আমার নিজের এক বিপদ উপস্থিত হ'য়েছে বল্‌তে হবে।

ঊর্ম্মিলা। সেকি! তোমার নিজের আবার কি বিপদ উপস্থিত হ'ল!

লক্ষ্মণ। আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও!

ঊর্ম্মিলা। (লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম)

লক্ষ্মণ। (ঊর্ম্মিলাকে ধরিয়া) আশ্বস্ত হও। এই আসনে ব'স। আমিও তোমার কাছে বসলাম। স্থির হও।

ঊর্ম্মিলা। (স্থির হইয়া) তুমি কি বলছিলে?

লক্ষ্মণ। যা বলি, মন দিয়ে শোন। বিচলিত হ'য়ো না।

ঊর্ম্মিলা। আচ্ছা বল।

লক্ষ্মণ। আজ প্রাতঃকালে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক মুনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই মুনিকে আমরা ইতিপূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে কতকগুলি অতি গোপনীয় কথা বল্‌তে চা'ন এবং সেজন্য একটী নিভৃত কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই মুনিবরের অভিপ্রায় অনুসারে মহারাজ এইরূপ নিয়ম করেন যে অন্যের অজ্ঞাতব্য তাঁদের কথোপকথন কালে যে তাঁদের সহিত সাক্ষাৎ কর'বে সে মহারাজের বধ্য বা বর্জ্জনীয় হইবে। সেই নিয়ম অনুসারে মহারাজ সেই মুনিবরের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হ'য়ে আমাকে দ্বার রক্ষা ক'রতে আদেশ করেন। মহারাজ সেই মুনিবরের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন এমন সময়ে দ্বারদেশে দুর্ব্বাসা মুনি আগমন ক'রে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান। আমি তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর'তে বলি। তিনি তা'তে সম্মত না হ'য়ে তাঁর অভিপ্রায় মত তৎক্ষণাৎ মহারাজকে সংবাদ না দিলে তিনি নিজেই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ ক'রতে এবং রঘুবংশীয়দিগকে অভিশপ্ত ক'রতে উদ্যত হ'ন। আমি তখন অনন্যোপায় হ'য়ে নিজেই মহারাজের নিকট দুর্ব্বাসা মুনির আগমন সংবাদ দিতে যাই। আমাকে দেখে সেই মুনিবর মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তারপর দুর্ব্বাসা মুনিও মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করে প্রস্থান করেন। এদিকে গুরু বশিষ্ঠ এবং অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ ক'রে মহারাজ আমাকে বর্জ্জনের আদেশ দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন।

ঊর্ম্মিলা। রঘুকুলের উচিত কার্য্য ক'রেছেন। চল না কেন আমরা অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রে কারুপথ অথবা মল্লভূমিতে চলে যাই?

লক্ষ্মণ। তা হয় না। আর্য্য রাম বিরহিত অন্যত্র জীবনধারণ আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যোগাবলম্বন ক'রে সরযূসলিলে প্রাণত্যাগ করব। তুমি আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও!

ঊর্ম্মিলা। আমি প্রথমে বড় ভীত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি ভয়ের কোন কারণ নাই। আমিও তোমার সহিত যোগাবলম্বনে সরযূসলিলে প্রাণত্যাগ ক'রব। তোমরা বনে গেলে চৌদ্দ বৎসর তোমার জন্য আশাপথ চেয়ে ছিলাম, আর শাশুড়ীদের সেবা করেছিলাম। এখন শাশুড়ীরা স্বর্গে গিয়েছেন, পুত্রেরাও উপযুক্ত হ'য়ে রাজ্যাধিকারী হ'য়েছে। আমরাও বহুদিন সংসার-ধর্ম্ম পালন করলাম। বার্দ্ধক্যে পত্নীসহ মুনিবৃত্তি অবলম্বন করাই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের কুলব্রত। আমরাও তাই করব।

লক্ষ্মণ। সাধ্বী! এ তোমার উপযুক্ত কথা হয়েছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। চল সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিগে। (উভয়ের প্রস্থান)।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত

সূর্য্যের কলঙ্ক।

বহুদিন পর্য্যন্ত লোকে কেবল মাত্র চন্দ্রের কলঙ্কের কথাই জানিত। কারণ, তাহার কলঙ্কটা কিনা খুব স্পষ্ট, তাই সহজেই ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সেইজন্য এত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্র বেচারা একাই এই কলঙ্কের বোঝা বহন করিয়া আসিতেছিল। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদের কৃপায় তাহার সে খেদ অনেকটা মিটিয়াছে। কারণ, আকাশরাজ্যেই তাহার আরো কয়টি জুড়ি জুটিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আমাদের সূর্য্য একটি।

সূর্য্যের গুপ্ত কলঙ্কের কথা ফাঁস হইয়া গেলেও এক বিষয়ে চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্যের বেশ সুবিধা। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন সুস্পষ্ট, সূর্য্যের কলঙ্ক কিন্তু তেমন নয়। তাহার কলঙ্কের পরিচয় পাইতে হইলে রীতি মত দূরবীণের প্রয়োজন। কাচের মধ্যে প্রদীপ-শিখার ধূম মাখিয়া অনেকে সৌর-কলঙ্ক দেখিতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দূরবীণই আমাদের প্রকৃত পক্ষে সাহায্য করিতে পারে।

সৌর-কলঙ্ক দেখিবার জন্য বেশী দামি দূরবীণেরও প্রয়োজন হয় না, সামান্য একটি অল্প মূল্যের দূরবীণ হইলেও চলে। দূরবীণ সাহায্যে সৌর-কলঙ্ক দেখিবার একটি প্রণালী বর্ণন করিতেছি। তিনটি দণ্ডের উপর একটি দূরবীণ স্থাপিত কর; ইহার পশ্চাতে একখানা চেয়ারের পৃষ্ঠ দেশে একটী কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলাও। দূরবীণের ভিতর দিয়া সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কাপড়ের পর্দ্দার উপর আসিয়া পড়িবে। পর্দ্দার উপর সূর্য্যের যে প্রতিবিম্বটি পড়িবে তাহা সম্পূর্ণ লাল নহে, মাঝে মাঝে কালো কালো বিন্দু চিহ্ন পড়িবে। এই চিহ্নগুলিই সূর্য্যের কলঙ্ক। খালি চোখে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপের জন্য আমরা এই কলঙ্কগুলি দেখিতে পাই না। কিন্তু দূরবীণে উক্ত প্রণালীতে সৌর-কলঙ্ক দেখিলে আর এই অসুবিধায় পড়িতে হয় না। সূর্য্যের দিকে না তাকাইয়াও দিব্যি আরামে সূর্য্যের কলঙ্ক দেখিয়া লওয়া যায়।

কাপড়ের পর্দ্দার মধ্যে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাতে কলঙ্কগুলিকে নিতান্তই ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই কি এই কলঙ্কগুলি এত ক্ষুদ্র? একটি খুব শক্তিশালী দূরবীণ চোখে দিয়া একটু সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই আমাদের এ সন্দেহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে। তাহাতে যে কলঙ্কগুলিকে কেবল মাত্র বৃহৎ দেখাইবে, তাহা নয়, তখন তাহাদের কত বিচিত্র অদ্ভুত রকমের আকৃতি আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে। এই স্থানে কয়েকটি বিচিত্র ও অদ্ভুত আকারের সৌর-কলঙ্কের চিত্র প্রকাশিত হইল।

সৌর-কলঙ্ক।

সৌর-কলঙ্ক জিনিসটা কি? এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে পূর্ব্বে সূর্য্যের প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ডটি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। কাহারো কাহারো মতে সূর্য্যের দেহটি তরল উত্তপ্ত পদার্থে নির্ম্মিত; কেহ

কেহ বলেন, ইহার কোন কোন অংশ তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে; আবার কাহারো কাহারো মতে ইহা একটি বাষ্পীয় পদার্থের গোলক মাত্র। আমাদের নিকট হইতে সূর্য্যের দূরত্ব তো নিতান্ত সামান্য নহে, বড় বড় শক্তিশালী দূরবীণ দিয়াও আমরা ইহার যেটুকু পরিচয় পাই, তাহাই বা আর কত? সুতরাং সূর্য্যের আলোক-পিণ্ডটি সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে; তবে অসম্ভবরূপ কিছু একটা না হইলেই হয়। বিজ্ঞান-রাজ্যে তাহা হইবারও যো নাই। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণের তুলাদণ্ড ধরিয়া বসিয়া আছেন। প্রমাণের একটু নড়চড় হইলেই চারিদিক হইতে কোলাহল পড়িয়া যায়। সম্প্রতি সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলের এই তিনটা অবস্থা সম্বন্ধেই আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদের মনে নানারকম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলটি কঠিনও নয়, তরলও নয়, বাষ্পীয়ও নহে—ইহা অনেকটা আকাশস্থ মেঘের ন্যায়—তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

এইবার সৌর-কলঙ্ক পদার্থটা যে কি, তাহা সহজেই আমরা বুঝিতে পারিব। বৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশে মেঘ করে, তাহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। ঝড় উঠিলে এই মেঘগুলির মাঝে মাঝে ফাঁক হইয়া যায়, তাহাও আমরা সকলে দেখিয়াছি। এই সৌর-কলঙ্কগুলিও সূর্য্য-দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ গহ্বর। সূর্য্যের দেহটা মেঘের মত পদার্থ কিনা, তাই গহ্বরগুলি এত বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া থাকে। আকাশস্থ মেঘেও আমরা কত বিচিত্র রকমের কত অদ্ভুত চেহারা প্রতি নিয়তই দেখিয়া থাকি। সূর্য্যের দেহটি তরল কিম্বা কঠিন হইলে ইহার মধ্যে গহ্বর উৎপন্ন হওয়া এবং সেই গহ্বরের এরূপ বিচিত্র আকার ধারণ করা কখনো সম্ভবপর হইত না।

এই কলঙ্কগুলির সকল স্থানই সমান কালো নহে। চিত্রের দিকে তাকাইলেই ইহা আমরা বুঝিতে পারি। চিত্রের মধ্যের অংশটা খুবই কালো, কিন্তু তাহার চারিপাশের অংশটা সেরূপ কালো নহে। কালো অংশও আমরা চিত্রে যাহা দেখিতেছি, প্রকৃত পক্ষে, সূর্য্যদেহের সেই অংশ এত কালো নহে। এই কালো অংশটা গহ্বরের ঠিক মধ্যস্থল কিনা, তাই চিত্রে ইহা এতো কালো দেখায়। গভীর গর্ত্তের মাঝখানে যদি কোন উজ্জ্বল জিনিষও থাকে, ফটো তুলিলে সেই গর্ত্তকে কালো বই আর কিছুই দেখায় না। সূর্য্যের এই গহ্বরগুলির অবস্থাও ঠিক তাই।

সূর্য্যেতে চিত্রের এই কালো অংশগুলি খুবই উজ্জ্বল, এমন কি পৃথিবীতে এরূপ উজ্জ্বল পদার্থের আমরা কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারি না। গহ্বরের ভিতরকার ফটো যদি তোলা যাইত, তাহা হইলে, গহ্বরগুলির প্রকৃত স্বরূপ আমরা দেখিতে পাইতাম।

সূর্য্যের এই কলঙ্ক আবিষ্কৃত হইবার পর জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ এই গুলিকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, সূর্য্য কখনো কলঙ্কমুক্ত থাকে না বটে, কিন্তু একটি কলঙ্কই সূর্য্য-দেহে চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কলঙ্কগুলি সূর্য্য-দেহের গহ্বরমাত্র এবং সূর্য্য-দেহের অবস্থা অনেকটা আকাশস্থ মেঘের ন্যায়। আকাশের মেঘের মাঝে মাঝে যে ফাঁক হয়, সেগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া দেখিলেই আমরা সূর্য্য-দেহের গহ্বরগুলির অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিব। আকাশস্থ মেঘের গহ্বরগুলি কি একই ভাবে চিরকাল আকাশের মধ্যে বিরাজ করে? সেই গহ্বরগুলিতো প্রতিনিয়তই ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া আকাশের মেঘগুলি কি কখনো গহ্বরমুক্ত হয়? কই, তাহাতো হয় না! শত শত নূতন নূতন গহ্বর আবার মেঘের মধ্যে দেখা দেয়। সূর্য্যদেহের গহ্বরগুলির অবস্থাও ঠিক তাই। সূর্য্যদেহ আন্দোলিত হইয়া তাহার মধ্য হইতে নিত্যনিয়তই নূতন নূতন গহ্বর উৎপন্ন হইতেছে এবং ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া যাইতেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে কোন কোন গহ্বর অধিক দিনও স্থায়ী হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ এই কিছুকাল স্থায়ী কলঙ্কগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সূর্য্য সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন

তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দুরবীণদ্বারা এই স্থায়ী কলঙ্কগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাদের একটা গতি আছে। তাহাদের এই গতি পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে। এই যে কলঙ্কগুলি একটু বেশীদিন সূর্য্যদেহে স্থায়ী হয়, তাহাদের সকলগুলিরই গতির পরিবর্ত্তন, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ দুরবীণের ভিতর দিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। অধিকদিন স্থায়ী কলঙ্কগুলি যেন ২৫ দিন অন্তর অন্তর একবার সূর্য্যের চারি পাশটা ঘুরিয়া আসে। দুরবীণ চোখে দিয়া সূর্য্যকে পরীক্ষা করিলে সৌরকলঙ্কের এই পরিবর্ত্তনটি আমাদের সকলেরই লক্ষ্যগোচর হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ কিন্তু সৌরকলঙ্কের এই পরিবর্ত্তন হইতে সূর্য্য সম্বন্ধে একটি বৃহৎ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। একজন সাধারণ লোক যদি দুরবীণদ্বারা সৌর-কলঙ্কগুলির এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সে কি মনে করিত? এই পরিবর্ত্তন হইতে সে কি এতটা অনুমান করিতে পারিত যে সূর্য্যও পৃথিবীর ন্যায় অবিরত ঘুরিতেছে? জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহাই অনুমান করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ এইরূপ ভাবেই এক একটা বৃহৎ বৃহৎ তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। একটার কারণ আবিষ্কার করিতে গিয়া তাঁহারা অনেক নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ কলঙ্কগুলির এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ আবিষ্কার করিতে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্য নিজেই ঘুরিতেছে (অবশ্য একস্থানে থাকিয়াই) সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কলঙ্কগুলিও ঘুরিতেছে। একটি টেনিস্ বলের এক পিঠে যদি একটি ছোট কালির চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ঘুরানো যায়, তাহা হইলে বলের সঙ্গে সঙ্গে কালির চিহ্নটিও কি ঘুরিবে না? সৌরকলঙ্কগুলির অবস্থাও ঠিক তাহাই। কলঙ্কগুলি তাহাদের নিজের স্থানেই থাকে। সূর্য্যের দেহ ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়, কলঙ্কগুলিই যেন ঘুরিতেছে।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

নববর্ষ।

অতীত দিনের তরে বৃথা অশ্রুভার।
আজি উঠে নব রবি,
ধরাতলে নব ছবি,
প্রশান্ত আকাশ-তল—নির্ম্মল উদার।
হে পান্থ, প্রসন্ন মুখে
নব আশা ধরি বুকে
যাত্রা করি' নিজ পথে চল এইবার।
যদি কভু আসে ক্লান্তি,
যদি ঘটে ভুল ভ্রান্তি,
চাহিবে না পিছে ফিরে, ফিরিবে না আর।

২

হে নাবিক, বাঁধা কেন তরণী তোমার!
সময় বহিয়া যায়,
আজি অনুকূল বায়,
অনুকূল স্রোতস্বিনী শান্ত নির্ব্বিকার।
তরী খুলে' যাও ভেসে,
সলিল-পথের শেষে,
নব রাজ্যে রতনের বাণিজ্যে আবার।
অযুত তরঙ্গে ঘিরে'
ঝঞ্ঝা যদি আসে ফিরে'—
বেয়ে যেও তরী, স্মরি' ভবকর্ণধার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বরপণ।

গত ফাল্গুনের "ভারতীতে" আমার লিখিত বরপণ শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা চৈত্রের "ভারত-মহিলায়" প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমার বিবেচনায় এই বিষয়ে একটা তর্কবিতর্ক হইয়া মীমাংসা হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়াই আমি একটী Academic discussion বা সাহিত্যিক আন্দোলনের অবতারণা করিয়াছিলাম। বিচারে যদি এই মীমাংসা

হয় যে বরপণ প্রথা দেশের অনিষ্টকর বা দুর্নীতিমূলক, তাহা হইলে তাহা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তাহাই ভাল। আর যদি তর্কবিতর্কের সিদ্ধান্ত এই হয় যে বরপণ দ্বারা দেশের ভাল বই মন্দ হইবে না, তাহা হইলে তাহার যত অধিক প্রচলন হয় ততই মঙ্গল। এ তর্কে আমার কোন জেদ নাই। তবে আমার বিশ্বাস এই যে. বরপণ দ্বারা দেশের মঙ্গলই হইবে।

সমালোচক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত মহাশয় আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে. তিনি আমার কথা বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সকল কথাগুলিই আমি বলি নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি। গুপ্ত মহাশয় আমার কথা বলিয়া উদ্ধৃতির চিহ্নমধ্যে লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বকার হিন্দু সমাজের ভদ্রলোকেরা তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে দাসীর মত খাটাইতেন. আর এখনকার শিক্ষিত লোকেরা তা ভাল মনে করেন না. সে জন্য বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীর পিতার নিকট আবশ্যক মত টাকা লইয়া স্ত্রীর সুখের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন।" আমি কিন্তু এই কথাগুলি বলি নাই। গুপ্ত মহাশয় আরও কয়েক স্থানে আমার প্রতি এরূপ কথার আরোপ করিয়াছেন, যাহা আমি বলি নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের নীতি যাহাই হউক না কেন, সাহিত্যিক বিচারেও যে-কোন প্রকারেই হউক প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে হইবে এ নীতিটা আমার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

গুপ্ত মহাশয়ের দুই তিনটা আপত্তি সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলিব। "দাসদাসীর মত খাটা" আমি কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি গুপ্ত মহাশয় তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। প্রথমে সেই জিজ্ঞাসারই উত্তর দিতেছি। প্রতিনিধি অর্থাৎ ভৃত্য বা অন্য কোন লোকদ্বারা যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে সেই সকল কর্ত্তব্য কার্য্য বাধ্য হইয়া নিজে করাই "দাস দাসীর মত খাটা।" প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একভাগ যথা ধ্যান, অধ্যয়ন, ভোজন, ব্যায়াম ইত্যাদি, যাহা প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। অপর বহুবিধ কর্ত্তব্য যথা গৃহনির্ম্মাণ, বস্ত্র বয়ন, মলমূত্র অপসারণ, প্রাঙ্গণ মার্জ্জন, রন্ধন, বস্ত্র ধৌত করণ প্রভৃতি প্রতিনিধি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। পাচক পাচিকা থাকিতেও অনেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষ স্বহস্তে কখন কখন পাক করেন। রাণী-ভবানীর কত পাচক পাচিকা ছিল অথচ তিনি এক সহস্র লোককে স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইতেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই সেরূপ না করিতে পারিতেন। কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের উদাহৃত রাম বাবুর স্ত্রী যখন রন্ধন না করিলে বাড়ীর সকলের অনশন হয় তখন রন্ধন কার্য্যটা তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করে না। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি দাসদাসীর মত খাটেন। দেশের গৌরবের জন্য. বেতন লইয়াই হউক বা বিনা বেতনেই হউক. ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ করিতে যাওয়া এক কথা, আর conscription দ্বারা বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করা অন্য কথা। রাম বাবু যখন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং যখন তিনি পড়া শুনা করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন তখন তাঁহার স্ত্রীও যদি অধ্যয়নশীলা হইতেন তাহা হইলেই তিনি রামবাবুর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সাহচর্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু অর্থাভাব জন্য তাহা ঘটিয়া উঠে না।

আমি এমন কথা বলি নাই যে যাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় শিক্ষিতা মহিলার সেরূপ কার্য্য আমি পছন্দ করি না। শিক্ষিতা নারী ইচ্ছা হইলে পাচিকার কার্য্য করেন বা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া শুশ্রূষাকারিণী হন ইহা ত তাঁহার গৌরবের কথা। কিন্তু তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এই সকল কোন কার্য্য করিতে হইলেই আমার আপত্তি।

গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "কন্যার বিবাহে প্রচুর অর্থপ্রদানকারী কন্যার পিতা তাঁহার জামাতাকে কন্যার প্রয়োজন সাধনের দ্রব্য মনে করিলে সেন মহাশয় বোধ হয় কিছু মনে করিবেন না এবং পণগ্রহণকারী বরের পিতা বা বরের আত্মসম্মানের বোধ হয় কিছু মাত্র লাঘব হইবে না।" এই বাক্যের প্রথমার্দ্ধের অভিপ্রায়টা বুঝিতে পারিলাম না। শেষার্দ্ধের উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে আত্মসম্মানের বৃদ্ধি ভিন্ন কিছু মাত্র লাঘব হইবে না। কুচবিহারের মহারাজের

ভ্রাতাকে বরোদার গাইকোয়ার যদি বহু যৌতুক সহ কন্যাদান করেন তাহা হইলে মহারাজ বা তাঁহার ভ্রাতার আত্মসম্মানের লাঘব হইবে বলিয়া কি কেহ মনে করেন? যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া গুপ্ত মহাশয় এই শেষার্দ্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে Petitio principii নামক হেত্বাভাব নিহিত আছে। গুপ্ত মহাশয় তাঁহার যুক্তিটা Syllogism-এ বিশ্লেষণ করিলে তাহা নিজেই ধরিতে পারিবেন। "যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জ্জনের" কথা গুপ্ত মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাও উক্তরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে বলি।

মুরারি বাবুর জ্বর হইয়াছিল ষোল টাকা দর্শনী দিয়া বিষ্ণু ডাক্তারকে আনাইয়া তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া সুস্থ হইলেন। পরে বিষ্ণু ডাক্তার এত অধিক টাকা লন বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে গালাগালি দিতে লাগিলেন। যদি গালাগালি কাহারও ন্যায্য প্রাপ্য হয় তাহা হইলে যে স্থানের জল বায়ুর দোষে সেই জ্বর হইয়াছিল সেই স্থানের এবং যে বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া মুরারি বাবু জ্বরের মুখ্য কারণ কুপথ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন সেই বুদ্ধির প্রাপ্য। বুদ্ধির আরও ত্রুটি আছে। তিনি নিকটবর্ত্তী রামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্নদা ডাক্তারকে দিয়া বিনা দর্শনীতে অথবা প্রতিবেশী শ্রীকান্ত ডাক্তারকে দুই টাকা দর্শনী দিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া মুরারি বাবু ইচ্ছা করিয়া ষোল টাকা দিয়া বিষ্ণু ডাক্তারকে ডাকাইলেন। বিষ্ণু ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই—পীড়াপীড়ি ত দুরের কথা। তবে বিষ্ণু ডাক্তারকে গালাগালি কেন? বরপণের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। বিনোদবাবু কন্যাদায় রূপ পীড়াগ্রস্ত; পীড়ার কারণ তাঁহার বাসস্থান রূপ সমাজের এবং তাঁহার নিজ বিবাহরূপ কুপথ্য সেবন বুদ্ধির। ইহা ভিন্ন তিনি বিনাপণে যোগেন্দ্রকে, অল্পপণে অক্ষয়কে কন্যাদান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাদিগকে তাঁহার পছন্দ হইল না—তিনি উপেন্দ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শ্রীমান উপেন্দ্র কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই সংকল্প করিয়াছিলেন যে, দশ হাজার টাকা পণ না পাইলে বিবাহ করিবেন না। সুতরাং বিনোদ বাবুর তত টাকা দিতে হইল! বিনোদবাবুর প্রতি উপেন্দ্রের পূর্ব্ব হইতে কোন আক্রোশ থাকা দুরে থাকুক, পরিচয়ও ছিল না। তিনি বিনোদ বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। বিনোদ বাবুকে পীড়াপীড়ি করা ত দুরের কথা! যখন অবস্থা এই-রূপ, তখন কি বিনোদ বাবু নিজের সমাজ ও বুদ্ধিকে দোষ না দিয়া ন্যায্য ভাবে উপেন্দ্রকে দোষ দিতে পারেন?

জন্মগত জাতিভেদ ভাল, না কর্ম্মগত অথবা অর্থগত জাতিভেদ* ভাল, গুপ্ত মহাশয় এই প্রশ্ন লইয়া কিছু বিচার করিয়াছেন। কিন্তু তৎ সম্বন্ধে বিচার বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। আমি কেবল এই বলিয়াছি, যে বরপণ প্রথা দ্বারা কালে জাতিভেদও উঠিয়া যাইতে পারে। যদি আমার অনুমানটা ঠিক হয় তাহা হইলে জন্মগত জাতিভেদ সমর্থক-দল বরপণের বিরুদ্ধে এবং সংস্কারক দল বরপণের পক্ষে একটা যুক্তি পাইলেন। আমি শেষোক্ত দলের উদ্দেশেই প্রধানতঃ আমার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। কেন না, প্রথমোক্ত দল যুক্তির কথা দুরে থাকুক তাঁহারা যাহাকে শাস্ত্র বলেন সে শাস্ত্রের কথাও মানেন না।

গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "লোকে বিবাহ করিয়া বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহে না বলিয়া আমেরিকা ও ইউরোপের কোন কোন দেশে লোক-সংখ্যা এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে সেই দেশের রাজ-পুরুষেরা...... লোকদিগকে বিবাহে বাধ্য করিতে কোন আইন করা উচিত কি না তাহাই বিবেচনা করিতেছেন। অথচ সেন মহাশয়ের স্কন্ধে মাল্‌থাস্‌ ভর করিয়া রহিয়াছেন।" গুপ্ত মহাশয় কথাগুলা বড়ই গোলমাল করিয়া বলিয়াছেন। লোকে বিবাহ

* অর্থ অনুসারে কর্ম্ম পরিচালিত হয় সুতরাং অর্থগত জাতি-ভেদ ও কর্ম্মগত জাতিভেদ একই ধাতুর।

করিয়া বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহে না বলিয়া রাজা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা কিরূপ কথা, বুঝিলাম না। একটা বিবাহ করার পর তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করে না বলিয়া রাজা কি আর একটা বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন?

আমি এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহার মর্ম্ম এই যে, বিবাহে অনেক ব্যয়সঙ্কুল দায়িত্ব আছে বলিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। কন্যাকর্ত্তারা যখন সেই ব্যক্তিদিগকে সেই ইচ্ছা হইতে চ্যুত করিতে চেষ্টা করেন তখন সেই ব্যয়ভার তাঁহাদেরই বহন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। মাল্থাসের কোন কথাই এখানে উঠিতে পারে না।

গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "এখনও অনেক যুবক আছেন যাঁহারা বিনা পণে বা অল্প পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। সেন মহাশয় তাহাতে ভীত হইয়াই বোধ হয় লেখনী ধারণ করিয়াছেন।" বিনা টীকায় এই সূত্রের অর্থও আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুপ্ত মহাশয়ের মতে বরপণ প্রথা দূষণীয়। তিনি আরও বলেন যে, সমাজের অভিমতেই এই অপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতে হয়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বর-কর্ত্তাকে দোষ না দিয়া কন্যাকর্ত্তা সমাজকে দোষ দেন না কেন? কন্যাদায়রূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে সমাজ যদি কন্যাকর্ত্তাকে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে সে সমাজ বাস্তবিকই ভক্তিভাজন হইতেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের কাছে সাহায্যের আশা নাই—কেবল শাসন ও বহিষ্করণ। সে সমাজের কথা আর কি বলিব?

গুপ্ত মহাশয়ের অন্যান্য প্রতিবাদ দ্বারা আমার যুক্তিগুলি খণ্ডিত হইয়াছে কি না তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

আমাদের আদি বাসভূমি।

প্রাচীন কালে মানব-সভ্যতা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার ধারণা করা দিন দিনই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উদার ধর্ম্ম বিশ্বাসে বর্ত্তমান যুগের মানুষই সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু মানুষ অতীতের জ্ঞান-সমুদ্রে যতই ডুবিতেছে, নূতন নূতন রত্নরাজি আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের সভ্যতার গর্ব্ব ততই ম্লান করিয়া দিতেছে। মিশরের পিরামিড ও মমি, আসিরিয়া বাবিলনের মৃত্তিকানিহিত প্রাচীন পদার্থ সকল, চীনের অতীত সভ্যতা, পশ্চিম এশিয়া ও প্রাচীন ভারতের উদার সংস্কৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাস—এ সকলের তত্ত্ব অবগত হইলে মনে হয়, প্রাচীন যুগের মানবেরা যে আমাদের অপেক্ষা সকল বিষয়েই—এমন কি জ্ঞান বিজ্ঞানেও—শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তাহার প্রমাণ কোথায়? সম্প্রতি সুইডেন দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক স্বেন হেডিন মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বালুকারাশির মধ্য হইতে যে সকল পদার্থ ও তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে বিস্ময় আরো বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সুমেরু ও কুমেরুর ভীতিপ্রদ প্রাকৃতিক অবস্থার কথা আজকাল সকলেরই বিদিত। এই সেদিন কাপ্তেন স্কট মেরু আবিষ্কার করিতে যাইয়া কি কষ্টেই না প্রাণ দিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে মেরু অপেক্ষাও বুঝি ভীষণতর স্থান আছে। এশিয়ার মধ্যভাগস্থিত সহস্র সহস্র মাইল বিস্তৃত বিশাল মরুভূমিই এই ভীষণ স্থান। বৎসরের অধিকাংশ কাল অনন্ত অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় সূর্য্য এখানে কিরণ বিকীরণ করে। স্থানটী তখন অগ্নিকুণ্ড সদৃশ ভীষণ ভাব ধারণ করে, কিন্তু তথাপি এখানে আলোকের উজ্জ্বলতা নাই, সূর্য্য এখানে নয়নগোচর হয় না। দিনের বেলায়ও আধ-আঁধার, আধ-আলো, এক ভীতিপ্রদ আবরণ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। মরুভূমির বায়ুবিক্ষিপ্ত বালুকারাশিই ইহার কারণ। বলা বাহুল্য, এই ভয়ানক স্থানে কোনও জীব বাস করে না।

কয়েক বৎসর হইল, অসম সাহসী ডাক্তার স্বেন হেডিনের মাথায় খেয়াল চাপিল, এই মৃত্যুর দেশে একটা মহা রাজ্য বালুকাচ্ছাদিত হইয়া আছে, আমি সেখানে যাইব, এবং সেই রাজ্য খুঁজিয়া বাহির করিব।

টাক্লামাকান মরুভূমিতে বালুকানিম্নে প্রাপ্ত দেবমন্দিরাস্থিত পুস্তকাদি

টাক্লামাকান মরুভূমিতে বালুকানিম্নে প্রাপ্ত পাদুকা ও রেশম নির্মিত আসনাচ্ছাদন

সকলেই তাঁহাকে বোধ হয় পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিল। এই খেয়াল-ওয়ালা মানুষগুলিকে সংসারের লোক সর্ব্বদাই পাগল বলিয়া আসিয়াছে, অথচ জগতের যা কিছু নুতন আবিষ্কার ইঁহারাই করিয়াছেন। কলম্বসকে সকলে পাগল বলিয়াছে, আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকেও পাগল বলা চলে। শুনিয়াছি, মাথায় নব সত্যের যে কল্পনা জাগিয়াছিল, তাহার দর্শনের জন্য অনেক সময় আহার নিদ্রা, বাড়ী ঘর, পরিবার-পরিজনের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরিটরীতেই দিবানিশি পড়িয়া রহিয়াছেন। স্বেন হেডিনকেও তাঁহার খেয়ালের জন্য লোকে পাগল বলিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? যা'হোক তাঁহার কল্পনা সত্যে পরিণত হইয়াছে, সত্য সত্যই সেই বিভীষিকাময় মৃত্যুর দেশে মানবের অতীত-জ্ঞানগরিমার নিদর্শন স্বরূপ এক অদ্ভুত রাজ্যের আবিষ্কার হইয়াছে।

একদল অনুচর ও বহুসংখ্যক ভারবাহী পশু লইয়া স্বেন হেডিন এই মরু-প্রান্তরে যাত্রা করেন। কিন্তু এই পর্য্যটক দলের পরিণাম কি ভয়াবহই না হইয়াছিল! এই বৃহৎ দলের মধ্যে একমাত্র স্বেন হেডিন রক্ষা পাইয়া, অন্ন জলবিহনে মৃতপ্রায় অবস্থায়, দাঁড়াইতে অক্ষমতা বশতঃ হামাগুড়ি দিতে দিতে একটী জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোনও প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আরো লোকজন সহ তাঁহার অনুগামীদিগের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কয়েকটি মাত্র সঙ্গী এবং পশুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে অসহ্য ক্লেশে উন্মাদ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

এই সুবিশাল মরুভূমির কতক অংশের নাম তক্লামকান, কিয়দংশের নাম গোবি। কিন্তু নাম বিভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ মরুভূমিটী একই। কাশ্মীরের পর্ব্বতমালার নিম্নভাগ হইতে পিকিনের উত্তরস্থিত মালভূমি পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ভীষণতা ও জীবশূন্যতা গুণে তক্লামকানের সহিত পৃথিবীর আর কোন মরুভূমির তুলনা হয় না। আকারে ইহা কতকটা ডিম্বাকৃতি, পরিমাণে ব্রিটিস দ্বীপের তিনগুণ। গ্রেনাইট পাথরের প্রাচীরবৎ পাহাড় দ্বারা ইহা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। এই পাহাড়ের উচ্চতা স্থানে স্থানে পাঁচ মাইলেরও অধিক। এই পাহাড়ের ধারে ধারে ২।৪টী পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদী আছে, দুই তিন শতটী পরিবার কোন প্রকারে এই নদীগুলির তীরে বাস করিতেছে। আর সর্ব্বত্রই মৃত্যুর রাজত্ব।

এই বিশাল মরুভূমিকে একটী সুবিস্তৃত বালু-সাগর বলা যাইতে পারে। তরঙ্গাকারে বালুকাস্তূপ এই মরু-সাগর-পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন তরঙ্গ দেড়শত হইতে সাড়ে তিনশত ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং এক মাইল সোওয়া মাইল প্রশস্ত। সলিল-প্রবাহের ন্যায় এই সকল বালুকাতরঙ্গ বায়ু বলে অবিরাম স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবিত হইতেছে। বালুকাস্তূপ কখনো কখনো জলস্তম্ভের আকার ধারণ করিয়া প্রবল বেগে দৌড়িতেছে। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে সেই প্রাণীহীন নীরব মরুভূমির দৃশ্য নাকি বড়ই মনোরম। তখন উহাকে এক অপ্রাকৃত মহাসাগর বলিয়া বোধ হয়,—যেন কোন্ অচিন্ত্য মহাশক্তি উহাকে জীবনহীন নীরবতায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বহু পূর্ব্বে এই মরুভূমি- জলপূর্ণ একটি সুবিশাল হ্রদ ছিল। ধীরে ধীরে, সহস্র সহস্র বৎসরে, সেই জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রেনাইট প্রস্তরের পাহাড় হইতে বায়ুর আঘাতে ও পার্ব্বত্য নদীর স্রোতে গ্রেনাইট প্রস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সেই শুষ্ক হ্রদগর্ভ পরিপূর্ণ করিয়াছে। বাতাস হ্রদের সলিলরাশি লইয়া এককালে নানা তরঙ্গভঙ্গে কত খেলাই খেলিত, এখন বালুরাশি লইয়াও সেইরূপ খেলাই করে।

ভূপৃষ্ঠে এমন প্রাণিশূন্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। একটি পতঙ্গ বা কীট পর্য্যন্ত এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জনহীন প্রদেশেই স্বেন হেডিন অতীত গৌরবে পরিপূর্ণ এক আশ্চর্য্য নগর আবিষ্কার করিয়াছেন। মরুভূমির প্রান্তদেশবাসী পূর্ব্বোল্লিখিত অধিবাসীদিগের নিকট তিনি শুনিতে পান যে, মরুভূমির মাঝে অনেক পরীর রাজ্য আছে; বন্য উষ্ট্র শিকার করিবার জন্য যাহারা মরুভূমির দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে, মরুভূমির মধ্যে কত স্বর্ণনির্ম্মিত

নগর আছে, কিন্তু তাহাতে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা রাজত্ব করে। যদি কেহ সেই ধন স্পর্শ করে তবে সেই ভূতযোনি তাহাকে যাদু করিয়া ফেলে এবং মরুভূমিতে পথ হারাইয়া হতভাগ্য পান্থ প্রাণত্যাগ করে।

শিক্ষিত লোক এই সকল গল্প শুনিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বেন হেডিন ইহার ভিতর সত্যের আভাস পাইলেন। প্রথম বার প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়া আর এক দল লোক সংগ্রহ করতঃ তিনি সেই

স্তম্ভাকারে বালুকাস্তূপ দৌড়িতেছে।

এই সকল জনশ্রুতি অতি পুরাতন প্রায় তের শত বৎসর অতীত হইল, সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্থ-সাং এই মরুভূমির কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তক্লামকানের স্বর্ণ-নগরী সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

এক সময়ে তক্লামকান মরুভূমিতে একটি অতি সুন্দর সুবৃহৎ নগর ছিল। সেই সহরের অধিবাসীরা নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতির লোক ছিল। তাহাদের সংশোধনের জন্য, তাহাদিগকে সুপথে চালিত করিবার ও সদুপদেশ দিবার জন্য, একবার এক সাধুপুরুষ সেই দেশে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ কেহ শুনিল না, বরং সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, উপরন্তু সেই দেশের রাজা তাঁহাকে শাস্তি দিবার আয়োজন করিলেন। তখন সেই সাধুপুরুষ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, সাতদিনে এই নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সাতদিন সাতরাত্রি সেই দেশের উপর আকাশ হইতে বালুকাবর্ষণ হইতে লাগিল এবং সপ্তম দিবসের শেষে দেখা গেল, নগরের চিহ্নও নাই, শুধু স্তূপীকৃত বালি।

গল্প-বর্ণিত নগর আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিলেন। অনেক দূর চলিয়া তিনি একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে কতকগুলি ধূসর-বর্ণ শুষ্ক-বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহা কাচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ। গাছের শাখাগুলি উত্তাপে কুঁচকাইয়া গিয়াছে, শিকড় গুলি বাহির হইয়া শত শত বৎসরের বালুকা-ঝটিকায় এবং অগ্নিবৎ রৌদ্রে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এই বিশুষ্ক বনভূমির নিকটেই তিনি একটী মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হইলেন। নগরটী প্রায় আড়াই মাইল বিস্তৃত। উহার রাস্তা-ঘাট, বাজার—সকলই বালিদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। যে সকল গৃহ উচ্চ-ভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং যেখানে বালি অনুচ্চ ছিল, শুধু সেই সকল গৃহেরই চূড়া অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। শুধু একটি মন্দিরের দেয়াল বালুর উপরও কয়েক ফুট ভাসিয়া ছিল। স্বেন হেডিন সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মন্দিরের দেয়াল নানা কারুকার্য্য-শোভিত চিত্রে আচ্ছাদিত। আর্য্য-ছাঁচের মুখাকৃতি বিশিষ্ট নরনারীর চিত্র তাহাতে

অঙ্কিত; ঘোড়া ও কুকুরের ছবিও দেখিতে পাইলেন। সেই জলবিন্দুলেশহীন মরুপ্রান্তরে নদীতরঙ্গে আন্দোলিত তরণীর চিত্র দেখিয়া তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। অপর একটী গৃহে তিনি কাঠের সাণীর, বরগা, চড়কা ও জলচালিত প্রকাণ্ড কলের নিদর্শন প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন। রেশম কীটের গুটি, ভাঙ্গা কলসী, অপরিচিত এক ভাষায় লিখিত দলিল পত্র ও ফলের বাগানে শুষ্ক কুল, বাদাম প্রভৃতিও প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই মরুভূমির বক্ষে এক সময়ে যে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, খেন হেডিন তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই।

খেন হেডিন যে বৎসর তক্লামকান মরুভূমি হইতে ফিরিয়া আসেন সেই বৎসরেই ডাক্তার ষ্টীন নামক এক ভারতীয় ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী এক অপরিচিত ভাষায় লিখিত কতকগুলি পদার্থ প্রাপ্ত হন। কয়েকজন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী গোবি মরুভূমির প্রান্তদেশবাসী-দিগের নিকট তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সেই লেখা পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। ডাঃ ষ্টীনের জ্ঞানানুরাগ অত্যন্ত প্রবল, তিনি হিউএন্থ সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বার বৎসর কাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত ভারতীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণের ফলে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, চীন ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যন্ত সত্য কথায় পূর্ণ, সুতরাং গোবি মরুভূমিস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের কথাও সত্য হইবারই সম্ভাবনা।

কিন্তু ষ্টীন অবস্থাপন্ন লোক নহেন, বহু ব্যয়সাধ্য আবিষ্কার-যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষতঃ এই আবিষ্কার কার্য্যে সুদীর্ঘ কাল তন্ময় হইয়া নিযুক্ত না থাকিলে সফলতা লাভের সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং খেন হেডিনের নব প্রকাশিত পুস্তক হইতে তিনি যখন প্রমাণ করিলেন, যে বাস্তবিকই মরুভূমির মধ্যে চীন ভ্রমণকারীর বর্ণিত নগর বালুকা-চ্ছাদিত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিলেন। এই অর্থ-সাহায্যে ডাঃ ষ্টীন এই মরুভূমিতে দুইবার দীর্ঘকালব্যাপী আবিষ্কার-যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। কাশ্মীর হইতে মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তিনি নানা অদ্ভুত তত্ত্ব ও পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এই মৃত্যুর দেশে এক অতি উন্নত সভ্যজাতি বাস করিত। তখন সুশীতল, সুমধুর, স্বচ্ছ-সলিল বহন করিয়া বহু সুবৃহৎ নদী মহানগরী সমূহের পাদদেশ নিরন্তর ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। প্রতাপশালী রাজারা এই দেশে রাজত্ব করিতেন। উত্তর-ভারত, পারস্য এবং বর্ত্তমানে রুশিয়ার অধিকৃত বহু স্থানে এই রাজাদিগের রাজত্ব প্রসারিত হইয়াছিল। ইহাই ছিল তখন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থান। একদিকে ইহা তখন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সহিত বাণিজ্য করিত এবং পাশ্চাত্য শিল্প বিজ্ঞানের সহিত যোগ রক্ষা করিত। আবার অন্য দিকে, এই দেশের লোক গালা, চীনাবাসন ও রেশমী বস্ত্রের বিনিময়ে স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যাদি চীন দেশে চালান দিত। মহাবীর সেকেন্দর (আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট) এই রাজ্যের দক্ষিণ-ভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন। চীন জাপানের শিল্প, সঙ্গীত ও কোন কোন ধর্ম্ম বিশ্বাস এই বিধ্বস্ত দেশের সভ্যতার নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। এই দেশ তৎকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন-ভূমি ছিল। আজ সেই উন্নত ও পরাক্রান্ত দেশের কি দশাই না হইয়াছে!

ডাঃ ষ্টীন বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, আশ্চর্য্য অধ্য-বসায়ের সহিত এই দেশের কতকগুলি প্রাচীন প্রাসাদ ও মন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন! অনেক বার তিনি মরুভূমিতে পথ হারাইয়াছেন এবং জলাভাবে মহা-বিপদে পড়িয়াছেন। কত সময় বালু-ঝটিকা দিনকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে পরিণত করিয়াছে, এবং তাঁহাদিগকে একবারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি ষ্টীনের জ্ঞানস্পৃহার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি কখনো কখনো মরুগর্ভে দেড়শত মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন; সেই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী মরুভ্রমণ-কারী বন্য উষ্ট্রশিকারীগণ বহু অর্থলোভেও তাঁহার পথ-প্রদর্শক হইয়া নিশ্চিত বিপদকে আলিঙ্গন করিতে চাহে

নাই। কাজেই তিনি পথ হারাইয়াছেন, সঙ্গের জল ফুরাইয়া গিয়াছে, সঙ্গীগণ বিদ্রোহী হইবার আয়োজন করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে দুর্দ্দমনীয় জ্ঞানস্পৃহারই জয় হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষার বস্তু মিলিয়াছে। নিরাশার শেষ মুহূর্ত্তে উদ্দিষ্ট নগরীর ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার নিকটেই পানীয় জল পাওয়া গিয়াছে।

বালুরাশি খনন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এক কোদালি বালি উঠাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্য বালিরাশি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলে; এজন্য ডাঃ ষ্টীন কাঠের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া খনিত বালি তাহার বাহিরে নিক্ষেপ করেন। এই উপায়ে তিনি কতকগুলি আশ্চর্য্য প্রাসাদ ও মন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সংখ্যায় এই খননলব্ধ দ্রব্যাদির ছয় খানি চিত্র পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিলাম। বারান্তরে তক্লামকান সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—গত চৈত্রমাসে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে আমরা গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কিছু আশা করি, এবার তাহা পাই নাই। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যেরও কিঞ্চিৎ অভাব দেখাইয়াছেন। অনেকেই মনে করেন, একটু গালাগালির চাটুনি না থাকিলে প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি জমাট বাঁধে না। বয়োবৃদ্ধ সরকার মহাশয়ও সেই প্রলোভনের হাত অতিক্রম করিতে পারেন নাই, নিতান্তই দুঃখের বিষয়। যাক্ সে কথা।

তাঁহার বক্তৃতায় আপত্তিজনক ও প্রতিবাদযোগ্য অনেক কথাই ছিল, আমরা তাঁহার দুইটী মাত্র উক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে কিছু বলিব। সভাপতি মহাশয় বলেন, কবিবর নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রের সুভদ্রার চরিত্র বাঙ্গালীর পক্ষে অস্বাভাবিক হইয়াছে। তাঁহার মতে "বাঙ্গালীর যশোদা, মেনকা, জগদম্বা" প্রভৃতির আদর্শ অবলম্বন করিয়াই বঙ্গসাহিত্যে নারী-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সরকার মহাশয়ের কথা পড়িয়াই কবি দীনেশচন্দ্রের "অধম বাঙ্গালী" মনে পড়ে। যশোদা, মেনকা, জগদম্বা—কেহই বাঙ্গালীর নিজস্ব নহেন, তাঁহাদের সকলেরই লীলাক্ষেত্র বাঙ্গালার বাহিরে। তবে নবীন সভ্যতা বঙ্গদেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, শুধু রান্না বাড়া খাওয়া দাওয়া, আর ধনোপার্জ্জনই যখন বাঙ্গালীর জীবনের সর্ব্বস্ব ছিল,—কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় জীবনের আদর্শ যখন বাঙ্গালীর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে নাই, তখন বাঙ্গালী সাহিত্যিক এই সকল আদর্শ যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সেই অর্থে ইঁহারা বাঙ্গালী বটে। কিন্তু সেই আদর্শ যে এখনও আদর্শ থাকিবে, তাহা কে বলিল? আমাদের কূপমণ্ডুকত্ব লইয়া আমরা একদিন যাহাকে আদর্শ বলিয়াছি, প্রাচীন ভারতেও যে তাহাই আদর্শ ছিল তাহার প্রমাণ কোথায়? সুভদ্রার আহত-সেবাটা তিনি বঙ্গনারীর আদর্শ-বহির্ভূত বলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, অর্জ্জুনের রথে সুভদ্রার সারথিগিরি করাটাও কি তাঁহার মাপকাঠিতে আদর্শ-বহির্ভূত নয়? যে সুভদ্রা ভাবী পতির রথে সারথি হইয়া পিতৃপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে রথচালনা করিতে পারেন, তিনি জীবন্ত করুণামূর্ত্তি রূপে আহত সৈনিকদিগের সেবাও করিতে পারেন। ইহা "বাঙ্গালী"-আদর্শ-বিরোধী হইতে পারে কিন্তু "ভারতীয়" আদর্শের বিরোধী কিছুতেই নয়। ভীরু বাঙ্গালী আমরা—যুদ্ধের কথায়ই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, আর আমরা মেয়েরা ত মূর্চ্ছাই যাই; দূরে থাকুক যুদ্ধাহতের সেবা!

কিন্তু মহাভারতের যুগে যুদ্ধবিগ্রহ নিত্যকার ঘটনা ছিল, আমাদের মাতৃগণ তখন যুদ্ধে পতিপুত্রের সাহায্যই করিতেন। পতিপুত্রকে ধর্ম্ম যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া আমাদের সেই মাতৃগণ যদি আহতের বুক হইতে পতি-

পুত্রেরই নিক্ষিপ্ত শেল টানিয়া তুলিয়া না থাকেন তবে তাঁহারা নারীর আদর্শের বিরোধী কাজই করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিয়াছেন, সরকার মহাশয়ই এখানে ভ্রান্ত। যতদূর জানি, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য এবিষয়ে নীরব। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কবি-প্রতিভা বলে "সত্য"ই আবিষ্কার করিয়াছেন, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের নূতন সংস্করণ গড়েন নাই। সরকার মহাশয় বলেন, "যদি স্বামীসেবা বিস্মৃত হইয়া কুলবধূ পরপুরুষের হতাহতের সেবায় ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে সেই (বাঙ্গালীর) আদর্শ থাকে কি? কখনই থাকে না।" তাঁহার স্বামীর পদসংবাহনে কিছুক্ষণ বিরত থাকিয়া সুভদ্রা যদি অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন-দেহ আহতের সেবায় কিছুটা কাল যাপন করিয়া থাকেন তবে অর্জ্জুন নিশ্চয়ই তাঁর উপর বিরক্ত হন নাই, কারণ তিনি ত আর সরকার মহাশয়ের আদর্শের লোক ছিলেন না! নারী যদি মাতৃমূর্ত্তিতে রুগ্ন বা আহতের সেবায় নিযুক্ত হন, তবে "পরপুরুষ" তাঁহার নিকট "পর" থাকে না, তাঁহার সন্তানস্থানীয় হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রা বা দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শ বাংলাদেশের সাহিত্যে ছিল না, শুধু তাঁদের কোমলতার দিকটাই বাঙ্গালী লেখকেরা ফাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল লেখকের শুধু 'কম-কান্ত' নারীচরিত্রের আদর্শ এদেশে এখন আর চলিবে না। সমগ্র জগতের সভ্যতার আলোক ভারত এখন বুক পাতিয়া লইতেছে, এদেশের নারীজীবনের "বাঙ্গালী-আদর্শ"ও পরিবর্ত্তিত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, গৌতমী, সঙ্ঘমিত্রার "ভারতীয়-আদর্শ" আবার আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে।

বক্তৃতা ও লেখনী-চালনা অপেক্ষা এখন প্রকৃত কাজে অধিক মন দেওয়া আবশ্যক। সাহিত্য-সম্মিলন কাজে একটু অধিক মন দিলে আমরা সুখী হইব। ত্যাগী-পুরুষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার "সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি" বিষয়ে ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামে যাহা পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হইল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সম্মিলন হইতে বিশেষ চেষ্টা হউক। বঙ্গ-সাহিত্যের তাহাতে অশেষ কল্যাণ হইবে। ব্যক্তি বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত অগ্রসর না হইলে এ সকল কাজ সফল হয় না। বিনয় বাবুকেই আমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি।

সম্মিলনে এ বৎসর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে:—"যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি লিখিত হয় এবং সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।"

পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে সভাপতি মহাশয় পুনঃ পুনঃ দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকা-সম্পাদকগণ এ বিষয়ে যাহা করিবেন তদ্দ্বারা যে বেশী কিছু হইবে, তাহা মনে হয় না। পল্লীগ্রামের অবস্থা দিন দিন যাহা হইয়া উঠিতেছে, শিক্ষিত সমাজ যদি এ বিষয়ে অচিরে মনোযোগ না দেন তবে দেশের দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। বড় সুখের বিষয়, অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সম্মিলনে পঠিত "পল্লী-সেবক" প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি স্বয়ং এই দিকে কিছু কাজও আরম্ভ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গেও এদিকে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিভাবান্ না হউন, বিদ্যাবুদ্ধির তেমন খ্যাতি না থাকুক, ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়া যুবক-দল কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন; সেবকগণ দলবদ্ধ হউন, মিলিত ভাবে তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের উন্নতি সাধন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হউন, তাঁহাদের আরাধনায় পল্লী-লক্ষ্মী পুনরায় পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিবেন, দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি:—প্রাদেশিক সমিতির বিগত অধিবেশন ঢাকায় হইয়াছিল। স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ নানা প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ ছিল। অভিভাষণে তিনিও জনসাধারণের উন্নতি সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে

অশ্বিনী বাবু অনেক করিতেছেন ; বঙ্গের অন্যান্য নেতৃবর্গ তাঁহার ন্যায় মনোযোগী হইলে যত কাজ হয় সহস্র বক্তৃতা বা কনফারেন্সে তাহা হয় না। প্রাদেশিক সমিতি এতদিন শুধু বক্তৃতা করিয়াই কাটাইয়াছেন। এসকল অনুষ্ঠান আরম্ভে এইরূপই হয় ; ক্রমে কাজের দিকে মন যায়। গত বৎসর সমিতি কাজ করিবার জন্য একটি স্থায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা উল্লেখযোগ্য কাজ যে কিছু হয় নাই, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এবার কমিটী পুনর্গঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, কমিটি আসল কাজে মন দিবেন। নারীজাতি ও জনসাধারণের উন্নতি সাধনই সেই আসল কাজ। নতুবা বৎসরের পর বৎসর 'গবর্ণমেণ্ট ইহা ভাল করেন নাই,' 'গবর্ণমেণ্ট উহা করুন', ইত্যাকার মন্তব্য নির্দ্ধারণ করিলে বেশী কিছু কাজ হইবে না। আমাদের যাহা করণীয় আছে আমরা তাহা করিতেছি না, অথচ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য উপদেশ দিতেছি দেখিলে গবর্ণমেণ্ট যে আমাদের কথার বড় মূল্য দিবেন, তাহা কখনও সম্ভব নহে। গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন না করিয়া আমাদের উপায় নাই, তাহা ত করিবই, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে যদি আমরা মনোযোগী হই তবে দেখিতে পাইব, আমাদের মূল্য গবর্ণমেণ্টের নিকটেও বাড়িয়া গিয়াছে, নিজেদের নিকটও বাড়িয়াছে। তাহাতেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

বঙ্গীয় সামাজিক সমিতি ঃ—সাহিত্য সম্মিলন, প্রাদেশিক সমিতি ও সামাজিক সমিতি, এই তিনটি সম্মিলনীর মধ্যে এখন পর্য্যন্ত সামাজিক সম্মিলনীটিই সর্ব্বাপেক্ষা অসার ভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বাদানুবাদপূর্ণ বিষয়গুলি বাদ দিলেও সামাজিক সম্মিলনীর সম্মুখে যে বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া আছে, তাহাতে আমাদের হাতে-কলমে করিবার অনেক রহিয়াছে। অন্য সম্মিলনী দুইটীর সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র এত প্রশস্ত নহে। সেখানে শুধু বক্তৃতা দিয়াও মনকে অমকেটা চোখ ঠারা যায়, কিন্তু এখানে শুধু বক্তৃতায় চলে না, এখানে ঘরের কাজ কিনা, লোকে শুধু কথায় ভুলে না। কাজেই আমরা সযত্নে এদিককার কর্ত্তব্যটা এড়াইয়া চলি। এবার যুগী জাতীয় শ্রীযুক্ত হরিমোহন নাথ এবং নমঃশূদ্র জাতীয় চাঁদসির ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস সামাজিক সম্মিলনীর অধিবেশনে আমাদের দেশের নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনারা যত রাজনৈতিক সভাসমিতিই করুন না কেন, নিম্নশ্রেণীকে তুলিয়া না ধরিলে কিছুতেই আপনাদের কল্যাণ নাই।" এই অতি সত্য কথাটির প্রতি আমাদের মনোযোগ কবে আকৃষ্ট হইবে ?

কলিকাতা মহিলা পরিষদ ঃ—মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই পরিষদ শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়ার ঐকান্তিক যত্নে প্রায় তিন বৎসর হইল, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুদ্দেশে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের অন্তর্গত মেরী কার্পেণ্টার-হলে নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাদি হইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সৌর-জগতের তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে দেশের মনীষিগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মাসে দুইবার ইহার অধিবেশন হয়। এইরূপ বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা জ্ঞান প্রচারের বিশেষ উপযোগী। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ ব্যবস্থা আছে। সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম মত শিক্ষালাভ করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। অধিকাংশ লোকেরই সে সুযোগ ঘটে না। সুতরাং সে সব দেশে শিক্ষা বিস্তারের এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতে সকলেই জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কখনও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হন নাই, এমন কত লোক এইরূপ সভায় নিয়মমত উপস্থিত থাকিয়া তথাকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন।

বহুবৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইংলণ্ড হইতে যখন ভারতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন জাহাজে কোন ইংরাজ শ্রমজীবীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত কথোপকথনকালে

এই দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, যে বিষয়েই তিনি কথা বলেন সেই বিষয়েই এই ইংরাজ শ্রমজীবী অনেক নূতন কথা বলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত সৌর জগতের বিষয় কথোপকথনকালে দেখিলেন যে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে যাহা জানেন ঐ ইংরাজ তাহা অপেক্ষা অনেক নূতন কথা তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন। আবার সমুদ্রের জীব জন্তুর বিষয় কথা বলিবার সময় তিনি তাঁহার নিকট হইতে অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ, উপাধিধারী। তিনি একজন সামান্য শ্রমজীবীর নিকট জ্ঞানে পরাভূত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন?" শ্রমজীবী হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "কোনো বিদ্যালয়ে পড়িবারই আমি সুযোগ পাই নাই। আমাদের অঞ্চলে সাপ্তাহিক বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ আসিয়া এই সকল স্থানে বক্তৃতা দেন। আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া রাত্রিকালে তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যাই এবং তাঁহারা যাহা বলেন তাহা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গৃহে লইয়া আসি। পরে তাহাই আয়ত্ত করিয়া জ্ঞান-তৃষ্ণার নিবৃত্তি করি।" এইরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া একজন সামান্য শ্রমজীবীও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে জ্ঞানে পরাভূত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যে শিক্ষার সমাপ্তি তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। তাহা লাভ করিতে হইলে জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। আমাদের আশা আছে, মহিলাগণ এই পরিষদে নিয়মিতরূপে যোগদান করিয়া নানা প্রকার জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া স্বদেশের উন্নতির সহায় হইবেন। (সুপ্রভাত)

ঢাকা মহিলা সমিতি :—এই সমিতিটী বহুকাল জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি নূতন সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু মহোদয়ার যত্নে ইহার নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে। কলিকাতা মহিলা পরিষদের অনুকরণে এখানেও প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে অভিজ্ঞদিগের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; ইহা খুবই সুখের কথা। কিন্তু সমিতি আরো কিছু কর্ম্মভার গ্রহণ করিলে ভাল হয়। ঢাকায় একটি অনাথাশ্রম আছে, একটি বিধবাশ্রম আছে; মহিলা সমিতির মহিলাগণ এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের অনেক সাহায্য করিতে পারেন। শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি সপ্তাহে একদিন করিয়া এক একটি আশ্রমের জন্য কিছু সময় দিতে পারেন তবে বোধ হয় আশ্রম দুইটির অনেক উপকার হইতে পারে। কোনও শিক্ষিতা মহিলা একখানা নূতন ভাল বই পড়িয়া ব্যাখ্যা করিলেও উপকার হয়। অতএব আমাদের অনুরোধ, সমিতির মহিলাগণ হাতে-কলমে কিছু কাজ আরম্ভ করুন। দেখিবেন, শক্তি খুলিবে. পরেরও উপকার হইবে. নিজেরও উন্নতি হইবে।

ময়মনসিংহ মহিলা-সমিতি :—প্রধান প্রধান অনেক সহরেই এখন মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ময়মনসিংহ মহিলা-সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া হিন্দু-বিধবাশ্রমের কর্ত্রী শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী ও আমি সেদিন ময়মনসিংহ গিয়াছিলাম। সমিতির সম্পাদিকা সন্তানের অসুস্থতা বশতঃ উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই। আমরা সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী ভক্তিসুধা ঘোষ বি, এ, মহোদয়ার উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তিনি প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে ময়মনসিংহের আলেকজাণ্ডার বালিকা বিদ্যালয়টির যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি. ময়মনসিংহের অন্যান্য মহিলাগণ মহিলাসমিতির কার্য্যে আরো মনোযোগিনী হইবেন। তাঁহারাও হাতে-কলমে কিছু কাজে হস্তক্ষেপ করুন, আমাদের এই নিবেদন। আপনার গণ্ডিটুকুর বাহিরে না গেলে আমাদের শক্তির বিকাশ হয় না, আমরা করিবার মত কোন কাজই হাতড়াইয়া পাই না। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, শিক্ষিতা মেয়েরা কাজ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণের তৃপ্তিকর কোন কাজ খুঁজিয়া পান না। সেরূপ কার্য্যক্ষেত্র তাঁহাদিগকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, চাই শুধু একটু সাহস

ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রম ঃ—"ভারত-মহিলার" জীবনের এক প্রধান আনন্দ এই যে, ইহা দুইটি সুন্দর প্রতিষ্ঠানের জন্ম দান করিয়াছে। (১) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অবনত জাতি সমূহের উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি। (২) ঢাকা হিন্দু-বিধবাশ্রম। ভগবানের কৃপায় দুইটি প্রতিষ্ঠানই দিন দিন উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতেছে। দুইটী মাত্র হিন্দু বিধবা ও তাঁহাদের একজনের একটী কুমারী কন্যা লইয়া ১৯১১ সনের জুলাই মাসে অতি দীনভাবে, নীরবে আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিধবা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার দক্ষতায় আশ্রমটী এখন সুন্দর রূপে চলিতেছে। আশ্রমে এখন ১২টী মেয়ে বাস করিতেছেন। আরো দুইজন আবেদনকারিণীর আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাঁহারা বোধ হয় শীঘ্রই আসিবেন। আশ্রমের চারিটী মেয়ে ঢাকা ইডেন উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহাদের দুইজন শিক্ষয়িত্রী-শ্রেণীতে পাঠ করেন। আশ্রম বাটীতে আশ্রমের মেয়েদের জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এণ্ট্রেন্স স্কুলের জনৈক পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ হেড্ পণ্ডিত আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেছেন।

স্থানীয় কমিশনার বাহাদুরের পার্সনেল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্ত এম, এ, মহাশয়ের পত্নী বিশেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া অতিযত্নের সহিত আশ্রমবাসিনীদিগকে শেলাই শিক্ষা দিতেছেন। ঢাকার বিখ্যাত গায়ক পেন্সনপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া মেয়েদিগকে ধর্ম্মসঙ্গীত শিক্ষা দিতেছেন। আমরা ইঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ভগবান তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

গত বর্ষাকালে আমাদের সদাশয় গবর্ণর মহোদয় যখন ঢাকায় বাস করিতেছিলেন তখন মাননীয়া লেডি কারমাইকেল মহোদয়া আমার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বিধবাশ্রমটীর কথা শুনিয়া ইহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সময়াভাবে তখন দেখিতে পারেন নাই। শীতকালে গবর্ণর পুনঃ ঢাকায় আসিলে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী লেডি কারমাইকেল মহোদয়া আশ্রমটী পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ—'আমি অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত অদ্য এই শিশু প্রতিষ্ঠানটী পরিদর্শন করিলাম। আমি আশা করি, আশ্রমবাসিনীগণ এখানে থাকিয়া নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করিবে। আমি অতি আনন্দের সহিত এই কার্য্যের সাহায্যের জন্য দেড়শত টাকা প্রদান করিলাম।'

ঢাকা বিভাগের কমিশনার স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বীটসন বেল. সি, আই, ই, মহোদয়ও আশ্রমটী দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অতি সুন্দর বাংলা জানেন। আশ্রমের প্রত্যেক মেয়েকে তিনি বাংলায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—'আমি ২৭শে জানুয়ারী বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়াছিলাম। আশ্রমবাসিনীরা বেশ মনের সুখে আছেন বলিয়া বোধ হইল। এখানে কোন বিষয়ে তাঁহাদের যত্নের ক্রটী হয় না। শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, প্রভৃতির কার্য্যে শিক্ষা লাভ করিবার উপযোগী অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা ইঁহারা এখানে প্রাপ্ত হইতেছেন। বিধবাগণের অভিভাবকগণের সম্মতি অনুসারে ইঁহারা এই আশ্রমে আসিয়া থাকেন। এটী বড়ই প্রয়োজনীয় কথা। যত দিন আমি ঢাকার কমিশনার থাকিব, আর যতদিন এই আশ্রম বর্ত্তমান সুন্দর প্রণালীতে পরিচালিত হইবে, আমি ততদিন আনন্দের সহিত এই আশ্রমে মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিব।'

এতদ্ব্যতীত আশ্রমের প্রয়োজনীয় আসবাবাদি ক্রয়ের জন্য দয়ালু কমিশনার মহোদয় আড়াই শত টাকা দিয়াছেন। ময়মনসিংহের বদান্য রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুর একশত, এবং শ্রীহট্টের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সুখময় চৌধুরী মহাশয় দেড়শত টাকা এককালীন সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে ক্ষুদ্র দানও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত দাতাদিগকে আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

আমরা আশা করি, আশ্রমটী এই দেশের নারী-শক্তির বিকাশের এক প্রধান উপায় হইবে।

আশ্রমের নিত্যব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিই সম্বল। সম্প্রতি ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর আমার আবেদনে আশ্রমে মাসিক কুড়ি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কমিশনার বাহাদুর ও মহারাজা বাহাদুরের সাহায্যে মাসিক বাড়ীভাড়া ত্রিশ টাকার ব্যবস্থা হইল। শিক্ষকের বেতন, দারোয়ানের বেতন, অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা, পুস্তক ও শিল্পের সরঞ্জামাদির ব্যয় মাসিক অন্ততঃ দেড়শত টাকা না হইলে চলে না। যে দান প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা কবেই ফুরাইয়া গিয়াছে। আমাদের সদাশয় গ্রাহকগ্রাহিকারা ভারতমহিলার মূল্য বাবত যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে খরচপত্র বাদে যাহা বাঁচিয়াছে আশ্রমের জন্মাবধি প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছে। এখনও আমি তাঁহাদেরই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমার বিশ্বাস, আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে ভারত-মহিলার পাঁচ হাজার গ্রাহক এ বৎসর সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে আশ্রমের ফণ্ডে পাঁচ হাজার টাকা এইবারই আমি দিতে পারিব, আশা করি। আমি সানুনয়ে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

সমালোচনা।

১। সীতা ঃ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ (সংশোধিত)। ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত। কাগজ উৎকৃষ্ট ; ডবলক্রাউন, ২৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য কাপড়ে বাঁধান ১।০ আনা। অবিনাশ বাবুর সীতা বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার নিকট সুপরিচিত। এই সংস্করণে কয়েকখানি সুন্দর চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা সীতা-চরিত্রের মতই নির্ম্মল, সুন্দর ও মধুর। সীতাদেবীর বৈচিত্র্যময় চরিত্র তিনি অতি দক্ষতা সহকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুস্তকখানি ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গের সর্ব্বত্র আদর লাভ করিয়াছে ; আশা করি, নূতন সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এবার অধিকতর সমাদৃত হইবে।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয়কে আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। "সীতার" ১০০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, "সীতা সম্ভবতঃ বিদুষী ছিলেন না; ইদানীন্তন কালের ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষা তৎকালে বহুল রূপে প্রচলিত ছিল না ; সুতরাং সীতাদেবী হয়ত স্বয়ং কোন শাস্ত্রগ্রন্থই পাঠ করেন নাই।" সীতা সম্ভবতঃ বিদুষী ছিলেন না, একথা বলিবার কি কোন উপযুক্ত প্রমাণ আছে? ইদানীন্তন কাল অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা তৎকালে অধিকতর প্রচলিত ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে তখনকার শিক্ষা-প্রণালী এখনকার মত ছিল না—স্ত্রী-লোকেরও নয়, পুরুষেরও নয়।

রামসীতার যে কথোপকথন গ্রন্থকার ১০১।২ পৃষ্ঠায় বর্ণন করিয়াছেন, অশিক্ষিতা স্ত্রীর মুখ হইতে তাহা বাহির হইতে পারে বলিয়া ত মনে হয় না। যে জনকের রাজসভায় গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মত পণ্ডিতাগণ উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন ও পরম সমাদর লাভ করিতেন, তাঁহার কন্যা সুশিক্ষিতা ছিলেন না, একথা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকার "সম্ভবতঃ"র উপর এরূপ গুরুতর বিষয়ে একটা মন্তব্য প্রকাশ না করাই বোধ হয় সমীচীন।

২। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনীনাসের আত্মচিন্তা ঃ—মূল গ্রীক হইতে শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম, এ, কর্ত্তৃক অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয়, ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এণ্টিক কাগজে ডবল ক্রাউন ২৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য কাপড়ে বাঁধান ১।০ আনা। অনুবাদক লিখিয়াছেন ঃ—"সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনীনাসের আত্মচিন্তা" একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী লেখক রেণাঁর (Renan) মতে ইহা সত্য ও শাশ্বত শাস্ত্র, এবং যাহারা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগের বেদ। ইহার নাম (Marcus Aurelius Antoninus,

to Himself) হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে জনসমাজে প্রকাশিত হইবে বলিয়া ইহা লিখিত হয় নাই। লেখকের চিত্তে যখন যে চিন্তার উদয় হইয়াছে, কঠিন কর্ত্তব্যপথে চলিতে চলিতে তিনি যখন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই এই দৈনন্দিন লিপিতে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্যই ইহা এমন স্বচ্ছ, সরলতামণ্ডিত ও অকৃত্রিম আবেগ-পরিপূর্ণ এবং ইহার ভাব-লহরী অবাধ-উচ্ছলিত ও স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত। বহু শত বৎসর পুস্তকখানির অস্তিত্বই অপরিজ্ঞাত ছিল; ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়; তদবধি ইহা সকল দেশীয় সাধকগণের নিকট সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ গ্রীক ভাষায় যত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে নূতন বাইবেল ভিন্ন আর কোনও পুস্তকেরই এরূপ বহুল প্রচার নাই। পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছে; এক ইংরাজীতেই জেরেমী কলিয়ার (Jeremy Collier). জর্জ্জ লং (George Long), জেরাল্ড রেণ্ডল (Gerald-Rendall) ও জন জ্যাক্‌সন্‌ (John Jackson), এই চারি জনের অনুবাদ প্রচলিত আছে। মূল গ্রীকের সম্পূর্ণ অনুবাদ বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল।"

রজনী বাবু সুপণ্ডিত ও সুলেখক। তিনি যে কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন অতি দক্ষতার সহিত তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ষ্টৈয়িক দর্শনের বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়াতে পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে। সংস্কৃত ও পালি হইতে মার্কাস অরেলিয়াসের উক্তির অনুরূপ উক্তগুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়াতে পুস্তকখানি অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মসাধকগণ ইহা পাঠ করিয়া পরম উপকার প্রাপ্ত হইবেন। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত অধিবেশনে স্থাপিত "সাহিত্য সংরক্ষণ ভাণ্ডার" এই পুস্তকখানির সমাদর করিবেন।

৩। থেরীগাথা:—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। এণ্টিক কাগজ; ডবল ক্রাউন ১৬৭ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৲ টাকা। থেরীগাথা ভারতের এক অপূর্ব্ব বস্তু। সুপণ্ডিত বিজয় বাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে এক অপূর্ব্ব রত্নে ভূষিত করিলেন। প্রবাসী ও ভারত-মহিলায় ইতিপূর্ব্বে থেরীগাথার কোন কোন অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া আমরা সমগ্র থেরীগাথা দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলাম। আমাদের অনুরোধে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনুবাদক শুধু সুপণ্ডিত নহেন, তিনি একজন সুকবি। সুন্দর সুখপাঠ্য কবিতায় তিনি পালি কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

অনুক্রমণিকায় অনুবাদক লিখিয়াছেন:—"থেরীগাথা ভারতের প্রাচীন গৌরবের অতি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। নারীজাতির সুশিক্ষা এবং নারীজাতির প্রতি যথার্থ সম্মানের এমন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। * * * প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-রমণীগণ কর্ত্তৃক যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য কত, সে কথা সুধীপাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না।"

থেরীগাথা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়া মূলসহ প্রায় ৭॥৹ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, আর আমাদের দেশের জিনিষ হইয়াও ইহা আমাদের নিকট দুষ্প্রাপ্য ছিল, ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যিকদিগের কলঙ্কের কথা। বিজয় বাবু আমাদের এই কলঙ্ক দূর করিলেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ভারতের নারী-সমাজের সম্মুখে প্রাচীন ভারতের নারী-চরিত্রের একটী অতি প্রয়োজনীয় নূতন দিক প্রকাশিত করিয়া তিনি আমাদের পরম উপকার করিয়াছেন।

কুমারী ডরোথি নীল এম, এস ডি

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি এক সূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ | ২য় সংখ্যা।

একটা জাতীয় ব্যাধি।

সকলেই অবগত আছেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশ-প্রীতির ফল স্বরূপ নগরে নগরে কত প্রকার অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল ; তাহার অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে, কতকগুলি জীবন্মৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। অথচ এদেশে ক্ষমতাশালী, সফল কর্ম্মীর অভাব নাই, এবং যাঁহারা শুধু নিজের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা লক্ষপতি হইয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নহে। সুতরাং যৌথকারবার গুলির অকালমৃত্যুর মূলে নিশ্চয়ই কোনও জাতীয় ব্যাধি বা দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। আমরা আত্মচেষ্টায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারি, কিন্তু দশজনে মিলিয়া একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে কিরূপে সফল করিয়া তুলিতে হয়, সে শিক্ষা আমাদের আজও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, নানা ক্ষেত্রে অসাফল্য দেখিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। জাতীয় জীবনের এই ব্যাধি দুই একদিনে উৎপন্ন হয় নাই, উহার বীজ জাতীয় অধঃপতনের সহিত কত শতাব্দী হইল সমাজ-দেহে উপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয় ধর্ম্ম-সাধন-তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত সাধনই এদেশে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, মণ্ডলীর ভাব জনসমাজে তেমন বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। উপনিষদের কোথাও এমন কথা নাই যে অপরকে সঙ্গে লইয়া না চলিলে মানবের পরিত্রাণ নাই। "আমি ও ঈশ্বর"——ইহা ভিন্ন সাধকের আর কিছুই ভাবিবার নাই।

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যে নু পশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।"

"ইহচেদ বেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদীহা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" *

অমৃতোপম ঋষিবাক্যে ব্যক্তিগত সাধনের প্রয়োজনই উল্লিখিত হইতেছে, উহাতে মণ্ডলীর ভাব কোথায়? বৌদ্ধ সাধনও আত্মানুশীলনের সাধন; বৌদ্ধ-সংঘ মণ্ডলী বা চার্চ্চের অনুরূপ হইলেও উহাতে সমবেত সাধনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পরবর্ত্তী যুগে শঙ্করাচার্য্যাদি প্রবর্ত্তিত সাধনও ব্যক্তিগত সাধন। আত্মানাত্মবিবেকে উক্ত হইয়াছে, শরীর পরিগ্রহেই আত্মার দুঃখ উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান দূর না হইলে জন্মের নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। আত্মানাত্ম বিবেকের (অর্থাৎ আত্মাই বা কি, আনাত্মাই বা কি) বিচার হইতেই জ্ঞান হয়। যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন, সে-ই আত্মানাত্ম বিবেকের অধিকারী। শাস্ত্রে এই সাধন চতুষ্টয়ের যে ব্যাখ্যা আছে তাহাতে দেখা যায়, এই সাধন প্রণালীতে অপর সম্বন্ধে একটা কথাও নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে আত্মগত, আত্মাভিমুখী ও আত্মান্বেষী। বৈষ্ণবগণের নাম-সংকীর্ত্তন সমবেত সাধনের এক অঙ্গ; কিন্তু "অপরের পরিত্রাণের জন্য আমি দায়ী, আমার ভ্রাতাদিগকে ছাড়িয়া আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেও অভিলাষ করি না," এই ভাব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আছে, এমত কেহ বলিতে পারেন কি?

ভারতীয় ব্যক্তিগত সাধনের ধারা হইতে এই একটী সুফল উৎপন্ন হইয়াছে যে, ইহা সাধকের চিত্তকে ধর্ম্মান্ধতা ও নির্য্যাতনস্পৃহা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত রাখিয়াছে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, যে "অপরকে ভ্রান্ত সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া পরিত্রাণের অধিকারী করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য," এই অকপট ধারণা খৃষ্টীয় সমাজে কত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সরল ধর্ম্মান্ধতা এই সে দিনও—ষোড়শ শতাব্দীতে—ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নররক্তে দেশ প্লাবিত করিয়া যে পৈশাচিক লীলার অভিনয় করিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্ধতম যুগেও তাহার শতাংশের একাংশ কখনও দৃষ্ট হয় নাই। * ইস্‌লাম প্রচারের মূলেও এই ভাব বর্ত্তমান ছিল। আত্মদৃষ্টির প্রবলতা ও অপরের পরিত্রাণের প্রতি উপেক্ষা হইতেই এদেশে এই উদারতা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই সুফলের সঙ্গে সঙ্গে একটী কুফলও জনসমাজকে ভোগ করিতে হইতেছে। যে উপেক্ষা সাধকের চিত্তে উদারতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাই তাঁহাকে লোকসঙ্গের প্রতি বিমুখ করিয়া অরণ্যচারী সন্ন্যাসী করিয়াছে, তাহারই প্রভাবে ধীরে ধীরে জনসাধারণ শুধু আপনাকে লইয়া তৃপ্ত থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। যে আপনার পরিত্রাণের সহিত অপরের পরিত্রাণের কথা ভাবে না, সে দশ জনের সহিত মিলিয়া

---

* যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান দিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি; অপরের নহে। কঠোপনিষৎ। ৬।১৩

যদি মনুষ্য ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিতে পারে তবেই জন্ম সফল হয়, ইহলোকে জানিতে না পারিলে মহান্ বিনাশ হয়। জ্ঞানিগণ সমুদায় বস্তুতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হয়েন। কেনোপনিষৎ। ১৩

* ভারতবর্ষে ধর্ম্মের জন্য নির্য্যাতন যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে। আর তাহা বীভৎসতায়ও যে কিছু ইউরোপীয় নির্য্যাতন অপেক্ষা কম ছিল, তাহা নহে। শঙ্কর যখন বৌদ্ধদিগের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে সকল বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচারে পরাজিত হইতেন তাঁহাদিগকে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতেন। সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের মাথা কাটিয়া বহু ছিন্নমুণ্ড ঢেঁকিতে চূর্ণ করা হইত। ইউরোপীয়দের ইতিহাস আছে, নির্য্যাতন-কাহিনীও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের ইতিহাসের সকলই তমসাচ্ছন্ন, অনেক খুঁজিয়া এ সকল তথ্য বাহির করিতে হয়, এই মাত্র পার্থক্য। ভাঃ মঃ সঃ।

মিশিয়া কাজ করিতে চাহিবে ও দশ জনের জন্য অক্লেশেই নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী আত্মগত সাধনে (অর্থাৎ যাহাতে মানুষ শুধু আপনার মুক্তি লইয়াই বিব্রত থাকে) আত্মপরায়ণতা বা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা জন-সাধারণের অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে; এই জন্যই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মাথা তুলিতে পারিতেছে না। এতগুলি প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মূলে অসাধুতা, অনভিজ্ঞতা, আত্মপরায়ণতা প্রভৃতি কত রোগই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু "দশ জনের ইচ্ছার নিকটে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করিতে হইবে" এই শিক্ষা অনেকগুলি রোগেরই অমোঘ প্রতীকার। মণ্ডলীগত সাধনের অভাব সেই শিক্ষার একটী অন্তরায়।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা আজও বর্ত্তমান, সে দেশের লোক অপরের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া চলিতে পারে না, এ কথা অযৌক্তিক। ইহার উত্তরে দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবার এক নায়কত্বের (Absolutism) উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা সাধারণ তন্ত্র নহে। যথার্থ একান্নবর্ত্তী পরিবারে কর্ত্তার ইচ্ছাই বলবতী, পরিবারস্থ অপর সকলকে উহা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয়; উহাতে যৌথকারবার বা সাধারণ তন্ত্রের কোনও লক্ষণই বিদ্যমান নাই। দ্বিতীয়তঃ, একান্নবর্ত্তী পরিবারের ধর্ম্মানুশীলনও ব্যক্তিগত অনুশীলন। উহাতে পিতা মাতা ও সন্তান প্রভৃতির সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা নাই; সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, তপঃ ইত্যাদি সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি, দুর্গোৎসবাদি বিরাট্ রাজসিক ক্রিয়াও মণ্ডলীলক্ষণাক্রান্ত নহে।

মিলিত ভাবে কাজ করিবার দ্বিতীয় অন্তরায়, জাতীয় অধঃপতন। শত শত বৎসর ধরিয়া জনগণ বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানের ভার রাজপুরুষগণের প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। শান্তিরক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক-বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় বিষয়েই আমরা কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী। ইহাতে একদিকে যেমন চর্চ্চার অভাবে কর্ম্মক্ষমতা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তেমনি অপর দিকে দশের জন্য, দেশের জন্য ভাবিবার অভ্যাসও চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, একবার লণ্ডনে এক সপ্তাহের মধ্যে কতকগুলি নরহত্যা হইল; পুলিশ হত্যাকারীদিগকে ধরিতে পারিল না। তখন লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা দল বাঁধিয়া অপরাধীদিগের অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন, এবং তাঁহাদিগের অক্লান্ত শ্রমে তাহারা ধৃত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হইল। এদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কেন বিরল, তাহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না, জাতীয় চরিত্রের একটী দুর্ব্বলতা নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—এস্থলে একটীমাত্র দিক আলোচিত হইতেছে।

মানব-প্রকৃতির একটী বিশেষত্ব এই যে, যে বিধি মানুষ নিজে প্রণয়ন করে না, তাহা সে স্বচ্ছন্দচিত্তে পালন করিতে চাহে না। "বিধি ঈশ্বরের বাণী"—এই ধারণা স্বাধীন জাতির হৃদয়ে যেমন বদ্ধমূল হয়, পরাধীন জাতির হৃদয়ে তেমন কখনই হইতে পারে না। আথীনীয়দিগের মধ্যে এই ভাবটী উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল, কারণ, আথেন্সে জনতন্ত্রতা বা Democracy চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক আথীনীয় বিধি-প্রণয়নে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতে পারিত, সুতরাং সে বিধিকে উপেক্ষা করিত না, বিধি প্রণীত হইলেই তাহার চরণে মস্তক অবনত করিত। বিধির নিকটে আত্মসমর্পণই আথেন্সকে এত গৌরবান্বিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে ইংরাজ জাতির মাহাত্ম্যও এইখানে। যতদিন কোনও বিধি শুধু প্রস্তাবাকারে থাকে, মনের মত না হইলে ততদিন ইংরাজেরা তুমুল আন্দোলন করে, এমন কি রক্তপাতের বিভীষিকা পর্য্যন্ত দেখায়; কিন্তু বিধি যেই প্রণীত হইল, অমনি সকলে তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। এই অমূল্য শিক্ষা ব্যতীত জনসংঘ কখনও কোনও বিপুল প্রতিষ্ঠানে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এদেশে সেই শিক্ষা কোথায়? কত কত অনুষ্ঠানে দেখিতে পাই, আত্মবিসর্জ্জন অপেক্ষা আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বাসনাই অধিকতর বলবতী। জীবনের অধিকাংশ কর্ম্মভার রাজপুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া

জনসমাজ নির্ব্বীর্য্য, অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে; কত শতাব্দী বিধিপ্রণয়নে বঞ্চিত থাকিয়া বিধির মাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়াছে; সমবেত-শক্তির পরিচালনার অভাবে আমিত্বকেই বৃহৎ করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই জাতীয় রোগ ধর্ম্মসমাজগুলিকেও অন্তর্দ্রোহে জরাজীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এই রোগের প্রতীকার কি?

দুইটী প্রতীকার এস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথম প্রতীকার, সমাজে মণ্ডলীর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা। ভাগবতের একটি শ্লোকে মণ্ডলীর লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

বাইবেলেও ঠিক্ এতদনুরূপ উক্তি আছে। "যেখানে আমার ভক্তগণ নামকীর্ত্তন করেন, আমি সেই-খানেই বর্ত্তমান"—এই ভগবদুক্তিতে মণ্ডলীর স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে। যে সমাজ যে পরিমাণে মণ্ডলীলক্ষণাক্রান্ত হইবে, তাহার সমবেত কার্য্য-শক্তি সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। সমাজস্থ জনগণ মণ্ডলী-ধর্ম্মে আস্থা হারাইলে সমাজে বিচ্ছিন্নতা প্রবেশ করে, সমাজ-গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে, তাহার প্রমাণ বহুস্থলেই দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রতীকার, রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের মূল-মন্ত্রাবলম্বন—"In things essential unity, in things non-essential liberty, in all things charity"—"প্রাণগত (প্রধান প্রধান) বিষয়ে একতা, অপ্রাণগত (অপ্রধান) বিষয়ে স্বাধীনতা, সর্ব্ব বিষয়ে উদারতা।" এই মহামন্ত্র শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও কাথলিক সম্প্রদায়কে আজও এক ও অখণ্ড রাখিয়াছে। এই মন্ত্র জীবনে আয়ত্ত হয় নাই বলিয়াই সংরক্ষণ অপেক্ষা সংহারের দিকে আমাদিগের ঝোঁক এত বেশী। যখনই আমরা দশজনে মিলিয়া কোন অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হই, তখনই কোন্‌টা প্রাণগত (অত্যাবশ্যক বা Essential) আর কোন্‌টা অনত্যাবশ্যক বা উপেক্ষণীয় (Non-essential) এই জ্ঞানের অভাবে বিষম কলহ আরম্ভ হয়। যে অনুষ্ঠানে আমরা দশজনে মিলিত হইয়াছি, তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোথায়, এই জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেইটা নির্ণীত হইলে ও সেইখানে সকলের ঐক্য থাকিলে অবান্তর বিষয়ে অনায়াসেই পরস্পরকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যায়, যেখানে যত কোলাহল অবান্তর বিষয় লইয়া, মূলগত অনৈক্য লইয়া তত নহে। বিশাল হিন্দুসমাজের শত সহস্র সম্প্রদায়ের মূলে প্রাণগত অনৈক্য কতটুকু? ঈশ্বর, জগৎ, মানবাত্মা প্রভৃতি ধর্ম্মের মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে মতভেদ কত অল্প! বাহ্য আচরণ বা অপ্রধান বিষয়ই কি অধিকাংশ দ্বন্দ্বের মূল নহে? খৃষ্টীয়, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মেও ইহাই দৃষ্ট হয়। সুতরাং কোন্‌টা ধর্ম্মের স্বরূপ, কোন্‌টা ধর্ম্মের স্বরূপ নহে; কোন্‌টা এই অনুষ্ঠানের প্রাণ, কোন্‌টা ইহার প্রাণ নহে; কোন্‌টা অপরিহার্য্য, কোন্‌টা উপেক্ষণীয়, এই জ্ঞানের অনুশীলন ব্যতীত সমবেত কর্ম্ম সফল হইবার নহে। এজন্য জনসমাজে শিক্ষাবিস্তার একান্ত আবশ্যক।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

বিলাতের পত্র।

(৩)

লণ্ডন, ১০ই এপ্রিল, ১৯১৩।

আজ মিসেস্ পি, কে, রায়ের বাড়ীতে আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। মিসেস্ রায় বহুদিন অবধি বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে চিন্তা করিতেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার অনেক অভিজ্ঞতাও আছে। ইঁহার চেষ্টায় শ্রীযুক্তা মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় ইংলণ্ডে শিক্ষানীতি অধ্যয়ন করিতেছেন। আমরা যখন ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে খুব উত্তেজনার সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলাম, শ্রীযুক্তা মৃণালিনী তখন নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। মিসেস্ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাবছ?" মৃণালিনী উত্তর করিলেন, —"মিসেস্ নরেন্সের মূর্ত্তিটা চোখে ভাসছে। কি আদর্শ

নারী! কি আদর্শ শিক্ষক? ঠিক্ যেন একটী তপস্বিনী।"

মৃণালিনী প্রতিভাশালিনী ও বুদ্ধিমতী, ভবিষ্যতে বহু নারীর শিক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিবেন। নিজের মধ্যে সেই শক্তি রহিয়াছে, যাহার বলে মঙ্গল-কর্ম্মে আত্মনিবেদন করা যায়। তিনি বিখ্যাত কবি সরোজিনী নাইডুর ভগ্নী। যখনই ইঁহার সঙ্গে দেশের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, জীবন্ত উৎসাহ দেখিয়া প্রীত হইয়াছি।

তিনি মিস্ লরেন্সের কথা যখন বলিলেন, তখন আমার প্রাণে খুব আনন্দ হইয়াছিল। কারণ যথার্থই ইনি একটী আদর্শ নারী। Froebel Institute (ফ্রোবেল ইনষ্টিটিউট) এর সংলগ্ন Teachers' Training College-(শিক্ষক বিদ্যালয়) এর তিনি অধ্যক্ষ। কুমারী মৃণালিনী বলিতেছিলেন, "যখনই মিস্ লরেন্সের মুখখানা মনে পড়ে তখনই একটা অনুপ্রেরণা লাভ করি।" ইনি কলেজে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া নারীত্বের একটী জীবন্ত আদর্শ দেখিয়াছেন। আমিও এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছি।

এই তপস্বিনী রমণীর মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া শিক্ষার তপস্যায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কলেজের ছাত্রগণের নিকট তাঁর এক একটি করুণাময়ী দৃষ্টি—কত অমৃতবর্ষী। ইংলণ্ডের শিশুশিক্ষার যুগান্তর আনয়ন করিবেন, এই মহাব্রত তিনি জীবনের আরম্ভে গ্রহণ করেন। শিশুশিক্ষার ভার মহিলা শিক্ষয়িত্রীদিগেরই হস্তে। সেই জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইউরোপের শিশুশিক্ষাজগতে যিনি নবযুগ আনয়ন করেন ইনি সেই মহামতি ফ্রোবেলের শিষ্যা।

মিস্ লরেন্স আজীবন ব্রহ্মচারিণী। কলেজের ছাত্রীগণই তাঁহার সন্তান। তাঁহার পবিত্র মুখখানা দেখিলেই বোঝা যায়, তিনি সংসারের পাপকালিমার অনেক ঊর্দ্ধে একটী দেবলোকের অধিবাসী। নিজের চরিত্রের প্রভাবে সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের মধ্যে ইনি একটা স্বার্থ-বিমুখ ও বিলাসহীন জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। কলেজের সংলগ্ন একটী আদর্শ শিশু-বিদ্যালয় আছে। মিস্ লরেন্স যখন তাঁহাদের মধ্যে যান, ছোট শিশুরা চুমো-খাওয়ার জন্য তাঁহার কোলে ছুটিয়া আসে। তাঁহার সহাস্য দৃষ্টি চারিদিকে যেন অমৃত বর্ষণ করে। ইঁহাকে যখন প্রথম দেখি, তখন মনে এই গভীর আনন্দ হইয়াছিল যে একজন আদর্শ শিক্ষক দেখিলাম। অল্পক্ষণ আলাপেই ইঁহার জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্নেহে, করুণায় ও কোমলতায় ইনি মহত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি। আবার বৃহৎ কাজটীর সমগ্র ব্যবস্থা বিধানের পারিপাট্যে ইনি আদর্শ ব্যবস্থাকর্ত্রী। নিজের চরিত্রের প্রভাবে বহুশত বালিকাকে ইনি নারীত্বের উন্নত আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছেন। তাহারা আবার সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। এইরূপ চেষ্টায় বিগত ৪০ বৎসরে শিক্ষাব্রতে ইনি ইংলণ্ডের মহিলা ও শিশুসমাজের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

যখন প্রথম ইংলণ্ডে পদার্পণ করি, তখন রাস্তায় ঘাটে সাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য নারীর যে অবস্থা দেখিতাম তাহা আমার চোখে মোটেই ভাল ঠেকিত না। আমার মনে হইত, পাশ্চাত্য নারী-সমাজে নারীত্বের পরিবর্ত্তে পুরুষত্বের ভাবই বেশী। তাহাদের পোষাক ক্রমেই পুরুষের মত আঁটা হইয়া উঠিতেছে। নব্যতন্ত্রের জামাগুলিও অনেকটা পুরুষদের মত। রাস্তায় দেখা যায়, হকী খেল্‌বার লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মেয়েরা পথ চলিতেছে। টেনিসে আর তাদের চলে না। ক্রিকেট্, ফুটবল, এমন কি রাগ্‌বী ইত্যাদি পুরুষোচিত ক্রীড়াতেও তাদের খুব ঝোঁক দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে সমাজে খুব একটা গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে, তাঁহার সন্দেহ নাই।

আমি একটী সাধারণ শ্রেণীর বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নব্য তন্ত্রের মহিলাকুলের এই যে পরিবর্ত্তন, তাহা তাঁহার নিকট কেমন লাগিতেছে, এবং বর্ত্তমান নারীতন্ত্র পূর্ব্বতন তন্ত্র হইতে উন্নত কি অবনত?

বৃদ্ধা দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আমি একেবারেই হাল্ ফ্যাশনের মেয়েদের পছন্দ করি না। আমরা যখন বালিকা ছিলাম তখন ক্রিকেট্, ফুটবল খেলার কথা কল্পনাও করিতে পারি নাই, নারী নারীই থাকুক, ইহাই আমার ইচ্ছা। বর্ত্তমানের ইংরেজ নারীগণ পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া পুরুষ হইতে চলিয়াছে, ইহা আমি আদৌ পছন্দ করি না।" তাঁহার বিশ্বাস, প্রাচীন তন্ত্রের মেয়েদের নৈতিক অবস্থা বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা উন্নত ছিল। অবশ্য এসকল বৃদ্ধার কথা সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য নহে। আমাদের দেশের বৃদ্ধারাও বালিকা বধূদিগকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্বামীর কাছে পত্র লিখিতে দেখিয়া অনেক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া "ঘোর কলির" স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বৃদ্ধার কথার অত্যুক্তিটুকু বাদ দিলেও উহার কিছু মূল্য আছে। আমেরিকায় মেয়ে-পুলিশ নিয়োজিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী দেশে বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মেন-ভীতি খুব জাগিয়াছে। একদল ফরসী-মহিলা স্বদেশের জন্য সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইংলণ্ডের একদল মহিলা গুপ্ত-সমিতি করিয়া লয়েড্ জর্জ্জের বাড়ীতে বোমা ছুঁড়িতেছে। এসকল ব্যাপারে নারীত্বের অপভ্রংশের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, তাহা বিবেচ্য বটে।

সেদিন ইংলণ্ডের একজন সমালোচকের একটী প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। সমালোচক বর্ত্তমান ইংরেজ কবিদিগের প্রেম-সঙ্গীত (Love Lyrics) সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, যে বর্ত্তমান নব্য কবিদের সঙ্গীতে নারীর আধিপত্য খুবই কম। অর্থাৎ ইংরেজ-রমণীগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় কবিদিগের কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছেন না। সমালোচক তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, দোকান পশারে, ফুটবল, ক্রিকেটে সর্ব্বত্র মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাতে উভয়ের প্রকৃতি একভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে। যতটুকু চাপা (reserve) থাকিলে—যতটুকু দূরত্ব রক্ষা করিলে পুরুষগণ নারীকে কল্পনার বলে বড় করিয়া মানস-চক্ষে গড়িতে পারে ততটুকু দূরত্ব আর থাকিতেছে না। লজ্জাশীলতা (Modesty) জিনিষটাই হইতেছে নারীত্বের উপরকার একটী আবরণ যদ্দ্বারা তাহার অন্তরের গুপ্ত জিনিষটী চট্ করিয়া ধরা দেয় না। এই লজ্জাশীলতার (Modesty) পর্দ্দায় ঢাকা নারীহৃদয় কবির চক্ষে একটী অস্পষ্ট রহস্যলোক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাহারই উপর কল্পনার রং ফেলিয়া কবি অপূর্ব্ব নারী-চিত্র অঙ্কন করেন। তবে এই লজ্জাশীলতার (Modesty) অভাবই কি কবিচিত্তে নারীর প্রভাব খর্ব্ব হওয়ার প্রধান কারণ?

কিছুদিন হইল, এখানে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখিকা দুইটী তুর্কী রমণী। তুরস্কের অধিবাসিনী দুই ভগ্নী ফরাসী লেখক পিয়ার লোটীর ভগ্নীর সহিত পরিচিত হন। তুর্কীর নিষ্ঠুর পর্দ্দা-কারাগার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ফরাসীদেশে চলিয়া আসেন। এই দুইটী মহিলা ফরাসী শিক্ষা ও সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা লাভ করিয়াছেন এবং তুর্কী রমণীর যে সকল প্রাচ্য গুণাবলী তাহাও রক্ষা করিয়াছেন। পিয়ার লোটীর ভগ্নীর নিকট পাশ্চাত্য নারীসমাজ সম্বন্ধে যে সকল গবেষণাপূর্ণ পত্র ইঁহারা লিখিয়াছেন তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এক স্থলে তাঁহারা লিখিয়াছেন, যে লণ্ডনের নারীদিগের ক্লাবে প্রায়ই দেখা যায়, মহিলাগণ ক্রিকেট্, টেনিস্ ইত্যাদিরই গল্প করেন। বাহিরের দিকেই ইঁহারা মনকে বেশীদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিয়াছেন। তুর্কী-নারীর যে শান্ত অথচ গভীর, স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় চরিত্র সেইটী এদেশে চোখে পড়ে না। হৃদয়ের গভীরতা, স্বার্থত্যাগ, সন্তোষ, স্বাভাবিক করুণা ও কোমলতা তুর্কী রমণীর প্রধান গুণ, কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনতা ও সুশিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় সে সকল মহৎগুণাবলীকে কার্য্যকরী করিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য মহিলা-সমাজে তুর্কী রমণীর সে সকল মহৎগুণের অভাব রহিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, "তুর্কী রমণীর আন্তরিক গভীরতা ও ত্যাগ-পরায়ণতার সহিত যদি ফরাসী-নারীর জ্ঞানালোচনা (Intellectual Culture) মিলিত হয় তবে জগতে অতুলনীয় নারী-চরিত্র গঠিত

হইতে পারে।" তাঁহারা আরেকটা কথা বলিয়াছেন এই যে, তুরস্কে তাঁরা যতদিন ছিলেন তত দিন স্বদেশ-প্রীতি কি তাহা অনুভব করেন নাই। ফরাসী দেশে পদার্পণ করিয়া তাঁহারা প্রথম তুরস্ককে ভালবাসিতে শিক্ষা করেন।

আমার মনে হয়, বাহিরে জাতীয় ব্যাপারে আমরা যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদান প্রদানের পক্ষপাতী তেমনি জগতের ভবিষ্যৎ নারী-চরিত্র গঠনে প্রাচ্য নারীর গুণাবলী ও পাশ্চাত্য নারীর গুণাবলীর আদান প্রদানের পক্ষপাতী হওয়া উচিত। ভারতীয় রমণী ত্যাগ ও মাতৃত্বে যেমন অতুলনীয়, শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাবে তেমনি জড়বৎ হইয়া রহিয়াছেন। পাশ্চাত্য নারী-সমাজ শিক্ষা ও স্বাধীনতায় যথেষ্ট অগ্রসর, তেমনি পারিবারিক জীবনের ত্যাগশীলতায় ক্রমশঃই অধিকতর বিমুখ হইয়া উঠিতেছেন। পাশ্চাত্য মহিলা-সমাজকে প্রাচ্য পারিবারিক আদর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। মনকে বাহিরের উত্তেজনা হইতে সংহত করিয়া পারিবারিক শান্তির দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের মহিলা-সমাজকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দানে আরও অধিকতর শক্তিশালিনী করিয়া তুলিতে হইবে।

শিক্ষা ও স্বাধীনতার সঙ্গে সীতা সাবিত্রী, শকুন্তলার আদর্শ আমাদের নারী-সমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। মাতৃত্বের আদর্শই ভারতীয় নারী-চরিত্রের প্রাণ। তাহাকে বিনষ্ট হইতে দেওয়া চলিবে না। রক্ষণশীলগণ বলিতে পারেন, শিক্ষা ও স্বাধীনতা আমাদের রমণীগণের সৎগুণাবলী বিনষ্ট করিবে। তাঁহাদের উত্তরে আমার বক্তব্য এই, বাহিরের আলো-বাতাসের ধূলি লাগিবার ভয়ে আমাদের নারী-চরিত্রকে অস্বাভাবিকরূপে পর্দ্দার কাচ-প্রাচীরে ঘিরিয়া যে গুণের গর্ব্ব করিতেছি তাহার মূল্য খুবই কম। পর্দ্দা-প্রথা মাতৃজাতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের একান্ত অভাবের পরিচায়ক। ভারতের মহিলা-সমাজ যখন জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের চরিত্র ও নারীত্ব রক্ষার জন্য পান্ধীর আলোক-রশ্মির ছিদ্র-পথকে পর্দ্দা ঢাকিয়া বন্ধ করিতে হয় নাই। ভারতের মহিলাকুলের উপর এই গুরুতর ভার পড়িয়াছে যে, শিক্ষা ও স্বাধীনতার সহিত মাতৃত্বের সমাবেশ করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিতা মহিলাগণকে এংলিসাইজড্ (বিলাতী ভাবাপন্ন) না হইয়া প্রাচীন আর্য্যনারীগণের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমান জগতের আদর্শ-নারীজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ইংরেজ-মহিলা সমাজের নিকট হইতেও আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা করিবার আছে। তাঁহাদের বাহিরের অবস্থা দেখিয়াই যদি ফিরি তবে অতি অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক ধারণা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। সাধারণ জন-সমাজের চাকচিক্য পশ্চাতে ফেলিয়া যথার্থ শিক্ষিত ইংরেজ-পরিবারে প্রবেশ করিলে ইংরেজ রমণীর অসাধারণ সৎগুণাবলী বিস্ময় উৎপাদন করে। তন্মধ্যে প্রধান গুণ, ইঁহাদের সন্তানের সুশিক্ষা বিধান। অবশ্য ইংলণ্ডের অধিকাংশ শিশু-বিদ্যালয়ই মহিলাদিগের হস্তে; এবং এই সকল বিদ্যালয়ের মহিলাগণ শিক্ষা ও চরিত্রের স্নেহ প্রবণতায় ও স্বার্থত্যাগে ভারতের নারী-সমাজ হইতেও উন্নত বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই পত্রের প্রথম অংশে কুমারী লরেন্সের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি তাহাতেই এই শিক্ষয়িত্রী-সমাজের আদর্শের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইঁহাদিগকে দেখিলে মানব-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত-জীবন প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের কথা মনে পড়ে।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত পরিবারের গৃহকর্ত্রীগণও অতি শৈশব হইতেই সন্তানগণের সুশিক্ষা দানে একান্ত মনোযোগী। সন্তানকে উন্নত আদর্শে গড়িয়া তোলাই মাতার পারিবারিক জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। সন্তানের শরীরের স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ, চরিত্রের পবিত্রতা, জ্ঞানে অনুরাগ সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজগৃহিণী সর্ব্বদাই যত্নবতী। পিতামাতা সন্তানগণের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া থাকেন। জোর করিয়া হুকুম চালাইয়া তাহাদের উৎসাহ নষ্ট করেন না। পিতা মাতা পথ দেখাইয়া দেন। মাতা কন্যার পক্ষে সুধু মাতা নহেন, বন্ধুও বটে। সমগ্র পরিবার সরল প্রাণে পরস্পরের সঙ্গে

মিলিত হইয়া হৃদয়ের আদান প্রদান করেন বলিয়া গৃহটী আনন্দের আলয় হইয়া উঠে। স্বাধীনতার সঙ্গে সুন্দর শাসনের (Discipline) মধ্যে সন্তানকে গড়িয়া তোলার নিপুণতা ইংরেজ মাতার বিশেষত্ব। নিজে সুশিক্ষা লাভ না করিলে সন্তানের সুশিক্ষা দান অসম্ভব।

একটী পরিবারে হয়ত একটী মাত্র চারি বৎসরের শিশু। তার খেলার সাথী নাই, তাহার ব্যায়াম দরকার। মা শিশুর মত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার সঙ্গে খেলা করছেন এবং সেই সঙ্গে শিশুর ব্যায়াম হইতেছে। আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাকে বর্ণ পরিচয় করাইতেছেন, গান শুনাইতেছেন। শিশু একটু বড় হইলেই তাহাকে লইয়া চিত্রশালায়, মিউজিয়মে, পশুশালায় ঘুরিয়া তাহার চিত্তবৃত্তিকে চারিদিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। মা শিশুর চারিদিকে উন্নত জ্ঞানলোকের একটী হাওয়া রচনা করিতেছেন। শিশুজীবন পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত তাহার মধ্যে স্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভারত-মহিলা ও ইংরেজ-মহিলা উভয়ের মধ্যে অনেক সৎগুণ রহিয়াছে; জাত্যভিমানে অন্ধ না হইয়া পরস্পরে পরস্পরের গুণাবলীর মর্ম্ম গ্রহণ ও অর্জ্জনে মনোযোগী হওয়া উচিত।

শ্রী—

প্রবাসী

ভুলেছি সে কোন্ দিন কবে
আইলাম গৃহ তেয়াগিয়া,
ভ্রমিলাম দেশে দেশে কত,
কোন্ নিধি খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

কতজনে হ'লো পরিচয়
কত সাথী দূর পরবাসে,
কতজনে বাসিলাম ভাল
মজিলাম স্নেহ সুখ আশে।

তারপর বাঁধিলাম গেহ
ভুলে গেনু পরবাসী আমি,
বিকাইনু আপনার প্রাণ,
হইলাম কত সুখকামী।

আসিয়াছি গৃহ তেয়াগিয়া
ভুলিলাম হইবে ফিরিতে,
ধীরে ধীরে সেই সব কথা
মনে আর জাগে না চকিতে।

শুনিয়াছি হেথা আছে যারা
একে একে কোথা যেন যায়,
সকলেরি শুনি পরিণাম
তবু প্রাণ জাগিল না হায়!

মজিলাম, দিনু আপনারে
বিকাইয়া কার কাছে হায়,
জেনে শুনে সঁপিলাম প্রাণ
দু'দিনের চপল খেলায়।

জগতের অবিরাম গতি
অতীতের মহা পরিণাম,
জেনে শুনে আপনারে তবু
সামালিতে নাহি পারিলাম!

একে একে আঁধারে আঁধার
সাথী যারা কোথা যায় চলে,
আমি শুধু ভগন হতাশ
ভাসিতেছি নয়নের জলে।

দেখিলাম মরণের সেতু
পরপারে কোথা নিয়া যায়,
সে দেশের আলোকের রেখা
পথিকের নয়নে খেলায়।

চকিতে ভাঙ্গিল ঘুম-ঘোর
জেগে উঠে পরাণ আমার,

কোথা হায় সে দেশের পথ
চোখে মোর লাগিছে আঁধার।

আকাশে বাড়ায়ে দুটি কর
কেঁদে উঠে হতাশ ব্যথায়,
পরবাসী পরাণ আমার
আজি যে গো গৃহে যেতে চায়॥

শ্রীসুধাসিন্ধু সেনগুপ্ত।

বনফুল।

তোমার নিকট পত্র লিখিতে বসিলাম। কেন আমার এই দুর্ম্মতি হইল জানি না, কিন্তু না লিখিয়া পারিলাম না। আমি মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু যেসব কথা চীৎকার করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করিবার জন্য সারাজীবন বুক ফাটিয়া গিয়াছে, অথচ প্রাণপণ বলে ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছি, সে সব কথা যদি আজ তোমাকে জানাইয়া না যাই তবে আমি মরিয়াও শান্তি পাইব না। হে দেবতা আমার, তোমাকে ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে হইবে। জীবনে তোমার নিকট এই আমার প্রথম আত্ম-নিবেদন।

তুমি আজ দেশের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত। নবোদিত নূতন জ্যোতিষ্কের মত তোমার দীপ্তি; সহস্র বিস্মিত নয়ন নির্নিমেষে তোমার কর্ম্মবহুল জীবনের গৌরবময় গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আর আমি? সংসারের কোনও কাজে না লাগিয়া দরিদ্র কুটীরে জীর্ণ শয্যায় শুইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। তবু আমরা এক-দিন পরস্পরের এত কাছে আসিয়াছিলাম যে তত কাছাকাছি মাত্র একবারই আসা যায়। তুমি সেই সময়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছ, তোমাদের অনেক কাজ, এত ক্ষুদ্র কথা মনে রাখিবার দরকার তোমাদের হয় না। কিন্তু আমার সারাজীবনে আমি এমন কি পাইয়াছি যে আমার জীবনের সেই একমাত্র পূর্ণিমা রাত্রির কথা ভুলিব? আমি ভুলি নাই, সারা জীবন সেই নিষ্ঠুর স্মৃতি অহরহ আমাকে দগ্ধ করিয়াছে। তুমিই কি ভুলিতে পারিয়াছ? আপনার মন ভুলাইতে সারাদেশময় যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ছেলেখেলার ব্যাপার স্তূপীকৃত করিয়া তোমার প্রকাণ্ড যশের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছ, তাহার শুষ্ক ইষ্টকগুলি কি জমাট অশ্রুদ্বারা গ্রথিত নহে? ক্ষুধার্ত্ত আত্মা যখন হাহাকার করিয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, যখন সমস্ত পৃথিবী তিক্ত-বিস্বাদ বোধ হয়, ব্যর্থ-জীবনের তীব্র অনুশোচনায় যখন দগ্ধ হইতে থাকে,—তখন জীবনের সেই দিনেকের পূর্ণ সার্থকতার কথা মনে করিয়া কি ভাষাহীন ব্যথায় অশ্রুজল উথলিয়া উঠে না? মূঢ় আত্মাকে উপবাসী রাখিয়া খেলনা দিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা?

তোমার আমায় দেখা আমার মাসীর বাড়ীতে, মনে আছে? আমার মাসতুত বোন লীলাবতীর বিবাহ উপলক্ষে সেখানে গিয়াছিলাম। লিলির ভাই অমূল্য সহরের কলেজে এম, এ পড়িত, তুমি তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদ্—সহপাঠী, লিলির বিবাহে অমূল্যদাদার সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলে। সেইখানে আমাদের সাক্ষাৎ। অধিবাসের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় তোমরা সহর হইতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলে। মনে আছে?—রাত্রে তুমি আর অমূল্য দাদা রান্না ঘরের বাঁধা বারান্দায় জ্যোৎস্নালোকে একত্র ভোজনে বসিয়াছিলে, আর আমি পরিবেষণ করিয়াছিলাম। তোমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তোমার পাতে আমি একরাশি মিষ্টান্ন ঢালিয়া দিয়াছিলাম, তুমি মিনতিপূর্ণ নয়নে বিপন্ন ভাব ফুটাইয়া মুখ তুলিয়া আমার পানে চাহিয়াছিলে। সেই আমাদের চারি-চক্ষের প্রথম মিলন। তখন বাড়ীর নিম্নে বিস্তীর্ণ প্রান্তর চন্দ্রের অজস্র অমিয় পান করিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, মাঠের প্রান্তের গ্রামান্তর হইতে পাপিয়ার তান মৃদুতর হইয়া সমীরহিল্লোলে ভাসিয়া আসিতেছিল।

প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম হয় কিনা ইহা লইয়া অনেক পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন,—হয় কিনা জানি না। কিন্তু

হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের পরিচয় প্রথম দৃষ্টিতেই হইয়া যায়। পরমুহূর্ত্ত হইতেই বোধ হইতে থাকে, যে এ যেন কত পরিচিত, এর একটী বাণী যেন প্রাণপণ পরিশ্রমের উচ্চতম পুরস্কার, ইহার দুদণ্ডের সান্নিধ্য যেন দুদণ্ডের স্বর্গভোগ। সমস্ত প্রকৃতি যে একটি মাত্র দৃষ্টিপাতে সজাগ হইয়া উঠিতে থাকে, তাহা সামান্য নহে। মনে আছে, তোমাদের আসিবার পূর্ব্বদিন বিকশিত-কুসুম কামিনী গাছের নীচে লীলাদের পুকুরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া লিলির গলা ধরিয়া সন্ধ্যারক্ত পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া গাহিয়াছিলাম, —"এজনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে?" লিলি সজল নয়নে শিশিরসিক্ত কুসুমটির মত গভীর বেদনায় আমার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিল। লিলির বয়স তখন ষোল, আমি তাহার এক বৎসরের বড় ছিলাম। আমাদের কুলীনের ঘরে গৌরী দান দুর্লভ, কিন্তু লিলির পিতা ধনী ব্যক্তি, তিনি ইচ্ছা করিলে লিলিকে ইহার বহুপূর্ব্বেই পাত্রস্থা করিতে পারিতেন, কেন যে করেন নাই তিনিই জানেন। যাহাহউক লিলিও শূন্যহৃদয়ের বেদনা অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। তাই আমার জন্য তার চোখে জল আসিয়াছিল। রান্নাঘরের সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত বারান্দায় চারিচক্ষুর প্রথম মিলনে আমার শূন্য হৃদয় যে মুহূর্ত্তে ভরিয়া উঠিয়াছিল তাহাকে আমি কিপ্রকারে ভুলিব? প্রথম লাভের টাকাটি কৃপণ যেমন করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চিত রাখে, আমার ব্যর্থ নারী জীবনের সেই প্রথম আনন্দ সেইরূপে আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তের পর হইতেই বোধ হইয়াছিল, যে জীবনটা হয়ত ব্যর্থ নাও যাইতে পারে।

আনন্দের উন্মাদনায় সে রাত্রিতে আমি যেন আর এ মাটির পৃথিবীতে ছিলাম না। তুমি আর অমূল্যদাদা বাহির বাড়ীর এক কক্ষে শয়ন করিয়াছিলে, প্রদীপের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া তোমরা কি একটা বিষয় লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছিলে। বাড়ীর ভিতর দোতালার এক কক্ষে আমি আর লিলি শয়ন করিয়াছিলাম; লিলি আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আমি জানালায় বসিয়া তদ্গতচিত্তে বাহির বাড়ীর তোমাদের কক্ষের পানে চাহিয়াছিলাম। জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল, টেবিলের উপর একখানা পুস্তক খোলা, তাহারই উপর বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের উপর মস্তক হেলান দিয়া তুমি দাদার সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন। প্রদীপের উজ্জ্বল আলো তোমার মুখের উপর পড়িয়াছে, তোমার মুখ ক্ষণে ক্ষণে উৎসাহে, আবেগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, আর যেন তাহা হইতে এক স্বর্গীয় আভা ফাটিয়া পড়িতেছে, আমি মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলাম! কতক্ষণ পরে তোমরা শয়ন করিলে, তোমাদের কক্ষের বাতি নিবিয়া গেল, জানালা দিয়া জ্যোৎস্নালোক গিয়া তোমাদের শুভ্র মশারির উপর পড়িল। বাড়ীর সকলে ইহার বহু পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল, আমি হতভাগিনী ক্ষণে ক্ষণে সম্মুখের নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতির প্রতি চাহিয়া, ক্ষণে তোমাদের জ্যোৎস্নালোকিত কক্ষের দিকে চাহিয়া আরও কতক্ষণ যে জানালার ধারে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। কেবল এইমাত্র মনে আছে যে হৃদয় যেন কিসের আবেগে ভরিয়া উঠিতেছিল, ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছিল, আর চোখের জলে জগৎ সংসার যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। হৃদয় যেন অশ্রুজলে ভাসিয়া কেবলি আবৃত্তি করিতেছিল, পূর্ণ হইলাম ধন্য হইলাম।

প্রভাতে অধিবাসের বাজনা বাজিয়া উঠিল, আমার হৃদয়ে উৎসাহ, আনন্দ ছাপাইয়া পড়িতে লাগিল। লিলি কর্ম্মবিমুখ হইয়া এক কোণে বসিয়াছিল, উৎসাহের ঝোঁকে আমি তাহাকেও কাজে টানিয়া নিলাম; সে নিজের বিবাহের কাজ নিজে করিতে গিয়া লজ্জাবতী লতাটির মত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার সে সব লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না, আমার মনে হইতেছিল, আজ যেন পৃথিবীর উৎসবের দিন, আজ যেন জগতের সমস্ত অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ হইবার দিন, আজ যেন বিশ্বে সকলেই মাতিয়া উঠিয়াছে। একা আমি দশ জনের কাজ করিতে লাগিলাম, আমি আর লিলি একত্র হইয়া রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করিলাম।

লিলি আমাকে সমস্ত জিনিস হাতের কাছে গুছাইয়া দিতে লাগিল, আমি একটির পর একটি করিয়া স্তূপীকৃত অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া নামাইতে লাগিলাম। আমার উৎসাহ কোথা হইতে আসিতেছিল, জান? আমি দেখিতেছিলাম, যে বাহির বাড়ীর সমস্ত কার্য্যভার তুমি নিজস্কন্ধে লইয়াছ। অমূল্যদাদা ও লিলির পিতা উভয়েই বিষয়কর্ম্মে অত্যন্ত অদক্ষ, তাঁহারা তোমার মত কর্ম্মী পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন। আমি এক একবার তোমার কর্ম্ম-ফুল্ল উৎসাহ-দীপ্ত ব্যস্ত মুখখানি দেখিতেছিলাম, আর আমার হৃদয়ে সমান কর্ম্মক্ষমতা ও উৎসাহ উছলিয়া উঠিতেছিল। সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, ভালবাসার সঞ্জীবনী শক্তি কি অসাধারণ! তোমার কি কুহক ছিল জানি না, তুমি আসিয়া একদিনেই সকলকে আত্মীয় করিয়া লইয়াছিলে, সকলেই যেন কি করিতে হইবে তাহার জন্য তোমার উপর নির্ভর করিতেছিল। তুমি ক্ষণে ক্ষণে অন্দরে বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছিলে। মনে আছে? একবার তুমি রন্ধনশালায় আসিয়া কি যেন একটা বন্দোবস্তের বিষয় আমাদিগকে জানাইয়া গেলে; তোমার প্রশংসাপূর্ণ বিলম্বী দৃষ্টির সহিত আমার প্রীতি-উজ্জ্বল দৃষ্টি সম্মিলিত হইল—আমার শরীর দিয়া যেন একটা আনন্দের তড়িৎ-প্রবাহ চলিয়া গেল। আমি সেই প্রশংসা-প্রসন্ন দৃষ্টিকে পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

তুমি, অমূল্যদাদা, এবং আরও কয়েকটি যুবক পরিবেষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি এবং লিলি রন্ধনশালা হইতে সমস্ত জিনিষ আনিয়া দিতেছিলাম। সেই প্রীতিপূর্ণ কর্ম্মসহযোগিতার মধ্যে উভয়ের কি আনন্দময় পরিচয়! স্মরণ করিতে এখনও পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। তুমি যখন আসিয়া চাহিতে—"আরো ডাল চাই,"—আমার বক্ষ তখন প্রীতি-প্রবাহে পূর্ণ হইয়া থর থর করিয়া উঠিত; ত্বরিত পদে যাইয়া আমি তোমার শূন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতাম, তুমি একবার মুখ তুলিয়া প্রসন্ন-মুখর নয়নে চাহিয়া পরিবেষণ করিতে চলিয়া যাইতে। আমি সজল নয়নে যাইয়া লিলিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতাম, সরল লিলি আমার অকারণ উচ্ছ্বাস দেখিয়া অবাক হইয়া যাইত।

লিলির বিবাহের দিন প্রাতে বরযাত্রীর দল আসিয়া পৌঁছিল। বিবাহ-বাড়ীর গণ্ডগোল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু আমার কাণে যেন সেই সব পৌঁছিতেছিল না। আমার ভাবে আমি ভোর হইয়া এক স্বপ্নরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার রাণী হইয়া বসিয়াছিলাম। রমণীকণ্ঠের মধুর মঙ্গলসঙ্গীতে এবং সানাইএর কোমল করুণ সুরে সে স্বপ্ন যেন গাঢ়তর হইতেছিল। এক অসীম আকাশ-গঙ্গায় যেন তরণী ভাসাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি হৃদয় পাশাপাশি, বড় কাছাকাছি বসিয়া। সৃষ্টি যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল পরস্পরের প্রতি অসীম নির্ভরে, অসীম ভালবাসায় আবদ্ধ দুইটি আত্মা সেই অনাদি স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যায় যখন বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল, তখন যুদ্ধের পূর্ব্বে যুদ্ধাশ্ব যেমন অসহিষ্ণু হইয়া উঠে আমার হৃদয়ও তেমনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। আমি লিলিকে নিজহাতে সাজাইতে বসিলাম। আমার সমস্ত শিল্প-কৌশল লিলির সজ্জাতে ঢালিয়া দিতে লাগিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ও যেন নব বধূর বেশ পরিধান করিতে লাগিল।

বর আসিয়া বিবাহ-আসনে উপবেশন করিল। অন্দরের প্রকাণ্ড আঙ্গিনায় বিবাহের স্থান করা হইয়াছিল; বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীতে বিবাহ-সভা ভরিয়া গিয়াছিল। তুমি ব্যস্তভাবে এধারে ওধারে ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত বিষয়ের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত করিতেছিলে,—আমি লিলির পাশে বসিয়া তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলাম।

মুখচন্দ্রিকার সময় হইয়া আসিল। লিলি আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"দিদি!" আমি তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—"যাও বোন,—সুখী কর, সুখী হও;—আর কি বলিব?" আমারও গলাটা ধরিয়া আসিল। কিছু পরেই পীড়ির উপর বসাইয়া বাহকগণ লিলিকে বিবাহ-সভায় লইয়া

গেল। আমরা সকলে মুখচন্দ্রিকা দেখিবার জন্য বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। মনে আছে?—তুমি বরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা উজ্জ্বল আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। বরের চতুর্দ্দিকে সাত পাক ঘুরা হইয়া গেল, কন্যার পীড়ি বরের পীড়ির সম্মুখে ধরিয়া লিলির অবগুণ্ঠন উত্তোলিত হইল। শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। মনে আছে? ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাস্যপ্রদীপ্ত মুখে আমার পানে চাহিয়াছিলে, আমাদেরও চারিচক্ষের মিলন হইয়াছিল! অতঃপর বরকন্যা মালা বদল করিল, আমরাও কি সে সময়ে মনে মনে মালা বদল করি নাই? সেই খানে, সেই ক্ষণে দুইটি বিবাহ হইয়া গেল, লোকে দেখিল একটি। কিন্তু জানিও, ভগবানের নয়নে এই দুই বিবাহই সমান! পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগকারী দুর্ব্বৃত্ত তুমি, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।

বিবাহ এবং আনুসঙ্গিক স্ত্রী-আচার সমস্ত হইয়া গেল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। দিনের ভোজন একেবারে বেলা-শেষে হইয়াছিল; সারাদিনের পরিশ্রমে এবং হট্টগোলে সকলে অত্যন্ত ক্লান্তও হইয়াছিলেন, কাজেই অনেকেই রাত্রে আর আহার করিলেন না, না খাইয়াই শয়ন করিলেন। এয়োগণও সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রায় সকলেই যাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এমন সময় তুমি আসিয়া খবর দিলে, যে প্রায় বিশ জন লোকের পাত করা হইয়াছে, তাহারা ভোজনে বসিয়াছে। তুমি পরিবেষণ করিতে স্বীকৃত হইলে মাসীমা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কমলা, যাও ত মা তুমি রান্না ঘরে; নরেন্দ্র পরিবেষণ করিবে, তুমি যাইয়া এগিয়ে দাও ত মা, আর ত কেহ যাইতে চাহে না।" সারাদিনের উত্তেজনার পর আমারও একটু অবসাদ আসিয়াছিল, তবু তুমি পরিবেষণ করিবে শুনিয়া আমি আনন্দে রান্নাঘরে গেলাম।

মনে আছে নরেন্দ্র, সেই বিশ্রব্ধ সান্নিধ্যের তীব্র হৃদয়মন্থন? তুমি নীরবে শূন্যপাত্র লইয়া আসিতেছিলে, আমি নীরবে পাত্র ভরিয়া অন্নব্যঞ্জন দিতেছিলাম—উভয়েরই হাত কাঁপিতেছিল। সেই রান্নাঘরটি যেন দুইটি হৃদয়ের অনুচ্চারিত বাণীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পরিবেষণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তুমি শূন্য মিষ্টান্নপাত্র লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলে। আমি মুখ তুলিয়া চাহিলাম, নয়নে নয়ন মিলিত হইল। তুমি রুদ্ধশ্বাসে মৃদুস্বরে ডাকিলে—"কমলা!" আমি কম্পিতকণ্ঠে কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, কথা ফুটিল না, কেবল দুরু দুরু বক্ষে পলকশূন্য নয়নে তোমার পানে চাহিয়া রহিলাম।

তুমি বাহির হইয়া গেলে আমার চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি রন্ধনশালার সমস্ত গুছাইতে লাগিলাম। তুমি সুযোগ খুঁজিয়া আর একবার আসিয়া দেখা দিয়া গেলে।

মনে আছে নরেন্দ্র, সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত স্তব্ধ রজনীতে সেই পুকুরঘাটে উভয়ের সাক্ষাৎ? সেই ফুল্ল কুসুমিত কামিনী গাছটির নীচে বসিয়া প্রহরেক ধরিয়া বিশ্রম্ভালাপ? কি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে,—মনে আছে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী কাপুরুষ? সেই বিশাল মাঠের প্রান্তবর্ত্তী পুকুরের ঘাটে বসিয়া সেই গম্ভীর নৈশপ্রকৃতিতলে চন্দ্র তারা সাক্ষী করিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে—তুমি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রাণপণ করিবে। পুকুরের জলে চন্দ্র-কিরণ তখন ঝিকিমিকি করিতেছিল, আমার সম্মুখে ভবিষ্যৎ জীবনও তেমনি মোহময়, তেমনি সুখালোকিত বোধ হইয়াছিল। আর এখন?

শুনিয়াছি, তুমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলে। তোমরা শ্রোত্রীয়, আমরা কুলীন, তাই সমাজের ভয়ে তোমার পিতামাতা কেহই এই বিবাহে সম্মত হন নাই। শুনিয়াছি, তুমি আজিও নাকি বিবাহ কর নাই। কিন্তু কাপুরুষ, এই কি প্রাণপণ চেষ্টা? এই যে দুইটি জীবন এরূপ ভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল ইহার জন্য দায়ী কে? বল্লাল না দেবীবর? তাহারা ত কবে মরিয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তোমরা এমনি মৃতেরও অধম হইয়া পড়িয়াছ যে শত শত বৎসর পূর্ব্বে দেবীবর যে গ্রন্থি দিয়া গিয়াছে,—যে গ্রন্থি তোমাদের কন্যা, ভগিনীগণের আত্মাকে তিলে তিলে পেষণ করিতেছে, জাতীয় জীবনের মূল পর্য্যন্ত যে গ্রন্থি শিথিল করিয়া দিতেছে—শত শত বৎসর আগের মৃতের

সে গ্রন্থি তোমরা আজও খুলিতে পারিতেছ না! মূর্খেরা সে গ্রন্থি গৌরব-চিহ্ন বলিয়া গলায় ধারণ করিতেছে, বিজ্ঞেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া সে গ্রন্থি-পেষণে তিলে তিলে মরিতেছে! কেহ গ্রন্থি-মোচনের উদ্যম করিলে সমাজে উপহসিত হইতেছে। দেশের সুসন্তান ছিল রাসবিহারী! ঐ রকম দশটা রাসবিহারী দেশে জন্মিলে এতদিনে দেবীবরের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইত।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজ যে আজ এত অবসন্ন তাহার কারণ কি? দেশময় চহিয়া দেখ, উৎসাহশূন্য মুখে অবসন্ন পদে ব্রাহ্মণগণ যেন কোন মতে চক্ষু বুঁজিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে জীবনের পথে চলিতেছে! ইহার কারণ কি জান? বাঙ্গালার যে কোন কুলীন-প্রধান গ্রামে যাও, কারণ বুঝিতে পারিবে। দেখিবে, গ্রামে এমন বাড়ী নাই যেখানে চারি পাঁচটি যুবতী অবিবাহিতা মেয়ে না আছে! গ্রামে পা দিয়াই বুঝিবে, গ্রাম যেন উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে পূর্ণ। এই উষ্ণ বাতাসের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা কিসে জীবনে উদ্যম পাইবে? হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থা এমনি মঙ্গলাভিসারী যে সমাজের এমন অবস্থা সত্ত্বেও সমাজে দৈহিক পাপের অবসর অত্যন্ত অল্প। কিন্তু মানসিক পাপ কে নিবারণ করিবে? এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, যাহাদের চারিদিকে এমন উষ্ণ মানস-পাপের ঘূর্ণাবর্ত্ত তাহারা কি করিয়া জীবনের পথে সোজা হইয়া হাটিতে পারে! কাপুরুষ তোমরা,—মরিতেছ, তবু বাঁচিবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করিতেছ না! এই যে সহস্র সহস্র বনফুল বনে ফুটিয়া বনেই ঝরিয়া যাই-তেছে, ইহারা প্রত্যেকে কি জাতীয় জীবনী শক্তি তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া যাইতেছে না? তাহাদের আর কিছু ক্ষমতা তোমরা রাখ নাই, কিন্তু তোমাদিগকে প্রাণপণে অভিশাপ দিয়া মরিয়া যাইবার ক্ষমতা তো তাদের আছে!

দেখ নরেন্দ্র,—আজ মনে হইতেছে বিধাতা নারী জাতিকে পুরুষের অধীন করিয়া দিয়া ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন। পুরুষকে তিনি যে অধিকার দিয়াছিলেন পুরুষজাতি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। তুমি ইতিহাস পড়িয়াছ, জান ত যুগে যুগে দেশে দেশে অবলা নারীজাতির উপর কি অসহনীয় অত্যাচার হইয়া গিয়াছে? প্রত্যেক দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে, সকলের আগে অত্যাচার হইয়াছে এই অসহায়া নারীজাতির উপর। আমার আজ মনে হইতেছে, সেই যুগে যুগে নিপীড়িতা রমণীর প্রতিনিধি আমি। নারীজাতি যুগে যুগে যে অন্যায় সহ্য করিয়াছে তাহারা যেন সকলে সমস্বরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে। প্রতীকার কি আসিবে না? কত বড় শক্তি মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া সুপ্ত হইয়াছিল, তাহা তোমরা বুঝিতেছ কি? তোমরা যুগযুগান্তের অত্যাচারে সেই মঙ্গলময়ীকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছ। ঐ পশ্চিমের দিকে চাহিয়া দেখ, মঙ্গলময়ী দানবী হইয়া দানবী শক্তি সহায় করিয়া জাগিতেছে। পুরুষজাতি সাবধান,—সমাজের ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে না, দুইটি জীবনই ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু আমি কি না হইতে পারিতাম—কি না করিতে পারিতাম? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিতাম, আমি তোমার জীবন পূর্ণ—সার্থক করিতে পারিতাম। আমি তোমার সন্তানগণের জননী হইতে পারিতাম, আমাদের প্রত্যেক সন্তান দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিত। আমি জানি, আমার মধ্যে কতখানি শক্তি ছিল,—কাপুরুষ, তোমার কাপুরুষতায় সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমি মৃত্যুশয্যায়। তোমার উপর বিমুখতা রাখিয়া মরিব না। এজন্ম ভরিয়া আমি তোমার ধ্যান করিয়া গেলাম, আগামী জন্মে তোমাকে পাইব, এই বিষয়ে আমি কোন সন্দেহই করি না। আজ কেবল অশ্রুজলে তোমার প্রতি আমার এক অনুরোধ;—প্রিয়তম মোর, দেবতা আমার, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার দেখা দিও।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

স্তনদুগ্ধ ও শিশুর আহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মাতৃদুগ্ধ ও তাহার বর্ণনা—শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা মাতৃদুগ্ধে বর্ত্তমান আছে। যদি মাতৃদুগ্ধের কোন উপাদান শিশুকে বেশী দিনের জন্য খাইতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, পরে স্নেহ জাতীয়, তৎপরে শর্করা জাতীয় ও শেষে লবণ এবং অন্যান্য পদার্থ।

শরীরতত্ত্ব বিধানানুযায়ী শিশুর আহার্য্য যোগাইতে হইলে উপর্য্যুক্ত উপাদানসকলের অংশ স্বাভাবিক থাকা আবশ্যক। যদি ইহার বেশী ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে কুফল দেখা যায়।

স্তনদুগ্ধের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানসমূহের পরিমাণের সামঞ্জস্য থাকিলে শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্যক্‌রূপে হইয়া থাকে; সাধারণতঃ স্তনদুগ্ধে বিভিন্ন উপাদানসমূহ নিম্নলিখিত পরিমাণে পাওয়া যায়।

	আমিষ জাতীয়	স্নেহ জাতীয়	শালী জাতীয়	লবণ জাতীয়
শতকরা	১·৫	৪	৬·৫	১·৫

যদি দুগ্ধে আমিষ অংশ স্বাভাবিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে দুগ্ধ উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি ঐ অংশ বেশী হয় তাহা হইলে সেই দুগ্ধকে খারাপ বলা যায়।

মাতৃদুগ্ধের উপাদানের তারতম্য—অতি উৎকৃষ্ট স্তনদুগ্ধেও উপাদানের অল্প বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্তনদুগ্ধের পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই পার্থক্য বেশী হওয়া উচিত নহে। আমিষ শতকরা ১ ভাগের কম হইবে না ও ৩ ভাগের বেশী হইবে না, স্নেহ জাতীয় পদার্থ ৩ ভাগের কম ও ৫ ভাগের বেশী হইবে না, শালি জাতীয় পদার্থ ৬ হইতে ৭ ভাগের মধ্যে এবং লবণ ০·১ হইতে ০·২ এর মধ্যে হইবে।

উপরিলিখিত অংশের বিশেষ কম বেশী হইলে শিশুর পুষ্টির ক্ষতি হইয়া থাকে এবং এই দোষের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক হয়।

মাখনের তারতম্য—দুগ্ধে মাখনেরই বেশী তারতম্য দেখা যায়। দুগ্ধ প্রদানের শেষাবস্থায় অর্থাৎ প্রায় ৯ মাস গত হইলে মাখনের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়া থাকে, এমন কি ২ ভাগ অথবা তদপেক্ষা আরও বেশী কমিয়া যায়।

আমিষের তারতম্য—আমিষের পরিমাণ ও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। মাতা পরিশ্রম না করিলে, দুগ্ধে আমিষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। খাওয়ার মাত্রা কমাইয়া ও পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দুগ্ধে বর্দ্ধিত আমিষভাগ কমান হইয়াছে এরূপ ঘটনাও জানা আছে। মানসিক উত্তেজনার দ্বারাও দুগ্ধে আমিষের ভাগ বৃদ্ধি পায়। আমিষের মাত্রা ৪ ভাগ কিম্বা তদপেক্ষাও কিছু বেশী হওয়া অদ্ভুত নয়। উপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য আহারের সহিত মাতার স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম পালনের কোন একটীর ব্যতিক্রম ঘটিলে স্তনদুগ্ধে আমিষের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এরূপ দুগ্ধে শিশুর পেটের অসুখ বা অন্য প্রকার স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে।

যে স্তনদুগ্ধে সকল সময়েই ৩ ভাগের অধিক আমিষ উপাদান থাকে তাহা ভাল নহে।

মধ্যে মধ্যে আমিষ উপাদানের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

শর্করার তারতম্য—দুগ্ধে শর্করার প্রায় তারতম্য দেখা যায় না। ইহা সকল অবস্থাতেই সমভাবে বর্ত্তমান থাকে।

স্তনদুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা—ইতর প্রাণীদিগের স্তন্যদান সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিবেচনা শক্তি না থাকিলেও তাহারা স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানকে পালন করে। রমণীদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ইচ্ছা, সভ্যতা, স্নেহ মমতা প্রভৃতি নানা কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই জন্য কেবলমাত্র মাতা নিজ স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে সন্তানের

অনিষ্ট হইতে পারে। অনেক প্রসূতিই সন্তানকে যখন তখন স্তন্য পান করান। সন্তান যে কোন কারণে কাঁদিলেই তাহার মুখে স্তন দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন।

স্তনদুগ্ধেই শিশুর পুষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্তনদুগ্ধ দান কালেও প্রসূতির কতকগুলি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। যথাঃ—

(১) পরিচ্ছন্নতা—স্তনদুগ্ধের সহিত শিশুর পাকস্থলীতে ধূলা প্রভৃতি যাইতে পারে ও ইহাতে নানাপ্রকার রোগ আনয়ন করিতে পারে। শিশুকে খাওয়াইবার পূর্ব্বে ও পরে স্তনের বোঁটা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত।

স্তনের বোঁটায় দুধ লাগিয়া থাকিলে তাহাতে বীজাণু জন্মিয়া শিশুর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে।

বাহিরে পরিষ্কার থাকিলেও বোঁটার মুখে কিছু দূষিত দুগ্ধ থাকিতে পারে সেইজন্য শিশুকে স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে কিছু দুগ্ধ গালিয়া বাহির করা উচিত।

(২) স্তন্যদানের নিয়মিত সময়—প্রথম হইতেই শিশুকে স্তন্য পান করাইবার নির্দ্ধারিত সময় থাকা উচিত। শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রেরই কার্য্যের পর বিশ্রামের আবশ্যক। যদি আহারের সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া স্তন্য দেওয়া যায় তাহা হইলে পরিপাক ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। প্রতি বৎসর বহু স্তন্যপায়ী শিশু অনিয়মের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেক শিশু পরিপাকসম্বন্ধীয় রোগে কষ্ট পায়।

শিশু যখনই ক্রন্দন করে মাতা যদি তখনই তাহাকে স্তন্য দান করেন তাহা হইলে শিশুর একটী বদ্ অভ্যাস হইয়া যায় এবং সেটী সহজে ছাড়ান যায় না। ভাল জিনিষ শীঘ্র অভ্যাস করান যায়, কিন্তু মন্দ অভ্যাস শীঘ্র ছাড়ান যায় না। স্তন্য দানের মধ্যে ব্যবধান অল্প থাকিলে দুগ্ধে আমিষ জাতীয় দ্রব্যের আধিক্য হয় এবং ইহাতে শিশুর পেটের পীড়া আনয়ন করিতে পারে।

স্তনদুগ্ধ শিশুর পাকস্থলীতে ১½ ঘণ্টাকাল থাকে। অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে স্তন্য দানের মধ্যে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল ব্যবধান থাকা কর্ত্তব্য।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ও আহারের মাত্রা বাড়িয়া যায়, তখন অধিক সময়ের ব্যবধান দেওয়া আবশ্যক।

(৩) দুগ্ধের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে—অপর দুগ্ধের বেলা মাপিয়া শিশুকে পান করিতে দেওয়া হয়। স্তনদুগ্ধের বেলা শিশু নিজেই মাত্রা ঠিক করে। সাধারণতঃ মাত্রা পূর্ণ হইলে শিশু স্তন ছাড়িয়া দেয় এবং অত্যধিক হইলে তুলিয়া ফেলে কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নাই।

যদি মনে হয় যে উপর্য্যুক্ত পরিমাণ দুগ্ধে শিশুর যথোচিত পুষ্টিসাধন হইতেছে না তাহা হইলে আবশ্যকানুযায়ী মাত্রা বাড়াইতে হইবে। ১ ছটাক পরিমিত দুগ্ধ টানিয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন শিশুর সময়ের অনেক তারতম্য দেখা যায়। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধ টানিয়া খাইতে পারগ হইলেও মাতার স্তনের অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। মাতার ও সন্তানের পরস্পরের সাহায্যে এই স্তন্যপান ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ যদি কমাইবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা বোঁটার গোড়া চাপিয়া ধরিলেই কমান যাইতে পারে। যদি দুগ্ধ নিঃসরণ মৃদুভাবে হয় তাহা হইলে অগ্রে স্তন মর্দ্দন করিয়া পরে সন্তানের দুগ্ধপানের সময় চাপ দিলে বেশী দুগ্ধ নির্গত হয়।

শিশুর শরীরের আবশ্যকমত স্তনদুগ্ধ যোগাইতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় সকলের আবশ্যক হয়।

(১) যদি স্তনদুগ্ধ পরিমাণে বেশী হয় তাহা হইলে স্তন্য পানের সময় মাতা স্তনের বোঁটা টিপিয়া আবশ্যকমত দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

(২) যদি মাতার দুগ্ধের দোষ থাকে তাহা হইলে চিকিৎসা দ্বারা দুগ্ধ দোষহীন করিতে হইবে।

দুগ্ধের মাত্রা—যাহা শিশু স্তন হইতে টানিয়া

নয়। স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ ও শিশুর টানিবার শক্তি প্রভৃতি নানা কারণে মাত্রার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

শিশু আপনা হইতেই কি পরিমাণ স্তনদুগ্ধ পান করিবে তাহা বলা অসম্ভব। শিশু খুব অল্প কি খুব অধিক পরিমাণও খাইতে পারে।

অনেক গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিক কতটুকু স্তনদুগ্ধ টানিয়া লইবে তাহার মোটামুটি একটা পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহারা শিশুকে স্তন্য পান করাইয়া পূর্ব্বে ও পরে ওজন করিয়া এই পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।

কত বয়সের শিশু কি পরিমাণ দুগ্ধ পান করিবে আমরা নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিতেছি।

ইহা নিরূপণের জন্য শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী বিষয়গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখা উচিত।

(১) যদি শিশু যথেষ্ট আহার না করে তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করা যায়।

(ক) শিশুর ওজনের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইতে কম হয়।

(খ) স্তন টানিবার সময় শিশু অস্থিরতা প্রকাশ করে ও আহারের শেষে শিশুকে সন্তুষ্ট দেখায় না।

(গ) বমি হয় না।

(ঘ) মল অল্প অল্প কিন্তু বারে অনেক হয়।

শিশুদিগের বয়স অনুসারে কি পরিমাণ দুগ্ধ কয়বার খাওয়া আবশ্যক তাহার তালিকা।

শিশুর বয়স	১ম দিন	২য় দিন	৩য় হইতে ২৪শ দিন	১৫শ হইতে ২৮শ দিন	২য় মাস	৩য় মাস	৪য় হইতে ৬ষ্ঠ মাস	৬ষ্ঠ হইতে ৯ম মাস
প্রত্যেক বারের মাত্রা	$\frac{১}{৪}$—$\frac{১}{২}$ আউন্স	$\frac{১}{২}$—$\frac{৩}{৪}$ আউন্স	$\frac{৩}{৪}$—১ আউন্স	১—১$\frac{৩}{৪}$ আউন্স	২—৩ আউন্স	৩—৩$\frac{৩}{৪}$ আউন্স	৪—৫ আউন্স	৫—৬ আউন্স
কয়বার খাওয়াইতে হইবে	১০	১০	১০	১০	৮	৮	৭	
২৪ ঘণ্টায় গ্রহণীয় মোট দুগ্ধের পরিমাণ	২$\frac{১}{২}$—৫ আউন্স	৫—৭$\frac{১}{২}$ আউন্স	৭$\frac{১}{২}$—১০ আউন্স	১০—১৭$\frac{১}{২}$ আউন্স	১৬—২৪ আউন্স	২৪—৩০ আউন্স	২৮—৩৫ আউন্স	৩০—৩ আউন্স

(ঙ) নিদ্রা সম্পূর্ণ হয় না।

(৩) যদি দুগ্ধ পরিমাণে কম হয় তাহা হইলে স্তনদুগ্ধের সহিত অন্য দুগ্ধ দেওয়া উচিত।

শিশু অত্যধিক বা অত্যল্প পরিমাণে আহার পাইতেছে কি না তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক। পূর্ব্ববর্ণিত তালিকাতে শিশুদের বয়স অনুসারে কি পরিমাণ দুগ্ধ কয় বার খাওয়া আবশ্যক তাহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পানের দ্বারা যে প্রত্যেক শিশুই সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত ও সবল দেহ প্রাপ্ত হইবে তাহা নহে। প্রত্যেকেরই শরীরগত স্বাতন্ত্র্য থাকা সম্ভব।

(২) যদি শিশু অধিক পরিমাণে আহার পায় তাহা হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

(ক) আহারের অব্যবহিত পরে বা অল্পক্ষণ পরে দুধ তোলা।

(খ) বদ হজমের লক্ষণ অর্থাৎ পেটফাঁপা ও পেট কামড়ান।

(গ) স্তন্যপানের পর সম্পূর্ণ সন্তোষ।

(ঘ) শীঘ্র শীঘ্র ওজনের বৃদ্ধি।

(ঙ) অধিক পরিমাণে অনেকবার মলত্যাগ হয়।

(চ) বেশী প্রস্রাব হয়।

(ছ) মাথায় ও ঘাড়ে বেশী ঘাম হয়।

অতি নিদ্রা, অলসতা ও নিদ্রানুভাব দেখা যায়। সময় সময় উদর স্ফীতির জন্য খুব কষ্টও হইয়া থাকে।

উপরিলিখিত প্রত্যেক বিভাগের লক্ষণসকল যদি একত্রে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে আমাদের শিশুর অবস্থা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তবে যদি ইহাদের মধ্যে দুই একটী বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে শিশুকে ওজন করিয়া স্তনদুগ্ধ পান করাইবে ও স্তন্যপান শেষ হইবার পর ওজন করিবে। যে পরিমাণে ওজন বৃদ্ধি হইবে, শিশু সেই পরিমাণে দুগ্ধ খাইয়াছে এবং এই পরিমাণ উল্লিখিত তালিকার পরিমাণের সহিত তুলনায় কতদূর বিভিন্ন তাহা নির্দ্ধারণ করিলে, শিশুর দুগ্ধের মাত্রা নির্দ্ধারিত হইবে।

মাতৃস্তনে দুগ্ধবৃদ্ধির উপায়

স্তনে যখন দুগ্ধের হ্রাস হয়, তখন সাধারণতঃ প্রসূতিকে অধিক মাত্রায় পানাহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং শারীরিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু প্রসূতির পরিপাক শক্তি যদি স্বাভাবিক থাকে তাহাহইলে অধিক খাদ্য পরিপাক করিতে না পারায় এই ব্যবস্থা উপকার জনক না হইয়া বরং অনিষ্টকরই হয়; অর্থাৎ ইহাতে দুগ্ধ বৃদ্ধি না হইয়া বিষাক্ত দুগ্ধের সৃষ্টি হয়।

দুগ্ধবৃদ্ধি নিম্নলিখিত দুইটী অবস্থার উপর নির্ভর করে।

১। শরীরের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি সাধন।

স্তনের পরিপুষ্টি প্রসূতির সমগ্র শরীরের পুষ্টির উপর নির্ভর করে। এই শরীরের পরিপুষ্টি কখনও অপরিমিত আহার দ্বারা সাধিত হয় না। সুতরাং দুগ্ধের পরিমাণ কম হইলে কখনও স্তন্যদাত্রীকে অধিক আহারের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নয়। তাঁহার পক্ষে সম্যক্ ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত পরিমাণে লঘু ও বলকর আহার্য্য নিয়মিত সময়ে খাইতে এবং মুক্ত বায়ুতে অঙ্গ-চালনার জন্য ভ্রমণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। স্বাভাবিক উপায়ে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করণ।

বিবিধ উপায়ে স্তনের দুগ্ধক্ষরণ শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। প্রথমতঃ সমস্ত শরীরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হইয়া পরোক্ষে স্তনকেও সতেজ করিবে। আর মনে রাখিতে হইবে যে জননীর মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে দুগ্ধের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অতি মাত্রায়, মানসিক উত্তেজনা কিংবা মানসিক চাঞ্চল্য বশতঃ দুগ্ধ বিষাক্ত হইতে পারে। নৈরাশ্যে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলে দুগ্ধক্ষরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। মনে স্ফূর্ত্তি থাকিলে শুধু যে প্রসূতির দুগ্ধ অধিকতর বলকারক হয় তাহা নহে তাহার পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে যাহাতে তাহার শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বজায় থাকে তাহা দেখিতে হইবে।

দ্বিতীয় শিশু নিজে যদি মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলেও স্বভাবতঃ দুগ্ধ বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু শিশু যদি দুর্ব্বল হয়, তবে তাহার দুগ্ধ আকর্ষণের ক্ষমতাও কম থাকে এবং মাতার দুগ্ধ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কোন বলিষ্ঠ শিশুকে প্রসূতির স্তন্যপান করিতে দেওয়া হয়, তবে যথা নিয়মে আকর্ষণ করার জন্য দুগ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে।

সাধারণতঃ দরিদ্র ঘরের প্রসূতিদের দুগ্ধের অভাব দেখা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে জননী জানেন যে তাঁহার সন্তানকে স্তন্য দানে পরিপালন করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন তাঁহার সন্তান প্রতিপালনের আর অন্য উপায় নাই। তাঁহাদের হৃদয়ের এই আবেগই দুগ্ধ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। ঔষধের মধ্যে কড্‌লিভার তৈল ইত্যাদি এবং খাদ্যের মধ্যে মাষকলাই ইত্যাদি দুগ্ধ বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু মসূরী, লঙ্কা ইত্যাদি দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

যে পর্য্যন্ত জননীর স্তনে পরিমিতরূপে দুগ্ধ সঞ্চার না হয় সে পর্য্যন্ত সন্তানকে উপবাসী রাখা যায় না। মাতার স্তন হইতে যথারূপে দুগ্ধক্ষরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যবিধ খাদ্য দ্বারা শিশুর সে অভাব পূরণ করা আবশ্যক। এই অবস্থায় শিশুর খাদ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম করা যাইতে পারে না। যিনি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবেন তাঁহাকেই বিবেচনা করিয়া খাদ্যের পরিমাণ প্রভৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখিলে উপকার দর্শিতে পারে---

১। কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধে শিশুর পেট ভরে কিনা দেখিতে হইবে।

২। যদি পরিমাণ কম হয় তবে অন্যবিধ খাদ্য বিধান করিয়া শিশুর সে অভাব পূরণ করিতে হইবে।

৩। শিশুর পরিপাক শক্তি অনুসারে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা দরকার। অবস্থা ভেদে ছানার জল অথবা জল মিশ্রিত দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

৪। স্তনে সামান্য দুগ্ধ থাকিলে শিশুকে পর্য্যায়ক্রমে মাতৃদুগ্ধ এবং উপরোল্লিখিত খাদ্য প্রদান করা দরকার। এমন কি, স্তন যদি একেবারেই দুগ্ধহীন হয় তবুও শিশুকে প্রথম স্তনাকর্ষণ করাইয়া পরে ঐ খাদ্য দিবে।

৫। মাতৃদুগ্ধ ভিন্ন অন্য দুগ্ধ প্রদান করিতে হইলে তাহাতে অত্যধিক পরিমাণে মিষ্ট দিবে না, কারণ তাহা হইলে শিশু মাতৃস্তন্য গ্রহণ করিতে চাহিবে না।

৬। শিশুকে কম পরিমাণে খাইতে দিয়া তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কারণ, তাহা হইলে সে প্রবল ভাবে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লইবে।

দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহার হ্রাসের উপায়---

এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে দেখা দরকার যে প্রসূতির দুগ্ধের মাত্রা সত্য সত্যই অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না। শিশুদের আহারের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক শিশুর অবস্থা অনুসারে তাহার খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিবে।

যখন নিঃসন্দেহ রূপে বোঝা যায় যে দুগ্ধ বৃদ্ধি বশতঃ অপরিমিত আহার হইতেছে সে স্থানে নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস করা যাইতে পারে।

১। প্রসূতি এক সময়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশুকে দুগ্ধ দান করিবেন না।

২। একবার স্তন্য পান করিলে পুনর্ব্বার স্তন্য দিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক।

৩। স্তন্য পানের সময় অঙ্গুলীদ্বারা স্তনের বোঁটা টিপিয়া দুগ্ধ-ধারা কমাইতে হইবে। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মাণ্ড।

দিনের বেলায় আমরা আকাশে কেবল সূর্য্য দেখিতে পাই। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠে, আর সারাদিন কিরণ দিয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সূর্য্য অস্ত গেলে অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবীকে ঢাকিতে থাকে। তখন নীল আকাশে এক একটী করিয়া উজ্জ্বল হীরার ফুলের মত তারার ফুল ফুটিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া পড়ে। যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই অসংখ্য তারা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে দেখা যায়। তখন আকাশের কি চমৎকার শোভা! যেন দেব-শিশুরা প্রদীপ জ্বালাইয়া দীপালী উৎসব করিতেছে!

রাত্রিকালে হীরার ফুলের মত যে অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়, সাধারণতঃ সেইগুলিকে "তারা" বলে। বাস্তবিক ঐ সকল জ্যোতিষ্ক একরকম পদার্থ নহে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি "গ্রহ" আর সব "নক্ষত্র।" গ্রহের সংখ্যা বেশী নয়; সমুদায়ে চারি শতের কিছু উপরে হইবে। কিন্তু নক্ষত্র কোটী কো

দিনের বেলায়ও আমাদের মাথার উপরে আকাশে অনেক তারা থাকে। কিন্তু সূর্য্যের প্রখর আলোকে ঐ সকল তারার ক্ষীণ আলোক ঢাকিয়া যায়। সেইজন্য আকাশ তারা-শূন্য বোধ হয়। আর দিবাভাগে যে আলোক অল্প দূর হইতেও দেখা যায় না রাত্রিতে সেই আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

'গ্রহে' আর 'নক্ষত্রে' অনেক প্রভেদ। প্রথমতঃ গ্রহের নিজের আলোক নাই, নক্ষত্রের নিজের আলোক আছে। আবার গ্রহগুলি নক্ষত্রের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। গ্রহগুলি আমাদের খুব নিকটে, আর নক্ষত্রগুলি অনেক দূরে। এই জন্যই নক্ষত্র-গুলিকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। এক একটী নক্ষত্র লক্ষ লক্ষ গ্রহের সমান বৃহৎ। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের পৃথিবী একটী গ্রহ, আর আমাদের সূর্য্য, আকাশের কোটী কোটী নক্ষত্রের ন্যায় একটী নক্ষত্র। অথবা রাত্রিকালে, আকা-শের গায় যে অসংখ্য আলোক মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলি-তেছে দেখা যায়, উহারা সকলেই এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য।

গ্রহ ও নক্ষত্রে কি প্রভেদ।

আকাশের কোটী কোটী নক্ষত্র সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ বলিয়াছি। এখন সূর্য্য কত বড় একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। আমাদের পৃথিবী অতিশয় প্রকাণ্ড। উহার পৃষ্ঠে বহুসংখ্যক সুবিস্তৃত দেশমহাদেশ, সাগর-মহাসাগর, শত শত পর্ব্বত, অগণিত নদ-নদী শোভা পাইতেছে। পৃথিবী যে কত বড় আমরা তাহা সম্যক্‌ ধারণাও করিতে পারি না। কিন্তু যে পৃথিবী হইতে সূর্য্য ক্ষুদ্র আলোক-পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয় উহা সেই পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ বড়। অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ হইবে। এখন সূর্য্য কত বড় একবার চিন্তা করিয়া দেখ! সূর্য্য অত্যন্ত দূরে আছে বলিয়াই এমন ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু নক্ষত্র-গুলি আরও অনেক দূরে অবস্থিত, এইজন্য সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ নক্ষত্রগুলিও আমাদিগের নিকট আলোক-বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

যদি আমাদের সূর্য্যকে কোন একটা নক্ষত্রের স্থানে রাখিয়া, সেই নক্ষত্রটীকে সূর্য্যের স্থানে রাখা যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিতাম না। আমাদের সূর্য্যকে নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং নক্ষত্রটীকে সূর্য্যের ন্যায়ই বৃহৎ ও উজ্জ্বল দেখাইত।

পৃথিবী সূর্য্যের গ্রহ। পৃথিবীর নিজের আলোক নাই; সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়। পৃথিবীর ন্যায় বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি আরও কতকগুলি গ্রহ আছে। ঐ সকল গ্রহও সূর্য্যের কিরণে আলোকিত হয়। কোন গ্রহেরই নিজের আলোক নাই! গ্রহসকল একস্থানে স্থির নহে। উহারা সর্ব্বদা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সূর্য্য ও নক্ষত্রসকল প্রায় স্থির।* গ্রহদিগের গতিদ্বারা উহাদিগকে নক্ষত্রসকল হইতে চিনিয়া লওয়া যায়। নতুবা গ্রহ ও নক্ষত্র শুধুচক্ষে দূর হইতে দেখিতে ঠিক এক রকমই বোধ হয়।

আজ রাত্রিতে নক্ষত্র সকল পরস্পর হইতে যতদূরে যে ভাবে আছে, একমাস পরেও ঐরূপ থাকিবে। একশত বৎসর পরেও উহাদের স্থান ও পরস্পরের দূরত্বের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু গ্রহগুলি সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে।

মঙ্গল একটি অতি উজ্জ্বল গ্রহ। এক রাত্রিতে মঙ্গল আকাশের যে স্থানে আছে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রগুলি লক্ষ্য করুন। মঙ্গল দৃশ্যতঃ কোন্‌ নক্ষত্রের কত নিকটে, কোন্‌টার কত বামে এবং কোন্‌টার কত দক্ষিণে তাহা কাগজে দাগ দিয়া রাখুন। দুই তিনমাস পরে আকাশে মঙ্গল দেখিয়া পুনরায় কাগজের চিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন। দেখিতে পাইবেন, নক্ষত্রগুলির পরস্পরের স্থান, কাগজে যেরূপ চিহ্নিত করিয়াছিলেন তেমনি আছে। কিন্তু মঙ্গল পূর্ব্ব স্থানে নাই; চিহ্নিত নক্ষত্রগুলি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

কোনও জ্যোতিষ্ক গ্রহ কি নক্ষত্র তাহা জানিতে হইলে উহাকে কিছুদিন লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি দেখা যায়, সেই জ্যোতিষ্ক চিহ্নিত নক্ষত্রগুলি অতিক্রম

* নক্ষত্রদিগেরও একপ্রকার গতি আছে।

করিয়া যাইতেছে, তবে বুঝিতে হইবে উহা একটী গ্রহ।

গ্রহ চিনিবার আরও একটী উপায় আছে। নক্ষত্র সকল মিট্ মিট্ করিয়া আলোক দিয়া থাকে, কিন্তু গ্রহের আলোক মিট্‌মিট্ করে না; সর্ব্বদা একরূপ। *

গ্রহ যেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে তেমনি কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আছে, উহারা গ্রহের চারিদিকে ঘুরে। উহাদিগকে "উপগ্রহ" বা "চন্দ্র" কহে। আমাদের পৃথিবীর একটী উপগ্রহ বা চন্দ্র আছে। গ্রহের ন্যায় চন্দ্র বা উপগ্রহেরও নিজের আলোক নাই। উহারা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়।

উপগ্রহ।

একদিন রাত্রিতে যখন আকাশে চাঁদ উঠে, গ্রহ-নক্ষত্র সকল প্রকাশ পায়, তখন যদি আমাদের সূর্য্যকে একবারে ঢাকিয়া ফেলা যাইত, তাহা হইলে চন্দ্র ও গ্রহগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যাইত। কিন্তু নক্ষত্রগুলি দীপ-মালার মত তেমনি উজ্জ্বল থাকিত। কারণ, নক্ষত্রের নিজের আলোক আছে, আর গ্রহ-উপগ্রহ সকলেই সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল দেখায়। সূর্য্যের আলোক না পাইলে গ্রহ ও উপগ্রহ সকল অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

পৃথিবী কত বড় আমরা তাহারই ধারণা করিতে পারি না। আর সূর্য্য এই বিশাল পৃথিবীর ন্যায় তের লক্ষ পৃথিবীর সমান হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশের অগণিত নক্ষত্রের সকলেই এক একটী সূর্য্য! আমাদের সূর্য্যের চারিদিকে যেমন বহুসংখ্যক গ্রহ ঘুরিতেছে, ঐ সকল দূরবর্ত্তী কোটী কোটী সূর্য্যকেও বোধ হয় বহু সংখ্যক গ্রহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঐ সকল কোটী কোটী সূর্য্য এক একটী বিশাল রাজ্য স্বরূপ। পরস্পর হইতে উহারা কোটী কোটী মাইল ব্যবধান। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, আকাশ কত বিস্তৃত! আকাশ অনন্ত। গ্রহ নক্ষত্রাদিও অনন্ত। অনন্ত আকাশের অনন্ত জ্যোতিষ্ক লইয়া ভগবানের অসীম সাম্রাজ্য! উহাকেই আমরা "ব্রহ্মাণ্ড" বলি।

ব্রহ্মাণ্ড অর্থ ব্রহ্মার 'অণ্ড' বা ডিম। ভগবানের সৃষ্ট জগৎ ডিমের ন্যায় গোলাকার। এই জন্য আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহার নাম "ব্রহ্মাণ্ড" রাখিয়াছেন। বাস্তবিক ডিমের খোলসের ন্যায় আকাশ পৃথিবীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আকাশের খোলটীর ঠিক মধ্যস্থলে যেন আমাদের পৃথিবী। হিন্দু পুরাণে লিখিত আছে, দুইটী কটাহ মুখোমুখী করিয়া রাখিলে যেমন হয়, 'ব্রহ্মাণ্ড' ঠিক তেমন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার; সেই ব্রহ্মাণ্ডের গোল আবরণের মধ্যেই পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক সকল অবস্থিত।

মাধ্যাকর্ষণ।

আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন, ঊর্দ্ধে ঢিল নিক্ষেপ করিলে উহা কতক দূরে উঠিয়া পৃথিবীর উপর পতিত হয়। বোঁটা ছিঁড়িলে ফল মাটিতে পড়ে। বন্দুকের গুলি খুব উপরে উঠে কিন্তু অবশেষে পৃথিবীতেই ফিরিয়া আইসে।

পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির কথা।

ইহার কারণ, পৃথিবীর একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই আকর্ষণ বলে পৃথিবী সকল পদার্থকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে। আশ্রয়হীন পদার্থ সেই আকর্ষণেই পৃথিবীর উপর পতিত হয়। পৃথিবীর সেই শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। নানাদেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা চুম্বকের লৌহ আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী যে পদার্থসকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের উপর টানিয়া আনে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য নামক একজন পণ্ডিত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। যেহেতু আশ্রয়হীন ভারী পদার্থসকল আকাশে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ভাস্করাচার্য্য।

* পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিকীরিত আলোক অনেক দূর হইতে আসিলে মিট্ মিট্ করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রতিফলিত আলোক স্থির ভাবে দীপ্তি প্রদান করে।

তাহাতেই পদার্থসকল পড়িতেছে বলিয়া ধারণা জন্মে। চারিদিকেই সমান আকাশ, অতএব পৃথিবী কোথায় পতিত হইবে? ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন দেশের লোকই এই সত্য অবগত ছিলেন না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের অসাধারণ পণ্ডিত "নিউটন্" স্বাধীন ভাবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। কথিত আছে,—তিনি একদিন বাগানে বসিয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে একটা আতাফল পতিত হইল। আতাফলটা পড়িতে দেখিয়াই নিউটনের মনে চিন্তা হইল--আতাফলটা মাটীতে পড়িল কেন? উহার বোঁটা ছিঁড়িয়াছিল। উহা তো উপরেও উঠিতে পারিত? পৃথিবীতে পড়িবার কারণ কি? অচেতন পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তবে বোঁটা ছিড়িলে ফল ভূ-পৃষ্ঠে আইসে কেন?

নিউটন।

নিউটন্ গভীর চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে জগতে সমস্ত পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। পদার্থ যতই দূরে থাকুক না কেন, এই আকর্ষণের বিরাম নাই। সামান্য ধূলিকণা হইতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অপরাপর জ্যোতিষ্ক সকলেই এই আকর্ষণের অধীন। সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, পৃথিবীও তেমন সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে।

ভাস্করাচার্য্য কেবল পৃথিবীর আকর্ষণের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু নিউটন প্রমাণ করিয়াছেন, জগতের ছোট বড় সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই এই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন।

নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণের কতকগুলি বিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কোন পদার্থ হাতে লইলে বোধ হয়, যেন সেই পদার্থটা হাতকে নীচের দিকে টানিতেছে। পৃথিবী সকল পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে, এইজন্য কোন পদার্থ শূন্যে তুলিয়া ধরিলে হাতে চাপ লাগে। পৃথিবীর এই আকর্ষণের জন্যই পদার্থ ভারী বোধ হয়। পৃথিবী সকল পদার্থকে সমান জোরে টানে না। এই জন্যই ওজনের পার্থক্য ঘটে। একটা "ক্রিকেট বল" তুলিতে হাতে যত আয়াস লাগে, এক খানি ইট তুলিতে তার চেয়ে বেশী আয়াস লাগে। একটা বড় পাথর তুলিতে আরও অধিক আয়াস লাগে। পাথর খুব বড় হইলে তুলিতেই পারা যায় না। ইহার কারণ, বল্ হইতে ইটে বেশী জিনিস এবং ইট হইতে পাথরে আরও বেশী জিনিস। সমান বড় একটা লোহার পাত ও একটী কাঠের তক্তা তুলিতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে, লোহার পাতটী তুলিতে বেশী আয়াস লাগে। কারণ, লোহার পাতে কাঠের তক্তা হইতে জিনিস অধিক। পদার্থের জিনিসের অনুপাতে মাধ্যাকর্ষণের বল বেশি বা কম হয়।

জিনিস কাহাকে বলে?
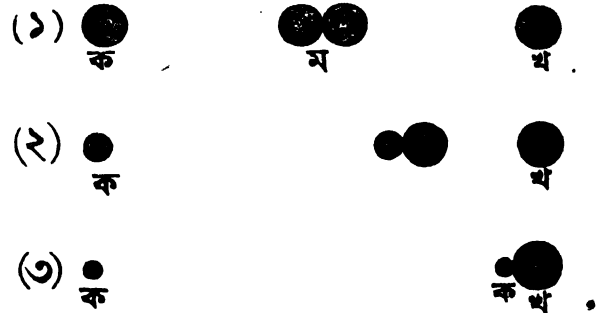
মনে করুন, জগতে কেবল 'ক' ও 'খ' এই দুইটী গোলা আছে। আর 'ক' ও 'খ' এর জিনিস সমান। তাহা হইলে উহারা পরস্পরের আকর্ষণে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ম স্থানে মিলিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে যদি খ এর জিনিষ ক অপেক্ষা বেশী হয় তা হইলে 'ক', 'খ' এর অধিকতর নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে মিলিত হইবে।

এখন যদি 'ক' একটী লোহার গোলা হয়, আর 'খ' আমাদের পৃথিবী হয় তবে 'ক' গোলা এত অধিক পথ চলিবে যে পৃথিবীর গতি বুঝিতেই পারা যাইবে না। দেখা যাইবে যেন 'ক'ই সমস্ত পথ চলিয়া পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পৃথিবী যেন এক স্থানেই স্থির রহিয়াছে এবং 'ক' গোলককে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া

আনিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় যে পৃথিবী হইতে লঘু পদার্থসকল আশ্রয়হীন হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে।

একটী পদার্থ অন্য পদার্থকে যে বলে টানে সেই পদার্থও প্রথমটীকে সেই বলে টানে। একটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই সহজে বুঝা যাইবে। বোঁটা ছিন্ন হইলে ফল মাটিতে পড়ে। উহার কারণ বলিয়াছি—পৃথিবীর আকর্ষণ। কিন্তু পৃথিবী যে বলে ফলকে আকর্ষণ করে ফলও সেই বলে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। তবে ফল পৃথিবীর টানে উহার পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে কেন? ইহার কারণ,—পৃথিবী অতিশয় প্রকাণ্ড পদার্থ; উহার জিনিস ফলের জিনিসের তুলনায় অত্যন্ত অধিক। সুতরাং যে বল ফলটীকে টানিয়া আনে সেই বল পৃথিবীকে নড়াইতেও পারে না বলিলেই হয়। এজন্য সমস্ত পদার্থই আশ্রয় না থাকিলে উর্দ্ধ হইতে পৃথিবীর আকর্ষণে উহার উপর পতিত হইয়া থাকে।

পদার্থ যত দূরে থাকে মাধ্যাকর্ষণের বল তত অল্প হয়। এই বলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রাস পায়। এক মাইল দূরে মাধ্যাকর্ষণের যে বল, দুই মাইল দূরে তাহার অর্দ্ধেক হয় না, এক চতুর্থ হয়। এবং তিন মাইল দূরে তাহার নয় ভাগের এক ভাগ হইয়া থাকে। এই অনুপাতে প্রত্যেক গ্রহের উপর সূর্য্যের আকর্ষণ-বল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পদার্থ সকল ভারী বোধ হয় কেন?

মাধ্যাকর্ষণের জন্যই পদার্থ ভারী বোধ হয়। পৃথিবী সকল পদার্থকে নিজের দিকে টানিতেছে। কোন পদার্থ তুলিতে হইলে আমাদিগকে উহা জোরে উর্দ্ধে ঠেলিয়া রাখিতে হয়। এই নিমিত্তই কোন বস্তু তুলিতে ভারী বোধ হয়। সকল পদার্থের উপরেই মাধ্যাকর্ষণের সমান আকর্ষণ; অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ এক সের তুলা, এক সের লৌহ ও এক সের সোণাকে সমান বলে টানে।

ইহাতে আমাদের জিনিসের পরিমাণ করিবার সুবিধা হইয়াছে। আমাদের সোণা, রূপা, লোহা, সীসা ইত্যাদি যে কোন পদার্থ আবশ্যক হয় আমরা দাড়ি-পাল্লায় সেই পরিমাণের বাট্‌খারার সহিত মিলাইয়া লই। এইরূপ জিনিস পরিমাণ করাকে ওজন করা বলে।

জড়পদার্থ অন্য বলের সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীর আকর্ষণের বল অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্য যেখানে যে পদার্থ রাখা যায় সেই পদার্থ সেইখানেই থাকে; আবার জড় পদার্থ আপনা হইতে চলে না।

গতি ও বল।

কিম্বা চালাইয়া দিলেও আপনা হইতে থামিতে পারে না। যাহা দ্বারা গতি (Motion) উৎপন্ন হয় তাহাকে বল (Force) কহে।

কোন জড়পদার্থকে একবার চালাইয়া দিলে চিরকাল একই মুখে সরল পথে সমান বেগে চলিতে থাকে। যদি দেখা যায় বেগ বাড়িতেছে তবে বুঝিতে হইবে গতির (Motion) অনুকূল বল (Force) আরোপিত হইয়াছে। যদি দেখা যায় বেগ কমিতেছে, তবে বুঝিতে হইবে গতির বিপরীত অর্থাৎ প্রতিকূল বল ক্রিয়া করিতেছে।

উর্দ্ধে ঢিল নিক্ষেপ করিলে মাধ্যাকর্ষণের বল গতির প্রতিকূল হয়। এইজন্য ঢিলের বেগ ক্রমে কমিয়া যায় ও শেষে ঢিল পতিত হয়। কিন্তু ঢিল পতিত হইবার সময় মাধ্যাকর্ষণের বল অনুকূল, এই জন্য ক্রমে বেগ বৃদ্ধি পায়। আবার যদি দেখা যায়, কোন পদার্থ সোজা না গিয়া বাঁকা চলিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কোন বল পাশ হইতে গতির মুখ ফিরাইয়া দিতেছে।

দড়িতে ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইলে ঢিলটা সোজা পথেই ছুটিয়া যাইতে চায়। দড়ি ছাড়িয়া দিলে উহা সোজা পথেই ছুটিয়া যায়। হাতের বল উহাকে সোজা যাইতে না দিয়া কেবল গতির মুখ ফিরাইয়া দেয়। ঢিলটী সোজাপথে চলিতে না পারিয়া হাতের চারিদিকে ঘুরে।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহসকল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

গ্রহাদির সূর্য্য-প্রদক্ষিণের কারণ।

সকল গ্রহেরই প্রথমে নিজের একটা গতি ছিল। সূর্য্যের আকর্ষণে ধরা পড়াতে উহারা আর নিজ নিজ পথে যাইতে পারিতেছে না।

সূর্য্য আকর্ষণ-বলে গ্রহসকলকে স্বীয় কেন্দ্রে আনিতে চায়। আবার গ্রহসকল আপন বেগে সোজা পথে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য্যের বল আপন কেন্দ্রের দিকে, আর গ্রহদিগের বল সূর্য্যের বলের বিপরীত।

এই দুই কারণে গ্রহসমূহ সোজা পথেও যাইতে পারিতেছে না, আবার সূর্য্যের উপরে গিয়াও পড়িতেছে না। সূর্য্য কেবল উহাদের গতির মুখ ফিরাইয়া দিতেছে, তাই গ্রহসকল সূর্য্যের চারিদিকে রজ্জুবদ্ধ ঢিলের ন্যায় অনবরত ঘুরিতেছে। কোন কারণে যদি গ্রহদিগের বেগ কমিয়া যায় তাহা হইলে উহারা সূর্য্যের গায় গিয়া পড়িবে। আবার সূর্য্যের বল কমিলে গ্রহ সকল সোজা পথে চলিয়া যাইবে। সূর্য্যের সহিত আর উহাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। (চিত্র দেখুন)

সোজাসুজি ক খ দিকে গ্রহের নিজের গতি; সূর্য্যের কেন্দ্রের দিকে সূর্য্যের আকর্ষণ। গ্রহ ক খ পথে চলে না, ক ঘ পথেও চলে না, মাঝামাঝি ক গ পথে চলিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

গ্রহগুলি যে কারণে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে সেই কারণে উপগ্রহসকলও গ্রহগণের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর আকর্ষণ না থাকিলে, উহার চন্দ্র, সোজা পথে আপন বেগে চলিয়া যাইত। আবার চন্দ্রের বেগ না থাকিলে উহা এতদিনে একবারে পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িত। চন্দ্র পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে বড় সোজা ব্যাপার হইত না।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব ভগবানের বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অনন্ত আকাশের জগতের সকলপদার্থই অগণিত জ্যোতিষ্ক এই নিয়মের মাধ্যাকর্ষণের অধীন অধীন হইয়া চলিতেছে। কাহারও একটু অবাধ্য হইবার শক্তি নাই। বাস্তবিক ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।*

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

* লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "আকাশের গল্প" হইতে গৃহীত।

বনলতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। নবেম্বরের সুন্দর প্রাতঃকাল। বেলা নয়টা। সাতটার সময় ধর্ম্মমন্দিরে সাধারণ উপাসনার কাল, কিন্তু আজ নির্দ্ধারিত সময়ের দুই ঘণ্টা পরেও বিডফোর্ড-মন্দিরে উপাসনার আহ্বানসূচক ঘণ্টা বাজিতেছে। ঘণ্টাধ্বনিতেও আজ একটা বিশেষত্ব টের পাওয়া যাইতেছে। অন্য দিন অবিরাম শান্ত ধীর গতিতে বহুক্ষণ ঘণ্টা বাজিয়া যায়, আজ পাঁচ মিনিট পরে পরেই যেন কি এক উৎসাহে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছে। সহরের পথে পথে আজ আনন্দোৎসবের চিহ্ন। ক্ষুদ্র বৃহৎ পতাকায় রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ। নাবিক, নাগরিক, বালকবালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই

আজ উৎসব সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে ক্ষুদ্র সহরের পথে পথে চলিয়াছে। নদীতীরে জাহাজগুলিও পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহারা কামানধ্বনি করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছে। সহরের বড় লোকদের আস্তাবলগুলি ঘোড়ায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নানা স্থান হইতে অনেক বড়লোক আজ অশ্বারোহণে বিডফোর্ডে আসিয়াছেন।

সার রিচার্ড গ্রেনভিলের বাড়ীতে আজ ভোজের মহাঘটা। পান ভোজন, লোকের যাতায়াত, হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে বাড়ী সর-গরম হইয়া উঠিয়াছে। উপাসনা-মন্দির আজ উত্তর ডিভনের সম্ভ্রান্ত নরনারীতে পরিপূর্ণ। মন্দিরের সহকারী পুরোহিত শশব্যস্ত হইয়া পদমর্য্যাদা অনুসারে সকলকে যথাযোগ্য আসনে বসাইতেছেন। তরুণীদিগকে যে স্থান হইতে ভাল দেখা যায়, যুবকেরা বাছিয়া বাছিয়া সেই স্থানগুলি অধিকার করিয়াছে। হঠাৎ দূরে বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। তুরীভেরী বিউগেলের বাদ্য ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মন্দির-দ্বারে আসিয়া বাদ্য থামিল। অদ্যকার উৎসবের যিনি নায়ক তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। পুরোহিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসূচক উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

আজ বিডফোর্ডে এ আনন্দোচ্ছ্বাস কেন? উপাসনা মন্দিরে সকলেরই চক্ষু দৃঢ়কায় চারিটী নাবিকের উপর পতিত হইতেছে কেন? আর তাহাদের অগ্রবর্ত্তী অজাতশ্মশ্রু অথচ দীর্ঘাকার ভীমকায় যুবকের প্রতিই বা সকলের তৃষিত চক্ষু এমন ভাবে চাহিতেছে কেন? ধীরে ধীরে এই পাঁচ ব্যক্তি বেদীর নিকটবর্ত্তী হইলে সকলেরই চক্ষু অবনত-জানু মিসেস লে'র উপর পতিত হইল কেন?—কারণ তখনকার দিনে গ্রাম ও নগর সর্ব্বত্র পাড়াপ্রতিবেশীর সুখ দুঃখে পরস্পরের সহানুভূতি ছিল। ইংরেজ নাবিকদিকের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন তন্মধ্যে এই পাঁচজন ডিভন জিলাবাসী; ইঁহারা বিডফোর্ডের লোক। তাই আজ সমগ্র ডিভন, বিশেষ ভাবে বিডফোর্ড সহর আনন্দে মাতিয়াছে। সকলের অগ্রবর্ত্তী যুবকটিকে পাঠকপাঠিকা চিনিতে পারিলেন কি? ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত আমিয়াস লে। সকল কথা বুঝাইতে হইলে গত পাঁচ বৎসরের ঘটনা খুলিয়া বলিতে হয়।

অক্সেনহামের সমুদ্রযাত্রার পর এক বৎসর আমিয়াসের ভাল ভাবেই কাটিয়াছিল। অবশ্য পড়া শুনায় তাহার উন্নতি অল্পই হইয়াছিল। কিন্তু তীর-ছোড়া, ঘোড়দৌড়, তরোয়াল খেলা এ সকলে তাহার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ কাছারীতে একদিন কম্প দিয়া তাঁহার পিতার কঠিন জ্বর হইল। সেই জ্বরের হাত হইতে তিনি আর নিষ্কৃতি পাইলেন না।

লে দম্পতির মধ্যে অতি গভীর ও পবিত্র দাম্পত্য প্রেম ছিল। মিঃ লে কতকটা খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতিতে একটা বিষণ্ণ ভাব বর্ত্তমান ছিল। কারণ, অবস্থা বৈগুণ্যে প্রথম জীবনে তাঁহাকে নানা ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতার অপব্যয়ে পূর্ব্ব পুরুষের সম্পত্তির অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৃথা মামলা মোকদ্দমায় মিঃ লে'র অবশিষ্ট অর্থও নিঃশেষিত-প্রায় হইয়াছিল। তিনি নানাগুণে ভূষিত ছিলেন, কিন্তু সেই গুণাবলী যদ্দ্বারা কাজে লাগান যাইতে পারে সেই শক্তিটি তাঁহার ছিল না। এইটির অভাবে, বিদ্বান, বীর ও বিচক্ষণ সভাসদ হইয়াও জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসর কাল তাঁহার বৃথাই কাটিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে রাজ্ঞী এলিজাবেথের জনৈক সহচরীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই মহিলাটিও সংসারের পাপ তাপের দৃশ্য দেখিয়া জীবনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে মিঃ লে'র ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কোন পুরুষ তাঁহা অপেক্ষা অন্য কোনও নারীর প্রতি অধিক অনুরক্ত হয় রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাহা সহিতে পারিতেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া সহচরী ও সভাসদকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা পরিণীত হইলেন। মিঃ লে দেখিলেন, তিনি পরম রত্নের অধিকারী হইয়াছেন।

মিসেস লে অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব, মহৎপ্রকৃতি ও অতি ধর্ম্মশীলা মহিলা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখেও প্রায়ই একটা বিষাদের ছায়া দেখা যাইত। কারণ, তাঁহার বাল্যকালের স্মৃতি বড় সুখের ছিল না। তখনকার দিনে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করা আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা প্রায় একই কথা ছিল। খ্রীষ্টান রাজ্য সমূহে তখন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতই প্রচলিত ছিল। ধর্ম্মসংস্কারক মার্টিন লুথার প্রচারিত প্রটেষ্টাণ্ট মত অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করিয়াছিল। রাজ্ঞী মেরীর রাজত্ব কালে কত ধর্ম্মপ্রাণ লোক ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছেন। মিসেস লে'র জননী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী ও পিতা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার অনেক সঙ্গিনী ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য রাজ্ঞী মেরীর রাজত্ব কালে অশেষ ক্লেশ সহিয়া জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আকুল প্রাণে প্রায়ই প্রার্থনা করিতেন, ঈশ্বর যেন তাঁহার জন্য এরূপ বিপদ না আনেন; আর যদিই বিপদ আসে, ভগবান যেন তাহা বহন করিবার শক্তি তাঁহাকে দেন। মিসেস লে'র পিতামাতার মধ্যে গভীর দাম্পত্য প্রেম ছিল. রোমান ক্যাথলিক স্বামীর সেই প্রেমেই পত্নী রক্ষা পাইয়াছিলেন। স্বামী নানা গুপ্তস্থানে স্ত্রী ও কন্যাকে লুকাইয়া রাখিতেন, কোন পুলিস কর্ম্মচারী পত্নীকে ধরিতে আসিলে তিনি ভয় দেখাইয়া বলিতেন, 'দেখ, আমি বিশ্বাসী রোমান ক্যাথলিক; আমার স্ত্রীকে যে ধরিতে চাহিবে, আমি তাহাকে খুন করিব।' বাল্যের সেই সকল কথা স্মৃতিতে উদয় হইয়া মিসেস্ লে'র মন প্রায়ই বিষাদে অভিভূত হইত। পিতামাতার জীবন্ত ধর্ম্মভাব কন্যা সম্পূর্ণ রূপেই লাভ করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর এই ধর্ম্মশীলা নারী স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেন। উভয়ের মিলিত জীবন বাস্তবিকই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-মন্দির হইয়া উঠিল। মিসেস লে স্বামী, সন্তান ও বিডফোর্ডের অসহায় ও দরিদ্রদের সেবায় এবং ঈশ্বরের আরাধনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন। কঠোর ধর্ম্মসাধনের জন্য তিনি অনেক সময় শরীরকে বড় নির্য্যাতন করিতেন।

চল্লিশ পার হইতে না হইতেই তিনি বিধবা হইলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য তখনও অক্ষুণ্ণ, জীবন্ত ধর্ম্মভাবে সেই সৌন্দর্য্যের উপর একটি পবিত্রতার আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রতি বাক্যে, প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে যেন সেই স্বর্গীয় ভাব ছড়াইয়া পড়ে। সংসার এই মাধুরী দেয় নাই, সংসারের শোক দুঃখ তাহা অপহরণ করিতেও পারিল না। এমন মেয়েকে শ্রদ্ধা না করিয়া, ভাল না বাসিয়া কে থাকিতে পারে? সার রিচার্ড গ্রেনভিল ও তাঁহার পত্নী মিসেস লে'কে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। সন্তানেরা মাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই আমিয়াস বুঝিতে পারিল, তাহাকে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে হইবে। এত দিন মাতাই শুধু তাহার কথা ভাবিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহাকেও মাতার কথা ভাবিতে হইবে। এক দিন স্কুল ছুটীর পর বাড়ী হইতে সে বরাবর সার রিচার্ড গ্রেনভিলের বাড়ী চলিয়া গেল। সার রিচার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সে তাঁহাকে বলিল, "এখন হইতে আপনাকে আমার পিতার স্থান অধিকার করিতে হইবে।" সার রিচার্ড বালকের দৃঢ়তাব্যঞ্জক প্রশস্ত মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; তার পর বলিলেন, "জীবনের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য এবং তোমার মাতার প্রতি ভ্রাতার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।"

সার রিচার্ডের পত্নী আমিয়াসের হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়ী চলিলেন। মিসেস লে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমিয়াসের কথা বলিয়া দুজনে কিছুক্ষণ পরস্পরের গলা ধরিয়া কাঁদিলেন। শোকে, বিপদে পূর্ব্ব বন্ধুত্ব আরো গাঢ়তর হইল।

আমিয়াসের শিক্ষা পূর্ব্ববৎই চলিতে লাগিল। সে অনেক সময় সার রিচার্ডের সঙ্গে বন্দরে বেড়াইতে যাইত। অশ্বারোহণ, শিকার, কুস্তী এ সকলের প্রতিই তাহার বেশী ঝোঁক,—এই শিক্ষাই ভাল করিয়া চলিতে লাগিল। জননীর প্রাণের ইচ্ছা ছিল, আমিয়াসও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় সাহিত্য ও সুকুমার বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ

করে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা স্বতন্ত্রমুখী দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফ্রাঙ্ক প্রতিভা বলে প্রথমে স্কুলে, পরে কলেজে সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। পরজীবনে-সুবিখ্যাত সার ফিলিপ সিডনির সহিত ছাত্রাবস্থায় তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ফ্রাঙ্ক জার্ম্মেনীর একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। সেই-খানে জার্ম্মেনীর দুইটি রাজকুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তিনি নিজ প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেই উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি অনেক বড় বড় লোকের সংস্পর্শে আসেন এবং সকলেই তাঁহার বিদ্যাবত্তা, নির্ম্মল ও বিনয়-মধুর চরিত্রে বিমুগ্ধ হন। তৎপর রাজকুমারদিগের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিবার জন্য ফ্রাঙ্ক তাহাদিগকে লইয়া ইটালি গমন করেন। ইটালি বিবিধ বিদ্যার জন্য বিখ্যাত; তিনি আকণ্ঠ পূরিয়া সেখানকার জ্ঞানসুধা পান করেন। তিনি গ্যালিলিও প্রভৃতি ইটালীর প্রধান প্রধান পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় স্থাপন করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি ইটালি হইতে জার্ম্মে-নীতে ফিরিয়া যান। এখানে রাজকুমারদিগের পিতা বিবিধ উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে বিদায় করেন। মিসেস লে ফ্রাঙ্কের পত্রে এই সংবাদ পাইয়া আশা করিয়াছিলেন, বিদেশগামী পুত্র এত দিন পরে বুঝি তাঁহার বুকে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা হইল না। মিঃ লে'র মৃত্যুর কয়েক দিন পর পিতার নামে তাঁহার এক সুদীর্ঘ পত্র আসিল। তিনি তাঁহার বিবিধ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া শেষে লিখিয়া-ছেন, জনৈক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর অনুরোধে অধিকতর অভি-জ্ঞতা লাভের জন্য তিনি হাঙ্গেরী দেশে গমন করিতে-ছেন। এই পত্রের পর তিনি নানা স্থান হইতে পিতাকে আরো অনেক পত্র লিখিলেন, কিন্তু দুই-বৎসরের মধ্যে কোন পত্রেরই উত্তর পাইলেন না। তখন তাঁহার আশঙ্কা হইল, বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, অনেক দিন হইল পিতা পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, ভ্রাতা আমিয়াস কাপ্তেন ড্রেকের সঙ্গে দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়াছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের পরও তিনি বেশী দিন বাড়ী থাকিতে পাই-লেন না। অলসতাকে সার রিচার্ড পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে তিনি ফ্রাঙ্ককে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজসভায় প্রেরণ করি-লেন।

মধুর চরিত্র, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কমনীয় সৌন্দর্য্যের গুণে অল্পদিন মধ্যেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সভাসদ রূপে গণ্য হইলেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইলেন। অল্পকাল পরেই ফ্রাঙ্কের মাতাকে রাজ্ঞী স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন, যে মিসেস লে তাঁহার পুত্রকে রাজসভায় প্রেরণ করিয়া রাজ্ঞীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ফ্রাঙ্কের অশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া তিনি লিখিলেন, অচিরেই তিনি তাঁহার এই ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিবেন। ফ্রাঙ্কের জননী দেশের রাজ্ঞীর নিকট হইতে পুত্র সম্বন্ধে এইরূপ পত্র পাইয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইলেন। পরমেশ্বরের চরণে তিনি কৃতজ্ঞতার অশ্রু উপহার দিলেন।

কিন্তু আমিয়াস দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়াছেন কেন? তাহার দুইটী কারণ ছিল। এই দুই শ্রেণীর কারণই বহু যুবকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ১ম—একজন শিক্ষকের সহিত কলহ; ২য়—একটি তরুণী সুন্দরীর প্রতি আকর্ষণ।

মিঃ ভিণ্ডেন্স তখন বিডফোর্ড স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বেশ ধার্ম্মিক ও সৎ লোক। কিন্তু সেকালের শিক্ষকগণ শারীরিক দণ্ডদানে বড়ই পটু ছিলেন। আমিয়াসের পিতার মৃত্যুর পর মিঃ ভিণ্ডেন্সের মনে হইল, এই পিতৃহীন বালক সম্বন্ধে এখন অধিক যত্ন লইতে হইবে। অধিকসংখ্যক বেত্রাঘাতের ব্যবস্থায় এই যত্নের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল।

আমিয়াস একদিনের জন্যও মন হইতে সমুদ্র-যাত্রার চিন্তা দূর করিতে পারে নাই। অনেক সময় সে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইত,—তাহার মনে হইত, সমুদ্র যেন তাহাকে 'আয় আয়' বলিয়া ডাকিতেছে, সুদূর অনন্তে

তরণী ভাসাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। স্কুলে আসিয়াও সে অনেক সময় অঙ্ক না কসিয়া, শ্লেটে জাহাজ আঁকিত, আর সমুদ্রের নক্সা তৈয়ার করিত।

একদিন অপরাহ্নে আমিয়াস শ্লেটে সমুদ্রের মাঝে একটা কল্পিত দ্বীপ আঁকিতেছিল। জাহাজে করিয়া আমিয়াস ও তাহার ছাত্রবন্ধুগণ সেই সমুদ্রের নিকট গিয়াছে। মিঃ ভিগুেক্সের চেহারা আঁকিয়া তাহার নীচে লেখা হইয়াছে, তিনি তীর হইতে ডাকিতেছেন, "তোমরা ফিরিয়া এস।" ছাত্রগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখা হইয়াছে, "মাষ্টার মহাশয়, বিদায়! বিদায়!!" এই ছবি দেখিবার জন্য ছাত্রেরা সকলে আমিয়াসের শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষক তখন নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ছাত্রদের কোলাহলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত গোল কিসের?" ছাত্রেরা সকলে নীরব, কোন উত্তর নাই।

শিক্ষক তখন বলিলেন, "তোমার কাণ্ড আমিয়াস্! এস, তোমার অঙ্ক দেখাও!"

আমিয়াস তখন মিঃ ভিগুেক্সের দাড়ি গোঁফ আঁকিতেছিল, সে উত্তর করিল, "আগে কাজ শেষ হইয়া যাক্, যথাসময়ে দেখাব।"

শিক্ষক বলিলেন, "আরে দুষ্ট ছেলে! হতভাগা আবার বল্‌ছে, যথা সময়ে দেখাব?"

আমিয়াস উত্তর না দিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল। শিক্ষক আরও রাগিয়া বলিলেন, "শীগগির আন্, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আজ তোর পিঠের চাম্‌ড়া তুল্‌ব!"

আমিয়াস ধীর ভাবে উত্তর করিল, "আর একটু অপেক্ষা করুন মশায়, এই হল বলে।"

মিঃ ভিগুেক্স লাফাইয়া আমিয়াসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার শ্লেটের দিকে চাহিয়া, "এ কিরে নচ্ছার বাঁদর!" বলিয়াই চাবুক তুলিলেন।

শান্ত-ভাবে, প্রসন্ন মুখে আমিয়াস উঠিয়া দাঁড়াইল। সবেগে তাহার শ্লেটখানি মিঃ ভিগুেক্সের টাকপড়া মাথার উপর পতিত হইল। শ্লেট ও মাথা দুই-ই এক সঙ্গে ভাঙ্গিল। মিঃ ভিগুেক্সের চেতনাহীন দেহ ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল।

আমিয়াস ধীরে ধীরে স্কুলের বাহির হইয়া গেল। বাড়ী গিয়া মাকে বলিল, "মা, আমি শিক্ষকের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়াছি।"

মিসেস্ লে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কিরে হতভাগা, মাথা ভাঙ্গিয়াছিস্? কেন কি হয়েছিল?"

"তা আমি জানি না। মাথাটা এমন মসৃণ, এমন টাক্‌পড়া—খালি, আর গোল, যে আমি তা না ভেঙ্গে থাক্‌তে পারলাম না।"

"হায়, হায়! সর্ব্বনাশ করেছিস্‌রে হতভাগা, সর্ব্বনাশ করেছিস্! তিনি কি বেঁচে আছেন, না একবারেই মেরে ফেলেছিস্?"

"না, তিনি মারা গেছেন ব'লে ত বোধ হয় না; যে শক্ত তাঁর মাথা, বাবা! এখন আমি স্যর রিচার্ডের কাছে যাই, তাঁকে গিয়ে সকল কথা খুলিয়া বলি।"

মিসেস্ লে বড়ই ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই বিপদেও আমিয়াসের এমন শান্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া পুত্রকে তিনি তাহার ধর্ম্মপিতার নিকটেই পাঠাইয়া দিলেন।

আমিয়াস সার রিচার্ডের নিকট যাইয়া ঠিক একই ভাবে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিল। সার রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি করিতে চাহিয়াছিলেন?"

আমিয়াস। আমাকে চাব্‌কাইতে চাহিয়াছিলেন, কারণ, আমি অঙ্কটা কসিতে না পারিয়া শ্লেটে তাঁহার একটা ছবি আঁকিয়াছিলাম।

সার রিচার্ড। কি? তুমি চাবুক খাইতে ভয় পাইয়াছিলে?

আমিয়াস। বিন্দুমাত্র না। তা ছাড়া ওটাত আমার নিত্য কর্ম্ম! কিন্তু আমি আজ বড় ব্যস্ত ছিলাম, আর তিনিও অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আপনি যদি অমন টাকপড়া মাথা দেখিতেন, আপনারও তা ভাঙ্গ্‌তে ইচ্ছা হইত।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সার রিচার্ডও তাঁহার শিক্ষক এই মিঃ ভিগুেক্সেরই পিতার মস্তক ঠিক এইরূপেই

ভাঙ্গিয়াছিলেন। সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "আমিয়াস, যাহারা আদেশ পালন করিতে পারে না, তাহারা কখনও অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তুমি যদি এখন শাসন মান্য করিয়া চলিতে না শেখ তবে অধীনস্থ সৈন্যদল বা জাহাজের নাবিকদিগকে কখনই শাসনে রাখিতে পারিবে না। বুঝ্‌তে পাচ্ছ?"

আমিয়াস। আজ্ঞে হাঁ।

সার রিচার্ড। তবে এখনই স্কুলে ফিরিয়া যাও এবং শাস্তি গ্রহণ কর।

"আজ্ঞে আচ্ছা," এই বলিয়া আমিয়াস বাহির হইল। এত সহজে সার রিচার্ডের হাতে নিষ্কৃতি পাইবে, আমিয়াস কখনই তাহা আশা করে নাই।

কথোপকথনের সময় সার রিচার্ড অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন। আমিয়াস বাহির হওয়া মাত্র হাসিতে হাসিতে তাঁহার নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

আমিয়াস স্কুলে ফিরিয়া গেল। তখন মিঃ ভিণ্ডেক্সের মাথায় পটি বাঁধা হইয়া গিয়াছে। তিনি আমিয়াসকে দেখিয়া খুবই খুসী হইলেন এবং মনের আনন্দে তাহাকে এমন চাবুকই লাগাইলেন, যে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আমিয়াস তাহার ব্যথা ভুলিতে পারিল না।

সেই দিনই সায়ংকালে সার রিচার্ড মিঃ ভিণ্ডেক্সকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কম্পিত কলেবরে বেচারা সার রিচার্ডের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সার রিচার্ড বলিলেন, "মিঃ ভিণ্ডেক্স, শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি, যে আমার ধর্ম্মপুত্র আজ আপনার প্রতি বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। এই নিন পাঁচটি টাকা ডাক্তারকে দিবেন।

শিক্ষক। ওঃ সার রিচার্ড! কি শক্ত আঘাতই করেছে! তা আমিও উপযুক্ত শোধ নিয়েছি। আচ্ছা করে তাকে চাবকাইয়া দিয়াছি, আর খুব কঠিন কঠিন আঁক কসিয়া নিতে দিয়াছি। কিন্তু মহাশয়, ওর লেখাপড়া কিছুই হবে না। ওর স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্ব্বল। ওদিকে খুব সাহসী আর বলবান বটে, কিন্তু পড়াশোনায় আর উন্নতির আশা মোটেই নাই। ওকে এখন স্কুল ছাড়াইয়া লইলেই ভাল হয়। আর এখন হইতে ওকে দেখিলেই ত আমার ভাঙ্গা মাথায় ব্যথা আরম্ভ হবে। সেদিন আমার ছেলে জ্যাককে আমিয়াস পুড়াইয়া মারিয়াছিল আর কি! কোন্ দিন সে কাকে খুন করিয়া বসে আমার এই ভয়। বিডফোর্ডে এমন ছেলে নাই যাকে সে না মারিয়াছে। এখন দেখিতেছি, ভিন্ন গ্রামের লোককেও মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন শুনিলাম, পাশের গ্রামের একটী যুবককে সে আচ্ছা করিয়া মারিয়াছে। যুবকটি বয়সে আমিয়াস অপেক্ষা অনেক বড়। তার অপরাধ—সে বলিয়াছিল, তাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে এমন সুন্দরী যে সারা বিডফোর্ডে খুঁজিলেও তার মতন সুন্দরী মিলিবে না। শুধু এই কথাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া আমিয়াস বেচারাকে কাদায় চুবাইয়া আধমরা করিয়া ছাড়িয়াছে, আর বলিয়াছে, "আমাদের মেয়রের (নগর-রক্ষক) কন্যা কুমারী রোজ সল্টার্ণ অপেক্ষা অন্য কোন মেয়েকে যে সুন্দরী বলিবে, তারই এই দশা করিব।"

সার রিচার্ড গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনি কার কাছে একথা শুনিলেন?"

শিক্ষক। আমার ছেলে জ্যাকের নিকট শুনিয়াছি।

সার রিচার্ড। আপনার ছেলেকে আমিয়াস পুড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল. কিন্তু পুড়াইলেই ঠিক হইত। পুত্রটিকে বুঝি গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত করিয়াছেন? কোন্ ছেলে কোথায় কি করে তাহা দেখাই বুঝি তার কর্ম্ম? ছেলেটির মাথা দেখিতেছি ভাল করিয়াই খাইয়াছেন।

সার রিচার্ডই ছিলেন স্কুলটির কর্ত্তা, তাঁহার বিরক্তি দেখিয়া শিক্ষক মহাশয়ের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

সার রিচার্ড বলিলেন,—"মিঃ ভিণ্ডেক্স, প্রতিজ্ঞা করুন, যে আমাদের মধ্যে আজ যে কথা হইল, তাহা আর কাহারো নিকট বলিবেন না, এবং আপনি বা আপনার পুত্র কেহই কুমারী রোজের নামের সহিত আমার ধর্ম্মপুত্রের নামোচ্চারণ করিবেন না—যদি কখনো করেন তবে—"

সার রিচার্ডকে বাকীটুকু আর বলিতে হইল না। কাঁপিতে কাঁপিতে নতজানু হইয়া মিঃ ভিণ্ডেক্স বলিলেন, "রক্ষা করুন মহাশয়, রক্ষা করুন। আপনি প্রভু, আমি ভৃত্য, আপনি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র, আপনি ঈগল, আমি ইঁদুর। আমার প্রতি দয়া করুন, আমার বৃদ্ধ বয়স, নয়টি সন্তান, তা'র ৮টিই কন্যা। আমাকে প্রাণে মারিবেন না।"

সার রিচার্ড। আপনার সেই হতভাগা ছেলেটার বয়স কত?

শিক্ষক। আজ্ঞে ষোল বছর, কিন্তু এতে তার দোষ নাই।

সার রিচার্ড। ষোল বছর, তবুও তাকে অক্সফোর্ডে পাঠান নাই কেন?

শিক্ষক। আজ্ঞে—এতে তার দোষ নাই, অবস্থার জন্য পাঠাইতে পারি না।

সার রিচার্ড। আচ্ছা আপনি উঠুন, বসুন। আমি তাকে অক্সফোর্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।

শিক্ষক। ধন্যবাদ মহাশয়, ধন্যবাদ! আমি তবে এখন বিদায় হই?

সার রিচার্ডকে অভিবাদন করিয়া মিঃ ভিণ্ডেক্স সবেগে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সিংহের গ্রাস হইতে যেন মৃগ মুক্তিলাভ করিল।

এই ঘটনার পর আমিয়াসও মিঃ ভিণ্ডেক্সের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল। তিন বৎসরের জন্য কাপ্তেন ড্রেকের সহিত সে সমুদ্র যাত্রা করিল।

বিজয়মাল্য পরিধান করিয়া তিন বৎসর পরে আমিয়াস ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই আজ বিডফোর্ডে এত আনন্দ উৎসব। তাই আজ সহরময় ধূমধাম। কত তামাসা, কত প্রকার অভিনয়েরই না বন্দোবস্ত হইয়াছে! উপাসনার পর সমবেত নরনারী সেই সকল অভিনয় দর্শন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলেন।

সার রিচার্ড, নগরাধ্যক্ষ মিঃ সল্টার্ণ ও অপর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উৎসবের নায়ক আমিয়াস ও তাহার সঙ্গী চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলেই আজ তাহাদের হস্তগ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিতে ব্যস্ত। শুধু তাহাদিগকে নয়, তাহাদের পিতা-মাতাকেও সকলেই অভিবাদন করিয়া তাহাদের আনন্দে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। মিসেস লে তাহাদিগকে বলিলেন, "চল বাছারা, চল, ঈশ্বর তোমাদিগকেও এমন পুত্র দান করুন, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

একটি শীর্ণদেহ বৃদ্ধা ভিড়ের মাঝখান হইতে বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বর আমাকে আমার ছেলে ফিরাইয়া দিন্।" —হঠাৎ আমিয়াসের হাত জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধা বলিল, "দয়ালু মহাশয়, দরিদ্র বৃদ্ধার কথায় একটু কাণ দিবেন কি?"

আমিয়াস। কি কথা বাছা?

বৃদ্ধা। আপনি কি "ইণ্ডিজে"* আমার পুত্র সেলভেসনকে দেখিয়াছেন?

আমিয়াস। সেলভেসন? —নামটী আমিয়াসের সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হইল না।

বৃদ্ধা। আজ্ঞে হাঁ, ক্লভেলি গ্রামের সেলভেসন ইয়ু। বেশ লম্বা চেহারা, কথায় কথায় শপথ করিবার অভ্যাস; —ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করুন।

আমিয়াসের এখন স্মরণ হইল, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই সেলভেসন ইয়ুই তাহাকে নক্সা-অঙ্কিত মহিষের শিং উপহার দিয়াছিল। আমিয়াস বৃদ্ধাকে বলিল, "দেখ বাছা, ইণ্ডিজ ত ক্ষুদ্র স্থান নয়, যদিও আমি তাকে দেখি নাই, সে হয়ত কোথাও নিরাপদে সুখে আছে। আমি এক সেলভেসন ইয়ুকে জানিতাম; কিন্তু তার ত কাপ্তেন অক্সেনহামের সঙ্গে ফিরিয়া আসিবার কথা! আচ্ছা ধর্ম্মপিতা, ভাল কথা মনে হইল; মিঃ অক্সেনহাম ফিরিয়া আসিয়াছেন ত?

সার রিচার্ড বিষণ্ণ ভাবে উত্তর করিলেন, "না আমিয়াস, তিনি গিয়াছেন পর তা'র আর কোনও খবরই পাওয়া যায় নাই।"

আমিয়াস। সার রিচার্ড, আপনিই আমাকে তাঁর সঙ্গে যাইতে দেন নাই। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে

* আমেরিকার পূর্ব্বদিকস্থ দ্বীপগুলির নাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, সাধারণতঃ ইণ্ডিজ বলা হয়।

একথাটি জানিলে, আর একটি করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারিতাম।

মিসেস্ লে বলিলেন, "বাছা, সারা জীবন ধরিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ কর।"

আমিয়াস। আর তাঁর কোনও খবরই পাওয়া যায় নাই?

সার রিচার্ড। না, কোনও খবরই না। তবে কাপ্তেন বেকার ইণ্ডিজ হইতে ফিরিবার সময় একখানি স্পেনীয় জাহাজ হইতে অক্সেনহামের পিত্তলের কামান দুইটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। স্পেনীয়েরা নোম্বার-ডি-ডিয়ো হইতে তাহা কিনিয়াছিল, তার বেশী তা'রা আর কিছু বলিতে পারিল না।

বৃদ্ধা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ গো, হাঁ, তা'রা কামান ফিরাইয়া আনিয়াছে, কিন্তু আমার ছেলেকে ফিরাইয়া আনিল না!"

সার রিচার্ড বলিলেন, "তা'রা তোমার ছেলেকে দেখিতেই পায় নাই মা!"

বৃদ্ধা। কিন্তু আমি চারি বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নে তাকে দেখেছি। বাছা আমার একটা পাহাড়ের উপর পড়িয়া 'জল জল' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। হায় বাছা সেলভেসন!

বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল! মিসেস্ লে তাহাকে একটি টাকা দিলেন, আরো কয়েক জন কিছু কিছু অর্থ দিলেন। বৃদ্ধা তাহা গ্রহণ করিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "কিন্তু হায়, টাকা দিয়া কি আমি আমার ছেলে পাব? মহাশয়, দয়ালু আমিয়াস, আপনি দয়া করিয়া আজ আমার নিকট একটি প্রতিজ্ঞা করুন—ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনি বলুন, ইণ্ডিজে আমার ছেলের দেখা পাইলে তাহাকে আপনি সঙ্গে করিয়া আনিবেন। অনাথা বিধবা আপনাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

আমিয়াস প্রতিজ্ঞা করিলেন। তারপর সকলে অভিনয় স্থলে চলিলেন। কিন্তু অক্সেনহামের কথায় সকলেরই মনটা ভারাক্রান্ত হইল। ধীরে ধীরে তাঁহারা অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। আমিয়াসের দাদা ফ্রাঙ্ক এই অভিনয়ের কর্ত্তা; তিনিই সকলকে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছেন। আমিয়াসের চক্ষু কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্যেও অতৃপ্ত ভাবে একখানি সুন্দর মুখ খুঁজিতেছিল। দীর্ঘকাল পর গৃহে ফিরিয়া আমিয়াস বুঝি মাকে দেখিবার জন্যও এত ব্যস্ত হয় নাই! আমিয়াস ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কুমারী রোজ সল্টার্ণকে এখানে দেখিতেছি না কেন, সে কোথায়?"

ফ্রাঙ্ক উত্তর করিলেন, "সে ত সহরে নাই! তার মাসীর বাড়ী গিয়াছে।"

আসল কথাটা এই:—ফ্রাঙ্ক কয়েকদিন পূর্ব্বে রোজকে অভিনয়ে যোগ দিতে এবং প্রধান অভিনেত্রীর অংশ অভিনয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রোজ ইহাতে আপত্তি করে নাই, কারণ এমন উৎসবে আবৃত্তি বা অভিনয় করিয়া সকলের বাহবা লইতে অথবা ফ্রাঙ্কের মত সর্ব্বগুণান্বিত সুদর্শন যুবকের নিকট অভিনয় শিক্ষা করিতে তাহার আপত্তির কোন কারণ ছিল না। কিন্তু রোজের পিতা তাহাতে বাদ সাধিলেন। রোজের কান্নাকাটি সত্ত্বেও তিনি তাহাকে দূরে তাহার মাসীর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সে দিনই অপরাহ্ণে রোজের পিতা আমিয়াসদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইয়া কথা প্রসঙ্গে মিসেস লে'কে বলিলেন, "আমি অকুলীন লোক, আপনারা হইলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়। কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়া আপনার ছেলেকে আমার মেয়ে গছাইয়া দিয়াছি, লোকের এই মন্তব্য শুনিতে আমি প্রস্তুত নই। আপনি সম্রাজ্ঞী হইলেও আমি তাহাতে প্রস্তুত হইতাম না।"

মিসেস লে বলিলেন, "মিঃ সল্টার্ণ, আপনাকে আপনার কন্যার ভাবনা ভাবিতে হইবে না। দশ মাইলের মধ্যে যত ভাল ভাল ছেলে আছে আপনার মেয়ের জন্য সকলেই পাগল!"

মিসেস্ লে একটুকুও অতিরঞ্জিত করিয়া বলেন নাই। রোজ এখন অষ্টাদশ বৎসরের তরুণী। তাহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য দেশের বড় বড় ঘরের

উপযুক্ত যুবকেরা পাগল। কে তাহাকে লাভ করিবে, এজন্য দেশের অবিবাহিত যুবকদলের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। এমন সময় আমিয়াস তিন বৎসর পর দেশে ফিরিয়া আসিল। এই তিন বৎসর কাল শয়নে স্বপনে সে রোজের কথাই ভাবিয়াছে। তাহার পবিত্র অন্তর কুমারী রোজই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, কারণ মা ছাড়া তাহার ভাবনার পাত্রী আর কেহ ছিল না।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বোম্বাইয়ে মুসলমান স্কুল ইনস্পেক্‌ট্রেস্—মুসলমান সমাজে বালকদিগের শিক্ষা যেমন প্রসার লাভ করিতেছে বালিকাদিগের শিক্ষারও তেমনি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে মুসলমানগণ যেমন রক্ষণশীল, বোম্বাই অঞ্চলের মুসলমানগণ তেমন নহেন। কুমারী ফৈজী নাম্নী জনৈক শিক্ষিতা মুসলমানমহিলা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিয়া শিক্ষাদান প্রণালীতে শিক্ষিতা হইয়া আসিয়াছেন। বঙ্গদেশে জনৈক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী মুসলমান বালিকা ব্যতীত আর কোন মুসলমান বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে উচ্চ বংশীয়া কয়েকটি মুসলমানমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাই লাট সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত রফিউদ্দিন আহম্মদের কন্যাকে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের মুসলমান বালিকাবিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্‌ট্রেস্ নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই ইনস্পেক্‌ট্রেস্ মহোদয়ার চেষ্টায় বোম্বাই মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা দিন দিন অধিকতর উন্নতিলাভ করিবে।

বঙ্গদেশের মুসলমান-সমাজে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য একজন ইনস্পেক্‌ট্রেস্ নিয়োগ করা কি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে? আমাদের মনে হয়, ইহাদ্বারা মুসলমান-সমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই কার্য্যের জন্য মুসলমান মহিলা না পাইবারই কথা, সুতরাং অন্য ধর্ম্মাবলম্বিনী কোন্ মহিলাকে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

প্লেগের ঔষধ—পঞ্জাব, লুধিয়ানার নিকটবর্ত্তী উমেদপুর নামক স্থানের মুক্তিফৌজের শুশ্রূষাকারিণী শ্রীমতী মেক্‌কার্ডি জানাইয়াছেন যে, তিনি আইয়োডিন সাহায্যে ৫১ জন মধ্যে ৫০ জন প্লেগ রোগীকে এবং মুক্তিফৌজেরই অন্য একজন কর্ম্মচারী এই ঔষধের দ্বারাই ৬০ জন রোগীর মধ্যে ৫৬ জনকে আরোগ্য করিয়াছেন। যাহারা মারা গিয়াছে তাহারাও, রোগ সাংঘাতিক হইবার পর চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল; নতুবা খুব সম্ভবতঃ তাহারাও আরোগ্য লাভ করিত। ব্যবহার প্রণালীঃ—প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা টিংচার আইয়োডিন পরিষ্কার জলের সহিত মিলাইয়া সেবন করিতে হইবে এবং ফোলা গ্রন্থিতে অবিরাম আইয়োডিনের প্রলেপ দিতে হইবে।

বোম্বাই হিন্দু বিধবাশ্রম—বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পুনাতেই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হিন্দু বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই সহরে আর একটি হিন্দু বিধবাশ্রমের ভিত্তি প্রোথিত হইয়াছে। গবর্ণর-পত্নী ভিত্তি প্রোথিত করিয়াছিলেন। এই আশ্রমটির ইতিহাস এইঃ—ছয় বৎসর পূর্ব্বে বাই নানিবেহান গাজ্জর ও বাই বাজিগৌরী মুন্সী নাম্নী দুইটি উৎসাহশীলা পরোপকারিণী মহিলা অতি সামান্য ভাবে সুরাট নগরে একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম তিন বৎসর আশ্রমটি অতি সামান্য ভাবেই চলিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে আশ্রমের প্রতি লোকের বিশ্বাস স্থাপিত হইতে লাগিল। ৬ষ্ঠ বৎসরে (১৯১২) আশ্রমের অধিবাসিনীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২১২ জন। বোম্বাইয়ের কয়েকজন সমাজহিতৈষী নেতা বোম্বাই সহরে একটি বিধবাশ্রম স্থাপনের জন্য ১৯০৯ সনে একটি সভা আহ্বান করেন; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু বাই জাভেরবাই ভগবান দাস নাম্নী একটি ধনাঢ্য বিধবা মহিলার প্রাণ তাঁহার দুঃখিনী ভগিনীদের জন্য কাঁদিল, সুরাটের বনিতাবিশ্রামের

(বিধবাশ্রমের নাম) দৃষ্টান্তে তিনি অন্তরে বল পাইলেন এবং একটি আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য এক কালীন পঞ্চাশ সহস্র টাকা দান করিলেন। গৃহ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিতে আরও ত্রিশ হাজার টাকা আবশ্যক, কিন্তু বোম্বাইয়ের মত দানশীল প্রদেশে এই টাকার নিশ্চয়ই অভাব হইবে না। ভিত্তি স্থাপন কালে লাটপত্নী যে কথা কয়টি বলিয়াছিলেন তাহা বড়ই সুন্দর। তিনি বলিয়াছিলেন :—"শোকের আঘাত আমরা কি করিয়া গ্রহণ করি তাহাদ্বারা আমাদের চরিত্রের মূল্য বুঝিতে পারি। সুরাট ও বোম্বাইয়ের বনিতাবিশ্রামের প্রতিষ্ঠাত্রীগণের দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই অনুকরণীয়। আমাদের অপেক্ষা যাহারা অধিকতর শোকাতুর ও বেদনাগ্রস্ত তাহাদের ক্লেশ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করাই শোককে গ্রহণ করিবার প্রশস্ত উপায়। অপরের বিষাদ-কালিমা মোচন করিবার প্রয়াসে আমরা নিজের শোক ভুলিয়া যাই এবং অন্তরে আমাদের অজ্ঞাতসারে এমন বল লাভ করি যদ্দ্বারা আমরা ক্রমেই জগতের কাজে বেশী করিয়া লাগিতে পারি।"

কুমারী ডরোথি বীল—ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যে সকল মহিলা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, কুমারী ডরোথি বীল তন্মধ্যে এক জন প্রধান। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার চিত্র প্রকাশ করিলাম, আগামী সংখ্যায় তাঁহার জীবন-চরিত প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়—কয়েক দিন হইল, টাউন হলে কলিকাতার অন্ধ বিদ্যালয়ের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে ৪০টী অন্ধ বালকবালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। বিগত বর্ষের প্রারম্ভে ২৯টী বালক এবং ৬।৭টী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছিল। বিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণ নানারূপ বাঁশের ঝুড়ি, বসিবার আসন, চিক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে। অর্দ্ধেক বালকবালিকাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত অনেকেই অঙ্ক, ভূগোল ও সাহিত্যে সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিগত বর্ষে লর্ড কারমাইকেল ৩০০৲, মিং ম্যাডান তাঁহার বায়োস্কোপ প্রদর্শনের আয় হইতে ২৫১৲, বেল-ভেডিয়ার মেলার কর্ত্তৃপক্ষ ১০০০৲, মিঃ এস, পি, সিংহ ১০০০৲ প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এই উৎসব সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "একমাত্র কলিকাতায় ৮০০ এবং সমস্ত বাঙ্গলা দেশে ২০,০০০ অন্ধ আছে। এতগুলি অন্ধ লোকের পক্ষে একটি বিদ্যালয় যথেষ্ট নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি গার্ডনার নামক কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইংলণ্ডের অন্ধদের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা দান করেন। আমি আশা করি, বাঙ্গলা দেশ এই ২০ হাজার লোককে মানুষ করিবার উপযোগী শিক্ষা প্রদানে যত্নবান্ হইবেন এবং সাধারণ শিক্ষা ও কারখানার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য দুইটি এবং অক্ষম ও বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য আর একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।" লর্ড কারমাইকেল বলিয়াছেন, "অন্ধ বালকদিগকে প্রকৃত ভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য ইংলণ্ড হইতে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আনয়ন করা উচিত হইবে না, কারণ এ দেশীয় লোকের ভাষা না জানিলে কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। ইংলণ্ডের অন্ধ বালকদিগের শিক্ষাপ্রণালী ও কারখানা প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আপনারা যদি কাহাকেও প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে সাহায্য করিব এবং শিক্ষক প্রস্তুতের জন্য আগামী ২ বৎসর কাল প্রতি বর্ষে ৭৫০ টাকা করিয়া প্রদান করিব।"

বর্ত্তমান উৎসব সভায় লর্ড কারমাইকেল ২৫০০, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ২৫০ এবং পারস্যের রাজদূত ১০০ টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

পুত্রকন্যাসহ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩২০ | ৩য় সংখ্যা।

ডোরোথী বীল্।

(১)

যে সকল মহিলা ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য "তনুমনধন্" ঢালিয়া দিয়াছিলেন, কুমারী ডোরোথী বীল্, তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। বিধাতা তাঁহাকে অসাধারণ শক্তি দিয়াছিলেন, তিনি প্রাণপণ যত্নে সেই শক্তি সুবিকশিত করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। একজন মহিলার দেহ মনের শক্তি যে কত গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার বহন করিতে পারে, কত বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিতে পারে এবং কি প্রকারে শুষ্ক মরুভূমিতে কনক-পদ্ম ফুটাইয়া তুলিতে পারে, ইঁহার জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন, ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার আবার কি? সে ত শিক্ষিতা নারীরই দেশ। কিন্তু আসল কথাটা এই, ইংরাজ মহিলাগণের শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও নিতান্তই হীন ছিল। সেখানেও নারীজাতির শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। কুমারী বীল্ এবং আরও কয়েকজন মনস্বিনী মহিলার জীবনান্ত পরিশ্রমে এবং কয়েকজন উদার-হৃদয় পুরুষের সহায়তায় ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কুমারী বীলের জীবন-বৃত্তান্ত ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস বিশেষ।

আমাদের দেশের পক্ষে এরূপ জীবনের শিক্ষা বড়ই প্রয়োজনীয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য জীবন দিতে গিয়া ইঁহাকে কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিতে হইয়াছে, কত ত্যাগ-

স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং কত তর্কবিতর্ক, কত লেখা, কত বক্তৃতা, কত দিনরাত্রিব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছে,—তাহার আলোচনা করিলে আমাদের বিশেষ শিক্ষালাভ হইবে।

ডোরোথীর পিতার নাম মাইল্‌স্ বীল্ এবং মাতার নাম ডোরোথী মার্গারেট্। উভয়েই মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্ভূত ছিলেন। পরিবারে যে সকল ব্যবস্থা থাকিলে সন্তানদিগের সুশিক্ষা সহজ হয়, বীল্ পরিবারে তাহার যথেষ্ট আয়োজন ছিল। পিতামাতা ভাইবোন সকলে পরস্পরের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী ছিলেন। স্বামীর সেবার জন্য স্ত্রী ব্যাকুল, স্ত্রীর সাহায্যের জন্য স্বামী তৎপর। পিতামাতা সন্তানগণের সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত; গৃহের এবং বাহিরের কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও তাঁহারা উভয়েই সন্তানগণের শিক্ষায় কখনও অবহেলা করেন নাই; সময় করিয়া তাহাদের সহিত বসিয়াছেন এবং কবিতা আবৃত্তি করিয়া, শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ করিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তাহাদের পুনরাবৃত্তি শুনিয়াছেন। গৃহে শাস্ত্রপাঠ, জ্ঞানালোচনা, সাধু বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সমাগম, প্রার্থনা এবং সেবার ব্যবস্থা ছিল,—সুতরাং তাঁহাদের গৃহই ছিল আশ্রম এবং জীবন ছিল সাধনাময়। প্রেম সাধন ও জ্ঞান সাধনের হাওয়াতে সে গৃহের সন্তানগণ বর্দ্ধিত হইতেছিল। ইঁহাদের মাসীপিসী, মামা, কাকা প্রভৃতিও কেহ সাহিত্যে, কেহ ইতিহাসে, সুবিজ্ঞ ছিলেন। এইরূপ পরিবারে, বিশপ্‌স্ গেট্ নামক স্থানে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ্চ, ডোরোথী জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতা একটি সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক ছিলেন; এবং তৎসঙ্গে একটি সান্ধ্য শ্রেণী এবং পাঠাগারও (Library) স্থাপন করেন। ইহাই উত্তর কালে "সিটি অব্ লণ্ডন কলেজ ফর ইয়ংমেন্" (City of London College for Youngmen) রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক বিজ্ঞ লোক তাঁহার বন্ধু ছিলেন; তাঁহারা কেবল জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন না, জনসাধারণের হিতকর কার্য্যও অনেক করিতেন। গৃহে যখন কোন ভাল বিষয়ের আলোচনা হইত, বড় ছেলে মেয়েরা কাছে বসিয়া তাহা শুনিত, এবং তিনি কথাবার্ত্তা ও পড়াশুনার ভিতর দিয়া তাহাদের মনে শুভভাব ও সাধু সংকল্প জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং পরিশ্রমশীল ব্যক্তি ছিলেন।

মাতা সকল বিষয়েই স্বামীর সঙ্গী ছিলেন, তিনি ইতিহাস ও কাব্য হইতে ভাল ভাল বিষয় সন্তানদিগের নিকট সুন্দর করিয়া পাঠ করিতেন এবং গল্প বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন।

গৃহে কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তৎ সম্বন্ধে কুমারী বীল্ যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা এই:—শিক্ষার প্রথম উপকরণ—পিতামাতার ঈশ্বর-প্রীতি, সকালে ও সন্ধ্যায় উপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থের ছবি ও গল্প রবিবারে নীতি উপদেশ ও উপাসনামন্দিরে গমন। প্রতি রবিবারে গৃহে বাইবেল, ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ মা পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, ইত্যাদি। গৃহের এইরূপ পবিত্র বায়ুর মধ্যে ডোরোথী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

প্রথমে কিছুদিন গৃহে শিক্ষয়িত্রী আসিয়া পড়াইয়া যাইতেন। এই শিক্ষয়িত্রীগণ কিছুই জানিতেন না। অথচ সব বিষয়ই ভাল জানেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। ডোরোথীদিগের শিক্ষার জন্য শত শত শিক্ষয়িত্রী আসিলেন, অনেক বাছিয়া যাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল, তিনিও অত্যন্ত বানান ভুল করিতে লাগিলেন। আবার অন্য এক জন আসিলেন। শিক্ষয়িত্রীগণের এইরূপ অবস্থা ছিল, কারণ শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিল না।

অতঃপর তাঁহারা তিন বোন এক সঙ্গে স্কুলে গেলেন। এখানেও শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি ছিল। ইতিহাস শিক্ষা ছিল কয়েকটা ঘটনার তারিখ মুখস্থ করা; অঙ্কের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু বোঝান হইত না; এবং সাহিত্য শিক্ষা ছিল কয়েকটা নগণ্য কবিতা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করা। যাই হোক্, এইরূপ স্কুলে গিয়াও ডোরোথী সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই স্কুলে ১২টার পর মেয়েরা জলযোগ করিত, এবং তারপর একটা পর্য্যন্ত বাগানে ত্রিশবার

ঘুরিবার নিয়ম ছিল। অন্য মেয়েরা আলস্য বশতঃ প্রায়ই ত্রিশবার ঘুরিত না, কিন্তু ডোরোথী কোন দিন ত্রিশবার না ঘুরিয়া ছাড়িতেন না। শরীর অসুস্থ হওয়ায়, তের বৎসর বয়সে ডোরোথী স্কুল পরিত্যাগ করেন।

তারপর গৃহে থাকিয়া এডিনবরা রিভিউ, কোয়ার্টার্লি রিভিউ, ব্ল্যাকউডস্ ম্যাগাজিন প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র, এবং দর্শন, ইতিহাস, জীবন-চরিত প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন, এবং উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি সুশৃঙ্খল ভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার মাসী এলিজাবেথ গ্রীক, লাটিন্ ও হিব্রু ভাষা জানিতেন, এবং দর্শন শাস্ত্র ও অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ডোরোথীকে জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি শিক্ষায় সাহায্য করিতেন। ডোরোথী লণ্ডন্ লাইব্রেরীতে গিয়াও পড়িতেন, এবং ক্রসবি হলে বক্তৃতা শুনিতেন। এইরূপে তিনি মহোৎসাহে কঠিন পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

১৮৩৭ সালে, ডোরোথী তাঁহার দুই ভগ্নীর সহিত প্যারীসের একটি স্কুলে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই ফিরিয়া আসিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে ফ্রান্স তখন অস্থির।

সতের বৎসরের বালিকা ডোরোথী শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখশ্রীতে আনন্দ এবং হাসিতে মিষ্টতার অভাব ছিল না। জ্ঞানী ও মহাত্মাদিগের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মন যে উন্নত আলোকময় লোকে বাস করিত, তাঁহার বিমল আনন্দে ডোরোথী কত সময় জীবনের ছোটখাট বিষয় একেবারে ভুলিয়া যাইতেন, কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে তিনি কখনও শিথিল ছিলেন না। ফ্রান্স হইতে বাড়ী আসিয়া, কেবল লিখিয়া পড়িয়াই তিনি দিন কাটাইতেন না। তাঁহাকে নানা প্রকার গৃহকার্য্যও করিতে হইত। তন্মধ্যে প্রধান কার্য্য ছিল, ছোট ভাই বোনদের পড়া বলিয়া দেওয়া। তিনি অতি যত্নের সহিত সকলের পড়া শিখাইয়া দিতেন। এ ছাড়া, ভাই বোনদের জন্মদিনে পুতুল তৈরি করিয়া উপহার দিতেন, ছেঁড়া মোজা রিফু করিতেন, এবং আরও নানা প্রকার গার্হস্থ্য কার্য্য শেষ করিয়া জ্ঞান আহরণে লিপ্ত হইতেন।

এইরূপে তাঁহার বাল্যকাল শেষ হইল। এইবার তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

(২)

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে কুইন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার নবযুগের সূত্রপাত হয়। তৎপূর্ব্বে নারীজাতির উচ্চশিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। ডেভিড্ লেইং নামক একজন অতি বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক লোক লণ্ডনের এক অংশে ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। গরিব শিক্ষয়িত্রীদিগের সাহায্যের জন্য একটি সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি উহার উন্নতি সাধনে লিপ্ত হইয়া পদে পদে বুঝিতে পারিলেন, যে নারীদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে, শিক্ষয়িত্রীদিগের উন্নতি সাধন অসম্ভব। পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেখিলেন, কেহই কিছু জানে না। শিক্ষা পায় নাই; জানিবে কি করিয়া? সুতরাং তিনি কন্যাদিগের সুশিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপনের সংকল্প করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের কথা।

তখনও ইংলণ্ডের অনেকের এই মত ছিল,—মেয়েদের আবার উচ্চ শিক্ষা কেন? তাহারা তো বিবাহ করিয়া গৃহিণী হইবে! কিন্তু ক্রমশঃ অনেক জ্ঞানী পিতামাতা বুঝিতে পারিলেন যে, সব মেয়েই যে বিবাহ করিবে, এমন বলা যায় না। অনেক মেয়েকে চিরজীবন কুমারী থাকিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। নিজের ভার নিজেকে বহন করিতে হইবে, জগতের কল্যাণকর কার্য্য করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। আর বিবাহ করিয়া সুগৃহিণী হইতে হইলেও সুশিক্ষার আবশ্যক।

মহাত্মা লেইং এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহচরী কুমারী মারে স্বয়ং মেয়েদের জন্য একটা কলেজ স্থাপনের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি সেই অর্থ লেইং এর

হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, মহারাণীর অনুমতি অনুসারে, "কুইন্স্ কলেজ" (মহারাণী বিদ্যালয়) নাম দিয়া, একটি উচ্চশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় খোলা হইল। তখন কলেজের বাড়ী ছিল না। হার্লিষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, কলেজ খোলা হইল। বেতনভুক্ শিক্ষকও ছিল না। কিংস্ কলেজের অধ্যাপকদিগকে বলিয়া লেইং স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এক এক জন, এক এক দিন সন্ধ্যার সময় কুইন্স্ কলেজে এক এক বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সুতরাং কলেজ সন্ধ্যার পর হইত। উক্ত অধ্যাপকগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলেজের উন্নতির পথ খুলিয়া গেল।

কুমারী সারা উড্ম্যান্ (বর্ত্তমান মিসেস্ ড্যাভেন্পোর্ট) এই কলেজের প্রথম ছাত্রী। তৎপর যে সকল মহিলা এই কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভবিষ্যতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডের রত্ন রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। প্রথমে কোন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন না। কয়েক জন সম্ভ্রান্ত মহিলা কলেজ দেখিতে আসিতেন। এই কলেজ খোলা হইলে, মাইল্স্ তাঁহার কন্যাদিগকে ইহাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কয়েক মাস অধ্যয়ন করিতে না করিতে, কুমারী বীল্‌কে অঙ্ক শাস্ত্রের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইল। তিনি একদিকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন, অপর দিকে লাটিন, গ্রীক, জার্ম্মাণ, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতির শ্রেণীতে গিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুমারী বীল্ নিম্ন শ্রেণীতে লাটিন ভাষার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন।

একদিকে তিনি পড়াইতে লাগিলেন, অপর দিকে কিংস্ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপকদিগের নিকট নানা বিষয় অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহাদের উন্নত চিন্তার সংশ্রবে আসিয়া দিন দিন আত্মোন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কলেজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অধ্যাপনা হইত:—(১) ধর্ম্মশাস্ত্র, (২) ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, (৩) ইতিহাস, (৪) ফ্রেঞ্চ, লাটিন, হিব্রু, গ্রীক, জার্ম্মাণ ও ইটালিয়ান ভাষা, (৫) সঙ্গীত, (৬) গণিত (জ্যামিতি প্রভৃতি), (৭) ভূগোল, (৮) ভূতত্ত্ববিদ্যা, (৯) উদ্ভিদ্-বিদ্যা (১০) পদার্থবিজ্ঞান, (১১) চিত্রবিদ্যা, (১২) শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি। এই বিষয়গুলির আবার শাখা প্রশাখা ছিল। কুমারী বীল্ শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষ প্রশংসা-পূর্ণ ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন—ইংরাজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ।
" ১৫ই " ফ্রেঞ্চ।
" ১১ই ডিসেম্বর—শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপ্রণালী।
১৮৪৮ " ডিসেম্বর মাসে—ধর্ম্মশাস্ত্র।
১৮৪৯ " জানুয়ারী " ভূগোল।
১৮৫০ " নবেম্বর " পাটিগণিত, বীজগণিত।
১৮৫১ হইতে ১৮৫৫ খৃঃ লাটিন, জার্ম্মাণ এবং পিয়ানো।

এতৎব্যতীত তিনি গ্রীক্ এবং সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কুলবিভাগের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন।

এই সময় তিনি তাঁহার ছাত্রীদিগকে এত ভালবাসিতেন এবং এরূপ যত্নের সহিত শিক্ষাদান করিতেন যে, তাহারা এক এক জন ৫০ বৎসর পরে সে বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিয়াছে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। অধ্যাপক এবং পরিদর্শকগণ তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতেন। তিনি শিক্ষাদানের সময় একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। নিজে শিক্ষা লাভ করা এবং অপরকে শিক্ষা দান করা, এ দুই-ই তাঁর পক্ষে পরম আনন্দের ব্যাপার ছিল। স্কুলের ছুটির সময় তিনি যে বার যেখানে বেড়াইতে যাইতেন, সেখানকার স্কুল ও তাহার শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শন না করিয়া ফিরিতেন না। এইরূপে কয়েক বৎসর আনন্দে

অতীত হইল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, যে তিনি যেন মন খুলিয়া স্বাধীন ভাবে কায করিতে পারিতেছেন না; পদে পদে অধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইতে হইতেছে। অধ্যক্ষ ছাত্রীদিগের অবস্থা না বুঝিয়া, কোন পরামর্শ না করিয়াই, তাহাদিগকে স্কুল হইতে কলেজে বক্তৃতা শুনিতে পাঠাইতেছেন, এবং তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছেন। তবুও কিছুদিন কায করিলেন; অবশেষে নবেম্বর মাসে ডোরোথী কার্য্য ত্যাগ করিলেন।

অধ্যক্ষ মিষ্টার প্লাম্প্‌টার, অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে কার্য্য ত্যাগ করিতে বারণ করিলেন, কিন্তু ডোরোথী কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কলেজে থাকিয়া বাদ প্রতিবাদের দ্বারা প্রিয় কলেজের ক্ষতি না করিয়া, সরিয়া দাঁড়ানই ভাল, এই স্থির করিয়া, তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি অপর একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইলেন। ক্যাষ্টার্টন্ নামক গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। পূর্ব্ববৎসর তাহার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মৃত্যু হয়। স্কুলকমিটি ডোরোথীকে সেই শূন্য পদে বরণ করেন। ডোরোথী একটা কায ছাড়িতেই আর একটা কায পাইলেন এবং সেখানে তিনিই স্কুলের কর্ত্রী, সুতরাং স্বাধীন ভাবে মনের মত আদর্শ অনুসারে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া, আগ্রহের সহিত সেই কার্য্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যখন সেখানে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, সম্মুখে বিশেষ পরীক্ষা বর্ত্তমান। পল্লীগ্রামে কখনও থাকেন নাই, স্বীয় পরিজন ছাড়াও কখনও বাস করেন নাই। এখন সেই অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে একাকী কি করিয়া দিন কাটিবে! সেখানে কোন বন্ধু নাই। লণ্ডনের মত লাইব্রেরী নাই, বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বক্তৃতা শোনার কোন সুযোগ নাই,—কিসে জীবনের তৃষ্ণা দূর হইবে! এইসব দুশ্চিন্তা মনে লইয়া, তিনি ক্যাষ্টার্টনে গমন করিলেন। তিনি সহরে জীবন কাটাইয়াছেন, পল্লীগ্রামের জঙ্গলপূর্ণ, উঁচু নীচু রাস্তা দিয়া যাইতে তাঁহার মন ভয়ে আকুল হইতেছিল, তিনি ভাবিতে ছিলেন, "একি ভয়ানক স্থান, এখানে লোক বাস করে কি করিয়া!" যাই হোক, তিনি কায আরম্ভ করিলেন। একাকী দশ বারটি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। সে স্কুলের আদর্শ উচ্চ ছিল, কিন্তু অর্থ ছিল না। গরিব প্রচারকদিগের কন্যাগণের শিক্ষার জন্যই সে স্কুলের জন্ম। অনেক ছাত্রীর অন্নবস্ত্রের ভারও স্কুলেরই বহন করিতে হইত। সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ছিল কম, খাটিতে হইত বেশী।

তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান এত প্রবল ছিল যে, এতগুলি বিষয়ে পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতে, তাঁহার বিশ্রামের সময় থাকিত না, যথেষ্ট ঘুমাইবার সময়ও পাইতেন না; এইরূপ পরিশ্রমে তাঁহার শরীর খারাপ হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি একজন ভাল শিক্ষয়িত্রী বলিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁর নাম পড়িয়া গেল। স্কুলের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নানা বিষয়ে কমিটির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কমিটির সভ্যগণ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির লোক, তাঁহারা পরিবর্ত্তন ভালবাসিতেন না, এবং ডোরোথীর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতিও তাঁহাদের আস্থা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কয়েক দিন ডোরোথীর সহিত আলোচনা করিলেন, তাঁর কথা শুনিলেন, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন করিতে রাজি হইলেন না। সুতরাং তিনি ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে ক্যাষ্টার্টন্ পরিত্যাগ করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া কুইন্স্ কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে পুনরায় উক্ত কলেজে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং ক্যাষ্টার্টনের আচার্য্য স্বইচ্ছায় তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন।

গৃহে ফিরিয়া তিনি সকলের স্নেহ ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত,—ভবিষ্যতে কোন্ কার্য্য করিবেন, এই চিন্তায় তিনি গভীর ভাবে মগ্ন হইলেন। অর্থোপার্জ্জন করা অনাবশ্যক, গৃহ তাঁর অতি প্রিয় স্থান, প্রিয়বন্ধু, পাঠাগার, বক্তৃতা প্রভৃতি আকর্ষণের বস্তুও যথেষ্ট আছে; এ সকলের মধ্যে থাকিয়াও নানা প্রকারে পরোপকার করা যায়। তিনি কি তাই করিবেন? বিবাহের প্রশ্নও মনে আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিবাহের আদর্শ ছিল অত্যন্ত উচ্চ; এবং

শিক্ষাকার্য্যে তিনি এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, যে সে চিন্তা আর মনেও স্থান পায় নাই। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার অতি প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র "লেডীজ্ কলেজ"কেই তিনি স্বামী বলিতেন।

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যদি কোন ভাল স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ পান, তাহা হইলে ঠিক কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিবেন। ইতিমধ্যে লেখা পড়া, আত্মচিন্তা, ভাই বোনদের দেখা, মাতাপিতার আনন্দ বর্দ্ধন করা নিয়মিত রূপে চলিতে লাগিল। তা ছাড়া দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতেন; গরিব ছেলে মেয়েদের পড়াইতেন এবং নানা প্রকার সৎকার্য্যের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিতেন।

এই সময়, প্রায় দেড় বৎসরব্যাপী বিশেষ পরিশ্রমের ফলে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "Students' Text Book of English and General History" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে সাধারণ ভাবে পৃথিবীর ইতিহাস এবং বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডের ইতিহাস বর্ণনা করেন। ১৭০ পৃষ্ঠার মধ্যে এত বড় বিষয় বর্ণনা করায় বইখানি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু তাহার শৃঙ্খলা ও পূর্ণতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থ সুধীগণের নিকট অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। তখন ইতিহাস শিক্ষার কোনও উৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল না, এই গ্রন্থ সে বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক।

এই সময় জার্ম্মাণীর একটি বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে একখানি এবং আত্মপরীক্ষা (Self Examination) নামক একখানি, এই দুইখানি পুস্তকও তিনি প্রকাশিত করেন। তাহাতে গভীর ধর্ম্মভাব এবং তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ধর্ম্ম সাধনকে জীবনের সকল বিভাগব্যাপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই সময় এমন গ্রন্থ আর ছিল না।

এই সকল কার্য্যে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল। এইবার তাঁহার জীবন-ব্রত যে স্থানে উদ্‌যাপিত হইবে, তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

প্রেম ও মৃত্যু।

(টেনিসন্ হইতে)

চাঁদিমা হাসিছে গগনের ভালে
ফুটেছে জোছনা রাশি,
প্রেম আসি' একা সহচরী সাথে
খেলিতেছে পাশা পাশি;—
অধরে তাহার সুধার প্রলেপ
হৃদে জাগে ভালবাসা;
প্রতি পদক্ষেপে জেগে উঠে কত
প্রেমিকার মনে আশা।
এ হেন সময়ে আসিল 'মরণ'
কহিল প্রেমেরে ডাকি'—
"কেন তুমি আসি ঘুরিতেছ হেথা
নিজ ছায়া পিছে আঁকি?
এ নহে তোমার বিহারের স্থান—
এ নহে তোমার কাল,
যাও চলে যাও—চারি ধারে হেথা
বিরাজিছে মম জাল।"
বিদায়ের কালে—প্রেমের নয়নে
ভরে গেল দুঃখবারি,
বলিল মরণে—"তব তরে বটে
আসে কাল সারি সারি;
জগতের মাঝে দেহের পিছনে
জীবনের তুমি ছায়া,
তব দরশন পাই না তখন
কেটে যবে পড়ে কায়া;
ছায়া সম তুমি ঘুরিতেছ হেথা
লীন হও মাঝে মাঝে,
আমি ছায়া নই—চিরকাল থাকি
শেষ নাহি মম মাঝে।"

শ্রীরেণুকাবালা দাসী।

মুদ্রাযন্ত্র।

হলাণ্ডে হার্লিম্‌ নামে একটি খুব পুরাতন সহর আছে। সহরের বাড়ীগুলি বেশ চমৎকার; কিন্তু রাস্তাগুলি আদৌ ভাল নয়। মস্ত লম্বা লম্বা ঘাসে তাহা একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া অত্যন্ত জঙ্গাল সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানে স্থানে জল জমিয়া স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক জায়গায় রাস্তাগুলি এত সরু যে এক বাড়ীর লোক রাস্তার অন্য ধারের বাড়ীর লোকের সহিত অনায়াসেই কথা কহিতে পারে।

এইরূপ একটি রাস্তার ধারে, বোধ হয় সব থেকে পুরাতন একটি বাড়ী, এখনও বিদ্যমান আছে। বাড়ীটা এত পুরাতন ও জীর্ণ যে একটি দমকা বাতাসে তাহা সহজেই ধূলিসাৎ হইবার সম্ভাবনা।

হার্লিমের ন্যায় পুরাতন সহর দেখিতে অনেক লোক গমন করিয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে এই ছয় সাত শত বৎসরের পুরাতন বাড়ীটি দেখিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হয়। ইহার কারণ, এই বাড়ীটিতে সমস্ত হার্লিমের গৌরবস্থল লরেন্স কষ্টার (Laurence Coster) বাস করিতেন।

লরেন্স কষ্টার তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোনো এক গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক ছিলেন। শিশুকাল হইতে পাঠে তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইত। কিন্তু তিনি যে সময়কার (১৩৭০—১৪৪০ খৃষ্টাব্দ) লোক, সেই সময়ে মোটেই ছাপার পুস্তক ছিল না। সমস্ত বই পার্চমেণ্টের (Parchment) * উপর হাতে লেখা হইত। সেইগুলি বেশির ভাগ সাধু সন্ন্যাসীদের মঠেই থাকিত।

হস্তলিখিত পুস্তকগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়সাধ্য ছিল। তাহা সকলের জুটিত না। বড় বড় ধনী ব্যক্তি ব্যতীত তাহার মূল্য আর কাহারো দিবার সামর্থ্য ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে একজন বড় চিত্রকরের চিত্রের যেরূপ মূল্য, পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেকার সামান্য হস্তলিখিত পুস্তকেরও সেইরূপ মূল্য ছিল।

পুস্তকের দুর্মূল্য হেতু অধিকাংশ ব্যক্তিকে চিরকাল অজ্ঞ থাকিতে হইত। কিন্তু লরেন্স কষ্টার এই নিয়মকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই গ্রন্থ পাঠ করিতে খুব ভাল বাসিতেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

গির্জ্জায় কয়েকখানি হস্তলিখিত পুস্তক ছিল—তিনি সেই গুলি এতবার ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন যে প্রায় সব তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। এই মহৎ ব্যক্তি কি করিয়া কোন্ কৌশলে সর্ব্বজনহিতকর মুদ্রাযন্ত্রের সূত্রপাত করেন আজ তাহারই আলোচনা করিব।

লরেন্স কষ্টার যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রের সন্তানসন্ততি গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার মনকে সকল সময়েই প্রফুল্ল রাখিত! তাহাদের সহিত মিশিয়া তিনি বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি স্বয়ং শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কষ্টার চিরকালই ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। অনেক সময়ে সহরের বাহিরে, বনের মধ্যে, নদীর তীরে, গাছের ছায়ায় 'দিনরজনী' অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সাধারণ গম্যস্থান লোকালয়ের বাহিরে—পত্রের মর্ম্মরধ্বনি, পাখীর কূজন ও নদীর কলস্বরে মুখরিত জনশূন্য বন।

যৌবনে ঐ সকল নির্জ্জন স্থানে গিয়া তিনি গাছে অনেক সময় নিজের নাম লিখিয়া রাখিতেন। বৃদ্ধ বয়সে একদিন সেখানে গিয়া তিনি একটি গাছে নিজের নাম দেখিতে পাইলেন। কিন্তু এখনও তাঁহার সেই স্বভাব যায় নাই। গ্রীষ্মকালে একদিন বৈকালে, একটি পল্লবিত বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া তিনি গাছের উপর কয়েকটা অক্ষর খুদিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একটি নূতন ধারণা হইল। তিনি ভাবিলেন, "গাছের ছালে অক্ষর না খুদিয়া যদি তাহা হইতে কাটিয়া অক্ষর বাহির করিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা আরো কাজের হয়।" তিনি কতকগুলা অক্ষর কাটিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার মনে হইল, "ছোট ছোট

* পার্চমেণ্ট—লিখনার্থ পরিষ্কৃত মেষ বা ছাগচর্ম্মের কাগজ।

ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিবার পক্ষে ইহাতে খুব সুবিধা হইবে। যখন তাহারা পড়িতে অনিচ্ছুক হইবে, তখন ইহা দেখাইয়া তাহাদের পাঠে মনোযোগ উৎপাদন করিব। অক্ষরগুলা শিশুরা খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিল দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। অক্ষর কাটিয়া সংগ্রহ করা তাঁহার স্বভাব হইয়া গেল এবং তিনি ক্রমশঃ তাহাতে দক্ষতা লাভ করিয়া আরো ভাল ভাল অক্ষর কাটিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি বনে গিয়া কতকগুলি চমৎকার অক্ষর কাটিয়া একখণ্ড পার্চমেণ্টে জড়াইয়া শিশুদিগের নিমিত্ত গৃহে লইয়া গেলেন। তাহাদিগকে অক্ষরগুলি দিয়া তিনি পার্চমেণ্টটি ফেলিয়া দিলেন।

অল্পক্ষণ পরে একটি ছোট ছেলে তাহাতে কতকগুলি অক্ষর দেখিয়া তাহা আনিয়া তাহার ঠাকুরদাদাকে দেখাইল। লরেন্স কষ্টার তাহার হাত হইতে কাগজ লইয়া দেখিলেন যে, তাহাতে কতকগুলি অক্ষরের বেশ ছাপ পড়িয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে যখন তিনি অক্ষরগুলি বন হইতে পার্চমেণ্টে জড়াইয়া লইয়া আসেন, তখন তাহার কষ লাগিয়া ছাপ পড়িয়াছে।

এই সামান্য ঘটনা হইতে জগতের মহা কল্যাণকর মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সূচনা হইল। কষ্টার যখন ভাবিলেন যে এইরূপে অক্ষরের পর অক্ষরের ছাপ দিয়া একখানি গ্রন্থ অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

লরেন্স কষ্টারের জীবনের এখন ইহাই প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি দিবারাত্রি এই মুদ্রাযন্ত্র লইয়া পড়িয়া রহিলেন। হঠাৎ একটা ছোট ঘটনা হইতে যে এমন একটি মূল্যবান্ জিনিষ আবিষ্কৃত হইবে তাহা তিনি কখনও ভাবেন নাই।

ইহাতে তাঁহার উৎসাহ আরো বৃদ্ধি হইল। কোন গোপনীয় স্থানে গিয়া তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এক একটি অক্ষরে কালী মাখাইয়া তিনি পার্চমেণ্টের উপর চাপিয়া ধরিতেন এবং তাহার অবিকল ছাপ পড়িত। এই প্রণালীতে শব্দ, বাক্য ইত্যাদি ছাপাইতে লাগিলেন।

এতদিন তিনি গাছের ছাল হইতে কাটা অক্ষর ব্যবহার করিতেছিলেন কিন্তু তাহা অত্যন্ত নরম বলিয়া তাহাতে কাজের অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন কাঠ হইতে অক্ষর কাটিয়া বাহির করিয়া কাজের আরো উন্নতি সাধন করিলেন। তাহার পর তিনি এক প্রকার ঘন কালী ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহা সহজে পার্চমেণ্ট হইতে উঠে না। এই কালী প্রস্তুত করিবার পর অক্ষর সম্বন্ধে আরো একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মিল। তিনি সীসা ও পিউটার নামক ধাতু হইতে অক্ষর কাটিতে লাগিলেন। ইহাতে কার্য্য আরো উত্তমরূপে হইতে লাগিল।

যে কোন জিনিষ যখনই প্রথমে আবিষ্কৃত হয় তখন নানাদিক্ হইতে বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক শত্রু মিত্র, ঠাট্টা তামাসা আসিয়া একেবারে নিরাশা আনিয়া দেয়। লরেন্স কষ্টারের এই নূতন আবিষ্কারকেও অনেকে বিশ্বাস করিল না। অনেকে তাহা পাগ্‌লামি মাত্র জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিল। শত্রুরা তাঁহাকে এত বিরক্ত করিয়া তুলিল, যে তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। লোকালয়ের বাহিরে তিনি মাসের পর মাস নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর রহিলেন।

একদিন একজন জার্ম্মানিবাসী যুবক হার্লিমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিঠে একটা মস্ত বোচ্‌কা। নিতান্ত সাধারণ বেশ—কোনো বিলাসিতা নাই। তিনি সেখানে গিয়া লরেন্স কষ্টারের আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক মতামত শ্রবণ করিলেন। তিনি ইহার সারমর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কষ্টারের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কষ্টার তখন নিজের কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন।

এই যুবকের নাম গুটেনবার্গ (Gutenberg)। বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর, কিন্তু ইহার মধ্যে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় পুরুষ। বাল্যকাল হইতে তাঁহার পাঠে খুব আগ্রহ ছিল। তিনি সাধু সন্ন্যাসীর নিকটে শিশুকাল হইতে শিক্ষা লাভ করেন এবং সেই সকল সন্ন্যাসীর নিকট যে সমস্ত হস্তলিখিত পুস্তক ছিল তাহা খুবই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন।

তিনি যে শুধু পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়, ধর্ম্মেও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল পার্চমেণ্টে হাতে লিখা ছিল। সেই জন্য সেগুলি বড় বড় ধনী ব্যক্তির নিকট এবং তখনকার মঠে থাকিত। তাহা সাধারণ লোকের দুষ্প্রাপ্য ছিল। ধর্ম্মপুস্তকসকল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তিনি প্রায়ই দুঃখ করিতেন।

জার্ম্মানিতে রাইন বলিয়া একটি নদী আছে। সেই নদীর ধারে ষ্ট্রাসবার্গ (Strasberg) সহরে গুটেনবার্গের বাড়ী। তিনি শিশুকাল হইতে দেশের ও বিদেশীয় লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে নানা কল্পনা করিতেন—এত-দিনে পূর্ণ যৌবনে তিনি সেই সব দেশ ভ্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। এই ভ্রমণের প্রারম্ভেই হল্যাণ্ডে লরেন্স কষ্টারের বিষয় শুনিয়া তাঁহার ভ্রমণের সমস্ত কল্পনা জল্পনা দূরীভূত হইয়া গেল। এই সমস্যার মীমাংসাই তাঁহার নিকট বৃহত্তর কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল।

কষ্টারের এতদিন কোনো মিত্র ছিল না—সব শত্রু। কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিত না। ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় ছিল। এতদিনে একজন সহানুভূতিপ্রকাশক অতিথিকে পাইয়া তিনি নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তিনি অতিথিকে নিজের সামান্য কিছু কার্য্যাবলী খুব যত্ন, আগ্রহ ও আনন্দের সহিত দেখাইলেন। যখন তিনি ছাপাইবার প্রণালীতে পার্চমেণ্টের উপর কয়েকটা অক্ষর ছাপিলেন, তখন গুটেনবার্গ আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর কষ্টার কয়েকখানি মোটা মোটা অক্ষরে ছাপা পার্চমেণ্ট দেখাইয়া তাঁহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের পরিচয় দিলেন। ইহা দেখিয়া গুটেনবার্গ বলিলেন,—"ইহার চেয়ে আরো ভাল করা উচিত; কারণ, মঠে যে সকল পুস্তক হাতে লিখিত হয়, তাহার চেয়ে ইহা আস্তে আস্তে হয়। আচ্ছা, আমিও এ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিব।"

লরেন্স কষ্টারের (Laurence Coster) আবিষ্কার দেখিয়া তিনি খুব প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভ্রমণের চিন্তার স্থানে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির চিন্তা তাঁহাকে আরো চিন্তিত করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোনো নূতন কাজ প্রথম আরম্ভ করিলে চারিদিক্ হইতে অনেক প্রতি-কূলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। গুটেনবার্গ তাহা বুঝিয়া এক কৌশল খাটাইলেন। বাহিরের সকলে জানিল তিনি মণিমুক্তার দোকান করিয়াছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর রহিলেন। তিনি একটি ঘরে একেলা বসিয়া সর্ব্বদাই কাজে লিপ্ত থাকিতেন এবং কখনো কখনো আহারের জন্য লোকের সমক্ষে আসিতেন।

এইরূপে নীরবে কার্য্য করাতে অনেকে তাঁহার উপর সন্দেহ করিল। তাহার পর শত্রুরা তাঁহাকে এত বিরক্ত করিয়া তুলিল যে তিনিও সহর পরিত্যাগ করিয়া অনতি-দূরবর্ত্তী কোনো পুরাতন ভগ্ন মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে একটি মঠে বসিয়া কষ্টার তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অহরহ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, এবং এই স্থানেও একটা মঠের সম্মুখে একটি মণিমুক্তার দোকান খুলিলেন। তাহাতে দুটি লোক নিযুক্ত ছিল; তাহারা পাথর কাটিত ও অন্যান্য জিনিষ পালিশ করিত।

এইরূপে তিনি একাগ্রচিত্তে আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে একটা নূতন ধারণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, এক একটা কথাকে (word) তার দিয়া বাঁধিয়া ছাপাইলে কাজের অনেক সুবিধা হইবে।

ইহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়া তিনি রসায়ণের (chemistry) সাহায্যে কালী প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে তাঁহার মনে আরো একটি ভাল ধারণা উপস্থিত হইল।

কালী প্রস্তুত হইলে তিনি তাহা চামড়ার পাত্রে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার পর একটি কাঠের ফ্রেম তৈয়ারী করিলেন। তাহাতে এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা (word) ধরিতে পারিত ও

অনেক বাক্য (sentence) পর পর সাজাইয়া পার্চমেণ্টের উপর ছাপানো যাইত। এইরূপে বেশ গুছাইয়া লইয়া তিনি পুস্তক ছাপাইতে লাগিলেন। তিনি যে কোনো বই যে কোনো রকমে অনায়াসেই ছাপাইতে পারিতেন। সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়া একটি সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইল।

তিনি যখন এইরূপে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা পুস্তকাদি ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই দোকানের ভৃত্য দুটি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। তাহারা ষ্ট্রাসবার্গের শাসনকর্ত্তার নিকট তাঁহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিল যে গুটেনবার্গ ঘরের মধ্যে একেলা থাকিয়া অনেক রহস্যপূর্ণ কাজ করিতেছেন। এই কথা শীঘ্রই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল। যাহারা হাতে পুস্তক নকল করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিত তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতির সম্ভাবনায় তাহারা রাগান্বিত হইয়া উঠিল।

চারিদিক হইতে গুটেনবার্গকে লোকে এত বিরক্ত করিয়া তুলিল, যে তিনি ষ্ট্রাসবার্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। শত্রুদের যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি প্রাণ মাত্র লইয়া তাঁহার জন্মস্থান মেইন নগরে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও তিনি পুনরায় মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যে একটি কার্য্যকে এমন দৃঢ় ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পৃথিবীর একটি মস্ত উপকার করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এইখানে এত দিন পরে একজন মিত্র পাইয়া তিনি তাহার সহিত একত্র কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুটেনবার্গের অদৃষ্ট মন্দ; কিছুদিন পরে এই মিত্র শত্রু হইয়া উঠিল; এইজন্য তাঁহাকে এইখান হইতেও পলায়ন করিতে হইল।

মেইন হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি ভিখারীর ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চারিদিকেই শত্রু, কোথায়ও আশ্রয় পাইলেন না। অনেক দিন পরে তিনি নাসান (Nassan) নগরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানকার শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এই সহরে তিনি নীরবে নিজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। অনেক পুস্তকাদি ছাপাইলেন। ইহাতে তিনি কখনও ধনী হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু শান্তি ও সুখে জীবনের শেষাংশ এই সহরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৬৯ বৎসর বয়সে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে মানবজাতির পরম হিতৈষী গুটেনবার্গ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর অনেক বৎসর পরে লোকে তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই তাঁহার জন্মভূমি মেইন সহরে এই বিশ্বহিতৈষী পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি লোক সমক্ষে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। (ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শ্রীসুহৃদ্‌কুমার মুখোপাধ্যায়।

স্তনদুগ্ধ ও শিশুর আহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সন্তানের আবশ্যক অনুযায়ী কিরূপ ভাবে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাইবে। মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা ইহার উপকারিতা বৃদ্ধি করা কঠিন বিষয়।

স্বাভাবিক অবস্থায়ও মাতৃদুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত নহে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা অনেক সময়ে দুগ্ধের নিকৃষ্টতা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু সন্তানের শারীরিক অবস্থা দেখিয়াই আমরা দুগ্ধের অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারি।

মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রকার খাদ্যাখাদ্যের পরিবর্ত্তন ও অনেক নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে কিন্তু তন্মধ্যে প্রসূতিকে লঘু খাদ্য প্রদান এবং তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাই একমাত্র মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি করে।

স্তনদুগ্ধ নিকৃষ্ট হইলে স্তন্যদাত্রী প্রসূতিকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে :—

১। প্রসূতিকে সুসিদ্ধ ভাত, রুটী, মৎস্য, দুগ্ধ, শাকসবজী প্রভৃতি লঘু খাদ্য খাইতে দিবে। লঙ্কা,

গরম-মশলা প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য কদাচ প্রসূতিকে প্রদান করিবে না।

২। স্তন্যদাত্রীকে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য প্রদান করিবে।

৩। চা, কফি অথবা অন্য কোনরূপ উত্তেজক দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করাইবে না।

৪। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও সকালে মুক্ত বায়ুতে কিছু-কাল ভ্রমণ করিতে দিবে।

৫। তাঁহাকে সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার এবং অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিবার জন্য উপদেশ দিবে।

৬। যাহাতে তাঁহার কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৭। তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে জলপান করিতে দিবে।

৮। যথাসম্ভব তাঁহাকে ঔষধ ব্যবহার করাইবে না।

আর্সেনিক, এণ্টিমনি প্রভৃতি অনেক ঔষধ আছে যাহা প্রসূতি ব্যবহার করিলে দুগ্ধের সহিত নির্গত হইয়া শিশুর পক্ষে অপকারী হইয়া থাকে, কাজেই ঐ প্রকার ঔষধ প্রসূতিকে কখন ব্যবহার করিতে দিবে না।

এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও যদি স্তনদুগ্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি করা না যায়, তবে অন্য উপায়ে সে অভাব পূরণ করিতে হইবে।

মাতৃদুগ্ধে আমিষ, স্নেহ ও লবণ জাতীয় উপাদানের মাত্রা কম বেশী হইতে পারে। এই সকল নিকৃষ্টতা আমরা কতক পরিমাণে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিতে পারি, কিন্তু শিশুর শারীরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা তদপেক্ষা রূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

শিশুর নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দ্বারা আমরা মাতৃদুগ্ধের নিকৃষ্টতা অবধারণ করিতে পারি ঃ—

১। **বমি, পেটের অসুখ, অনেকবার সবুজ মলত্যাগ প্রভৃতি**—শিশুর উপসর্গগুলি যদি জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত-রূপে বুঝিতে হইবে যে মাতার অসুস্থতাই ইহার কারণ। এরূপ অবস্থায় সন্তানকে কখনও দূষিত স্তন্য পান করিতে দিবে না।

২। **স্তন্যপান করিবার কিয়ৎকাল পরেই জমাট দুগ্ধ বমন**—ইহা প্রায়ই স্তন্য পান করাইবার পর শিশুকে নাড়া চাড়া করার জন্য হইয়া থাকে, সুতরাং শিশুর আহারের পর তাহাকে নড়াচড়া করিবে না। দুগ্ধ অধিক মাত্রায় পান করিলে অথবা দুগ্ধে আমিষ অংশ বেশী থাকিলে এরূপ বমন হইয়া থাকে। যদি দুগ্ধাধিক্য বশতঃ বমন হয় তবে দুগ্ধের মাত্রা হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। যদি দুগ্ধের মাত্রা হ্রাস করা সত্ত্বেও বমন হয় তবে শিশুকে স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে অল্প চিনি ও সোডিয়াম সাইট্রেট মিশ্রিত জল পান করাইলে বমন বন্ধ হইবে।

৩। **অম্লগন্ধযুক্ত বমন**—দুগ্ধে স্নেহ অংশের আধিক্য বশতঃ উহা হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে সামান্য শর্করার ও অণ্ডলালের জল পান করাইলে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

৪। **অজীর্ণ ও পেটে বেদনা**—স্তন্য পানের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ল্যাক্টোপেপ্‌টিন্ বা এসেন্সিয়া পেপ্‌টিকা ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে।

৫। **তৈলাক্ত "ভেদ"**—দুগ্ধের স্নেহ অংশের আধিক্য হেতু ইহা হইয়া থাকে।

৬। **কোষ্ঠবন্ধ**—দুগ্ধের মাত্রা কম হইলে হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে গো দুগ্ধ দ্বারা এ অভাব পূরণ করিতে হইবে এবং প্রসূতিকে কড্‌লিভার অয়েল ও মণ্ট খাইতে ব্যবস্থা দিবে।

৭। **মস্তকে ঘর্ম্ম**—আহারের মাত্রাধিক্যই ইহার কারণ।

৮। **মস্তকে ঘা**—জননী বাতগ্রস্ত হইলে এরূপ হইয়া থাকে।

৯। **শিশুর অধিক ওজন বৃদ্ধি**—সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে শিশু ৬ হইতে ৮ আউন্স করিয়া ওজনে বাড়িয়া থাকে। যদি ইহা অপেক্ষা বৃদ্ধি বেশী হয় তাহা হইলে তাহাকেই অত্যধিক বিবেচনা

করিবে। মাতৃ দুগ্ধ কমাইয়া দিবে। এবং যদি কৃত্রিম খাদ্যাদি দিতে পারা যায় তবে চিনি যথাসম্ভব কম দিবে।

প্রসূতি শিশুকে স্তন্য দানে অক্ষম হইলে স্তন্য দায়িনী ধাত্রী কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয় আমরা এখন আলোচনা করিব।

(ক) ধাত্রীর বয়স ২০ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর হইলে ভাল হয়।

(খ) সে বেশ সুস্থকায়া এবং সবলা হইবে।

(গ) তাহার কাসি, বাত প্রভৃতি অসুখ না থাকে, সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ঘ) তাহার উপদংশ রোগ অথবা জননেন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যাধি না থাকে।

(ঙ) তাহার স্তন বেশ বড় আর শক্ত হইবে এবং তাহাতে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকিবে। তাহার স্তনের বোঁটা বেশ উঁচু হইবে।

(চ) তাহার মেজাজ খুব ঠাণ্ডা এবং প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক এবং প্রসূতির ন্যায় সব নিয়ম পালন করিতে হইবে।

আমরা স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর সন্তানকে দেখিয়াও তাহার দুগ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে কতক ধারণা করিতে পারি। যদি ঐ সন্তান বলিষ্ঠ, রোগহীন হয় তবে আমরা বুঝিতে পারি যে ধাত্রীর দুগ্ধ বেশ উপকারী হইবে

যদি কোন সদ্যোজাত শিশু অন্য কোন স্তন্যদায়িনী দ্বারা পালিত হয় তবে স্তনদাত্রীর সন্তানের বয়স এবং ঐ পালিত শিশুর বয়স ঠিক একই রূপ হওয়া উচিত। কারণ, প্রসবের পর হইতেই দিন দিন প্রসূতির দুগ্ধের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দশ দিনের অনধিক বয়স্ক শিশুকে তাহার নিজ জননী ব্যতীত অন্য কোন স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর দুগ্ধ ব্যবহার করাইতে হইলে পম্প (breast pump) দ্বারা স্তন আকর্ষণ করিয়া উক্ত দুগ্ধ পেপ্টোনাইজ ও জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাইলে কোনরূপ অপকার হইবার আশঙ্কা থাকে না। দশ দিনের পর শিশু নিজে ধাত্রীর স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লইলেও কোনরূপ কুফল জন্মায় না।

এখন আমাদের বিবেচ্য, স্তন্যদায়িনী ধাত্রী তাহার নিজ সন্তানকে স্তন্য পান করাইবে কি না? নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ধাত্রীকে তাহার সন্তানকে স্তন্য প্রদান করিতে অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য:—

(১) তাহা না দিলে ধাত্রীর শিশুকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয়—(২) যদি স্তন্যদায়িনী ধাত্রী তাহার নিজ সন্তানকে স্তন্য না দেয় তাহা হইলে অনেক সময় তাহাকে অসন্তুষ্ট দেখা যায় এবং যদি তাহার নিজ সন্তান কৃত্রিম খাদ্যাদি খাইয়া পীড়িত হয় তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থা বিকৃত হয় এবং দুগ্ধও দুষ্ট হইয়া থাকে। নিজের সন্তানকে স্তন্য পান করাইলে ধাত্রীর মন বেশ প্রফুল্ল থাকিবে এবং তাহার দুগ্ধের উপকারিতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে।

যদি হিসাব করিয়া শিশুদিগকে স্তন্য দেওয়া হয় তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে দুইটী শিশু অতি সন্তোষজনকরূপে এক স্তন্যদাত্রী হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আহার্য্য পাইতে পারে। অনেক প্রসূতি উপযুক্ত আহার পাইলে যথেষ্ট উত্তম দুগ্ধ দিতে সক্ষম হয়। প্যারিস সহরের শিশু হাঁসপাতালে একজন স্তন্যদায়িনী ধাত্রী ৪ হইতে ৫টী শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দিতে সক্ষম হয়।

৫০ হইতে ৭৫ আউন্স অর্থাৎ প্রায় /১৷৷০ সের হইতে /২৷০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ একটী স্তন্যদায়িনী ধাত্রী দিতে সক্ষম হয়।

আমাদের মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকগণ, যাঁহারা অর্থব্যয় দ্বারা অন্য কোন স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হন না, তাঁহারা অনায়াসেই আত্মীয়বর্গ মধ্যে অন্য কোন প্রসূতি দ্বারা এ অভাব পূরণ করিতে পারেন। (স্বাস্থ্য সমাচার)

সমাধি

চা বাগানের পাশে আমাদের বাড়ী। প্রত্যহ দুপ্রহরে আহারান্তে যখন বিশ্রামের জন্য ঘরের সম্মুখের

বারাণ্ডায় আসিয়া বসিতাম, তখন দেখিতাম সেখানে শত শত কুলি পিঠে টুক্‌রি বাঁধিয়া চায়ের পাতা তুলিতেছে। আমি সেখানে নূতন গিয়াছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের সহিত আমার বেশ সদ্ভাব হইয়া গেল। এই সব সরল প্রাণ, প্রফুল্লচিত্ত পাহাড়ীরা চায়ের পাতা তুলিতে তুলিতে তাদের সুখদুঃখের সব কাহিনী আমাকে বলিত।

সেদিন তখনো বাহিরে আসি নাই, ঘরে বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত আছি, এমন সময় নিকটেই একটি সকরুণ মর্ম্মভেদী স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বাঁশীর সুরে করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে।

অন্তরের সব দুঃখ, ব্যর্থ আশার নিদারুণ বেদনা, সে সুরে উথলিয়া উঠিতেছিল। সে কাতর ধ্বনি আমার হৃদয়ের অন্তস্তরে আঘাত করিল। অন্তর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। কাহার প্রাণের অব্যক্ত যাতনা প্রকাশের এ আকুল প্রয়াস? কোন্ নিধি হারাইয়া কে এমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে? জীবনের কতখানি শূন্য হইয়াছে—তাই এই বেদনা? সে হতভাগ্যকে দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় আসিলাম। ততক্ষণে বাঁশী থামিয়া গিয়াছে। দেখি, এক নবাগতকে ঘিরিয়া কুলিরা সব কোলাহল করিতেছে। তাহার বিষণ্ণ মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু, রুক্ষ কেশ! হাতে একটি কাঠের বাঁশী। কুলিরা নিতান্ত উৎসুক চিত্তে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাকে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছে। সে তাহাদের দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া দ্রুতপদে দল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আবার বিষাদ মাখানো স্বরলহরী তুলিয়া বাঁশী বাজাইয়া সে চলিয়া গেল। পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে সে আকুল স্বর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিল। ক্রমে তাহা দূরে মিলাইয়া গেল। সম্মুখে প্রসারিত গিরি-উপত্যকায় ক্ষণেকের জন্য যে শোকপূর্ণ গীতি শুনিলাম, তাহা বহুক্ষণ ধরিয়া আমার কাণে বাজিতে লাগিল।

পরদিন কুলিরা কাজে আসিলে আমি তাদের সর্দ্দারকে এই নবাগতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ত প্রথমে কিছুতেই বলিবে না। অবশেষে আমার আগ্রহ দেখিয়া বলিল, "বাবুজি, আমাদের মত সামান্য লোকের জীবনের কথা শুনে আপনারা কি করবেন? এ লোক আগে এই চা বাগানেই কাজ করত, আমাদের সঙ্গে এক বস্তিতেই থাকত। রংবীর বয়সে আমার ঢের ছোট। আমি বাল্যকাল হইতেই তাকে ছোট ভাইএর মত ভালবাসি! সে আমাদের বাড়ীর পাশে থাকৃত। সে তার মা বাপের বড় আদরের একমাত্র পুত্র ছিল। পিতামাতা তারই উপর সব আশা ভরসা রেখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সের সম্বল পুত্রের উপর নির্ভর ক'রে তাঁরা সুখের দিনের আশায় জীবনধারণ করতেন। রংবীরের মত বলিষ্ঠ, সাহসী, সচ্চরিত্র যুবক তখন আমাদের বস্তিতে আর কেহ ছিল না। সে চা বাগানে কাজ ক'রে অল্প টাকাই উপায় করৃত তবে এমন যুবক ভবিষ্যতে যে নিশ্চয়ই আপনার উন্নতি করবে সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একটি ঘটনায় এমন আশাপূর্ণ জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

রংবীরের বাড়ীর পাশেই মতিয়া তার পিতামাতা, ভাইবোনদের নিয়ে থাকৃত। শৈশবকাল হতেই রংবীরের সহিত মতিয়ার খুব ভাব ছিল। মতিয়াও চা বাগানে চায়ের পাতা তুলৃত। শৈশবের একত্র খেলা ধূলা, একত্র আহার বিহার, একত্র কাজ কর্ম্মের মধ্য দিয়ে যখন তারা বড় হয়ে উঠ্‌ল, তখন রংবীর একদিন মতিয়ার পিতাকে গিয়ে জানাল যে সে মতিয়াকে বিবাহ করতে চায়। মতিয়ার পিতা প্রথমে একরকম সম্মত হলেও শেষে একজন ধনীকে পেয়ে তার সঙ্গে মতিয়ার বিবাহ দিলেন। দরিদ্র রংবীর হতাশ নয়নে শুধু চেয়ে রইল,—কোনো কথা বলিল না। মতিয়া শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে রংবীর নিয়ম মত কাজ করে যেত। কিন্তু তার বিবর্ণ মুখ, ছলছল চোখ দেখে আমি বুঝেছিলাম যে তার কোথায় লেগেছে। দুই বৎসর পর একদিন মতিয়া পীড়িত হয়ে স্বামীর ঘর হ'তে পিতার ঘরে ফিরে এল। তখন দেখ্‌লাম রংবীরের ব্যাকুলতা, তার ভাবনা, তার যাতনা। এক বৎসর ধরে সকল কাজ ভুলে সে মতিয়ার সেবা করিল। কোথা দিয়ে দিন রাত্রি কেটে যেত, আবার দিন আস্‌ত, তা সে কিছুই জান্‌ত না। কিন্তু মতিয়া বাঁচ্‌ল না। এই

পাপতাপ পূর্ণ পৃথিবীর প্রেম পায়ে ঠেলে সে কোথায় চলে গেল। তরুণ বয়সে তার সব লীলা শেষ হয়ে গেল।

সে চলে গেল কিন্তু জীবন্মৃত করে রেখে গেল আর এক জনকে! মতিয়ার স্বামী আবার বিবাহ করে সংসার করছে। কিন্তু মতিয়ার মৃত্যুর পর হতে রংবীর গৃহত্যাগী উদাসীন। যতদিন তার পিতামাতা বেঁচেছিলেন, ততদিন সে উপার্জ্জন করে তাঁদের খাইয়েছে। তার পর হ'তে সে এই বাঁশী বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কেহ জানে না সে কোথায় থাকে, কি করে খায়। ঐ যে সমাধি দেখ্‌চেন উহা মতিয়ার সমাধি। মাঝে মাঝে একবার করে রংবীর এই সমাধি দেখ্‌তে আসে।" এই ব'লিয়া সর্দ্দার চক্ষু মুছিল।

তার কতকদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় নির্জ্জন গিরি-উপত্যকা দিয়া গৃহে ফিরিতেছিলাম। সম্মুখে বিশাল অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী। তখন তাহাতে মেঘের উপর মেঘ জমিয়াছে। পর্ব্বত-গাত্র হইতে ক্ষুদ্র ঝরণা রজত-ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। নিস্তব্ধ উপত্যকা কম্পিত করিয়া দু' একটি পাখী মধুর স্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। হঠাৎ চাহিয়া দেখি আমি মতিয়ার সমাধির সম্মুখে আসিয়া প'ড়িয়াছি। ভাল করিয়া চাহিলে দেখিলাম, একটি লোক কাঠের বাঁশী হাতে সমাধির উপর পড়িয়া আছে।

তখন নীল আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, আর তার ঠিক নীচে সন্ধ্যাতারা ধপ্‌ধপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

শ্রীমতী——

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানে যাহা ঘটে, সে সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই, বরং তাহাতে তাঁহার বিধানকে অবজ্ঞাই করা হয়। ইহাতে প্রকৃত মঙ্গলকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার পক্ষে নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। সেই দুঃখ হইতে, বেদনা হইতে, আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূল বিধান হইতে কিছুতেই যেন আমরা খাঁটি সত্যকে বাহির করিয়া লইতে পারি না তথাপি আমরা যাহা আকাঙ্ক্ষা করি, যাহা দেখিলে আমরা আনন্দিত হই তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিলে প্রাণ স্বতই কাঁদিয়া উঠে—তখন শত যুক্তিও আমাদের ব্যথিত প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। পরম দেবতার মঙ্গলময় বিধানে দ্বিজেন্দ্রলাল ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন কিন্তু সমগ্র দেশ আজ তাঁহার বিয়োগে শোকাহত। তিনি আমাদের অনেক দিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া, শিল্পকলার ভিতর দিয়া, নানাভাবে তিনি দেশের সেবা করিয়াছেন; তবু তাঁহার এই পরিণত বয়সের সেবায় ভারত-ভূমি আরও গৌরবান্বিত হইবে, সকলেই ইহা আশা করিয়াছিলেন। তিনি আজ আমাদের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। ইতিহাসে তাঁহার স্থান কোথায় সুধীবৃন্দ তাহা বিচার করিবেন, আজ আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদের নিকট তাঁহার জীবন সম্বন্ধে ২।৩টী কথা বলিয়া আমাদের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিব।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ কৃষ্ণনগরে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রিয় ও উদারচিত্ত লোক ছিলেন। পিতার সমস্ত গুণই দ্বিজেন্দ্র-লালের জীবনে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে আরও বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাল্যকালে দ্বিজেন্দ্রলাল অতিশয় রুগ্ন ছিলেন। কৃষ্ণনগর হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ক্রমে কৃতিত্বের সহিত এফ,এ, বি,এ, ও ১৮৮৪ খৃঃ এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়ার একটী বিশেষ সুযোগ ঘটিল। যে বৎসর তিনি এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সেই বৎসর যিনি এম,এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলালই সরকারী বৃত্তিতে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। ইংলণ্ডে গিয়া কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে নিযুক্ত হন এবং শেষ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া F. R. A. S. উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ সালে সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা সুরবালা দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের অব্যবহিত পরেই তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল নানা বিভাগে কাজ করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়া দিনাজপুর গমন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আবকারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন, ইহার পরেও তিনি অনেক কাল নানা বিভাগে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিপ্রাণা সাধ্বী সুরবালা দেবীর মৃত্যু হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রিয়তমা পত্নীর শোকে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কিছুদিনের জন্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর অনুরোধে সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার ও একমাত্র কন্যা মায়াদেবী নিতান্ত শিশু। তৎপর (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) খুলনায় প্রায় তিন বৎসর কাল ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯০৮ সালে ১৫ মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতায় পত্নীর নামে সুরধাম নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। ১৯১২ সালে তিনি বাঁকুড়ায় বদলী হন; এইস্থান হইতে মুঙ্গেরে বদলী হইয়া যাওয়ার সময় পথে কলিকাতা আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। এক বৎসর কাল অবসর নিয়াও আরোগ্য লাভ করিতে না পারায় ১৯১৩ সনের মার্চ্চ মাসে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর দুইমাস অতীত হইতে না হইতেই সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৯।১৫ মিনিটের সময় অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায় তাহা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। আমরা দু একটী কথা মাত্র বলিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব তাঁহার হাসির গানে ও কবিতায় এবং চরিত্র অঙ্কনে ও সঙ্গীতের সুর বাঁধনে। তাঁহার হাসির গান সকলের নিকটেই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু শুধু রঙ্গরহস্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ব্ব প্রতিভা নিয়োজিত হয় নাই; তাঁহার বাল্য রচনা "আর্য্যগাথায়" অনেক উচ্চ অঙ্গের কবিতা পাওয়া যায়। নাটকাদিও তিনি মহৎ উদ্দেশ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় নাটক নানা কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ ছিল, তাঁহারই চেষ্টায় বর্ত্তমান নাটকাদি অনেক পরিমাণে এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই ইতিহাসের মর্য্যাদাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। যে সকল চরিত্রের ভূমিকা তিনি ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, সেইগুলিকে আমাদের দেশোপযোগী করিয়া তুলিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, "যাহা কবির জীবনের নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল, যে ভিত্তির উপরে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রতি সঙ্গীতে এবং প্রতি চিত্রে তাঁহার যে ভাব ফুটিয়া উঠিত, অনেকে হয়ত সেই মৌলিক ভাবটী ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই, অথবা লক্ষ্য করিয়াও অনেক সময় হাসির ঘটায় অথবা চিত্রের ছটায় ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহাতে সমাজ উন্নত এবং পবিত্র হয় তাহাই তাঁহার লক্ষ্য এবং ব্রত ছিল।"

তাঁহার নাটকাদির মধ্যে "প্রতাপসিংহ" অধিকাংশের মতে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে, বিজয় বাবু দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনা আলোচনায় "প্রতাপসিংহ" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কবি তাঁহার "প্রতাপসিংহ" নাটকে মুখ্যতঃ এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যদি আদর্শ উচ্চ না হয়, তবে প্রতাপসিংহের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং বীরত্বও ফলদায়ক হইতে পারে না। প্রতাপসিংহ যত বড় দেবতা হউন না কেন, তিনি "বংশগৌরব" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। বংশগৌরব অপেক্ষা যে স্বদেশ অনেক গুণে বড়, এবং স্বদেশ বলিতে যে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বুঝায় না, এ কথাও নাটকের দুই তিন স্থলে কবি বুঝাইয়া গিয়াছেন। যাঁহার আদর্শ কেবল বংশগৌরব রক্ষা, তিনি যবনী-বিবাহের অপরাধে শক্তসিংহের মত ভাইকে পরিত্যাগ করিয়া হঠিয়া গেলেন। প্রতাপ বলিলেন—'শক্ত! তুমি আমার ভাই নও; কেননা তুমি

যবনী-বিবাহ করিয়াছিলে।' কবি দেখাইলেন যে প্রতাপের মত মহাত্মাও মনের সঙ্কীর্ণতার ফলে ক্ষুদ্র হইয়া গেলেন, এবং প্রতাপ-প্রত্যাখ্যাত শক্তসিংহ সকল ক্ষুদ্র গণ্ডী এড়াইয়া বিশ্বজনের ভাই হইয়া দাঁড়াইলেন।"

ইহার পরে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল আচারে ব্যবহারে মনে প্রাণে খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, নিজে বিলাতফেরতা হইয়াও বিলাতী ভাবের অনুকরণকে তিনি সর্ব্বদাই ঘৃণা করিতেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব "প্রায়শ্চিত্তে" বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সমাজের যে কোন দোষ-দুর্ব্বলতা যখনই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত তখনই তিনি লেখনীতে তাহা প্রকাশ করিয়া মনের তীব্র জ্বালার উপশম করিতেন। অনেক সময় ব্যঙ্গরসের ভিতর দিয়া যেন হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা ঢালিয়া দিতেন। তিনি মাতৃ-ভূমির উদ্দেশ্যে যে গানগুলি রচনা করিয়াছেন, চিরদিন দেশের আকাশে বাতাসে সে গানের সুর বাজিবে এবং দিন দিন সেই সুর শুনিয়া আমাদের ভারত-জননী ধন্য হইবে। আমরা উপসংহারে তাঁহার একটী গানের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দেশবাসী-দিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কবি আকুল প্রাণে গাহিতেছেন—

"কিসের শোক, করিস্ ভাই!—আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ।
ভুলিয়ে যারে আত্ম-পর, পরকে নিয়ে আপন কর্;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ।
শত্রু হয় হোক্ না যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড সে যে—তাহারে দূর করিয়া দে,—
সবার বাড়া শত্রু সে;—আবার তোরা মানুষ হ।
জগৎ জুড়ে দুইটী সেনা পরস্পর রাঙায় চোখ;—
পুণ্যসেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক্;
ধর্ম্ম যেথা সেথায় থাক্; ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ।"

কবির এই পুণ্য আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইবে না?

শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত।

বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা।

(১৩১৯। অগ্রহায়ণ মাসের পর)

১৩ই নবেম্বর—রেঙ্গুনে জাহাজের ডাক্তার আরোহী-দের পরীক্ষা করার পর দুইটার সময় জাহাজ ছাড়িল। রেঙ্গুন হইতে আজ আমাদের ক্যাবিনে আরো দুই জন জাপানী উঠিলেন। ইঁহাদের একজন সাংহাই ও একজন জাপান যাইবেন। আমরা অন্য ক্যাবিনে গেলাম। এই ক্যাবিনটী বেশ ভাল। ঘরে টেবিল, চেয়ার, গদি দেওয়া বেঞ্চ, বিছানা, আর্শি ইত্যাদি; পার্শ্বেই স্নানাগার। সকল রকমেই সুবিধাজনক ও সুসজ্জিত; প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনের মত জাপানী "বয়" (Boy) যখন যা প্রয়োজন হয় করে দেয়। "ডেকে"ও বেশ জায়গা আছে,—বেড়ান যায়; ঘরেও বেশ বাতাস আসে। এদিকে জাহাজের বড় কর্ম্মচারীরা থাকেন, তাই এমন সুবন্দোবস্ত। আমাদের সম্মুখের গৃহ ওঁদের ভোজনাগার (dinner room)। এখানে আমাদের আশাতীত সুবিধা হয়েছে। বিন্দুমাত্র অসুবিধা নাই। সমুদ্রপীড়া হয় নাই। জাহাজ বেশ স্থিরভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আজকাল মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, গরম খুব বেশী। আমার একটু জ্বর হইল। আমি মাঝে মাঝে এস্রাজ বাজাই। আস্তে আস্তে গান-করি, সেলাইও এক আধটুক করি। প্রায়ই "ডেকের" উপর বেড়াই ও অনন্তের রচিত অনন্ত নীলাকাশ ও নীল সমুদ্র দেখি। সূর্য্যাস্তের সময় দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

১৭ই নবেম্বর—প্রাতে পিনাং পৌঁছিলাম। শরীর অসুস্থ থাকায় ও বৃষ্টি হওয়াতে তীরে নামিলাম না। ১৮ই—বৈকালে জাহাজ ছেড়ে ২০শে প্রাতে সিঙ্গাপুর পৌঁছি-লাম। সারাদিন বৃষ্টি। ২১শে—সহরে বেড়াতে চলিলাম। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানগুলি বড় সুন্দর। সমুদ্রের তীরেই ছোট ছোট পাহাড়, তদুপরি সুদৃশ্য পুষ্প-বৃক্ষাদি পূর্ণ বাগানপরিবেষ্টিত ছবির মত সুন্দর সুন্দর বাড়ী। জাহাজঘাট থেকে হেঁটেই সহরে গেলাম। অনেকটা দূর। রাস্তায় ধূলা নাই; তৈলে সিক্ত। সহরে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান, তৎসম্মুখে ফুটপাথ।

ফুটপাথের উপর ছাদ। রৌদ্র বৃষ্টিতে পথিকদের কষ্ট হয় না। রাস্তায় ট্রাম, ঘোড়ারগাড়ী, রিক্স (মানুষটানা গাড়ী) ইত্যাদি চলে। চীনা ও মালয়ী লোকই বেশি। এখানে জাপানীও অনেক আছে। ফিরিবার সময় ট্রামে ফিরিলাম। আমি এই প্রথম ট্রামে উঠিলাম। এখানে সমুদ্রতীরে কতকগুলি ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক বাস করে। যখন জাহাজ আসে বা ছাড়ে সেই সময় ছোট ছোট নৌকায় তাহারা জাহাজের নিকটস্থ হয়। জাহাজ থেকে আরোহীরা জলে পয়সা ফেলে দেয়, আর উহারা নৌকা থেকে জলে লাফিয়ে প'ড়ে ডুব দিয়ে জল থেকে পয়সা নিয়ে নৌকায় উঠে। ২।৩টী পয়সা একবারে লইতে পারে। এতে সকলেই তামাসা দেখে আর উহারাও কিছু উপার্জ্জন করে। আমাদেরও কয়েক সেণ্ট (cent—এখানকার পয়সা) খরচ হইল। বৈকালে একটী জর্ম্মন জাহাজ আসিল; তীরে লাগিবার পূর্ব্বে ব্যাণ্ড বাজাইল। এখানে খুব গরম।

২৩শে নবেম্বর—প্রাতে আমাদের জাহাজ পিনাঙ্ ছাড়িল। আমরা ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। পরে ঘরে এসে চা খাইলাম। আধ ঘণ্টাখানেক পর দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিল। কারণ, এখন স্থির সমুদ্র ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। জাহাজ খুব দুলিতে লাগিল। শরীর অস্থির—গা বমি বমি করিতে লাগিল। দুজনেরই শরীর অত্যন্ত খারাপ, জাহাজশুদ্ধ সকলেরই প্রায় তাই। আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি, প্রবল উত্তুরে বাতাস, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সব অদৃশ্য। সমুদ্রের ঢেউ ও গর্জ্জন ভয়ানক। জাহাজ সম্মুখে পশ্চাতে দুলিতেছে। আমরা জাহাজের মধ্যভাগে, তাই কষ্ট কম। যাহারা সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে, তাদের অবস্থা আরও কষ্টকর। ২৭শে পর্য্যন্ত একই অবস্থা। তবে প্রথম দিনের মত শারীরিক উদ্বেগ কিছুই নাই। আমি সর্ব্বদা শুয়েই থাকি। উঠিলে পড়িয়া যাই, মাথা ঘোরে। ভাত খাই না। বল্লিলেই হয়, কমলালেবু ও বিস্কুট কিছু কিছু খাই। আহারে রুচি মোটেই নাই। শুয়ে থাকিলে কোন কষ্ট নাই। উনি (Mr. Takeda) খান বেড়ান, কোন কষ্ট নাই। ২৮শে আকাশ একটু পরিষ্কার দেখা গেল। সমুদ্র ও জাহাজ কিছু স্থির হইল। আমি উঠিয়া স্নান করিলাম, কয়েক দিন পর বেশ রুচির সহিত আহার করিলাম। সারাদিন বসে রইলাম, ২৯শে আবার ঘন মেঘ দেখা দিল। প্রবল বাতাসে জাহাজ এবার আড়া আড়ি ভাবে দুলিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন-আহারের পর শুইয়া পড়িলাম। বৈকাল হইতে জাহাজ অত্যন্ত দুলিতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ ভয়ানক গর্জ্জনে জাহাজের উপর হুস্ হুস্ ক'রে এসে সব ভিজিয়ে দেয়। জিনিষ পত্র যাহা উপরে ছিল নীচে পড়ে একবার এ পাশে আবার ও পাশে গড়াইতে লাগিল। পরে দুইজন "বয়" এসে সব জিনিস নীচে পরস্পর ঠেকা দিয়ে রেখে গেল। কিছু না ধরে কেহই দাঁড়াতে পারে না। বেঞ্চে বস্‌লে সম্মুখ দিকে পড়ে যেতে হয়। বিছানার চারিদিকে কাঠের ফ্রেম, তাই পড়বার ভয় নাই। তবুও আমাদের বিছানা পাশাপাশি ভাবে থাকাতে ও কিছু লম্বা হওয়াতে একবার পায়ের-দিকে নেমে যেতে হয় আবার মাথার দিকে উঠ্‌তে হয়। বিছানা জোর করে ধরে ধাক্কা সাম্‌লাতে হয়। ঘুম হয় না। মাথা একবার নীচে যায় আবার উপরে উঠে। খাওয়া হল না; জাহাজে প্রায় ১০০০ চাইনীজ্ আরোহী, সব উপবাস। ৩০শে—আকাশ, সমুদ্র, জাহাজ সকলেরই এক অবস্থা। কেবল ভাত সিদ্ধ ক'রে চাইনীজরা আহার করিল। কিন্তু তাহাতেও কত বিড়ম্বনা! কিছু না ধরে দাঁড়াতে পারে না। সমস্ত শরীরে ভাত পড়ে একাকার। তাকেদাসান চা রুটী খেলেন। আমার আহারে রুচি নাই। কিন্তু শারীরিক কোন উদ্বেগ নাই। কমলালেবুই আমার আহার। এই ভাবে ২রা ডিসেম্বর প্রাতে হংকং পৌঁছিলাম। জাহাজখানি নাকি ঘণ্টায় ৯½ মাইল চলে। এই কয়দিনে ৪।৫ মাইলও চলিয়াছে। ৫।৬ দিনের স্থানে ৯ দিনে হংকং আসিলাম। আজ অত্যন্ত শীত—কাল থেকে হঠাৎ যেন শীত পড়িল; আগে বেশ গরম ছিল।

হংকংএ বেড়াতে নামিলাম। সহরটী একদিকে যেমন সুদৃশ্য তেমনি জাঁকজমকে পূর্ণ। পর্ব্বতময় স্থান বলিয়া রাস্তাগুলি কোনটা উঁচু, কোনটা নীচু। ৫।৬

তালা পর্য্যন্ত উচ্চ বড় বড় বাড়ী। নিম্নতলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত দোকান। ফুটপাথের উপর ছাদ। রাস্তায় ট্রাম, রিক্স্ ও সীড্ন চেয়ার (অনেকটা ছাদশূন্য পাল্কির মত)। ঘোড়ার গাড়ী দেখিলাম না। হংকং পীক্ ট্রামে উঠিতে হয়। পীক্ ট্রামওয়ে এক আশ্চর্য্য জিনিষ। পীকের উপরে ট্রামওয়ে ষ্টেশনস্থিত ইঞ্জিনের চাকায় আবদ্ধ লৌহরজ্জুদ্বারা দুইটী ট্রাম বাঁধা থাকে। চাকাটী ঘুরান হয়, তৎসঙ্গে ট্রাম দুইটী সমসূত্রে আকর্ষিত হয়ে একটী উপরে উঠে ও অপরটী নামিয়া আসে। খাড়া পাহাড়ের উপর এরূপে যাতায়াত আশ্চর্য্য ব্যাপার! ট্রাম শেষ পর্য্যন্ত যায় না। যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে পীক্‌হোটেল (Peak Hotel) নামে একটী হোটেলআছে। এখান থেকে হেঁটে উপরে উঠিতে হয়। উপরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী ও বাগানাদি আছে। স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য বেঞ্চ। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানা প্রকারসুদৃশ্য বৃক্ষাদি আছে। পীকে হেঁটে উঠিবার জন্য একটীরাস্তা আছে। পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রের বড় বড়জাহাজগুলি অতি ক্ষুদ্র দেখায়।

রাত্রে সমুদ্র হইতে হংকংএর দৃশ্য আরও মনোহর। পাহাড়ের উপর সহরে ও গৃহে গৃহে আলো দেখিয়া বোধ হয় যেন অসংখ্য নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে! বাস্তবিক স্থানটী বড়ই সুন্দর! এখানে নানা দেশীয় লোকের বাস। অধিকাংশই বোধ হইল চাইনীজ্।

৪ঠা ডিসেম্বর—বৈকালে ৪টায় জাহাজ ছাড়িল। আকাশ পরিষ্কার, এবার আর কোন কষ্ট হল না, কারণ ঝড় বৃষ্টি আর হয় নাই। জাহাজও বেশ স্থির ভাবে চলিতেছে। ৯ই প্রাতে সাংহাই পৌঁছিলাম। শীতের জন্য ঘরে পাইপে গরম জল নেওয়া হয়েছে। তাহাতে ঘরখানি বেশ গরম থাকে। ইয়াংসিকিয়াং খুব বড় নদী। এখানে অসম্ভব শীত। এত শীতবস্ত্র পরিধান করিয়াও শীতে শরীর যেন অবসন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। সহরটী বেশ পরিষ্কার। রাস্তাগুলি ইটে বাঁধান, সিমেণ্ট করা, সাদা ধব্‌ধবে, ধুলা নাই। দুইদিকে সুন্দর চাইনীজ্ ধরণের বাড়ী। প্রায় ৫ ঘণ্টা হেঁটে বেড়ালাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ আছে কিন্তু তাহা পত্রশূন্য। ১০ই বৈকালে ৩½টায় জাহাজ সাংহাই ছাড়িল।

১৩ই ডিসেম্বর—প্রাতে জাপানের প্রথম পোর্ট মোজি পৌঁছিলাম। ডাক্তার জাহাজের আরোহীদের পরীক্ষা করিলেন। আমরা নৌকা ক'রে নেমে বেড়াতে গেলাম। জাপান দেখে বেশ আনন্দ হইল। বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তা কর্দ্দমময় ছিল, জুতাপায়ে চলা মহা মুস্কিল; তার উপর আর খুব শীত। দেখিবার জিনিস বিশেষ কিছুই নাই। সহরটী অপরিষ্কার ও কর্দ্দমময় দেখা-গেল। নিকটেই সমুদ্রের অপর পারস্থ সহর সিমোনোসেকি। ফেরী-ষ্টীমারে করে গেলাম। সহর প্রায় একরকমই। এখানে "তেনজিন সামা"র (স্বর্গবাসীর) একটী দেবমন্দির দেখিলাম। সমুদ্রতীরস্থ পাহাড়ের উপর মন্দিরটী স্থাপিত। উঠিবার জন্য সিঁড়ি। প্রবেশ-পথে প্রস্তর-নির্ম্মিত "তোরি" নামক ফটক। দরজার চৌকাঠের নিম্ন দিকের কাঠখানা না থাকিলে যেরূপ হয়, ঠিক্ সেই ধরণে দুইদিকে প্রস্তর বা লৌহাদি দ্বারা প্রস্তুত দুইটী স্তম্ভ ও উপরে আড়াআড়ি ভাবে আর একটী—দুটী থামকে সংযোগ করিয়াছে। অভ্যন্তরে নির্জ্জন শান্তির আলয় স্বরূপ সুদৃশ্য বাগান ও মন্দির, সম্মুখে সমুদ্র. উপর হইতে বড়ই সুন্দর দেখা যায়!

এখানে অনেক জাপানী আমাকে বিদেশী দেখে ব্যগ্র হয়ে দেখিতে লাগিল।

১৫ই ডিসেম্বর—বৈকালে কোবে পৌঁছিলাম। জাহাজ লাগিবার পূর্ব্বে ডাক্তার পরীক্ষা করিলেন। হংকংএর পর হইতে মাত্র ৩৪ জন জাপানী আরোহী ছিলেন। আমরা এখানে নামিব; পূর্ব্বেই এক হোটেলে জানান হয়েছিল। হোটেলের লোক এসে আমাদের জিনিস পত্র গুছাইয়া লইল। আমরা নৌকা করে তীরে উঠিলাম। কাষ্টম্ হাউসে (Custom House) জিনিষগুলি দেখাইতে হইল। বৃষ্টি হইয়া রাস্তা এত খারাপ হইয়াছে যে চলা দুষ্কর। এদেশের রাস্তা ভাল নয়।

আমরা হোটেলে উঠিলাম। বাড়ীটী কাঠের; বেড়া, প্রাচীর, গৃহের মেজে, সব কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। মেজেতে

মাদুর মোড়া। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নীচে জুতা খুলে চক্‌চকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিলাম। বসিতে তুলাভরা ফুতন (আসন) দিল। হোটেলের দাসীগণ যখন যাহা প্রয়োজন হয় অত্যন্ত যত্নের সহিত ও বিনীত ভাবে সম্পন্ন করে। ইহাদের আদর যত্ন বড়ই প্রীতিকর। প্রবেশ মাত্র মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসাদি করে। হাঁটু গেড়ে বসিয়া নম্র ও সুমিষ্ট ভাবে কথা বলে। সম্মুখ হইতে যাওয়ার সময় মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করে।

সন্ধ্যাকালে দুইজন পত্রিকার সম্পাদক সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এবং আমাদের বিষয় জ্ঞাত হইয়া সংবাদ-পত্রে আমাদের সংবাদ ও ছবি দিতে চাহিলেন। ইণ্ডিয়ায় তাকেদাসানের এক জাপানী বন্ধু কাওয়াগুচি সান্ (Kawaguchisan) আমাদের বিবাহের পর কাশী হইতে যে পত্র লিখেছিলেন তাহা দেখান হইল। পত্র খানির মর্ম্ম এই—"তুমি যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছ তাঁহার পিতা অতি সৎলোক বলিয়া খ্যাত। অনেকের নিকট তাঁহার সুনাম শুনিতে পাই। এই সকল সুলোকের সহিত সর্ব্বদা সদ্ভাবে থাকিবে। আশা করি তুমি যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হওয়ার ন্যায় জাপানীদের দুর্ণাম করিবে না।"

তৎপরদিন "খবরের কাগজে বাহির হইল, "মিঃ তাকেদা ইণ্ডিয়ার অমুকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া কয়েক বৎসর পর সস্ত্রীক পরমানন্দে স্বদেশাগমন করিয়াছেন। আনন্দ যেন তাঁহার চক্ষু হইতে উথলাইয়া পড়িতেছে।" ইত্যাদি।

জাপান হইতে টেলিগ্রাম করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রতি শব্দে প্রায় ৩৲ করে খরচ হয় বলে করিলাম না।

১৭ই ডিসেম্বর—প্রাতে ৮টার ট্রেণে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩টায় ওঁদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে ট্রেনের ব্যবস্থা বেশ সুখকর। গাড়ীর সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে দুটী দরজা. এবং ট্রেণে চলাচল করার জন্য সেতু আছে। মাঝে মাঝে ষ্টেশনে গাড়ীগুলি ঝাড়ে ও জলদিয়া মুছিয়া দেয়। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি আমাদের দেশের মধ্যম শ্রেণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শীতের জন্য গরম জলের পাইপ আছে। আরোহীগণ সঙ্গে অধিক জিনিষ লয় না, সমুদায় জিনিস মালগাড়ীতে দেয়। ট্রেণে উঠিবার সময় ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। স্থানীয় কর্ম্মচারী ও যাত্রীগণ পরস্পর পরস্পরের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত। জাতীয় একতা পথে ঘাটেও পূর্ণরূপে অনুভব করা যায়। পর্ব্বতময় দেশ বলিয়া ট্রেণ মাঝে মাঝে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যায়। যখন অধিকক্ষণ অন্ধকারে থাকে, তখন আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

ষ্টেশনে আমার দুই দেবর এসেছিলেন। আমরা রিক্সে করে বাড়ী আসিলাম। জাপানে ঘোড়ার গাড়ী নাই বলিলেই হয়। এখানে রিক্সে একজন বসে ও মানুষ ঘোড়ার মত টানে।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে বাড়ী এসে পৌঁছিলাম। বাড়ী একখানা গ্রামে; চারিদিকে শূন্য মাঠ। এখন মাঠে গম ও মূলা গাছ। অন্যান্য বৃক্ষ ও "কুবানোকি" (সিল্ক পোকা যে বৃক্ষের পাতা খায়) প্রভৃতি অনেক পত্রশূন্য বৃক্ষ শুষ্ক তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান। ষ্টেশন হইতে এই গ্রামটী অনেক দূর। গ্রামের নিকটস্থ হইতেই আত্মীয় স্বজনগণ পরিবেষ্টন করিয়া বহুলোক একত্রে আনন্দ প্রকাশ ও অভিবাদনাদি করিতে লাগিলেন। আমরা গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে নিকটস্থ পূর্ব্বোল্লিখিত "তোরি" অভ্যন্তরস্থ নির্জ্জন স্থানে ক্ষুদ্র প্রার্থনায়,—যিনি আজ আমাদের বুকে করে, কত অবস্থায় রক্ষা করে, এতদিনের প্রার্থিত স্থানে আনিয়া প্রিয় ও পূজনীয় জনগণের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দান করিলেন, সেই বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। আমরা গৃহে আসিলে, আমাদের বসিবার আসন, অগ্নিপাত্র, দুগ্ধ-শর্করা ব্যতীত এদেশীয় "ওচা" (চা) ও কিছু পিষ্টক দিলেন। তাকেদাসানের আত্মীয়স্বজনগণ, আজ আমরা আসিব বলে নিমন্ত্রিত হইয়া একত্র হইয়াছিলেন। আজ ৯ বৎসর পরে—যে পিতামাতা ও আত্মীয়গণ বহুদিন পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বিদেশে তাঁহার মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলেন ও পরে সংবাদ পাইয়াও সশরীরে মিলিত হইবার আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন,

তাঁহারাও আজ কত আনন্দিত হইলেন। চারিদিকে উপস্থিত সকলে ঘিরিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। ছোট বড় সকলেই টুপী খুলিয়া জানুর উপর উপবেশন পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া (আমাদের দেশে পদধূলি লওয়া ব্যতীত প্রণামের নিয়মানুসারে) পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন। একে একে সকলে নিজ নিজ পরিচয়ের সঙ্গে অভিবাদন, কুশলাদি জিজ্ঞাসা, ধন্যবাদ ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কথা বলিতে পারি না বলে নীরবে প্রণাম করিলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমি গুরুজনদের প্রণাম করিতেছি, কিন্তু দেখি দেশীয় প্রণালী অনুসারে উঁহারাও মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া আছেন।

আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী স্বহস্তে আমার খাবার প্রস্তুত ক'রে দিলেন। শীতের জন্য বড় কষ্ট পাইতেছি ইত্যাদি বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা প্রস্তুত ক'রে দিলেন ও শীঘ্র শয়ন করিতে বলিলেন। নিমন্ত্রিতগণ আহারের পর নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

এ দেশী আহার আমার পক্ষে অরুচিকর বলিয়া আমার নিজের তরকারী প্রায়ই নিজে রান্না করিতে আরম্ভ করিলাম। এ দেশে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার অন্নাহার করে। রন্ধনাদি আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাতের ফেন ফেলা হয় না। একেবারে এরূপ ভাবে জল দেওয়া হয় যাতে চাউলগুলি ঠিক্ রকম সিদ্ধ হয়। তৈল, ঘৃত ও মশলা ছাড়া, তরকারী, মাছ ও মাংস "সইও" নামক এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত লবণাক্ত তরল পদার্থ দিয়া সিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ করা হয়। মাংসগুলি নাম মাত্র সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, কাঁচা শুষ্কমৎস্য ও লবণাক্ত মৎস্য পোড়া ইত্যাদি খুব আহার করে। মূলা এঁদের অতি প্রিয় খাদ্য। এখানে খুব বড় বড় মোটা মোটা মূলা জন্মে। কাঁচাও খায়। আবার লবণ মাখিয়া কিছু শুকাইয়া একস্থানে বন্ধ করিয়া রাখে, যখন প্রায় পঁচিয়া উঠে, তখন আহার করে। ছোট অনুচ্চ টেবিলের উপর কয়েকটী ছোট ছোট চীনা বাটীতে মাছ, তরকারী, মূলা, ফুলের চাট্নী ইত্যাদি ও একটী বাটী ভাত খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়। ভাত একটী পাত্রে লইয়া একজনে ঐ বাটীতে ভাত উঠাইয়া দেয়। দুটী কাঠি ভাত খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন দ্রব্য হাত দিয়া খাওয়া এদের নিয়ম বিরুদ্ধ।

এখানে বাড়ীগুলি কাঠের। ফটকে দরজায় একটী ঘণ্টা বাঁধা থাকে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার শব্দ হয়, তাহাতে গৃহস্বামী জানিতে পারেন। দরজার চৌকাঠে উপরে ও নীচে খাঁজ কাটা থাকে। দরজায় কব্জা দেওয়া নয়, ঐ খাঁজে আট্‌কান থাকে। এক দিক হইতে অপর দিকে ঠে'লে দিতে হয়। গৃহের প্রাচীরও প্রায় কাঠের। কোন অংশ বাঁশের বেড়ার উপর মাটি প্রভৃতির লেপ দিয়া প্রস্তুত হয়, বাকি সমুদায় কাঠের। ঐরূপ উপর ও নীচের চৌকাঠের খাঁজের ভিতর কাঠের বেড়াগুলি আট্‌কান থাকে। দিনে সবগুলি ঠে'লে একদিকে রাখা হয়, রাত্রে বন্ধ করা হয়। অভ্যন্তরস্থ বেড়াগুলি কাগজের। কাঠের ফ্রেমে কাগজ আঠা দিয়া লাগান থাকে, সেগুলি ঐরূপ চৌকাঠের খাঁজে আট্‌কান থাকে ও ইচ্ছামত এদিক ওদিকে ঠে'লে দেওয়া যায়। গৃহখানি ভূমি হইতে প্রায় এক ফুট উচ্চ কাঠের মাচার উপর অবস্থিত। ঘরের মেজে মোটা মাদুর দ্বারা আবৃত। ঘরের ছাদ মাটির খোলা বা খড় দ্বারা প্রস্তুত। গৃহে আস্‌বাব্‌-পত্র প্রায় কিছুই নাই। বসিবার জন্য চেয়ার টেবিল ব্যবহৃত হয় না। "ফুতনে"র উপর হাঁটু গাড়িয়া বসে। ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধূলা ময়লা নাই। বিছানাদি কাঠের বা কাগজের সুদৃশ্য বেড়ায় আবদ্ধ। এক কোণে বন্ধ করে রাখা হয়। একদিকে এক কোণে হয়ত মনোহর দৃশ্যপূর্ণ ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান, একটী সুদৃশ্য সুসজ্জিত ক্ষুদ্র গাছ বা কিছু সুন্দর জিনিষ রক্ষিত। কোন স্থলে ছবি বা ফটো টাঙ্গান থাকে। গৃহ-সজ্জার মধ্যে ইহাই প্রায় যথেষ্ট। একখানি বড় ঘর কাগজের বেড়া দিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। প্রতি গৃহে গৃহ-দেবতা বুদ্ধ-মূর্ত্তি একটী সুদৃশ্য পিতল নির্ম্মিত বাক্সে রক্ষিত। প্রতিদিন গৃহস্বামী ধূপ, ধূনা ও আলো জ্বালিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় পূজা করেন। গৃহকর্ত্রী কয়েকটী ভাতের ডেলা সাজাইয়া ভোগ দেন ও ফুলদানীতে ফুল ও পাতা

সাজাইয়া রাখেন। কাঠের ঘরগুলি বাহির হইতে বিশেষ সুন্দর বোধ হয় না। বাহির হইতে পর্ণ-কুটীরের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে বেশ সুন্দর দেখা যায়। প্রতি বাড়ীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান থাকে; তন্মধ্যে একটী নকল পাহাড়ের মত উচ্চস্থান ও কয়েকটী সুন্দর সুন্দর গাছ থাকে। বাগানটী সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

এদের পোষাক আমাদের পক্ষে অদ্ভুত বলে বোধ হয়। স্ত্রী-পুরুষের প্রায় এক ধরণেরই পোষাক। পোষাকের মধ্যে "কিমোনো" প্রধান। ইহা পা পর্য্যন্ত পড়ে। সম্মুখ দিকটা খোলা. দুই ধার একটার উপর আর একটা রেখে "ওবি" নামক একটা চওড়া মূল্যবান ফিতা দ্বারা "কিমোনো"টা বন্ধ করা হয়। "ওবি"টা খুব লম্বা। কোমরে জড়াইয়া পশ্চাদ্দিকে একটী ফাঁস দিয়ে রাখে। কিমোনোর হাতের নীচে কতকটা কাপড় থলির মত ঝোলান থাকে। ইহা পকেটের কাজ করে। ইহা পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বেশী লম্বা হয়। "ওবি"টী পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চওড়া হয়। স্ত্রী-পুরুষের পোষাকের বিভিন্নতার মধ্যে আর যে যৎসামান্য পার্থক্য আছে তাহা বোঝা যায় না। স্ত্রীলোকেরা "ওবি"র ফাঁস খুব বড় করে দেয় ও একটী সরু ফিতা দ্বারা "ওবি"টী আট্‌কাইয়া রাখে। শীতকালে ইহার উপরে "হাওরী" নামক আর একটী পোষাক পরিধান করে। ইহা জানুর অল্প নিম্ন পর্য্যন্ত থাকে, সাম্‌নের দিক্‌টা খোলা, একটী সুদৃশ্য ফিতা দ্বারা বুকের উপর আট্‌কান থাকে। হাতের থলিগুলি "কিমোনো"র থলির সমান হয়। শীতকালে পোষাকের রং গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা গাঢ় হয় এবং পোষাকের ভিতরে তুলা দেওয়া থাকে।

আমাদের আসার সংবাদ শুনিয়া অনেক লোক সর্ব্বদাই আমাদের দেখিতে ও ভারতের কথা শুনিতে আসিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের আহারাদি, পরিচ্ছদ,আচার, রীতি, ধর্ম্ম, আমার আত্মীয়বর্গ ইত্যাদি অনেক বিষয় সম্বন্ধে অনেকে জিজ্ঞাসা করে জানিলেন। তাকেদাসান বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং অন্যান্য ভারতীয় মহাপুরুষ, ভারতের সতীধর্ম্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প বল্‌লেন।

এই গ্রামটীতে অনেক লোকের বসতি। নিকটেই ছোট ছোট সহর আছে; এ গ্রামে খুব সিল্কের চাষ হয়। প্রতিগৃহে সিল্ক পোকা পালন ও গুটী হইতে সূতা প্রস্তুত করে। বাড়ী বাড়ী তাঁত আছে। মেয়েরা কাপড় বুনে ও গৃহের সকল কর্ম্মই করে। এ খানে চাউল পরিষ্কার-প্রণালী আমাদের দেশ হইতে ভিন্ন প্রকার। আমাদের দেশে যেমন কেবল ঢেঁকিদ্বারা ধান ভেনে চাউল প্রস্তুত করে, এখানে সেরূপ করে না। ইহারা চাউল প্রস্তুত করিতে ৩।৪টী যন্ত্র ব্যবহার করে। একটী কাঠের যাঁতাদ্বারা ধানগুলি পেষণ করে। ঝাড়িবার জন্য 'কুলা' ব্যবহার না করিয়া একটী আবদ্ধ বাক্সে উপরের খোলা মুখ দ্বারা চাউলগুলি ধীরে ধীরে ঢালে ও বাক্সের অভ্যন্তরস্থ পাখা ঘুরাইতে থাকে। পাখার বিপরীত দিকে বাক্সের একদিক খোলা থাকে। তদ্দ্বারা তুষগুলি বাহির হয় ও নিম্নের একটী খোলা মুখ দিয়া চাউল পড়ে। তৎপরে আবার জালদ্বারা প্রস্তুত চালনীর মত বাক্সে ঢালে। চাউল নীচে পড়ে ও ধানগুলি উপরে থাকে। পরে অল্প ছাঁটিয়া কুঁড়া পরিষ্কার করে। এই রূপে কতকগুলি যন্ত্রসাহায্যে অল্পায়াসে, অল্প সময়ে প্রচুর চাউল প্রস্তুত হয়।

অনেক স্থলে মেয়েরা মাঠে স্বামীসহ কৃষিকর্ম্ম করে। বাজারে, দোকানে, ষ্টেশনে, সর্ব্বত্র মেয়েরা কাজ করে। আমোদ প্রমোদের স্থলে. যেখানে অত্যন্ত জনতা হয় মেয়েরা সেখানে তত্ত্বাবধান করে। তামাসা দেখার জন্য টিকিট বিক্রয়াদি মেয়েরাই করে।

মেয়েরা সাধারণতঃ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া ঘরের দরজাগুলি খুলিয়া দেয়। তৎপর রন্ধন আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সকলে উঠিয়া মুখ ধুইতে যায়। গৃহিণীরা বিছানাদি সব ভিতরে বদ্ধ করিয়া ঘর পরিষ্কার, "হিবাচী"তে (অগ্নিপাত্র) অগ্নি ও চায়ের জল বসাইয়া দেয়। সকলে একত্র আহার করে। তৎপর ছেলেরা সব স্কুলে যায়। মা সন্তানদের পুস্তকাদি ও মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য "বেস্তো" (ভাত, কিছু মূলা ও অল্প তরকারী বা মাছ ইত্যাদি) একটী ছোট বাক্সে বেঁধে দেন। মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সময় সাধারণ পোষাকের উপর নীচের

দিকে একটী ঘাঘরার মত পরে। গৃহ-কর্ত্তা কয়েক মিনিট গৃহদেবতার পূজা করিয়া স্বকর্ম্মে প্রস্থান করেন। এই কাজগুলি সংসারের অর্থসমাগমের উপায় হয়। মধ্যাহ্নে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হয় ত রন্ধন ও খাওয়া শেষ হইয়া যায়; সারাদিন নানা কার্য্যে থাকিয়া সন্ধ্যায় সকলে একত্রে আহারাদি সম্পন্ন করেন।

স্নান এখানে প্রায় সকলেই সন্ধ্যাকালে করে। গরম জলের টবে শরীর ডুবাইয়া স্নান করে। ওরূপ স্নান শীতকালে খুব আরামপ্রদ, কিন্তু জাপানীরা গ্রীষ্মকালেও প্রতিদিন প্রায় গরম জলেই স্নান করে। স্থানে স্থানে সরকারী স্নানাগার আছে। যাহাদের বাড়ীতে গরম জলের বন্দোবস্ত না থাকে তাহারা সেখানে স্নান করে। একটী চৌবাচ্চায় গরম জল থাকে। সকলে তাহার ভিতরে শরীর ডুবাইয়া স্নান করে। প্রতি জনকে স্নানের জন্য ২।৩ পয়সা করে দিতে হয়।

বৈকালে ও সান্ধ্যাহারের পর সন্তানগণ সহ আমোদ প্রমোদ, তাহাদের নীতিশিক্ষা দেওয়া, সঙ্গে লইয়া বেড়ান ইত্যাদি জননীর কার্য্য। পত্রিকা পাঠ, সেলাই আদি শয়নের পূর্ব্বে করে। আমাদের দেশে রন্ধন ভোজনই যেমন একমাত্র কার্য্য, ইহাদের তা নয়। কি দরিদ্র কি ধনী, জাপানী স্ত্রীগণ দিবসের প্রায় অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার বেশী রন্ধন ভোজন ও নিদ্রায় কাটায় না। অথচ এদের তিনবার রন্ধন ও আহার করিতে হয়। অপর অর্দ্ধাংশ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের, পরিবারের, দেশের ও জাতির উন্নতির সুযোগ করে।

মেয়েদের পতি, পতির আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা পরম ধর্ম্ম। ইহার কোনরূপ অন্যথা হইলে স্ত্রী অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন। এমন কি, শাশুড়ীর অপছন্দ হইলে স্বামী অনায়াসে স্ত্রী-পরিত্যাগ করিতে পারেন।

শ্রীহরিপ্রভা তাকেদা।

উল্কা।

রাত্রিকালে আকাশের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে যেন একটী নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে দেখা যায়। বাস্তবিক উহা নক্ষত্র নহে, উল্কা (Shooting Stars)। নক্ষত্রগুলি অনেক বড়, এক একটা নক্ষত্র এক একটা সূর্য্য। নক্ষত্র যদি ঐরূপ ছুটিয়া আসিয়া আমাদের পৃথিবীতে পড়িত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই পৃথিবী ধ্বংস হইত।

উল্কাপাতকেই সাধারণ লোকে 'তারা-খসা' বলে। উল্কাগুলি যখন আকাশ হইতে ছুটিয়া পড়ে, তখন দেখিলে বোধ হয় যেন তারাগুলিই খসিয়া পড়িতেছে। বহুসংখ্যক উল্কা যখন হাউইর মত আকাশ হইতে ছুটিয়া আইসে, তখন দেখিতে বড়ই সুন্দর দেখায়!

উল্কা-পিণ্ডের গড়।

সর্ব্বদাই উল্কাপাত হইতেছে। একজন পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, গড়ে প্রতিবৎসর ছোট বড় প্রায় ১৪,৬০০,০০০০০০০ চৌদ্দহাজার ছয় শত কোটী উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়। দিনের বেলায়ও উল্কাপাত হয় কিন্তু সূর্য্যের প্রখর আলোকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

উল্কা-পিণ্ডের আকার ও আয়তন।

গ্রহাদির তুলনায় উল্কার আয়তন অতি ক্ষুদ্র। অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডই ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়। এ পর্য্যন্ত দুই শত মণের অধিক ওজনের উল্কা-পিণ্ড পতিত হয় নাই। কঙ্করের মত ক্ষুদ্র উল্কা-পিণ্ড কোটী কোটী পড়িতেছে।

প্রস্তরখণ্ড হইতে উল্কা-পিণ্ডগুলি চিনিয়া বাছিয়া বাহির করা অতি কঠিন কাজ। সমুদ্রের তীরে, বিস্তৃত মাঠে কিম্বা মরুভূমিতে বহুসংখ্যক উল্কা-পিণ্ড পড়িয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে দেখিলেও সাধারণ পাথর মনে করিয়া উপেক্ষা করি। বাস্তবিক আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত পাথর ও উল্কা-পিণ্ডে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। যে সকল উল্কা-পিণ্ড মানুষের সম্মুখে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে, কেবল সেইগুলিই যত্নের সহিত 'মিউজিয়ম্' ইত্যাদি স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়মেও অনেক উল্কা-পিণ্ড আছে। সাধারণ লোকে ঐ সকল পাথর দেখিয়া বড় একটা আমোদ পায় না। উহারা যে এককালে শূন্যে বিচরণ

করিত, তারপর এক দিন নক্ষত্রের মত ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়িয়াছে, সেই কৌতুহলপূর্ণ ইতিহাস সাধারণ লোকে জানে না। তাই ঐ পাথরগুলি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।

উল্কাপাত দেখিয়া সকল দেশেরই প্রাচীন কালের লোকেরা অতিশয় বিস্মিত হইত। তাহারা উল্কাপাতের কারণ জানিত না। তখন নানাপ্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহারা উল্কাপাত ব্যাপারটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। নানাদেশের প্রাচীন গ্রন্থে আকাশ হইতে অগ্নিবৃষ্টি ও পুষ্পবৃষ্টি হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নিবৃষ্টি ও পুষ্পবৃষ্টি এই উল্কা-বৃষ্টিকেই বুঝাইতেছে বলিয়া ধারণা হয়। বোধ হয় কোন শুভ ব্যাপার, কি প্রসিদ্ধ ঘটনা-কালে আকাশ হইতে প্রচুর উল্কাপাত হইলে উহাকেই দেবতাদের আশীর্ব্বাদ-সূচক পুষ্পবৃষ্টি মনে করা হইত! আর অশুভ ব্যাপারে কিম্বা দুর্ঘটনা-কালে অধিক সংখ্যক উল্কাপাত হইলে উহাকে অমঙ্গলসূচক অগ্নিবৃষ্টি নামে অভিহিত করা হইত। মহাপুরুষদিগের জন্মকালে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইবার কথা শুনা যায়। আরব দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, যে রাত্রে ইব্রাহিম বেন্ আহাম্মদ নামক সম্রাট্ প্রাণত্যাগ করেন, সেই রাত্রে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল। সক্রেটিস যে রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন সেই রাত্রিতে একটী প্রকাণ্ড উল্কা পতিত হইয়াছিল।

অগ্নিবৃষ্টি ও পুষ্পবৃষ্টি।

উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার সময় কখন কখন ভয়ানক শব্দ হইয়া থাকে। এক এক সময়ে এই শব্দ বজ্রপাতের শব্দের ন্যায় ভীষণ হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে দুই প্রহরের সময় বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটী উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়। উহা পড়িবার সময় কামানের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইয়াছিল। ঐ উল্কা-পিণ্ড এখন কলিকাতা 'এসিয়াটিক্ সোসাইটী'র গৃহে রক্ষিত আছে।

কয়েকটী উল্কা-পিণ্ডের বিবরণ।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী স্রপ্‌সায়ারে (Shropshire) একটী প্রকাণ্ড উল্কা পড়িয়াছিল। এই উল্কা-পিণ্ডটী দেখিতে নিরেট লোহার মত। উহা পৃথিবীতে পড়িবার সময় এমন ভীষণ শব্দ হইয়াছিল যে, ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরাও ভয়ে অধীর হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত উল্কা-পিণ্ডটী এক কৃষকের ক্ষেত্রে পতিত হয়। কৃষক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিল। সে দৌড়িয়া গিয়া দেখিল তাহার ক্ষেতের এক হাত মাটির নীচে একটা লৌহ-পিণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। স্পর্শ করিয়া দেখিল, উহা তখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে। ফরাসী দেশে উল্কা পড়িয়া একটা গোলাঘর একবারে পুড়িয়া গিয়াছিল।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার অন্তর্গত "কনেক্‌টীকট্" প্রদেশে একটী উল্কাপাত হইয়াছিল। উহা পৃথিবীতে পড়িবার পূর্ব্বে শূন্যে তিন বার তোপের ন্যায় শব্দ হইয়াছিল। এই উল্কা-পিণ্ডের যতগুলি খণ্ড পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মোট ওজন প্রায় তিন মণ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে "ওহিও" প্রদেশে একটী উল্কা-পিণ্ড পড়িয়াছিল, উহার ওজন প্রায় আট মণ।

উল্কাগুলির আলোক নাই। কিন্তু উল্কা যখন আকাশ হইতে পতিত হয় তখন জ্বলন্ত হাউইর মত দেখা যায়। ইহার কারণ পরে বলিব। লৌহ, তামা, টিন্, গন্ধক, নিকেল্, কোবাল্ট, মেঙ্গেনিস্, গ্রেফাইট্, চুণ, সোরা প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ উল্কা-পিণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই, সে বস্তু উল্কাতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর খনির মধ্যে বিশুদ্ধ নিকেল্ ধাতু পাওয়া যায় না, উহাদের সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে; পরে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু উল্কা-পিণ্ডে যে লৌহ ও নিকেল পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ। কথিত আছে, পারস্যের সাহের এবং তিব্বতের বৌদ্ধগুরু লামার তরবারি উল্কার লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

উল্কার উপাদান।

প্রতিদিন গড়ে ছোট বড় ৪০,০০০০০০০ চল্লিশ কোটী উল্কা পৃথিবীতে পতিত হয়। যদি লক্ষ উল্কা-

পিণ্ডের মধ্যে একটাও মানুষের উপরে পড়িত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবী জন-শূন্য হইয়া যাইত। কিন্তু এপর্য্যন্ত উল্কাপাতে সমস্ত পৃথিবীতে দুই তিনটী লোকের বেশী মরিতে শুনা যায় নাই। কিরূপে আমরা এই ভীষণ উৎপাত হইতে রক্ষা পাইতেছি তাহা জানিবার জন্য কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক।

উল্কাপাতে মৃত্যু।

জলমগ্ন গোলকের ন্যায় আমাদের পৃথিবী বায়ুর মধ্যে ডুবিয়া আছে। পৃথিবীর চারিদিকেই বায়ুর আবরণ (Atmosphere)। এই আবরণের গভীরতা. কেহ কেহ বলেন, পঞ্চাশ মাইল। আবার কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পৃথিবীর ৪০০।৫০০ শত মাইল উপরেও বায়ু আছে। সুদূর আকাশ হইতে কোন পদার্থ যখন পৃথিবীতে পতিত হয় তখন ঐ পদার্থকে বায়ু-স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয়। বায়ু খুব হাল্‌কা। হাল্‌কা হইলেও গতিশীল বস্তুকে বাধা দিয়া থাকে। গতির বেগ যত বৃদ্ধি পায় বায়ুর প্রতিরোধ করিবার শক্তিও তত প্রবল হয়। জলে অঙ্গুলি স্থাপন করিলে জল সরিয়া যায় কিন্তু জলের ভিতর দিয়া কামানের গোলাও বেশী অগ্রসর হইতে পারে না। বায়ুর গতিরোধ করিবার শক্তি অনেকটা জলের মতই। দৌড়িবার সময় বায়ু আমাদিগকে বাধা দেয়; গতিশীল রেলগাড়ীকে আরও বেশী বাধা দিয়া থাকে। খুব দ্রুত-গামী রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলে, কিন্তু উল্কাগুলি মিনিটে ১৮০০ এক হাজার আট শত মাইল গতিতে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডল ভেদ করিয়া আইসে। সুতরাং বায়ু উল্কাগুলিকে অত্যন্ত বাধা দিয়া থাকে। ঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। "ফুটবলে" বায়ু পুরিবার সময় সামান্য ধর্ষণে পাম্পের (Pump) চোঙ্গ গরম হইয়া উঠে। বায়ুর সহিত উল্কা-পিণ্ডসমূহের সংঘর্ষণ তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী হয়। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উল্কা-পিণ্ড সকল অতিশয় উত্তপ্ত হয়। উত্তাপ যতই বৃদ্ধি পায় উল্কা-পিণ্ডসমূহ ততই রক্তবর্ণ ধারণ করিতে থাকে। অবশেষে উত্তাপের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে উল্কা-পিণ্ডগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং তখনই জলন্ত বাষ্পে পরিণত হয়। আমরা সেই সময়েই পৃথিবী হইতে উল্কাপাত দেখি। বায়ুর সহিত সংঘর্ষণজনিত তাপে লোহার মত শক্ত উল্কা-পিণ্ডও বাষ্প হইয়া পড়ে এবং অবশেষে ধূলি-কণার ন্যায় পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয়। দৈবাৎ দুই একটা লোহার ন্যায় শক্ত উল্কা-পিণ্ড পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। বায়ুর দুর্ভেদ্য আবরণ আছে বলিয়াই উল্কার উৎপাত হইতে জন-প্রাণী রক্ষিত হইতেছে।

বায়ুর দুর্ভেদ্য আবরণ।

সাধারণতঃ পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ৭০।৭৫ মাইল উপরে উল্কা-গুলি প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় এবং ৫০।৫৫ মাইল উপরে উহারা বাষ্পে পরিণত হইয়া শেষে অদৃশ্য হইয়া যায়।

কোটী কোটী উল্কা-পিণ্ড কোথা হইতে আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে এবং কেনই বা পৃথিবীতে আইসে সেই কথাই এখন বলিব।

গ্রহসকল যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি উল্কাসকলও সূর্য্যের আকর্ষণের অধীন হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কোটী কোটী উল্কা নিজ নিজ পথে সর্ব্বদা ছুটিতেছে। কাহারও পথ ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই। তবে উহারা পৃথিবীতে আইসে কিরূপে?

উল্কাপাতের কারণ।

পৃথিবী যেমন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি উল্কাসকলও নির্দ্দিষ্ট পথে স্বাধীন ভাবে ৩৩ বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর কক্ষ উল্কার পথ ছেদ করিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীকে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ কালে অগণিত উল্কার মধ্য দিয়া কতকটা স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। উল্কাগুলি ছোট বড় অসংখ্য দলে, কোটী কোটী মাইল জুড়িয়া, অসংখ্য পথে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী যখন উল্কা-পথ অতিক্রম করিয়া যায়, তখন উল্কার দল ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে প্রবেশ করে। তখন আর যাইতে পারে না। ধীবর জাল দিয়া যেমন মাছ ধরে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি বায়ুর জাল দিয়া উল্কা-মাছ ধরিতেছে। উল্কার পথ

অতিশয় বিস্তৃত এবং অসংখ্য উল্কা অসংখ্য দলে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাই সর্ব্বদাই পৃথিবীর বায়ু-জালে উল্কা ধরা পড়িতেছে।

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড উল্কাদলের পথ অতিক্রম করিয়া যায়। সেই সময়ে অনেক উল্কা ধরা পড়ে। এইজন্য অগ্রহায়ণ মাসে অধিক সংখ্যক উল্কাপাত হইয়া থাকে। ঐরূপ উল্কার আর একটা খুব প্রকাণ্ড দল আছে।

অগ্রহায়ণের উল্কা-বর্ষণ।

পৃথিবীর সহিত যখন ঐ দলের সাক্ষাৎ হয় তখনও অজস্র উল্কা-বৃষ্টি হইয়া থাকে। তেত্রিশ বৎসর পর পর ঐ প্রকাণ্ড দলটা হইতে প্রচুর পরিমাণে উল্কা বর্ষিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি. বায়ুর সহিত উল্কা-পিণ্ডের সংঘর্ষ হইলে এত তাপের উৎপত্তি হয় যে ক্ষণকাল মধ্যে কঠিন উল্কা-পিণ্ড বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়।

কখন কখন আকাশের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অনবরত উল্কা-বর্ষণ হইয়া থাকে। সেই দৃশ্য দেখিতে বড়ই মনোরম। যেন সহস্র সহস্র উজ্জ্বল তারার ফুল নীল আকাশ ভেদ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সমস্ত রাত্রি এইরূপ অবিশ্রান্ত উল্কা-বর্ষণ হইতে শুনা গিয়াছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে আমেরিকায় যে উল্কা-বৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। ঐ দিবস রাত্রি নয়টা হইতে পর দিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অজস্র উল্কা-বর্ষণ হইয়াছিল।

এখন উল্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। কেহ কেহ বলেন, শুক্র মঙ্গলাদি কোন গ্রহের আগ্নেয়-গিরি হইতে এক সময়ে বহু সংখ্যক প্রস্তর বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ সকল প্রস্তরখণ্ড এখন উল্কারূপে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি আছে। পৃথিবীর ন্যায় অপরাপর গ্রহেও মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত পদার্থ গ্রহ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে কোন বস্তুই কোন গ্রহ হইতে একবারে চলিয়া যাইতে পারিবে না। মাধ্যাকর্ষণের শক্তি এক-বারে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে গিরি-নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ সাত মাইল হওয়া চাই। কিন্তু আগ্নেয় গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরের বেগ সেকেণ্ডে দুই মাইলের অধিক হয় না। সুতরাং এই মত গ্রহণ করা যায় না।

উল্কার উৎপত্তি।

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, চন্দ্রের আগ্নেয় গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরসকল এখন উল্কা রূপে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে। এই মতটী কতদূর সঙ্গত, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক্। চন্দ্রে অসংখ্য আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। আবার চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণও কম। যে জ্যোতিষ্কের জিনিস (mass) যত কম, তাহার আকর্ষণ-শক্তিও তত অল্প হয়। চন্দ্রের জিনিস পৃথিবীর জিনিসের ৮০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবী হইতে কোন পদার্থকে চিরদিনের জন্য উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিদায় দিতে হইলে যে বলের প্রয়োজন, চন্দ্রমণ্ডলে সেই বলের ছয় ভাগের এক ভাগ হইলেই কাজ চলিতে পারে। কিন্তু এই মত সম্বন্ধেও আপত্তি আছে।

উল্কা-বর্ষণ।

চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী। সুতরাং চন্দ্রের পাহাড় হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তররাশি পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। যদি একবার পৃথিবীকে এড়াইয়া যায়, তবে আর কখনও পৃথিবীতে পড়িবে না। অতএব চন্দ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর যদি পৃথিবীতে পতিত হয় তবে চন্দ্র হইতে বাহির হইয়াই একবারে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে হইবে। চন্দ্র হইতে বাহির হইয়াই উল্কাগুলি পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে একথা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, চন্দ্রের পাহাড়গুলি বহুদিন যাবৎ নির্ব্বাপিত সুতরাং এখন আর উহাদের ভিতর হইতে প্রস্তর উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহে আগ্নেয় গিরির অস্তিত্ব এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আবার ঐ সকল বড় বড় গ্রহের আকর্ষণী শক্তিও অধিক। উল্কা-পিণ্ডের সেই ভীষণ আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া আইসা অসম্ভব।

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পৃথিবীর আগ্নেয় গিরি হইতে এক সময়ে যে প্রস্তর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই আবার উল্কা রূপে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উল্কাগুলি কিরূপে যাইতে পারিয়াছিল তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সুতরাং উল্কার উৎপত্তির বিষয় এখনও অপরিজ্ঞাত। *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দেশ-মাতার মর্ম্মের কথা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যে কয়টী সন্তান বলিতেছিলেন, তন্মধ্যে যেটী নববর্ষ-প্রভাতেই গঙ্গা-সৈকত-শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিলেন, তাঁহার স্থান শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

"হাসির গানের" প্রসিদ্ধ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল "হাসির আগুন জ্বালি" নিজের প্রাণ দহিয়াছেন, কিন্তু দেশকে হাসাইয়াছেন। দেশের দৈন্য তাঁহাকে দগ্ধ করিত। দেশ যে আত্ম-সম্মান-বোধ বিসর্জ্জন দিয়া কপটতার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি প্রাণে প্রাণে যে দুঃখ অনুভব করিতেন, বিমুখ শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত তাহাই হাসির আবরণে মণ্ডিত করিয়াছেন।

এ দেশে অশ্লীলতা ভিন্ন ব্যঙ্গ ছিল না। সে ব্যঙ্গ লোকে উপভোগ করিতে পারিত না, কারণ তাহা মোটেই রুচিকর ছিল না, বরং রুচিবিকারই উৎপন্ন করিত। সে ব্যঙ্গ মানুষের হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিত এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও কখনই স্বাস্থ্যকর হইত না। সুতরাং দেশের নিকট ও দশের নিকট ব্যঙ্গ জিনিষ-টাই হাল্‌কা ও ঘৃণার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। এই হাল্‌কা জিনিষটাই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সবল হস্তে বিশেষরূপে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার হাসির গান শ্রোতার ওষ্ঠাধরকে হাস্য-বিকশিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, তাহা ঝিল্লী-রবের ন্যায় অগোচর রূপে যে দেশব্যাপী বিরাট ক্রন্দনের রোল প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তৎপ্রতি শ্রোতার হৃদয়কে পরিপূর্ণ রূপে সচেতন করিয়া দেয়। সে গান শুধু নির্ম্মল হাস্যেরই উদ্রেক করে না, তাহা সকল অসত্যের মধ্য হইতে আমাদের প্রকৃত মূর্ত্তিটীকে মনশ্চক্ষুর সমক্ষে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। সে গান যে কেবল ছোট বড় সকলেরই কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে তাহা নহে, পরন্তু সেগুলি আমাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতাকে লজ্জিত করে। "এমন অবস্থাতে পড়িয়া কত লোকের মত বদ্‌লাইয়াছে" তাহা কে বলিবে? কত "নন্দলাল," কত "Reformed Hindus", কত "বিলাত ফের্‌তা" ভাই তাঁহাদের অবিকৃত প্রতিচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণ-রসে বিগলিত হইয়াছেন তাহা কে বলিবে? শুধু তাহাই নহে, "গাদা গাদা ভিনোলিয়ার" অপব্যবহারও যে কিছুই কমে নাই—তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না! কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষাকে যে নব সম্পদে অলঙ্কৃত করিয়া

---

* লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "আকাশের গল্প" হইতে গৃহীত।

গেলেন তাহা দেশের কর্ত্তব্যবোধকে সচেতন রাখিতে সর্ব্বদা সহায়তা করিবে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান দেশের দুর্ব্বলতার কথা বলিয়া দেয়। তাঁহার রচিত অন্যান্য সঙ্গীত দেশের "নবীন গরিমার" জ্যোতিঃ প্রকাশিত করে। তাঁহার রচিত যে দুইটী সঙ্গীতে আজ বঙ্গদেশ মুখরিত, যে কোন ভাষা ও যে কোন দেশ সেরূপ সঙ্গীতের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। এমন হৃদয় মাতানো ভাষায় আর কোন্ কবি এত তেজ, এত ভক্তি, এত আশা ব্যক্ত করিয়াছেন? এগুলি "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" প্রাণকে "আকুল" করিয়া তোলে। এ সঙ্গীত দুইটী কত নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে ও ভবিষ্যতে কত নবীন হৃদয়কে দেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় মাতৃ-পূজার এই মন্ত্র দুইটী চিরকাল এদেশে সমাদৃত হইবে। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত তিনি অতি সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি এরূপ ভাবে প্রাণ খুলিয়া বলিতে সক্ষম হইয়াছেন—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, কবিপ্রতিভা ও হৃদয় দিয়া আজীবন এই সাধনাতেই নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার লেখনী দেশব্যাপী বিরাট মিথ্যার অন্তরাল হইতে সত্যকে প্রকাশিত করিতেছিল, তাঁহার লেখনী সমুদায় অমঙ্গলকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র শিব স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়াছিল, তাঁহার লেখনী সৌন্দর্য্যের নব নব বিকাশকে মূর্ত্তি প্রদান করিতেছিল। পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক এইরূপেই তাঁহার সকল কর্ম্ম—সকল চেষ্টাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

বাংলার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল! তোমার প্রার্থনাই পূর্ণ হইল; তোমার—"এই দেশেতেই জন্ম" এবং এই দেশের মাটীতেই তোমার দেহ মিশাইলে। "আঁধারে ঘেড়া দিব্য আলোকের" বার্ত্তা বহন করিয়া তুমি আসিয়াছিলে—সে বার্ত্তা সুন্দররূপেই প্রচার করিয়াছ। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল! তুমি বাঙ্গালীর হৃদয়-পঞ্জর ভগ্ন করিয়া গিয়াছ। "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" দেশের কবি! বাঙ্গালী আজ তোমার বিদায়-সম্ভাষণের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, মৃত্যুর দ্বার দিয়া তুমি অমৃতের রাজ্যে উপনীত হইয়াছ। বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, তোমার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর আশা বিশ্বপতির চরণে নিবেদিত হইতেছে। কিন্তু "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর" তাঁহার দেশের কবি! তোমার কণ্ঠের মধুর তান যে বাংলা দেশের নদীতে উজান বহাইত! বাঙ্গালী ত প্রাণ ভরিয়া তাহা শুনিতে পাইল না। সে তানকে প্রতিধ্বনিত করিয়া বাংলার গগন ধন্য হউক্! তোমার সঙ্গীত বাংলার ভাগ্য-দেবতাকে প্রসন্ন করুক্। আজ বাংলার—"সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠ" তোমার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছে।

শ্রীহিরণ্ময় বসু।

বনলতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে আমিয়াসের আর ভাল ঘুম হইল না; নানা দুঃস্বপ্নে ঘুমের মধ্যেও বার বার চমকাইয়া উঠিতে লাগিলেন। দিনের সমস্ত উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে অক্সেনহামের কথাই পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে জাগিতেছিল। তাঁহাকেই তিনি স্বপ্নে দেখিতেছিলেন। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, অক্সেনহামের জাহাজের অনুসরণ করিয়া তিনিও সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার জাহাজ কিছুতেই চলিতেছে না। অক্সেনহামের জাহাজ যেন, তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল। অবশেষে তাঁহার জাহাজ চলিল বটে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রজনীর ঘোর অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে সে অন্ধকার কাটিয়া চন্দ্রের বিমল রজত-জ্যোৎস্না সমুদ্র-বক্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিল। হঠাৎ যেন দূরে অক্সেনহামের জাহাজ

দেখা দিল। তাহার পাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, মাস্তুল অর্দ্ধভগ্ন, জাহাজখানি জরাজীর্ণ। আমিয়াস যেন দেখিতে পাইলেন, দড়ীতে কতকগুলি কাল কি বস্তু ঝুলিতেছে। আরও অগ্রসর হইয়া যেন দেখিতে পাইলেন, সে দড়ীতে অনেকগুলি মৃতদেহ ঝুলিতেছে! অক্সেনহামের মৃত দেহও তন্মধ্যে রহিয়াছে। সে মৃতদেহ যেন হাত বাড়াইয়া আমিয়াসকে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেছে। ভীতিবিহ্বল চিত্তে আমিয়াস যেন দেখিতে পাইলেন, তিনি দক্ষিণ সমুদ্রে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার জাহাজ ও স্বদেশের মাঝখানে সুবিস্তীর্ণ আমেরিকা দেশ। অক্সেনহামের মৃতদেহ যেন কি গোপনীয় কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে আরও নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিয়া আমিয়াস বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন, রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে। তিনি উঠিয়া সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য ঘরের বাহির হইলেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে জননীর শয়ন-গৃহে তাঁহার শয্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শয্যার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, তিনি রাত্রিতে শয্যা স্পর্শ করেন নাই। আমিয়াস চাহিয়া দেখিলেন, তিনি রাত্রিবাস পরিধান করিয়া তাঁহার উপাসনা-স্থানে উপাসনায় নিমগ্ন। বিনা বাক্যব্যয়ে আমিয়াস গৃহে প্রবেশ করিয়া জননীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, জননী চক্ষু মেলিয়া আমিয়াসকে দেখিয়া একটু হাসিলেন এবং বাহুদ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি যে আমিয়াসের জন্যই প্রার্থনা করিতেছিলেন, আমিয়াস তাহা জানিতেন, তিনিও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জননীর জন্য, অক্সেনহাম ও তাঁহার বিনষ্ট নাবিকদিগের জন্য, তিনি আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিলেন।

অবশেষে মিসেস্ লে গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমিয়াসের কপাল হইতে চুলগুলি সরাইয়া স্নেহাভিষিক্ত-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমিয়াসও মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাতাপুত্র উভয়েই নীরব, কাহারও নিকট কাহারও কিছুই বলিবার ছিল না। উভয়ের হৃদয়ই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, কাহারও কোন কথা অপরের নিকট লুকান ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সেই দৃষ্টি-বিনিময়ের অবসান হইল। জননী সাগ্রহে সন্তানের মুখ চুম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহার একবিন্দু অশ্রু আমিয়াসের মুখের উপর পড়িবার উপক্রম দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার শূন্য-পদযুগল পোষাকের নিম্নে দেখা যাইতেছিল, আমিয়াস মায়ের পায়ের উপর পড়িয়া পাদুখানি চুম্বন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন কৈফিয়ৎ দিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—"কি সুন্দর তোমার পাদুখানি মা!" মিসেস লে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি চিরদিনই সুন্দরী ছিলেন। বার্দ্ধক্যে যৌবনের সেই সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাঁহাদের দেখিবার মত চক্ষু ছিল তাহারা দেখিতে পাইত, ধর্ম্মের এক পবিত্র জ্যোতিঃ তাঁহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মিসেস্ লে বলিলেন, "ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার বাবাও ঠিক্ এই কথা বলিতেন আমিয়াস!"

আমিয়াস বলিলেন, "আমি এখনও তাই বলি, তুমি চিরদিনই সুন্দরী ছিলে—এখনও তুমি সুন্দরী।" জননী উত্তর করিলেন, "যা—যা—বোকা ছেলে, বুড় মায়ের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া দরকার নাই, রাস্তায় একটু বেড়াইতে যাও, তোমার উপযুক্ত কোন তরুণী থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্যের কথা ভাব গিয়ে।"

পুত্র বাহির হইয়া গেলেন। মাতা পুনরায় উপাসনায় নিমগ্ন হইলেন। আমিয়াস স্নান করিবার জন্য তরঙ্গময় সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদ্রের সেই তরঙ্গভঙ্গের সহিত যুঝিয়া মনের আনন্দে স্নান করিলেন, তাঁহার স্নান সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সমুদ্রের তীর হইতে কে যেন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। আমিয়াস মাথা তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার খুড়তুত ভাই ইউষ্টেস্ তাঁহাকে ডাকিতেছে। আমিয়াস তাহাকে দেখিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। কুমারী রোজের ভাবনায় তখন তাঁহার মনপ্রাণ পূর্ণ, ইউষ্টেসের সঙ্গে কথা বলিতে গেলেই সেই চিন্তায় বাধা পড়িবে।

কিন্তু তিন বৎসর পরে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ, ভদ্রতার খাতিরে জল হইতে উঠিতে হইল।

এখানে ইউষ্টেসের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার পিতা পূর্ব্বে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক মেরী সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়া রোমান ক্যাথলিক মত অবলম্বন করেন। কিন্তু তাহার পর এলিজাবেথ যখন সম্রাজ্ঞী হইলেন, তখন আর তিনি মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। সেই সময়ের অনেক রোমান ক্যাথলিক নরনারী ধর্ম্মমতের গোড়ামি বশতঃ এলিজাবেথের বিরুদ্ধে গোপনে নানা ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল। ইউষ্টেসের পিতা কোন গোলমালে যোগ না দিয়া নীরবে তাঁহার বিষয় সম্পত্তির সংরক্ষণে মন দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ের রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণ বড়ই চক্রী ছিলেন। নীরবে ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা ছলে বলে কৌশলে আপনাদিগের ধর্ম্মমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের বেশী প্রিয় ছিল। ইউষ্টেসের পিতাকে ধরিয়া তাঁহারা তাঁহার একটী পুত্রকে পৌরহিত্য ব্রতের জন্য চাহিয়া লইল। ইউষ্টেস্ই সেই পুত্র। সে রীমস্ নগরীতে ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের আশ্রমে ভাবী পৌরহিত্যের শিক্ষালাভ করিতেছিল। ইতিমধ্যেই সত্য-গোপনে, মিথ্যা-আচরণে এবং নানাপ্রকার চক্রান্ত কার্য্যে সে বিশেষ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বকার্য্য সাধনে পুরোহিতগণ তাহাকে অতি উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

অল্পকাল পূর্ব্বে রাজাদেশ হইয়াছিল, ইংলণ্ডবাসিগণের যাহার যাহার সন্তান অথবা কোন অধীনস্থ জন বিদেশে আছে সরকারে তাহাদের নাম দাখিল করিতে হইবে এবং চারিমাস মধ্যে তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই আদেশের ফলে ইউষ্টেস্কেও দেশে ফিরিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখানে থাকিয়াও গোপনে স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সাধনে সে উদাসীন ছিল না।

আমিয়াস ও ইউষ্টেস্ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির যুবক। আমিয়াসের হৃদয় স্বভাবতঃ সরল, উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ; ইউষ্টেস্ কুটীল, পরশ্রীকাতর ও ধর্ম্মাভিমানী। সে মনে মনে জানিত, আমিয়াস সর্ব্বদাই তাহাকে কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করে।

যথারীতি অভিবাদন ও দীর্ঘকাল পরে দর্শনজনিত আনন্দোচ্ছ্বাসের পর দুই ভাইয়ে উপলরাশির উপর বসিয়া নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইউষ্টেস্ বলিল, "কাল তোমার অভিনন্দন-উৎসবের দিনে আসিতে না পারিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে। অদ্য আসিয়া তোমার মার নিকট শুনিতে পাইলাম, এখানে তোমার দেখা পাইব, তাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়াছি।"

আমিয়াস। অনেক দিন পরে দেখা হইল ভাই! রাত্রে জাহাজের ডেকে বেড়াইতে বেড়াইতে কত বার তোমার কথা চিন্তা করিয়াছি"। খুড় মহাশয় ভাল আছেন ত? ওহে, সেই বুড়ো টাট্টু ঘোড়াটা এখনও বেঁচে আছে ত? সেই ডিক্ কামার আর তার মেয়ে নান্সি কেমন আছে হে? মনে হয় কত দীর্ঘকাল যেন তোমাদের বাড়ী যাই নাই!

ইউ। সত্যি তুমি তোমার বেচারা ভাইকে মনে করিয়াছিলে? আমিও ভাই প্রতি রাত্রে দেবতাদের নিকট তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। আহা! তোমারও যদি তাঁদের প্রতি—

আমি। থাম ভাই থাম! তোমার দেবতাদিগকে * তুমি আমি যতটা ভাল মনে করি, তাঁহারা যদি তাহার অর্দ্ধেকও ভাল হন, তবে তাঁহারা তোমার প্রার্থনা ছাড়াও আমার সাহায্য করিবেন।

ইউ। তাঁরা তোমার সাহায্য করিয়াছেন—আমিয়াস!

আমি। হইতে পারে; তাঁরা যদি আমার স্থানে থাকিতেন আর আমি যদি তাঁদের স্থানে থাকিতাম, তবে আমিও তাই করিতাম।

ইউ। তুমি কি তা'হলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অনুভব কর না? সর্ব্বোপরি সেই জল-দেবতার প্রতি—যাঁর চরণে আমার অবিরাম প্রার্থনা তোমাকে রক্ষা করিয়াছে?

---

* রোমান ক্যাথলিকগণ যীশুমাতা মেরী ও Saints অর্থাৎ সাধু নামধারী দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

আমি। কি জানি ভাই! ঐ ফ্রাঙ্ক আসিতেছেন, তাঁহাকে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর।

যথোচিত অভিবাদনাদির পর ফ্রাঙ্কও তাঁহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমিয়াস বলিলেন, "শুন দাদা! ইউষ্টেস্ ত আমাকে তার ধর্ম্মে ভজাইবার চেষ্টা করিতেছে। সে বলিতেছে, আমার সৌভাগ্যের জন্য আমি পবিত্র কুমারী মেরীর নিকট ঋণী।"

ফ্রাঙ্ক উত্তর করিলেন, "হইতে পারে; যে পবিত্র অনিন্দ্য কুমারীর আদেশে তুমি সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলে, যাঁর সুমধুর প্রার্থনা তোমার মঙ্গলের জন্য নিয়ত স্বর্গের দিকে ধাবিত হইয়াছিল; সত্য ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী যে সম্রাজ্ঞীর যশোগৌরব ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য ঈশ্বর সমুদ্রবক্ষে তোমায় নিরাপদে রক্ষা করিয়াছেন, সেই মহীয়সী সম্রাজ্ঞী কুমারী এলিজাবেথের প্রার্থনার নিকট তুমি নিশ্চয়ই ঋণী।"

আমিয়াস্ মস্তক অবনত করিয়া যথোচিত রাজভক্তি প্রকাশ করিলেন। ইউষ্টেস্ বিষ-দগ্ধ অন্তরে বলিয়া উঠিল, "আমার যিনি পূজনীয়া তিনি কিন্তু সতী কুমারী!"

এই ইঙ্গিতে ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখ ক্রোধে আচ্ছন্ন হইল। আমিয়াস্ ধীর-শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "আজোর্স্ সহরে যে ফরাসীটার মাথা আমি কাটিয়া দুখণ্ড করিয়াছিলাম না জানি সেই হতভাগার আত্মা এখন কি মনে করিতেছে!"

ইউ। কি! তুমি একজন ফরাসীর মাথা কাটিয়াছিলে?

আমি। হাঁ, ইউষ্টেস্। আমার তরবারির সেই প্রথম আঘাত। একটা সরাইয়ে আমি ও জর্জ্জ ড্রেক্ বসিয়াছিলাম; সেই ফরাসীটাও যেন কলহের জন্য উন্মুখ হইয়া সেইখানে বসিয়াছিল। অল্প কথার পরেই সেই সয়তান আমাদের সম্রাজ্ঞীর পবিত্র চরিত্রের কুৎসা করিতে লাগিল। সেই সকল কথা আমি এখানে তোমাদের নিকট উচ্চারণ করিতে পারি না।

ফ্রাঙ্ক। আমি এই সকল কথা ঢের শুনিয়াছি। ফরাসী রাজদরবার এখন যে পিশাচের লীলাভূমি! যত সব বিলাসিতা, চরিত্রহীনতা ও পাশবিক কাণ্ডে তাহা কলুষিত। সেখানকার হীনচেতা লোকদের পক্ষে আমাদের কৌমার্য্য ব্রতধারিণী সম্রাজ্ঞীর চরিত্রের পবিত্রতার ধারণা অসম্ভব বই কি? কিন্তু, কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিতে দাও।

আমি। আমি কিন্তু ঘেউ ঘেউ করিতে দি নাই। যেই বলা অমনি আমি তাহার কাণে ধরিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া আসিলাম। তারপর দুইজনেই যার যার তরোয়াল লইলাম। কিন্তু হতভাগা যথারীতি তরবারি-যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া এক প্রকার অদ্ভুত উপায়ে আমাকে খোঁচাইতে লাগিল। আমি মারা যাইতে বসিয়াছিলাম আর কি? ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সুবিধা পাইয়া এক আঘাতে তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলাম।

ফ্রাঙ্ক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি রক্ষা পাইয়াছ। ঈশ্বর আমাদের সম্রাজ্ঞীর শত্রুদিগকে এই ভাবেই বিনষ্ট করুন।

ইউ। আমি আশা করি, তোমরা আমাকে রাজ্ঞীর শত্রু বলিয়া মনে কর না!

ফ্রাঙ্ক। তা আমি করি ভাই! কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, যাঁহারা সর্ব্বদা আমাদের সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে বাস করে' তাঁহার চরিত্রের সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পায়, তাঁহাদের কথাই বিশ্বাস করিও। যাহারা কিছু জানে না, অথচ দূরে থাকিয়া আমাদের পূজনীয়া সম্রাজ্ঞীর কুৎসা করিতে আনন্দ পায় তাহাদিগকে ঘৃণা করিও। এখন ওসব কথা থাকুক, চল এখন আপেলডোরে একটু বেড়াইয়া বাড়ী যাই।

কিন্তু নরথামসহরে কাজ আছে বলিয়া ইউষ্টেস্ আপেলডোরের দিকে যাইতে অস্বীকৃত হইল। ফ্রাঙ্ক ও আমিয়াস্ আরো কিছুক্ষণ সমুদ্র-তীরে বেড়াইয়া আপেলডোরের দিকে চলিলেন। সত্য সত্যই কিন্তু নরথামে ইউষ্টেসের কোন কাজ ছিল না। আপেলডোরের নিকটেই তাহারও গন্তব্য স্থান ছিল। কোন গোপনীয় কারণে আমিয়াস-ভ্রাতৃযুগলের সঙ্গ বর্জ্জন করাই ছিল তাহার আসল অভিপ্রায়। নিজের বিবেককে প্রবোধ দিবার জন্য সে মিছামিছি নরথাম সহরের দিকে অনেক

দূর পর্য্যন্ত গেল, তার পর পুনরায় আপেলডোরের দিকে ফিরিয়া আসিল। ঠিক্ সেই সময়েই ফ্রাঙ্ক ও আমিয়াস্ আপেলডোরের নিকট পৌঁছিল। ইউষ্টেসের পিতার চারিটী অশ্ব সেখানে একটী কুটীরের নিকটে সসজ্জিত অবস্থায় বাঁধা ছিল। দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোক ও ইউষ্টেস্ অশ্বারোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, আর একটি অশ্ব মালপত্রে বোঝাই ছিল। আমিয়াস্ ফ্রাঙ্ককে বলিলেন, "দেখ দাদা, সকাল বেলাই এই এক নম্বরের মিথ্যা! আচ্ছা দেখা যাউক, ওর সঙ্গীরা কে এবং কোথায় যাইবে। ও যখন আমাদিগের নিকট গোপন করিতে চায়, তখন উহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ওকে লজ্জা না দেওয়াই ভাল।"

ইউষ্টেস্ ও তাহার সঙ্গীদ্বয় চলিয়া গেলে ফ্রাঙ্ক ও আমিয়াস্ কুটীরে প্রবেশ করিয়া অপরিচিত আরোহীদ্বয়ের পরিচয় কুটীর-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল. কুটীর-স্বামী বলিল, "ইহাদের বাড়ী ওয়েল্‌সে, এদের এক জনের নাম মরগান্ ইভান্‌স, আর এক জনের নাম ইভান মরগান্‌স্।

আমিয়াস বলিলেন, 'জুডাস্ ইস্কারিয়ট আর ইস্কারিয়ট জুডাস্। * ওরা ত একটুও ঘোড়ায় চড়িতে জানে না। হাঁটিয়া গেলেই পারিত!

কুটীর-স্বামী। ওদের বাড়ী কিনা নিতান্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে, সেখানে ঘোড়া দৌড়াইবার সুবিধা নাই। আপনাদের মতন যুবকদিগের ন্যায় ইহারা ঘোড়া দৌড়াইতে পারিবে কি করিয়া? তা ছাড়া আপনার মতন সওয়ার কোন্ দেশেই বা ক'টা আছে? ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আর আপনার খুব ভাল একটী ক'নে জুটুক্, এখন আমরা এই চাই।

আমি। তোমার জিহ্বাটি ত খুব চলে হে! আর তোমার অসরল মুখ ও চাউনি দেখলে মনে হয়, তুমিও ক্যাথলিক!

কুটীর-স্বামী। আজ্ঞে হইলামই বা আমি ক্যাথলিক! ক্যাথলিক হওয়া ত আর আইন-বিরুদ্ধ নয়? গরিবের সাহায্য-ভাণ্ডারে আইনের নির্দ্দেশ অনুসারে আমি মাসে মাসে আমার ট্যাক্‌স দিয়া থাকি; তার বেশী আপনার বা আর কোন লোকের আর কিছু দাবী করিবার অধিকার নাই।

আমি। "আইনের নির্দ্দেশ!"—"অধিকার নাই!"—বটে তুমি এত আইন শিখিয়াছ? তোর মতন হতভাগা মাসে মাসে ট্যাক্‌স দেয় কোথা থেকে রে?

কুটীর-স্বামী এই প্রশ্নে ভীত হইয়া "আজ্ঞে—আজ্ঞে—"করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল। তখন দুভাই রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। আমিয়াস্ বলিলেন, "দেখিলে দাদা, ক্যাথলিক গুপ্তচর সর্ব্বত্র আড্ডা গাড়িয়াছে. এখন উপায় কি বল্‌ত?"

ফ্রাঙ্ক। কি আর করিবে বল? সাবধানে থাকিতে হইবে।

আমি। শুধু সাবধানে থাকিলেই কি চলিবে? আচ্ছা দেখা যাবে। এখন চল বাড়ী যাই, ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করিতেছে।

ওদিকে অশ্বারোহীত্রয় কিছুদূর চলিয়া সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া বন্য পথে চলিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে একজন সহিস্ মাল বোঝাই ঘোড়াটা টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথটী জনশূন্য; বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝে মাঝে ছোট জঙ্গল। এই নির্জ্জন জঙ্গলে অপরিচিত পথিকদ্বয় ভীতভাবে এক এক বার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। পাঠক পাঠিকা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, ইভান্‌স্ ও মরগান্‌স্ কল্পিত নাম মাত্র। ইহারা ওয়েল্‌সবাসীও নয়—রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত, গুপ্তচর। ইহাদের একজনের নাম ফাদার কাম্পিয়ান ও অপরের নাম ফাদার পার্সন্‌স্। কাম্পিয়ান্ পার্সন্‌স্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ যে ডাকাতের উপযুক্ত স্থান!"

ইউষ্টেস্ উত্তর করিল "পিতঃ, আমাদের পক্ষে আরো বেশী উপযোগী। এই স্থানেই রোমানগণ প্রথমে ব্রিটনে পদার্পণ করিয়াছিল। এখান হইতেই তাহারা এই দেশ

* যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে জুডাস্ ইস্কারিয়ট নামক শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুকে শত্রুদিগের নিকট ধরাইয়া দিয়াছিলেন। এজন্য বিশ্বাসঘাতকের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে জুডাসের নাম উল্লেখ করা হয়।

জয় করিতে আরম্ভ করে। এখান হইতে এক দিকে যেমন বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়, তেমনি স্থলপথেরও অনেক দূর দেখা যায়। এক দিন হয়ত আমরাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারিব—যদি আমাদিগের স্পেনীয় বন্ধুগণ—বুঝিলেন ত?"

ইউষ্টেসের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ এক ঝোপের ভিতর হইতে অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত এক যুবক অশ্বারোহণে বাহির হইল। ক্যাথলিকত্রয় তাহাকে দেখিয়া একেবারে থত মত খাইয়া গেল।

নবাগত যুবক বলিল, "মহোদয়গণ, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আর একপদও অগ্রসর হইবেন না, হইলে বিপদ ঘটিবে।"

ফাদার কাম্পিয়ান মুখে মনে বিড় বিড় করিতে লাগিল, পার্সন্‌স্ বলিল, "সাম্রাজ্ঞীর রাজপথে নির্দ্দোষ লোকেরা চলাফেরা করিবে, তাহাতে বাধা দিবার তুমি কে?" কিন্তু নবাগত যুবক তাহার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া ইউষ্টেসের ঘোড়ার নিকট ঘোড়া চালাইয়া দিল এবং বলিল, "তুমি কোথা হইতে এত সকালে আসিলে হে, ইউষ্টেস্? আপনারা সকলে আমার পেছনে পেছনে চলুন। এসহে তোমরা কে কোথায়!" এই কথা বলিতে না বলিতে ঝোপের ভিতর হইতে আরও ৪।৫ জন অশ্বারোহী যুবক বাহির হইল। ইউষ্টেস্ ও কাম্পিয়ান বড়ই ভয় পাইল, পার্সন্‌স্ দুএক মিনিট বাক্‌বিতণ্ডা করিল, কিন্তু সম্মুখস্থ মাল বোঝাই ঘোড়াটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই ভয়ে তাহার মাথা নীচু হইয়া পড়িল, উহার মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্টদের বিরুদ্ধে পোপের কত আদেশ পত্র, ঘোষণাপত্র ও ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রপূর্ণ কত কাগজ পত্র রহিয়াছে, ধরা পড়িলেই বিপদ!

এই সময়ে সার রিচার্ড গ্রেনভিলও অশ্বারোহণে সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই যুবকেরা গত রজনীতে তাহারই বাড়ীতে আহারাদি করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিল, প্রাতঃকালে তাহাদিগকে লইয়া তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। সার রিচার্ডের তীব্র চক্ষু মুহূর্ত্ত মধ্যে ইউষ্টেসের সঙ্গীরা যে কে, অনুমান করিয়া লইল। তিনি ইউষ্টেস্‌কে বলিলেন, "তুমি জান ইউষ্টেস্, বিনা পরিচয়ে কোনও নূতন অভ্যাগতকে আমরা এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিই না, তোমার সঙ্গীদ্বয়ের পরিচয় দাও।"

ইউষ্টেস্ ওয়েলস্‌বাসী ইভান্ মরগান্‌স্ ও মরগান্ ইভান্‌স্ নামে তাহাদের পরিচয় দিল। সার রিচার্ড মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের পরিচয়ে বাধিত হইলাম, আপনাদের সঙ্গে দেখিতেছি অনেক জিনিষপত্র, পথ চলিতে আপনাদের নিতান্তই অসুবিধা হইতেছে, জিনিষ পত্রগুলি পশ্চাতে রাখিয়া যান, আপনারা আরামে যাইতে পারিবেন, আমি জিনিষ পত্র পরে আমার লোক দিয়া আপনাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিতেছি।" ক্যাথলিকগণ বলিল, "আপনার এ অনুগ্রহের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আস্তে আস্তে গেলে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না, আমাদের জন্য আপনার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া তাহারা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সার রিচার্ড উইলিয়াম ক্যারী নামক তাঁহার সঙ্গীয় যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উইল, ইহারা নিশ্চয়ই জেসুইট।"* উইল বলিল, "তা হইলে না জানি ইহাদের সঙ্গে পোপের কত আদেশ, ঘোষণাপত্র ও ষড়যন্ত্রপূর্ণ কাগজ পত্র আছে। আমি যাইয়া উহাদিগকে আটকাই।"

সার রিচার্ড। দরকার নাই, শয়তানের হাতে দড়ী দাও, সে নিজের ফাঁসি নিজেই দিবে।

উইল। তবে এখন উপায়?

সার রিচার্ড। তোমরা খুব সাবধানে এদিক্‌টা পাহারা দিবে ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের যাতায়াত লক্ষ্য করিবে, কিন্তু মুখে কাহাকেও কিছু বলিবে না।

অতঃপর তাঁহারা তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

* এক শ্রেণীর রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত। ক্যাথলিকদিগের মধ্যে ইহারা একদিকে যেমন জ্ঞানে ও ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তেও এই সম্প্রদায়ের অনেকে এক সময়ে তেমনি পটু ছিলেন।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩২০ | ৪র্থ সংখ্যা।

ডোরোথী বীল্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৮৫৩।৫৪ খৃষ্টাব্দে, কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির চেষ্টায় চেল্‌টেন্‌হামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হয়। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি চাঁদা দিয়া এই স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের জন্য ক্যাম্ব্রে হাউস্ নামক প্রাচীন প্রাসাদ মাসিক ২৫০৲ টাকায় ভাড়া করা হয়; এবং যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত অধ্যাপক এবং শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। প্রথম তিন বৎসর উন্নতি হওয়ার পর ইহার ছাত্রীসংখ্যা কমিতে আরম্ভ হয় এবং কলেজের অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। এই সময় লেডি প্রিন্সিপাল্ কর্ম্মত্যাগ করেন। তখন কমিটি উক্ত পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেন। ৫০ জন মহিলা উক্ত পদপ্রার্থী হন। কমিটি কয়েক জনের প্রশংসাপত্র চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে ডোরোথী তাঁহার প্রশংসা-পত্র প্রেরণ করেন। কমিটিতে পদপ্রার্থীদিগের প্রশংসা পত্রের তুলনা ব্যতীত ধর্ম্মমত লইয়া বিচার হইল। এই বিচার মহা আন্দোলনে পরিণত হইল; অনেক বাদানুবাদের পর, ডোরোথী লেডি প্রিন্সিপ্যাল পদে মনোনীত হইলেন। তাঁহাকে মাসিক ২৫০৲ বেতন, এবং সুসজ্জিত বাসভবন দেওয়া স্থির হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্টে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জীবন-যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

ডোরোথী লেডী প্রিন্সিপাল হইয়া যাওয়ার বহু পূর্ব্বে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ অতি উন্নত, উদার এবং শিক্ষাপ্রণালী অতি উত্তম ছিল। শিক্ষকগণ অতি

যোগ্য নরনারী ছিলেন, এবং ছাত্রীসংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কলেজের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হয়। এই অবস্থার মধ্যে তিনি আসিয়া দেখিলেন যে কর্ত্তৃপক্ষগণ অতি উদার প্রকৃতির লোক; সেখানে কলেজের উন্নতি সাধন সম্ভব। তিনি আসিয়াই সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীতশিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে বহু অর্থব্যয় হইল। কমিটি কোন আপত্তি করিলেন না।

অতঃপর তিনি কঠিন পরিশ্রম করিয়া সকল বিভাগে শৃঙ্খলা এবং নিয়মের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ইংরাজী সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ইতিহাস পড়াইতে লাগিলেন. এবং ক্রমশঃ বিজ্ঞান শিক্ষার সূচনা করিতে লাগিলেন।

যে বিষয় যেমন করিয়া পড়াইলে ঠিক হয়, তিনি তাহার প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, ততোধিক মনোযোগ দিলেন ছাত্রীদিগের স্বভাব চরিত্র গঠনের প্রতি। কাহারও কোনও অন্যায় আচরণের জন্য তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন না, বা একটা কোন কড়া আদেশ প্রচার করিতেন না; তাঁহার শান্ত, গম্ভীর ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই সকল দোষ সংশোধন করিতেন। তিনি শিক্ষয়িত্রীগণকে এবং ছাত্রীগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা, সকল বিষয়ে উন্নত আদর্শের প্রতি দৃষ্টি, সকলের প্রতি প্রেম ও মঙ্গল ভাব,—ছাত্রীদিগের কেবল পড়ার প্রতি নয়, খাওয়া পরা, শরীরের অবস্থার প্রতিও সস্নেহ দৃষ্টি, সদা-সাগ্রহ সহায়তা,—তাঁহার আগমনে কলেজের সর্ব্বত্র এই নূতন ভাব দেখিয়া সকলেই অনুভব করিতে লাগিল, যেন কোন দেবীর আগমন হইয়াছে। তাঁহার এরূপ মিষ্ট ব্যবহারে, গভীর জ্ঞান এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান প্রণালী ও কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রথম তিন বৎসর ছাত্রীসংখ্যা বাড়িল না, অর্থাভাব দূর হইল না। এমন সময় একজন উৎসাহী জ্ঞানী ব্যক্তি স্বইচ্ছায় কলেজের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন, এবং বহু চেষ্টায় তাহার অর্থাভাব দূর করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডোরোথীর পরামর্শ অনুসারে, এই স্কুলের সঙ্গে একটি ছাত্রী-নিবাস খোলা হয়। যে সকল বালিকা পূর্ব্বে অভিভাবকগণের সঙ্গে স্থানান্তরে যাইত, এখন হইতে অভিভাকগণ স্থানান্তরে গমন করিলে, তাহারা এই বোর্ডিংএ বাস করিতে লাগিল। ইহাদ্বারা স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যে এইরূপ নানা উপায়ে স্কুলের অর্থাভাব দূর হইল; নূতন বেঞ্চ প্রভৃতি প্রস্তুত হইল, এবং স্কুল-গৃহ বর্দ্ধিত হইল। অতঃপর ডোরোথী অন্যান্য সংস্কারে মনোযোগ দিলেন। পূর্ব্বে বেলা ৯-১৫ হইতে ১২-১৫; এবং অপরাহ্নে ২½ হইতে ৪½ পর্য্যন্ত কলেজের কাজ হইত। ছাত্রীগণ প্রায় সমস্ত দিন কলেজে থাকিত। কুমারী বীল্ অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে সকালের দিকে বেশীর ভাগ পড়াশুনা শেষ করিয়া পুনরায় বৈকালে কিছুক্ষণ শিক্ষা দিয়া, কলেজের ছুটি হইবে; তাহা হইলে ছাত্রী এবং শিক্ষকগণ একটু বিশ্রাম ও ভ্রমণের সময় পাইবে। এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি হইল, অনেক আন্দোলন হইল; অবশেষে দুই মাস পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রস্তাব হইল। দুই মাস পরে ডোরোথীর নূতন বিধিই গৃহীত হইল। এখন সর্ব্বত্রই সেই নিয়মে কার্য্য চলিতেছে।

পূর্ব্বে বার্ষিক পরীক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল কিন্তু সাপ্তাহিক পরীক্ষা ছিল না। ডোরোথী সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে তিনি ধীরে ধীরে কলেজের নানা প্রকার উন্নতিজনক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া কলেজের সম্পাদক ও কমিটির সভ্য, শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী এবং অভিভাবকগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতে লাগিলেন। স্কুল এবং বোর্ডিংএর কাযে তিনি এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, ছুটির সময়ও তাঁহাকে প্রায়ই কলেজেই কাটাইতে হইত। তিনি কখনও জনসমাজে, বিবাহে বা পার্টিতে যাইতেন না। কারণ, কলেজের জন্য এত ভাবিতে এবং খাটিতে হইত যে, তিনি তাহা ছাড়িয়া অন্য ব্যাপারে সময় দেওয়া ঠিক মনে করিতেন না।

এই সময় ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র নারীজাতির উন্নত শিক্ষার পথ প্রশস্ততর করিবার জন্য চিন্তা ও আন্দোলন চলিতেছিল। কুইন্স্ কলেজ, বেড্‌ফোর্ড কলেজ, কেম্ব্রিজ্ কলেজ, ক্যাম্‌ডেন্ রোড্ স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় ক্রমশঃ এই আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জলিত করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ্ ব্লাক্‌ওয়েল সুইজারল্যাণ্ডে এম, ডি, উপাধি পান এবং মিস্ গ্যারেট্ লণ্ডনে উক্ত উপাধি লাভের জন্য পড়িতে আরম্ভ করেন। এ ছাড়া আরও কয়েক জন উন্নতমনা মহিলা নানা স্থানে প্রাণপাত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় গবর্ণমেণ্ট্ কর্তৃক (স্কুল্ ইন্‌কোয়ারী কমিশন্) স্কুলের অবস্থা নির্ণয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড লিটল্‌টন্, সার্ ষ্টাফোর্ড নর্থকোট্, জন ব্রাইট্ প্রভৃতি এই সমিতির সভ্য ছিলেন। ইঁহারা এক একজন কয়েকটি করিয়া স্কুল পরিদর্শন করেন, এবং কয়েকজন প্রধান শিক্ষককে সাক্ষ্য দানের জন্য লণ্ডনে আহ্বান করেন। এই সময় ডোরোথী আহূত হইয়া সাক্ষ্যদান করেন এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বৃটনে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, "বালিকাদের শিক্ষাও প্রকৃত শিক্ষা হওয়া উচিত। কেবল উপর উপর লোক দেখান শিক্ষা, পোষাকী শিক্ষাই মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাহাদেরও গভীর অধ্যয়ন ও কঠিন পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।" অতঃপর উক্ত কমিশনের রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইলে, তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য তাঁহার সমালোচনা ও মন্তব্য সহ সেই রিপোর্ট পুনর্মুদ্রিত করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, "শিক্ষিত পিতা অপেক্ষা শিক্ষিতা মাতার আবশ্যকতা অধিক। বালিকাদিগের বিবাহের সুবিধা হওয়ার জন্য শিক্ষা নয়। দেহ মন ও হৃদয়ের শক্তির বিকাশই শিক্ষা। সেই শিক্ষা প্রত্যেক বালিকারই আবশ্যক।"

এই রিপোর্ট্ প্রকাশের ফলে মিসেস্ উইলিয়ম্ গ্রে প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা সমবেত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে একটি সমিতি (The National Union for Improving the Education of Women) স্থাপন করেন। এই সমিতির সাহায্যে ইংলণ্ডের প্রত্যেক বড় নগরে উচ্চ শ্রেণীর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

একদিকে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, অপর দিকে ডোরোথী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মেয়েদের পরীক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত এ তর্কও উঠিল। কুমারী বীল্, এবং কুমারী ডেভিজ্, অনেক চেষ্টা করিয়া কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দ্বার বালিকাদিগের জন্য উন্মুক্ত করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ইংলণ্ডে ৮ জন বালিকা এই পরীক্ষা দেয়। দুইটি উত্তীর্ণ হয়; তন্মধ্যে একজন ডোরোথীর ছাত্রী। আবার আপত্তি হইতে লাগিল যে পরীক্ষার জন্য মেয়েদের অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় গৃহকর্ম্মে দক্ষতা জন্মে না। ডোরোথী দেখাইলেন, যে সকল মেয়ে পরীক্ষায় ভাল তাহারাই গৃহকর্ম্মেও সুদক্ষ।

এইরূপে কলেজের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল; ছাত্রীসংখ্যা এবং শিক্ষকসংখ্যা বাড়ীতে লাগিল। তিনি প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট পরিশ্রমের সহিত, নারীজাতির উন্নতির চিন্তায় আরও বেশী মগ্ন হইতে লাগিলেন। কলেজটিকে আদর্শ বিদ্যালয় করিয়া তুলিবার চিন্তা ও পরিশ্রমও তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল।

ক্রমশঃ কলেজের জন্য প্রশস্ততর বাড়ীর আবশ্যক হইল। যাঁহাদের অর্থে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, (Shareholders) তাঁহারা কোন মতেই আর অর্থব্যয় করিতে রাজী হইলেন না। তখন কমিটির সম্পাদক এবং সভাপতির সহায়তায় তিনি কলেজের একটি নূতন অধ্যক্ষ সমিতি (Governing Body) সংগঠনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং বহুপরিশ্রমের ফলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে অর্থদানকারীগণ কলেজের সঙ্গে সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন এবং নূতন অধ্যক্ষ-সমিতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ইঁহারা নূতন স্থান ক্রয় করিয়া তাহাতে প্রশস্ততর নূতন গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিলেন।

অতঃপর বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ, সোমবার প্রাতঃকালে নূতন গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ডোরোথী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায়

ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, সকলকে আনন্দের বার্ত্তা শুনাইয়া সেদিনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অনেক পুরাতন ছাত্রী এবং কলেজের বন্ধু সেদিন উপস্থিত ছিলেন। এই গৃহের আয়তনও শীঘ্রই বাড়াইতে হইল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলেজ গৃহ তৃতীয়বার বাড়াইতে হইল; সঙ্গীতের ঘর, বিজ্ঞানের ঘর, যন্ত্রের ঘর, কিণ্ডারগার্টেন গৃহ প্রভৃতি ক্রমশঃ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। তিনি যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন মাত্র ৬৫টি ছাত্রী ছিল, ক্রমে ছাত্রীসংখ্যা ৬০০ শত হইল।

বোর্ডিং হাউস লইয়াও অনেক গোলমাল হয়। ডোরোথী দেখিলেন, থাকিবার স্থান না থাকায় অনেকের পড়া হয় না, এবং অনেকের পড়ার এবং চরিত্রের বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু বোর্ডিং খোলার দায়িত্ব অনেক। প্রথম অর্থের দায়িত্ব; দ্বিতীয় মেয়েদের ভার গ্রহণের দায়িত্ব। একজন মহিলাকে একটি বোর্ডিংএর ভার দেওয়া হইল। ক্রমশঃ তিনি স্বয়ং বালিকাদিগের অভি-ভাবক হইয়া উঠিলেন এবং কলেজের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারও অশান্তির একটি কারণ হইল। কিন্তু তিনি ছাড়িলেন না। যে সকল গরিব মেয়ে শিক্ষয়িত্রী হওয়ার জন্য পড়িতেছিল, তাহারা যাহাতে কম খরচে থাকিতে পারে তজ্জন্য ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বোর্ডিং খুলিলেন। আবার, একটি সদাশয় মহিলা স্বইচ্ছায় স্বীয় শক্তি ও অর্থ দান করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহাকে কয়েকটি মেয়ের ভার দিয়া আর একটি বোর্ডিং স্থাপন করিলেন। এক বৎসর পর এই মহিলার মৃত্যু হইল। তখন ডোরোথীই সে ভার গ্রহণ করিলেন এবং গরিব ছাত্রীগণ যাহাতে বিনাব্যয়ে থাকিতে পারে, তজ্জন্য প্রায় ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিলেন। এই অর্থে তিনি একটি প্রকাণ্ড কার্য্যের সূত্রপাত করেন।

কলেজে উন্নত জ্ঞান ও চিন্তার প্রবাহ আরও প্রশস্ত-তর করিবার জন্য; তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, কলেজ হইতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পুরাতন ছাত্রী-গণও তাহাতে লিখিতেন। ছাত্রীদিগের বিশেষ বিশেষ লেখাই ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। রাস্কিনের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিও এই কাগজ পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাগজে ডোরোথীর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিয়া-ছিল।

পুরাতন ছাত্রীদিগকে লইয়া একটী সমিতি গঠনের আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতে ডোরোথীর মনে জাগিতে-ছিল। তাঁর এই প্রস্তাব পত্রে পাঠ করিয়া অনেক ছাত্রীও তাহার সমর্থন করেন। এইরূপে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই বৎসর ডোরোথীর কলেজে আগমনের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, কলেজের জুবিলি উৎসব করার কথা হয়; এবং অনেক পুরাতন ছাত্রী তাঁহাকে উপহার প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "যদি কেহ আমাকে উপহার দিতে চাও, তাহা 'আমার স্বামী' এই কলেজকে দিও। তদনুসারে তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া একটি বহুমূল্য অর্গান যন্ত্র (organ) কলেজে প্রদান করিলেন।

ইহার পর ৬ই জুলাই পুরাতন ছাত্রীদিগের প্রথম সম্মিলন হয়। ৭ই জুলাই স্কুলের প্রার্থনার সময় সকলেই সমবেত হইলে, ডোরোথী অল্প কয়েকটি কথায় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করেন। অতঃপর এই সম্মিলন স্থায়ী সমিতিতে পরিণত হয়; ইহার নাম হয় "গীল্ড্।" এই "গীল্ড্" ভবিষ্যতে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে শিক্ষা-বিস্তারে নানা প্রকার সাহায্য করিয়াছে।

দরিদ্র ছাত্রীগণ যাহাতে পড়িতে পারে; থাকিতে স্থান পায় এবং ভবিষ্যতে স্বাধীন জীবন যাপন করিতে পারে ও শিক্ষাবিস্তারে সহায় হইতে পারে—এইজন্য তিনি একটী ফণ্ড (fund) এবং একটী বোর্ডিং স্থাপন করেন। অবস্থা অনুসারে ছাত্রীগণের সকল অভাব মোচন করিয়া অধ্যয়নের সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং তাহাদের চরিত্র গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য এই বোর্ডিং স্থাপিত হয়। তিনি কুমারী নিউম্যান্ নামক একজন সদাশয়া বন্ধুর হাতে উহার ভার অর্পণ করেন। তিনি অকালে দেহত্যাগ করায়, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য অনেকে প্রচুর অর্থ দান করেন।

সেই অর্থদ্বারা তাঁহার প্রিয়কার্য্য স্থায়ী করিবার জন্য ডোরোথী চিন্তিত হইলেন। অনেক চিন্তার পর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে চেল্টেনহাম্ সেণ্ট্ হিল্ডা কলেজ নামক একটি স্বতন্ত্র কলেজ ও বোর্ডিং স্থাপন করিলেন। ইহাই ছাত্রীনিবাস সহ শিক্ষয়িত্রীদিগের উচ্চশিক্ষার প্রথম ট্রেনিং কলেজ। এখানে শিক্ষয়িত্রীগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহা স্থাপনের পর তিনি দেখিলেন, অক্সফোর্ডের শিক্ষা-প্রভাব অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। অতঃপর বহু অর্থব্যয় করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড সেণ্ট্ হিল্ডা কলেজ নাম দিয়া আর একটি বোর্ডিং কলেজ স্থাপন করেন। এটি চেল্টেনহাম্ কলেজ হইতে উত্তীর্ণ উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাদিগের জন্য। তৎপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সেই একই উদ্দেশ্যে সেণ্ট্ হিল্ডা ইষ্ট নাম দিয়া লণ্ডনে আর একটি বিদ্যালয় ও বোর্ডিং স্থাপন করেন। এই তিনটি বিদ্যালয়ই নবনির্ম্মিত নিজস্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এত শীঘ্র শীঘ্র ইহাদের উন্নতি হইতে থাকে যে প্রত্যেকটি স্থাপনের পর দু এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে, গৃহাদি বর্দ্ধিত করা আবশ্যক হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে এই তিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ মিলিত হইয়া "সেণ্ট্ হিল্ডা সমিতি" গঠন করেন। অক্সফোর্ডের সেণ্ট্ হিল্ডা কলেজ, কয়েক বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজ রূপে স্বীকৃত হয়। এই সেণ্ট্ হিল্ডা তাঁহার অতি শ্রদ্ধাভাজন একজন আদর্শ রমণী ছিলেন।

এইরূপ বহু অর্থব্যয় ও যথেষ্ট আয়োজন-সাপেক্ষ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও, তিনি কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই এই সকল কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার কলেজের শিক্ষিতা মহিলাগণই এই সকল বিদ্যালয়ে গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয় ক্যাম্ব্রে হাউসের (Cambray House) অধিকারীগণ উহা বিক্রয় করিতে চান। ডোরোথী স্বীয় অর্থে সেই প্রকাণ্ড বাটী ক্রয় করিয়া তাহাতে একটি নূতন স্কুল এবং বোর্ডিং (Cambray School and Cambray Boarding House) স্থাপন করেন। ক্রমশঃ স্কুলের উন্নতি হইতে থাকে। শেষে ছাত্রী-সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, ছয় বৎসর পরে আরও ৩০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া এই স্কুল ও ছাত্রীনিবাসের উন্নতি সাধন করেন; এবং অবশেষে এই বাড়ী, স্কুল এবং বোর্ডিং "লেডীজ্ কলেজ সমিতি"কে দান করেন। ইহার পর, সেণ্ট্ হেলেন্ ও সেণ্ট্ অষ্টিন্ নাম দিয়া আরও দুইটি বোর্ডিং স্থাপন করিয়া কলেজকে প্রদান করেন।

(৪)

একটি প্রকাণ্ড কলেজের অধ্যাপনা ও সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন, তদ্ব্যতীত প্রায় সাত আটটি স্কুল, কলেজ ও বোর্ডিং বিভিন্ন স্থানে স্থাপন, সে সকলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, গৃহ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার ব্যবস্থা করা এবং পরিচালন করা, একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করা,—এই সকল কার্য্য করিয়াই তাঁর বিশ্রাম ছিল না। তবুও এই সকল কার্য্য ছাড়া, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কত সভা সমিতি, কত অনুষ্ঠান, কত বাদ প্রতিবাদ, কত লেখালেখি, কত সাক্ষ্যদান —সকল ব্যাপারে তিনি একজন নেতৃস্থানীয়া মহিলা ছিলেন। প্রধান শিক্ষয়িত্রীদিগের সভা, সাধারণ শিক্ষয়িত্রীদিগের সভা, শিক্ষক-সম্মিলন, অনাথা বালিকাদিগের আশ্রম, শিক্ষা কংগ্রেস প্রভৃতি প্রায় দশ বারটি স্থায়ী অনুষ্ঠানের তিনি সভাপতি বা সহকারী সভাপতি ছিলেন। প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র ভাবে খাটিতে হইত। কি করিয়া নারীজাতির উন্নতি হইবে, দুঃখ দূর হইবে; তাহারা স্বাধীন ভাবে ও সম্মানের সহিত জীবন যাপন করিতে পারিবে, কি করিয়া নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইবে, অর্থহীন সহায়তা পাইবে, এই চিন্তায় তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। আহার নিদ্রা বিশ্রাম ইহার নিম্ন স্থানে পড়িয়াছিল।

তাঁহার গুণের সৌরভ সভ্য জগতে বহু পূর্ব্বেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধ্যাপক-সভা তাঁহাকে তাঁহাদের সভ্য মনোনীত করিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের জাতীয় শিক্ষা সমিতি তাঁহাকে তাঁহাদের সভ্য নির্ব্বাচন করি-

লেন; এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল্. এল্. ডি, উপাধি দান করেন। সেইদিন সর্ব্বপ্রথম লর্ড আল্‌ভারষ্টোন, তৎপর মিষ্টার এস্ কুইথ, তৎপর ডোরোথী এবং তৎপর আরও তিনজন বিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। সেইদিন তিনি নানা স্থান হইতে আনন্দ-সূচক বহু টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ গণ্য হইতে লাগিলেন। নানা কারণে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লেডীস্ কলেজের জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই; এজন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে জুবিলী উৎসবের সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। যথা-সময়ে মহা সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইল। লর্ড লণ্ডনডেরী প্রভৃতি কতিপয় প্রধান পুরুষ ও মহিলা তদুপলক্ষে বক্তৃতাদি করিলেন। সকলেই একবাক্যে ডোরোথীকে কলেজের উন্নতির জন্য ধন্যবাদ দিলেন। এই উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু তাঁহার একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি কলেজকে উপহার দিলেন।

এই উৎসবের বহু পূর্ব্ব হইতেই, অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য মাঝে মাঝে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু মনের জোরে এবং অবকাশ কালে কোন না কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়া, তাহা সাম্‌লাইয়া লইতেন। এইরূপে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস আসিল। পুরাতন ছাত্রীদিগের "গীল্ড"এর (সম্মিলনের) অধিবেশন উপলক্ষে প্রায় ৩০০।৪০০ ছাত্রী নানা স্থান হইতে আসিয়া সমবেত হইল। মহা উৎসাহে বক্তৃতাদি হইয়া গেল। তিনি মনের জোরে শারীরিক দুর্ব্বলতা জয় করিয়া বক্তৃতা করিলেন, পুরাতন ছাত্রীদিগের সহিত কয়েকদিন মিশিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের সময় একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া একটু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন।

২২শে সেপ্টেম্বর কলেজ খুলিল। তিনি বক্তৃতা ও প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পদে পদে দুর্ব্বলতা বোধ করিতে লাগিলেন। অক্টোবরের ১৬ই এবং ১৭ই স্কুল ও কলেজ সম্বন্ধীয় দুইটি সভায় যোগ দান করিলেন, কলেজ কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় স্বয়ং রিপোর্ট পাঠ করিলেন। ইহার পর দুইজন ডাক্তার বন্ধু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, যে শীঘ্র কোন শুশ্রূষা নিবাসে (Nursing Homeএ) গিয়া তাঁহার চিকিৎসা করান উচিত। তিনি নীরবে কলেজে ফিরিয়া গিয়া, কার্য্য হইতে বিদায় লওয়ার সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন। কাগজ পত্র, হিসাব, ইত্যাদি সব ঠিকঠাক করিয়া, ২২এ অক্টোবর প্রাতঃকালে তিনি প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন, সমস্ত দিন যথারীতি কার্য্য করিলেন, বৈকালে স্কুলের পরে, যাহা কিছু কাজ গুছাইয়া রাখিতে বাকী ছিল, তাহাও শেষ করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় সন্নিকটস্থ হাসপাতালে গমন করিলেন। অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়া গেল। কয়েকদিন একটু ভাল থাকার পর, একদিন জ্বর হইল এবং ক্রমশঃ অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে ৯ই (১৮৯৬) নবেম্বর ১২-১৫ মিনিটের সময় তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন।

সেই দিন স্কুলের ছুটির পূর্ব্বে ছাত্রীদিগকে একত্র করিয়া সহকারী প্রিন্সিপ্যাল উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর চতুর্দ্দিকে তাঁহার শিষ্যাগণ, ও বন্ধুগণ, এবং নানাস্থানের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ১৬ই নবেম্বর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিন, সেদিন সেণ্ট্ পল গির্জ্জা এবং নানাস্থানের ধর্ম্মমন্দিরে শত শত লোক সমবেত হইয়া তাঁহার অমূল্য জীবনের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রেমপূর্ণ কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রভাব শত শত জীবনে প্রসারিত হইয়া এখনও কার্য্য করিতেছে।

প্রেম-নিষ্ঠা।

দণ্ডক অরণ্য মাঝে শোভে চারু পম্পা সরোবর
শ্যামল-অঞ্চল-তলে প্রকৃতির হাসি মনোহর

দর্পণ সে হৃদয়ের! অতিশয় নিকটে তাহার
বিলাতে নিখিল বিশ্বে অমৃতের মহা সমাচার
বিরচিয়া কি অপূর্ব্ব শান্তিময় আশ্রম সুন্দর
যুগল জ্যোতিষ্ক সম মাতঙ্গ ও ঋষি ঋষীশ্বর
সশিষ্য করেন বাস! কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সনে
জাগে নিত্য বেদ-ধ্বনি, হবির্ধূম পরশে গগনে
লভি' পূত হব্যাহুতি, হোমগন্ধ পুষ্পগন্ধ সাথে
করে সবে কোলাকুলি!

প্রতিদিন জাগিয়া প্রভাতে
বাহিরি' স্নানের আশে বিস্ময়ে নিরখে যতিগণ,
গভীর নিশীথে কবে অতর্কিতে আসি' কোন জন
দুর্গম গহন-পথ কত যত্নে সম্মার্জ্জনী দিয়া
করে গেছে পরিষ্কার! স্নেহ-মুগ্ধ আশঙ্কিত হিয়া
ভুলি সুপ্তি ভুলি ক্লান্তি মৃত্যু-ভয় ভুলিয়া আপন
নিবারিতে ঋষি-পদে নিদারুণ কণ্টক-পীড়ন
চেষ্টিয়াছে দীর্ঘ রাতি! বিস্ময়ের শেষ হেথা নয়,—
আহরিয়ে পুঞ্জে পুঞ্জে যজ্ঞ-কাষ্ঠ অরণি-নিচয়
রেখে গেছে হবির্গৃহ-দ্বারে! বিকশিত ফুলে ফলে
সাজায়েছে অর্ঘ্যরাজি!

মুনিবৃন্দ চিত্তে কুতূহলে
আপনা লুকায়ে হেন রজনীর নিবিড় আঁধারে
সহৃদয় সাধু কেবা নিত্য নিত্য সেবে সবাকারে
নিষ্কাম সে পুণ্যব্রত! সহায়তা করি তপস্যার
অংশী সে যে তপোফলে!

একদিন করিয়া বিচার
উদ্ঘাটিতে রহস্য এ, মাতঙ্গ ঋষির শিষ্যগণ
নিশাকালে পথপার্শ্বে স্থানে স্থানে রহিল গোপন
ঘন বন-অন্তরালে!

শারদীয় কৃষ্ণপক্ষ রাতি
দ্বিতীয় প্রহর গত, বনদেবী পুষ্প মাল্য গাঁথি
সাজাইছে স্তরে স্তরে, মুগ্ধ-নেত্রে নক্ষত্রনিকর
চেয়ে আছে নীলাকাশে, বহে ধীরে কিবা স্নিগ্ধতর
সুরভিত সমীরণ, দিকে দিকে সুপ্ত অরণ্যানী,—
গাহে ঝিল্লী সুপ্তির সুতান! শান্তির অঞ্চলখানি
প্রসারিত দিশে দিশে!

রক্ষা করি আশ্রম-গৌরব
শ্বাপদ গরজে দূরে, নিঃশব্দেতে মাণিক-বিভব
পন্নগনিচয় ফিরে, রহি রহি তবু যে শিহরে
আতঙ্কে মানব-প্রাণ! স্থির ধীর প্রশান্ত সাগরে
একি শঙ্কা ঝটিকার!

অকস্মাৎ পত্রের মর্ম্মরে
সচকিত শিষ্যগণ; চেয়ে দেখে বিস্ময়ের ভরে
অপচ্ছায়া সম কেবা সম্মুখের বন-বীথিখানি
ফিরিতেছে সম্মার্জ্জিয়া! মুহূর্ত্তেকে হল জানাজানি
সকলে ঘিরিল তারে! নিশাচর-আশঙ্কা ভীষণ
উপেক্ষি যে অনায়াসে আসিয়াছে পালিতে আপন
নিগূঢ় জীবন-ব্রত শর্ব্বরীর গাঢ় অন্ধকারে
কাঁপেনি যাহার বক্ষ; নিরখি সে এবে চারিধারে
মানব-সন্তানে হায়, যেন কোন্ অজানিত-ভয়ে
কম্পিত রোদনোন্মুখ! হে মানব! মানব-হৃদয়ে
কত মত পার্থক্যের আবরণ করিয়া রচনা
এমনি রেখেছ দূরে!

নিয়ে তারে এল সব জনা
আপন আশ্রম মাঝে! তখনো সে মহর্ষি-যুগল
ছিলা রত সদালাপে, লীন যেন চিত্ত-শতদল
ঐশ-প্রেম-করে! দীপালোকে হেরিল সকলে
শিষ্যবৃন্দ ধরি যারে আনিয়াছে আজি কুতূহলে
সেতো আর কেহ নহে! ব্যাধ-বালা কুমারী শবরী
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে নিত্য নিশাকালে ফিরে সেবা করি
কি অপূর্ব্ব প্রাণাবেগে! হয়তো সে দীর্ঘ দিন ধরি
অপেক্ষিত প্রতি পলে বিশ্বে কবে আসিবে শর্ব্বরী
লভিবে সে সুনির্ম্মল গোপন-সেবার অধিকার
আত্ম-প্রসাদের তরে! এমনি কেটেছে কতবার
নিদাঘের দগ্ধ রাতি, বারি-ধারা অজস্র বর্ষার,
শিশিরের তীব্র শীত, কেহ কভু পারে নাই তার
করিতে সঙ্কল্পচ্যুত! আজি সবে ধরিয়াছে তায়—
কাঁদে বালা অধোমুখে, কত যেন ত্রুটি হায়, হায়,
অজ্ঞাতে করেছে সে গো!

ভাবিলেন ঋষি ঋষীশ্বর
'অস্পৃশ্যার অর্ঘ্য মোরা—পরিতাপ একি ভয়ঙ্কর!—

না জানিয়া এতকাল করিয়াছি সতত গ্রহণ
কি কঠোর দণ্ড তাই করি তাঁর বিধান এখন
কাঁদিছে এ, সে শঙ্কায়!'

মহর্ষি মাতঙ্গ স্নেহশীল
শবরীর হৃদয়ের পরিচয় লভি অনাবিল
কহিলেন স্নেহ-ভাষে, "এস বৎসে, এস মোর কাছে,
তোমারি চিত্তেতে সত্য অমৃতের বার্ত্তা পশিয়াছে
পুণ্যবতী নারী তুমি! শ্রেষ্ঠা তুমি আমা সবা হতে!
কে তোমা' অস্পৃশ্যা ভাবে! আত্মম্ভরী মোহান্ধ মরতে
কি নিষ্কাম সেবাদর্শ প্রতিদিন দেখালে অতুল
তৃপ্ত মোরা অতিশয়! আজ যদি ভেঙ্গে থাকে ভুল,
আজ যদি পুণ্যশীলে, পুণ্য-ব্রত হয় বা প্রকাশ
কেন এত ভীতা তাহে? উৎসের সে পীযুষ-উচ্ছ্বাস
কতকাল রহে গুপ্ত তমোময় পাষাণ-গুহায়
উথলে না শুভক্ষণে? আজ বুঝি হ'ল তা'রি প্রায়!--
এস কাছে, মুছ অশ্রু! মন্ত্র-শিষ্যা করিয়া তোমায়
আজি আমি ধন্য হব!"

দৃপ্ত-রোষে গরজিলা হায়,
ঋষীশ্বর "হে মাতঙ্গ! ধিক্ তোমা, ধিক্ শতবার!
সেবা-ছলে যে অনার্য্যা ঘটাল পতন সবাকার
নাহি করি তার প্রতি সুকঠোর শাস্তির বিধান,
কি কহিব মূঢ় তুমি! ক্রোধে মোর জ্বলিছে পরাণ –
ঋষি নামে অর্পি' কালি—আর্য্যত্বের করি অপচার
তারে তুমি দীক্ষা দিবে? তুমি হবে চণ্ডাল-বালার
মন্ত্র-গুরু? নরাধম!"

বজ্রাহত স্তব্ধ শিষ্যগণ,
শবরী মূর্চ্ছিতা প্রায়! মাতঙ্গ হাসিয়া ধীরে ক'ন—
"ঋষীশ্বর! ক্ষান্ত হও! তর্কে মোর নাহি অবসর!
কহিছে সহস্র কণ্ঠে আজি মম সকল অন্তর
'শবরী সুযোগ্যা অতি সর্ব্বোত্তম অধ্যাত্ম-বিদ্যায়
রেখোনা বঞ্চিতা তারে!'—আত্মম্ভরী-স্বার্থ-উপেক্ষায়
রহিতে নারিব দূরে!

কেন বৎসে, দাঁড়াইয়া দ্বারে'
সমস্ত আশ্রম আজি মহানন্দে মাগিছে তোমারে
অসঙ্কোচে এস হেথা! কেন দ্বিধা, কেন লজ্জা-ভয়,
আভিজাত্য মনুষ্যত্ব নাহি দেয় মানবে নিশ্চয়
লব্ধ সে যে সাধনায়!"

এত কহি মহর্ষি আপনি
সস্নেহে কম্পিত-কর ধরি তার আনিলা তখনি
আপনার গৃহ মাঝে! পদতলে লুটাল শবরী
আকুল উচ্ছ্বাসভরে! ব্যর্থ-রোষে হুহুঙ্কার করি'
চলে গেলা ঋষীশ্বর, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত
মিশিলা আঁধারে ক্ষণে!

মহর্ষি মাতঙ্গ সদাব্রত
মুক্ত তাঁর প্রেমের ভাণ্ডার! দীক্ষা হল শবরীর;—
একটী মুমুক্ষু আত্মা অকস্মাৎ লভিল গভীর
স্পর্শমণি-পরশন!

শবরী আশ্রমে পেল স্থান;—
আশ্রমবাসীর সেবা করি' ফিরে সারা দিনমান
সকল হৃদয় দিয়ে! নিশাকালে একেলা নির্জ্জনে
ইষ্টদেবতার ধ্যানে তৃষ্ণাতুর চিত্ত-তপোবনে
প্রকাশে কি দিব্য জ্যোতিঃ--লভে কিবা চির-প্রাণারাম
শান্তি-সুধা অতুলন! স্নেহভরে সবে তার নাম
করে সদা উচ্চারণ; ঋষিত্বের গর্ব্ব শুধু নিয়ে
র'ন দূরে ঋষীশ্বর।

একদিন সবারে ডাকিয়ে
কহিলা মাতঙ্গমুনি "সংসারের কাজ শেষ মম,
লইব সমাধি আজ! যদি কারো রহে ভ্রান্তি-ভ্রম
কহ, ঘুচাইয়ে যাব!" শিষ্যগণ নীরব নিশ্চল
বাষ্পাকুল আঁখিযুগ! অগ্রসরি শবরী কেবল
প্রণমিয়া ঋষিবরে যুক্তকরে রহিল দাঁড়ায়ে,
কি যেন প্রাণের কথা নাহি ফুটে বারেক ভাষায়ে
নিবেদিতে গুরুদেবে, মুক্তাবিন্দুনিভ অশ্রুজল
ঝরে শুধু শতধারে! আশীষিয়া মাতঙ্গ নির্ম্মল
কহিলা, "কেঁদ না বৎসে, দেহ-নাশে আত্মার বিনাশ
নাহি হয় কোন দিন; কর তাহা বুঝিতে প্রয়াস
মোহ-পাশ অপসারি! হে শবরী, জানিয়াছি আমি
তোমার অব্যক্ত-সাধ, মগ্ন হয়ে রহ দিন-যামি
ইষ্টদেবে, কৃপাময় ভগবান রাম রঘুমণি
তোমারে দিবেন দেখা এ আশ্রমে আসিয়া আপনি

কহিলাম সুনিশ্চিত! মোর চির-উপাস্য দেবতা
শুভ বুদ্ধি দিন্ সবে!"

শুধু রাখি স্মৃতি-ব্যাকুলতা
সকলি ফুরায়ে গেল! অবলম্বি পূত দেবযান
মহর্ষি সমাধি-যোগে করিলেন হরষে প্রয়াণ
পরম মাহেন্দ্রক্ষণে, ধ্যান-মূর্ত্তি মিলাইল ধ্যানে
শূন্য করি বসুন্ধরা!

কি বেদনা লয়ে সারা প্রাণে
তাপসী শবরী হায়, আত্মহারা উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে
লুটাল অবনীতলে! ভগ্ন দ্রুম, শাখা-চ্যুত হয়ে
হারাল সুস্নিগ্ধ ছায়া সুকুমারী শোভনা বল্লরী
নিল ধূলি-শয্যাশ্রয়! মর্ম্মভেদী হাহাকার করি
জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস! মহর্ষির সান্ত্বনা-আশ্বাস
চমকে তাহারি মাঝে—পতি-গৃহে করিবারে বাস
নবোঢ়া আদিষ্টা যেন, অজানিত আশা-আশঙ্কায়
মুহুর্মুহুঃ কাঁপে বুক!

কায়া-হীন নির্জীব ছায়ায়
রত হল দৈনন্দিনে! একদিন তাই মন-ভুলে
অমার্জ্জিত বন-বীথি, কণ্টক বিঁধিল পাদ-মূলে
ঋষীশ্বর তাপসের! মহাক্রোধে কোলাহল ক'রে
উঠিলেন ঋষিবর! দয়া দিতে কুণ্ঠা গর্ব্বভরে—
সেবা নিতে স্বতোন্মুখ, জগতের রীতি চিরন্তন
পরিচিত ঋষীশ্বরে! ধেয়ে এল ত্বরা শিষ্যগণ
কম্পিত অজ্ঞাত ভয়ে! শবরী মাগিল যুক্তকরে
সকরুণ ক্ষমা, হায়! ক্ষমা যে দুর্লভ চরাচরে!
অকস্মাৎ বায়ুভরে মহর্ষির পবিত্র কৌপীন
স্পর্শিল শবরী-অঙ্গে! "চণ্ডালিনী, আয়ু তোর ক্ষীণ!"
গর্জ্জিলেন ঋষীশ্বর, ঘৃতাহুতি দীপ্ত দাবানলে
সন্ত্রাসিত বনস্থলী!—"কি সাহসে আশ্রম-কমলে
পশিলিরে ঘৃণ্য কীট? করিলিরে সবারে পতিত
দংশিলিরে ভুজঙ্গিনী! আজি তোর মরণ নিশ্চিত—
ঋষীশ্বর-ক্রোধ হ'তে কেবা তোরে রক্ষিবে মরতে
ভেবেছিস্ পাতকিনী! দূর হয়ে যারে হেথা হতে
স্বধর্ম্ম-ত্যাগিনী দুষ্টা!"

অবিচল সুপ্রশান্ত স্থির
শবরী দাঁড়ায়ে রহে শুধু ধীরে নত করি শির
মগ্ন সে যে প্রেমার্ণবে! ব্যাকুল শঙ্কিত শিষ্যগণ
বজ্রাহত বাক্যহারা! চলে গেলা দ্রুত তপোধন
স্নাত হয়ে শুচি হতে স্বচ্ছতোয়া পম্পা সরোবরে—
বাহিরের শুদ্ধি হায়, মাগে বিশ্ব রহিয়া অন্তরে
অপবিত্র অসরল!

কি বিচিত্র লীলা বিধাতার!
বিস্ময়ে হেরেন ঋষি কোথা পম্পা অমৃত-আধার—
রুধিরের সরোবর কীটপূর্ণ পূতি গন্ধময়
সম্মুখে বিরাজে তাঁর! তবু বিন্দু নহে জ্ঞানোদয়।
ভাবিলেন ঋষীশ্বর, চণ্ডালিনী শবরীর হায়,
অপবিত্র পরশনে শরতের মধু-চন্দ্রিকায়
স্পর্শিয়াছে কালকূট—মন্দাকিনীকল্পা পম্পা আজ
শোণিত-পঙ্কিলা হেন! সাধ্যমত দূষি ঋষিরাজ
চলে গেলা স্থানান্তরে!

শবরী হেথায় নিজ মনে
বদরিকা বনে বনে ফিরিতেছে আহরি যতনে
সুপক্ক বদরীরাজি! মিষ্ট কটু ঈষৎ চাখিয়া
বুঝে সে প্রতিটী তার, সুমিষ্ট যা' বাছিয়া বাছিয়া
বাঁধে অঞ্চলের কোণে! আসিবেন রাম রঘুমণি
বাঞ্ছিত দেবতা তার, কোথা সর—কোথায় নবনী
রাজ-ভোগ্য উপহার, বদরী সে দিবে হাতে তাঁর
প্রাণের মমতা সনে!

কভু গাঁথে চারু ফুল-হার
পুঞ্জে পুঞ্জে পুষ্প চয়ি,—অর্চ্চিতে সে চির-প্রিয়তমে
সাজাতে সে ঘনশ্যামে! আসিবেন যে পথে আশ্রমে
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, আত্ম-হারা শবরী কখন
সে পথে বসিয়ে রহে, সারা পথে বিছায়ে আপন
নির্ম্মল হৃদয়খানি! নেত্র দু'টী করিয়া আসন
রাখে বুঝি পথোপরে! কভু হায়, করিয়া স্মরণ
আপনার নীচ কুল, কুরূপ দর্শন, কদাকার
পালায় সে পথ ত্যজি'—নাহি পায় স্থান লুকাবার
বন হতে বনান্তরে! আবার যখন পড়ে মনে
অব্যর্থ গুরুর বাক্য—শ্রীরামের কৃপা দীন জনে—

আশা-সান্ত্বনায় কত ভরে উঠে—নেচে উঠে বুক—
সবাকার আগে তাঁর শ্রীচরণ হেরিতে উন্মুখ
জাগে সাধ শত মতে!

এই মত তীব্র উৎকণ্ঠায়
কেটে গেল কত কাল! প্রতীক্ষার প্রেমানলে হায়,
দগ্ধ হয়ে হল বুঝি শবরীর হৃদয়-কাঞ্চন
পবিত্র বিশুদ্ধতর—অন্তরের নিগূঢ় ক্রন্দন
শুনিলা অন্তর-নাথ! একদিন ভকতবৎসল
অধমতারণ রাম লক্ষ্মণেরে লইয়া কেবল
উপনীত আশ্রমেতে, শুধাইলা ব্রহ্মচারীগণে
শবরী কোথায় থাকে? ঋষীশ্বর অঙ্গুলি হেলনে
দেখান আশ্রম তার!

চলিলেন রাজ-রাজেশ্বর
দীন কুটীরের পানে! অকস্মাৎ পেয়ে সে খবর
শবরী আসিল ধেয়ে, লুটাইল চরণে তাঁহার
ছিন্ন লতিকার প্রায়! রামচন্দ্র করুণা-আধার
নিলা উঠাইয়ে তারে, প্রেমভরে দিলা আলিঙ্গন,
ঘুচে গেল মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব দুঃখ-সন্তাপ-বেদন
নবীন জীবন লভি'! চকোর যেমতি এক ধ্যানে
চেয়ে রয় শরতের নির্ম্মল চন্দ্রমার পানে
সেইমত শবরীর উপাস্যের বদন-কমলে
আঁখি দু'টা অনিমিখ! কি সুধা সে পিয়ে কুতূহলে
কি বুঝিবে মর্ত্ত্যবাসী! আজন্মের হৃদয়ের ভাষা
নাহি ফুটে মুখে হায়! দর্শনের আকুল-পিপাসা
নাহি মিটে নিরখিয়া! শান্তিরসে নিমগন প্রাণ—
অতর্কিতে ডাকে যেন অফুরন্ত আনন্দাশ্রু-বাণ
তিতি' বক্ষ ধরাতল!

কহিলেন রামচন্দ্র ধীরে
শবরী, "নিবে না মোরে তব পূত আশ্রম কুটীরে?
আমরা যে শ্রান্ত অতি!" বাহ্যজ্ঞান গেল শবরীর
কহিল সে করযোড়ে, "ক্ষম প্রভু, ত্রুটি এ দাসীর—
এস মোর দীন-গৃহে! কত যত্নে রেখেছি সেথায়
বন-ফল-ফুল কত উৎসর্গিতে ওই রাঙ্গা পায়
সমগ্র-জীবন সনে! কোথা পাবে গহনবাসিনী
তব যোগ্য পূজা আর!"

নিয়ে এল সুখে নিষাদিনী—
শ্রীরামে দেখায়ে পথ, পেতে দিল অজিন আসন,
এনে দিল পাদ্য অর্ঘ্য। তার পর করে নিবেদন
উচ্ছিষ্ট বদরী সেই—সেই শুষ্ক চারু ফুল-হার—
সদ্য-চয়নিত ফুল-রাশি সিক্ত প্রেম-অশ্রু-ধার—
ভক্তের নির্ম্মাল্য পূত!

রঘুমণি করুণা-সাগর
হাসিমুখে জুড়াইয়ে শবরীর তাপিত অন্তর
গ্রহণ করিলা সবি! কি আনন্দে উচ্ছিষ্ট বদরী
আহারে হলেন রত! কহিলেন, "আরো গো শবরী,
দাও দাও আমাদেরে। এত মিষ্ট এমন মধুর
খাই নি জনমে আর!"—ত্রিদিবের কি অমৃত সুর
পশিল ভক্তের প্রাণে!

ঋষীশ্বর লভি সমাচার
আসিলা বিস্ময়ে ধেয়ে! শুধাইলা, "একি ব্যবহার
সূর্য্যবংশ-অংশুমালী? শবরী সে অস্পৃশ্যা রমণী
ঘৃণিত চণ্ডাল বালা, তার গৃহে আসিলে আপনি
অসঙ্কোচে রঘুনাথ! তার পর একি অনাচার!
উচ্ছিষ্ট বদরী তার ঘৃণা লজ্জা করি পরিহার
আহার করিছ সুখে? মহারাজ দশরথ-সুত;
একি তব যোগ্য হায়? একি নহে অচিন্ত্য অশ্রুত
নিদারুণ আর্য্য-গ্লানি?"

উত্তরিলা করুণা-নিকর
"শবরী অনার্য্যা বলি তার প্রতি কেন ঋষীশ্বর,
এমন বিরূপ তুমি! ভিন্ন কিগো অনার্য্য-ঈশ্বর?
ভিন্ন কিগো মাতৃভূমি? উভয়ে লভিয়া নিরন্তর
এক দেবতার কৃপা-স্নেহ এক জনম-ভূমির
এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত প্রীতি হেন বিশ্ব-প্রকৃতির
উঠেনি আনন্দে জাগি? হৃদি যার পবিত্র নির্ম্মল,
ভক্তি প্রেম সেবা নিষ্ঠা করেছে যে প্রাণের সম্বল,
সেকি নহে আর্য্যোত্তম?

শবরী যে সেই আর্য্যোত্তমা!
ব্যাধ-বৃত্তি সে তো নহে। এক খানি চিত্ত মনোহর,
একটী মহৎ আত্মা উদ্ধারিতে বুঝি চরাচর

ব্যাধকুলে পেয়েছে বিকাশ! নিশাকাশে ধ্রুবতারা—
খনি-গর্ভে জ্বলে মণি!

শবরীরে আমি আত্ম-হারা
ভালবাসি ঋষীশ্বর! তুমি যদি ভালবাস মোরে
তবে শুধু তব-পাশে মাগিতেছি আজি করযোড়ে
বেসো ভাল শবরীরে! মনে রেখো আশ্রম তাহার
মোর প্রিয় তীর্থ-ভূমি! তার দত্ত তুচ্ছ উপহার
মোর চক্ষে অতুলন! তার এই উচ্ছিষ্ট বদরী
মনে হয় কি পবিত্র মাতৃ-স্তন্য-সুধা-রস ভরি'
আনিয়াছে মোর পাশে! আজি ইহা করিয়া আহার
ধন্য ও কৃতার্থ আমি!"

বিলাইয়া স্নিগ্ধ হৃদি-ধার
নীরবিলা রঘুনাথ! একখানি কৃষ্ণ যবনিকা
সরে গেল আঁখি হতে! কোথা এবে চণ্ডাল-বালিকা.
উদ্ভাসে সে দেবীরূপে! ঋষীশ্বর কন গাঢ়-স্বরে
"শবরী, ক্ষমিও মোরে—ভ্রান্তি বশে কত কাল ধরে
দিনু তোমা মনোব্যথা! রামচন্দ্র! সর্ব্ব গুণাধার!
আজ তুমি চূর্ণ করি মোর সর্ব্ব গর্ব্ব অহঙ্কার
প্রদানিলে দিব্যজ্ঞান; এ-আলোকে চিনিয়াছি তোমা—
চিনিয়াছি শবরীরে! কৃপাময়, অন্তর্য্যামী, ভূমা,
তুমিও ক্ষমিও মোরে! এ দুর্ম্মুখ কর্কশ বচনে
তোমায়ও দুষেছে বৃথা! কহ নাথ, হইবে কেমনে
ক্লেদপূর্ণ পম্পা পুনঃ স্বচ্ছতোয়া পবিত্র সুন্দর
কুমুদ কহ্লার শোভী।"

শবরী ভুলেছে চরাচর
শ্রীরাম কহেন হাসি, "হে মহর্ষি, পরিতুষ্ট আমি
শুনিয়া তোমার কথা! জ্ঞানে প্রেমে রহি অনুগামী
জ্ঞানময়ে প্রেমময়ে অন্বেষণ করিয়া হৃদয়ে
হও ধীরে অগ্রসর! কহিতেছি একান্ত নির্ভয়ে
হবে ধ্রুব মোক্ষ তব! তারপর শুন ঋষীশ্বর
শবরীর পদধূলি না লভিলে পম্পা সরোবর
হবে না বিশুদ্ধ কভু!"

ঋষীশ্বর নিলা পদধূলি;—
শবরী যে জ্ঞান-হারা! সে শুধুই লুটাল আকুলি
শ্রীরামের পদ প্রান্তে! সস্নেহে কহিলা রঘুমণি
"উঠ নিষ্ঠাবতী নারী! তব প্রেম নিখিল অবনী
করেছে বিজিত আজ! পূর্ণ মোর হল মনস্কাম
আর্য্য ও অনার্য্য-ঋষি মিলিয়াছে আজি অভিরাম,
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য মরি! দু'জনার পূত হৃদি ধার
মুছি বিশ্ব-জগতের যত দুঃখ-দৈন্য হাহাকার
শান্তি-রাজ্য করুক স্থাপন! উঠ উঠ হে শবরী,
আমারে বিদায় দাও।"

অকস্মাৎ থেমেছে বাঁশরী
ডুবে গেছে ধ্রুবতারা! কেবা দিবে শ্রীরামে বিদায়
আপনি বিদায় নিয়ে প্রিয়তম-বিরহ-শঙ্কায়
শবরী ত্যজেছে দেহ! আত্ম-হারা ভকত বৎসল,
ঋষীশ্বর বাক্য-হারা!

বঙ্গ-কবি ঢালি আঁখি জল
যুগ-যুগান্তের পরে হে তাপসী, উদ্দেশে তোমার
স্মৃতির তর্পণ করে! এস দেবী, এস একবার,
এ সন্তপ্ত হৃদি মাঝে! তপ পূত পদ-রেণু-সনে
মিশাইয়ে অশ্রু মোর রচি প্রাণে নিভৃতে গোপনে
তোমারি সমাধি-পীঠ! যেথা নিত্য উষায়-সন্ধ্যায়
একান্তে একেলা বসি আরাধ্যের পূজা-শেষে হায়,
শিখিব তোমারি পাশে তব দিব্য প্রেমের সেবার
নীরব-নিষ্কাম-মন্ত্র বিশ্বে শুধু দিতে উপহার।*

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

* এই কবিতাটী লেখকের অপ্রকাশিত কাব্য "দেবীগাথা" হইতে সঙ্কলিত এবং চট্টগ্রাম "সাহিত্য পরিষদের" দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সভায় পঠিত।

বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জানুয়ারীর ১৪ই আমরা টোকিও যাই। সেখানে ২০ দিন আমার ছোট ননদের বাড়ী ছিলাম। এখানে তাঁহার স্বামীর দোকান আছে। ১৩ই সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হইয়া ১৪ই প্রাতে ষিমবাসী (টোকিওর ষ্টেশন)

নামিয়াছিলাম। এদেশে আরোহী ভিন্ন অন্যলোক ট্রেনের নিকটে যাইতে পারে না। যদি কেহ আত্মীয়কে ট্রেনে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্ল্যাটফরমে আসিবার জন্য কয়েক পয়সার টিকিট কিনিতে হয়।

টোকিও জাপানের রাজধানী। টোকিওতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী বাড়ী ব্যতীত সকলই কাঠের বাড়ী। সহরটী রাজধানী হিসাবে বিশেষ কিছু জমকাল বলে বোধ হয় না। রাস্তায় সর্ব্বদা রিক্স, ট্রাম চলে; কদাচিৎ ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায়। বৃষ্টির পর রাস্তার অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান হয়। কাষ্ঠ-পাদুকা পরিয়া চলাতে আরও গভীর কাদা হয়। ট্রাম বেশ সুবিধাজনক, পাঁচ পয়সার এক টিকিটে সহরের যে কোন স্থানে যাওয়া যায়। ট্রাম বদলাইতে হইলে এক টিকিটেই চলে। গাড়ী একখান ক'রে চলে; শ্রেণীবিভাগ নাই। ট্রামের সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে দ্বার। ট্রামে উঠিলে কণ্ডাক্টার টিকিট দিয়ে যায়, নামিবার সময় তাহাকে টিকিট খানা দিয়ে যেতে হয়। নির্দ্দিষ্ট লাল রংয়ের স্তম্ভ-চিহ্নিত স্থানে ট্রাম থামে। থামিবার পূর্ব্বে কণ্ডাক্টার পরবর্ত্তী স্থানের নাম বলে ও নামিবার লোক আছে কি না জিজ্ঞাসা করে, উত্তর না পাইলে থামায় না। সময় সময় সাবধানে ধীরে ধীরে উঠা-নামা করিবার উপদেশ দেয়। রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র কুঠুরীতে পুলিশ বসে থাকে। তাহার কাছে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বলে দেয়। জাপানে পুলিশের নিকট তরবারী থাকে। পুলিশ কোনরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন না করিয়া শান্তিরক্ষা করে এবং সকলের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করে। স্থানে স্থানে টেলিফোন করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে, পাঁচ পয়সা দিয়া টেলিফোনে পাঁচ মিনিট কথা বলা যায়।

১৬ই জানুয়ারী—আমরা একটী মেয়েদের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী আমাদের সব দেখাইলেন। ইনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সুশিক্ষিতা, ইংরাজী বেশ জানেন। ২।৩ ঘণ্টা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। সংসারে উন্নত জীবন লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য হইতে হইলে ও সন্তানসন্ততি এবং দেশবাসীদের মানুষ করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার বুঝি কোনটীরই এখানে অভাব নাই। স্কুলটিতে রসায়ণ, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, সাধারণ শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি কলেজের পাঠ্য উন্নত বিষয় হইতে রন্ধনকার্য্য, ধোপার কাজ, গৃহাদি পরিষ্কার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানের কাজ, সেলাই, গান বাজনা, শিল্প কাজ, ড্রইং, নীতিশিক্ষা, ইংরাজীভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের বই পড়ান হয় না। তাহাদিগকে কাগজ কাটা, ছবি আঁকা, মাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা ও গল্পচ্ছলে নীতি বিষয়ে নানা প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। মাটি দিয়া "ফুজিসান" (পাহাড়), "সুমিদা" (নদী) প্রস্তুত ক'রে ভূগোল শিক্ষা দেয়। ছড়া বলার মত গান ক'রে বড় বড় নগরের ও সহরের বড় বড় স্থানের নামগুলি মুখস্থ করে। শিশুদের হস্তনির্ম্মিত মাটির দ্রব্যগুলি ও চিত্রগুলি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

১১ই মাঘ—মাঘোৎসব। এতদুপলক্ষে টোকিও প্রবাসী একজন ভারতবাসীর গৃহে ব্রহ্মোপাসনার বন্দোবস্ত হইল। আরও ৩।৪ জন ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। সকলে একত্রে আহারাদি হইল।

কয়েকটী পার্ক আছে। তন্মধ্যে একটী "আসাকুসা কোয়েন"—আমোদ প্রমোদের স্থান। পার্কে প্রবেশ করিলেই একটী মন্দির। তৎপরে স্থানে স্থানে সার্কাস, বায়স্কোপ, নাচ, ইত্যাদি কত কিছু হইতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এ গুলি খোলা থাকে। অল্প পয়সায় খুব ভাল ভাল তামাসা যতক্ষণ ইচ্ছা দেখা যায়। অনেক লোক দেখিতে আসে। অত্যন্ত ভিড় হয়। নানা প্রকার বাজনা বাজে। এখানে একটী "খাননসামার" দেবমন্দির আছে। আমরা ৩।৪ দিন এখানে বেড়াতে এসেছি।

"উয়েনো" নামক আর একটী পার্ক অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর স্থিত। এখানে একটী চিড়িয়াখানা ও একটী মিউজিয়ম আছে। মিউজিয়মে—মৃত মিকাডোকে কবর দিতে লইয়া যাইবার জন্য যে সুদৃশ্য মূল্যবান বাক্সটী ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা আছে। একটী বৃহৎ পুষ্করিণীতে গ্রীষ্মকালে পদ্মফুল ফুটিয়া বড়ই সুন্দর দেখায়।

টোকিওর মধ্যস্থলে স্বর্গগত মিকাডোর প্রাসাদের

নিকটই অতি সুন্দর "হিবিয়া" নামক "কোয়েন" (পার্ক) ইউরোপীয় ফ্যাসানে প্রস্তুত। বিস্তীর্ণ স্থান। পুষ্করিণীর ভিতরে ফোয়ারা হইতে জল উঠিতেছে। অনুচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়, খেলিবার মাঠ, নানারূপ পুষ্পবৃক্ষ, কয়েকটী সুদৃশ্য পক্ষী ইত্যাদি আছে। রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধান।

এখান থেকে অল্প দূরে "কুদন" নামক স্থানে "যোকনষা" (বীরপূজার মন্দির) নামক একটী মন্দির; এখানে প্রতি বৎসর অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত দেশের মৃত বীরগণের উদ্দেশ্যে পূজা হয়। মন্দির-পার্শ্বেই অস্ত্রপ্রদর্শনী। বিগত যুদ্ধের দ্রব্যাদি, বীরগণের ফটো ও স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষিত। রুশ ও চীন-যুদ্ধে ব্যবহৃত ও অধিকৃত অসংখ্য কামান, বন্দুক, তরবারী ইত্যাদি কত কি যে রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বকালীন যুদ্ধাদির সাজ, অস্ত্রাদি ও দেশের জন্য যে বীরগণ প্রাণ দিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেছেন তাঁহাদের ফটো ও স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষিত হইয়াছে। পোর্টআর্থার বিজয়ী স্বর্গীয় জেনারেল নোগী ও তৎপত্নী যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ও যে তরবারী দ্বারা আত্মহত্যা করেন তাহা ও তাঁহার গৃহসজ্জাদি রক্ষিত। দেখিবার জন্য প্রতি জনকে পাঁচ পয়সার টিকিট কিনিয়া প্রবেশ করিতে হয়। বাহিরেও অনেক বড় বড় কামান রাখা হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদ বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। স্বর্গীয় সম্রাটের প্রাসাদ "মারু নোউচি" ক্রমান্বয়ে দুইটী পরিখা ও দুইটী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার নিকটেই বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ। ইহাও উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। নগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ রাজবাটীর চারিদিকে কাছারী, বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় লোকের বাস।

২৯শে জানুয়ারী—টোকিও হইতে ট্রেনে ৫ ঘণ্টার পথ "নিকো" নামক স্থানে গিয়াছিলাম। নিকো অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ পর্ব্বতময় স্থান। পাহাড়ের উপর চিত্র বিচিত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত কাষ্ঠ ও পিত্তল নির্ম্মিত সুদৃশ্য বাড়ী ও প্যাগোডা (মন্দির)। একটী জলপ্রপাত হইতে ভয়ানক শব্দে হুড় হুড় করিয়া জল পড়িতেছে। যে পথে জল যাইতেছে তদুপরি একটী সুদৃশ্য লাল রংয়ের কাঠের সেতু আছে। ইহা পবিত্র সেতু বলিয়া ইহার উপর গমনাগমন নিষেধ। এখানে অত্যন্ত শীত। সবই তুষারাচ্ছন্ন। শীতে যেন শরীর আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছিল। আমরা কয়েক ঘণ্টা মাত্র এখানে ছিলাম। "ইসে" এখানকার একটী তীর্থস্থান। এখানকার দুইটী দেবমন্দিরে প্রণাম করিবার জন্য সর্ব্বদা লোক আসিয়া থাকে। নির্জ্জন সুদৃশ্য স্থানটী বাস্তবিক যেন শান্তির আলয়। একটী যুদ্ধে সাহায্যকারী দেশহিতৈষী দেবতার মন্দির। দেশে যুদ্ধ বিদ্রোহ, কোন অশান্তি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আরম্ভ হইলে লোকে এখানে পূজা করিতে আসে। বৃহৎ সুন্দর উদ্যান-পরিবেষ্টিত মন্দির। বৃহৎ "তোরি" তল হইতে শূন্য মস্তকে প্রবেশ করিতে হয়। সর্ব্বদা পুলিশ পাহারা দেয়। তৎপরে বাগানের অনেকটা পার হইয়া মন্দির দ্বারে আসিতে হয়। মধ্য পথে মন্দিরস্থ দেবতার যুদ্ধ-যাত্রাকালে সজ্জাগৃহ ও তাঁহার জন্য ২।৩টী অশ্ব আছে। মন্দির দ্বারে একটী বাক্সে ইচ্ছামত কিছু দান করিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে হয়। দ্বারদেশ শ্বেত পরদায় আবৃত। চারিদিকে কাঠের উচ্চ প্রাচীর, বাহির হইতে মন্দিরের চূড়াগুলি ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না।

জাপানের পূর্ব্বতন রাজধানী কিয়োতো এঁদের পুণ্য তীর্থস্থান রূপে গণ্য। এখানকার নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট বড় বড় "ওথেলা" (দেবমন্দির) গুলি দর্শনীয়। একটী বাড়ীতে পূজাদি উপলক্ষে পূর্ব্বের রাজগণ আসিলে বসিতেন। বর্ত্তমান রাজারও বসিবার ঘর আছে। গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ বারান্দাগুলি এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে হাঁটিবার সময় পাখীর ডাকের মত নানারূপ শব্দ হয়। প্রতিজনকে পাঁচ পয়সার টিকিট কিনিয়া বারান্দায় একবার বেড়াতে হয়। ওথেলায় পিত্তল ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুদৃশ্য বড় বড় আলমারীতে "ওসাকাসান"—বুদ্ধমূর্ত্তি। সম্মুখে পিত্তলের ফুলদানীতে ফুলপাতা, পিত্তলের পাত্রে ধুনা এবং পিত্তল নির্ম্মিত ঝাড় ও প্রদীপ। সম্মুখে আলোও ধূপধুনা জ্বালাইয়া উৎকৃষ্ট বেশধারী "বোসান" (পুরোহিত) উন্নত আসনে উপবিষ্ট

হইয়া মন্ত্রপাঠ করেন ; মাঝে মাঝে বৃহৎ ঘণ্টায় ঢং ঢং শব্দ করা হয়। উপস্থিত লোকেরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে ও মাঝে মাঝে "নামান্দাত্‌ নামান্দাত" (অনেকটা হরিধ্বনি বা ঈশ্বরের কোন নামোচ্চারণের ন্যায়) শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে। যুক্তকরে ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ বা কাচের মালা হাতে জড়াইয়া নমস্কার করে। পরে অপর একজন উপদেশ দেন। পূজা শেষ হইলে প্রতি জনের নিকট হইতে এক একটী ছোট ডালায় দুই, এক বা অর্দ্ধ পয়সা হিসাবে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।

জাপানের ওথেরাগুলি সবই প্রায় এক ধরণেরই, পূজাদিও প্রায় এক পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয় ; তবে মন্ত্রাদি ধর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন হয়। কিয়োতোর মন্দিরে প্রতি বৎসর বিশেষ পূজার সময় বহুলোক গমনাগমন করে। এখানে পাহাড়ের উপর স্বর্গীয় মিকাডোর সমাধিস্থান। এক্ষণে সমাধি ও রাস্তাদি প্রস্তুত হইতেছে, সেজন্য কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না। পাহাড়ের কতকটা নীচে দর্শনার্থীরা উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া যায়। কিয়োতোয় একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ; উপরে পিতলের গিল্টি করা। আরও কয়েকটী সহর দুই একদিন করিয়া দেখিয়াছি, তন্মধ্যে নাগোয়া ও ওসাকা বড় নগর। নাগোয়া এঁদের গ্রাম হইতে খুব নিকটে ; ট্রামে কয়েক মিনিটের পথ। এখানে সর্ব্বত্র এমন কি ছোট ছোট সহরেও ট্রাম চলে। বৃষ্টির পর রাস্তা বড়ই খারাপ হয়। সর্ব্বত্র এক ধরণেরই কাঠের বাড়ী। স্ত্রী পুরুষের প্রায় একই পোষাক ও একই চেহারা।

এখানকার কোন ভূমি জঙ্গলপূর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। ধান্য, গোধূম ও অন্যান্য শস্য থাকে থাকে সারি সারি করিয়া বপন করা হয়। ইহারা মলমূত্রাদি পচাইয়া কৃষিক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহার করে। মটরের মত নানা প্রকার ডাল হয় ; মটর ডালও হয়। ইহা প্রথম ইণ্ডিয়া হইতে আমদানী হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে "ইন্দোমামে" অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার ডাল বলে। দারুণ শীতে যে সকল বৃক্ষলতা পত্রাদিশূন্য হইয়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, এক্ষণে বসন্তকালে তাহা পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়াছে। এসময় "সাকুরানোহানা"—বসন্তের চেরী ফুল ও অন্যান্য ফুল বৃক্ষ আচ্ছাদন করিয়া প্রস্ফুটিত হয়। কোন কোন স্থানে অনেক পরিমাণে চেরী ফুলের বাগান আছে। অসংখ্য লোক তাহা দেখিতে আসে। তাহাদের বিশ্রামের জন্য কয়েক খানি ঘর প্রস্তুত করা হয়। ঘণ্টা হিসাবে তাহার ভাড়া দিতে হয়। নানারূপ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত হয়, দোকান ও আহারাদির বন্দোবস্তও থাকে। চারিদিকে প্রস্ফুটিত চেরী বৃক্ষ। বসন্তে জাপানের দৃশ্য বড়ই মনোরম !

আমার প্রতি এ দেশবাসীগণের আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিলে অবাক হইতে হয়। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ সর্ব্বদা আমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তাহাই করিতেন। আমার সকল কাজ তিনি ক'রে দিতেন। কূপ হইতে কদাচিৎ জল তুলিতে বা বস্ত্রাদি কাচিতে গেলে তাহা আমার হাত হইতে জোর করিয়া লইয়া নিজে সম্পন্ন করিতেন ; আমি আপত্তি করিলে বলিতেন, "শীতে কষ্ট হইবে ও অসুখ হইবে।" ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছে কিন্তু এত পরিশ্রম করিতে পারেন, যাহা আমাদের মত ২।৩ জনেও সমর্থ হয় না। আমি আহারাদি প্রস্তুত, গৃহ পরিষ্কার প্রভৃতি যে কোন কাজ করিতে যাইতাম, আমাকে সরাইয়া নিজে সমাধা করিতেন। ঠাণ্ডা জল কখনও ব্যবহার করিতে দিতেন না। আমার রুচিকর খাদ্য যাহা পারিতেন প্রায়ই প্রস্তুত করিয়া বা কিনিয়া দিতেন। শীতে অগ্নি-পাত্র লইয়া যখন বসিয়া থাকিতাম, আমার গাত্র কম্বলাদি শীতবস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া দিতেন ; স্নান করিবার সময় গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতেন। অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিতে কষ্টকর বোধ হইত বলিয়া আমাকে 'কিমোনো' প্রভৃতি সেলাই করিতে দিতেন। যে সকল স্থানে কোন আনন্দের ব্যাপার বা কিছু দর্শনীয় থাকিত তথায় লইয়া যাইতেন। তাকেদাসানের ভ্রাতৃবধূ তাঁহার শিশুপুত্রকে প্রায় আমার নিকটে রাখিতেন, পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়গণ আমাকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গৃহের কার্য্যাদি, চিত্রিত কার্ড

ইত্যাদি দেখাইতেন। এইরূপে আমাকে বিদেশী বলিয়া কোনরূপ ঘৃণা বা অসন্তোষ প্রকাশ ত দূরের কথা, কিসে আমার চিত্ত বিনোদন করিবেন তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। কেবল নিজ বাটীতে নয়, যে কোন স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া বা নিজ প্রয়োজনে যাইতাম, বিদেশী বলিয়া সকলেই আমাকে দেখিতে আসিতেন ও নানা সংবাদ শুনিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যে কি বন্দোবস্ত করিবেন তাহার ঠিক পাইতেন না। সাধ্যানুসারে যত্নাদি করিয়াও আমার অত্যন্ত কষ্ট অসুবিধা হইতেছে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না—ইত্যাদি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। মোট কথা, বিদেশীর প্রতি ইঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। কোন ভারতবাসীর পরিবারে কয়েক দিনের জন্য ঝি ছিল না। তাঁর স্ত্রী শিশু-পুত্রটীকে লইয়া ভয়ানক শীতকালে সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের বাটীর নিকটস্থ এক সম্ভ্রান্ত ধনী জাপানী পরিবারের একটী বালিকা সর্ব্বদা উঁহাদের সাহায্য করিতেন। মেয়েটীর স্কুলের পড়া শেষ হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী গ্র্যাজুয়েট ও ইংরাজীতে অভিজ্ঞা। বালিকাটী সর্ব্বদা ওঁদের বাড়ী এসে সন্তান রাখা, বাসন ধোয়া, রন্ধনাদির সাহায্য ইত্যাদি সব করে দিতেন।

তাকেদাসান ভারতে আসার পর একবার অনেকদিন পর্য্যন্ত সংবাদাদি না পাইয়া সকলে তাঁহার মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলেন। সে জন্য দীর্ঘ নয় বৎসর কাল পরে সন্তানকে পাইয়া পিতামাতা ও আত্মীয়গণ পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে খুব উৎসবানন্দ হইল। সমুদয় আত্মীয়-স্বজনগণ এসময় মিলিত হইয়াছিলেন। হিন্দুদের মত এঁদের এক এক পরিবারের একজন করিয়া পুরোহিত (বোসান) থাকেন। উৎসব উপলক্ষে মাতৃপক্ষ, পিতৃপক্ষ ও অপরাপর ১২ জন পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বাটীস্থ সুসজ্জিত গৃহে, বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান বেশধারী ১২ জন "বোসান" সমস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরিবারস্থ পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র বা স্তোত্র পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে একজন সকলকে উপদেশ দান করিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ৮ টায় আরম্ভ হইয়া ৩।৪ ঘণ্টা ব্যাপী পূজাদি হইল। বৈকালে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও তৎপরদিন প্রত্যুষে স্তোত্র পাঠ ও উপদেশাদি প্রদত্ত হইল। রাত্রে "বোসান"গণ ও আমরা একত্রে আহার করিলাম। সে সময় পুরোহিতগণের সহিত আলাপ হইল। কেহ কেহ আমাদিগকে নিমন্ত্রণও করিলেন। হিন্দু পুরোহিতগণের ন্যায় ইঁহাদিগকে টাকা দিতে হয় ও তদ্দ্বারাই ইঁহারা সাধারণ অপেক্ষা পরম সুখে বাস করেন। পুনঃ পূর্ব্বদিনের ন্যায় পূজাদি হইয়া কার্য্য শেষ হইল। এতদুপলক্ষে তিন চারশত আত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীদের খাওয়ান হইয়াছিল। পূজার পূর্ব্বে নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল। অনেক লোক বিশেষ ভাবে আমাকে দেখিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। এত লোক হইয়াছিল যে পূজার পর যে চাঁদা সংগ্রহ করা হয় তাহাতে প্রতিজনের নিকট হইতে এক, অর্দ্ধ বা সিকি পয়সা করে প্রায় ১৫।১৬ ইয়েন (২৩।২৪ টাকা, ১॥১০ আনায় ১ ইয়েন) আদায় হইয়াছিল। সকলে আমাকে দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র যে ভিড়ের ভিতরে আমার থাকা কষ্টকর হওয়াতে আমার দেবরেরা সকলকে ঠেলিয়া আমাকে টানিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন দেখিবার জন্য সকলে খুব ব্যগ্র হইতেন, ২।৩ মিনিটের জন্য আমাকে বাহিরে আসিতে বলিতেন। এসকল গ্রামে ও অন্যান্য সহরে, যেখানে বিদেশী বড় কেহ দেখেন নাই, এইরূপ স্থানে আমার চলা ফেরা এক রকম কষ্টকর বোধ হইত। কারণ, অসংখ্য লোক আমাকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিত। আসিবার সময় শাশুড়ীঠাকুরাণী এক ননদ-পুত্র সহ "কোবে" পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিলেন। বিদায় কালে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। আমি তাকেদাসানকে বলিতে বলিলাম, "সকলে আমার কত যত্ন আদর করিলেন কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিতে পারিলাম না।" তাহাতে তাঁহারা—"বিদেশে কত কষ্ট পাইতে হইল কিছুই করিতে পারিলাম না" ইত্যাদি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিদেশে এমন সরলস্বভাবা স্নেহপরায়ণা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মা'র মত

যেই যত্ন ভালবাসা পাইয়া ইঁহার সহিত বাস করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায় ?

শ্রীহরিপ্রভা তাকেদা।

শ্রাদ্ধিকী ও অশোকস্মৃতি।

আমাদের শ্রদ্ধেয়া কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় সম্প্রতি "শ্রাদ্ধিকী" ও "অশোকস্মৃতি" শীর্ষক দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়া দুখানি গ্রন্থই উপহার পাঠাইয়াছেন। সাহিত্য রচনার জন্য এ দুখানি বহি লিখিত হয় নাই। মৃত্যু ক্রমাগত তাঁহার চারিদিকে অন্ধকারময় ছায়া ফেলিতেছে; তাঁহার পরম স্নেহের ভগিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুর আক্রমণে অকালেই সংসার হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব এবং স্বামীও পরলোকে গমন করিলেন। অবশেষে তাঁহার হৃদয়বৃন্তের রমণীয় পুষ্পটি না ফুটিয়াই অকালে ঝরিয়া পড়িল; তিনি প্রিয় পুত্র অশোককে হারাইলেন। ধর্ম্মশীলা কবির ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস; তাই তিনি ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া সকল দুঃখই সহ্য করিতেছেন। এই সকল প্রিয়জনদিগের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত বন্ধুদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ঐ সকল জীবনের কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই দুখানি পুস্তক বড়ই ভাল লাগিয়াছে এবং উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। সেই জন্যই মাসিক পত্রে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্তি হইতেছে।

"শ্রাদ্ধিকী" গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন, স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেন, স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় ও তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া সরযুবালার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডী বাবু সুশিক্ষিত, স্বদেশহিতৈষী, ধার্ম্মিক ও তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিতের মধ্যে সেই তেজস্বী পুরুষের সদ্‌গুণের কথা পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। চণ্ডী বাবু সাহিত্যজগতেও সুপরিচিত। তৎপ্রণীত "মেটকাফের জীবনচরিত", "টমকাকার কুটীর", "চল্লিশ বৎসর" এবং "মহারাজা নন্দকুমার" প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি অনেকেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন। আশা করি "শ্রাদ্ধিকী"র মধ্যে তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিয়া সকলেই সুখী হইবেন। আমরা এই গ্রন্থের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয়া লেখিকার জীবনের দুই একটি ঘটনা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় মহাশয়ও এ দেশের একজন উচ্চ শিক্ষিত ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্ব্বিসের লোক ছিলেন। নানা স্থানে সেসন জজের কার্য্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি তেজস্বী ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তরুণ বয়সে ধর্ম্মের জন্য অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-চরিতও আমাদের পাঠ করিবার যোগ্য।

স্বর্গীয়া সরযুবালার জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। উহা মহিলাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কয়েকটি স্কুলের মেয়ে এই সুন্দর জীবনের চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলি পাঠ করিয়া বইখানি কিনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সরযুবালার জীবনচরিত সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সরযুবালার জননী ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। সরযু এগার বৎসর বয়সের সময়ই মাতৃহীনা হইয়া পিতার সংসারের ভার গ্রহণ করেন এবং ভ্রাতৃসেবায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৭ সনে বেথুন স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলেন; কিন্তু রুগ্ন ভ্রাতার সেবার জন্য আর পড়ার সুবিধা হইল না। শুধু তাহাই নয়; বালিকা রুগ্ন ভ্রাতাকে লইয়া কলম্বো গমন করিলেন। এই সময় বালিকার অন্তরে মহৎ সংকল্পের উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন রোগীর সেবায় জীবনপাত করিবেন। ইহার পর সিটিকলেজের অধ্যাপক মিষ্টার বিমলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁহার পরিণয়

হইল। সরযু চিকিৎসা ও শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য স্বামীর সঙ্গে বিলাত গমন করিলেন। বিলাতে খ্যাতনামা ব্যাংলার মিষ্টার পারঞ্জপ্যে প্রভৃতি অনেক ভারতবাসী ছাত্র তাঁহার সদ্‌গুণে ও হৃদয়-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সরযূ ধাত্রীবিদ্যা ও শুশ্রূষাবিদ্যা শিখিয়া পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা লাভ করেন। হয় ত মনে আশা ছিল, অনেক রুগ্ন রমণীর শুশ্রূষা করিয়া সেবার গৌরবে গৌরবান্বিতা হইবেন এবং নারী-জীবনকে ধন্য করিবেন। কিন্তু সে মনের আশা মনেই রহিয়া গেল; কঠিন পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; একাকিনী রুগ্ন শরীর লইয়া বাঙ্গালাদেশে পিতার কাছে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর এই সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এ দেশে যে সকল মেয়েরা লেখাপড়া শিখেন, সেই সকল শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে লোকের কত রকমেরই ভ্রান্তধারণা আছে। কিন্তু সরযু লেখাপড়া শিখিয়া এবং জজের কন্যা, জজের ভগিনী হইয়াও প্রাণপণ করিয়া ভাইদের সেবা করিতেন। সংসারের কার্য্য ও আপনার চরিত্রের মাধুর্য্যদ্বারা পরিবারের সমস্ত লোককেই সুখী করিতেন। বালিকা অতিশয় সরলা ছিলেন। তাঁহার বিবেক উজ্জ্বল ছিল। জীবন-চরিতে শ্রদ্ধেয়া লেখিকা লিখিয়াছেন—"সরলা পবিত্র-হৃদয়া সরযুর সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বিমলচন্দ্র বিবাহের প্রস্তাব করিবা মাত্র তিনি তাঁহাকে দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; 'আপনি জানেন, কি রোগে আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে? আপনি জানেন, আর এক ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল?' এই দুই বিষয়ে যুবক সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন, এ কথা জানিয়া তবে তাঁহার অপর কথা শুনিতে স্বীকৃত হইলেন।"

ক্ষুদ্র জীবনচরিতের মধ্যে এই রকম আরও অনেক সুন্দর কথা আছে। আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে একখানি "শ্রাদ্ধিকী" কিনিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

অতঃপর "অশোকস্মৃতি" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অশোক শ্রদ্ধেয়া লেখিকার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের পুত্র। ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অল্প বয়সেই বালকের সুন্দর জীবন নানা সদ্‌গুণে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। বালক জননীকে অতিশয় ভক্তি করিত; প্রতিদিন তাঁহার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। মাতার সেবা করা তাঁহার স্বাস্থ্য ও সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখা বালকের একটি প্রধান কার্য্য ছিল। বোধ হয় বাঁচিয়া থাকিলে মাতার প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইতে পারিত। অশোক এই বয়সেই বাঙ্গলা ভাষায় সুন্দর রচনা লিখিত। বিধবা জননী এই সন্তানের উপর অনেক আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, মানুষের ইচ্ছা এক রকম, বিধাতার ইচ্ছা অন্য রকম; তিনি এই বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ও সেবাপরায়ণ বালকটিকে তাঁহার স্বর্গে লইয়া গেলেন।

"অশোকস্মৃতি" আমরা আমাদের ঢাকার নীতি-বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তাঁহারা এক একখানি বই পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। আমরা "অশোকস্মৃতি" হইতে গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"তাহার বয়স যখন সাত বৎসর তখন সে ও তাহার ভগিনী আমাদের সহিত ওয়াল্টেয়ারে গিয়াছিল। সেখানে আমার একদিন খুব জ্বর হয়; তখন দুই ভাইবোনে তর্ক চলিতে লাগিল, কে সারা রাত্রি আমার কাছে জাগিয়া বসিয়া থাকিবে? দুই জনেই পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল, কিছুতেই ঘুমাইবে না। * * দশ বৎসর বয়সের সময় ইহাদের গৃহবাসিনী কোন মহিলা অসুস্থ হন। অশোক স্কুল হইতে আসিয়া কখন কখন ১১।১২ টা রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত।"

"আজই আমরা দেখিলাম, তাহার একখানি পুস্তকের মধ্যে তাহার স্বহস্তের লেখা রহিয়াছে—

"Heaven is not dearer
Nor is it more loving
Than is my mother,
My Goddess, my queen"

অর্থাৎ আমার মা অপেক্ষা স্বর্গও আমার অধিক প্রিয় নয়; আমার মা আমার রাণী, তিনিই আমার দেবী।

"এক দিন মাতা কিছু অসুস্থ ছিলেন, সকালে আহার করেন নাই। অশোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা কখন খাবে, আর কি খাবে?" মাতা বলিলেন, "চাকরদের ভাত ঢাকিয়া রাঁখিতে বল, আমি ২টার সময় খাইব।" দুইটার পূর্ব্বে আহার-গৃহে খট খট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই অশোক মাতাকে খাইতে ডাকিল। তিনি নীচে আসিয়া দেখেন, টেবিলের উপরে আহার্য্য সজ্জিত, সব জিনিষই গরম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাকরেরা কি ইহার মধ্যেই আসিয়াছে?" অশোক বলিল "না।" মাতা বুঝিলেন, অশোক নিজ হাতে চুলা ধরাইয়া সব গরম করিয়াছে। ভাত কি প্রকারে গরম করিবে ভাবিয়া না পাইয়া তাহাতে কিছু জল দিয়া ফুটাইয়া নরম করিয়া ফেলিয়াছিল।"

"একদিন দেখি চুলা ধরানো রহিয়াছে * * অশোককে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে উনুন ধরাইয়াছে?" সে বলিল, "কেন, আজ আপনার উনুনে কি দরকার নাই? বড় মামার জন্য কিছু রাঁধিবেন না? আপনি রোজ রাঁধেন, তাই আমি মনে করিলাম, আপনার জন্য উনুনটা ধরাইয়া রাখি।"

"মাতা বলিলেন * * নিজের জীবনখানি এমন সুন্দর ভাবে গঠন কর, যে তাহারা তোমাকে দেখিয়া অপর সকল ব্রাহ্মকেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিখিবে।" মাতৃভক্ত পুত্র মাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া * * নীরবে আদর্শ জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল।"

আমরা সকল বালক বালিকাদিগকে মাতৃভক্ত অশোকের ক্ষুদ্র জীবনচরিতটুকু পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রদ্ধেয়া লেখিকার গল্পরচনা অতিশয় মনোহর। সাহিত্যের হিসাবেও বই দুখানি পাঠ করিবার যোগ্য।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ঘোম্‌টাওয়ালী।

(সত্য ঘটনা।)

বিগত বৎসর একটী নবপরিণীত যুবক নববধূকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয় হইতে স্বগৃহে ফিরিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া মহিলাদিগের গাড়ীতে নববধূকে তুলিয়া দিয়া তাহার খানিক দূরে নিজে পুরুষদের গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী কোনও ষ্টেশনে থামিলে সেই যুবক সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া স্বীয় পত্নীকে "ঘোমটাওয়ালী" সম্বোধন পূর্ব্বক তাহার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া আবার নিজের গাড়ীতে গিয়া বসিত। পার্শ্বস্থিত একটী গাড়ীর আরোহী এই ঘটনা দেখিয়া রাত্রিতে কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে সেই মহিলাদের গাড়ীর নিকট গিয়া "ঘোমটাওয়ালী" শীঘ্র নামিয়া এস, দেরী করিও না, বাড়ী আসিয়াছি" বলিয়া ডাকিল। অমনি একটী অবগুণ্ঠনবতী যুবতী গাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই লোকটী তাহার হাত ধরিয়া সেই জনতার মধ্য দিয়া তাহাকে লইয়া কোথায় যে পলাইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। অবশেষে সেই নবপরিণীত যুবক তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলে গাড়ী হইতে নামিয়া পত্নীকে লইবার জন্য "ঘোমটাওয়ালী, শীঘ্র নেমে এস" বলিয়া বার বার ডাকিতে লাগিল। গাড়ীর ভিতরের রমণীরা বলিল, "তাহাকে যে রাত্রিতে আসিয়া একটী লোক ঘোমটাওয়ালী বলিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।" এই সংবাদে হতভাগার মস্তকে বজ্রপাত হইল। সে উন্মাদের ন্যায় সমস্ত ষ্টেশনের ভিতরে বাহিরে "ঘোমটাওয়ালী" "ঘোমটাওয়ালী" বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুলিসে খবর দিল, কিন্তু তাহার কোনই সন্ধান পাইল না। বেচারা বিবাহের রাত্রি ভিন্ন পত্নীকে আর ভাল করিয়া দেখেও নাই, আর সেই হতভাগিনী যুবতীরও যে কি পরিণাম হইল তা কে বলিতে পারে! সে একে নববধূ, বিদেশে বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে কোথায় চলিয়া গেল। নিরক্ষরা জ্ঞানহীনা

নারী, নতুবা পত্র দ্বারাও তাহার স্বামীর বা পিতার নিকট সংবাদ দিতে পারিত।

অনেকেরই ধারণা, যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতে শিক্ষার স্রোত যেরূপ প্রবলতর রূপে প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে এরূপ নিরক্ষরা তরুণী রমণী আর কোথাও নাই ; কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা, বিগত বৎসর পাঞ্জাব প্রদেশে ঘটিয়াছে। এখনও যে কত শত নারী অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহাদের অজ্ঞানতা নিবন্ধন সমাজের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে তাহার আরও দু একটী ঘটনা ক্রমে বর্ণিত হইবে।

শ্রীহেমন্তকুমারী চৌধুরী।
পাতিয়ালা।

চেতনা।

স্বপনে কি পেয়েছিনু তাঁরে
দিছিল কি স্নেহের পরশ,
তাঁরি ডাকে জাগিলাম বুঝি
আজি তাই হৃদয় সরস।

আজি তাই উষার আলোক
কি মধুর সোণালি আভায়
আজি তাই আকাশে বাতাসে
তাঁরি প্রেম অমিয় বিলায়।

তাঁরি সে 'নিখিলগতি' নাম
শুনেছিনু বহুদিন গত,
ভাবিতাম কত মনে মনে
ভাবিতাম আলেয়ার মত।

ভাবিতাম ধরিতে তাঁহারে
মরুভূমে হব পথহারা,
আজি প্রাণ সত্য বলি মানে
অনিমেষ সে যে ধ্রুবতারা।

আধ আধ ছায়ার মতন
শুধু যাঁর একটু পরশে,
জীবন এমন সচেতন
মগ্ন প্রাণ নিবিড় হরষে।

না জানি গো তাঁহার বারতা
নাহি জানি কেমন সে জন,
ক্ষণিকের পরশনে যার
জেগে ওঠে নিখিল ভুবন।

কি আলোক লভিল নয়ন
পরশ মণির পরশনে
আমারি যে মরমের কথা
কে লিখিল গগনে গগনে!

স্বপনে কি পেয়েছিনু হায়!
এস আজ জীবনের মাঝে,
বেদনার আনন্দে পরাণ
তোমারি যে পথ চাহি আছে।

শ্রীসুধাসিন্ধু সেনগুপ্তা।

শিশুর পরিণতি।

শিশুকে ঠিক বুঝিতে হইলে, তাহার জীবনের ক্রম-পরিবর্ত্তনের যুগগুলি বেশ করিয়া জানা আবশ্যক।

প্রথম অবস্থায়, শিশুর যত কিছু চৈতন্য (Consciousness) তাহার ক্ষুধানুভব শক্তির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। তাহার স্পর্শ-বোধ-শক্তি দেহের অন্যত্র তেমন থাকে না, যতটা মুখের মধ্যে। এই জন্য তাহার পায়ে শুড়শুড়ি দিলে, সে তাহা টের না পাইতেও পারে, কিন্তু মুখে কিছু দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে। এ সময়ে শিশু-জীবনের একমাত্র সেব্য দেহের পরিপোষ ভিন্ন আর কিছু নহে। এই কারণেই তাহার সকল চৈতন্য একমাত্র মুখ গহ্বরেই নিহিত থাকিতে দেখা যায়। তাহার দেহের পোষণ কার্য্যটির কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটিলেই সে পরিতৃপ্ত রহে ; ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম

ঘটিলেই ক্রন্দন করিতে থাকে। সাধারণতঃ ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত শিশু এই ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে।

ইহার পর তাহার চৈতন্যের মাত্রাটি একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহা যতই বাড়িতে থাকে শিশু একে একে তাহার আপনার অধিকার বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করে। তাহার জামাটি, তাহার গেলাসটি, তাহার দুধ খাওয়ার বাটিটি, এমন কি তাহার মাথায় দেওয়ার বালিশটি পর্য্যন্ত চিনিয়া লইতে পারে। ফলতঃ এ সময় হইতে শিশু আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। শিশুর এই যে ভেদজ্ঞান ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তাহার পরিণতির পক্ষে এই ভেদজ্ঞানের বিশেষ সার্থকতা আছে। এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানটি যাহাতে যথোচিত বিকাশ পায়, পিতা মাতার সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এ সময় তাহাকে উদার নীতির মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে গেলে, তাহার ভবিষ্যৎটি এককালে নষ্ট করা হয়। আমরা এই কথাটি যেন বিস্মৃত না হই যে, স্বার্থপরতা হইতেই পরার্থপরতার উৎপত্তি হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার অর্থ বুঝে না সে পরের অর্থ কি করিয়া বুঝিবে? শিশুকে যদি বলা যায়, গেলাসটি তাহারই, ইহাতে অন্যের কোন অধিকার নাই, তবেই সে হয় তো তাহার ছোট ভাই কিংবা ভগ্নীকে হৃষ্ট চিত্তে উহা দিতে পারিবে; জোর করিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। এই রূপ স্বভাব-জাত উদারতা হইতেই ক্রমে ক্রমে স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে।

এত দিন পর্য্যন্ত শিশু কেবল তাহার নিজের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত ছিল, এখন হইতে সে আপনাকে ছাড়া অপরকেও ভাবিতে পারে, কিন্তু সে অপর আর কেহ নয়, তাহার বাপ, মা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিতান্ত আপনার জন। ইহাও একরূপ স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কি বলা যায়? ইহা স্বার্থপরতা, কিন্তু শিশুর পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং পরম হিতকর।

অতঃপর তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি আর একটু পরিসর প্রাপ্ত হইতেই তাহার ঘরখানি তাহার নিকট আপনার রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ঠিক যেন—

"খেলার গৃহ হ'য়ে উঠে বিশ্বজগৎ
খোকা তার মাঝখানেতে বেড়ায় ঘুরে।"

এ ঘরখানিতে যেন আর কাহারও কোন অধিকার নাই, সে যেন এখানকার একমাত্র অধীশ্বর। বাড়ীতে কত ঘর আছে, খোকার তাহাতে জ্রক্ষেপও নাই। তাহার যত ভাবনা আপনার এই ঘরখানি লইয়া। এখানকার সামান্য জিনিসটাও স্থানান্তরিত করিতে কাহারও কোন অধিকার নাই; করিলে যতক্ষণ তাহা পুনঃ স্থাপিত না হয় ততক্ষণ শিশুর যেন আর শান্তি নাই। এ সময় এই বিপুল বিশ্বে দুই চারি জন ব্যক্তি ছাড়া আর সকলকে শিশু একান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই দুই চারি জনকে না হইলে তাহার চলিতেই পারে না। শিশুর নিকট এ দুই চারি জনের মত ভাল লোক আর থাকিতে পারে না। ইহাদের ক্ষমতা যে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী শিশু তাহা জানে বটে কিন্তু বুদ্ধি বিষয়ে ইহারা তাহার অনেক নিম্নে, এই রূপ তাহার বিশ্বাস। এমন মনে করিবার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। সে কারণটি এই যে, শিশু এ সময় যে জগতে বাস করে তাহা আমাদের এই বস্তুতন্ত্রময় বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহার জীবন স্বতন্ত্র, চিন্তা স্বতন্ত্র, আদর্শ স্বতন্ত্র। সে তাহার নিজের গড়া একটা কল্পনালোকে বাস করে। তাহার সকল বিষয়েই যেন একটা মোহিনী মায়ার ছায়া থাকে। তাহার জগতে—

"সেথা ফুল, গাছপালা
নাগ-কন্যা, রাজবালা
মানুষ, রাক্ষস, পশু, পাখী;
যাহা খুসী তাই করে
সত্যেরে কিছু না ডরে
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি!"

তাই বলিয়া শিশুর জগৎ যে মিথ্যা আর আমাদের জগৎ যে সত্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। স্বতন্ত্র হইলেও এই দুই জগৎই তুল্য সত্যকার। কথাটা বেশ করিয়া তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। আমরা মনে করি, আমরা এই জগৎখানিকে যে ভাবে দেখি শিশুর সে ভাবে দেখিবার শক্তি না থাকাতেই এই বৈষম্যের

উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত কথাটা তাহা নহে। আসল ব্যাপারটি এই যে, শিশু জগৎকে দেখে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে। সে তো আমাদের মত এই সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর একটি কোণ আশ্রয় করিয়া থাকে না। তাহার জগতের আদিও নাই, অন্তও নাই। সেখানকার সমাচার কেবল শিশুই রাখে, আমাদের রাখার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার কাছে অসম্ভব যে খুবই সম্ভব হয়। কেন না—

"খোকা থাকে জগৎ মায়ের
অন্তঃপুরে—
তাই সে শুনে কত যে গান
কতই সুরে।
নানা রঙে রাঙিয়ে দিয়ে,
আকাশ পাতাল,
মা রয়েছেন খোকার খেলা—
ঘরের চাতাল;
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য্য-শশী
খোকার সাথে হাসে যেন
এক বয়সী।
সত্য বুড়ী নানা রঙের
মুখোস পরে
শিশুর সনে শিশুর মত
গল্প করে।"

আমরা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা যদি এ সময় শিশুকে জীবনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে, আমাদের অবস্থাটি নিতান্তই হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের সমস্ত যুক্তি, সকল তর্ক শিশুর নিকট নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অগ্রাহ্য হইয়া দাঁড়ায়। সে আমাদের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে থাকে, "না তা নয়। ও কথা ঠিক হইতে পারে না।" বাস্তবিক ব্যাপারও ঠিক তাহাই। আমরা "পক্ষিরাজ" ঘোড়া দেখি নাই সত্য, তাই বলিয়া ইহা যে নাই শিশু তাহা বিশ্বাস করিতে একেবারে অসমর্থ। সে আমাদের অজ্ঞতায় একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ে। সে মনে মনে আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকে। সে মনে ভাবে, আমরা যেন চোক থাকিয়াও কাণা।

খোকা তাহার মাকে বলিতেছে—

"আমার রাজার বাড়ী কোথায়, কেও জানে না সে ত!
সে বাড়ীটি থাকত যদি লোকে জানতে পেত?
রূপো দিয়ে দেওয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত;
থাকে থাকে সিঁড়ি উঠে শাদা হাতীর দাঁত।
সাত মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়ো রাণী।
সাত রাজার বাড়ী কোথায় শোন মা কাণে কাণে,
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেই খানে।"

আছে যে তাহার প্রমাণ?

"তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হ'লে
আমি তখন চুপিচুপি যাই সে ছাদে চলে"

ইহার পর কি আর অবিশ্বাস করা চলতে পারে? শিশু যাহা বলে, তাহার একটি কথাও মিথ্যা নহে, সকলই সত্য। শিশুর আত্মা ত আমাদের ন্যায় শত শৃঙ্খল শত বন্ধনে আবদ্ধ নহে। সে যে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাই তাহার গতি অবাধ। আমাদের বুদ্ধিতে যাহা অসম্ভব শিশুর নিকট তাহা মোটেই অসম্ভব নয়।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, শিশুরা মিথ্যা স্পর্দ্ধা এবং অমূলক কাল্পনিক গল্প করিতে বড়ই ভালবাসে। সময় সময় তাহার এই সব আজগুবি গল্প আমাদের নিকট বিশেষ বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়, এজন্য হয়ত আমরা তাহাকে তাড়নাও করিয়া থাকি। ইহার মত নির্দ্দয় ব্যবহার আর কিছুই থাকিতে পারে না। খোকা আপনার বীরত্বের বড়াই করিয়া বলিতেছেন—

"ধূ ধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোন খানে জন মানব নাই।"

খোকার মা পাল্কিতে আছেন, খোকা তাঁহার সঙ্গী হইয়া যাইতেছেন।

"এমন সময় হাঁরে রে রে রে রে
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে;
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে।

বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটা বনে
পাল্কি ছেড়ে কাঁপ্‌চে থরথরে!
আমি যেন তোমায় বল্‌ছি ডেকে,
আমি আছি ভয় কেন মা কর
হাতে লাঠি মাথায় কোঁকড়া চুল
কাণে আছে গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুক্‌রা করে দেবো তোদের মেরে।"

ইহার পর জোড়া দীঘির মাঠে খোকার সহিত ডাকাতদের তুমুল লড়াই বাঁধিল। মা ভাবছেন খোকা এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে বুঝি মারাই পড়্‌ল। কিন্তু—

"আমি তখন রক্ত মেখে মেখে
বলচি এসে লড়াই গেছে থেমে
তুমি শুনে পাল্কি হ'তে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে
বল্‌চ "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কি দুর্দ্দশাই হত তা না হলে।"

খোকার এমন বীরত্ব কাহিনী যে কত আছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। এগুলি মিথ্যা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। খোকার জগৎ বিস্ময়ের আধার। খোকার জগতে সবই সম্ভব হয়। এ কথাটি যিনি না বুঝেন, শিশুর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই রাখা উচিত নয়।

ইমার্সন্ (Emerson) কল্পনাকে (imagination) হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (angel of mind) বলিয়াছেন। ইহার আগমনে মানুষের সকল চিন্তা, সকল কাজ ধন্য হয়। শিশু যত দিন এই দেবীটির সংসর্গে কালাতিপাত করিতে পারে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল মনে করিতে হইবে। শিশুকে তাহার শৈশবের চির-উর্ব্বর, ছায়ামণ্ডিত ক্ষেত্র হইতে জোর করিয়া তুলিয়া আনিয়া আমাদের এই তাপ-দগ্ধ নীরস বাস্তব জীবনের মধ্যে প্রোথিত করিতে নাই, সেইরূপ করিলে তাহার স্বাভাবিক পরিণতির এবং তাহার বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি সাধন করা হয়।

আর কেহ শিশুর মত এত অনুকরণপ্রিয় নহে। সে যাহা দেখে, তাহাই অনুকরণ করিতে থাকে। এই কারণে শিশুকে যে স্থানে "মানুষ করা" হয়, সেখানকার আব-হাওয়ায় যাহাতে আমাদের বাস্তব জীবনের গন্ধ স্পর্শ না করে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা এত ছোঁয়াচে যে, যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই ঘোরতর সংসারী করিয়া তুলে। ইহার সংস্পর্শে শিশু অকাল-পক্ক হইয়া উঠে। শিশুর জীবনটি একটা মায়াজাল দ্বারা যেন আচ্ছাদিত থাকে। সে যতই বড় হইতে থাকে, এই মায়াজালটা একটু একটু করিয়া অপসারিত হইতে থাকে। অকাল-পক্ক দিগের তাহা হইতে পারে না। ইহাদের মনোবৃত্তি ও শরীরবৃত্তি-সমূহ সম্যক পরিণত না হইতেই এই মায়াজালটি সহসা অপসৃত হয়; তাহার ফলে তাহাকে একেবারেই সত্যকার পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে হয়। এ সময় জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্যটি বুঝিয়া উঠা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়।

এখন শিশুরা আমাদের কার্য্যকলাপ কি ভাবে দেখিয়া থাকে তাহাই দেখা যাউক। শিশু ভাবে—

"আমি যে কাজে রত
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব কসি কত;
আঁকের সারি হতেছে ভারি
কাটিয়া যায় বেলা
সময় নিয়ে খেলা।"

আবার—

"মধু মাঝির ঐযে নৌকাখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোন কাজে লাগছে না ত
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি একশো বড় দাঁড় আঁটি
পাল তুলে দিই চারটে, পাঁচটা, ছটা,
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাক হাটে।

আমি কেবল যাই একটি বার
সাত সমুদ্রে তের নদীর পার ।"

এইরূপে আমরা যাহা কিছু করি শিশুর কাছে সেগুলি নিতান্ত বাজে-কাজ, সময় নিয়ে খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়! আমরা যেন জীবনের প্রকৃত কার্য্যটি হারাইয়া ফেলিয়া মিছামিছি ঘুরিয়া মরিতেছি। আমাদের দুর্দ্দশায় তাহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়। আমাদের এই অবস্থাটি তাহার নিকট মোটেই লোভনীয় বলিয়া বোধ হয় না। শিশুর মনের এই যে ভাবটি এইটিই শৈশব ও যৌবনের মধ্যকার প্রকৃত বেড়া। এই বেড়াটি উঠাইয়া ফেলাইলে শিশু একেবারে বয়স্কদিগের মধ্যে আসিয়া পড়ে। সেখানকার আবহাওয়া তাহার স্বাস্থ্য ও পরিণতির পক্ষে কোন মতেই সুবিধাজনক নহে।

আমাদের জীবনের যাত্রা-পথটি যতই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, ও-পারের কালো ছায়া একটু একটু করিয়া যতই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, শিশুর জীবনের প্রকৃত রহস্য আমাদের নিকট ততই যেন সুস্পষ্ট হইতেছে। এখন অজ্ঞাতকেও আমাদের যেন জানিতে হইতেছে। এখন অজ্ঞাতকেও আমরা যেন জানিতে পারিতেছি, এই বস্তুতন্ত্রতাময়ী পৃথিবীই যে একমাত্র সত্য, ইহা ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না, একথা বলিতে যেন আমাদের সাহসে কুলাইতেছে না। এখন দৃষ্টও আমাদের কাছে যেমন সত্য, অ-দৃষ্টও তাহার অপেক্ষা কম সত্য নহে। এখন বুঝিয়াছি, তাঁহার দর্শন পাইতে হইলে, তাঁহাকে হৃদয়ের রাজরাজেশ্বর করিতে হইলে, শিশুর সেই সরল স্বাভাবিক পবিত্র বিশ্বাস-সলিল দ্বারা হৃদয়ের সকল পার্থিব ধূলি, ময়লা, আবর্জ্জনা ধৌত করা আবশ্যক, তাহা না করিতে পারিলে হৃদয়রাজ হৃদয়ে বিরাজমান হইবেন না। এত দিনে শৈশব-জীবনের প্রকৃত রহস্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানব-জীবনে শৈশব বড় সামান্য কাল নহে, ইহা নিরর্থক নহে। শিশুর আত্মার মধ্যে জীবনের কুঁড়িটি পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। (প্রতিভা)

ঋণ-মুক্তি।

ছেলেবেলা হইতেই রমেশের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল একবার পশ্চিমে বেড়াইতে যায়। কিন্তু সুযোগ অভাবে সেই অনেক দিনকার বাসনা এতদিন সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিল না। এম, এ পরীক্ষা দিয়া ঠিক করিল, এবার বেড়াইতে যাইবেই। সহাধ্যায়ী, অন্তরঙ্গ বন্ধু যোগীনকে ধরিয়া পড়িল, তাহাকেও রমেশের সঙ্গে যাইতে হইবে;—কারণ একা ভ্রমণ করা বড় ক্লেশ-দায়ক এবং তাহাতে ভ্রমণের সুখ ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। বিশেষতঃ দুইজনেরই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পরিশ্রান্ত, ভাবাক্রান্ত দেহ পশ্চিম-ভ্রমণে সুস্থ, সবলকায় ও সরস হইয়া উঠিবে। যোগীন সম্মত হইল; পরদিন ৯টার ট্রেনে দুই বন্ধু প্রবাস যাত্রা করিল।

এলাহাবাদে রমেশের এক দূর সম্পর্কীয় কাকা থাকিতেন,—নাম শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। সেই বাসাতেই তাহারা উঠিল।

রোজ প্রাতঃকালে জগদীশ বাবুর চায়ের টেবিলে পার্লেমেণ্টের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ বসিত। সেই সভায় অনেক কথা উঠিত, অনেক তর্কাতর্কি, হাসা-হাসি হইত, আর হইত—মধ্যে মধ্যে গান বাজনা।

হাইকোর্টের উকিল নগেন্দ্র বাবু খুব সামাজিক এবং ভয়ানক চা-খোর; সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে তিনিও তীর্থ-কাকের মত জগদীশ বাবুর চায়ের টেবিলে প্রত্যহ উদিত হইতেন।

মজলিসে জগদীশ বাবু রমেশ ও যোগীনকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। দুই জনেই আলাপে খুব পটু ছিল, শীঘ্রই তাহারা নগেন্দ্র বাবুদের আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিল। নগেন্দ্র বাবু জগদীশ বাবুর প্রতিবেশী, সুতরাং রমেশ ও যোগীনের সহিত তাঁহার খুব সৌহৃদ্য জন্মিয়া গেল।

কয়েকটা দিন শরৎকালের মেঘের মত দেখিতে না দেখিতে কাটিয়া গেল। নগেন্দ্র বাবু একদিন জগদীশ বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া রমেশের সহিত তাঁহার বোন

লীলার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। জগদীশ বাবু কোনো আপত্তির কারণ দেখিলেন না; শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, সুন্দরী, সচ্চরিত্রা, লেখাপড়া জানে; তিনি রমেশের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে রাজি হইলেন, এবং বলিলেন, রমেশের পিতা নাই, সংসারে মাত্র মা ও দুটি বোন আছেন; রমেশ এই বিবাহে সম্মতি দান করিলে, তাঁহারা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন।

রমেশ যোগীনকে লইয়া পরদিন মেয়ে দেখিতে আসিল। আয়েষা, তিলোত্তমার মত সুন্দরী না হইলেও লীলা সুন্দরী; আধফোটা গোলাপফুলটির মত লীলার সেই সুন্দর, সরলতা-মাখা মুখ খানিতে কেমন একটু সঙ্কোচ জড়ান ভাব, কমনীয়তার কেমন একটু স্নিগ্ধ মধুর আহ্বান, রমেশের হৃদয়ে একটা স্পন্দনের তরঙ্গ উঠাইয়া দিল। রমেশ এই বিবাহে রাজি হইল। জগদীশ বাবু রমেশের মাতার নিকট পত্র লিখিলেন, কয়েকদিন পরেই উত্তর আসিল, এই বিবাহে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

এই কয়দিনের মধ্যে একটা প্রবল পরিবর্ত্তনের স্রোত যোগীনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। রমেশ তাহা লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিল, যোগীন আগে যেমন মেশামিশি করিত, এখন তেমন করে না; একলা একলা বসিয়া কি আকাশ পাতাল ভাবে। আগে যেমন সে জগদীশ বাবু, নগেন্দ্রবাবু ও তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইত, এখন বড় একটা তেমন ঘরের বাহির হয় না; হইলেও নিজকেই সাথী করিয়া বাহির হয়। নগেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় পূর্ব্বে কেমন আড্ডা মারিত, এখন আড্ডা মারা দূরে থাকুক, সেই বাসাকে একরূপ 'বয়কট' করিয়াছে। সন্দেহের গাঢ় ছায়া রমেশের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রমেশ অনেক কারণ অনুমান করিল, কিন্তু একটা কারণই তাহার নিকট বজ্রের আলোকের মত সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে ভাবিল, যোগীন নিশ্চয়ই লীলাকে ভালবাসে। তা না হইলে সে নগেন্দ্র বাবুদের বাসায় যাওয়া বন্ধ করিয়াছে কেন? নিশ্চল জড় পদার্থটির মত চুপি চুপি বসিয়া থাকে কেন? নিশ্চয়ই সন্ধ্যা-তারাটির মত যোগীনের হৃদয়-গগনে উদিত হইয়া লীলা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। রমেশ দেখিত, যোগীনের মুখমণ্ডলে দুঃখ-বিজড়িত কেমন একটা ভাব প্রতিভাত;—যেন সে লীলার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পারিতেছে না।

যোগীন একখানা বই খুলিয়া মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছিল; রমেশ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথাটা একেবারে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল,—

"যোগীন, তুই আমাকে একটা সত্য কথা বল্‌বি?"

যোগীন বলিল, "তোর কাছে কোন কথাটা বলি না?"

রমেশ তাহার স্বাভাবিক স্বর টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যে লীলাকে ভালবাসিস্ তাহা এতদিন বলিস্ নাই কেন?"

একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ যোগীনের দেহের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল; সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

রমেশ একেবারে নগেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। নগেন্দ্র বাবু তখন চোখে চস্‌মা আটিয়া এক মনে ল-রিপোর্ট পড়িতেছিলেন। কোনো 'গৌর-চন্দ্রিকা' না করিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিতে বসিতে রমেশ বলিল, "আপনার বোনের সহিত আমার বিবাহ হইবে না!"

নগেন্দ্র বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! আবেশ-আবিষ্ট মৌন-দৃষ্টিতে তাহার দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "সেকি কথা! বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে, দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এমন অবস্থায়—", রমেশ বাধা দিয়া বলিল,—

"এমন অবস্থায় আমি ফিরিলে আপনাদিগকে খুব বিপদে পড়িতে হইবে, এবং আমারও দুর্ণাম হইবে। কিন্তু উপায় নাই। যাহা হউক আমি আপনাদিগকে একটি সুপাত্র দিতেছি, আপত্তি না থাকিলে সেই তারিখেই বিবাহ হইতে পারে। আমাদের যোগীন এই বিবাহ করিতে রাজি আছে। আমি কেন বিবাহ করিব না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না।" নগেন্দ্র বাবু

এই রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। ফাল্গুন মাসে যোগীনের সহিত লীলার বিবাহ হইয়া গেল।

রমেশ অবিবাহিত রহিল।

২

বিবাহের পর ৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যোগীন বি, এল্ পাশ করিয়া আলিপুরের জুনিয়ার উকিলদের দল বৃদ্ধি করিল। রোজ ১০টার সময় ধরাচূড়া পরিয়া, সাম্‌লা মাথায় দিয়া কাছারিতে যাইত; আর বিকাল-বেলা ঘুমন্ত ছবির মত একখানি মুখ মনে করিতে করিতে নিজ ভবানীপুরের বাটীতে ফিরিয়া আসিত। আসিয়া হয়ত দেখিত, লীলা নিবিষ্টমনে একখানা বই পড়িতেছে, বা কারপেট বুনিতেছে; অথবা জানালা দিয়া মুক্ত নীলাকাশের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতেছে। যোগীন চুপ্‌টি করিয়া পেছন্ হইতে লীলার চক্ষুদুটি চাপিয়া ধরিত; লীলা জানিত কে ধরিয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ তাহার নাম বলিত না। অপর ২।৩ জনের নাম বলিয়া শেষে হাসিয়া হাসিয়া বলিত, "উকিল বাবু।" অমনি উকিল বাবু বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে উকিলি-ফিস আদায় করিয়া লইত। যোগীন হাত মুখ ধুইয়া আসিত, লীলা খাবার আনিয়া দিত এবং তাহাকে বাতাস করিতে করিতে কত গল্প করিত। কত আশার কথা, কত সুখের কথা, কত হাসির কথা, আর কত অভিমানের কথা! সে কথার বুঝি অন্ত নাই।

রাত্রে লীলা বই পড়িত, যোগীন শুনিত; কোন দিন বা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। আবার কোন দিন বা নানা বই নিয়া নানা কথা উঠিত, সমালোচকের আসনে বসিয়া দুই জনেই নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিত; মতের অনৈক্য হইলে দুইজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া যাইত এবং শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া দুইজনেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহত বীরের মত পড়িয়া থাকিত। এমনি ভাবে তাহাদের দিনগুলি, স্বচ্ছ পুকুরের উপর তরল মেঘের ছায়ার মত, ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছিল। কেমন একটা নিবিড় মধুর বন্ধনে আপনাদিগকে জড়িত করিয়া তাহারা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল।

একদিন বিকাল বেলা পাতলা মেঘগুলি ভেদ করিয়া সূর্য্যের নিস্তেজ আলোক-রাশি কলিকাতা সহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যোগীন ও লীলা গল্প করিতেছিল—গল্প করিতেছিল তাহাদের চিঠিগুলি লইয়া।

যোগীন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা লীলা, বল দেখি আমার চিঠিগুলির লেখা কেমন!"

লীলা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "শুষ্ক, যেন উকিলের চিঠি!"

যোগীন বলিল, "বাস্‌রে বাস্, তোমার দেখি দ্বিজুরায় একেবারে কণ্ঠস্থ! তা যাই হউক, তুমি আমার পত্র শুষ্ক দেখিলে কোন্ খানে?"

"যাও, আমি তোমার সাথে তর্ক করিয়া উঠিতে পারি না।"

যোগীন বলিল, "তর্ক উঠিতে না উঠিতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে? তা বেশ! আমার পত্রগুলি কি রকম জান? ঠিক আঁকের ডাঁটার মত, না চিবাইলে রস বাহির হয় না।"

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "বাবুর টেলি আছে।"

যোগীন টেলিগ্রাম হাতে করিয়া পাণ্ডুরমুখে লীলার কক্ষে ফিরিয়া আসিল। লীলা কিসের 'তার' জিজ্ঞাসা করিল; যোগীন বলিল, "রমেশের প্লেগ হইয়াছে, আমাকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে।"

রমেশ ভাগলপুর মাষ্টারী করিত। লীলা তাহাকে যাইতে নিষেধ করিল এবং তৎসম্বন্ধে অনেক কারণ দর্শাইল।

যোগীন উত্তর করিল, "ছি লীলা, তোমার এ কথা বলা উচিত নয়। রমেশ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, আমাকে দেখিতে চাহিয়াছে, আমি আমার বন্ধুকে দেখিতে যাইব না? না দেখিতে গেলে যে আমার ভয়ানক অধর্ম্ম হইবে। আরো দেখ, আমরা তাহার নিকট কত ঋণী! রমেশের সাথে তোমার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল; এমন সময় আমাকে সুখী করিবার জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া রমেশ তোমাকে আমার করে দিল। সে তোমাকে খুব ভালবাসিত, এখনো

ভালবাসে, তা না হইলে অবিবাহিত থাকিবে কেন? ইহা আগে জানিলে আমি তাহার জীবন দুঃখময় করিতাম না। যাহা হউক আমি যাইব। লীলা, আমাকে বাধা দিও না; আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।"

যোগীন সেই রাত্রেই ভাগলপুর চলিয়া গেল।

হাঁসপাতালে খোঁজ করিয়া সে রমেশকে বাহির করিল; একটা অপকৃষ্ট কামরার মধ্যে ব্যাধ-বিদ্ধ হরিণের মত রমেশ একখানা তক্তপোশের উপর ছট্ ফট্ করিতেছে। ঘরে কেহই নাই। যোগীনের চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ হইল। রমেশ অজ্ঞান, জানিল না যে যোগীন আসিয়াছে। যোগীন নিজেই সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। রাত্রিদিন জ্ঞান নাই, প্রাণপণে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সে শুশ্রূষা করিতে লাগিল; রমেশও আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

* * * ডাক্তার সাহেব রমেশকে বলিলেন,—"শুশ্রূষার জন্যই আপনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এমন সেবা-শুশ্রূষা আমি জন্মে দেখি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ভদ্রলোকটি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।"

উদ্বেলিত হৃদয়ে রমেশ ক্ষীণ দেহখানি লইয়া জীবন-দাতাকে দেখিতে চলিল। কি দেখিল? দেখিল, যোগীন শয্যায় পড়িয়া আছে; প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে কোন্ অজানিত দেশে উড়িয়া গিয়াছে!

শ্রীজীবনচন্দ্র তালুকদার।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যিনি ব্রহ্ম-সত্তায় জীবন্ত হইয়া অগ্নিময় বক্তৃতাদির দ্বারা বঙ্গদেশের ঘনীভূত অসত্যকে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করিয়াছিলেন সেই বাগ্মীপ্রবর, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া জটিল দর্শন শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম বিষয়-গুলির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন সেই সুপণ্ডিত দার্শনিক, যিনি ব্রহ্মের অভয় পাতাকা [illegible] আকাশে উড্ডীন করিয়া ব্রহ্মের নাম ও মহিমাকে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই ধর্ম্মবীর প্রকৃত পক্ষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন।

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের বেদীর সহিত ইদানীং তিনি কোন যোগ রাখিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনা করা, উপদেশ দেওয়া, বক্তৃতা করা, কয়েক বৎসর হইতেই তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দেশের যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ যে প্রবীণ আচার্য্যকে হারাইয়া আজ শোকে বিহ্বল হইয়াছেন, বঙ্গদেশ যে কর্ম্মবীরকে হারাইয়া আজ অশ্রুপাত করিতেছেন, তিনি ইতিপূর্ব্বেই সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিলেন।

ভক্ত নগেন্দ্রনাথ যখন বার্দ্ধক্যে আসিয়া রোগে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, দেহের শক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যখন মনের শক্তিও হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য, দেশের কার্য্য, সকল প্রকার হিতকর কার্য্যের বাহিরে গিয়া পড়িলেন, তখনও তিনি ভগবানেরই সেবক ছিলেন!

ইংরাজ কবি মিল্‌টন অন্ধ হইবার পর সুন্দর একটি চতুর্দ্দশপদীতে লিখিয়াছিলেন—

They also serve that stand and wait.

যাঁহারা নীরব হইয়া সকল দুঃখের মধ্যে ধীর ভাবে দিন কাটান, দুরবস্থার ভিতরে পড়িয়া ভগবানের উপরে কোন প্রকার অভিযোগ করেন না, তাঁহারাও ভগবানের সেবক।

ভক্ত নগেন্দ্রনাথ ভগ্ন দেহে সুস্থ চিত্তে ভগবানের মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারই ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন। শনিবার ১৪ই জুন তারিখে যখন ডাক আসিয়া পৌছিল তখন তিনি হাস্যমুখে ইহলোক পরি-ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতা, উপদেশ ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তির পরিচয় দিতেছিলেন তখন আমার বয়স অতি অল্প। তাঁহার জলন্ত বক্তৃতা, জীবন্ত প্রার্থনার কিছুই তখন বুঝিতাম

না। বুঝিবার মধ্যে বুঝিতাম, শুধু তাঁহার কণ্ঠের দরাজ ধ্বনিখানি, আবেগের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নৃত্যখানি, আর বুঝিতাম তাঁহার শ্মশ্রুবিমণ্ডিত কৃষ্ণ মুখের হাস্যখানি। কিন্তু মনের মধ্যে এই কথারই তোলপাড় হইত—এমন করিয়া কোন ব্যক্তিকেই তো হাসিতে দেখি না, এমন ভঙ্গিতে কেহই তো কথা বলিতে পারেন না, ইঁহারই ভিতরে এই বিশেষত্বটুকু দেখিতেছি; তবে কি ইনি সাধারণ স্তরের উপরকার লোক! বড়ই ক্ষোভ রহিয়া গেল, যখন আমার বয়স হওয়ায় জ্ঞান কিছু পাকিয়া উঠিল তখন আগ্নেয়গিরির অগ্নি নিভিয়া গিয়াছে—নগেন্দ্রনাথকে বড় একটা কিছু বলিতে শুনি নাই।

মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। তখন তিনি কলিকাতায় মথুরায়ের গলিতে ৩২নং বাটীতে বাস করিতেন। আমিও সেই বাটীতে ৪।৩ দিন কাটাইয়াছি।

আমার রচিত কোন একখানি পুস্তিকার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিবার জন্যই আমার তাঁহার নিকট যাওয়া এবং এই ক্ষুদ্র সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয়। মাথা নত করিয়া চরণের ধূলা লইয়া যখন আমার পুস্তিকাখানি হাতে উপহার দিয়া তাঁহার মতামত জানিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলাম ও সেই সঙ্গে আমার পিতার নাম বলিয়া যখন আমার পরিচয়টা কিছু ভাল করিয়া দিলাম তখন তিনি অতিশয় আনন্দে আমার উপহার গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণদয়াল বাবুকে আমরা খুবই জানি। তুমি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, না?"

অতি আবেগের সহিত পিতার নাম লইয়া কথাগুলি বলিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা!

ভক্ত নগেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে প্রেততত্ত্বের আলোচনায় রাত দিন মগ্ন ছিলেন। আমি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই তখন তিনি "নব্যভারত" পত্রিকায় অনেকগুলি প্রেততত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ছোট খাটো এক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তোলেন।

অনেকেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছিলেন। প্রেততত্ত্ব বিষয়গুলির আলোচনা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কেরই পরিচয় দিতেছেন, এমন কথাও তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে শুনা গিয়াছে।

প্রেততত্ত্বের খবর বড় একটা আমি রাখি না, আর যতটুকুই বা রাখি তাহা লইয়া এখানে নাড়া-চাড়া করার কোনই প্রয়োজন দেখি না। কেবল ইহাই বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি, ভক্ত নগেন্দ্রনাথ যাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন তাহার মধ্যে যদি কেবল ভ্রান্তিই থাকিয়া থাকে তবুও তাঁহাকে প্রশংসা করি এইজন্য, যে তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহাকে লোকের সম্মুখে প্রচার করিতে কিছুমাত্র ভীত হন নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আত্মা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছি কিম্বা লিখিতেছি তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা আমার উপরে খড়্গহস্ত। তাঁহারা বলেন, নগেন বাবুর মাথায় গোল হইয়াছে, বুড় বয়সে ভিমরতি ধরিয়াছে, কিন্তু আমি কি করিব, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি তাহা গোপন করিয়া থাকি কি করিয়া? তাহাকে যে প্রচার না করিয়া থাকা যায় না। লোকে আমায় পাগল বলে, কিন্তু আমি তার কি করিব।"

তিনি লোকের প্রশংসা লাভ করিবার জন্য কিম্বা কোন দলের গুরু হইবার অভিলাষে ঐ তত্ত্বের প্রচারে ব্রতী হন নাই। সত্য বলিয়া যাহা উপলব্ধি করা যায় তাহাকে প্রচার না করার এক তীব্র বেদনা আছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই নগেন্দ্রনাথের ঐ তত্ত্বের আলোচনা লইয়া এত মত্ততা। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহা সত্য হউক, আর মিথ্যাই হউক, তাহার প্রচারের মধ্যেই মানুষকে আমরা বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হই।

আমরা জানি, তিনি যাহা প্রচার করিতেছিলেন তাহা কথার কথা, মুখের জিনিস ছিল না, তাহা হৃদয়ের প্রচার ছিল—ভালবাসার ধন ছিল। আবশ্যক হইলে তাহার জন্য তিনি জীবন পর্য্যন্তও পণ করিতে পারিতেন।

৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি একদিন কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে যাই। সেদিন ৬ই মাঘ, মহর্ষির মৃত্যু-দিনের উৎসব। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রাদ্ধের উপাসনার কার্য্য করিলে পর "ভক্ত" নগেন্দ্রনাথের উপর কিছু বলিবার ভার পড়ে। তিনি মহর্ষির ধ্যানের কথা সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি আমার দৈনন্দিন হইতে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"একবার মহর্ষি পদ্মায় নৌকা যোগে চলিয়াছিলেন, সঙ্গে কেশব বাবু, আরো কয়েকজন বন্ধু। সকলে মিলিয়া নৌকার মাথায় বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মহর্ষি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নৌকার ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। যাই দাঁড়ান আর কথা নাই, অমনি গভীর ধ্যানে মগ্ন—২ ঘণ্টা কি ২॥০ ঘণ্টা ঐ ভাবে রহিলেন।

"মাথার উপরে প্রখর রৌদ্র—কিন্তু তবুও কোন জ্ঞান নাই। সকলে অবাক, কেশব বাবু একজন চাকরকে মহর্ষির মাথার উপরে একটি ছাতা ধরিতে বলিলেন। চাকর তাহাই করিল। মহর্ষি তাঁর শেষ বয়সে চারবার ভগবানের বাণী শোনেন—বাহ্য জগতের সকল জ্ঞান যখন চলিয়া যায় তখনই বাণী নাবিয়া আসে।"

কোন পার্থিব ক্ষুদ্র বস্তুর যোগে মানব-আত্মার চরিতার্থতা নহে। সে যদি ভূমার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে তবেই সে বাঁচিয়া যায়—অমৃতের অধিকারী হয়। মানব-আত্মা অন্য কিছুর অন্বেষণের অপেক্ষা রাখে না। তার একমাত্র গতি পরমাত্মার দিকে। মহাপুরুষ মাত্রই যে দেশেরই লোক হউন না কেন, ভিতরকার সাধনার দ্বারা এই যোগ-সম্বন্ধ ঘটাইয়া তোলেন, তাই জগতে তাঁহারা দেবতা বলিয়া পূজিত হন। সকল লাভের শ্রেষ্ঠ লাভ সেই যে ব্রহ্মলাভ তাহার মধ্যেও ভক্ত নগেন্দ্রনাথকে তন্ময় হইতে দেখা গিয়াছে।

শ্রদ্ধেয় সঞ্জীবনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় যে সব ঘটনার উল্লেখ করিয়া ভক্ত নগেন্দ্রনাথের ধ্যানের গভীরতা প্রকাশ করিয়াছেন আমি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা হইতে এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"একবার বাঁশবেড়িয়াতে উৎসব; গোস্বামী মহাশয়, উমেশ বাবু প্রভৃতি উৎসব করিতে গিয়াছেন। ভক্ত নগেন্দ্রনাথের মনে কি অভাবনীয় ভাবের উদয় হইল। তিনি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। প্রাতঃকাল গেল, আহারের সময় অতীত হইল, সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, নগেন্দ্রনাথের দেখা নাই। গোস্বামী মহাশয়, দত্ত মহাশয়, সকলে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা দেখেন নগেন্দ্রনাথ এক স্থানে মহাসমাধিতে মগ্ন। তখন তাঁহারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; কতক্ষণ পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাঁহার এইরূপ ধ্যানপরায়ণতা ছিল; এরূপ ধ্যানের ভাব আমি নিজেও দেখিয়াছি। ৮১নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ভবনে এক সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমরা বাস করিতাম। তিনি ছাদের উপর যাইয়া ধ্যানস্থ হইতেন। সেখানে বালকবালিকাগণ খেলা করিত, চীৎকার করিত, কেহ তাঁহার গায়ে পড়িত, কেহ ডাকিত, কিন্তু তাঁহার চৈতন্য নাই; তিনি মহাসমাধিতে ডুবিয়া থাকিতেন। এইরূপ অবস্থায় অনেক বার তাঁহাকে দেখিয়াছি।

"এক সময়ে তিনি হাজারীবাগ সমাজের উৎসবে যান; ব্রাহ্মগণ একদিন উপাসনার জন্য নির্জ্জনে পাহাড়ে গমন করেন; সেই পাহাড়ে খুব বাঘ ছিল। সকলে নানা কার্য্যে ব্যস্ত; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তায় ডুবিয়া গেলেন; দিন যায়, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। এমন সময়ে একটা বাঘ দেখা দিল; চারিদিকে রব উঠিল; কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গে না। বাঘের শরীরের গন্ধে সকলে অস্থির; তিনি উঠেন না, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। সকলে তাঁহার জন্য ভীত হইল; বাঘ তাঁহার কাছ দিয়া চলিয়া গেল; পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল। সকলে আপন আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত; নগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসত্তায় মগ্ন। বাঘ তাঁহাকে স্পর্শ করিল না।"

যে ক্ষেত্রেই অসাধারণ পুরুষদিগের প্রতি তাকাই না কেন, ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে তাঁহাদের মধ্যে

কেমন জানি একটা অন্তর্নিহিত দৃষ্টি আছে। সাধারণ লোকেরা বাহিরের চক্ষুতে জগতের সব জিনিসগুলিকেই ভাসা ভাসা করিয়া দেখে—উপরের দেখাকেই তাহারা দেখার শেষ বলিয়া মনে করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু মহাপুরুষেরা বাহিরের সমস্ত স্তরকে ভেদ করিয়া পদার্থের আদি মূলে গিয়া উপস্থিত হন, তাই আমরা দেখিতে পাই সাধারণ এবং অসাধারণ পুরুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

অনন্ত আকাশের বুকে যে সৌন্দর্য্য-সাগর নিহিত আছে তাহার খবর অনেকেই রাখেন না। তাই আকাশের পানে দুই একবার চোখ তুলিয়া তাকাইলেই তাঁহাদের কাছে আকাশ পুরাতন হইয়া আসে। ইহার কারণ তাঁহারা চক্ষু দিয়াই দেখেন, হৃদয় দিয়া যে একটা দেখা আছে এবং সেই দেখাই যে প্রকৃত দেখা সে শিক্ষা তাঁহারা জীবনে কখন লাভ করেন নাই। কবি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তাকান বটে কিন্তু হৃদয় দিয়াই সমস্ত দেখাটা দেখিয়া লন তাই হৃদয়কে যতই সৌন্দর্য্যের মধ্যে মগ্ন করাইয়া দেন ততই দেখেন এ সাগরের তল মেলে না। আকাশ এই কারণেই কবির কাছে চির নবীন থাকিয়া যায়। কবি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া আপনার হৃদয়ের আনন্দকে কবিতায় মূর্ত্তি দান করেন, আমরা তাহাই পাঠ করিয়া দেখি, বাস্তবিকই আকাশের মধ্যে অপার রূপের সাগর বর্ত্তমান আছে। আমাদের চোখ যেন তখন ফুটিয়া যায়। যে সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে ভাল করিয়া অধিকার করে না তাহাকে উত্তমরূপে অনুভব করিতে হইলে কবির প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকার করি। আমরা যে অনেক সময়েই শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না, তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হই, ইহার কারণ আমাদের ভিতরকার দৃষ্টির অভাব। শ্রেষ্ঠ কবিরা যে দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যকে পান করিয়া থাকেন সে দৃষ্টি ত আমাদের না-ইই, এমন কি তাঁহারা অনুভব করিয়া যাহা প্রকাশ করেন তাহার মধ্যেও প্রবেশ করিবার শক্তি আমাদের অল্পই আছে। সেইজন্য এমন সব লোক জন্ম গ্রহণ করেন যাঁহারা কাব্য হইতে অমৃত উদ্ধার করিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরিয়া দেন। যেমন কবির জন্ম আবশ্যক, কারণ তিনি সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করেন, তেমনি কবি এবং সাধারণ লোকের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা কবির কাব্যকে সকলের কাছে বোধগম্য করিয়া তোলেন তাঁহাদের জন্মও কম প্রয়োজনীয় নয়। যদি শুধু কালিদাস জন্মগ্রহণ করিতেন, মল্লিনাথের জন্ম না হইত তবে কালিদাস জগতে এতটা আদৃত হইতেন কিনা বলা যায় না। মল্লিনাথ কালিদাসের মধ্যে এমন করিয়া ডুবিলেন কি করিয়া, তিনিই বা কেন কালিদাসের সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেন এই প্রশ্ন করিলেই উত্তরে জানিতে পারি, যে মল্লিনাথও ভিতরে ভিতরে কবির দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। একটি কথা আছে, কবিকে বুঝিতে হইলে নিজেকেও অনেকটা কবি হইতে হয়।

দর্শন শাস্ত্রের তিনটি প্রধান কথা—

(১) আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ কি। তাঁহাদের মধ্যে সম্বন্ধই বা কি।

(২) জড়ের স্বরূপ কি।

(৩) আত্মা এবং জড়ের মধ্যে কি প্রকারের সম্বন্ধ।

বড় বড় দার্শনিকগণ আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করিতে গিয়া আত্মা এবং জড়ের সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়া কতই না শক্তির পরিচয় দিয়াছেন! তাঁহাদের সাধনার বিষয় আমাদের চিন্তার অতীত।

রাজা রামমোহন রায়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের ভিতরে প্রবেশ করে এমন পণ্ডিত অতি বিরল। তিনি এক দৈবশক্তিতে অতল দর্শন শাস্ত্রকে মন্থন করিয়া যে সমুদয় সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ভক্ত নগেন্দ্রনাথ রাজার জীবনকে এমন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, রাজার আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে এমন করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে দুর্ব্বোধ রাজাকে তিনি সাধারণের নিকট অতি সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে কোন জীবনচরিত ছিল না বলিলেই হয়। জীবনচরিত লেখার প্রণালী কেহই জানিতেন না। ভক্ত নগেন্দ্রনাথের

রাজার জীবনী এদেশে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত। এই জীবনচরিত পাঠে আমরা যে কেবল রাজাকেই জানিতে পারি তাহা নয় ইহাতে আমরা ভক্ত নগেন্দ্রনাথেরও শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি। রাজা যে অন্তর দৃষ্টিতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া সকল তত্ত্বের মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহারও সেই ব্রহ্ম দর্শন লাভ হইয়াছিল তাই তিনি এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভক্ত নগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ না করিলে সাধারণের পক্ষে রাজাকে বুঝিতে পারা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিত। আমরা যে রাজাকে খুব বেশী বুঝিয়াছি এমন বলিতে পারি না, জগৎ আজও ভাল করিয়া রাজার পরিচয় পায় নাই। তবুও রাজাকে যতটা জানা গিয়াছে তাহার মূলে ভক্ত নগেন্দ্রনাথের কার্য্য অনেক পরিমাণে বিদ্যমান আছে. একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন।

কেবল বড় কাজেই মানুষ যে তাহার মনটাকে আমাদের কাছে ধরা দেয় তাহা নয়। ছোট কাজেও আমরা মানুষকে চিনিতে পারি।

ভক্ত নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ হয় তখন তাঁহার হাসিতেই আমি তাঁহার সাদা মনের পরিচয় পাই। এমন প্রাণখোলা হাসি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। শিশুর হাসির মত সরল, ফুলের মত পবিত্র, যেন সমস্ত হৃদয়খানির কোথাও কোন মলিনতা নাই, কোথাও কোন আঁড় নাই। ব্রহ্মগত প্রাণখানি যেন হাসির ভিতর দিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকই যাহার মন পবিত্র নয় সে কিছুতেই ভাল করিয়া হাসিতে পারে না—বুকের উপর যেন একখানি ভারি পাথর চাপান থাকে। একথা অতি সত্য, খোলা হাসিতেই খোলা মনের পরিচয় দেয়।

সেক্সপীর জুলিয়াস্ সিজার নামক নাটকের এক স্থানে লিখিয়াছেন:—

Seldom he smiles; and smiles in such a sort
As if he mock'd himself ... ...
And therefore ... very dangerous.

যাহাদের মুখে হাসি দেখা যায় না, যাহারা হাসিতে গেলেই চাপিয়া হাসে, হাসির মধ্যেও যেন নিজেদের অন্তরাত্মাকেই বিদ্রূপ করে তাহারা ভাল লোক নয়, তাহাদের আমরা বড়ই ভয় করি—এমন লোকদের এড়াইয়া চলাই ভাল।

ভক্ত নগেন্দ্রনাথ ভাল বক্তা ছিলেন, বড় লেখক ছিলেন, খুব উঁচুদরের দার্শনিক ছিলেন, একথা বলিলেই তাঁহার বিষয় খুব বেশী বলা হইল, তাহা মনে করি না। এ যদি বলি তবে তাঁহাকে ছোট করিয়াই দেখা হইল—তাঁহাকে বাহির হইতেই দেখিলাম। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে বক্তৃতার শক্তি, লেখার শক্তি তাঁহার সকল প্রকার শক্তি যেখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, যে স্থল হইতে তাঁহার শক্তির বিচিত্র ধারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভিতরকার যে একটি নগেন্দ্রনাথ রহিয়াছেন যাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বাহিরের নগেন্দ্রনাথ অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হইবে সেই ভিতরকার নগেন্দ্রনাথের সন্ধানে আমাদিগকে ছুটিতে হইবে। তবেই জানিব কর্ম্মের ভিতরে কৃতকার্য্য হইয়া তিনি যেমন মহৎ, কর্ম্মের ভিতরে অকৃতকার্য্য হইয়াও তিনি তেমনি মহৎ—তবেই জানিব নগেন্দ্রনাথ মরেন নাই।

ভগবান করুন, আমরা যেন অন্তর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করি, আমরা যেন ভিতরকার নগেন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করি।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

বনলতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুমারী রোজ সন্টার্ণের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমিয়াসের স্বদেশে প্রত্যাগমন উপলক্ষে বিডফোর্ডে যে আনন্দোৎসব হইয়াছিল তাহা হইতে

বঞ্চিত করিয়া তাহার পিতা কিরূপে তাহাকে এক দূর-সম্পর্কিতা মাসীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, পাঠক পাঠিকা তাহা অবগত আছেন। সে সুদূর পল্লীগ্রামে রোজ যেন এক প্রকার বনবাসেই দিন কাটাইতেছিল। বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, সভ্যতার আলোক সেখানে প্রবেশ করে নাই—নেহাৎই পাড়াগাঁ। এখানে একটী মাত্র লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া রোজ একটু আরাম পাইত। মাইল দুই দূরেই ইউষ্টেসদের বাড়ী। ইউষ্টেসের সঙ্গে বিড্‌ফোর্ডেই রোজের সামান্য পরিচয় ছিল। রোজ যে তাহাকে খুব ভাল চক্ষে দেখিত তাহা নয়, কিন্তু এই বন্ধুহীন প্রদেশে তাহার মত বন্ধুও আর কেহ ছিল না।

রোজের সঙ্গে এই প্রকার দেখা সাক্ষাতে ইউষ্টেসের মনে এক ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। পাঠক পাঠিকাগণ জানেন ইউষ্টেস ক্যাথলিক পুরোহিতের ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্যাথলিক পুরোহিতগণ চির-কৌমার্য্য-ব্রত ধারী। কিন্তু রোজের সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে বিবাহের কামনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্যাথলিক পুরোহিতদের নিকট নারীজাতি সয়তানের দূত। ইউষ্টেস্‌ও সেই শিক্ষাই পাইয়াছিল। সুতরাং নারীজাতিকে সে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে তাহা অসম্ভব। প্রেম নয়—শুধু কামনা তাহাকে রোজের জন্য পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে মনে মনে স্থির করিল, যে প্রকারেই হউক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সঙ্কল্প ত্যাগের অনুমতি লাভ করিয়া রোজকে বিবাহ করিবে। রোজ ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। বহু সম্পত্তির অধিকারিণী; পোপের অনুচরগণ যে প্রকার ব্যয়সাধ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অনুমতি দিতে বেশী ইতস্ততঃ করিবেন না। বস্তুতঃ সে মিথ্যা অনুমান করে নাই। ফাদার কাম্পিয়ান ভাবে ভঙ্গীতে তাহার মনোভাবের কিছু আভাস পাইয়া নানা উপায়ে প্রকৃত তথ্য জানিয়া লইলেন এবং কথা প্রসঙ্গে ইউষ্টেসকে বলিলেন, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রোজের পিতার সম্পত্তি হইতে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিলে তিনি নিশ্চয়ই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ইউষ্টেসের মুক্তি-পত্র আদায় করিয়া দিবেন। ইউষ্টেস একদিন রোজের নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিল, কিন্তু রোজ সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল।

যে ভাবে যে প্রণালীতে নিতান্ত অসভ্যের মত ইউষ্টেস বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল রোজের চিত্ত তাহাতে নিতান্তই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এমন কোন বন্ধু বা আপনার জন নিকটে ছিল না, যাহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাহার ভারাক্রান্ত চিত্তের ভার লাঘব করিতে পারে। তা'ছাড়া এই ঘটনার পূর্ব্ব রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সে রাত্রে রোজ তাহার অনেক প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল। ইউষ্টেসের প্রতি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ না থাকিলেও স্বপ্নে তাহাকেও দেখিয়াছিল। তাহার পর দেখিতে পাইল ফ্রাঙ্ক ও আমিয়াস দুই ভাইয়ের সঙ্গে ইউষ্টেস্ যেন যুদ্ধ করিতেছে। স্বপ্নের প্রথমার্দ্ধ সুফল হইল দেখিয়া তাহার মনে হইল, দ্বিতীয়াংশও যে সফল হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? তখন তাহার মনে হইল, এই গ্রামেই লুসি নামক একটী স্ত্রীলোক ভাগ্যগণনা করিতে জানে। তাহার দ্বারা একবার অদৃষ্ট গণনা করাইতে হইবে। এই ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে লুসির বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লুসি আদরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। অত্যন্ত চতুর না হইলে ভবিষ্যৎ-বক্তার ব্যবসায়ে কেহ কোন দিন সফলতা লাভ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, লুসিও অতি সুচতুরা রমণী ছিল। নানা বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া তাহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে সে রোজের মনে যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। এবং বলিয়া দিল, সেইদিন রাত্রে গভীর নিশীথে রোজকে নদীর তীরে লুসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সেখানে মন্ত্রবলে লুসি তাহাকে তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ চিত্র দেখাইয়া দিবে।

এদিকে ইউষ্টেসের পিতা তাঁহার অতিথিদ্বয় কাম্পিয়ান ও পারসন্সকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের কার্য্যসিদ্ধির উপলক্ষ

করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করিয়া লইতেছিল এবং নিত্য নূতন নূতন দাবি উপস্থিত করিতেছিল। একে ত অর্থের জন্য পীড়ন, অন্যদিকে সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গৃহে স্থান দিয়া নিজের ধন-প্রাণ বিপন্ন করা—তিনি আর সহিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে একদিন প্রকাশ্য ভাবেই জেসুইট দ্বয়ের সহিত তাঁহার বেশ একটু বচসা হইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, তাঁহাকে আর বেশী শোষণ করা চলিবে না।

এখন আমরা একবার ফ্রাঙ্ক ও আমিয়াসের সংবাদ লইব। মাতা ও ভ্রাতৃযুগলে মিলিয়া পরমানন্দে তাঁহাদের দিন যাপন করিতেছিলেন। একদিন গভীর রজনীতে আমিয়াসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি শুনিতে পাইলেন, ফ্রাঙ্ক তাঁহার পার্শ্বস্থ শয়ন গৃহ হইতে অতি মধুর স্বরে স্বরচিত একটী প্রেম-সঙ্গীত গান করিতেছেন। সেই সঙ্গীত শুনিয়া আমিয়াসের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আমার যদি এমন সুন্দর রচনা-শক্তি ও গাহিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলে আমি কত সুললিত ভাষায় অন্তরের গভীর প্রেম ব্যক্ত করিয়া রোজের উদ্দেশে প্রেমের কবিতা রচনা করিতাম আর মধুর কণ্ঠস্বরে প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া সেই প্রেমসঙ্গীত রোজের নিকট গান করিতাম।" কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে-পরিবারের সবল অস্থিমজ্জা দিয়াছেন, সুকোমল সমুন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী করেন নাই—সে অধিকার লাভ করিয়াছেন পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ফ্রাঙ্ক। কিন্তু তাতে কি? তিনি আর ফ্রাঙ্ক ত অভিন্ন হৃদয়। একের গৌরবে উভয়েরই গৌরব। তিনি নিজের ঘর হইতেই ফ্রাঙ্ককে ডাকিয়া বলিলেন, "মধুরকণ্ঠ কোকিল, ধন্য তোমার মধুর স্বর!"

ফ্রাঙ্ক উত্তর করিলেন, "কি! তুমি এখনও জাগিয়া আছ? এস আমার ঘরে এস। একটা সামুদ্রিক গান গাহিয়া আমার ঘুম পাড়াইয়া দেও।"

আমিয়াস ফ্রাঙ্কের ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তিনি তখনও শয্যা স্পর্শ করেন নাই। ফ্রাঙ্ক বলিলেন, আমার ঘুম বড় খারাপ। সহজে ঘুম পায় না। তুমি আমার কাছে বস, চলন্ত তুষার-গিরি, মনুষ্যভোজী রাক্ষস, অগ্নিময় দেশ প্রভৃতির গল্প বল।

আমিয়াস বসিলেন এবং ফ্রাঙ্কের ফরমাস মত নানা গল্প বলিলেন। কথায় কথায় রোজের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসার বিষয় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে যে গভীর ভাল বাসা ছিল তাহাতে প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষার কথা জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট প্রকাশ করিতে আমিয়াসের বিশেষ কিছু সঙ্কোচ বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "দেখ ফ্রাঙ্ক, রোজের চিন্তা অধিকাংশ সময় আমার মনকে এমনি অধিকার করিয়া রাখে যে সেদিন মন্দিরে উপাসনার সময়ও আমি তাহার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু সে কি নিষ্ঠুর দেখ, সেদিন ত তাহাকে দেখিতে পাইলামই না, আজ পর্য্যন্ত একটী বার তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইল না!"

ফ্রাঙ্ক। রোজকে দেখিতে তোমার যে ইচ্ছা হইবে আমি তাহা আগেই অনুমান করিয়াছিলাম, এজন্য তোমার অভিনন্দন উৎসবে জলদেবীর অংশ অভিনয় করিতে রোজকে অনুমতি দিতে তাহার পিতাকে অনুরোধও করিয়াছিলাম।

আমিয়াস। বটে! আমার প্রতি তোমার কি গভীর ভালবাসা! আমাকে সুখী করিবার জন্য তোমার কতই চেষ্টা! এখনও কি সে আগের মতই সুন্দরী আছে?

ফ্রাঙ্ক। তাহার সৌন্দর্য্য এখন দশগুণ বাড়িয়াছে। চারিদিগের ভদ্র যুবকেরা তাহার জন্য পাগল, ঈশ্বর করুন তুমি তাহাকে পত্নীরূপে লাভ কর। কিন্তু অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। এখন যাও, শোও গিয়ে। তোমার তরোয়ালখানা কাল সকালে মাকে দিয়া দিও। নতুবা আমার ভয় হয়, কখন তুমি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকে বসাইয়া দিবে!

"না না, সে ভয় করিও না, আমিত আর পাগল নই। এই বলিয়া হাসিয়া আমিয়াস ফ্রাঙ্কের ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং নিজের ঘরে যাইয়া শয়ন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদঃ—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। ভাদ্র, ১৩২০ ৫ম সংখ্যা।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

সৌন্দর্য্য, তুমি স্বর্গের দূত,—দুঃখীর সান্ত্বনা। তুমিই প্রকৃতি-মন্দিরের দ্বার মুক্ত করিয়া জগদতীত বার্ত্তা আমাদের নিকট আনয়ন কর। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে যে যবনিকা চির-কল্যাণকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, তোমারই প্রেম-হস্ত সেই মায়া-আবরণ আমাদের চক্ষুর নিকট হইতে অপসারিত করে। তুমি কত অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি, কত বধিরকে শ্রবণ-জ্ঞান দিয়াছ। তোমার স্পর্শে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত—মরুভূমিতে নির্ম্মল উৎস উৎসারিত হইয়া উঠে। তুমি কত ওমর, পল, কত জগাই মাধাইকে অপার্থিব জ্যোতিতে মণ্ডিত করিয়াছ। হে সৌন্দর্য্য, তুমি কত রূপে ভিতরে বাহিরে! তোমাকে দেখিতেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তোমার তত্ত্ব জানিতে পারিলাম না।

যখন বৈজয়ন্তের অফুটন্ত মুকুলের মত কোন্ অজ্ঞাত রাজ্য হইতে সমাগত একটি ক্ষুদ্র জীব প্রথম বসুন্ধরার অঙ্ক অলঙ্কৃত করে,—জননীর হৃদয় আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলে; তখন লোক-কোলাহলময়ী কর্ম্ম-ভূমিতে সেই নবাগত যাত্রীটির নয়নপথে সর্ব্বাগ্রে কোন্ বস্তু পতিত হয়?—সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যই বিশ্বরাজ্যের সহিত তাহাকে ধীরে ধীরে পরিচিত করিতে থাকে, এবং শিশু-হৃদয়ের সুপ্ত জ্ঞান ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠে। সহস্র অনুভূতির সঙ্গে সৌন্দর্য্য-বোধও তাহার প্রাণে ক্রমে জাগ্রত হয়। যখন সে কাঁদিতে থাকে, একখানি সুন্দর ছবি অথবা একখানি সুন্দর খেলেনা দেখিয়া সে

যাবার হাসিয়া উঠে। কোন্ বস্তু তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর? মায়ের স্নেহ-স্পর্শ, কিংবা মায়ের স্নেহপূর্ণ মুখ? যে নারীকে কুৎসিত—কুরূপা বলিয়া জগৎ ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে, ক্রোড়স্থিত শিশুর নিকট তাহার মুখখানিও কত সুন্দর! এ সৌন্দর্য্যবোধ কে আনয়ন করিল?—প্রেম। যে জন্মান্ধ,—চিরদৃষ্টিহীন, প্রেমনয়নেই সে মাকে দেখিয়া লয়,—জগতের নিকট পরিচিত হয়। প্রেম ভিতরে থাকিয়া দৃষ্টিহীনের নিকট যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলে, বাহিরের দৃষ্টিশক্তি তাহার কাছে কোন্ ছাড়!

কত যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, প্রকৃতি একই ভাবে শোভা পাইয়া থাকে, একই সূর্য্য নিত্য প্রাচী উজ্জ্বল করিয়া হাসিয়া উঠে,—একই বৃক্ষ লতা পল্লব বনভূমিকে সুসজ্জিত করে,—নিত্য একই তটিনী অনিল-প্রবাহে তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া যায়,—সন্ধ্যার রক্তিম আভায় ধরণীকে রঞ্জিত করিয়া রবি অস্তাচল চূড়ায় অদৃশ্য হয়। নিত্য একই ভাবে রূপসী অপ্সরার মত নক্ষত্রকুল রূপের আভায় বিশ্ব মোহিত করিয়া যেন অনন্তের কপাট খুলিয়া হাসিয়া উঠে। নিত্যই চন্দ্রমা রজত-চন্দ্রিকা-লহরে ধরণীকে ভূষিত করে। প্রকৃতি-রাণীর প্রতি অঙ্গের ভুবনমোহিনী মাধুরী একই রূপে কত কাল ধরিয়া দেখিতেছি; কই, দেখিয়া তো সাধ মিটে না, আঁখি পরিতৃপ্ত হয় না। ঐ সৌন্দর্য্য-বিভব যেন নিত্যই নূতন। প্রেমই পুরাতনে নূতনত্ব দান করে। কারণ প্রেম স্বয়ং চৈতন্যময়ী মহাশক্তিরই চিরন্তন সৌন্দর্য্য।

প্রেমই প্রাণে সৌন্দর্য্য-বোধ জাগ্রত করে; সেই প্রেম দুই মূর্ত্তিতে জগতে দর্শন করা যায়; স্বভাব-বিকশিত এবং সাধন-বিকশিত।

শিশু মাকে ভালবাসে, একটু না দেখিলেই মা মা বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হয়। সংসারের সঙ্গে যাহার অল্পই পরিচয় জন্মিয়াছে, যে অস্ফুট হৃদয়ে জ্ঞানের কিছুমাত্র বিকাশ নাই, সে এত ভালবাসা কোথা হইতে লাভ করিল? তাহার প্রেম স্বভাবে জন্মিয়া স্বভাব দ্বারাই ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সন্তানের প্রতি মাতার যে নিঃস্বার্থ স্নেহ তাহাও এই শ্রেণীর। যিনি মাতৃবক্ষে স্তন্য-সুধা দান করিয়াছেন, তাঁহারই করুণায় মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ অমৃত-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বিমল প্রবাহে জীবলোক পবিত্র ও প্লাবিত করিতেছে। এই স্বভাব-বিকশিত প্রেমই বিশ্ব প্রকৃতিতে অতি পরিস্ফুট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অলক্ষ্য সঞ্জীবন মন্ত্রে প্রাণীজগৎ বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতেছে। পাখীটি বনে বনে ঘুরিয়া শাবকের জন্য আহার সংগ্রহ করিতেছে,—নিজে ঝড়বৃষ্টি সহ্য করিয়া পক্ষপুটে সন্তানকে ঢাকিয়া রাখিতেছে। পশু আহার নিদ্রা ভুলিয়া কত যত্নে সন্তান পালন করিতেছে। কীট পতঙ্গেও এই প্রেম বিদ্যমান। কোন কোন ইতরপ্রাণীকে সন্তানের জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। মানব-মাতার কথা আর কি বলিব? প্রকৃতি যেন জগদ্ধাত্রী বেশে সকল জীবকেই আপনার স্নেহবক্ষে টানিয়া লইয়াছেন। এই প্রেমে যে সৌন্দর্য্য-বোধ, তাহাও প্রকৃতি প্রদত্ত। যে নিগ্রো-শিশুকে শ্বেতকায় ব্যক্তি ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন, সেই কৃষ্ণকায় বালকও নিজ জননীর নিকট কত সুন্দর! তাহার প্রতি কথা, প্রতি অঙ্গভঙ্গী, হাসি, কান্না, খেলা, মাতার চক্ষে কত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দেয়! যে বৃক্ষটি আমি যত্নে রোপণ করি—তাহাতে সতত জল সেচন করি, অন্যের নিকট না হউক, সে বৃক্ষ আমার নিকট সুন্দর।

যে প্রেমের উন্মেষ সাধনসাপেক্ষ, তাহার নামই সাধন-বিকশিত প্রেম, যে স্বর্গের ধনে মনুষ্যের মানব-জন্ম সার্থক হয়, জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে, তাহা কখনও সাধনা ভিন্ন লাভ হইতে পারে না।

সমুদ্র নীল দিগন্তকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্তপ্রবাহে শোভা পাইতেছে; পর্ব্বত হিমানী-মণ্ডিত বেশে শুভ্র-জটাজুট-ধারী যোগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে; কত ফুল বনে ফুটিয়া উঠিয়া মাধুরী ঢালিতেছে; লতা তরুর শ্যাম-অঙ্গে বায়ু-হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া যেন সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছে। পাখীর কলকণ্ঠে, ভ্রমর-গুঞ্জনে, ঝিল্লীর নিশীথ-গীতি-ধ্বনিতে কত মাধুর্য্য! এসকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কি সকলে সমান ভাবে অনুভব

করিতে সমর্থ হয়? কবি, ভাবুক ও ভক্তের প্রাণে যেমন সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, সাধারণের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। এই প্রেম, যদিও স্বভাব হইতেই জন্মে, তথাপি সাধন ভিন্ন তাহা বিকশিত হইতে পারে না।

জ্ঞান আমাদের নিকট কেবল বস্তু-তত্ত্বই নির্ণয় করিয়া থাকে। সুদূরস্থ নীহারিকা-পুঞ্জে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করিয়া বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছে। মহাসমুদ্রের অতল গর্ভে প্রবেশ করিয়া কোথায় কোন্ পদার্থ, কোন্ রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিতেছে, ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর জন্মকাল নির্ণয় করিতেছে; কিন্তু তাহাকে সৌন্দর্য্যে শোভিত-করা—ভাব-সম্পদে ভূষিত করা, জ্ঞানের সাধ্য নয়; প্রেমেই কেবল এই দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিলীলাকে সৌন্দর্য্যে মহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। কবি, ভাবুক, ভক্তের নিকট বিজ্ঞানের জটীল রহস্যও কত মাধুর্য্যময়!

ইটালীর সুসন্তান কবিবর দান্তে (Dante) বলিয়াছেন, মানবহৃদয় প্রেমে সুন্দর না হইলে তাহা-হইতে কবিতার উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রেম স্বয়ং বিশ্বাতীত এবং সৌন্দর্য্যের সার। আর্য্য কবিগণ তাঁহাদের অতুলনীয় তুলিকায় প্রেমের মাধুরী বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রেম সত্য সত্যই সুন্দর। কিন্তু এই মর্ত্ত্যলোকে প্রেমের সৌন্দর্য্য কোথায় মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে?—নারীচরিত্রে। পৃথিবীর কাব্য ইতিহাস এইরূপ শতশত জীবন্ত নারী-চিত্রে পূর্ণ রহিয়াছে।

ঐ যে ঋষি-প্রতিপালিতা তরুণী কুটীর দ্বারে উপবিষ্টা! প্রেমের এক গভীর সাধনায় তাঁহার প্রাণ নিমগ্ন। বাহিরের কোন দর্শনীয় বস্তু তাঁহার নয়ন দেখিতেছে না,—কর্ণ কোন শব্দই শ্রবণ করিতেছে না, এই বাহ্য-জগৎ যেন তাঁহার হৃদয়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একখানি সুন্দর মুখ মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়াছে। তিনি একেবারে প্রিয়তমে তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন। এমন সময় সাক্ষাৎ অলন্ত অগ্নির ন্যায় মহর্ষি দুর্ব্বাসা নিকটে সমুপস্থিত হইয়া সদর্পে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

"দ্বারে অতিথি সমাগত—দুর্ব্বাসা অতিথি।"

কিন্তু এই জলদ-নির্ঘোষে তাপসীর তপস্যা ভঙ্গ হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রিয়-ধ্যাননিরতা তরুণীর মস্তকে ঘোররবে বজ্রপাত হইল। তথাপি সেই নবীনা তপস্বিনীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না।

এই মনোরম জীবন্ত চিত্রটি দেখিতে দেখিতে প্রাণ আপনা আপনি বলিয়া উঠে,—কি সুন্দর! কি সুন্দর!

আর একটি বিচিত্র চিত্র, ভারতের গিরি-নিকেতনে এক রমণীয় তপোবন। শ্যামল তরুগুল্ম ও ফলে ফুলে তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পাদপ্রান্তে স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনী প্রস্তররাশি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই মনোজ্ঞ স্থানে পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে বিরাজিতা থাকিয়া বেদবতী তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার রূপরাশি তপঃপ্রভাবে হোমাগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, সমস্ত ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রাণ কোন্ সৌন্দর্য্যে মগ্ন রহিয়াছে?

বেদবতী ধ্যানান্তে জপে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, এমন সময় লঙ্কা-অধিপতি রাবণ ত্রিলোক জয় করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

একাকিনী অরক্ষিতা নারীকে সেখানে তপস্যায় রত দেখিয়া রাক্ষস-নাথ রাবণ কহিল,—

"দেবি, তুমি কে? তোমার এই অলৌকিক রূপ কখনও তপস্যার উপযুক্ত নহে। তুমি আমার মহিষীরই যোগ্যা। আমি দেবতাদিগেরও অধীশ্বর।"

বেদবতী কহিলেন—"রাক্ষস, তোমার মঙ্গল হউক। আমি বিষ্ণুকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এই নির্জ্জন অরণ্যে ভগবানই আমার একমাত্র রক্ষক। তিনিই অবলার বল।"

রাবণ দেখিল, এইরূপ অসহায়া ক্ষীণাঙ্গী নারীকে হরণ করা তাহার মত বলশালী বীরের পক্ষে কিছুমাত্র আয়াস সাধ্য নয়। বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস দুই পদ অগ্রসর হইয়া বেদবতীর কেশাগ্র ধারণ করিল। কিন্তু দুর্জ্জয় দৈব বলের নিকট পাশব বল পরাস্ত হইল। সহসা সেই

লাবণ্যময়ী তরুণীর কান্তি আশ্চর্য্য ব্রহ্মতেজে দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং প্রবল পরাক্রান্ত দশাননকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল।

বেদবতী কহিলেন,—"দুরাচার, কেশ স্পর্শ করিয়া আমার দেহ অশুচি করিয়াছিস্। আমি অগ্নিতে এই দেহ আহুতি প্রদান করিয়া মৃত্যুর পর প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইব।"

এই বলিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ী নারী সমীপস্থ যজ্ঞীয় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। সর্ব্বভুক্ হুতাশন দেখিতে দেখিতে বেদবতীর কমনীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। প্রেম, পবিত্রতা ও আত্মোৎসর্গের কি জীবন্ত সৌন্দর্য্য!

সত্য সত্যই নারী ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী। নারী যদি প্রেমের অমৃত-রসে ধরণীকে সঞ্জীবিত না করিতেন, তবে জন-সমাজ মরুভূমিতে পরিণত হইত! স্নেহময়ী জননীরূপে, সেবাপরায়ণা দুহিতা রূপে, অনুরাগের প্রস্রবণ দয়িতা রূপে, নারীকেই দেখিতে পাই। কি ধনীর রম্য হর্ম্ম্য, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কি নগর, কি গ্রাম, কি বন, সর্ব্বত্রই নারীর পবিত্র সেবা-হস্ত; সকল স্থানই নারী-প্রেমের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া রহিয়াছে!

এই সৌন্দর্য্য বিশ্ব-প্রেমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে তাহা প্রকৃতই অতুল্য। ভগবদ্ভক্তিতে তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়।

যখন মহর্ষি ঈশা ক্রুশে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন,—সেই, শান্ত সমাহিত কান্তি শোণিতস্রোতে প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল, তথাপি মহর্ষির মুখ বিশ্ব-প্রেমে সমুজ্জ্বল, তিনি হত্যাকারীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন! আর যখন নবদ্বীপের পথে নিত্যানন্দ জগাই মাধাই কর্ত্তৃক আহত ও রক্তধারায় প্লাবিত হইয়া আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছিলেন—

> "মেরেছিস্ কলসীর কানা,
> তা বলে কি প্রেম দিব না?"

এবং তাহাদিগকে ভাই বলিয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন এই পৃথিবীতে বিশ্ব-প্রেমের যে সৌন্দর্য্য দেব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে কি?

সকল সৌন্দর্য্যের আধার সেই অনন্ত প্রেম-প্রস্রবণের একটি ধারা মর্ত্ত্যলোক প্লাবিত করিতেছে। সাধনা দ্বারা ভক্তগণ তাহা লাভ করিয়া থাকেন; তাই, প্রেমিক ভক্তের হৃদয় এত সুন্দর! এই প্রেম-ধারার নামই পরানন্দ বা চিদানন্দ ঘন।

কত তাপস তপস্বিনী নির্জ্জন গিরি-কন্দরে, পূত-সলিলা তটিনী-পুলিনে সেই আনন্দ স্বরূপের ধ্যানে যুগযুগান্তর অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দেব-দেবকে "রসো বৈ সঃ" রূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

> "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
> আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ নেতি"
> তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

"মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন তিনি কোন বস্তু হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।"

যিনি বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের প্রাণ,—সাধক যাঁহাকে "শিব সুন্দর" রূপে ভজনা করেন, বৈষ্ণব কবি যাঁহার হ্লাদিনী শক্তিতে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহাতে প্রাণ সমর্পণ করিলেই মানুষ সৌন্দর্য্যের সারতত্ত্ব বুঝিতে পারেন।

> "সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ,
> অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ।
> আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
> চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি,
> হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম,
> আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের লক্ষণ।"
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের আনন্দেই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে। এজন্যই উপনিষৎকার ঋষিগণ তাঁহাকে "রস স্বরূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের এই আনন্দ স্বরূপই হ্লাদিনীশক্তি; হ্লাদিনীশক্তিই বিশ্বলীলায় বিকশিত হইয়া সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। তাহার নামই—প্রেম। এই প্রেম চির সুন্দর, চির নূতন,—চির মঙ্গলময়। ইহার

রূপ-মাধুরীতে চিরদিন জগৎ বিমোহিত। সৌন্দর্য্যের ইহাই সার তত্ত্ব।

শ্রীকুমুদিনী বসু।

আভাস

রক্তিম আভায় দীপ্ত
বেলান্তে গগন-গায়,
নিখিল-হৃদয় ঢালা
উছলিত জোছনায়.
উজল প্রভাত-ভালে
তরুণ অরুণ-মুখে,
রূপে রসে ঢল ঢল
কোমল কুমুদ-বুকে,
উপল-আহত গতি
আকুল লহরী মাঝে.
কাহার সন্ধানে প্রাণ
ছুটে যেতে চাহে কাছে ?
অস্ফুট আভাস কার
প্রাণ করে উচাটন ;
কাহার প্রতীক্ষা মাগি,
ধ্যানে চিত্ত নিমগন ?
রে নিঠুর ! ও পাষাণ,
রে গুপ্ত হৃদয়-চোর !
ব্যথাতুর করে প্রাণ
লুকানো যে খেলা তোর।
জীবন-বাঞ্ছিত ধন,
হে মোর হৃদয়-রম !
মিলন-পরশ দানে
শান্ত কর হিয়া মম।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

বিলাতের পত্র

(৩)

কবি-দর্শন

কলেজের অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান সাহিত্য পাঠ করিতে হইলে কাহার লেখা তিনি ভাল মনে করেন। অধ্যাপক কবি ইয়েট্‌সের লেখা পড়িতে অনুরোধ করেন।

আর এক দিন বিখ্যাত অধ্যাপক 'কার্' কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "ইয়েট্‌স্‌ই বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের যথার্থ কবি।" ইয়েট্‌সের Shadowy Waters এবং Catharine নাটক আমাদের ভাবুকতা-প্রবণ বাঙ্গালী-চিত্তকে খুবই আকর্ষণ করে। ইয়েট্‌স্ আইরিষ্। তাঁর কাব্যে আইরিষ্ ভাব ও চরিত্রের পূর্ণ-বিকাশ বর্ত্তমান। বাঙ্গালীর ভাব ও চরিত্রের সঙ্গে আইরিষ্ ভাবের অনেকটা মিল আছে। ইহারাও বাঙ্গালীর মত কতকটা আইডিয়েলিষ্ট। হয়তঃ ইয়েট্‌সের লেখা সে জন্যই এত ভাল লাগিয়াছে।

বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যে বাস্তবতার যুগ চলিতেছে। ইংলণ্ডের থিয়েটার গুলিতে দেখা যায়, বাস্তবতাপূর্ণ নাটক যেমন জমাট্ বাঁধে ভাবুকতাপূর্ণ নাটক তেমন হয় না। বড় বড় অভিনেতাদেরও দেখা যায় গভীর ভাবকে খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সংগ্রাম, দেশ প্রীতির প্রেরণা সম্বন্ধে এখানকার ষ্টেজ খুব উন্নত; কিন্তু বাহ্যিক বাস্তব জগতের ঊর্দ্ধে ভাবলোকে যাহা বিচরণ করিতেছে, তাহাকে সাধারণ ষ্টেজে, সাধারণের উপভোগ্য করিয়া উপস্থিত করিবার শক্তি এখানকার ষ্টেজের এখনও ততটা হয় নাই।

আইরিষ্ ও ওয়েল্‌স্‌দের সঙ্গে খাঁটী ইংরেজ-চরিত্রের একটা তফাৎ আছে। ইহারা খাঁটী ইংরাজদের মত অতটা কেজো নয়, অতটা ব্যাবসায়ী নয়। রাষ্ট্রনৈতিক কূটবুদ্ধি এবং অর্থাগমের ব্যাবসায়-বুদ্ধির কাজেই ইহারা জীবনটাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেয় নাই। আলাপ

করিলে সহজেই বোঝা যায়, যে হৃদয়ের দিক দিয়া ইহারা অধিকতর উদার এবং ভাবের দিক্ দিয়া অধিকতর মুক্ত। ভারতবর্ষের কোনও একটা গভীর ভাবের কথা উপস্থিত করিলে ইংরেজ তাহার যুক্তির মাপকাঠী দিয়া ওজন করিয়া দেখিবে। তাহার ফলে সে তাহার ভিতরকার রসটারই স্বাদ পাইবে না। পক্ষান্তরে এক-জন আইরিষ্ ও একজন ওয়েল্‌স্ ভাবের আভাসেই ভাবের রসাস্বাদ গ্রহণ করিবে। সে যুক্তির ছোব্‌রা লইয়া ব্যস্ত হইবে না।

এই বাস্তবতার যুগে ইয়েট্‌স্ ভাবের কবি। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক এবং একদল আধুনিক কবির উপর তাঁহার প্রভাবও যথেষ্ট। এদেশে ইংরেজী সাহিত্যকে এক গভীর ভাবুকতা ও আধ্যা-ত্মিকতার মধ্যে পরিচালিত করিবার একটা সাধনা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। একদিন ইয়েট্‌সের দলের এক-জন তরুণ কবি আমাকে বলিতেছিলেন, "আমাদের সাহিত্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কলের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। উহার প্রাণধারা—মুক্ত ভাবস্রোত—ক্রমেই রুদ্ধ ও অচল হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য বাস্তবের নকল করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে না। আমরা ইহাকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মুক্তি দিতে চাই। আমরা যাহা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম তাহার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে পাইয়াছি। তাই তাঁহাকে আমাদের এই নবযুগের prophet বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কবি ইয়েট্‌স্ মিষ্টিক্, কিন্তু ততটা আধ্যাত্মিক নন। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক্ এবং আধ্যাত্মিক, তাই বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিতে তাঁহার যোগ্যতা অধিক।"

বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ ইংরেজ-কবিকে দর্শন করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া ইয়ুষ্টন স্কোয়ারের নিকটবর্ত্তী একটী সরু গলিতে প্রবেশ করিলাম। ১৮ নং ওবার্ণ বিল্ডীংএর একটী পুরাণো-ধরণের ক্ষুদ্র বাড়ীতে ইয়েট্‌স্ বাস করেন। দরজার সাম্‌নে আমেরিকান্ কবি পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা। উপরে উঠিতে সরু সিঁড়ী। দুধারের দেওয়ালে সেকেলে ধরণের ঝাপ্‌সা ছবি। ঘরে ঢুকে দেখি, গতবারে যে সকল সাজসজ্জা দেখিয়া-ছিলাম তাহার অনেক বদলান হইয়াছে। চারিদিকের দেওয়াল কাল। তার নীচুটা গাঢ় সবুজ পরদায় ঢাকা। ঘরের ছাদটা ধূম্রবর্ণে চিত্রিত। টেবিল, আলোদান ও চেয়ার সবই কালো বর্ণে রঞ্জিত। ঘরের ছাদটা নীচু। মনে হইতেছিল যেন চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার কোনও বাড়ীতে আসিয়াছি। দেওয়াল সেকেলে ধরণের ঝাপ্‌সা ছবিতে সজ্জিত। ছবি সাজাবার প্রণালীটীও আধুনিক নহে। ঘরের চারিদিকে কৃষ্ণ বর্ণের আলোদানের উপর দেড় হাত লম্বা ও প্রায় দুই ইঞ্চি মোটা মোমবাতির মালা জলিতেছে। কালো দেওয়ালে মোমবাতির ঝাপ্‌সা আলো পড়িয়া যেন একটা মিষ্টিক্-লোক তৈয়ারী হইয়াছে। গৃহসজ্জা অতি শাদাশিদে। কবির পোষাক ও বসিবার আসন সবটার মধ্যেই একটা ভট্‌চায্যি-ভাব মাখানো রহি-য়াছে। কথাবার্ত্তা সরলতাপূর্ণ। মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয়, ইনি বৈজ্ঞানিক যুগের কেজো দলের লোক নন্। কথা বলিতে বলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাব-লোকে ডুবিতেছেন।

টেবিলে খাবার আসিল। চাহিয়া দেখি, কাটা চাম্‌চার বাঁট্‌গুলিও কালো। আমার বিশ্বাস হইল, কবি ইয়েট্‌স্ কালো রংটা ভালবাসেন।

কাটাচাম্‌চার সঙ্গে সঙ্গে কবির বাক্যের তরঙ্গ ছুটিয়া চলিল। তিনি বাংলা দেশের ষ্টেজের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের ষ্টেজ্ ঘরের বাহিরে হওয়া উচিত। এদেশে শীতের তাড়ায় ঘরে ষ্টেজ্ করিতে হয়; ভারতের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর।

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' তাঁর খুব ভাল লাগিয়াছে। তিনি বলিলেন, "বর্ত্তমান জগতের সাহিত্যের মধ্যে ইহার স্থান খুব উচ্চে। ম্যাটারলিঙ্কের নাটক ব্যতীত ইহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না। ম্যাটারলিঙ্কের সহিত ইহার তফাৎও প্রচুর। 'ডাকঘরে' প্রাচ্যভাবেরই প্রাধান্য বেশী এবং ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়। প্রকৃতির মধ্যে যে একটী মুক্তির আহ্বান বাজিতেছে

তার প্রতি মানব-প্রাণের যে স্বাভাবিক প্রবল আকর্ষণ, 'ডাকঘরের' কবি খুব অল্পের মধ্যে সেইটাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ব্যাকুল আকর্ষণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সুর মিলিয়া চিত্রটীকে আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। এখানে ম্যাটারলিঙ্কও এতটা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কলিকাতা ষ্টেজে 'ডাকঘরের মত নাটক অভিনীত হওয়া সম্ভব কি না?" তাঁহার মতে ইংলণ্ডের ষ্টেজ এখনও ম্যাটারলিঙ্কের ধরণের নাটক খুব কৃতকার্য্যতার সহিত উপস্থিত করিতে পারে নাই। তবে ইংলণ্ডে 'ডাকঘরের' উপযুক্ত শ্রোতা এখন অনেক আছে। খুব লম্বা লম্বা বক্তৃতা ও খুব উত্তেজনা-পূর্ণ ঘটনাবলীর দৃশ্যই শ্রোতারা ভালবাসে—ইহাই ছিল ষ্টেজের অবস্থা। ম্যাটারলিঙ্কের নাটকে ঘটনার বাহুল্য নাই; কথাও খুব কম। তাহার অর্দ্ধ পদের পরের শূন্য চিহ্নগুলিই অনেক অর্থ প্রকাশ করে। একটী সাধারণ ঘটনার পশ্চাতে যে মজার রহস্য রহিয়াছে—তাহাই তিনি সুনিপুণ চাতুর্য্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। বাস্তব জীবনের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া তাহার অন্তরালস্থ অতল গভীর সুখ-দুঃখ-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গকে পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেওয়াই ম্যাটারলিঙ্কের উদ্দেশ্য। একদল চিত্রকর ছবিকে রংচং মাখাইয়া ঝকঝকে করিয়া তোলেন—দর্শকের চিত্ত-হরণের জন্য। কিন্তু ওস্তাদ্ চিত্রকর তিনিই—যিনি খুব কম রং মাখান এবং যিনি বিরল লাইন্‌গুলির মধ্য দিয়া ছবির উদ্দেশ্যটীকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারেন। ম্যাটারলিঙ্ক সেই শ্রেণীর কবি।

ইয়েট্‌স্ বলিতেছিলেন, "ইংলণ্ডেও সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু নূতন ভাব ও নূতন রচনা-প্রণালী যাঁহারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই অনেক সহিতে ও অনেক অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "আয়র্লণ্ডের অবস্থা অনেকটা বাংলা দেশের মত। বাংলাদেশে জন সাধারণের মধ্যে যেমন যাত্রা, কবি, কথকতা ইত্যাদি ছিল, আয়র্লণ্ডেও তদ্রূপ সাধারণের দ্বারা গঠিত অভিনয়াদি প্রচলিত ছিল। এবং সেইজন্যই এখনও আইরিষ্ চাষা ও মজুরদের মধ্যে একটা আর্টের রুচি আছে, যাহা ইংরেজ চাষা মজুরদের নাই।"

ইংলণ্ডের সঙ্গীত নাটকাদি কতকটা aristocratic অর্থাৎ সঙ্গীত-শালায়ই তাহাদের স্থান, ফ্যাশানেবল্ সমাজেই তাহার প্রচলন। গায়ক গায়িকা, রচয়িতা ও শ্রোতা সমজদার সকলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। গ্রাম্য চাষাদের জীবনের সঙ্গে তাহার অবিচ্ছিন্ন যোগ নাই। চাষাদের মধ্যে ballads ছিল, folk dance ছিল, সঙ্গীত কীর্ত্তন ছিল, তাহা মরিয়া গিয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনের ফলে চাষাদের জীবনে সৌন্দর্য্যের প্রতি অনেকটা দৃষ্টি পড়িয়াছে।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ডের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা দেশেরই মত এসকল গ্রাম্য যাত্রা ইত্যাদিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইংরেজী অনুকরণে অন্ধ হইয়া যখন আয়র্লণ্ড স্বজাতির ভাল উপাদানগুলিকেও অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিতে লাগিল, ইয়েট্‌স্ তখন তাহাদিগকে সচেতন করিবার জন্য তীব্রভাবে লেখনী ধারণ করেন। তখন তাঁহাকে কতকটা রক্ষণশীল হইতে হইয়াছিল। এখন আয়র্লণ্ডের সেই অবস্থা অতীত হইয়াছে। এখন তথায় তিন দল গোঁড়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমদল ক্যাথলিক্ গোঁড়া। ইহারা বাংলাদেশের গোঁড়া হিন্দুদলের মত যে কোন নূতন সংস্কার এবং যে কোনও নূতন বিস্তার-বিরোধী। অবশ্য যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক ক্যাথলিক, তাঁহারা উদার। পৌরহিত্যপ্রিয় ক্যাথলিকেরাই জনসাধারণকে মূঢ়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চাহে।

দ্বিতীয় দল ন্যাশানেলিষ্ট গোঁড়া। ইঁহারা রাজনৈতিক রেষারেষী জাগাইয়া রাখিতেই সতত ব্যস্ত। জাতির যথার্থ কল্যাণকে ধীরভাবে তলাইয়া দেখিবার ধৈর্য্য নাই। ইংলণ্ডের কোনও ভাল জিনিষকেও গ্রহণ করিতে রাজি নন। এবং ইঁহাদের রাজনৈতিক propa-ganda র বাহিরে কোনও সত্য থাকিলেও তাহাকে অসত্যের আকার দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

তৃতীয় দল যারা ইংরেজী মোহে অতিশয় মুগ্ধ এবং নিজের জাতীয় সভ্যতায় একান্ত উদাসীন।

ইহার বাহিরে ধীরে ধীরে আর একদল বুদ্ধিমান লোক তৈয়ারী হইতেছে—যাহারা কোনও গোঁড়ামীর দ্বারা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করিয়া যথাযথ ভাবে সত্যকে দেখিতে ও গ্রহণ করিতে পারে। জগতের চিন্তা-স্রোতের সঙ্গে ইহাদের যোগ রহিয়াছে।

ইয়েট্‌স্ খুব দ্রুত কথা বলেন। মাথা নীচু করিয়া চোখ বুজিয়া কথা বলিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "তোমাদের দেশের অবস্থাও বোধ হয় অনেকটা এইরূপ?"

ব্রিটিস মিউজিয়ামে তিনি ভারতবর্ষের একটী কাঠের বাড়ী দেখিয়াছিলেন। সমগ্র জীবন ধরিয়া একটী লোক তার কাঠের বাড়ীটীকে চিত্রিত করিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল, যে পুত্রপৌত্রাদির নিকট তাহার স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য এই প্রয়াস। ভবিষ্যৎপুরুষের প্রতি প্রেম কত গভীর এবং নিজের আনন্দকে তাহাদের কাছে জীবন্ত করিয়া রাখিবার এই প্রয়াস কত মহৎ! ইয়েট্‌স্ বলিলেন, "পারিবারিক বাসস্থানের সহিত হৃদয়ের যে গভীর যোগ ইহা চরিত্র ও শিল্প বিকাশের মস্ত সহায়। বর্ত্তমান সভ্যতায় চঞ্চল জীবনের মধ্যে ইহা পাওয়া যায় না। এখানে সকলই অনিশ্চিত। বাড়ী ঘর দুদিনের জন্য। তার সঙ্গে হৃদয়ের একটা স্থায়ী সম্বন্ধ হয় না।"

তাঁহার নাটকে ম্যাটারলিঙ্কের প্রভাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন—

"কোনও সমালোচক বলিয়াছেন যে ক্যাথারিন্‌এ ম্যাটারলিঙ্কের প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু উহা ম্যাটারলিঙ্কের কয়েকবৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।"

আসিবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ কি খুব অল্প সময়ে অনেক লিখিতে পারেন?" আমি বলিলাম "হাঁ, অল্প সময়ে অনেক লিখিতে পারেন এবং সমগ্র দিন লিখিয়াও ক্লান্তিবোধ করেন না।" ইয়েট্‌স্ বলিলেন, "আমি তাহা পারি না। ২।৩ দিনে আমার ছোট একটা কবিতা লেখা হয়।"

আমি বলিলাম, "আপনি কোথায় বসিয়া কবিতা-লিখেন?"

সম্মুখের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার দিকে তাকাইয়া চেয়ারটী তার কাছে টানিয়া বলিলেন, "এই আগুনের কাছে এমনি করিয়া চেয়ার টানিয়া বসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায় কিন্তু লেখা বেশী হয় না। মনটা যে শূন্য থাকে তা নয়, কিন্তু কলমে তত দ্রুত প্রকাশ করিতে পারি না।"

কবি ইয়েট্‌স্ কোন্ শ্রেণীর ভাবুক—তাঁহার রচিত Shadowy Waters নাটকের Trogaelএর চরিত্রে আমরা তার কতকটা আভাস পাই।

সাংসারিক লোকে যাহাকে প্রেম ও সৌন্দর্য্য বলে Trogaelএর চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। তিনি এক অচিন্তনীয় সুখের দেশে (unimaginable happiness) যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু বলিতেছেন, "যদি প্রেম ও সৌন্দর্য্য চাও সংসারে কত সুন্দরী ও প্রেমিকা রহিয়াছে। তুমি কোথায় ধ্বংসের দিকে যাত্রা করিয়াছ? যাহা পাওয়ার নয় তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া কি হইবে? সংসারে ফের।"

Trogael বলিলেন,—

"It is love that I am seeking for,
But of a beautiful, unheard of kind
That is not in the world.

বন্ধু বলিলেন, "পার্থিব জগতের বাহিরে ত কেবল মৃত্যু! সেদিকে গিয়া কি হইবে?"

Trogaelএর চিত্ত তাহাতে প্রবোধ মানিবার নহে। বন্ধু যাহাকে মৃত্যু মনে করিতেছেন, Trogael তাহার মধ্য দিয়া অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন। যেই অমৃতলোক হইতে বিশ্বের প্রাণধারা উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে—যাহার অভিমুখে বিশ্বের প্রেমরাশি তরঙ্গায়িত ও উচ্ছ্বসিত হইতেছে—সেই দিকেই তিনি যাত্রা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের বিধি যেখানে পরাস্ত হয়—দার্শনিকের যুক্তিবিচার যেখানে পথ খুঁজিয়া পায় না, যথার্থ কবি ঋষিরই ন্যায় ধ্যান ও কল্পনার সাহায্যে সেই 'অগম্য পুরে' প্রবেশ করিয়া পাঠকের জন্য তার দ্বার খুলিয়া দেন। তাই বিদায়ের বেদনা বহন করিয়া আসিবার

সময় কেবল মনে হইতেছিল, "যথার্থ কবি ও ঋষিতে তফাৎ কোথায়?" শ্রী—

সন্তান-পালন

(ছয় মাস হইতে দুই বৎসর)

এখন আর শিশুটি একান্ত অসহায় জীব নহে। এখন হয় তো সে হামাগুড়ি দেয়, নয় তো দাঁড়াইবার চেষ্টা করে; হয় তো দুই এক পা হাঁটিতেও পারে। এখন তাহার দাঁত উঠিয়াছে সুতরাং কঠিন জিনিস একটু আধটু দিলে, তাহা খাইতে পারে। বুদ্ধিও একটু না হইয়াছে এমন নহে। তাহার মনের ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে। যা দেখে তাহার বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। তাহার শরীরের হাড় মাংসগুলি কতকটা দৃঢ় হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদির কতকটা পরিণতি হইয়াছে। আবার চুলগুলি বেশ বড় হইয়াছে।

সাত মাস বয়স হইতে শিশুকে একটু আধটু ভাতের মাড় কি অন্য কিছু না দেওয়া যায় এমন নহে। ৭ মাস বয়সের পূর্ব্বে শিশুর একমাত্র খাদ্য হইতেছে দুগ্ধ; এ সময় দুধ ছাড়া অন্য কিছু দিলে, সে তাহা ঠিক জীর্ণ করিতে পারে না। এ সময়, তাহাকে পেটেণ্ট্ ফুড্ কি সাগু, বার্লি, ভাত, রুটি প্রভৃতি দেওয়া উচিত নহে; দিলে, তাহার অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। ৭ মাস বয়সে কোন শিশুকে যদি কোন পেটেণ্ট্ ফুড্ ব্যবস্থা করার একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, দেখিতে হইবে উক্ত পেটেণ্ট্ ফুডে কোন প্রকার শ্বেতসার (starch) আছে কি না; যদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা ব্যবস্থা না করাই উচিত। ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত শিশুকে প্রধানতঃ স্তন-দুগ্ধ দিয়া রাখিবে; যে সকল শিশু মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত তাহাদিগকে বোতলে করিয়া গোদুগ্ধ খাওয়াইয়া রাখিবে। ১০ মাস বয়স হইলে স্তন ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে মাই ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে নাই। শীতকালে মাই ছাড়ানের চেষ্টা করা বিধেয়। গ্রীষ্মকালে অতি সামান্য কারণেই শিশুর পেটের গোল হয়; শীতকালে তাহা হয় না। যে সকল শিশুকে বোতলে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করা হয়, তাহাদিগকে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই দুধ খাওয়াইতে হয়। ইহার পর বাটিতে চুমুক দিয়া দুধ খাওয়ার অভ্যাস করাইতে হয়।

৬ মাসের শিশুকে দিন রাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬ বার খাওয়ান আবশ্যক। ২।১ দিন অন্তর এক আধটা আঙ্গুরের রস কিংবা সুমিষ্ট কমলা লেবুর রসও দেওয়া যাইতে পারে। রসের সঙ্গে ছিবড়ে কিম্বা বীচি যাহাতে উহার পেটের মধ্যে না যাইতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ৭ মাস বয়সেও দিবা রাত্রে ৬ বার খাওয়ানের আবশ্যক বটে, তবে এসময় প্রত্যেক বারে ৩ ছটাক, ৩।০ ছটাক পরিমাণে খাওয়াইতে হয়। এ সময় দুধের সঙ্গে ৩ নম্বর এলেন্‌বেরি ফুড্ (Allenbary's Food no. 3) কিম্বা বেন্‌গারস্ ফুড্ (Benger's Food) প্রভৃতি দিলে বিশেষ ফল হয়। এগুলি প্রস্তুত করা একটু কঠিন ব্যাপার। ভাল করিয়া প্রস্তুত না করিলে ইহা দুধের সঙ্গে ডেলা বাঁধিয়া যায়। পেটেণ্ট্ ফুডের সহিত দুধটা একেবারে মিশাইতে নাই। একটু একটু করিয়া মিশাইতে হয়, আর চাম্‌চে দ্বারা নাড়িতে চাড়িতে হয়, তাহা হইলে চাপ বাঁধিতে পারে না। সাধারণতঃ ৭ মাস বয়স হইতেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। এ সময় শিশুর মাড়ি শুড় শুড় করে। এই সময় সে যাহা পায় তাহাই কামড়াইতে চায়। একটু পাঁউরুটির ছাল কিম্বা রুটির টুকরা কি এইরূপ কোন জিনিস মুখে ধরিলে সে তাহা কাটিতে থাকে এবং তাহাতে সুখও পায়। কিন্তু সাবধান, এগুলি যেন তাহার পেটের মধ্যে না যায়। কাটা হইলে এগুলি মুখের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে। ৯ মাস বয়স হইলে, উহাকে একটু আলুসিদ্ধ, কি ফুলকপিসিদ্ধ কি এইরূপ কোন জিনিস অতি সামান্য পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে ১০ মাস বয়সে একটু আধটু ডিমসিদ্ধও দেওয়া যাইতে পারে। ডিমটা যেন বেশ টাট্‌কা হয় আর উহা যেন দেড় মিনিটের অধিক কাল ধরিয়া সিদ্ধ না করা হয়। ডিমের হরিদ্রাংশই দিতে হয়,

কিন্তু আরও একটু বড় হইলে শ্বেতাংশও দিতে পারা যায়। এক বৎসরের শিশুকে একটি ডিমের আধখানি দেওয়া যাইতে পারে; দেড় বৎসরের শিশুকে ডিমটির ১২ আনা অংশ দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পর একটি ডিম অবাধে দেওয়া চলে। এক বছরের শিশুকে একটু আধটু মাছের যুষও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ডাল দুইও অবাধে দেওয়া যাইতে পারে। ডিম খুব পুষ্টিকর খাদ্য, শিশুদের পেটে ইহা বেশ সহ্যও হইতে দেখা যায়।

দুধ-ভাত, দুধ-রুটি—একবৎসরের শিশুকে দুধ-ভাত, দুধ-রুটি প্রভৃতিও ধরাইতে পারা যায়। অনেক শিশু ১০ মাস বয়স হইতেই ভাত ধরে। কেহ কেহ আবার ১৷৷৹ বৎসর ২ বৎসর বয়স না হইলে ভাত ধরিতে পারে না।

মুড়ি, পাঁউরুটি—এক বৎসর বয়সেই শিশুর উপর নীচু উভয় পাটিতেই কয়েকটি করিয়া দাঁত দেখা দেয়। এ সময় তাহাকে একটু পাঁউরুটির শাঁস এক আধখানি বিস্কুট কিম্বা মুড়ি দিলে সে তাহা খাইয়া জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

সুজী, সাগু প্রভৃতির পায়স—এ সময় তাহাকে সুজী, সাগু প্রভৃতির পায়স দিলে সে তাহা তৃপ্তি সহকারে খাইতে পারে এবং তাহাতে কোন অনিষ্টও হয় না।

মাছ-ভাত—১৮ মাস বয়স না হইলে শিশুকে মাছ-ভাত দিতে নাই। তরকারীর মধ্যে আলুসিদ্ধ, কপিসিদ্ধ, কাঁচকলাসিদ্ধ, পেঁপেসিদ্ধ এই রকম তরকারীই শিশুর পক্ষে উপযোগী। মাছ তরকারী দিয়া ভাত খাওয়া হইলে, তাহাকে দুধ বা দই খাইতে দিবে।

১০ মাস বয়স হইতে ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে যে সকল খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহার তালিকা—

১০ মাস;—সকাল ৬টা-৭টা—১ পোয়া দুধ; বেলা ১২টা-১টা—আলু বা কপিসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ, চারিটা ভাত, মাছের সুপ, কিঞ্চিৎ পরে আধপোয়া দুধ; বেলা ৩-৪টা—এক পোয়া দুধ; রাত্রি ৭-৮টা—৩ ছটাক দুধ; ইহার সহিত এলেনবেরীর ফুড কিংবা বেন্‌জারস্ ফুড্ও দেওয়া যাইতে পারে।

১২ মাস;—বেলা ৭টা—১ পোয়া দুধ; বেলা ১০টা—দুধের সঙ্গে চারিটা ভাত অথবা রুটি; পাঁউরুটি দিতে হইলে তাহা যেন এক দিনের বাসী হয়; টাট্‌কা পাঁউরুটি শীঘ্র জীর্ণ হয় না। বেলা ১টা—একটু আলু, কপি বা পেঁপেসিদ্ধ, একটু সুজী বা সাগুর পায়স এবং আধ পোয়া দুধ কিংবা আধখানি ডিমসিদ্ধ ও দুধ রুটি; বেলা ৪টা—একপোয়া দুধ, কিংবা দুধ ও এক ঝিনুক ভাত বা রুটি; রাত্রি ৭-৮টা—৩ ছটাক বা ১ পোয়া দুগ্ধ।

১৫ মাস;—বেলা ৭টা—এক পোয়া দুধ; বেলা ১০টা—রুটি-মাখন, দুধ ভাত; বেলা ১টা—আলুসিদ্ধ, কপি প্রভৃতি সিদ্ধ, পায়স, ডিমসিদ্ধ অথবা দুধ এবং একটু রুটি; বেলা ৪টা—দুধ রুটি; ৭-৮টা—দুধ।

১৮ মাস;—৭টা—দুধ ১ পোয়া; বেলা ১০টা—রুটি মাখন কিম্বা ভাত তরকারী, একটু দালের ঝোল প্রভৃতি; বেলা ১টা—আলুসিদ্ধ, কপিসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি, সঙ্গে একটু একটু দুধ; বেলা ৪টা—একটু রুটি ও দুধ; রাত্রি ৮টা—এক পোয়া দুধ।

২৪ মাস;—বেলা ৭টা—মুড়ি, বা বিস্কুট, পরে দুধ; বেলা ১০টা—ভাত, মাছ, তরি-তরকারী, দুধ কিম্বা দই; বেলা ১টা—রুটি ডিম, দুধ প্রভৃতি; বেলা ৪টা—একটু সন্দেশ ও দুধ; রাত্রি ৮টা—দুধ-রুটি প্রভৃতি। এ কথা খুবই ঠিক যে, এক প্রকার খাদ্য যে সকল শিশুর পক্ষে উপযোগী হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। উপরের প্রণালী মত খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে, অধিকাংশ শিশুর পক্ষেই উপযোগী হওয়া সম্ভব। শিশুকে ফুলকপিসিদ্ধ দিতে হইলে, উহার ফল অংশ বেশ সিদ্ধ করিয়া দিবে, সবুজ অংশ দিতে নাই। এক বৎসর, দেড় বৎসরের শিশুর দুধে জল মিশাইবার কোন আবশ্যক নাই। ২ বৎসর বয়স না হইলে শিশুকে মুড়ি, বিস্কুট প্রভৃতি দিতে নাই। ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুধই শিশুর প্রধান খাদ্য মনে করিতে হইবে। ৬ মাস বয়স হইতে তাহার বয়সানুসারে একটু একটু করিয়া আঙ্গুরের রস, কমলালেবুর রস, আমের রস প্রভৃতি দিতে থাকিবে। সকল শিশুর উপযোগী হইতে পারে, এরূপ একটা খাদ্যের তালিকা বাঁধিয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব। সকল শিশুর রুচি সমান নহে;

আবার সকল খাদ্যই সব শিশু সমান সহ্য করিতে পারে না। ছেলেরা যাহাতে তাড়াতাড়ি করিয়া না খায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খাওয়ার সময় বেশী কথাবার্ত্তাও কহিতে নাই। পেটুকতা দোষ শিশুর যাহাতে না জন্মায় সে দিকে পিতামাতার দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিলে, তাহার হস্তে কোন খাদ্য দ্রব্য দিবার পূর্ব্বে তাহার হাত বেশ করিয়া ধুইয়া দিবে। আহারের পূর্ব্বে সকলেরই হাত মুখ ধোয়া উচিত। হাত মুখ যদি অপরিষ্কার থাকে, সেই অবস্থায় কিছু খাইলে পেটের গোলযোগ ঘটিতে পারে। আহারের পরে হাত মুখ ধুইতে হয় এ অবশ্য সকলেই অবগত আছেন, এবং সকল দেশেই এ প্রকার প্রচলন আছে।

শিশুকে প্রতিদিনই স্নান করান আবশ্যক। সকালে বিকালে তাহাকে বাড়ীর বাহিরে একটু হাওয়া খাওয়ান উচিত। শিশুর বয়স ২১ মাস হইলে, সেই সময় হইতে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় তাহার দাঁতগুলি মাজিয়া দেওয়া উচিত। এ অভিপ্রায়ে চক খড়ি-চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিশু যদি দিবসে দুই বারের অধিক মল ত্যাগ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার পেটের অবস্থা ভাল নহে। শিশুকে জোলাপ দিতে হইলে, ফ্লুইড্ ম্যাগ্‌নেসিয়া বা সীরাপ্ অব্ ফিগ্ ব্যবস্থা করাই ভাল। প্রবল বিরেচক কদাপি ইহাদের ব্যবস্থা করিতে নাই।

শিশুদের পক্ষে অধিক নিদ্রার আবশ্যক। দিবা-নিদ্রায় বয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরের হানি হয় সত্য কিন্তু শিশুদের পক্ষে দিবানিদ্রারও আবশ্যক আছে। শিশুদের বেশীক্ষণ ধরিয়া পায়ের উপর থাকিতে দিতে নাই। এ সময় তাহাদের হাড়গুলি তেমন শক্ত ও দৃঢ় হয় নাই, সারা দিন পায়ের উপর থাকিতে দিলে, পায়ের হাড়গুলি বাঁকাইয়া যাইতে পারে। শিশুদের কেমন স্বভাব, হাঁটিতে শিখিল তো আর বসিতে চাহে না; আছাড় খায় তবুও হাঁটিবে। ফুলের বাগানে শিশুদের বেড়াইতে দেওয়া মন্দ নহে। বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুষ্পের সৌন্দর্য্যে তাহার চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তিটি বিকশিত হয়। শিশু যাহাতে ফুল গাছে হাত না দেয় কিংবা ফুল না ছিঁড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিশু যত দিন দুই বৎসরের না হয়, তত দিন তাহাকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিতে নাই। শিশুকে খুব বেশী সংখ্যক খেলেনা কিনিয়া দিতে নাই, ইহাতে খেলেনা পাওয়ার যে সুখ সে তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারে না; উপরন্তু প্রত্যহ নূতন নূতন খেলেনার জন্য বায়না ধরে মাত্র। (প্রতিভা)

ডোরোথী বীল্

(৪)

"In interpreting the universe, we are corresponding with an infinite mind, revealed in nature."

'বিশ্বব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টার ভিতর দিয়া, আমরা প্রকৃতিতে প্রকাশিত অনন্ত জ্ঞানের সহিত যোগ সাধন করিতেছি।'

কুমারী বীলের শেষ উক্তি হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"জড় ও চেতন স্বতন্ত্র নহে। সর্ব্বত্র জড়ের সহিত চেতন বাঁধা; বিশ্বে বিশ্বনাথ বর্ত্তমান। আমাদের সকল চিন্তাই দেশ ও কালকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু দেশকালে আবদ্ধ থাকে না।" —জীবনের এই উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইতে তাঁহাকে জীবনব্যাপী সাধনায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ তিনি অতি শৈশবে পিতামাতার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্ত পরিবারে জন্ম; স্তুতিবন্দনা, প্রেমসাধন, "নামে রুচি ও জীবে দয়ার" মধ্যে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত;—সুতরাং তাঁহার জীবনের মূল ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জন্য, সতের বৎসর বয়সেই, গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা, দৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান, জীবনের উন্নত লক্ষ্যে দৃষ্টি, এবং জগতের কল্যাণ সাধনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মুখমণ্ডলে এক প্রকার শুভ্র প্রসন্নতার স্থির জ্যোতি উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল। লঘুতার লেশ মাত্র তাঁহার চরিত্রে স্থান পায় নাই। এইজন্য তিনি কখনও অসংলগ্ন ভাল কার্য্যও করিতেন না।

যে কার্য্যে একটা লক্ষ্য আছে, এবং সেই লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার একটা ধারাবাহিক প্রণালী আছে, যে কার্য্য সাধন করিতে গিয়া নিজকেও গড়িয়া উঠিতে হয়, আত্মার বিকাশ হয়, (কেবল পরোপকার করা হয় না), এইরূপ স্থায়ী কার্য্যেই তিনি আপনাকে লিপ্ত রাখিতেন। তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহারই মধ্যে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ না করিয়া ছাড়িতেন না; এবং সকল কার্য্যেই ভগবৎ ইচ্ছাকে আপনার চালক করিয়া রাখিতেন।

পিতা মাতা, মাসী, পিসী, বন্ধু বান্ধব সকলেই জ্ঞানে গুণে ধর্ম্মভাবে অতি উন্নত ছিলেন। গৃহে ইঁহাদের সঙ্গ, ইঁহাদের আলোচনায় যোগদান, এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ ও 'ক্রসবী হলে' বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বক্তৃতা শ্রবণ—তাঁহার হৃদয় ও মনে যে সকল ভাবের তরঙ্গ ও জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করিত, তিনি আপনার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তন্নিহিত শক্তি আলোক ও আনন্দ আত্মস্থ করিয়া লইয়া, তবে ক্ষান্ত হইতেন। জীবনকে জ্ঞানে, প্রেমে, সৎকার্য্যে পূর্ণ করিয়া ফুটাইয়া তোলা, জীবনের সৎব্যবহারের জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বদা, প্রতি মুহূর্ত্তে দায়িত্ব অনুভব করা, সময় সুযোগ অর্থাদি সকলই অমূল্য সম্পদ, ভগবানের দান বলিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করা অলঙ্ঘনীয় বিধি, মঙ্গলকর কর্ত্তব্য, তিনি এরূপ মনে করিতেন, এবং কাযেও এই বিশ্বাসের অনুসরণ করিতেন।

প্রথমে অঙ্কশাস্ত্র ও সঙ্গীত প্রভৃতি ভাল করিয়া শিক্ষা করা হয় নাই বলিয়া, পরে কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি তাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাই বোনদিগকে তিনি অতি যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন। শিক্ষয়িত্রী হইয়া প্রথমেই এমন উত্তম প্রণালীতে ছাত্রীদিগকে পড়াইতেন এবং তাহাদিগকে এত ভালবাসিতেন যে পঞ্চাশ বৎসর পরে এক একজন সেই কথার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

শিক্ষকের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। যাহারা ভবিষ্যতে মা হইবে এবং মানব-শিশুর প্রথম জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ যাহাদের কাছে হইবে, তাহাদিগের শিক্ষা অতি গভীর ও গুরুতর বিষয়। লোক-দেখান শিক্ষা, আদব কায়দা ও সামাজিক ধরণ ধারণে অভিজ্ঞতা লাভ করা যথেষ্ট নহে। কেমন করিয়া চিন্তা কাযে পরিণত হয়, এবং কায স্বভাব রূপে ফুটিয়া উঠে তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার শক্তি লাভ করা জননীর কর্ত্তব্য। শিক্ষক স্বয়ং এমন হইবেন যে ছাত্রীগণ যেন তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারে যে ফ্যাসান্ (fashion) এবং শুধু লোকমতের সম্মান করিয়া চলা একটা কর্ত্তব্য নহে।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"—জ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়ে মানুষ মানুষ হইতে পারে না, নারী স্বীয় জীবনের মর্য্যাদা বুঝিতে ও রক্ষা করিতে পারে না, মাতা যথার্থ রূপে সন্তান পালন করিতে পারেন না,—এই চিন্তা করিয়া তিনি শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে ব্রতী হইয়া ছিলেন, এবং নানা উপায়ে আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্য যখন যেখানে যাইতেন, সেখানকার স্কুল সকল যত্নের সহিত পরিদর্শন করিতেন এবং তাহার শিক্ষা-প্রণালী বুঝিয়া লইতেন। জার্ম্মানীর 'কাইসার ওয়ার্থ' নামক স্থানের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে সে বিষয়ে একখানি ছোট বই লিখিয়া প্রচার করেন। ইহার উদ্দেশ্য, শিক্ষার উন্নত আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ প্রণালী সকলের সম্মুখে প্রদর্শন।

শিক্ষার আদর্শ ও প্রণালী একটু খাট করিয়া লইয়া কায চালান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এইজন্য তিনি তাঁহার অতি প্রিয় "কুইন্স্ কলেজ" পরিত্যাগ করেন, এবং ক্যান্টার্টন্ স্কুল হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। কিন্তু লেডীজ্ কলেজের ভার প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন সমস্ত শক্তি দিয়া, নিজের অর্থ ও স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত দিয়া, তাহাকে আদর্শ বিদ্যালয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষার আদর্শ ও প্রণালী এবং সেই সঙ্গে নারী-জীবনের লক্ষ্যও ক্রমশঃ উন্নততর করিয়া তুলিয়াছেন, কখনও অবনত হইতে দেন নাই। স্কুল-গৃহ বর্দ্ধন,

বোর্ডিং স্থাপন, পরীক্ষার ব্যবস্থা, অক্স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজের সহিত যোগ স্থাপন,—কলেজের কাগজ ও সম্মিলন—এ সকলই সেই এক মহৎ লক্ষ্য সাধনের প্রয়াস ও প্রণালী।

তিনি দিন দিন জ্ঞানে গভীরতা লাভ করিতে-ছিলেন এবং চিরজীবন জ্ঞান বিস্তারের সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। সাতাশ বৎসর বয়সের সময় তিনি যে ইতিহাস (Students' Text book of English and General History) প্রণয়ন করেন, তৎকালে সেইরূপ গ্রন্থ আর ছিল না। সেই গ্রন্থ ইতিহাস রচনার এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করে। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইয়াছিল, কতদিন দিনরাত্রি অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

একদিকে এইরূপ একনিষ্ঠ, গভীর জ্ঞান-চেষ্টা, অপর দিকে গভীর ধর্ম্মভাব, তাঁহার জীবন শক্তিশালী ও সুন্দর করিয়াছিল। এই সময় তিনি আর একখানি বই লেখেন "আত্মপরীক্ষা।" উহা তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের নিদর্শন। তাঁহার ডায়ারী হইতেও ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কতদিনের ডায়ারীতে এইরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঃ—"আরও নম্র ও ধীর হইতে চেষ্টা করিব।"—"প্রাতঃকালের প্রার্থনা কেবল অসার চিন্তা মাত্র।"—"বড় খিট্‌খিটে হ'য়েছি—ভগবান, আমাকে শান্ত কর।"

একদিকে প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা এবং উন্নতি সাধনের জন্য এইরূপ সংগ্রাম, অপর দিকে "আত্মপরীক্ষা" গ্রন্থে কি গভীর বিশ্বাসের কথা বলিয়াছেন,—"আমার জীবনে এমন কোন দিন ছিল না, যেদিন ভগবানকে নিকটে বিদ্যমান বস্তু বলিয়া অনুভব করি নাই। বিপদের সময় আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি এবং তিনি কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন।" * * * অন্যত্র বলিয়াছেন—"ধর্ম্ম অর্থই প্রভুত্ব—প্রতিদিনের বাধ্যতা। ধর্ম্ম কেবল ভাব নহে—সমস্ত জীবনগত ব্যাপার। দুঃখ ও অনুতাপ পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জাগাইয়া তুলিবে ও শুভ চিন্তা মাত্রই কোন মঙ্গলকর কার্য্যের আকারে ফুটিয়া উঠিবে, ইহাই ধর্ম্ম।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। কাহাকেও নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি সকলকে সাহায্য করিতেন। সত্যের পথে সকল বাধা দূর করিয়া দিতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি উপাসনা ও ধ্যান আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রতি রবিবার বিশেষ ভাবে ধ্যান সাধন করিতেন।

সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আপ-নাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, জীবনের মূল্যও তাঁহার নিকট বাড়িয়া গিয়াছিল। নারীর জীবন সম্বন্ধে সে সময় অনেকের ধারণা ছিল অত্যন্ত হীন। মেয়েরা দুচার খানা বই পড়িয়া, ফ্যাশান্ শিখিবে, যুবকদিগের সঙ্গে সুন্দরভাবে আলাপ করিতে শিখিবে, বিবাহের বাজারে সুন্দর বিক্রেয় সামগ্রীরূপে বিবেচিত হইবে—তাহা হইলেই হইল। তিনি এই নিকৃষ্ট ভাবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন; "শিক্ষায় মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। শিক্ষা অর্থ আমার শক্তির বিকাশ, চরিত্রগঠন। এ বিষয়ে নরনারী উভয়ই সমান।"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে একটা "রয়াল্ কমিশন্" (Schools Inquiry Commission) নির্ব্বাচিত হয়। তাঁহারা ইংলণ্ডের তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। সেই সভায় কুমারী বীল্ সাক্ষ্যদানের জন্য আহুত হন। সেখানেও তৎকালীন শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া, তিনি স্বীয় কলেজে যে প্রকারে যে বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা জ্ঞাপন করেন, এবং সর্ব্বশেষে নিবেদন করেন যে—"শিক্ষার বিষয়গুলি মানবজীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধনের উপায় মাত্র, সেই লক্ষ্যের প্রতিই দৃষ্টি স্থির রাখা কর্ত্তব্য। সেই লক্ষ্যচ্যুত হইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিক্ষাই অসার বিলাসিতার সৃষ্টি করে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন,—"নিতান্ত অসম্ভব না হইলে কন্যাদিগকে কখনও গৃহ হইতে সরাইয়া বোর্ডিংএ রাখিতে নাই। গৃহ সন্তানদিগের ঈশ্বর-রচিত বাসস্থান। গৃহের অভাব বোর্ডিং পূর্ণ করিতে পারে না।"

উক্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে, তিনি

স্বয়ং তাহার সহিত স্বীয় মন্তব্য প্রকাশিত করেন, নানা প্রকার সভা সমিতি স্থাপন করিয়া, নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং স্বয়ং কলেজের উন্নতি সাধন করিয়া, নূতন নূতন স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষার আদর্শ দেখাইতে থাকেন।

তিনি প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, কত সহস্র বালিকা তাঁহার অধীনে বাস করিয়াছে ও অধ্যয়ন করিয়াছে, কত বিভিন্ন চরিত্রকে তাঁহার শাসন করিতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি কোনও দিন কাহাকেও কোন কঠিন শাস্তি দেন নাই। তিনি স্বীয় জীবনকে এরূপ উন্নত ও মহৎ-ভাবে পরিচালিত করিতেন যে তাহার প্রভাবে বালিকা-গণ তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইত। তিনি স্বয়ং প্রত্যেক ছাত্রীর অভাব, দুঃখকষ্ট, দুর্ব্বলতা সব জানিতে চেষ্টা করিতেন, এবং প্রত্যেককে স্বয়ং নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। অধ্যাপনার সময় তিনি কেবল নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিয়াই তৃপ্ত হইতেন না, ছাত্রীদিগের মনে জ্ঞান-পিপাসা আরও প্রবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। কেবল উপদেশের দ্বারা নহে, স্বয়ং জীবনের উন্নত পথে বিচরণ করিয়া মহৎ জীবনের আদর্শ দেখাইতে নিজেকে দায়ী বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য যথেষ্ট ধন সম্পদের অধিকারিণী হইয়াও নিজের আরামের জন্য কখনও এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না। সকল বিষয়ে অতি সাদাসিদে ভাবে চলিতেন। ভৃত্য কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে, কত সময় স্বয়ং নিজের জল-যোগের টেবিল্ প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইতেন, নিজেই জল গরম করিয়া লইতেন। কত সময় হাঁটিয়া ষ্টেশনে যাইতেন। কিন্তু কর্ত্তব্য পালনের সময় অর্থ ও দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অপরের শিক্ষার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন; কলেজের জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াছেন, আহার ও বিশ্রাম ভুলিয়া গিয়া ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

তিনি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে জীবন যাপন করিতেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রার্থনা করিতেন; যথাসময়ে স্নান আহার করিতেন; শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের সংবাদ লইতেন, যথাসম্ভব অপরকে সাহায্য করিতেন; নিজে অধ্যয়ন করিতেন, শিক্ষয়িত্রীদিগকে কায শিক্ষা দিতেন, স্কুলের নূতন নূতন প্ল্যান্ স্থির করিতেন, সভাতে সেই সকল প্ল্যান্ সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে দিনমান গত হইয়া সন্ধ্যা আসিত, কিন্তু কুমারী বীল্ কখনও কোনও সান্ধ্য সমিতিতে যাইতেন না। কারণ তখনও, এমন কি গভীর রাত্রেও তাঁহার কলেজের কাজ শেষ হইত না। সকল কার্য্য সুশৃঙ্খল ও সুন্দর না হইলে, তিনি স্থির হইতে পারিতেন না; এবং সকল সময় আদর্শ অনুযায়ী সকল কার্য্য করিতে পারিতেন না বলিয়া নিজের উপর অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন; কতদিন শক্তির জন্য কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শ ছিলেন নর্দ্দাম্ব্রিয়ার সন্ন্যাসিনী "সেণ্ট্ হিল্ডাজ্"। এই সন্ন্যাসিনী নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী এবং ন্যায় ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার আদর্শ স্বরূপ ছিলেন, এবং সকল বিষয়ে অতি সুন্দর শৃঙ্খলার অনুসরণ করিতেন। তিনি প্রত্যহ এই আদর্শের সহিত জীবন মিলাইয়া দেখিতেন, আত্ম-পরীক্ষা করিয়া ডায়ারীতে লিখিতেন।

তাঁহার ডায়ারী ক্রমাগত কঠোর সংগ্রামের কথায় পরিপূর্ণ—সে এক জীবনব্যাপী সংগ্রাম—আত্মার সংগ্রাম; অপূর্ণতা জয় করিয়া পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার সংগ্রাম। "আমি আরও ভাল করিয়া কেন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতেছি না;" "আরও বেশী পরিশ্রম কেন করিতে পারিতেছি না;" "আমার এই কথাটা কেন আরও কোমল হইল না;" "অমুকের সঙ্গে ব্যবহার ঠিক ভদ্রোচিত হয় নাই;" "আজ এক ঘণ্টা আলস্যে গিয়াছে"; "আজ ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগত হইতে পারি নাই;" "কর্ত্তব্য-পালনে শিথিলতা;" "আমি এত দুর্ব্বল কেন?"; "আরও বিশ্বাস ও নির্ভর চাই;" "তোমার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে শক্তি দাও"—এইরূপ উক্তিতে তাঁহার ডায়ারী পরিপূর্ণ। ৪৫ বৎসর বয়সের সময়ও এই সংগ্রামের বিরাম হয় নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পঞ্চাশ বৎসরের সম্বন্ধ—গভীর প্রেমের সম্বন্ধ— তাহার পরি-

পাম কি হইল, এই চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। মৃত্যু যেন বিভীষিকাময় অন্ধকার বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যু দেহের বন্ধনই ছিন্ন করে, কিন্তু পবিত্র শোকানল প্রজ্বলিত করিয়া আত্মার সম্বন্ধকে নবজীবন দান করে। এই সময় তিনি ডায়ারীতে লিখিয়াছেন,—"চক্ষে সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাই না, কিন্তু অন্তরে সেই প্রেমপূর্ণ আত্মার বর্ত্তমানতা ও নৈকট্য অনুভব করি। মৃত্যু আমাদিগকে ভগবানের নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়।"

অতঃপর তাঁহার ধর্ম্মজীবনে এক কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাঁহার নিকট যেন সমস্ত বিশ্ব অন্ধকার হইয়া গেল। মনে প্রশ্ন জাগিল,—সত্য সত্যই ঈশ্বর আছেন কি না? যদি থাকেন তবে সে কেমন? এই সন্দেহ তাঁহার অন্তরে তুষানলের মত জ্বলিতে লাগিল—তাহাতে শরীর ও মন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল;—তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে আলোকের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন,—দর্শনশাস্ত্র ও ভক্ত কবিদিগের কাব্য সকল পাঠ করিতে লাগিলেন—বিশেষ আগ্রহের সহিত গেটে ও ব্রাউনিংএর কবিতা পাঠ করিলেন। তিনি পুনরায় আলোক দেখিতে পাইলেন; বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। বুঝিলেন, অন্ধকার মুহূর্ত্তেও আমাকে ধরিবার একজন আছেন। এই সংগ্রামের সময় দিনরাত্রি অশ্রুপাত করিয়াছেন, জীবন বিস্বাদ বোধ হইয়াছে এবং কতবার কর্ম্মত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই সংগ্রাম, অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তার মধ্যে একটা ধর্ম্মসম্মিলনের নিমন্ত্রণ আসিল। তিনি সেই সভায় গিয়া বিশ্বাসী ও ভক্ত জ্ঞানীদিগের জীবনের সাক্ষ্যদান মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলেন, এবং তাহার ফলে নবজীবন লাভ করিলেন, জীবনের মহামোহের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, আশা ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল।

তিনি চরিত্রের জন্য, জ্ঞানের জন্য, ভক্তির জন্য এবং শক্তির জন্য চিরজীবন গুরুতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন; কঠোর সংগ্রাম করিয়া, আলোক ও অন্ধকার, আশা ও নিরাশার ভিতর দিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীদিগের সহায়তার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা, জ্ঞানালোচনার ব্যবস্থা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনের জন্য আলোচনা ও পরামর্শের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সেই সকল ব্যবস্থার প্রাণ ছিলেন।

এই রমণীরত্নের জীবনচিত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অঙ্কিত করা সম্ভব নহে। তাঁহার শেষ জীবন কিরূপ হইয়াছিল তাহার আভাষ দিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"গঠন" (Building) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর আছেন কি, তিনি কেমন?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যে সকল বাহ্য বা স্থূল প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়, তাহা অগ্রাহ্য। আমরা জীবনে দেখিতেছি যে তিনি প্রকৃতির ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, এবং তাঁহার নিকটে টানিয়া লইয়া নূতন নূতন সত্য শিক্ষা দিতেছেন। যুগে যুগে তিনিই মানুষকে তাঁহার জন্য ব্যাকুল করিয়াছেন।

"যাঁহারা তাঁহাকে চায়, তাঁহারা যে পায়, তাহার প্রচুর প্রমাণ ইতিহাসে বর্ত্তমান। পবিত্র হৃদয় ও ব্যাকুল আত্মাগণ, তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন এবং তাঁহার প্রেম স্পষ্টরূপে অনুভব করেন। আব্রাহাম, সেক্রেটিস্, বুদ্ধ, মোজেস্ এবং অন্যান্য সাধুগণ তাহার প্রমাণ।

"দেশ ও কালের ভিতর দিয়া ভগবান আমাদিগকে শিক্ষা দেন। কিন্তু তাঁহার কোন শিক্ষাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে, কালে বা সমাজে বদ্ধ থাকিবার বিষয় নহে। তাঁহার শিক্ষা সকলের জন্য।"

অপর একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমরা সময়ের ভিতর দিয়াই ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মানব-জীবনের মধ্যেই ভগবান প্রত্যেক মানবের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত, আলোক বিতরণে ব্যস্ত। কিন্তু জগতে আলোক ও অন্ধকারে সংগ্রাম চলিয়াছে।

"গ্রন্থে লিখিত শব্দ এ অন্ধকার দূর করিতে পারে না। ভগবানের আলোক চাই। * * * আমাদের দাঁড়াইবার স্থান যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহার উপর আমাদের আত্মার বাসযোগ্য গৃহ আমাদিগকেই

নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার বিধি। এইজন্ত পরস্পরের সহায়তা আবশ্যক।”

তাঁহার শেষ উক্তি—“জড়ে চেতনে সেই একেরই লীলা—সমস্ত বিশ্ব সেই এক মহাজ্ঞানের চিন্তালহরী। স্বর্গরাজ্য নিকটে, অন্তরে।”

তিনি নারীজাতির এবং কলেজের প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য সুন্দর পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত উপাধি ও অন্যান্য সম্মান গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তিনি চিরদিন বিনয়ের অবতার ছিলেন, অপরের জন্য সর্ব্বদা স্বার্থ সুখ ত্যাগে তৎপর ছিলেন; এবং সর্ব্বোপরি, বাল্যকাল হইতে ভগবৎ অর্চ্চনায় অটল ছিলেন; সন্দেহের সময়, অন্ধকার মুহূর্ত্তেও প্রার্থনা পরিত্যাগ করেন নাই। প্রার্থনায় অনুরাগ ও নিষ্ঠাই তাঁহার সকল উন্নতির মূল।

রাম-মথুরার রাজলক্ষ্মী সংবাদ

(নাট্য)

স্থান—শয়ন কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

রাম শয্যায় নিদ্রিত। সেই কক্ষে এক নারীবেশ-ধারিণী রামের অদূরে দণ্ডায়মানা। কক্ষের দীপ স্তিমিত প্রায়।

রাম। (নিদ্রাভঙ্গে উপাধানে ভরদিয়া দেহার্দ্ধ উন্নত করিয়া) বৈদেহি, তুমি কোথায়? এ ভাবে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া তোমার উচিত হয় না। একি! কোথায় আমি? কোথায় সীতা? স্বপ্নকে সত্য ব'লে মনে করেছিলাম। অদূরে কে ঐ দাঁড়িয়ে? স্বপ্ন কি সত্যে পরিণত হ'য়েছে? সত্যই কি সীতা আগমন ক'রেছেন? কিন্তু তা ত সম্ভব নয়। ঐ নারী-বেশ-ধারিণী কে? ওঁকে ত সীতা ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। ওঁকে ত আমি ইতি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। ঐ অপরিচিতা কেমন ক'রে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রলেন আচ্ছা ওঁকে জিজ্ঞাসা করি। কল্যাণি, আপনি কে আপনি কার পত্নী? অর্গল-বদ্ধ আমার এই শয়নকক্ষে আপনি কেমন ক'রে প্রবেশ ক'রলেন? আপনার ত যোগ প্রভাব লক্ষিত হ'চ্ছে না; কারণ আপনাকে দেখে শিশির মথিতা পদ্মিনীর ন্যায় মলিনা ব'লে বোধ হ'চ্ছে। আমার নিকটে আপনার আগমনের কারণ কি? জিতেন্দ্রিয় রঘু বংশীয়দের মন স্বভাবতঃই পরস্ত্রী-বিমুখ এই বিষয় বিবেচনা ক'রে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।

অপরিচিতা নারী। মহারাজের জয় হ'ক। মহারাজ, আমাকে মথুরার রাজলক্ষ্মী ব'লে জানুন। মধুদৈত্য মথুরা রাজ্য স্থাপন ক'রে সেই রাজ্যের অশেষ বিধ উন্নতি বিধান করে। তার সুশাসনে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু তার পুত্র লবণ এখন মথুরার রাজা। সে স্বেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী অবলম্বন ক'রেছে। তার অত্যাচারে রাজ্যের প্রজারা ব্যতিব্যস্ত। সে সাধুতপস্বীদের ও সকল প্রকার সৎ কর্ম্মের বিরোধী। মহারাজ, মথুরার প্রজাদের এই মহাভয় নিবারণ ক'রে আমাকে আশ্বস্তা করুন। আমি আপনার অপক্ষপাত সুশাসনের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা করি। আগামী কল্য ভার্গব চ্যবন প্রমুখ মুনিগণ এজন্য আপনার নিকট আগমন করবেন। আপনি তাঁদের নিকট লবণের অত্যাচারের বিষয় সবিশেষ অবগত হ'বেন। (অন্তর্ধান)।

রাম। মথুরার রাজলক্ষ্মী কোথায়? মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছেন। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হ'য়েছে। বৈতালিকদের স্তুতিগান শুনতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে বৈতালিকদের গান।

“উঠ, গা তোল ওহে নৃপমণি
দেখ, প্রভাত হইল সুখ-যামিনী। ইত্যাদি”

রাম। (বৈতালিকদের গীতান্তে)
এখন প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রতে যাই।

(প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

বিদুষী আনন্দময়ী

বিদুষী আনন্দময়ী স্বনামধন্য রাজা রাজবল্লভের বংশোদ্ভবা। তিনি বিক্রমপুর নিবাসী "মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা" রচয়িতা রামগতি সেন মহাশয়ের দুহিতা এবং "হরিলীলা" রচয়িতা কবি জয়নারায়ণ সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। এই বিদুষী মহিলা ১৭৫২ খৃঃ অব্দে উক্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে এককালে বিক্রমপুর মুখরিত ছিল। সেনহাটী, মুলঘর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে নবম বর্ষ বয়ঃক্রমে কালে সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে তাঁহার শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আনন্দময়ী ও তাঁহার খুল্লতাত কবি জয়নারায়ণ সেন "হরিলীলা" নামক সত্য-নারায়ণ ব্রতকথা প্রণয়ন করেন। এই ব্রতকথা প্রচলিত অন্যান্য ব্রতকথা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। "হরিলীলা" হইতে আনন্দময়ীর রচনা পৃথকভাবে নির্দ্দেশ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে, আনন্দময়ীর বংশীয়দের সাহায্যে ও সাহিত্যা-নুরাগী মহাত্মাদের প্রভূত উদ্যমের ফলে তাঁহার লিখিতাংশ যথাসম্ভব সুনিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আনন্দময়ীর রচনা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একভাগে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি; অন্তভাগে সহজ, সুবোধ্য কোমল শব্দের সমাবেশ। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" যে যে অংশ আনন্দময়ীর রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপাদন করিব। যথা :—

হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে পরক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥
কতি চারুবক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা।
সুনাশা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
কতি ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা, সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥
দেখি চন্দ্রভাণে, কত চিত্ত হারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা॥
করে দৌড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠ-দষ্টা॥
অনঙ্গাস্ত্র ভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা।
বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা॥

এ সকল স্থল পাঠে, আনন্দময়ীর সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পদগুলি অনেক সময়ে "ভট্টিকাব্যের" মত নীরস। অষ্টাদশ শতাব্দীর এরূপ সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত ভাষা বিংশ শতাব্দীর পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই। এখন আমরা সহজ রচনার একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভাবি যাই যথা আছ, হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥
যে অঙ্গে কুসুম তুলি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥

এসকল স্থলে অনেকটা কবিত্বের ঝঙ্কার আছে। উপরি-উক্ত সংস্কৃত বহুল কবিতার সহিত ইহার তুলনা করিলে মনে হয় যেন উভয় রচনা একজন কবির লেখনী-প্রসূত নয়। এ দুইটির বিষয় আলোচনা করিলে আনন্দ-ময়ীতে একাধারে কবিত্ব শক্তি, অতুল শব্দ-সম্পদ-পূর্ণতা ও ব্যাকরণে প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দময়ীর প্রতিভা সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। রাজা রাজবল্লভ "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞের প্রমাণাদির জন্য রামগতি সেন মহাশয়কে লিখিলে, অখিল শাস্ত্রজ্ঞা আনন্দময়ী সেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় নিজে শাস্ত্রা-লোচনা করতঃ স্বহস্তে লিখিয়া পাঠান। আনন্দময়ীর

এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া রাজসভায় সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য উপসংহার করিতেছি :—

"অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ; আনন্দময়ী দেবীর যেরূপ রচনা পরিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে।" *

শ্রীহেমচন্দ্র রায়।

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" অবলম্বনে লিখিত।

রূপ ও অরূপের ধ্যান

তিনি ছিলেন—কবি, ভাবুক ও শিল্পী ; কল্পনায় তিনি যাহা দেখিতেন, ভাবে তাহাকে রস-মণ্ডিত করিতেন এবং চিত্রে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতেন ; এতদপেক্ষা অধিক আরো কিছু তিনি গ্রহণ করিতেন, সেটী ছিল,—তাঁর প্রাণের আনন্দ। তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক, নানাভাবের নানা রসের বিচিত্র সঙ্গী। ফুলের সুবাস স্পর্শ, বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, সাগরের কল-হিল্লোল, অনিলের স্নিগ্ধ আলিঙ্গন ও রবির স্বর্ণ আভা তাঁহার সোনালী হৃদয়-হ্রদটী বিচিত্র বেদনার রসে উদ্বেলিত করিত, এবং সকলের মধ্যে তিনি একটা সতেজ আনন্দপূর্ণ প্রাণ অতি নিগূঢ় ভাবে অনুভব করিতেন ; তাঁহার এ ভাব-সৌন্দর্য্য-সম্পদ তিনি নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ রাখিতেন না,—তাঁহার গানে, কাব্যে, বিচিত্রচ্ছন্দ চিত্রে, দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। তাঁহার উপবনের সম্মুখে কলস্বনা যে নদীটী বহিয়া যাইত, তাহার উর্ম্মিগুলি আনন্দের প্রতিবিম্ব রূপে কত কথা বহিয়া আনিয়া উপকূলের কূলে কূলে গান গাহিয়া চঞ্চলপদ বিন্যাসে সাগরের অতল আনন্দে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে ছুটিত। সেই নদীর তীরে সলিলোত্থিত সোপানাবলী পরিমণ্ডিত সুন্দর পুষ্প-উপবনটী কবির স্বীয় আবাস-বাটিকা, নাম তার—অমরা। অমরার সুবিন্যস্ত বৃক্ষরাজি ও লতাকুঞ্জের তলে ভূমিবিন্যস্ত ধারানিবদ্ধ সলিল-রেখা বঙ্কিম পথগুলির পার্শ্বচর রূপে সমস্ত উপবনটী ঘিরিয়া রহিয়াছে। নানা বিচিত্র পুষ্প-শোভিত নানা বর্ণ ও গন্ধ বিমোহিত সমস্ত উপবনটী একটী বৃহৎ পুষ্প-গুচ্ছেরই মত মনোহর।

সোপানে বাঁধা একটী ক্ষুদ্র তরণী তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া তা'র ক্ষুদ্র প্রাণের কোন আকাঙ্ক্ষা বারম্বার প্রকাশ করিতেছিল!

তিনি ফুল বড় ভাল বাসিতেন, ফুলের সম্বন্ধে তিনি অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন, এজন্য দেশের লোক তাঁহার নামকরণ করিয়াছিল—পুষ্পকবি।

পুষ্পকবি সর্ব্বদা ফুলের মধ্যে বিচরণ করিতেন। ফুলের মালা গাঁথিতেন, রাশীকৃত ফুল লইয়া আপনার গৃহাদি সজ্জিত করিতেন ও ফুলবাগানে বসিয়া ফুলের মধু ভরা বক্ষের উপর প্রজাপতির নৃত্য দেখিতেন।

এক দিন তিনি ফুলবাগানে বসিয়া ভাবে বিভোর আছেন, এমন সময় একটী তরুণী মুখখানিতে উষার বিমল আভা ও ঈষৎস্ফুট পদ্ম-কোরকের মত একটী করুণ ভাব লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

সঙ্গীতের ধ্বনি সম্পূর্ণ নীরব না হইতেই কবি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—সমস্ত ফুলের পুরোভাগে যেন উষার লাবণ্য-মহিমা!

বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে কবি প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি?"

তরুণী উত্তর করিল,—"আমি দরিদ্রা—আপনার সেবা প্রয়াসী! উচ্চবংশ-গৌরবে সম্মানিতা হইয়াও দরিদ্রতা নিবন্ধন একার্য্যে ব্রতী হইয়াছি ; জানি আপনি গুণবান্ ও মহৎ।"

কবি করুণার্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম।"

* * *

তরুণী হাজার রকম ফুল লইয়া মালা গাঁথিত, ফুলের

তোড়া তৈরী করিত, এবং তৎসঙ্গে ফুলের মধু ও প্রাণের আনন্দ কবিকে প্রদান করিত।

কবি অপরিসীম তৃপ্তির মধ্যে সর্ব্বদাই মগ্ন থাকিতেন। আনন্দের নেশা উন্মত্ত উন্মাদনার মত তাঁহার শিরা উপশিরাগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছিল, কিন্তু অন্যদিকে তাঁহার অমৃতময় জীবনের নিস্ফলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ভোগ-প্রবৃত্তির যে তৃপ্তি সহজেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়, বিফলতার মর্ম্মবেদনা ও দীর্ঘশ্বাসেই তাঁহার অন্তিম প্রাপ্তি।

তিনি আত্ম-তৃপ্তির মধ্যে ডুবিয়া নিখিল আনন্দের অমরত্ব হইতে ক্রমেই বঞ্চিত হইতেছিলেন। উন্মাদরসে যে বিহ্বল হয়, আত্মহিত চেষ্টা তাহার অসম্ভব।

তরুণীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া কবি তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন, এবং শুভকার্য্য সম্পাদনের জন্য একজন পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

পুরোহিত আসিলেন; তাঁহার পূত শুভ্র শান্ত মহিমা বনবীথি ও পুষ্পদলের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিয়া ফেলিল। কবি তরুণীকে বিবাহের আবশ্যকীয় পুষ্পদল সহ উপস্থিত হইবার জন্য বারম্বার আহ্বান করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না; তিনি তাহার অনুসন্ধানে গৃহের বাহিরে আসিলেন, কিন্তু নানা স্থান খুঁজিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে বারম্বার আহ্বানের পর তরুণীর একটা অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তি গৃহের বহির্দ্বারের পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া কবি দ্রুত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া করুণ কণ্ঠের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন,—"পুষ্পকবি, আমি এত দিন আপনার নিকট ছিলাম, আজ চলিলাম; ধর্ম্মপ্রাণ পরহিতব্রত ভোগলিপ্সাহীন নিষ্কামকর্ম্মী পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হওয়া আমার অসাধ্য। আপনি যে ফুল ভালবাসেন, আমি সেই ফুলের প্রাণ—পুষ্পরাণী।

"নিখিল আনন্দের মর্ম্মের মাঝখানে আমার বাস। আমাকে পাইতে হইলে প্রাণের মধ্যে বিশ্বপতির আসন খানি উজ্জ্বল করুন, ভোগের মধ্যে না যাইয়া যোগের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করুন,—তাহা স্থায়ী ও অক্ষয়। ক্ষমা চাই, আজ বিদায়।"

ছায়া মিশাইয়া গেল। কবি ফিরিয়া আসিয়া পুরোহিতের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন।

পুরোহিতের সাধন ও প্রেমমন্ত্রে কিছুদিনের মধ্যে কবির নয়নের কুহেলিকা বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন—অরূপ বিশ্বরাজের একচ্ছত্র রাজত্ব। ভাষাহারাণ, ভাব ডুবান অতল জলধি!

সেই অবধি কবির গানে, কাব্যে ও ছন্দে এক অপূর্ব্বতা পরিব্যক্ত হইত, কোন্ অচিন্ত্য আনন্দের আভাষ ভাসিয়া বেড়াইত, কোন্ বিরাট রাজ্যের সুবিশাল দ্বার যেন তাঁহার নিকট অর্গল-মুক্ত হইত।

যে বুঝিত, সে বলিত—"হায়! কি আশ্চর্য্য সম্পদ, কবে দেখিব, কবে পাইব!" যে বুঝিত না, সে বলিত—"কবির কাব্যে কিছু বোঝা যায় না, সব অব্যক্ত, অস্ফুট—প্রহেলিকা জড়িত, মিথ্যা—আজগুবী স্বপ্ন।"

কিছুদিন পরে কবি সোপানাবদ্ধ স্বীয় তরণী খানির বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাতে গিয়া বসিলেন; মহাসাগরের স্রোতের দিকে, মহা সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সুর বাঁধিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বহু শতাব্দীর পরেও মহাকবির কণ্ঠ-সঙ্গীত আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

আচার্য্য শ্রীধর স্বামী

শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দুদিগের একটি বিখ্যাত এবং প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। শ্রীধর স্বামী নামক জনৈক পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থের টীকা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত মানব-সমাজে পরিচিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীধরের নামও পণ্ডিত-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

শ্রীধর স্বামী বিবাহ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্ত্রীকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু একদা হঠাৎ তাঁহার এই দুর্দ্দমনীয় মানসিক ভাবের উদয় হইল যে তিনি তাঁহার পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে

ঈশ্বরোপাসনায় দিন কর্ত্তন করিবেন। কিন্তু স্ত্রীর কি উপায় করেন? তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার স্ত্রীকে বলিতে লাগিলেন—"তোমাকে এবং পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি প্রকৃতই আমাকে ভালবাস তবে মুক্ত-কণ্ঠে বিদায় দাও।" শ্রীধরের সহ-ধর্ম্মিণী তাঁহার প্রকৃতি বেশ জানিতেন; তিনি জানিতেন যে তাঁহার স্বামী কখনও উপহাস করেন না, তিনি কথায় যাহা বলেন কার্য্যেও তাহাই করেন। তাঁহার স্বামী যে কি বলিতে চান ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার অবশ্য অনেক সময় লাগিয়াছিল; কিন্তু যখন তাঁহার মনোগত ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখনই শ্রীধর-পত্নী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বামী যথোচিত যত্নের সহিত শুশ্রূষা করায় তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়তম, আমাকে কি করিতে হইবে? আপনার ঈশ্বর আছেন কিন্তু আমার কেবল আপনিই আছেন। স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র জীবনের সাথী—স্বামীই একমাত্র উপাস্য দেবতা। আপনি ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে চলিলেন, কিন্তু আমি ত আর আপনার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব না। দেব, আপনিই এই হতভাগিনীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা; আপনাকে পূজা করিতে না পারিলে আমাকেও যে নিরয়গামী হইতে হইবে! হৃদয়েশ, আমি আপনার কাছ ছাড়া হইয়া জীবনের এই ভীষণ দিবস-যামিনী কি প্রকারে অতিবাহিত করিব?"

অতঃপর স্থির হইল যে যখন তাঁহার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তখনই শ্রীধর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পরিবেন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ সত্বরই শ্রীধরের স্ত্রী এমন এক অবস্থায় উপনীত হইলেন যে অন্য সময়ে তাঁহার এই অবস্থা আহ্লাদজনক হইলেও তৎকালে সেই অবস্থায় তিনি সুখী হইতে পারিলেন না, কারণ যে মুহূর্ত্তে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। সুতরাং যখন প্রসবের সময় উপস্থিত হইল তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অবশ্য-স্তাবী পতি-বিরহ-যাতনা-বর্দ্ধিত প্রসব বেদনা তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পুত্র প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই পতিগত-প্রাণা সাধ্বী সতী শ্রীধর-পত্নী এই মরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

শ্রীধর স্বামী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি এখন মহা বিপদে ঠেকিলেন। একদিকে তাঁহার মৃতা স্ত্রী এবং নবজাত সন্তান, অপরদিকে লোকালয় পরিত্যাগের স্বর্গীয় আদেশ!

"প্রভো, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, বলিয়া দাও," এই বলিয়া তিনি অতি ব্যগ্রভাবে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় ঘটনা ক্রমে একটি টিকটিকীর ডিম্ব তাঁহার কুড়ে ঘরের চাল হইতে মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, খোসার ভিতর হইতে একটী ছোট টিক্‌টিকী বাহির হইল এবং সম্মুখে একটি অতি ক্ষুদ্র পোকা দেখিতে পাইয়া উহাকে আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। "ইহাই স্বর্গীয় আদেশ,"—এই বলিয়া শ্রীধর আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যিনি এই ক্ষুদ্র নিঃসহায় টিক্‌টিকীকে রক্ষা করেন, তিনি ইহার ন্যায় নিঃসহায় আমার সন্তানকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার শিশু সন্তানটিকে সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রতিবেশীরা তখন সেই কুটীরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে মৃতা মাতার পার্শ্বে পড়িয়া নিঃসহায় পুত্র কাঁদিতেছে। জনৈক নিঃসন্তান বিধবা এই শিশুটির ভার গ্রহণ করিলেন।

কালে শ্রীধর একজন অতি বড় "স্বামী" বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থের টীকা করিলেন। এদিকে তাঁহার পুত্র ভট্টনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়া একজন বড় গ্রন্থকর্ত্তা হইলেন। পিতা এবং পুত্র উভয়েই প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুর নিকট পরিচিত। উক্ত ভট্টনারায়ণ কৃত "ভট্টিকাব্য" সংস্কৃত ভাষায় লিখিত,

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। *

শ্রীপ্রেমকৃষ্ণ সেনগুপ্ত।

প্রেম ও প্রলোভন

রমেশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ঐ যুবতীটি?"

পাশেই গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী বিভাবতী উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি আজ একটা পার্টি দিতেছেন। অতিথি অভ্যাগতে তাঁহার গৃহ আজ পূর্ণ। রমেশ বাবুর প্রশ্ন শুনিয়া তিনি তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং যাহার উপর তাঁহার নজর পড়িয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক বল্‌তে পারলাম না আপনাকে, ওটি কে? শ্রীমতী চারুলতা ওকে এনেছেন। আচ্ছা, খবর নিয়ে আপনাকে বল্‌ছি।"

"ব্যস্ত হবার কিছু দরকার নেই। খাম্‌কাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম।"

এমন সময় শ্রীমতী চারুলতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিভাবতী তাঁহাকে বলিলেন, "রমেশ বাবু এইমাত্র জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি যে মেয়েটিকে নিয়ে এসেছেন তার নাম কি?"

"ও আমার মাসতুত বোন। বেলা ওর নাম। ও মোটেই আমোদ পাচ্ছে না, তাই ওকে সঙ্গে করে এনেছি। যে সব মেয়েরা মোটেই আমোদ পায় না তাদের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়।"

"আপনি কি মনে করেন সব মেয়েরই জীবনটা উপভোগ করবার মৌরসী পাট্টা করা অধিকার রয়েছে?" রমেশ বাবু এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হাঁ; বিশেষত যারা সুন্দরী। বেলার চেহারা খানা বেশ সুন্দর বলে বোধ হচ্ছে না আপনার কাছে?"

রমেশ বাবু কথার ঝোঁকটা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া শুধু একটু ঘাড় নাড়িলেন।

কতকক্ষণ পর রমেশ বাবু উঠিয়া গেলেন। তখন শ্রীমতী চারুলতা অতি মৃদুস্বরে শ্রীমতী বিভাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমেশ বাবু নাকি একজন গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী—বড় একজন ডিটেক্‌টিভ?"

"হাঁ, আমিও আজ সুবোধ বাবুর কাছে তাই শুনলুম। কিন্তু এখানে তিনি * * কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে পরিচয় দিয়েছেন।"

*   *   *

এদিকে আহার শেষ করিয়া বেলা সুবোধ বাবু নামক একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত বারান্দার এক পাশে আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুবোধ বাবুর সাথে তাঁহার কোনো দিন পরিচয় ছিল না; আজ হঠাৎ একটু বেশি রকম পরিচয় হইয়া গিয়াছে।

সুবোধ বাবু বলিতেছেন, "পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত উদ্যানেই আমি ভ্রমণ করেছি এবং সকল স্থানেই অনেক অনেক সুন্দর পুষ্প দেখেছি কিন্তু আজকার এই রাত্রির পূর্ব্বে কোনো ফুলকে নিজের জন্যে আহরণ করবার ইচ্ছা আমার হয় নাই।"

বেলা তাঁহার দিক হইতে ঘার ফিরাইয়া মুখ নত করিলেন। কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন, বেলার লজ্জাবনত মুখখানা বিকাল বেলাকার আকাশের মত 'অস্তরবির আবির' মাখিয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া জড়িত কণ্ঠে বেলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ফুল খুব ভালবাসেন—গোলাপ, পদ্ম?"

"হাঁ, গোলাপ, পদ্ম—বেল। আপনার কোন্‌টি সব চেয়ে ভাল লাগে? আপনার নিজের নামীয়টি বোধ হয়?"

তিনি মৃদু হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

"কাল আপনাকে কতকগুলি বেলফুল পাঠিয়ে দেব—আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি নিজেই নিয়ে যাব।"

চকিতে একটা চঞ্চলতা বেলার চোখের উপর দিয়া

---

* The Hindu spiritual Magazine হইতে গৃহীত প্রবন্ধাংশের মর্ম্মানুবাদ।

হইয়া গেল—কপালে শিশির-বিন্দুর মত ঘাম দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "সুবোধ বাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না যে এখানে উপস্থিত অন্যান্য বালিকার মত আমি নই। এরা সব আপনার দলের—সর্ব্বদাই এরা এ পৃথিবীর; কিন্তু আমি এখানে একজন ক্ষুদ্র আগন্তুক মাত্র। আজকেই আমি চলে যাব—আমার ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটীরে—সে কুটীর আপনার পদার্পণের উপযুক্ত নয়।"

"বেলফুল নিভৃত ছায়ায়ই সব চেয়ে ভাল জন্মে। আপনি অন্যান্য বালিকার মত নন্ সেইটেই আপনার বিশেষত্ব। আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে আমাকে প্রবেশাধিকার দিলে আমি সম্মানিত ও সুখী হব।"

তবুও বেলা আপত্তি করিতে লাগিলেন। তখন সুবোধ বাবু তাঁহার একখানা তুষারধবল হাত নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, "আপনিই শুধু কিছু বুঝতে পারেন না। শুধু আপনার বাড়ী গিয়ে দেখা করবার জন্যে নয়, এর চেয়েও একটা বেশী কিছু আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—যাহা এখনো মুখ ফুটে বলতে সাহস হচ্ছে না। কলিকাতায় আমি আর মাত্র পাঁচ দিন আছি; তার পরই লাহোর চলে যাব। অনুগ্রহ করে আমাকে আসবার অনুমতি দিন্ এবং মনে রাখবেন যে আপনার সহবাসে ক্ষুদ্র কুটীরও আমার কাছে রাজপ্রাসাদ বলে মনে হবে।"

এমন সময় একজন লোক কাছে আসিয়া বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে আমি একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি। অনুমতি হলে এখন বলতে পারি।"

* * * *

সংবাদ নিয়া আসিয়াছিলেন রমেশ বাবু। বেলাকে এক পাশে সরাইয়া নিয়া তিনি বলিলেন, "গবর্ণমেন্টের কাছে হতে আমার এ সংবাদ। আমি জানি আমাদের শিক্ষিতা বাঙ্গালী রমণীরা খুব বিশ্বাসী। আশা করি আমার এ সংবাদ আপনি খুব গোপনে রাখবেন।"

বেলা বলিলেন, "আপনার কথা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না। বোধ হয় আপনি ভুল করে আমার কাছে এসেছেন।"

"মোটেই নয়। অবিশ্যি আরো খুব ধীরে ধীরে এসব কথা উত্থাপন করা উচিত ছিল, কিন্তু সময়ের নেহাৎ অভাব। যে অনুগ্রহটি প্রার্থনা করবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি সেটি বেজায় জরুরী; দেরী করবার অবসর নাই।"

"অনুগ্রহ!"—বেলা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি আজ একজন খুব বড় রাজনীতিজ্ঞ স্বদেশীওয়ালার সহিত পরিচয় করেছেন; এবং যদিও সে একজন অদম্য প্রেমিক ও আপনাকে দেখে খুব মোহিত হয়েছে তবু আমার মনে হয় বিয়ে করবার মত লোক সে মোটেই নয়। আমি জানি প্রবল ঢেউয়ের মত তার প্রেম হঠাৎ এক বার বেলাভূমিকে আঘাত করে আবার পূর্ব্বের মত সংসার-স্রোতে ভেসে চলে যায়: আট্‌কে রাখতে পারে কারু সাধ্যি নাই। তার প্রেমের এ প্রথম উচ্ছ্বাসের সময় আমার মনে হয়, আপনি একটি সংবাদ তার নিকট হতে সংগ্রহ করে আমাকে জানাতে পারবেন।"

বেলা ইহার বিরুদ্ধে বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি এই মাত্র আপনার সমস্ত ইতিহাস জান্‌তে পেরেছি। আপনার এক বৃদ্ধা মা আছেন, তিনি এখন পীড়িত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত। টাকা হলে আপনি আবার তাঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন। আপনার নামে দশ হাজার টাকা আমি ব্যাঙ্কে জমা রাখব; পাঁচদিনের ভিতর যদি সে সংবাদটি আমাকে দিতে পারেন তবে সে অর্থ আপনার হবে। সংবাদটি বিশেষ কিছুই নয়;—সুবোধ বাবুদের খুব বড় একটি স্বদেশী দল আছে; গোপনে উহার অধিবেশন হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট কিছুতেই উহার খোঁজ করতে পারছে না। আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না—আগামী অধিবেশন কোথায় হবে শুধু সেই জায়গাটির নাম তার কাছ থেকে জেনে বলবেন—শুধু সেই নামটি। এতে আপনার কোনো অপরাধ নেই বরং গবর্ণমেন্টের কাজে সাহায্য করলেন।"

"কিন্তু সে যে অসম্ভব! সুবোধ বাবুর উপর আমার কোনো হাত নেই, যদিই বা থাক্‌তো তা হলেও আমি তা কক্‌খনো তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতুম না। এবং এ ছাড়া, এরূপ একটা গোপন বিষয় তিনি আমাকে জানাবেনই বা কেন?"

"আপনি কেন সুবোধ বাবুকে বলুন না যে আমি এইরূপ একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছিলুম কিন্তু আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর কোনো প্রকারে আপনাদের মেয়েলি আর্ট খাটিয়ে কথাটা বের করা কিছু কঠিন হবে না। এই আমার ঠিকানা দিলুম। পাঁচ দিনের ভিতর আমাকে তার করলে * * ব্যাঙ্কে আপনার জন্যে দশহাজার টাকা গচ্ছিত থাকবে। আমি কক্‌খনো এ সংবাদ কাহারো কাছে প্রকাশ করব না। এর পর আপনার ইচ্ছা হলে স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনি সুবোধকে বিয়ে করতে পারবেন। কারণ, ইহাদ্বারা আপনি তার কোনো ক্ষতি করছেন না। সে একটা রাজনৈতিক ভুল করতে যাচ্ছে বরং তা হতে তাকে আপনি আরো বাঁচালেন। বলতে গেলে আপনি ইহাদ্বারা তার উপকারই করলেন। আমি এখন যেতে চাই। আশা করি আপনার ভবিষ্যৎ সুখের হবে। টাকা দিয়ে সুখ কেনা সম্ভব। রোদ থাকতে খড় শুকিয়ে রাখুন!"

বেলা যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন দুটি কথা তাঁহার মনে তোলপাড় করিতেছিল—"কাল আপনাকে কতকগুলি বেলফুল দিয়ে যাব" আর "আপনার নামে দশহাজার টাকা জমা থাকবে।"

শ্রীমতী বিভাবতীর বাড়ীর ভোজের পর তিনদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। এই তিন দিনে বেলার তিনটি অবস্থা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

প্রথম, তাঁহার মাতার পীড়া খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং ডাক্তার বলিয়াছেন, যদি তাঁহাকে বাঁচাতে হয় তবে অবিলম্বে তাঁহাকে কোনো শৈলাবাসে নিয়া যাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, তাঁহার নিকট একখানি পত্র আসে। উহার ভিতর শুধু লেখা ছিল—দশ হাজার টাকা ও রমেশ বাবুর ঠিকানা।

তৃতীয়, সুবোধ বাবু রোজ রোজ তাঁহাকে কতকগুলি ফুল উপহার দিয়া যাইতেন; এবং তিনি নিজ হইতে এমন সব অধিকার বেলাকে দিয়াছিলেন যে বেলা সহজেই রমেশবাবুর অনুরোধ পালন করিতে পারিতেন।

এমন সব অনুকূল অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল যে বেলা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই এই প্রলোভন চরিতার্থ করিতে পারিতেন। রমেশ বাবুর কথিত সুবোধ বাবুর গুপ্ত সভার কথা মনে হইলেই সুবোধ বাবুর উপর বেলার একটা ঘৃণার ভাব আসে। তখন সে ভাবে, "সুবোধ বাবুর সমস্তই হয় ত ভণ্ডামী, তিনি যদি ভাল লোক হবেন তবে এমন সভার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন কেন, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সন্দেহের উদ্রেক করে, ছিঃ!" আবার তখনই ভাবে, "তাঁহার এত সরলতা, এত স্নেহ, এত ভালবাসা, সমস্তই কি মিথ্যা?—অসম্ভব।"

সুবোধ বাবু একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার মত এরূপ ভাবে এ পর্য্যন্ত কোনো রমণী আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয় নাই। আমার হৃদয়ের প্রেম, বিশ্বাস, ভক্তি এ সমস্তগুলিই তুমি অধিকার করে বসেছ। তোমার এই কোমল ক্ষুদ্র হাত দুটির ভিতর আমার জীবন, সম্মান, সব স্থাপন করতেও আমি একটু কুণ্ঠিত হব না। যদি তেমন কোনো গোপন বিষয় থাকতো, তবে এখনি তা দিয়ে আমি ইহা প্রমাণ করে দিতে পারতুম!"

তিনি থামিলেন। বেলাও চুপ করিয়া রহিলেন, যদিও তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছিল—'দশহাজার টাকা আর রমেশবাবুর ঠিকানা!'

সুবোধ বাবু বলিলেন, "আমাকে আবার কাজে ফিরে যেতে হবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সুখস্মৃতি ও আশা বহন করে নিয়ে যাব। তুমি কেন তোমার প্রেমের নিশ্চয়তা দিয়ে আমাকে আরো সুখী ও সাহসী করে দাও না, যেন, যখন আমি ফিরে আসব তখন আমার সমস্ত হৃদয় মন যেন বলে উঠতে পারে আমি তোমারই কাছে ফিরে এসেছি?"

তিনি বেলার দুটি হাত নিজ হাতে সংবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমাকে ভালবাস তুমি, বেলা?"

বেলা সহসা কোনো উত্তর দিলেন না; রমেশ বাবুর কথাগুলি তাঁহার মনে হইতে লাগিল—'অদম্য প্রেমিক বটে কিন্তু বিবাহ করবার মত লোক নয়।' অবশেষে তিনি চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং শুধু বলিলেন, "হাঁ।"

সুবোধ বাবু কম্পিত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন,, "এখন আমি প্রফুল্লচিত্তে আমার কাজে ফিরে যেতে পারব। নেহাৎ জরুরী কাজ, তাই আমাকে যেতে হচ্ছে, নতুবা তোমাকে ছেড়ে কক্‌খনো যেতুম না। যে কাজের জন্যে যাচ্ছি তা খুব গোপনীয়। সেই গোপন বিষয় তোমার হাতে দিয়ে, তোমার প্রতি আমার কেমন ভালবাসা তা প্রমাণ করব।" এই বলিয়া তিনি একটি পকেটবুক বাহির করিলেন এবং তাহার ভিতর একটি খোলা এন্‌ভেলোপে মোড়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই এন্‌ভেলোপের ভিতর, কি ভাবে আমি কাজ করব এবং আমাদের সভার অধিবেশন কোথায় হবে তাহার নাম লেখা রয়েছে। এ দিয়ে তুমি আমাকে যা' ইচ্ছা তাই করে ফেল্‌তে পার। এখন তবে আসি; সন্ধ্যায় একবার এসে শেষ বিদায় নিয়ে যাব।"

বেলার হাতে সেই খোলা এন্‌ভেলোপটি দিয়া সুবোধ বাবু চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন। বেলার ঘরে গিয়া দেখেন, তিনি একটি চেয়ারের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ খুব ম্লান, চিন্তাক্লিষ্ট, চোখ ছল ছল।

তিনি বলিলেন, "সুবোধ বাবু, এই আপনার চিঠি, আপনি এখনি এটা নিয়ে যান। আপনার সঙ্গে পরিচয় না হওয়াই আমার ভাল ছিল। মা কাল এক পল্লী-বাড়ীতে চলে যাচ্ছেন এবং আমিও একটা মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারী নেব, যেন তাঁকে সাহায্য করতে পারি। আপনি আর আমি দুই পৃথিবীর জীব। আমাকে যে সব অনুগ্রহ দেখিয়েছেন সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু—" পরে মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমি চাই আপনার সম্মুখ হতে দূরে যেতে। এখনি আপনি আমাকে মুক্তি দিন।"

সুবোধ বাবু স্মিতমুখে চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন।

"তুমি এই পৃথিবীরই জীব কিন্তু তবু এই চিঠিটা খুলে ইহার ভিতরকার গোপন কথাটা জানবার প্রলোভন হতে তুমি নিজকে রক্ষা করেছ। তবে কি আমার কাজকর্ম্মের প্রতি—আমার প্রতি তোমার এতটুকু কৌতূহল নেই?"

"আপনি কি করে জানেন যে আমি এটা খুলিনি?"

"সে আমি দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার সামনেই আমি খুলে দেখাচ্ছি যে তুমি এটা খোল নি।" এই বলিয়া তিনি এন্‌ভেলোপটা খুলিলেন। উহার ভিতরে আরেকটি বন্ধ করা এন্‌ভেলোপ ছিল এবং আটা দিয়া বাহিরের এন্‌ভেলোপের সহিত সেটা আবদ্ধ ছিল।

তিনি বলিলেন, "এটা না ছিঁড়ে তুমি কক্‌খনো খুল্‌তে পারতে না। তা ছাড়া এটা দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে খোলা হয়নি। আমার গোপন কথাটা এরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা লেখা ছিল যে আমি ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে পারত না। তোমাকে এ কথাটা আমি বলছি শুধু এই জন্যে যে তুমি ভেব না যে নেহাৎ হালকা ভাবে আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে আমি তার গুরুত্ব নষ্ট করে দেব।" তিনি চিঠিখানা পকেটে পূরিয়া স্মিতমুখে বেলার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং আবেগভরে তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "রমেশ তোমাকে যে টাকা ঘুস দিচ্ছিল, কেন তুমি তা নিলে না?"

"জান তুমি?"—বেলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিয়া উঠিল।

"নিশ্চয়; রমেশ যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যই আমার এ খেলা। নতুবা সভা সমিতি কিছু নয় ত বেলা! তুমি কি মনে কর বেলা, যে আমি একটা সন্দেহজনক রাজনৈতিক সমিতির সঙ্গে সংস্রব রাখ্‌ব? রমেশ ডিটেক্‌টিভ্ নয়, আমারই ইচ্ছাক্রমে সে এই রূপ মিথ্যার অভিনয় করেছে। এনভেলোপে যা লিখেছিলেম, এই দেখ।" এই বলিয়া চিঠি খানা খুলিয়া সুবোধ বেলার সম্মুখে ধরিলেন; বেলা

দেখিলেন, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "আমি তোমাকে ভালবাসি।" বেলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সুবোধ বাবুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন সুবোধ বাবু তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এখন বল আমাকে, রমেশ তোমাকে যে টাকা ঘুস দিচ্ছিল, কেন তুমি তা নিলে না, বেলা ?"

"কেন ?—আমি যে তোমাকে ভালবাসি, এবং তোমার সম্মান তোমার নিজের কাছে যেমন প্রিয় আমার কাছেও যে তেমনি।"

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

রমণীর কার্য্যক্ষেত্র

আমাদের জন্মভূমি অমূল্য রত্নরাজিপূর্ণা এবং শস্য-সম্পদশালিনী। পৃথিবীতে আমাদের দেশের তুল্য আর দেশ নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক্ দিয়া দেখিলেও কি অত্যুন্নত পর্ব্বত, কি সুদূর প্রবাহিনী নদী, কি মনোরম শস্যক্ষেত্র, কি তরঙ্গোচ্ছ্বাসিত বিশাল জলধি, কি সৌধমালা-বেষ্টিতা সুসজ্জিতা নগরী, সকলই ভারতবর্ষে বিদ্যমান।

জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মনে পড়ে, পুণ্য বেদগান-মুখরিত আশ্রম, ওঁকার শব্দে নিনাদিত কানন! আসমুদ্র হিমাচলাধিপতিও যৎসামান্য ফলমূলাহারী বনচারী ঋষির পদতলে লুণ্ঠিত! আবার মনে পড়ে, দেশ বিদেশাগত সুধীজন-সভা, রমণী ও পুরুষ তুল্যরূপে শাস্ত্রালোচনা করিয়া, অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন। জনকের সভায় মহীয়সী গার্গী দণ্ডায়মানা হইয়া শাস্ত্রীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভারতমাতা তখন জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু বর্ত্তমান ভারত কি সেই ভারতই রহিয়াছে ? সে সকল এক্ষণে অতীতের সুদূর স্মৃতি মাত্র। ভারত-মাতা আজ কালিমাময়ী, ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্না।

শ্রদ্ধেয়া মহিলাগণ, একথা বলার পর আমাদের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উদয় হয়,—যে দেশ একদিন সমস্ত পৃথিবীময় জ্ঞানের ও সত্যের উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়াছে, আজ সেই দেশই জ্ঞান-সত্য হইতে বিচ্যুত কেন ?

পরমেশ্বর এই বিশাল জগতের মানবমণ্ডলীকে স্বভাবতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, নর ও নারী। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নর, অপরার্দ্ধ নারী। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী যেরূপ অর্দ্ধাঙ্গ চালনে সক্ষম হইয়াও কোন কার্য্যই করিতে পারে না, তেমনি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ বিনষ্ট হইলে, সমগ্র সমাজেরই কার্য্য-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপা রমণী জাতি অশিক্ষিতা, সুতরাং কার্য্যের অনুপযুক্তা, তাই আমাদের দেশ আজ জগতের অন্যান্য সভ্য দেশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। সমস্ত দেশ ঘোরতর অন্ধকার ও আবর্জ্জনা-রাশিতে পূর্ণ। যদি আমরা দেশের প্রকৃত উন্নতি দেখিতে চাই, তবে এই আবর্জ্জনারাশি দূর করিতে হইবে। কিন্তু সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ কি প্রকারে এই আবর্জ্জনারাশি দূর করিবেন, যদি অপরার্দ্ধ রমণী তাঁহাদের সাহায্য না করেন ? যদি স্নেহময়ী রমণী, মাতা, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণী রূপে তাঁহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়-মানা হন, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের গুরুতর দায়িত্ব-ভারও বোধ হয় অনেকটা লাঘব হয়।

এক্ষণে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে, আমরা কোন্ কার্য্যের উপযুক্ত ? কোন্ কার্য্যে আমরা তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারি! আমাদের কর্ত্তব্য কি ? আমাদের মনে হয়, সুশিক্ষালাভই আমাদের জীবনের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ, সুশিক্ষা দ্বারা যাঁহার মন বিকশিত হয় নাই, বিবেক যাঁহার কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শনে অগ্রসর হয় নাই, তাঁহাতে ও পশুতে প্রভেদ অতি অল্প। জ্ঞান ও চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষতা দ্বারাই মানব পশু হইতে বিভিন্ন। আমরা যদি সেই জ্ঞানলাভ ও তজ্জনিত হৃদয়ের উৎকর্ষতা হইতে বিচ্যুত হই, তবে আমাদিগেতে ও পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায় ? স্কুল কলেজে না পড়িলে যে শিক্ষালাভ হয় না, আমরা তাহাও

বলিতেছি না। কিন্তু স্কুল কলেজে পড়িলে, পড়া নিয়মিত হয়, অনেক প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ব্যবহারিক জ্ঞানও অনেক লাভ করা যায়। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, আমরা লেখাপড়া শিক্ষা করিব, অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে নয়, আমরা শিক্ষা লাভ করিব শুধুই মনের উদ্দাম জ্ঞানপিপাসাকে বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য, এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য। যদি আমরা উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারি এবং প্রকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইতে পারি, তবেই আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, এবং আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব।

তবে একটা কথা উঠিতে পারে, রমণীগণের কার্য্যক্ষেত্র কোথায়? হিন্দু-কুল-ললনারা বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্ক খুব কমই রাখেন, শারীরিক শক্তি দ্বারা সাহায্যের পথও তাঁহাদের পক্ষে একপ্রকার রুদ্ধ। সুতরাং এক্ষণে চিন্তার বিষয়, তাঁহারা কি প্রকারে সমাজের সাহায্য করিয়া স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারেন।

আমাদের দেশ রমণীদিগকে সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিতা করা হইয়াছে। রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি, হাতা বেড়ীর গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহারা আবদ্ধ। তাঁহারা যেন কোনও কার্য্যেরই উপযুক্ত নহেন। সমাজের সহিত তাঁহাদের যেন কোনও সম্পর্কই নাই। তাঁহাদিগকে সমাজের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতেও যেন পুরুষেরা রাজি নহেন।

কিন্তু, দয়াময় পিতা এই বিশাল ধরণী সৃজন করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র তৃণ, কীট, পতঙ্গ হইতে রবি-শশী-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সুসজ্জিত অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই সৃষ্ট। আমরা দেখিতে পাই, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত, এমন কি প্রত্যেকটী ধূলিকণা ও তৃণ গাছিও বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই। সকলেই পৃথিবীতে আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত, শুধু রমণী জাতিই কি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছেন? সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীর কি কোনও আবশ্যকতাই নাই? ইহাও কি সম্ভব? আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, আমাদের কর্ত্তব্য কি, কার্য্যক্ষেত্র কোথায়?

রমণী-হৃদয় মমতার খনি, প্রেমের ভাণ্ডার বিধাতা-প্রদত্ত, মহা সম্মানিত মাতৃপদ তাঁহাদের। একদিকে তাঁহারা যেরূপ কুসুম-কোমলা, অপর দিকে তাঁহাদের হৃদয় বজ্রাদপি কঠোর। জগতের বীরত্বের প্রস্রবণ বীরমাতা হইতেই উদ্ভূত। নেপোলিয়নকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ফ্রান্সকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? তিনি উত্তর করিলেন—

"ভাল মাতা"

শৈশবে শিশু মাতৃ-ক্রোড়েই পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই সময় হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। উপযুক্ত জননী আপন হৃদয়নিহিত সদ্‌গুণরাশি সন্তান-হৃদয়ে ঢালিয়া দেন, এবং ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা স্বদেশের ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল হয়।

আমরা পড়িয়াছি, "সংসার-রাজ্যের মাঝে অন্তঃপুর রাজধানী। পরম মহিমাময়ী রমণী তাহার রাণী।" সত্য কথা নয় কি? প্রত্যেকটী পরিবারের ভার গৃহকর্ত্রীর উপর ন্যস্ত। তিনিই তাহার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি যদি আপন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তবে, সংসারে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজিত থাকে। আমরা কত সময় দেখিয়াছি, গৃহকর্ত্রীর দোষে এক একটী পরিবার সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইয়াছে।

যে সকল নারী সংসার হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত, এবং যাঁহাদের সাংসারিক বন্ধনও তত দৃঢ় নহে, তাঁহাদের শূন্য জীবন পূরণ ও জীবনের সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত সেবাই উৎকৃষ্ট। স্বভাবতঃ স্নেহ-প্রবণ মহিলাগণ, যদি তাঁহাদের অন্তরের ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি অনাথ অনাথাদের সেবায় ঢালিয়া দেন, তবে কি তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা হয় না? আমরা "কুরুক্ষেত্রে" দেখিয়াছি, জননী সুভদ্রা দেবীবেশে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। তাঁহার আবির্ভাবে হতভাগ্যদিগের যাতনার যেন উপশম

হইত। তিনি শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে, সকলের সেবাতেই একেবারে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটী বচন পাঠ করিলে তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মে। সুলোচনা বলিতেছেন:—"তোমার কি শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, দিনরাত মরা খেটে মরছ?"

সুভদ্রা উত্তর দিলেন:—

"না দিদি আমরা নারী, বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা সম অজস্র-জননী প্রেম,
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সেতো ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার।
শত্রু, মিত্র তরে যার, সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার।"

কি মহাপ্রাণতা! কি পবিত্র নিষ্কাম প্রেম!! আমরা নিষ্কাম প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি এই নারীকে দেখিয়া মোহিত হইয়া যাই।

এবার রমণী-জীবনের আর এক দিক্ দেখিতে চেষ্টা করা যাক্! কি মহান্ কর্ত্তব্যভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। সমস্ত ভবিষ্যৎ জাতির আশা, ভরসা এক আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। শিক্ষিতা রমণী দেশের রত্নস্বরূপা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ। যে দেশ যে জাতি এই অমূল্যরত্নের অধিকারী, সেই দেশ, সেই জাতিই উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে পারেন। আমরা যদি আমাদের প্রিয়তমা জন্মভূমিকে উন্নত করিতে ইচ্ছা করি, জগতের সকল দেশের মধ্যে ভারতমাতার শীর্ষদেশ সর্ব্বোচ্চ করিতে ইচ্ছা করি, তবে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যে শিক্ষা মানব-হৃদয়কে উন্নত করে, অন্তঃকরণ উদার করে, নরনারীকে সমভাবে ভ্রাতাভগিনীরূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়, সেই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন। *

শ্রীসুনীতিবালা গুপ্ত।

* গৌহাটী মহিলাসমিতিতে পঠিত।

বনলতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া আমিয়াস আস্তে আস্তে জননীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইলেন, ফ্রাঙ্ক জননীর কোলে মাথা রাখিয়া বসিয়াছেন, উভয়ে নীরব। আমিয়াস্ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। জননী ধীরে ধীরে ফ্রাঙ্কের মুখ তুলিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ফ্রাঙ্ক উত্তর করিলেন, "হাঁ মা, তোমার কাছে লুকাইব কেন? আমার কোন কথাই কোন দিন তোমার কাছে লুকাই নাই, আজও লুকাইব না। কিন্তু সাবধান, আমিয়াস যেন ঘুণাক্ষরেও একথার কিছুই জানিতে না পারে।" এমন সময়ে তাঁহাদের দুজনের চক্ষুই আমিয়াসের উপর পতিত হইল। জননী চক্ষের ইঙ্গিত দ্বারা আমিয়াসকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমিয়াস চলিয়া গেলেন। আমিয়াসের মনে একটা ভয়ানক খট্‌কা বাঁধিয়া গেল। তাঁহার কাছে গোপন করিতে জননীকে অনুরোধ করা হইল—সে কথা কি? চক্ষের নিমেষে যেন দৈবালোকে আমিয়াসের মনের সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। গত রজনীর প্রেমসঙ্গীতের অর্থ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মন প্রাণ ঢালিয়া কার উদ্দেশে ফ্রাঙ্ক তাঁহার হৃদয়ের গভীর প্রেম নিবেদন করিতেছিলেন, তিনি বুঝিলেন, প্রেম-রাজ্যে ভাই ভাই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—ফ্রাঙ্কও রোজ সল্টার্ণের পাণিপ্রার্থী।

এই কথা উপলব্ধি করিবা মাত্র আমিয়াসের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, নিজের মাথাটাকে দুই হাতে ধরিয়া তিনি বেশ করিয়া ঝাঁকিয়া দিলেন—যেন অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্ককে জোর করিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে চাহিতেছেন। তারপর কিছুক্ষণ তিনি উন্মাদের মত প্রবল বেগে সেখানে বেড়াইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার মস্তিষ্ক কতকটা

শীতল হইল; তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিছুক্ষণ পর প্রাতরাশের জন্য ফ্রাঙ্ক তাঁহাকে ডাকিলেন, আমিয়াস গৃহে প্রবেশ করিলেন। যথারীতি মাতা ও পুত্র-যুগল আহারে বসিলেন। আমিয়াস সর্ব্বদাই ভীমের ন্যায় ভোজন করিতেন, আজও তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হইতেছে না দেখিয়া জননী আশ্বস্ত হইলেন। আমিয়াস পুনঃ পুনঃ চা ঢালিয়া পান করিতেছেন দেখিয়া জননী হাসিয়া বলিলেন, "বাছা আমিয়াস, এত চা পান করিও না, মাথা গরম হইবে; শুনিয়াছ ত চা-খোরেরা স্বপ্নেও চা দেখে, চায়ের কথাই অধিকাংশ সময় ভাবে!"

আমিয়াস বলিলেন, "তাহ'লে যাহারা জল পান করে তাহারা শুধু জলই স্বপ্ন দেখে, আর তাহাদের চিন্তাও বুঝি জলের মতই তরল!"

জননী উত্তর করিলেন, "মেঘও ত জল, আকাশের রামধনুও জল। মেঘ দেবতাদের বাহন, আর রামধনু পৃথিবীতে ভগবানের শান্তির চিহ্ন।"

আমিয়াস জননীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন; তিনি ফ্রাঙ্কের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শোন মা, শোন দাদা, তোমাদিগকে আমার একটা গল্প শুনিতে হইবে," এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফ্রাঙ্কও সেই মুহূর্ত্তেই উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমিয়াস বলিলেন, "তুমি বাইবেলে উল্লিখিত রাজা দায়ুদ, তুমি তোমার সিংহাসনে বস। তুমি জান, দায়ুদ সুগায়ক ও সুবাদক ছিলেন, দেখিতেও অতি সুন্দর ছিলেন। হে রাজন! তোমার নিকট আমার এক নিবেদন আছে; এক নগরে এক ধনী ও এক দরিদ্র বাস করিত, ধনীর অতুল ধন সম্পদ ও বন্ধুবান্ধব ছিল, ইচ্ছা করিলেই তিনি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসীকে বিবাহ করিতে পারিতেন; কিন্তু দরিদ্রের আর কিছুই ছিল না, ছিল শুধু—" বলিতে বলিতে আমিয়াসের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। ফ্রাঙ্ক তখন চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমিয়াস, ভাই আমার, থাম থাম, আমি আর সহিতে পারি না। হে ভগবান! আমার মাথায় এই সাংঘাতিক খেয়াল চাপানোই কি যথেষ্ট হয় নাই, ছোট ভাইয়ের নিকট ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িবার লজ্জাও আমাকে পাইতে হইল?"

আমিয়াস আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "ইহাতে লজ্জার কথা কি আছে দাদা! শোন দাদা, বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি এতক্ষণ এই কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। আমি একটা আস্ত গাধা, তাই গত রাত্রে তোমাকে এ সকল কথা বলিয়াছি। তুমি অবশ্যই রোজকে ভালবাস—সকলেই তাকে ভালবাসিতে বাধ্য, আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই আগে একথা আমার মাথায় আসে নাই। তুমিও তাকে ভালবাস, ইহাতেই প্রমাণ যে তোমার রুচি আর আমার রুচি এক। ইহাতে আমাদের উভয়েরই রুচির প্রশংসা করিতে হয়। তারপর এখন কথা,—কে তাকে পাবে? তার মীমাংসা অতি সহজ; তুমি জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তুমিই তাকে পাবে। আর দেখ দাদা, যদিও আমি তোমার মত পণ্ডিত নই, তথাপি তোমাতে আমাতে পার্থক্য কি, তাহা যে আমি না বুঝি তা নয়। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আমার জয়ের কারণ একটি থাকিলে তোমার শতটি কারণ আছে; আমি কি এতই বোকা, যে বাতাস ও স্রোত দুয়েরই বিরুদ্ধে তরী ভাসাইব? অবশ্য একথা বুঝি, আমি তার অনুপযুক্ত নই, কিন্তু তুমি উপযুক্ততর। ভাল কুকুর দৌড়াইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টটাই শিকার ধরিতে পারে; সুতরাং এই বিষয়ে আমার আর কিছুই করণীয় নাই। তুমিই তাহাকে বিবাহ করিবে, এই ঘর সংসার তোমাকেই বজায় রাখিতে হইবে; আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সংসারের ঝঞ্ঝাট বহন করা আমার কর্ম্ম নয়। আমি সৈন্য বিভাগে চাকরি লইয়া আয়র্লণ্ডে চলিয়া যাইব, দরিদ্রতার ন্যায় কামানের গোলাও মাথা হইতে প্রেমের চিন্তা দূর করিতে পারে।" এই বলিয়া আমিয়াস বসিয়া পড়িলেন এবং পুনরায় ভোজনে মন দিলেন। মিসেস লে'র চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "না আমিয়াস, তোমার এত দিনের আশা আমার জন্য এমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি কিছুতেই দিব না। দেখ মা, আমার এত বিদ্যা,

এত পাণ্ডিত্য সবই বৃথা—যদি এই সরল নাবিক-বালকের নিকট আমি ভদ্রতার পরীক্ষায় হারিয়া যাই!"

"বাছারা তোমাদের কাহাকে আমি বেশী ভালবাসিব? তোমাদের দুজনের মধ্যে কার অন্তর বেশী মহৎ? ফ্রাঙ্কের স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আমি আজ প্রাতঃকালে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি আমি দুটি পুত্ররত্নের অধিকারিণী!"—এই বলিয়া মিসেস্ লে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। দুই ভাইয়ের সংগ্রাম তখনও চলিতে লাগিল।

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "কিন্তু প্রিয় আমিয়াস,—"

"কিন্তু ফ্রাঙ্ক, তুমি যদি এখন না থাম, আমাকে বাধ্য হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। অনেক কষ্ট করিয়া আমি স্থির মীমাংসা করিতে পারিয়াছি, এখন আর তোমাকে আমার সেই মীমাংসা পরিবর্ত্তন করিতে দিতে পারি না।"

মিসেস্ লে মাথা তুলিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "আমিয়াস, আজ প্রাতঃকালে ফ্রাঙ্ক আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া রোজকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা চিরকালের তরে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

"তবেই ত! আমি তবে দাদার অনুকরণ করিব না কেন? আমি তাঁহার কাছে হারিব কেন?" এই বলিয়া আমিয়াস দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সবলে তাঁহার সুদীর্ঘ বাহু দ্বারা ফ্রাঙ্কের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এখন ওসব কথা থাকুক ফ্রাঙ্ক, চল আমরা ওসকল কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই। এখন আমাদের মায়ের কথা, এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের কথা ভাবিবার সময়। কোন স্ত্রীলোকের জন্য মাথা না ঘামাইয়া এখন আমাদিগকে বংশ-গৌরব রক্ষায় মনোযোগী হইতে হইবে। আমি বাস্তবিকই একটা নীরেট গর্দ্দভ! এই কয় বৎসর সমানে নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি যথোচিত মনোযোগ না দিয়া সুধু রোজের স্বপ্নই দেখিয়াছি!—অথচ জানি না সে তার পিতার কর্ম্মচারীদিগের জন্য যতটা ভাবে আমার জন্য ততটুকুও ভাবে কি না!"

"আমিয়াস, তোমার প্রত্যেক কথা আমাকে নূতন করিয়া লজ্জা দিতেছে। তুমি কি জান, যে আমার প্রতি তাহার মনের ভাব কি, আমিও তার কিছুই জানি না!"

"আমাকে একথা বলিয়া আমার মনে বৃথা আশা জাগাইতে চেষ্টা করিও না। সে যদি নিতান্ত বুদ্ধিহীনা না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসে, আর যদি সে তোমাকে ভাল না-ই বাসে তবে অমন মেয়ে আমাদের ঘরে কিছুতেই আসিবার উপযুক্ত নয়।"

"প্রিয় আমিয়াস, তুমিও আর আমার নিকট এসব কথা বলিও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া এসকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছি।"

"আজ সকালে ত পরিত্যাগ করিয়াছ? সে চিন্তা এখনও অনেক দূর যাইতে পারে নাই!"

ফ্রাঙ্ক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আজ সকালেই বটে, কিন্তু তারপর শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে।"

"শতাব্দী? কই আমি ত তোমার মাথায় পাকা চুল দেখি না?"

"কিন্তু তোমার মাথায় পাকা চুল দেখিলে আমি বিস্মিত হইতাম না।"

"তুমি যে দেবতা।"

"তুমি তা হ'লে দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ!"

এখানেই দুই ভাইয়ের সংগ্রামের নিবৃত্তি হইল। ফ্রাঙ্ক আসিয়া তাঁহার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। আমিয়াস সার রিচার্ডের একটা নূতন যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে চলিয়া গেলেন।

সুখ

ভুলিয়া থেক না, ফেলিয়া যেয়ো না
ওহে জীবনের সুখ,
ওহে জীবনের সাধের স্বপন
দিয়ো না দিয়ো না দুখ।
অঙ্গে আমার জড়ায়ে থেক হে
সারাটি দীর্ঘ দিন,

নিশীথে আমার সিথানে বসিয়া
বাজায়ো তোমার বীণ্।
তোমারি সোহাগে জীবন ধরিব
তোমারি নেশায় ভোর,
চির জনমের সাধের স্বপন
ভেঙ্গো না ভেঙ্গো না ঘোর।
কহে সুখ হাসি, হে সুখ-প্রয়াসী
শুনিয়া মরি যে লাজে,
মোর নেশাটুকু পেশা হবে তব
পাসরি সকল কাজে।
ফেলিব তোমারে, ভুলিব তোমারে
দিব হে তোমারে ব্যথা,
মোরে যে না স্মরে আমি চিরতরে
তাহারি শরণাগতা।
তাহারি মরমে বসতি আমার
তাহারি করমে ভাসি,
জীবনে তাহারি চরণে শরণ
মরণে তাহারি দাসী।

শ্রীহেমলতা দেবী।

ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রমে লেডী কারমাইকেল

ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রমের কথা আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। কাহারও নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া দুইটি হিন্দু বিধবা লইয়া একমাত্র ভগবানের করুণা সম্বল করিয়া নীরবে, ঢাকার উয়ারি নামক স্বাস্থ্যকর পল্লীতে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দুই বৎসরে আশ্রম-বাসিনীর সংখ্যা ১৪টি হইয়াছে। নির্ম্মলস্বভাবা হিন্দু বিধবাগণ এখানে বাস করিয়া লেখাপড়া ও শিল্পাদি শিখিয়া আত্মোন্নতি সাধন করতঃ যাহাতে আপনাদের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে আশ্রম হইতে দুইটি বিধবা গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন, দুইজন ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য সকলে সাধারণ লেখাপড়া ও সেলাই ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাননীয়া লাটপত্নী লেডী কারমাইকেল মহোদয়া একবার এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া এক কালীন দেড়শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। গত ২২শে আগষ্ট তিনি পুনরায় আশ্রমটি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বাহ্ন আট ঘটিকার সময় মাননীয়া গবর্ণর-পত্নী ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্ মিস্ গ্যারেট মহোদয়াকে সঙ্গে লইয়া মোটর গাড়ী আরোহণে আশ্রমে উপস্থিত হইলে শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত ও শ্রীমতী নির্ম্মলা দাস তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত ইংরেজী ভাষায় লিখিত এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের নারীজাতির মধ্যেও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। দুঃখিনী বিধবাগণের অন্তরেও আত্মোন্নতির স্পৃহা দেখা দিয়াছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও হিন্দু বিধবার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা যে আপনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি।

"এদেশীয় মহিলাদিগের যে-কোন সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইলেই আপনি বিধবাদিগের উপযোগী কার্য্য-ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। রোগীর শুশ্রূষা শিক্ষা করা বিধবাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য, আপনি যে ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। এই ঢাকা সহরেও আপনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মহিলাদিগের জন্য শুশ্রূষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, এই আশ্রমের হিতৈষী ঢাকা বিভাগের মাননীয় কমিশনার মহোদয়ের নিকট একথা শুনিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি।

তৎপর সংক্ষেপে আশ্রমের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া প্রতিষ্ঠাত্রীদ্বয় নিবেদন করেন, যে দুই বৎসর আশ্রম পরিচালন করিয়া আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা নীরবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই কার্য্যে সাধারণের কি পরিমাণে সহানুভূতি পাইবেন, প্রথমে অনুমান করিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহারা জন সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া নিজেরাই কার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বন্ধু বান্ধব ও সাধারণের নিকট হইতেও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। এই ভাবে অবশ্যই আর বেশী দিন চলিতে পারে না, এখন হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের নিকটও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই নিয়মিত মাসিক সাহায্য মঞ্জুর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। শুধু এই সাহায্যেও চলিবে না। অনির্দ্দিষ্টকাল ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রম রাখা যাইবে না, আশ্রমের নিজের বাড়ী আবশ্যক, কোথা হইতে এই অর্থ আসিবে প্রতিষ্ঠাত্রীগণ তাহা জানেন না, কিন্তু যাঁহার কৃপায় আশ্রম ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে সেই মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরই সকল বিষয়ে ইহার সুব্যবস্থা করিবেন, প্রতিষ্ঠাত্রীগণ অন্তরের সহিত তাহা বিশ্বাস করেন।

প্রত্যুত্তরে লেডী কারমাইকেল বলেন, তিনি এই অভিনন্দন পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন। এদেশীয় মহিলাগণ, বিশেষতঃ বিধবাগণ রোগীর শুশ্রূষা শিক্ষা করেন, ইহা তাঁহার আন্তরিক কামনা। ঢাকায় শুশ্রূষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলার আয়োজন হইতেছে, কিন্তু কলিকাতা লেডী ডফ্‌রিণ হাসপাতালে শুশ্রূষা শিক্ষার জন্য একটি উচ্চতর শ্রেণী শীঘ্রই খোলা হইবে। সাধারণ নার্স (শুশ্রূষাকারিণী) অপেক্ষা ইঁহারা অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহাদের নাম হইবে "শুশ্রূষাকারিণী ভগ্নী" (Sister Nurse)। এই অঞ্চল হইতে বৎসরে তিনটি করিয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিধবা কলিকাতা যাইয়া এই শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। ঢাকা বিধবাশ্রমে তিনি অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়াও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

তৎপর গবর্ণর-পত্নী আশ্রমবাসিনী প্রত্যেক বিধবার ইতিহাস জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, একে একে সকলেরই পরিচয় তাঁহাকে বলা হয়। একটি ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া তিনি বিশেষ ভাবে আদর করেন এবং নিজের সম্মুখে তাহা দ্বারা সেলাই করাইয়া সেই সেলাই দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করেন। কিছুদিন হইতে আশ্রমে লেস্ বুনিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তিনি মেয়েদিগকে তাঁহার সম্মুখে লেস্ বুনিতে বলেন এবং তাঁহাদের কাজ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন। একটি বিধবার প্রস্তুত জড়ির পাড় দেখিয়া তিনি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং উপযুক্ত মূল্যে উহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ মূল্য গ্রহণ না করিয়া উপহার স্বরূপ উহা গ্রহণ করিতে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায় তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করেন।

তারপর মাননীয়া মহোদয়া আশ্রমের সমস্ত গৃহ রান্নাঘর (বাহির হইতে), ভাঁড়ার ঘর, বিধবাদিগের স্বহস্তে ধৌত বাসন কুশন ও তাহাদিগের স্বহস্তে রচিত শাক-সব্জীর বাগান ইত্যাদি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলিলেন, বেশী জাঁক জমক ও হৈ চৈ না করিয়া নীরবে ঢাকা বিধবাশ্রম অতি সুন্দর কাজ করিতেছেন, এখানকার সরলতা ও আড়ম্বর-বিহীনতা দেখিয়া তিনি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া অতি সুমিষ্ট ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া লেডী কারমাইকেল প্রস্থান করেন।

দানবীর

মহাত্মা রাসবিহারী ঘোষ

বাঙ্গালী জাতির বড় কলঙ্ক ছিল, সৎকার্য্যে তাহারা দান করিতে জানে না। কোটি কোটি টাকার অধিকারী

ইহরা অকার্য্যে কুকার্য্যে, অসার বিলাস-ব্যসনে তাহা ব্যয় করিবে অথবা সারা জীবন যক্ষের মত সঞ্চিত ধনের পাহারা দিবে এবং পুত্র কন্যা না থাকিলে সেই ধন নষ্ট করিবার জন্য পোষ্যপুত্র রাখিয়া যাইবে, তথাপি দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য সেই অর্থের সংব্যয় করিবে না। স্বদেশ ও স্বজাতিকে ঘনিষ্ঠরূপে আপনার বলিয়া মনে না করাতেই এদেশের লোকের এই ভ্রান্তবুদ্ধি জন্মে। আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাই ও পঞ্জাব প্রদেশ শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পরোপকারজনক কার্য্যে প্রচুর পরিমাণ অর্থদান করিয়া আমাদের সম্মুখে সাধু দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিয়াছে। পার্সীজাতি দানের জন্য বিখ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিদাতা বোম্বাইয়ের এক পার্সী ধনী। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় বাঙ্গালী জাতি এই দানের বিশালতায় পার্সী প্রমুখ জাতি সমূহকেও হারাইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিজ্ঞান চর্চ্চার উন্নতির জন্য নগদ টাকা ও ভূসম্পত্তিতে প্রায় পোনর ষোল লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ সি. আই, ই মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের অর্থে যে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হইবে সেই কলেজের উন্নতির জন্য নগদ দশ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, আরো দশ লক্ষ টাকা তিনি শীঘ্রই দিবেন এরূপ আশা করা যায়। ধন্য ডাক্তার রাসবিহারী, ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য তোমার অর্থোপার্জ্জন !

সমালোচনা

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প।—শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস লিখিত ভূমিকা সংযুক্ত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। এণ্টিক কাগজ; ডবল ক্রাউন ১৮৭ পৃষ্ঠা। ২০ খানি স্বতন্ত্র-মুদ্রিত চিত্র সহ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শিশু-সাহিত্যে আজকাল কেবল রাক্ষস-খোক্কস ও পরীর গল্পের—উপকথার ছড়াছড়ি। এ সকলের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু যেরূপ অধিক মাত্রায় এ সকলের প্রচলন হইতেছে তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্যের লেখকগণ যেন মনে করেন, যে শিশু-সাহিত্য উপকথা ছাড়া আর কিছুই হয় না। প্রভাত বাবু শিশু-সাহিত্যের একটি নূতন অথচ অতি চিত্তাকর্ষক দিক আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন মিশর, বাবিলন, আসিরিয়, ফিনিক প্রভৃতি জাতির ইতিহাস, এবং যে উপায়ে এইসকল ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যে উপন্যাস, উপকথা অপেক্ষাও বিস্ময়কর, তাহা আমাদের দেশের কয়জনে জানেন? এই গ্রন্থ পাঠে শুধু যে বালক বালিকাগণই উপকৃত হইবে, তাহা নয়, বয়স্কেরাও ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবেন। সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া আমরাও বলি, "কাহিনীর সাহায্যে মানব-চরিত্রের কয়েকটি জলন্ত আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া এবং সভ্যতার পট চিত্রিত করিয়া লেখক নিশ্চয়ই তরুণ পাঠকদিগের মনে কুতূহল জাগাইতে এবং একখানি সুস্পষ্ট রঙ্গীন ছবি অঙ্কিত করিতে পারিবেন।"

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest —I will not excuse, I will not retreat a single inch —and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | আশ্বিন, ১৩২০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

নারীর কার্য্য

যে সকল মেয়ে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য কি কি কার্য্য করিতে পারেন তাহা আলোচনা করিবার জন্যই এই সামান্য প্রবন্ধের অবতারণা। কারণ, বর্ত্তমান সুশিক্ষার ফলে কেবল যে পুরুষদিগের মনেই দেশের উন্নতির জন্য ও স্বার্থত্যাগ করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে, সমাজের মাতৃ-স্বরূপিণী কল্যাণময়ী নারীর প্রাণেও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থত্যাগের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু অবরোধ-পীড়িত বঙ্গরমণীগণ সেরূপ কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত সুবিধা ও সাহায্য পান না, সেই জন্য জলবুদ্বুদের ন্যায় অনেক নারীর মনের ইচ্ছা মনেই লয় পায়।

আমার বক্তব্য বিষয়ের এই ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ পাঠ করিয়া অনেক পাঠক হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন ; তাঁহারা বলিবেন—"কেন? স্ত্রীলোকের রান্নাবান্না, ঘরকন্না, ছেলে মানুষ করা, শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা—ইত্যাদি কত কাজই রহিয়াছে, সে সকল কাজ ত্যাগ করিয়া বাহিরের কাজে যোগ দিবার প্রয়োজন কি? তবে যদি তাঁহারা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া রান্না করাটাকে অসভ্যতা মনে করেন, কোমল অঙ্গে কাঁটার আঁচড় লাগিবার ভয়ে গৃহকার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের দেশের কাজে যোগ না দেওয়াই ভাল।"

স্ত্রীলোকেরা ঘরকন্না ও তাঁহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সংসারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া যে দেশের কাজে যোগ দিবেন এ কুপরামর্শ দিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের নাই। সত্য বটে শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে এই এক চিরন্তন

অভিযোগ আছে, যে, তাঁহারা গৃহকর্ম্মে মন দেন না; কিন্তু কথাটি সত্য কিনা তাহা বিচার-সাপেক্ষ। হয়ত উহার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। তাহা থাকিলেও সেজন্য শিক্ষার দোষ দেওয়া যায় না; বরং বলিতে হয় কালের দোষ। কারণ এখন এমনই দিন পড়িয়াছে যে মানুষের বিলাসিতা ও সুখস্পৃহা বাড়িয়া চলিয়াছে। সেইজন্য যাঁহাদের ঘরে টাকা আছে, দুই চারিটা চাকর চাকরাণী ও পাচক রাখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের মেয়েরা লেখপড়া না জানিলেও রন্ধন-গৃহের সীমানায় যান না। পক্ষান্তরে গরীবের ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া জানিলেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সংসারের কাজ করেন। তবে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে রমণীগণের শুধু গৃহকর্ম্ম করিয়া তৃপ্ত হওয়া উচিত, না অবসর, সুবিধা ও শক্তি অনুসারে দেশের কোনও মহৎ কর্ম্ম করিয়া যশস্বিনী হওয়া এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। গৃহে নারীদিগের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, তাহা করিতেই হইবে, না করিলে চলিবে না; সেইরূপ গৃহে পুরুষদিগেরও কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেক পুরুষই সেই কর্ত্তব্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু পুরুষেরা যদি সেই পারিবারিক কর্ত্তব্যশৃঙ্খলে হাত পা বাঁধিয়া রাখেন, দেশের কাজের দিকে একবারও ফিরিয়া না চান, তবে কে তাঁহাদের প্রশংসা করিবে? এদেশে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন, এবং এই স্বার্থপরতার জন্য দেশের কত ভাল কাজ পণ্ড হইয়া যায়।

সুতরাং প্রত্যেক পুরুষের যেমন সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সেবা ও সমাজের কল্যাণের জন্য সময় দেওয়া আবশ্যক, সেইরূপ নারীরও গৃহকার্য্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের হিতের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মানুষের অনেক প্রকার ঋণের উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা কেবল পরিবারের মধ্যে কর্ত্তব্য-ঋণে ঋণী নহি। আমাদের অনেক ঋণ আছে। আমরা জননী-জন্মভূমির নিকট, জনসমাজের নিকট সহস্র ঋণে ঋণী। যে জন্মভূমি আমাদিগকে স্নেহ-অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন, যে জনসমাজ সহস্র প্রকারে আমাদের সুখের জন্য আয়োজন করিতেছেন, আমরা কি সেই জন্মভূমি ও জনসমাজকে ভুলিয়া যাইতে পারি? আমরা কি দেশের ও সমাজের ঋণের কথা ভুলিয়া স্বার্থে ডুবিয়া থাকিতে পারি? তাহা হইলে আর আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবার আশা কোথায়?

অতএব দেশের ও সমাজের ঋণ শোধ করিবার জন্যই মহিলাগণের গৃহকার্য্য ব্যতীত জনহিতকর মহৎ-কার্য্যে হস্তার্পণ করা উচিত।

শুধু তাহাই নহে; রমণীগণ যখন সমাজ-শরীরের একটি অঙ্গ তখন তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন কেবল মাত্র পুরুষের মহৎকার্য্য দ্বারা কখনই দেশ উন্নত হইবে না। এজন্য সকল সভ্য দেশেই নারীগণ পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন; ইহাতেই ঐ সকল দেশের কল্যাণ সাধন হইতেছে।

আমাদের দেশকেও সভ্যতায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চস্থানে সমারূঢ় করাইতে হইলে প্রথমেই রমণীগণের উচিত, রমণীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। এখনও দেশের লক্ষ লক্ষ নারী অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আছেন, জ্ঞানের রশ্মিরেখা তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই; আত্মোন্নতির জন্য কোনও প্রকার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। তাঁহাদের উন্নতির জন্য শিক্ষিতা মহিলাগণের কি কোনও দায়িত্ব নাই? সত্য বটে ঐ সকল নারীর জন্য গভর্ণমেণ্ট বড় বড় স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে খৃষ্টান ও ব্রাহ্মবালিকাগণের উপকার হইতেছে, হিন্দুর ঘরের মেয়েদের তাহাতে আশানুরূপ উপকার হইতেছে না। হিন্দুবালিকারা অল্পদিনই বিদ্যালয়ে যায়, একটু বড় হইলেই তাহাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়। ইহা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে বাল্যবিবাহই উহার কারণ। কিন্তু এখন বরের বাজার অত্যন্ত চড়া, কাজেই অনেক হিন্দুমেয়ের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হয়; অথচ তাঁহারা বিদ্যালয়ে যাইতে

পান না। তাহার কারণ কি? ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয় ও অন্য দুএকটি দেশীয় স্কুল ভিন্ন অন্য সকল বিদ্যালয়েই পুরুষ শিক্ষক; কোন্ হিন্দু তাঁহার বয়স্কা কন্যাকে পুরুষ-শিক্ষকের নিকট পাঠাইবেন? এতদ্ভিন্ন যে সকল বালিকার বিবাহ হইয়া যায় তাহাদের বিদ্যালয়ে যাইবার কোনও সুবিধা নাই। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি সপ্তাহের মধ্যে একদিনও ভদ্র, সচ্চরিত্র এবং পরিচিত হিন্দুদিগের অন্তঃপুরে গিয়া গৃহের বধূ ও বয়স্কা কন্যাদিগকে শিক্ষা দেন, তাঁহাদের সহিত সৎ বিষয়ে আলাপন করেন, তবেই তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

যদিও স্বীকার করি নারীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য, তথাপি দুই একজন ভগিনীর চেষ্টায় এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। নারীর শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায়, মহিলা-সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। সমিতি হইতে অর্থ সংগৃহীত হইবে ও সমিতির ভগিনীগণ সমবেত হইয়া শিক্ষাদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

এইরূপ করিলেই সমগ্র দেশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সার্ব্বজনীন হইবে। শিক্ষা সার্ব্বজনীন না হইলে দেশের নারীসমাজের উন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। কেবল মাত্র কতকগুলি প্রধান নগরে সমিতি স্থাপিত হইলে কিরূপে সমগ্র দেশের উন্নতি হইতে পারে?

আমাদের দেশে কলিকাতা ও প্রধান প্রধান দুই চারিটি নগর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে নারীসমাজ নাই এবং তত্রস্থ মহিলাগণ সভায় মিলিত হইয়া দেশীয় ও স্থানীয় হিত সাধন প্রস্তাবের আন্দোলন করিবার সুবিধা পান না। এই নারীসমাজের শাখা সমগ্র বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ যতক্ষণ শিক্ষিতা ভগিনীগণ এরূপ সভায় সমবেত হইয়া দেশীয় এবং স্থানীয় প্রশ্নের আলোচনা না করিবেন ততক্ষণ দেশের বা সমাজের প্রকৃত উন্নতির আশা কিরূপে করা যাইতে পারে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি। আমাদের দেশের অনেকানেক মহোদয়গণ সমাজ সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু অশিক্ষা-নিবন্ধন নারীগণ তদ্বিষয়ে উদ্যোগিনী হন না, এবং সংস্কার কার্য্যের অনুমোদন ও তাহাতে সহায়তা না করাতে উহা আশানুরূপ ফল প্রদান করে না।

বঙ্গদেশে কোন সময়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইতিহাস পাঠে বিদিত হওয়া যায় যে ইংরাজ-রাজশাসন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরেও কিছু কাল পর্য্যন্ত আমাদের নারীসমাজ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখন কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে এবং রাজপুরুষদিগের আনুকূল্যে স্ত্রীশিক্ষার পুনরুন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, কিছু দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষাকার্য্য রীতিমত নির্ব্বাহিত হইলে নারীসমাজ মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইবে, আশা করা যায়। কিন্তু বিবাহের কাল সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যেরূপ ধারণা আছে তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। সাধারণতঃ বালিকারা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম না করিতেই বিবাহিতা হয় এবং অনতিকাল পরেই সন্তান প্রসব করে। এত অল্পবয়সে বিবাহিতা হইলে শিক্ষা করিবার অবসর পাইবে কিরূপে? যতকাল বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকিবে ততকাল প্রকৃত শিক্ষার আশা সুদূর-পরাহত। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, এ বয়সে কোন ক্রমেই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে না। যাহাতে উচ্চশিক্ষা-লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে সময় দেওয়া উচিত এবং সময় দিতে হইলেই তাহাদিগকে অন্ততঃ শিক্ষাকার্য্য সমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখা আবশ্যক। গৃহস্বামীগণ তাহা করিবেন কি? দেশস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সভা সমিতিতে যোগদান এবং সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহাদের কন্যাগণ অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিলেই তাহাদের বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত এবং ব্যাকুলিত হন ও যেন তেন প্রকারে কন্যার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। ইহা কি বাক্যের এবং কার্য্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছে না? বম্বে, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষাদান অপেক্ষাকৃত অল্পকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অথচ সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তত্রস্থ ব্যক্তিগণের উদ্যোগ এবং কার্য্য সংক্রান্ত সংবাদ আমরা

মধ্যে মধ্যে পাঠ করি। কিন্তু বঙ্গদেশে শিক্ষিত জন সাধারণের তাদৃশ কার্য্যকুশলতা লক্ষিত হয় না। নৈতিক সাহসের অভাব ব্যতীত ইহার কারণ কি হইতে পারে? কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ সাহস প্রদর্শন করিতে না পারাতে সমাজে যে সকল শোচনীয় ঘটনাবলী ঘটিতেছে তাহা অহরহঃ শ্রুতিগোচর হয়। যে বয়সে অন্যান্য দেশের বালিকারা বিদ্যালয়ে যাতায়াত এবং পাঠাভ্যাস করে, আমাদের দেশের বালিকাগণ সে বয়সে সন্তান প্রসব করে এবং অভাবনীয় দুঃখে পতিত হয়। রাজপ্রচারিত বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কলিকাতা এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের শিশুদিগের অধিক পরিমাণ মৃত্যু সংখ্যা কেবল বাল্যবিবাহ নিবন্ধন ঘটে।

অতএব শিক্ষিতা ভগিনীগণের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে তাঁহারা সমাজস্থ বর্ত্তমান কুপ্রথা দুরীকরণ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন। যতকাল তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ততকাল আমাদের সমাজ সুগঠিত হইবে না, শিশুদিগের মৃত্যুর হার কমিবে না এবং ভাবী বংশাবলী বলবান এবং বীর্য্যবান হইবে না। ৺রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার রচিত একটি পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন

"ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।"

আমাদের অবস্থা অবলোকন করিয়া এবং সে অবস্থা হইতে যাহাতে সমুন্নত হইতে পারি তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি এই কবিতা লিখিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা তাঁহারা কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচনা করিবেন কি?

অতঃপর শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। শিক্ষা হইতে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারি: অন্য জাতির সহিত আমাদিগের অবস্থার তুলনা করিয়া তাহার উৎকৃষ্টতা বা হীনতা অনুধাবন করিতে পারি; কি উপায় অবলম্বন করিয়া অন্যান্য জাতি উন্নত হইয়াছে এবং আপনাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে তাহা জানিতে পারি; আমাদের সমাজে কি কি দোষ বিদ্যমান থাকিয়া কণ্টক স্বরূপ উন্নতির পথরোধ করিতেছে তাহা [illegible] করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে সমাজ হইতে সেই সমস্ত দোষ উৎপাটিত হয় তাহা বোধগম্য করিতে পারি; কিরূপ আচরণ ও ব্যবহার করিলে পারিবারিক শান্তি ও সুখ লাভ করিতে পারা যায় তাহা জানিতে পারি। নারীগণ শিক্ষিতা হইলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইবেন সুতরাং কলহপ্রিয়তা, পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পাইবে না। ইহা শিক্ষার এক দিক মাত্র। শিক্ষা লাভ করিলে জানকী দ্রৌপদী সাবিত্রী প্রভৃতি মহীয়সী মহিলাগণের জীবনী পাঠ করিতে এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। বিবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মাকে উন্নত করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে। শিক্ষিতা নারীর পক্ষে ধর্ম্ম, শান্তি, প্রেম, ও মোক্ষ সহজ-লভ্য। সীতা অরুন্ধতী দময়ন্তী প্রভৃতি নারীগণ শিক্ষা ও পতিভক্তি গুণেই জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শিক্ষা আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে প্রধান সহায়। শিক্ষা দ্বারা পতিপ্রেম, পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি ভালবাসা, অন্যের উপকার কামনা, জীবজন্তুর প্রতি দয়া ও অন্যান্য সদ্‌গুণের বিকাশ হয়। প্রাচীন গ্রন্থপাঠে আমরা অবগত হই, পুরাকালে কোন কোন নারী সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন এবং আত্মত্যাগ দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে জ্ঞানমূলক নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস, ধর্ম্মের মুখ্য প্রয়োজনীতার অনুভব এবং নীতি ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষলাভের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলেই শিক্ষার সর্ব্বোত্তম সার্থকতা হয়। কেবল মাত্র পূজায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না। তাঁহার বিধান যাঁহারা লঙ্ঘন করেন, পূজা পাইলেও তিনি তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। তাঁহার বিধান বুঝিবার জন্য, তাহা পালন করিবার জন্য জ্ঞানের আবশ্যক, জ্ঞানের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

তাহার পর শিশুদিগকে গঠন করিয়া তোলা নারীজাতির এক মহৎ কর্ত্তব্য। মাতৃজাতি সুশিক্ষিতা না হইলে এই কর্ত্তব্য কিছুতেই সম্পন্ন করিতে পারেন না। শিশুগণ স্বভাবতঃ মাতার নিকট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা পায়। মাতা শিক্ষিতা না হইলে কিরূপে তিনি সন্তানকে

শিক্ষা দিবেন? কারণ নারীজাতি মাতৃজাতি; পুরুষজাতি ও নারীজাতি উভয়কেই গঠন করিয়া তুলিবার ভার নারীজাতির হস্তে। নারীজাতির সন্তান-বাৎসল্য তবে বৃথা আদরে পর্য্যবসিত না হইয়া এই ভাবেই প্রকাশিত হউক। বাল্যকাল হইতেই পিতা মাতার প্রতি বাধ্যতা, রাজার প্রতি রাজভক্তি, ঈশ্বর ও মানবের প্রতি কর্ত্তব্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া মাতার কর্ত্তব্য। জননীগণ তাহাদিগকে সত্যপরায়ণতা, ধৈর্য্য, ভালবাসা ও ভগবানের সৃষ্ট জীবগুলির প্রতি দয়া শিক্ষা দিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিবেন না। প্রথম হইতেই জননীর নিকট এই সকল শিক্ষা পাইলে সন্তানের প্রকৃতি কঠোর ও কর্ত্তব্য-বিমুখ হওয়ার পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কোমল হয়। মাতৃশক্তির বিকাশেই জাতীয় জীবনে শৌর্য্য বীর্য্যের এবং ধর্ম্মের সঞ্চার হইয়া থাকে। মাতৃশক্তির উন্নতি সাধনে বিমুখ হইয়া, মাতৃশক্তিকে অবহেলা করিয়া কোনও জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, পারিবেও না।

সুতরাং শিক্ষিতা ভগিনীগণের প্রতি আমার এই নিবেদন, যে যখন বহুকাল পরে দেশে নবশক্তি সঞ্চারের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সেই শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া পুরুষেরা দেশের শিল্প জাত দ্রব্যাদির ব্যবহার দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে উদ্যমশীল হইয়াছেন, তখন নারী বলিয়া তাঁহারা যেন নির্ব্বাক-নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকেন। তাঁহাদিগকেও জাগিতে হইবে, এবং অক্লান্ত উৎসাহের সহিত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্না ভগিনীগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবে হইবে। ক্ষুদ্র শক্তি বিবেচনায় আপনাদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া মঙ্গলময়ের নাম স্মরণ পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হউন, সেই সর্ব্বশক্তিময়ের আশীর্ব্বাদ বলেই তাঁহারা সাফল্যের কনকমন্দিরে পৌঁছিতে পারিবেন।

এই সামান্য প্রবন্ধে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি হইতে পারে ও সমগ্র বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইতে পারে তাহা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি একজন গৃহস্বামীও আপনার গৃহের বালিকাগণের সুশিক্ষার জন্য চেষ্টিত হন তাহা হইলে পরমানন্দ লাভ করিব।

পরিশেষে আমার অল্পশিক্ষিতা ভগিনীগণের নিকট এই নিবেদন, যে তাঁহারা অসার নভেল পাঠে বহুমূল্য সময়ক্ষেপ না করিয়া আত্মোন্নতির জন্য অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হউন; কারণ আমরা আমাদের উন্নতির জন্য স্বয়ং চেষ্টা না করিলে কেহ আমাদিগকে জোর করিয়া উন্নত করিতে পারিবে না।

শ্রীকাননকুমারী দেবী।

আগমনী

মেয়েটির নাম সাপ্‌লা। লাবণ্যে ঢল ঢল পবিত্র মুখখানি, ছল ছল বিশাল বঙ্কিম নয়নদ্বয়,—ক্ষীণদেহ-লতা এবং অনতিদীর্ঘ কোঁকড়া কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ,—সে এক অপূর্ব্ব কমনীয়তার মূর্ত্ত প্রতিমা। মুখের ভাব একটু গম্ভীর, একটু মনোহর বিষণ্ণতা মাখান,—মর্ত্ত্যের উষ্ণ নিশ্বাস যেন তাহাকে অহরহ ক্লিষ্ট করিতেছে।

প্রফেসার সত্যশরণের দাম্পত্য জীবন একরকম একঘেয়ে ভাবেই চলিতেছিল। যখন সাপ্‌লার জন্ম হইল তখন স্বামী স্ত্রী উভয়েই যেন একটা আকস্মিক পরিত্রাণের অপরিসীম আরাম ও আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহাদের নিরবলম্ব অবসন্ন হৃদয় তবে অবশেষে একটা আশ্রয় পাইবে;—তাঁহাদের সাংসারিক জীবনটা তবে একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে না;—রুদ্ধ শুষ্কপ্রায় আনন্দ-নির্ঝর-গুলি একটী স্বর্গীয় জীবের অমিয় মাখা আধ আধ বাণীতে আবার তবে উথলিয়া উঠিতে থাকিবে! আনন্দময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় দম্পতি বিভোর হইয়া উঠিলেন।

শৈশব হইতেই মেয়েকে সত্যশরণবাবু নিজ হাতে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। নিজ হাতে শিক্ষার ভার লইয়া তিনি তাঁহার এই অল্পভাষী ক্ষীণদেহলতা কন্যার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, হৃদয়ের মাধুর্য্য এবং মনের তেজ দেখিয়া মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। বাঙ্গালা কাব্য পড়াইতে পড়াইতে সাপ্‌লার ব্যাখ্যায় এমন সব নূতন নূতন সৌন্দর্য্য বাহির হইয়া পড়িত যে তিনি নিজে

তাহার কল্পনাও করেন নাই! তিনি অশ্রুসজল নয়নে ভাবিতেন—"মা আমার সাক্ষাৎ সরস্বতী।"

কিন্তু সরস্বতীই হউক আর লক্ষ্মীই হউক, যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বাঙ্গালীর মেয়ে পাত্রস্থা না হইলে বঙ্গ-গৃহিণীর আহার নিদ্রা ঘুচিয়া যায় এবং কর্ত্তাগণও ঘরে কিছুমাত্র শান্তি পান না। সাপ্‌লা যখন দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল তখন হইতেই সত্যশরণ বাবু তাহার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে অধুনা পাত্র জুটা কি সহজ ব্যাপার? তাহাতে আবার সত্যশরণ বাবু নৈকুষ্য মেলি কুলীন। পাল্‌টি ঘরে অনেক খুঁজিয়াও ভাল পাত্র পাওয়া গেল না। অবশেষে সত্যশরণ বাবুদের বাড়ী হইতে মাইল পাঁচেক দূরে এক গণ্ডগ্রামে এক পাত্রের সন্ধান মিলিল। পাত্রের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল। পাত্রের পিতার মস্ত লগ্নির কারবার। পাত্রটি কিন্তু প্রবেশিকার দ্বারে তিন তিন বার ঘুরিয়া আসিয়াও "প্রবেশ নিষেধ"ই লেখা দেখিয়া অবশেষে পিতার লগ্নির কারবারেই দেহ মন সংলগ্ন করিয়াছে। এমন পাত্রের হাতে প্রাণসমা দুহিতাকে সমর্পণ করিতে সত্যশরণ বাবুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করেন,—এত দিনের নৈকুষ্য কুলীনের কুল অবশেষে তাঁহার হাতে ভঙ্গ হইবে?

শ্রীমের বন্ধে বাড়ী যাইয়া সত্যশরণ বাবু কন্যার বিবাহ দিলেন। জাঁক জমক, পণ, দান সামগ্রী, ঘটক কুলীন বিদায় ইত্যাদি কিছুরই ত্রুটী হইল না, কিন্তু তবুও সত্যশরণ বাবু কুসীদ-ব্যবসায়ী বেহাইর মন উঠাইতে পারিলেন না। বরকর্ত্তা সত্যশরণ বাবুকে কটূক্তি করিয়া, রাগ করিয়া অনাহারে বরকন্যা লইয়া সত্যশরণ বাবুর বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। একমাত্র কন্যার বিবাহে যে এত লাঞ্ছনা সহিতে হইবে সত্যশরণ বাবু তাহা স্বপ্নেও মনে করেন নাই, সমস্ত সংসারের উপর তাঁহার চিত্ত বিমুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু কন্যা বিদায়ের সময় অবিরল ধারে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া সাপ্‌লা ভীত-অকম্পিত-পাদক্ষেপে শুষ্ক নেত্রে যাইয়া পাল্কীতে উঠিল। ধীরে ধীরে পাল্কী চলিয়া গেল।

শূন্যহৃদয়ে দম্পতি সহরে ফিরিয়া আসিলেন এবং নীরবে তিক্ত দৈনন্দিন কার্য্যের বোঝা মাথায় লইয়া শূন্য গৃহে একটির পর একটি করিয়া জীবনের শুষ্ক দিন গুলি কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

(২)

শ্বশুরগৃহে আসিবামাত্র ভবিষ্য জীবনের যে ছবি সাপ্‌লার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল, সাপ্‌লা দেখিল তাহার সঙ্গে অতীত অভ্যস্ত জীবনের কিছুই মিল নাই। পিতৃগৃহ হইতে প্রথম প্রথম শ্বশুরগৃহে আসিয়া সকল মেয়েই একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করে। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সাপ্‌লা আশৈশব আত্মসমাহিত ও মিতভাষী, মুখ বুজিয়া সহিয়া থাকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক; কিন্তু শ্বশুরগৃহের অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখিয়া সেও অনেকটা দমিয়া গেল। পিতা মাতার একমাত্র মেয়ে সে, পিতৃগৃহের সমস্ত মাধুর্য্য সে একা ভোগ করিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সৌন্দর্য্যের সাধক পিতার পদতলে বসিয়া সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, বিশ্ব সৌন্দর্য্যের অসীম সুধাভাণ্ড তাহার তৃষিত ওষ্ঠের নিকট অহরহ বিরাজ করিত; সৌন্দর্য্য পিপাসু সাপ্‌লা তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া বিভোর হইয়া উঠিত। কিন্তু শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল, অভ্যস্ত অতীত জীবনকে এখন হইতে নির্ম্মম হস্তে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া জীবন সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। এখানে রন্ধন গৃহের উষ্ণ বাতাস এবং শয়নগৃহের তিক্ত অভিজ্ঞতা, এই দুইটিই জীবনের প্রধান উপাদান। ইহার অপর পারে যে জীবন তাহা তাহার জন্য নহে;—সে জীবন বাহির বাড়ীতে টাকার নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝনা এবং দায়িকের কাতরোক্তিতে মুখরিত এবং অন্দরে তাহা সঙ্কীর্ণহৃদয় সাঙ্গভঙ্গী কোন্দল ও তর্জ্জন গর্জ্জনে পর্য্যবসিত। এখানে সরস্বতীর ত প্রবেশ নিষেধই, লক্ষ্মীও যদি আসেন তবে তাঁহাকে চুপি চুপি পেচক বাহনে আসিয়া একেবারে অনন্তকালের জন্য লোহার সিন্দুকে আশ্রয় লইতে হয়! বালিকা সাশ্রুনয়নে মধ্যে মধ্যে ভাবিত,—স্নেহময় পিতা এমন শাস্তি তাহাকে কেন দিলেন?

সদ্য-বিবাহিতা বালিকার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল স্বামী। জীবনের সমস্ত কোমলতার প্রবলতম বন্ধনগুলি একটানে ছিন্ন করিয়া, অতীতের সমস্ত প্রিয়তম স্মৃতিগুলি বিসর্জ্জন দিয়া অসহায়া বালিকা যখন অপরিচিত সংসারে আসিয়া পড়ে, তখন সে মূক বেদনায় স্বামীর মুখের পানেই চাহে। কিন্তু আমাদের দেশের নাটক নভেল পড়া প্রেমপিপাসু অসহিষ্ণু নব্য যুবকগণ সদ্য-বিবাহিতা দীর্ণ-হৃদয়া বালিকা স্ত্রীর নিকট নায়িকার মত প্রেম-সম্ভাষণ এবং ষোড়শীর মত প্রগল্‌ভতা না পাইলেই, নিজের প্রতি স্ত্রীর অবহেলা কল্পনা করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং স্ত্রীকে অনাদর দেখাইতে থাকেন; এমন কি সময় সময় নিষ্ঠুর আচরণে সহানুভূতি-প্রয়াসী বালিকার মর্ম্ম দলিয়া সদীর্ঘনিশ্বাসে কেবলি ভাবিতে থাকেন, যে জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল! কাজেই বিবাহের পর প্রথম কয়েক মাস প্রায়ই উভয়ে এক রকম আনন্দ-বিহীন মেঘাচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়।

এই রকম জীবনের মধ্যেও মাধুর্য্য আছে। এই বিমুখতার মধ্যেও পরস্পরের পরিচয় লাভের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত থাকে যাহা ব্যবধানকে দ্রুতগতিতে কমাইয়া আনে এবং ভবিষ্য মিলনকে মধুরতর করিয়া তোলে। কিন্তু সাপ্‌লা তাহার সম্মুখে যে দাম্পত্য জীবন বিস্তৃত দেখিল, তাহার মধ্যে আগ্রহও নাই, অবহেলাও নাই—তাহা এক ঔৎসুক্য-বিহীন একঘেয়ে জীবন। সাপ্‌লার স্বামী নরেন্দ্রনাথ দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক। কিন্তু যুবক বলিতে আমাদের চোখের সামনে যে চিত্রটি ভাসিয়া উঠে তাহার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কিছুই মিলে না। মিটি মিটি চক্ষু, সতর্ক মন্থর গতি, ঈষৎ আনত দেহ; সে যেন টাকার সুদের এক মূর্ত্ত অবয়ব! স্নেহ প্রেমের ধার সে কস্মিন্ কালেও ধারে নাই এবং বিবাহের পরেও ধারিবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না। তাহার পার্থিব আকর্ষণের জিনিষ মাত্র দুইটি, টাকার সুদ ও গঞ্জিকা। পার্শ্ববর্ত্তিনী যৌবনোন্মুখী বালিকা যখন প্রেমাকাঙ্ক্ষা-থরথর-লজ্জিত হৃদয়খানি লইয়া গোপনে তাহার পানে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, তখন গাঁজার নেশায় বিঘূর্ণিত-রক্ত-লোচন কুলীনশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথের নিকট বিশ্ব যথেষ্ট স্পষ্ট থাকিত না। বালিকা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত; এবং পরে স্বামীর নিকট যে রকম ব্যবহার পাইত তাহাতে অবশিষ্ট রজনী তাহার অশ্রুপাতে কাটিয়া যাইত।

সাপ্‌লা শৈশবাবধিই গৃহকার্য্যনিপুণা। মিতভাষিণী বালিকা-বধূ যদি গৃহ-কার্য্য-নিপুণা হয় তবে ক্রমে ক্রমে সংসারের বার আনা কাজ আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপে। তা চাপুক, সাপ্‌লা কর্ম্মবিমুখ নহে; কিন্তু প্রাণপণে খাটিয়াও সে কাহাকেও খুসি করিতে পারিত না। শিশু ননদ দেবর হইতে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী পর্য্যন্ত কেহই তাহার উপর ন্যায় অন্যায় হুকুম চালাইতে ক্রটি করিত না, কিন্তু তাহার তামিলে কিছুমাত্র অসম্পূর্ণতা থাকিলেই সর্ব্বনাশ! তাহাকে প্রায়ই শুনিতে হইত যে তাহার বাপ ছোটলোক, সে ছোটলোকের মেয়ে এবং সকলেই উদারভাবে স্বীকার করিতেন, যে ছোট-লোকের মেয়ের কাছে এর চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করা তাঁহাদেরই অন্যায় হইয়াছে! যে ছোটলোক জামাই বেহাইকে অনাহারে বিদায় দিতে পারে তাহার মেয়ে যে ইচ্ছা পূর্ব্বক রন্ধনে দেরী করিয়া দেবরদিগকে অনাহারে স্কুলে পাঠাইবে, ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে!

সাপ্‌লা এই অনন্ত দুঃখের জীবনে কোনই আশার আলোক দেখিতে পাইত না। কিন্তু তবু একটি দুইটি করিয়া দিন কাটিতেছিল এবং ক্রমে এক মাস দুইমাস করিয়া দীর্ঘ পাঁচমাসও কাটিয়া গেল।

(৩)

পূজার বন্ধে বাড়ী যাইয়া সত্যশরণ বাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সকন্যা জামাতা আনিবার জন্য বেহাইকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে তিনি যে পত্র পাইলেন তাহাতে তেজস্বী সত্যশরণ বাবুর সমস্ত শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া গেল এবং সমস্ত কৌলীন্য গর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভূলুণ্ঠিত হইল! দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তিনি বল্লালকে, দেবীবরকে এবং সর্ব্বোপরি নিজকে অভিসম্পাত দিলেন। কিন্তু উপায় নাই—এই অপমানও নীরবে সহ্য করিতে হইল। পত্রের উত্তর শুনিয়া সাপ্‌লার মা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা যখন আসিয়া গৃহিণীকে জানাইলেন যে বধূ এবং নরেন্দ্রনাথকে পূজা উপলক্ষে নিজের বাড়ী নিবার প্রস্তাব করিয়া বেহাই চিঠি লিখিয়াছেন, তখন গৃহিণী এমন উচ্চ কলরব করিয়া উঠিলেন যে কুসীদব্যবসায়ী স্বল্পজীবী কুলীনশ্রেষ্ঠ একবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সাপ্‌লা, সাপ্‌লার মা এবং সাপ্‌লার হতভাগ্য জনকের উপর গৃহিণী যে সমস্ত বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন তাহা শুনিবার জন্য আর নরেন্দ্রনাথের পিতা সেখানে দাঁড়াইলেন না। বাক্যবর্ষণে শ্রান্ত হইয়া গৃহিণী অবশেষে বাহির বাড়ী হইতে সরকারকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং নিজে বলিয়া বলিয়া তাহাকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া নরেন্দ্রনাথের পিতার নাম দিয়া তাহাই সত্যশরণ বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই চিঠিই সত্যশরণ বাবুর হস্তগত হইয়াছিল।

ষষ্ঠীর দিন চতুর্দ্দিকে বোধনের বাদ্য বাজিয়া উঠিলে সাপ্‌লার হৃদয় পিতামাতার কল্পনাতীত দুঃখ স্মরণ করিয়া অশান্ত হইয়া উঠিল। পিতৃগৃহ হইতে বিদায়কালে মায়ের যে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি দেখিয়া আসিয়াছে, ফিরিয়া ফিরিয়া সাপ্‌লার সম্মুখে তাহাই আজ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সারাদিনের অশ্রান্ত কাজে উদ্বেল অশ্রুপ্রবাহ দমিত রাখিয়া, রাত্রে সকলের ভোজন শেষে সাপ্‌লা যখন নিজের শয়নপ্রকোষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিল তখনও নরেন্দ্রনাথ বাহির বাড়ীতে সুদের হিসাবে ব্যস্ত।

সাপ্‌লা তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া পিতৃপ্রদত্ত সমস্ত জিনিষগুলি একে একে দেখিতে লাগিল, আর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পিতার স্নেহোপহার বঙ্গসাহিত্যের বাছা বাছা গ্রন্থগুলি একে একে প্রায় সমস্তই সে বিলাইয়া দিয়াছে। কেবল রবি বাবুর গ্রন্থাবলি এখনো সযত্নে ট্রাঙ্কের এক কোণে রক্ষিত আছে। সাপ্‌লা সজলনয়নে গ্রন্থাবলির প্রত্যেক খণ্ড উঠাইয়া দেখিতে লাগিল। প্রত্যেক খণ্ডেরই প্রথম পাতায় তাহার পিতা স্বহস্তে সুস্পষ্ট সুন্দর অক্ষরে তাহার নাম লিখিয়া দিয়াছেন—শ্রীপ্রতিভাসুন্দরী দেবী। অবিরলধারে চোখের জল পড়িয়া পুস্তকগুলি ভিজিয়া গেল।

সাপ্‌লা একখণ্ড পুস্তক খুলিল, খুলিবামাত্র চোকে পড়িল—"বধূ"। ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া, বিছানায় আসিয়া সে পড়িতে লাগিল—

"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল,"

ক্রমে পড়িতে লাগিল,—

কোথায় আছিস্ তুই কোথায় মাগো?
কেমনে ভুলিয়া আছিস্ হ্যাগো?
উঠিলে নব শশী,
জানালা ধারে বসি,
আর কি রূপকথা বলিবি না গো?
হৃদয় বেদনায়,
শূন্য বিছানায়,
বুঝি মা আঁখি-জলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি লয়ে,
প্রভাতে শিবালয়ে,
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো!"

সাপ্‌লা পুস্তক খোলা রাখিয়া বিছানার উপর পড়িয়া হাপুস্ হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিল—"ওকি?"

সাপ্‌লা বিদ্যুতাহতবৎ উঠিয়া পুস্তকখানা ট্রাঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখিল এবং দৃঢ়হস্তে চোকের জল মুছিয়া ফেলিল।

নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইতেছিল?"

সাপ্‌লা উত্তর করিল না এবং তাহার ফলে যে লাঞ্ছনা লাভ করিল তাহা বক্তব্য নহে। দণ্ডখানেক রাত্রি থাকিতে সাপ্‌লা সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ তখন গভীর নিদ্রামগ্ন, সাপ্‌লা সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, কিন্তু আননে এক অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব। ধীরে ধীরে সে অন্দরের আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে নৈশপ্রকৃতি যেন স্তব্ধ ধ্যানাসনে বসিয়া আছে, বাহির বাড়ীর পুকুরে নক্ষত্রতারকাখচিত আকাশের প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে। বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায় সাপ্‌লা কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর দৃঢ়পদে সম্মুখের

পথ ধরিয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। কিছুদুর গিয়াই একটা খাল পাইল, সাপ্‌লা সাঁতরাইয়া তাহা পার হইয়া গেল। খালই গ্রামের সীমানা, তার পরই বিস্তৃত মাঠ আরম্ভ হইয়াছে। সাপ্‌লা সিক্ত বসনে সেই স্তব্ধতার মধ্যে জনশূন্য মাঠের পথ দিয়া তাহার বাপের বাড়ীর গ্রামের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বদিক যখন ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে তখন সাপ্‌লা দেখিল, যে অন্য এক পথ দিয়া কয়েকজন পশ্চিমা বেহারা যাইতেছে। দেখিয়া তাহার হৃদয়টা একবার কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে সাহসে ভর করিয়া ডাকিল—"জমাদার!" বেহারাগণ ডাক শুনিয়া চমকিয়া ফিরিল এবং এই উষাকালে জনশূন্য মাঠের মধ্যে একাকিনী বালিকাকে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইল। সাপ্‌লার কাছে যাইয়া বয়োবৃদ্ধ জমাদার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি কোথায় যাইবে মাইজি?"

সাপ্‌লা ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমাকে হরিপুর নিয়ে চল জমাদার, আমার বাপ তোমাকে অনেক বকশিস্ দিবেন।" বৃদ্ধ জমাদার আরও কাছে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল এবং সঙ্গীদিগের প্রতি চাহিয়া বলিল—"আরে, এ যে সত্যশরণ বাবুর লেড়কী? আমরাই ত একে উহার শ্বশুরের ঘরে রাখিয়া আসিয়া-ছিলাম। তুমি কি শ্বশুরের ঘর হইতে চলিয়া আসিয়াছ মাইজি?"

সাপ্‌লা নীরবে মস্তক নাড়িয়া উত্তর দিল। বেহারা-গণ পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, এ অবস্থায় ইহাকে সত্যশরণ বাবুর নিকট লইয়া যাওয়াই সমীচীন হইবে।

বৃদ্ধ জমাদার বলিল—"চল মাইজি, তোমার বাবার কাছে তোমাকে নিয়ে যাই।"

সাপ্‌লা বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

গ্রামে একটা নূতন বাজার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সপ্তমীর দিন তাহা খুলিবে, তাই সত্যশরণ বাবু এবং গ্রামের অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক সপ্তমীর দিন প্রাতে সেই নূতন বাজারে সমবেত হইয়াছিলেন। সহসা দুরে সাপ্‌লাকে বেহারাদের সহিত আসিতে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে তিনি সোদ্বেগে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। সাপ্‌লা কিয়ৎ দুরে প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, কিরূপে সাপ্‌লা শ্বশুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং কিরূপে মাঠের মধ্যে তাহারা তাহাকে পাইয়াছে, বৃদ্ধ জমাদার তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিল। সমবেত সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সত্যশরণ বাবু উঠিয়া জমাদারের হাতে দুইটী টাকা দিয়া বলিলেন—"এই লও তোমার বকশিস্ আর,—" পকেট হইতে আর একটী টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"তুমি এখনি দৌড়িয়া যাইয়া ওর শ্বশুর বাড়ীতে খবর দিয়া আইস, যে ও এখানে চলিয়া আসিয়াছে। পরে কন্যার নিকট যাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"বাড়ী চল।" সাপ্‌লা যন্ত্রচালিতের মত সত্যশরণ বাবুর পাছে পাছে চলিল।

বাড়ীর উঠানে বসিয়া সত্যশরণ বাবুর স্ত্রী কি কাজ করিতেছিলেন। সত্যশরণ বাবুর পাছে পাছে সাপ্‌লাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, বেহাই বুঝি মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি সহর্ষে উলুধ্বনি দিয়া উঠিলেন। সত্যশরণ বাবু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—"উলু দিতেছ?—কেটে ফেল এমন মেয়েকে, কেটে ফেল—" তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

সাপ্‌লার মা স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? কি হইয়াছে?"

সত্যশরণ বাবু ভাঙ্গাকণ্ঠে বলিলেন—"সাপ্‌লা শ্বশুর বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।" সাপ্‌লা দুরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। তাহার মা দৌড়িয়া গিয়া অশ্রুজলে কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন—এবং "আয় মা, হতভাগিনী মা আমার—" বলিয়া কন্যাকে বক্ষে ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। মাতা-পুত্রীর অশ্রুজল গৃহতল সিক্ত করিতে লাগিল।

তখন চতুর্দ্দিকে আগমনীর বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

শিবসুন্দরী পাটনী

ফুল কোথায় না বিকশিত হয়? রাজোদ্যানে যে ফুল ফোটে তাহার যশোগৌরব শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; গায়কের রসনায় তাহার শোভা ও সৌরভের গাথা কীর্ত্তিত হইতে থাকে। কিন্তু বিজন বনান্তরালে যে কত ফুল স্বর্গের মাধুরী বুকে লইয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে এবং কাননের নীরব প্রকৃতিকে যেন সংবর্দ্ধনা করিয়া বনেই নীরবে ঝরিয়া পড়ে তাহাদের সংবাদ কে লয়? শিবসুন্দরী পাটনী ঐরূপ একটি বনফুল,—বিংশ শতাব্দীর তীব্র শিক্ষালোক হইতে দূরে থাকিয়া স্বর্গীয় শোভা ও সৌরভে গড়কাশিমপুরের একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আমোদিত করিয়া নীরবে কালের বক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শিবসুন্দরী প্রকৃতি-বক্ষে প্রতিপালিতা, স্বভাবে পরিবর্দ্ধিতা দরিদ্র-দুহিতা। কিন্তু স্বভাব হইতে তিনি যে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, অনেক ধনী-গৃহে তাহা দুর্লভ। তাই তাঁহার ক্ষুদ্র জীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রিয় পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতে সাহস করিতেছি। ভারত রত্নভূমি, নারী-চরিত্রের পবিত্রতা—সতীত্ব গৌরবে চির গৌরবান্বিত। পুণ্যস্থান ভারত-বর্ষের খনিগর্ভে কত রত্ন যে লোকচক্ষুর অগোচরে নিহিত রহিয়াছে—দরিদ্রের কুটীরে কত সীতা সাবিত্রী শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাতে থাকিয়া, গৃহলক্ষ্মী রূপে এখনও বিরাজ করিতেছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? সাধ্বী শিব-সুন্দরীর জীবন তাহারই সামান্য নিদর্শন মাত্র। যদি এই মহনীয়া নারী গুণগ্রাহিতার লীলাভূমি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কোন প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার গুণের সম্যক আদর হইত। ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণেতা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, "নারীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে নতুবা তাহারা রক্ষা পাইতে পারে না।" কিন্তু রমণী যে কিরূপ ধর্ম্মের স্বাভাবিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অনেক শিক্ষা-লোকবর্জ্জিতা পল্লীবাসিনী তাহার প্রমাণ। সেই দেব পূজার অসংখ্য অনাদৃত পবিত্র নির্ম্মাল্যের মধ্যে শিব-সুন্দরী একটি নির্ম্মাল্য।

গড়কাশিমপুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন পল্লী। নাতিপ্রসরদেহা, খরস্রোতা একটি নদী প্রবাহিতা থাকিয়া ইহাকে সজীব রাখিয়াছে এবং শ্যামল বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও ফুল ফলে শোভিত করিয়াছে। এখানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও ভদ্র কায়স্থ বাস করেন এবং অনেক নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকও এখানকার অধিবাসী রূপে গণ্য। তিলকরাম পাটনী তাহাদের মধ্যে অন্যতম। শিবসুন্দরী তাঁহারই কন্যা।

শিবসুন্দরী শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিক আলোক লাভ করিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িকতার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে তাহা নিবদ্ধ ছিল না। তাঁহার স্নেহ স্বর্গ-মন্দাকিনীর ন্যায় সকলের উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইত। স্বাভাবিক বৈরাগ্য, বিনয়, বিশ্বাস ও ভক্তিতে তিনি ভূষিতা ছিলেন।

চারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে চৈতন্যচন্দ্রের যে নির্ম্মল আলোক ভারতের সকল স্থানে দীপ্তিলাভ করিয়াছিল আজি তাহা নির্ব্বাপিত-প্রায়! কিন্তু অনেক দরিদ্র-কুটীরে স্তিমিত দীপশিখার ন্যায় এখনও তাহা প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবসুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, একথা বলাই বাহুল্য। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষার যে অবস্থা ছিল তাহাতে কয়জন পল্লীবাসী উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দু আপনাদের কন্যাগণকে সুশিক্ষিতা করিতে যত্নবান হইতেন? নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণের তো কথাই নাই। এই শ্রেণীর অনেক বালিকারই বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় ঘটিত না। কিন্তু তিলকরাম কন্যাকে যত্নে শিক্ষা প্রদান করিতেন; শিবসুন্দরী উচ্চ শিক্ষালাভ না করিলেও পিতার যত্নে ও স্বকীয় স্বাভাবিক প্রতিভায় অনেক সরল বাঙ্গলা পদ্য পুস্তক সুন্দর পাঠ করিতে এবং তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। কৃত্তি-বাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাস কৃত মহাভারত তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। দুরূহ বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদ্য গ্রন্থ সকলও তিনি নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিতেন।

শিবসুন্দরী ষোড়শ বৎসর বয়সে বিধবা হন। জীবন-প্রারম্ভে সর্ব্বস্ব হারাইয়া বালবিধবা দুহিতা পিতৃগৃহেই

আশ্রয় লাভ করেন। এই সময় হইতে শিবসুন্দরী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-পুষ্পে যে অর্ঘ্য রচিত হইয়াছিল তীর্থভ্রমণ তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

সকলেই ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। বেদান্তে ব্রহ্মচর্য্যকে যোগমার্গে গতির এক প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুবর্ণযুগে পুরুষ এবং রমণী উভয়েই সমভাবে এই মহাব্রত পালন করিয়া জন্মভূমিকে ধন্য করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজ বক্ষে নারীই এই গৌরবপূর্ণ পূর্ব্ব সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অবশ্য দুই চারিজন মহাপুরুষ এখনও পাহাড় পর্ব্বতে কিংবা নির্জ্জন কাননে এই মহাব্রত পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সমাজ হইতে বহু দূরে রহিয়াছেন। যেখানে বয়স্ক পুরুষও বালিকা-ভার্য্যা গ্রহণে বিরত নহেন—সেখানে যখন দেখিতে পাই তরুণী বিধবাগণ কুসুম-সুকুমার হৃদয়ে স্বর্গের বল ধারণ করিয়া অম্লান বদনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছেন, তখন কেন না বলিব, যে নারীই এই ব্রতের একমাত্র রক্ষয়িত্রী?

শিবসুন্দরী যে সমাজে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সাধন করিতেছিলেন, সে সমাজ ও সংসর্গ তাঁহার পক্ষে একেবারেই অনুকূল ছিল না। ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষাও দুর্দ্দান্ত লোক দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন,—তাঁহার চারিদিকে বিলাসিতা ও ভোগবাসনার দুর্নিবার স্রোত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু অগ্নিকে যেমন কোন মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে না, সে আপন জ্যোতিতে আপনি সমুজ্জ্বল থাকিয়া চারিদিক আলোকিত করে; তেমনি শিবসুন্দরীকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইত না, বরং তাঁহার পুণ্য প্রভাবের নিকট নিতান্ত পাপাচারীর হৃদয়ও শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই যেন অপার্থিব তেজ দীপ্তি পাইত। শিবসুন্দরীকে প্রতিবেশীগণ দেবীর ন্যায় সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। তাঁহার প্রশংসা সকল শ্রেণীর লোকের মুখেই ধ্বনিত হইত। সেই স্থির গম্ভীর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিলে আমাদের মনেও কি একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব উপস্থিত হইত। তিনি কাহারও সঙ্গে বেশী মিশিতেন না, নিজে সর্ব্বদা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থগুলিই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও প্রকৃত সৎসঙ্গ ছিল। ঐ সকল কঠিন ভাবপূর্ণ গ্রন্থের কোন কোন স্থানের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা তিনি করিতেন, যে শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হইত। ধর্ম্মের অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব তাঁহার মুখে শুনা যাইত।

প্রকৃত পক্ষে ভগবান জ্ঞানস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হন তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের অমূল্য তত্ত্ব সকল স্বতঃই প্রকাশিত হইতে থাকে।

নাম জপই শিবসুন্দরীর প্রধান সাধন ছিল। সর্ব্বদা নাম সাধনে তিনি আপনাকে নিমগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি সারাদিন পূজা অর্চ্চনা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতিতে রত থাকিতেন। মৃত পতির কাষ্ঠ-পাদুকা সযত্নে রক্ষা করিয়া প্রতিদিন তিন বেলা পুষ্প-চন্দনে তাহার অর্চ্চনা করিতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এ নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই। অদ্ভুত পতিভক্তি এবং পতির পবিত্র স্মৃতি যেন প্রতি শিরা ধমনী,—প্রতি রক্ত-বিন্দুতে অবিরাম মিশ্রিত থাকিয়া তাঁহাকে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। পতিই যে নারীর চির আরাধ্য,—জীবনে মরণে সতীর একমাত্র অবলম্বন, ভারতের ব্রহ্মচারিণী তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান চিরদিনই করিতেছেন।

শিবসুন্দরী অতিথি ও বৈষ্ণব সেবায় সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার গৃহে অতিথি দেখা যাইত। তিনি সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। কিন্তু নিজে দিনান্তে একবার মাত্র অন্ন গ্রহণ করিতেন। কখন কখন সমস্ত দিন রাত্রি উপবাসে চলিয়া যাইত। ক্রমাগত দুই তিন দিনও ফল মূলাহার

করিয়া কাটাইতেন। সন্ধ্যাকালে মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে তাঁহারা অঙ্গন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। যখন রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িত, তখন ঐ ধর্ম্ম-প্রাণা নারী আপন ইষ্টদেবের ধ্যান ধারণা ও নাম জপে রত হইতেন। প্রতিদিন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিতেন এবং সামান্যই নিদ্রা যাইতেন।

কোন কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকের মুখে শুনিয়াছি, শিবসুন্দরী গভীর রাত্রিতে নাম সাধনে এমন তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে কখন কখন বন্য পথে বাহির হইয়া নৈশ-নিস্তব্ধ মুক্ত প্রকৃতির নীরব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে নামরসে নিমগ্ন হইতেন। ঐ স্থানে দুষ্ট লোকের ভয়ে দরিদ্র পুরমহিলাগণ দিবা ভাগেই ঘরের বাহির হইতে সাহস করিত না, তাহার উপর ব্যাঘ্র-ভয়ও অল্প ছিল না। শিবসুন্দরী যখন নাম জপে রত থাকিয়া রাত্রিতে পথে বাহির হইতেন, তখন অনেক দিন নাকি অদূরে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন শ্রুত হইত। কিন্তু যিনি অভয় পদে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার ভয় কাহাকে ? দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইত। শিবসুন্দরী বলিতেন,—"এই জগৎ শ্রীহরির মন্দির, সর্ব্বত্রই তিনি রহিয়াছেন।" যিনি বিশ্বকে শ্রীহরির মন্দির ভাবিয়া সমস্ত ভয় ভাবনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই সামান্য মানবী নহেন।

একজন মুসলমান মহর্ষির উক্তি আমাদের স্মরণ হইতেছে ;—"বিশ্বাসী যেখানে থাকেন, ঈশ্বর সঙ্গে থাকেন।"

শিবসুন্দরী অবিশ্রান্ত ধর্ম্ম সাধনে ব্যাপৃত থাকিলেও কর্ম্মে অলস ছিলেন না। অনেক সময় তিনি নিপুণতার সহিত শ্রমসাধ্য কার্য্যেও নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি নিজ শরীর রক্ষায় একেবারেই মনোযোগী ছিলেন না। দীর্ঘ-কাল শারীরিক নিয়ম ভঙ্গের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে শিবসুন্দী দেহত্যাগ করেন।

কেহ কেহ আমার কথাগুলি অত্যুক্তি মনে করিতে পারেন। প্রায় ছয় বৎসর কাল তাঁহার প্রতিবেশিনী রূপে বাস না করিলে আমার নিকটেও এসকল কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মময় কঠোর জীবন-ব্রত,—তাঁহার ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি, তাহার বিষয় সামান্যই লেখা হইল।

শ্রীকুমুদিনী বসু।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

প্রাচীন কালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কলম্বসের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ ইত্যাদি পাঠ করিলে আমরা সমুদ্রাদির যেরূপ অবস্থা জ্ঞাত হই, তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তেমন কিছু পার্থক্য দেখা যায় না। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন ছিল এখনও প্রায় সেই প্রকারই আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, সমুদ্র দিন দিনই শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর জল যদি এইরূপে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়াই যাইতেছে তবে আমরা সাগর মহাসাগর প্রভৃতির জলে তাহার পরিচয় পাই না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একটী শক্তি যেমন ক্রমাগত সমুদ্রজল শুষ্ক করিতেছে আর একটী বিরোধী শক্তি তেমনই প্রচুর পরিমাণে জল সমুদ্রে জোগাইতেছে। এই জন্যই হাজার হাজার বৎসরেও আমরা সমুদ্র-জলকে প্রায় এক ভাবেই দেখিতেছি। কিন্তু মোটের উপর এই দুই শক্তির সংগ্রামে জলশুষ্ককারিণী শক্তিই জয় লাভ করিতেছে। সুতরাং ধীরে ধীরে—লক্ষ লক্ষ বৎসরে—পৃথিবীর সাগর মহাসাগর, নদ নদী, সমস্তই এককালে শুষ্ক হইয়া যাইবে। পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যে স্থির করিয়াছেন, চন্দ্রে এক সময় নদ নদী সাগর মহাসাগর বিদ্যমান ছিল, এখন সে সকলই শুষ্ক। আমাদের এই শস্য পরিপূর্ণ, বৃক্ষলতা ও ফলপুষ্প শোভিত পৃথিবীও নাকি এক দিন চন্দ্রের দশা প্রাপ্ত হইবে।

গ্রীষ্মকালে, একখানা থালায় অথবা একটী বাটিতে যদি সামান্য একটু জল রাখা যায় তবে আমরা দেখিতে পাই, অল্পক্ষণ মধ্যে সেই জলটুকু কোথায় মিলাইয়া

গিয়াছে, থালা বা বাটির জল শুকাইয়া গিয়াছে। কারণ জল সব সময়ই শুকায়—কখনও দ্রুতবেগে—কখনও ধীরে ধীরে, শুকাইয়া বাতাসে উড়িয়া যায়। ছোট পাত্রের পক্ষে যে কথা বড় বড় পাত্র অর্থাৎ সাগর মহাসাগরের পক্ষেও সেই একই কথা। সাগর মহাসাগরের জলও শুষ্ক হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছে।

সমুদ্রের জল বাষ্পের আকার ধারণ করিয়া আকাশে জল যদি কেবল শুকাইয়াই যাইত তাহা হইলে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত জলাশয় সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইত—শুধু আমাদের কেন, কোন প্রাণীরই পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হইত না। জল ছাড়া আমাদের এক দিনও চলে না। সে আবার যে সে জল হইলে চলে না, বাষ্পাকার জল হইলে চলিবে না, ভিজা জল—তরল জল চাই। বাষ্পময় জল পৃথিবী পূর্ণ

সমুদ্র হইতে জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে, বাষ্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি ও ঝরণা এবং ঝরণা হইতে নদী উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে।

উড়িয়া যায়। বায়ুর মধ্যে বাষ্পাকারে এই জল সর্ব্বদাই রহিয়াছে। বায়ুতে যে জল আছে, শীতকালে অতি সহজেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। শিশির-বিন্দুই তাহার প্রমাণ। গ্রীষ্মকালে পুকুর, কূপ প্রভৃতির জল কত তাড়াতাড়ি কমিয়া যায় সকলেই তাহা দেখিয়াছেন; ছোট ছোট কূপ তড়াগে যাহা দেখা যায় বড় বড় সমুদ্রেও তাহাই ঘটিতেছে—সেখানকার জলও অবিরত শুকাইয়া উড়িয়া যাইতেছে। যদি শুধু এই বিশোষণ ক্রিয়াই চলিত অর্থাৎ সমুদ্রাদির করিয়া থাকিলে কি হইবে? পানের জন্য এক ফোঁটা জল না পাইলে লক্ষ মণ জলীয়বাষ্পেও আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে তরল জল যেমন শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিতেছে আর একটী বিপরীত ক্রিয়া সেইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে জলীয়বাষ্পকে জলে পরিণত করিতেছে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা আকাশে বাষ্প হইতে মেঘ ও বৃষ্টির এবং রাত্রিকালে ভূপৃষ্ঠে শিশিরের সৃষ্টি হইতেছে।

এইরূপে প্রকৃতির নিয়মে বাষ্প মেঘ বৃষ্টিতে পরিণত

হইয়া ঝরণার সৃষ্টি করিতেছে, ঝরণা সকল মিলিয়া নদীর সৃষ্টি করিতেছে. নদী যাইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে—কিন্তু তবুও সমুদ্র পরিপূর্ণ হইতেছে না। কেন পূর্ণ হইতেছে না তাহার কারণ বলিয়াছি—সমুদ্রের জল শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। যদি এইরূপে জল শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত না হইত তবে পৃথিবীতে বৃষ্টি হইত না। নদী বহিয়া সমুদ্রে পড়িত না।

জল বাষ্প হইতেছে, বাষ্প আবার বৃষ্টি হইতেছে, অনন্ত কাল ধরিয়া যদি এই ভাবেই চলে, তবে এই একঘেয়ে কাণ্ডটা কি বৃথা বলিয়া মনে হয় না? কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? ঈশ্বর যদি জলের রূপান্তর প্রাপ্তির ব্যাপারটা একবার থামাইয়া দেন তবে পৃথিবীতে জীবের চিহ্ন মাত্র থাকে না।

এখন আর একটা বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা যাক। বাষ্পাকারে যে জল আকাশে উড়িয়া যাইতেছে তাহার সমস্তটুকুই ফিরিয়া পৃথিবীতে আসিতেছে না। কেহ যদি খুব জোরেও লাফাইয়া আকাশে উঠিতে চায়, বেশী দূর উঠিতে পারে না। কারণ, মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী আমাদিগকে টানিয়া নামায়। সেইরূপ আকাশের বাষ্পরাশিকে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী তাহার নিকটে টানিয়া রাখে, কিন্তু উর্দ্ধে—অনন্ত আকাশে অধিক দূর পর্য্যন্ত পৃথিবীর এ আকর্ষণ চলে না। এমন একটা সীমা আছে যাহার বাহিরের বস্তুকে পৃথিবী আর আকর্ষণ করিতে পারে না। সেই সীমার কাছাকাছি যে সকল বাষ্প, গ্যাস প্রভৃতি নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের ধাক্কা ধাক্কিতে একটু একটু বাষ্প ও গ্যাসের অংশ সময় সময় প্রবল বেগে উক্ত সীমা পার হইয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া যায়, আর তাহা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না। এই উপায়ে পৃথিবীর জল অতি অল্প পরিমাণে ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলে কি হয়? লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া একটু একটু করিয়া জল কমিয়া যাইতেছে।

এই কারণে ধীরে ধীরে পৃথিবীর অনেক সাগর-উপসাগর হ্রদ নদী শুকাইয়া যাইতেছে। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, পৃথিবীতে মরুভূমির পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়—পৃথিবীর জলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিতেছে। মঙ্গোলিয়ার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে লব্‌নর নামক একটী হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই

লব্‌নর একটী অতি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। ক্রমে ক্রমে তাহার জল কমিয়া যাওয়াতে সেই স্থলে এখন কতকগুলি ছোট ছোট হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। লব্‌নরের তীরবাসী যে সকল জেলে এক সময়ে সেই প্রকাণ্ড হ্রদ হইতে মাছ ধরিত, বৃদ্ধ বয়সে তাহারাই এখন শুষ্ক হ্রদে হাল চাষ করিতেছে। সেখানে এখনই অনেক স্থানে জলাভাবে গাছপালা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, লোকে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া দূরে সরিয়া পড়িতেছে। ক্রমে জল যখন আরও শুকাইবে তখন লব্‌নরের সমুদয় বক্ষ বালুকাময় কঠোর মরুভূমিতে পরিণত হইবে, বালি আর বাতাসে মিলিয়া সেই জনপূর্ণ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, পর্ণকুটীর হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সকলই বালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া যাইবে।

মধ্য এশিয়াতেই এই জল বিশোষণ ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বেগে চলিতেছে। বৎসরের পর বৎসর এই অঞ্চলের মরুভূমি বিস্তৃততর হইতেছে। দুই হাজার

বৎসর পূর্ব্বে—বোধ হয় তাহারও পরে আমুদরিয়া নদীটী কাস্পিয়ান সাগরে গিয়া পড়িত। এখন তাহা আরল হ্রদে পড়িতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, নদীটী তখন আরও দীর্ঘ ছিল; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কাস্পিয়ান সাগর তখন আরও বিস্তৃত ছিল; আরল হ্রদের সঙ্গে তখন তাহা মিলিত ছিল; কাস্পিয়ান সাগর ও আরল হ্রদ উভয়ে মিলিয়া তখন এক প্রকাণ্ড সাগর ছিল; এখন তাহার দুই-তৃতীয়াংশই শুকাইয়া গিয়াছে।

এই যে একটু একটু করিয়া জল কমিতেছে, ইহাতে পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিশেষ পরিবর্ত্তন আর কি হইতেছে? হাজার হাজার বৎসরে একটু একটু করিয়া মরুভূমির পরিমাণ বাড়িতেছে, ইহাতে কি আসে আর যায়? বস্তুতঃ তাহা নহে। মঙ্গোলিয়ায় মরুভূমি বৃদ্ধি হওয়াতে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে হাজার হাজার লোক সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানের অভাবে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে এবং তাহার পর ইউরোপে বর্ত্তমান নূতন সভ্যতার সূত্রপাত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অতি সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে গিয়া পৃথিবীর কতই পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। এই উপায়ে মরুভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে আরও কত লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, তাহা এখন অনুমান করাও কঠিন।

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেখানে জলীয় বাষ্প নাই—নদী নাই—সমুদ্র নাই। এক সময়ে যে সেখানেও জলীয় বাষ্প, নদী, সাগর, উপসাগর ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এখনও চন্দ্রপৃষ্ঠে নদ নদী ও সাগরাদির শুষ্ক বক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর জলীয় বাষ্প এখন যেমন একটু একটু করিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের হাত এড়াইয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া যাইতেছে, ঠিক সেই ভাবে চন্দ্রের জলীয় বাষ্পও চন্দ্রের আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ, তাহার আকর্ষণ-শক্তিও সামান্য, এজন্য জলীয় বাষ্প সহজেই চন্দ্রলোক হইতে ছুটিয়া দূরে পলাইতে পারিয়াছে। এই কারণেই চন্দ্র এখন জীব-বিহীন উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে।

মঙ্গল গ্রহ অনেকটা আমাদের পৃথিবীর ন্যায়। সেখানকার আকাশে অতি সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে এবং মঙ্গলের পৃষ্ঠেও অল্প পরিমাণ জল আছে। মঙ্গল আকারে চন্দ্র অপেক্ষা বড়, কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। তবে বয়সে মঙ্গল বোধ হয় আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। ইহার জল পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে মহাশূন্যে পলায়ন করিতেছে; কারণ মঙ্গলের আকৃতি ছোট বলিয়া তাহার আকর্ষণ-শক্তিও অল্প, আর পৃথিবী অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেক পূর্ব্ব হইতে ইহার জল পলাইয়া যাইতেছে। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ বিশ্বাস করেন, মঙ্গল গ্রহে মনুষ্যের ন্যায় এক প্রকার জীব বাস করে। জল ব্যতীত তাহারাও বাঁচিতে পারে না। এজন্য মঙ্গল গ্রহে যে অল্প পরিমাণ জল আছে, অনেকে ইঞ্জিনিয়ারী বুদ্ধি খাটাইয়া অসংখ্য খাল কাটিয়া সেই জলটুকু প্রয়োজন মত নানা-স্থানে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে।
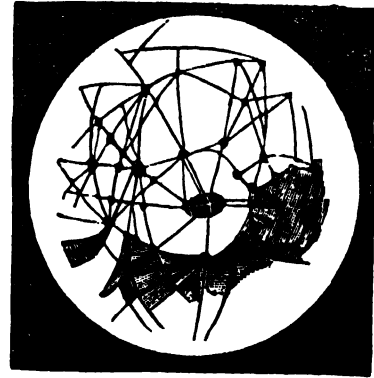
মঙ্গল গ্রহের খাল।

মঙ্গলে লোক আছে কি না আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে, কারণ সেটা অনুমানের কথা মাত্র, কিন্তু খালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সিয়াপ্যারেলি (Schiaparelli) নামক ইটালি দেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রথমে মঙ্গলের খালের অস্তিত্ব

অনুমান করেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, এজন্য বহুকাল পর্য্যন্ত লোকে তাঁহাকে ঠাট্টা তামাসা করিত। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রের উন্নতির ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থান হইতে মঙ্গলের খালের ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। সেই ফটোগ্রাফগুলি নিশ্চয়ই কাল্পনিক পদার্থ নয়। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিয়াপ্যারেলির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মঙ্গলের খালের ফটোগ্রাফ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইহার যে আবার ফটোগ্রাফ তুলিতে পারা যাইবে, আমি স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারি নাই।"

যে সকল মহা পণ্ডিত মঙ্গল গ্রহের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা এখন বলিতেছেন, বুদ্ধিশক্তি বিশিষ্ট একপ্রকার জীব নিশ্চয়ই মঙ্গলে বাস করিতেছে,—আর মানুষের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাহাদের পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে কি প্রকার জীব তাহা বলা কঠিন। মঙ্গলে জল থাকিলেও পৃথিবীর মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিবে না। কারণ আমাদের এই সাধের পৃথিবীর এমন অনেক জিনিষেরই সেখানে অভাব আছে যাহার অভাবে মনুষ্য জীবনধারণ করিতে পারিবে না। সকলেই জানেন, বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন্ বাষ্প আছে বলিয়া আমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গলের বায়ুতে আমাদের জীবন ধারণের উপযোগী যথেষ্ট অক্সিজেন্ নাই।

জলাভাবে চন্দ্র জীবশূন্য হইয়াছে, মঙ্গলেরও কণ্ঠ শুষ্ক-প্রায়। একই প্রণালীতে পৃথিবীর জলও শুষ্ক হইতেছে; কিন্তু পৃথিবীর আকার বৃহৎ, এজন্য তাহার প্রবল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া অতি অল্প জলই পলাইতে পারিতেছে। সুতরাং পৃথিবী জলশূন্য হইতে এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে। সেই ভয়ে অবশ্য এখনই আমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! কত আশ্চর্য্য শক্তি-সামর্থ্যে ভূষিত করিয়া তিনি এক একটি মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, কত শক্তির পরিচয় দিয়া তাহাদের জীবন-লীলার অবসান হয়, অসার মৃতদেহ মাত্র পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। গ্রহ উপগ্রহেরও কি ঠিক সেই অবস্থা? কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জাতি, কত অদ্ভুত শক্তিশালী মানুষ পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য শক্তিরই পরিচয় দিতেছে, কত নদ নদী, কত বৃক্ষ লতা পুষ্পে এই পৃথিবী কি মনোরম শোভাই ধারণ করিয়াছে। কিন্তু হায়! আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী জলাভাবে একদিন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইবে—এক দিন সকলই হারাইয়া চন্দ্রের ন্যায় ইহার মৃতবৎ দেহ এই বিশাল বিশ্বের এক কোণে পড়িয়া থাকিবে, একথা ভাবিতেও কষ্ট হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

জাহানারা

জাহানারা সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুবিখ্যাত বেগম মমতাজ মহল তাঁহার জননী। জাহানারা অতি বুদ্ধিমতী ও সদ্গুণশালিনী নারী ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর জননীর ন্যায় স্নেহে তিনি বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। আওরঙ্গজেব পিতা সাজাহানকে কারারুদ্ধ করিলে ভ্রাতার অনুমতি লইয়া জাহানারা কারাগারে পিতার সেবায় নিযুক্ত হন। এবং সাজাহানের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে তাঁহার সেবা করেন। (ভাঃ মঃ সঃ।)

জাহানারা। পিতঃ, আসিয়াছি আমি!

সাজাহান। জাহানারা কন্যা, মা আমার,
মরুদগ্ধ এ জীবনে করি স্নিগ্ধ সুধার সঞ্চার
কোথা হতে এলি তুই? একি স্বপ্ন?

জাহানারা। স্বপ্ন নহে পিতঃ,
সত্য আমি আসিয়াছি! হে সম্রাট, হে মহিমান্বিত,
চেয়ে দেখ মোর পানে!

সাজাহান। হায় বাছা, কত কাল পরে
পিতৃ সম্বোধনে মোর সন্তাপিত তৃষিত অন্তরে
জুড়ালি সহসা আজি। সাধ যায় আরো কোটী বার
মধুমাখা কণ্ঠে তোর শুনি শুধু, অয়ি মা আমার,
ও মধুর সম্ভাষণ! কিন্তু বাছা, তুই কেন এলি
অন্ধকার প্রাণে মোর তড়িৎ-হিল্লোল হায় খেলি'

ক্ষণেকে লুকাতে মাগো, করি আরো নিবিড় গভীর
প্রাণের আঁধার রাশি!

জাহানারা। হে সম্রাট!

সাজাহান। বৎসে! হ'রে স্থির।
কে তোর সম্রাট হেথা? ওই নামে ডাকিস্‌নে আর!
পুত্র-স্নেহে অন্ধ আমি, কারাগার প্রাসাদ আমার—
বন্দী আমি আজি তায়! রাখি শুধু স্মৃতির দংশন
সম্রাটের রাজদণ্ড কেড়ে নিল নিষ্ঠুর ভুবন
গৌরব সম্ভ্রম সনে! জাহানারা! বাছনি আমার,
সম্রাটের আখ্যা আজি মোর পাশে বিদ্রূপ অপার
জ্বালিস্‌নে তুষানল! যদিও রে পিতৃ সম্বোধনে
স্পর্শিয়াছে কালকূট, তবু তোর ও কচি আননে
"বাবা" বলে মোরে মাগো! ডাক্ আরবার!

জাহানারা। স্নেহময়
পিতা মম! অজ্ঞানেতে অনিচ্ছায় ব্যথিনু হৃদয়,
ক্ষমা কর কৃপা করে! তুলি বৃথা তর্ক-কোলাহল
কহিব না কোন কথা; আসিয়াছি জানাতে কেবল
তোমা ছেড়ে যাব না কোথাও, পিতৃ-পদ-সেবা-আশে
স্বেচ্ছায় বন্দিনী আমি, দিও ঠাঁই শ্রীচরণ পাশে
এই শুধু আকিঞ্চন!

সাজাহান। একি বাছা, শুনাইলি হায়!
বন্দিনী নন্দিনী মোর! নিদারুণ দুঃস্বপ্নের প্রায়
নিদারুণ বজ্রাঘাত! আজনম হতে অনুক্ষণ
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, স্নেহ দিয়ে যাহার জীবন
করিয়াছি রক্ষা, বৎসে, আজি সেই কৃতঘ্ন পামর
সেই দুষ্ট কাল ফণি আমারে—আমার প্রিয়তর
তোরেও দংশিল ক্রূর! জরাজীর্ণ মাংসপিণ্ড আমি,
নীরব নিশ্চেষ্ট হয়ে নিরখিতে হবে দিন-যামি
দুহিতার অপমান!

জাহানারা। পিতা, তুমি করিতেছ ভুল
স্বেচ্ছায় বন্দিনী আমি, অগ্রজের করুণা অতুল
পূরাতে সে মনস্কাম, অর্পিলেন মোরে অধিকার
পিতৃ-পদ-সেবা-সুখে! সত্য কহি, মোর তরে তাঁর
নাহি কোন অপরাধ!

সাজাহান। ক্ষান্ত হরে ওরে জাহানারা,
দুরাত্মার করুণা সে আমারে করেছে ক্ষিপ্ত পারা—
বহু নিদর্শন তার জ্বলন্ত গৈরিক-ধারা সম
পশিয়াছে মর্ম্মে মর্ম্মে, করিতেছি অতি তীব্রতম
অনুভব নিশিদিন।
হায় মাগো! সেই ছিল ভাল
চঞ্চলা চপলা হেন মাঝে মাঝে আনন্দের আলো
উদ্ভাসিতি দেখা দিয়ে, সুধামাখা পিতৃ সম্বোধনে
জুড়াতি হৃদয় মোর! প্রাণাধিকে, সহিবি কেমনে
সদা তীব্র কারা-ক্লেশ!
বৃদ্ধ আমি জরাতুর কায়,
জীবন-প্রদীপ-প্রভা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হায়,
নিভে আসে অতি দ্রুত, রোগে শোকে ক্ষোভে যাতনায়
প্রতিপলে প্রয়াণ-উন্মুখ, মাগো, তুই কেন তায়
রক্ষিবারে চাস্ বৃথা! দু'দিনেতে শেষ হবে সব,
দেব-আশীর্ব্বাদ সম মহাকালে হর্ষে বরি লব
সন্তপ্ত ভুবনে মোর! তুই কেন নূতন মায়ায়,
নূতন স্নেহের ডোরে বাঁধিবারে অন্তিমে আমায়
লইলি কঠোর ব্রত? আলোক-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
লয়ে কত আশা-হর্ম বিশ্বারাধ্য কল্প-লোকবৎ
সম্মুখে মা, রাজে তোর, সব ত্যজি' বৃদ্ধ পিতা তরে
(মৃত্যুর ভিখারী সে যে!) কেন মা, লইবি যাচ্ঞা করে
অরুন্তুদ গ্লানি রাশি! দাব-দাহে পুষ্পকলি মোর
কেন বৃথা সাধি নিবি? ফিরে যারে, ফিরে যারে, তোর
সে উৎসব-কলোচ্ছ্বাসে! পিতা হয়ে কেমনে বঞ্চিয়া
আনন্দ-আহ্বান হতে তোরে মাগো, রাখিব রোধিয়া
এ সমাধি কারাগারে! তাই বাছা, কহি আরবার
ফিরে যা ফিরে যা ঘরে!

জাহানারা। হে উপাস্য জনক আমার,
অর্চ্চি ও চরণ-স্বর্গ লভিব যে পুলক-গৌরব
তা'রি পাশে সংসারের যত কিছু দুর্লভ বৈভব
অতি তুচ্ছ গণি মনে। তুমি পিতা, করুণা-সাগর,—
দুহিতারে ভিক্ষা দিতে কৃপা করে হয়ো না কাতর
বঞ্চিতা করো না মোরে! যদি দূরে দাও খেদাইয়া
আমি ত যাব না ফিরি, পদ প্রান্তে রব লুটাইয়া
নিরাশ্রয় শিশু হেন!

পিতা, মোর হইতেছে মনে
সঙ্গীত কবিতা মম যত তুচ্ছ হউক্ ভুবনে
তুমি বড় ভালবাস! হেথাকার দীর্ঘ অবসরে
নিত্য নব গান রচি সুনির্জ্জনে কি আনন্দভরে
তোমারে শুনাব সদা, তুমি শুধু বসি হাসি-মুখে
ভুল মোর দিও দেখাইয়া! সংসারের কোন্ সুখে
এ আনন্দ আছে আর! বুঝি পিতা, সোণার শৈশব
আবার আসিবে ফিরে!

কি কহিব, নহে ত অজ্ঞাত তব
বিশাল বিশ্বের মাঝে জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য রূপে
আমি শুধু বরি' নিমু সারা হৃদে কত চুপে চুপে
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তব রাঙ্গাচরণ-পূজন
আমরণ প্রতিপলে, আর পিতা, পাসরি ভুবন
কবিতা সখীর সনে সুনিভৃতে খুলি প্রাণ মন
আলাপন আত্ম-হারা! অমঙ্গল সেই শুভক্ষণ
যদি আজ নিয়ে এল, চরিতার্থ হোক্ পিতা, তবে
করুণা-আদেশ লভি।

সাজাহান। ওরে মোর নিরমম ভবে
শান্তি-স্বরূপিনী বালা! লয়ে তোর পুলক-উচ্ছ্বাস
মুক্ত বিহঙ্গিনী সমা আয় তবে আয় মোর পাশ
মোর দগ্ধ মন প্রাণে সুধাস্রাবী সঙ্গীত-ধারায়
প্লাবিবারে স্নিগ্ধ করি! আয় মাগো, আরো কাছে আয়
সুকোমল বক্ষে তোর রাখি মোর জরাক্রান্ত শির
অন্তিম-নিশ্বাস ত্যজি, ভুলি মর্ম্ম-বেদনা গভীর! *

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

খাদ্যদ্রব্যের অসম্মিলন

আমরা প্রতি দিবস যাহা আহার করি সেই সকল খাদ্যের অসম্মিলন বিষয় কেহই সম্যক্ অবগত নহেন। খাদ্যদ্রব্যের অসম্মিলনে অজীর্ণ, আমাশয়, অম্লপিত্ত, জ্বর, জ্বরাতিসার প্রভৃতি কঠিন পীড়াসকল আক্রমণ করিয়া আমাদের শরীর অসুস্থ করিয়া দেয়। বর্ত্তমান সভ্যযুগে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকেই দুরারোগ্য অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, আমাশয় প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করেন। দরিদ্র অপেক্ষা ভদ্রসমাজেই অজীর্ণ, অম্লপিত্তের অধিক আধিপত্য। এই সভ্যযুগে খাদ্যাখাদ্যের বিশেষ রূপ বিচার না করাই তাহার প্রকৃত কারণ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ু ও দৈহিক গঠনানুযায়ী খাদ্যাখাদ্যের বিচার হইয়া থাকে। এক কালে ছিলও তাহাই। বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন দরিদ্র বাঙ্গালী সভ্যতার অনুকরণে মত্ত হওয়ায় এখন আর খাদ্যের নিয়ম, সময়, অসম্মিলন প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন না। তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অসম্মিলন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা একটী প্রধান কারণ। তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করান উদ্দেশ্যেই খাদ্যদ্রব্যের অসম্মিলন বিষয় আলোচনা করা হইল।

বায়ু জল ও তাপ সংযোগে জগতের যাবতীয় দ্রব্যের প্রতিনিয়ত যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এক দ্রব্যের সংমিশ্রণে অন্য দ্রব্যও সেই প্রকার ভিন্ন গুণাবলম্বী হইয়া পড়ে। ভাত ও দাইল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে রন্ধন করিয়া দাইল ভাত একত্র আহার করায় যে গুণ হয়, আবার সেই চাউল ও দাইল একত্রে খিচুড়ি পাক করিয়া আহার করিলে তাহা অপেক্ষা গুরুপাক, রুক্ষ ও উত্তেজক গুণসম্পন্ন হয়। শুধু চাউল জলে পাক করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিলে যে গুণ হয়, সেই চাউল মসলা ও ঘৃত সংযোগে পোলাও পাক করিলে, তাহা সাধারণ অন্ন অপেক্ষা অনেক ভিন্ন গুণাবলম্বী হয়। দুগ্ধ ও ভাত আমরা আদরের সহিত লঘুপাক বলকারক বলিয়া আহার করিয়া থাকি, আবার চাউল ও দুগ্ধ একত্র পাক করিলে, সুমিষ্ট পায়সান্ন দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে। আমরা যে সকল দাইল সাধারণতঃ আহার করিয়া থাকি, সেগুলি কতক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলম্বী এবং তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রধান প্রধান উপাদানগুলিও ভিন্ন ভিন্নভাবে কম বেশী দেখা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে "কেওরা" দাইল অর্থাৎ দুই তিন রকম দাইল কিছু কিছু লইয়া একত্রে পাক করিয়া খাইতে দেখা যায়।

---

* লেখকের যন্ত্রস্থ কাব্য "দেবীগাথা" হইতে সঙ্কলিত।

মৎস্য বাঙ্গালীর প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য। তাহা নানা প্রকারে আহার করা হইয়া থাকে। সকল মৎস্যের এক প্রকার গুণ নহে এবং সকল মৎস্যেই সম পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস্ নাই। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্য একত্র পাক করিয়া আহার করিলে তাহাতে অসম্মিলন দোষ জন্মে। দাইল ও মৎস্য ভিন্ন জাতীয় খাদ্য, তাঁহা একত্র আহারে নিশ্চয়ই পীড়া জন্মে; কিন্তু আমাদের দেশে মুগ, বুট ও মাষ দাইলের সহিত রোহিত, কাতলা প্রভৃতি মৎস্যের মাথা দ্বারা উত্তম মুড়িঘণ্ট আহার করা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে সাধারণ সংস্কার বশতঃ উল্লিখিত প্রচলিত আরও দুই চারিটী বিরুদ্ধ খাদ্য ভিন্ন কেহই ভাতের সঙ্গে মাছ, মাছের সঙ্গে মাংস, দুধের সঙ্গে দই, বেগুণের সঙ্গে লাউ, কচুর সঙ্গে বেগুন, আমের সঙ্গে জাম ইত্যাদিরূপ আহার করেন না। এই সকল ব্যতীত আরো কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহাদের রাসায়নিক ক্রিয়া এবং তাহাদের বৈজ্ঞানিক অসম্মিলনের বিষয় বিবেচনা করিয়া আহার করিলে দুরারোগ্য রোগ সকলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল, লবণ এই ছয় প্রকার রস সম্পন্ন দ্রব্য আমরা আহার করিয়া থাকি এবং আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য যবক্ষারজানময়, (আমিষ জাতীয়) শ্বেতসার ও শর্করামর, (শালি জাতীয়) তৈলময়, (স্নেহ জাতীয়) লবণময় এবং জলময়, এই কয় প্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন। এই সকল দ্রব্যের কোনটীর অভাব হইলেই আমাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আবার ইহাদের অল্পতা বা আধিক্যেও শরীর পীড়াগ্রস্ত হয়। যবক্ষারজানময় পদার্থের আধিক্যে তৈলময় পদার্থ অম্লজান দ্বারা আক্রান্ত ও পরিবর্ত্তিত হয়। তৈলময় পদার্থের আধিক্যে অল্প পরিমাণ অম্লজান ব্যয়িত হয় এবং যবক্ষারজানময় ও তৈলময় পদার্থের পরিবর্ত্তন হ্রাস পায়। শ্বেতসার বা তজ্জাতীয় পদার্থের আধিক্যেও ঐরূপ হইয়া থাকে। খাদ্যস্থ প্রোটীডের অভাবে মাংসপেশীর ও মনের বলক্ষয় হয়, জ্বরভাব, অজীর্ণতা, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগ জন্মে, সে জন্য ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে সহজে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায়। আবার প্রোটীডময় পদার্থ অধিক আহার করিলে শরীরে নাইট্রোজেন বিষ উৎপন্ন হয়। ষ্টার্চ্চ (শ্বেতসার) বর্জ্জন করিয়া কিম্বা ফ্যাট (মেদ) পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রোটীডময় পদার্থ আহার করিলেও শরীরে নাইট্রোজেন বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যবক্ষারজানময় খাদ্য অধিক আহার করিলে, গেঁটেবাত ও পাথুরি জন্মে। শ্বেতসারময় (চাল, গম) অধিক খাইলে বাতের ব্যারাম হয়। শর্করাময় খাদ্যের আধিক্যে বহুমূত্র রোগ জন্মে এবং অন্ত্রে কৃমি-কীট জন্মিয়া থাকে। তৈলময় খাদ্যের অল্পতায় গণ্ডমালা রোগ জন্মে। অধিক খাইলে পিত্তপ্রধান ধাতু হয়। লবণময় খাদ্যের অল্পতা বা অভাবে স্বাস্থ্যহানি হয়; রক্তের নিকৃষ্টতা জন্মে এবং শরীর জ্বর, বিসূচিকা রক্তস্রাবপ্রবণতাদি জাইমোটিক রোগপ্রবণ হয়।

জলের অপর নাম জীবন। শরীরে জলের অভাব হইলেই পিপাসা উপস্থিত হয় এবং শরীর রক্ষার ও পরিপুষ্টির বিঘ্ন হয়; আবার জলের পরিমাণাধিক্য হইলে, রক্ত রসাদি অত্যন্ত পাতলা হয় এবং ঘননির্ম্মিত বৈধানিক পরমাণু মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া তাহাদের নৈকট্যের হ্রাস করে সুতরাং তাহারা স্ফীত ও শিথিল হয় এবং তন্নিবন্ধন তাহাদের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা জন্মে। সেজন্য অজীর্ণ ইত্যাদি পীড়া জন্মে। যে সকল খাদ্য দ্রব্য সংযোগে ঐ সকল খাদ্যের অল্পতা বা আধিক্য হয় তাহাই অসম্মিলন সুতরাং সেই সকল দ্রব্য আহার করিলেই পীড়া জন্মান সম্ভব। এই সব বিবেচনা করিয়া খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত ষড়্‌রসযুক্ত খাদ্য ও ছয় প্রকার উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরস্পর একত্রে অসম্মিলন ক্রিয়া জন্মায়; যেমন তিক্ত দ্রব্যে ঝাল, কষায় দ্রব্যে তিক্ত, মধুর সহিত তিক্ত, অম্লের সহিত তিক্ত, লবণের সহিত মধুর ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত উহাদের শ্রেণী অনুসারে পরস্পর অসম্মিলন ক্রিয়া জন্মাইয়া থাকে। কোন কোন কটু দ্রব্য কোন কোন কটু দ্রব্যের সহিত, কোন

কোন তিক্ত দ্রব্য, কোন কোন তিক্ত দ্রব্যের সহিত, কোন কোন কষায় দ্রব্য, কোন কোন কষায় দ্রব্যের সহিত, কোন কোন মধুর খাদ্য, কোন কোন মধুর খাদ্যের সহিত, কোন কোন অম্ল, কোন কোন অম্লের সহিত, কোন কোন লবণ, কোন কোন লবণের সহিত অসম্মিলিত। এস্থলে গুটিকতক উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে। উল্লিখিত ষড়্‌রসযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য আমরা নিয়ত আহার করি কিন্তু কতকগুলি কটু (ঝাল) দ্রব্য যেমন গোল মরিচ, লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি কি কখন শুধু আহার করি? সেইরূপ তিক্ত দ্রব্য ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আহার করিলে কি আমরা জীবনধারণ করিতে পারি? তাহা কখনই নহে; সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য অন্য খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন পৃথক পৃথক্ ভাবে আহার বিরুদ্ধ খাদ্য।

এতদ্ব্যতীত লবণের সহিত গুড়, মধুর সহিত অন্য মিষ্ট দ্রব্য, মরিচের সঙ্গে তিক্ত দ্রব্য ইত্যাদি কি কেহ কখন আহার করিয়া থাকেন? কখনই সেরূপ দেখা যায় না। কারণ্ তাহারা পরস্পর অসম্মিলিত।

যবক্ষারজানময় খাদ্য

মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইহারা এই শ্রেণীর খাদ্যের অন্তর্গত হইলেও মৎস্যের সহিত মাংস, মাংসের সহিত ডিম্ব, ডিম্বের সহিত মৎস্য, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ খাদ্য। কারণ মাংসে যে পরিমাণ যবক্ষারজান, তৈল, লবণ, জল বর্ত্তমান আছে, মৎস্যে তাহা অপেক্ষা ঐ সকল দ্রব্য অনেক কম। এতদ্ব্যতীত মৎস্যে জল ভাগ বেশী, সেজন্য যবক্ষারজান ও তৈলময় পদার্থ অম্লজান দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঐ সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই জন্যই ইহারা একত্রে অসম্মিলন ক্রিয়া দর্শায়। ডিম্বে শ্বেতসারের ভাগ বেশী বলিয়া এবং ইহাতে ফস্‌ফরাস্ বেশী থাকায়, মাংস ও মৎস্যের সহিত সংযোজিতভাবে আহার করিলে, পাকাশয়ে এক প্রকার উদ্বেগ জন্মায় এবং তজ্জন্য অজীর্ণ পীড়া জন্মে; সেজন্য মাংসের সহিত ডিম্ব কিম্বা ডিম্বের সহিত মৎস্য বিরুদ্ধ ভোজন জ্ঞানে আমরা পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

আবার সকল জীব জন্তুর মাংস সমগুণ বিশিষ্ট নহে। সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন পশুর মাংস একত্রে ভোজন করিলে অসম্মিলন দোষ জন্মিয়া থাকে। মৎস্য শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই জাতীয় বলিয়া ঐ দুই জাতীয় মৎস্য একত্রে ভোজন বিরুদ্ধ খাদ্য। আয়ুর্ব্বেদেও মৎস্য মাংস একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্বেতসার ও শর্করাময় খাদ্য

চাউল, দাইল, যবাগু, বার্লি ও মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য। ইহারা পরস্পর অসম্মিলিত। কেহ কি কখন চাউল, দাইল, সাগু, বার্লি একত্র খাইয়া থাকেন? তাহা কখনই নহে। তাহার কারণ শ্বেতসার-ময় পদার্থ অম্লজানের সহিত বিহিতরূপে মিশ্রিত না হইতে পারিলে, শরীরের কোন উপকারে আইসে না বরং পাকাশয়ে উদ্বেগ জন্মাইয়া অপকার দর্শাইয়া থাকে এবং শুধু শ্বেতসার ঘটিত খাদ্যদ্রব্য যবক্ষারজান ও লবণাক্ত পদার্থের সাহায্য ব্যতীত পাকাশয়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। পাকাশয়ের পাকাশয়িক রস যে পরিমাণ শ্বেতসার ঘটিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও পরিপাক করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক হইলে উহা পরিপাক হইতে পারে না। সেজন্য ওরূপ আহার রুচিকর ও সুবিধাজনক নহে বলিয়া উহাদের একত্র ভোজন নিষেধ। যবক্ষারজানময় খাদ্যদ্রব্যের সহিত শ্বেতসার ও শর্করাময় দ্রব্য বিরুদ্ধ খাদ্য অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিলে তাহা পাকাশয়িক রসে পরিপাকের অনুপযোগী হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি দ্রব্য শর্করাময় দ্রব্যের সহিত অসম্মিলিত, যেমন মূলা, ঘৃত, মধু বা মাংসের সহ পাক করিলে অসম্মিলন হয়। মধু উষ্ণ হইলেই বিরুদ্ধ খাদ্য হয়। মৎস্যের সহিত মধু বা ইক্ষুরস মিশ্রিত হইলেই বিরুদ্ধ ভোজ্য হইয়া থাকে। কদলী সহ দধি, ঘোল, দুগ্ধ বা অন্য ফলাদি মিশ্রিত হইলেই অসম্মিলন ক্রিয়া জন্মায়। তাম্রপাত্রে মধু থাকিলে অসম্মিলন ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে।

তৈলময় খাদ্যদ্রব্য

তৈল, ঘৃত, চর্ব্বি এই সকল দ্রব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সকল খাদ্যদ্রব্যে এবং উহাদের মুক্তাবস্থায় উহারা

পরস্পর অসম্মিলিত। যে সকল দ্রব্যে অধিক পরিমাণ তৈলাক্ত পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, সেই সকল খাদ্যদ্রব্যের সহিত অন্য প্রকার খাদ্য অসম্মিলিত। কারণ তৈলময় পদার্থে অল্প পরিমাণে অম্লজান ও অধিক পরিমাণে অঙ্গার ও উদজান থাকায় অধিক অম্লজান আকর্ষণ করিয়া দ্বাম্লঅঙ্গারক বাষ্প ও জল উৎপাদন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তৈলাক্ত পদার্থ পাকাশয়িক রসে পরিপাক না হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে আহার করিলে, শীঘ্র তাহা পরিপাক না হইয়া অম্ল, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি কঠিন পীড়া সকল উৎপাদন করে। তৈলময় খাদ্যদ্রব্যের সহিত শর্করাময় খাদ্য বিরুদ্ধ,—ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কাংস্যপাত্রে দশ দিন ঘৃত রাখিলেই তদ্দ্বারা অন্য প্রকার গুণসম্পন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তৈলের সহিত ঘৃত, মৎস্যের সহিত ঘৃত অসম্মিলন।

লবণময় খাদ্যদ্রব্য

আমাদের শরীরের উপাদান মধ্যে লবণ একটী প্রধান ও আবশ্যকীয় দ্রব্য। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে লবণই সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট। পাকরসে যে বিযুক্ত লবণদ্রাবক ও রক্তে এবং পিত্তে যে সোডা ক্ষার আছে, তাহা লবণ হইতে উৎপন্ন হয়। শরীরে লবণাভাব হইলে রক্ত নিকৃষ্ট হয় এবং জ্বর, বিসূচিকা, রক্তস্রাব প্রভৃতি পীড়া জন্মে। সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যেই কিয়ৎপরিমাণ লবণ বর্ত্তমান থাকে। তথাপি উদ্ভিদ-ভোজীদের লবণের নিমিত্ত বিষম আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কারণ রক্তরসে যথেষ্ট পরিমাণ প্লোজমা লবণ আছে, এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ পটাসিয়ম ঘটিত লবণ আছে। অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে, পটাসিয়ম ঘটিত লবণ রক্তে প্রবেশ করিয়া রক্তস্থ ক্লোরাইড্ অব সোডিয়ম সংযোগে রাসায়নিক বিশ্লেষণ উপস্থিত হইয়া পটাশিয়ম ক্লোরাইড্ এবং সোডিয়াম কার্ব্বনেট্ বা ফস্ফেট্ নির্ম্মিত হয় এবং উহারা প্রস্রাব সহ নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং রক্তে ক্লোরাইড্ অব সোডিয়ামের অভাব হয়। এ কারণ খাদ্য দ্রব্যের সহিত লবণ আবশ্যক হয়। এক্ষণে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, যে সকল খাদ্যদ্রব্যের একত্র মিশ্রণে রাসায়নিক বিশ্লেষণে লবণের অল্পতা বা আধিক্য জন্মে সেই সকল খাদ্যদ্রব্য পরস্পর অসম্মিলিত এবং যে সকল খাদ্যদ্রব্য লবণ সংমিশ্রণে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যে সকল দ্রব্যে মিষ্টতা আছে তাহাদের সহিত লবণ ঘটিত খাদ্য অসম্মিলিত।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"সলবণং দুগ্ধং ত্যাজ্যম্।"

রাজবল্লভ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—দুগ্ধ বা দুগ্ধজ দ্রব্য লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করিলে পিত্ত বৃদ্ধি এমন কি কুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

জলময় খাদ্যদ্রব্য

উদজান ও অম্লজান এই দুই বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। জলে দুইভাগ উদজান্ ও একভাগ অম্লজান থাকে। এই দুইটী পদার্থ বিশুদ্ধ জলের উপাদান। জল শরীর ধারণের জন্য প্রধান দ্রব্য। আবার এই জল সংযোগেই সকল দ্রব্যের পচন উৎপাদন হইয়া থাকে। জল মধ্যস্থ অর্গ্যানিক, ইন্আর্গেনিক বায়ু কার্ব্বনিক এসিড, এমোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড্ ও মার্শগ্যাস প্রভৃতি বাষ্প গলিত প্রাণিদেহ ও পচনশীল উদ্ভিদংশ, এমোনিয়া প্রভৃতি দ্বারা অন্য সকল খাদ্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে পচন উৎপাদন করে বলিয়া ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য জল সংমিশ্রণে অসম্মিলন। (স্বাস্থ্যসমাচার)

কোণারক ভ্রমণ

এ জন্মে আর রাজা মহারাজা হইতে পরিলাম না বলিয়া স্পেশাল ট্রেনে চড়াটা কপালে ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু একবার স্পেশাল গো-যানে ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য জীবনে ঘটিয়াছিল।

১৯১০ সালের ৪ঠা জুন তারিখে, শনিবার অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময় চাল ডাল লঙ্কা প্রভৃতির পুঁটুলি বাঁধিয়া আমরা তিন বন্ধু স্পেশাল গো-যানে পুরী

হইতে কোণারক যাত্রা করিলাম। কোণারক পুরী হইতে ১১।১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যাঁহারা পুরী গিয়াছেন তাঁহারা জগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখের অরুণ-স্তম্ভ দেখিয়াছেন কিন্তু অনেকেই হয়তো অবগত নহেন যে উহা এক সময়ে কোণারক মন্দিরের সম্পত্তি ছিল।

পুরী হইতে কোণারকের সারা পথটা শুধু বালিরই পথ—মরুভূমির ভিতর দিয়া গমন করিতে হয়। দিনের বেলা রৌদ্রে বালু তপ্ত থাকে বলিয়া কোন গাড়ী যাতায়াত করে না। রাত্রেই গাড়ী চলিয়া থাকে। পুরীর গরু যদি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলে তবে তাহার জান প্রায় বাহির হইয়া যাইবার যোগাড় হয়, তাই কোণারকে যাইতে হইলে ওখানকার স্পেশাল গরু ও স্পেশাল গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই খবর দিয়া আনাইয়া লওয়া দরকার। কোণারকের গরুগুলি খুবই হৃষ্ট-পুষ্ট। প্রকাণ্ড দেহে অসুরের শক্তি রাখে, অথচ দেখিতে অতিশয় ভদ্র।

আমার এই ক্ষুদ্র ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে কোণারক দেখিবার অভিলাষ জন্মায়, তবে যেন তিনি স্পেশাল গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বিস্মৃত না হন। যদি ভুলক্রমে পুরীর গরুর গাড়ীতে চড়িয়া বসেন তবে গো-হত্যার অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

স্পেশাল গো-যানের কথায় কেহই হাসিবেন না। বাস্তবিকই উহা স্পেশাল ভ্রমণ। যাঁহারা কোণারকে গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন অন্যান্য গো-যানের যে মহা একটা ঢক-ঢক্ ঝাঁকুনী আছে যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠে; এ গাড়ীতে কিন্তু তাহার কোনই আশঙ্কা নাই। বালির বুকের উপর দিয়া গাড়ী চলে, তাই কোনই ঝাঁকুনী নাই। একে বালি, তায় আবার সমতল ভূমি। ক্যাঁ-ক্যোঁর-ক্যোঁ, ক্যাঁ-কোঁর-ক্যোঁ শব্দ নাই—দিব্যি আরাম।

চিল্কা হ্রদ হইতে সমুদ্রের বালুকাময় তীর বরাবর সোজা চলিয়া গিয়া কোণারকে আসিয়া উত্তরে বাঁকিয়া একটি কোণের সৃষ্টি করিয়াছে। চিল্কার পরে এবং এই কোণের পরে সমুদ্রের তীর প্রস্তরময়। এই বালুকাময় তীরের দক্ষিণ প্রান্তের মাথায় চিল্কা হ্রদ এবং উত্তর প্রান্তের মাথায় কোণারক।

কোণারক যাইবার ইচ্ছা দুই কারণে বলবতী হইয়া উঠে। এক কারণ সেখানকার মন্দির দর্শন করা, অপর কারণ সমুদ্র হইতে সূর্য্যের উদয় দেখা। পুরীতে সূর্য্যোদয় দেখা যায় বটে, কিন্তু আমি যে সময়ে সেখানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাই তখন উত্তরায়ণ থাকায় সূর্য্য সহরের বাড়ীর মাথার উপর হইতে উঠিত, সমুদ্রের বুক বিদীর্ণ করিয়া উঠিত না। তাই পুরীতে আমার সূর্য্যোদয় দর্শনের পুণ্যলাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

সহরের বাহিরে আসিয়া আমাদের গাড়ী যে রাস্তায় চলিতে লাগিল, কিছু দূর পর্য্যন্ত সেই রাস্তার দুই ধারেই কেতকী বৃক্ষের শ্রেণী দেখিতে পাইলাম। তার পর কূল কিনারা নাই—ধূ ধূ বালির সমুদ্র।

রাত্রি প্রায় ৪॥০ টার সময় আমরা কোণারকে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট (Public Works Department) এর একখানি ছোট খাটো বাংলা আছে। দুইটী ঘর, দুইটী বাথ রুম, দুই দিকে দুটী বারান্দা। বাংলায় আসবাবপত্রও মন্দ নয়। বাংলার বাগানের জন্য একজন মালী আছে ও কমোটের জন্য একজন মেথর আছে। বেশ বন্দোবস্ত—অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

আমাদের তো কোনই কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই; তার প্রধান কারণ বাংলার চাপরাশি "সুন্দর" পুরী হইতেই আমাদের সঙ্গে ছিল। খাবার জিনিষ পত্র সব আমরা বাড়ী হইতেই লইয়া যাই। সেখানে কিছুই সহজে মিলিবার নয়। রাঁধিবার জন্য একজন চাকরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু কপালের জোরে বাংলায় এক পাচক ব্রাহ্মণও জুটিয়া গেল।

বাংলায় যাইবা মাত্রই সুন্দর আমাদের জন্য অতি ক্ষিপ্রহস্তে বিছানা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল, কিন্তু আমি নিদ্রা গেলাম না। সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য জাগিয়া রহিলাম। এদিকে রাত অল্পই আছে। বাংলা হইতে হাঁটিয়া যদি সমুদ্রের তীরে গিয়া উদয় দেখিতে হয় তবে

আর সময় পাওয়া যাইবে না—কারণ সমুদ্র প্রায় ৩ মাইল দূরে। তাই মই বাহিয়া বাংলার ছাদের উপর উঠিয়া—পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া—চক্ষু খুলিয়া—ধ্যানে বসিয়া রহিলাম কিন্তু আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন থাকায় সূর্য্যোদয় দেখা ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না। ক্ষুণ্ণ মনে মই বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।

আম গুলিয়া কলা চট্‌কাইয়া চিঁড়ার মধ্যে দুধের পরিবর্ত্তে জল ঢালিয়া উত্তম রূপে প্রাতরাশ করিবার পর সুন্দরকে লইয়া মন্দির দেখিতে গেলাম।

মন্দিরটি সূর্য্য-মন্দির। উহার বাহির গায়ে খোদাই করা বড় বড় ৪টি সূর্য্য-মূর্ত্তি। দেখিতে চমৎকার। সূর্য্য-দেবের মানব-মূর্ত্তি। দুই হাতে দুই পদ্মফুল। পায়ে বুট জুতা। দাঁড়াইয়া আছেন। সূর্য্য-মন্দিরটি প্রকাণ্ড একটি রথ। মন্দিরের ভিতরে ঠিক উপরের যে অংশ তাহাতে বড় বড় চাকা খোদাই করা। সূর্য্যদেবের পায়ের তলায় সারথি অরুণ বসিয়া। হাতে লাগাম, সাত ঘোড়ার রথ চালাইতেছেন—ঘোড়া ৭টি বেশ সুন্দর। সূর্য্য-মূর্ত্তি দেখিতে অনেকটা বুদ্ধ-মূর্ত্তির ন্যায়—সচরাচর আমরা যেরূপ ছবিতে কিম্বা পাথরে খোদাই দেখিতে পাই।

মন্দিরটি নেড়া—ছাদ নাই। ইহার সম্বন্ধে দুইটী মত শোনা যায়। কেহ কেহ বলেন, ভূমিকম্পে উহার উপরটা ভাঙ্গিয়া পড়ে, আবার কেহ কেহ বলেন, তাহা নয়—মন্দিরটার মাথার উপরে খুব বড় একখানা চুম্বক পাথর বসান ছিল। বাণিজ্যের জাহাজ যখন সমুদ্র দিয়া ঐ পথে চলিত তখন ইহার আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া যাইত। এই আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে বণিকেরা ঐ স্থানে গিয়া পৌঁছায় এবং পাথর খানিকে দেখিতে পাইয়া ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান বণিকদের এই কাজ, কেহ কেহ বলেন, ইংরাজ বণিকেরাই ভাঙ্গিয়া লয়। যাই হোক্ আজ পর্য্যন্ত সবই অনুমানের উপর আছে।

হয়তো পাথর ছিল, হয়তো পাথর ছিল না; হয়তো মুসলমান বণিকেরাই ভাঙিয়া থাকিবে, হয়তো তাহা নাও হইতে পারে। কেবল নিঃসন্দেহে এইটুকুমাত্র আমরা বলিতে পারি যে মন্দিরটার ছাদ ছিল এবং আমরা ইহাও আশা করিতে পারি যে একদিন না একদিন ছাদ ভাঙ্গার যথার্থ কারণটি মানুষের কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে।

মন্দিরটি অতি প্রাচীন। বালির গর্ভ খনন করিয়া উহাকে আবিষ্কার করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধযুগের মন্দির। এবিষয়েও মতভেদ আছে।

ঐতিহাসিক আবুল ফজেল মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে মন্দিরটি বেশ শ্রীবিশিষ্ট এবং কোণারকের অবস্থা খুব উন্নত ছিল। এখন সেখানে জনপ্রাণী নাই। মরুভূমির মধ্যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কোন প্রকারে অতীতের গৌরব বহন করিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে অনেকটা জমি ঘিরিয়া খুব বড় একটি প্রাচীর ছিল। এখন কেবল তিনদিককার প্রাচীন গেটের চিহ্ন আছে—পূর্ব্বদিকে সিংহগেট, দক্ষিণদিকে অশ্বগেট, উত্তরদিকে হস্তীগেট কিন্তু পশ্চিম গেটের কোন চিহ্নই নাই। সে গেট যে কোন্ জন্তুর গেট ছিল তাহা আজও কেউ ঠিক করিতে পারেন নাই। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের খিলান স্থানে একখানা ক্লোরাইট (chlorite) পাথর ছিল। উহার দৈর্ঘ্য ১৩ হাত, প্রস্থ ৪ হাত, স্থূলত্ব ২॥ হাত। এত বড় একখণ্ড ভারী পাথরকে তখনকার দিনে কি করিয়া তুলিয়া ঐ স্থানে বসান হইয়াছিল তাহা এখনকার বড় বড় অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়-গণের মাথা ঘামাইবার বিষয়। পাথর খানা খসিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকায় এবং মন্দিরের মাথার অবস্থা ভাঙ্গা পাওয়ায় এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, মন্দিরের দেয়াল হয়তো একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে, তাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারটি পাথর দিয়া গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া এবং মন্দিরের সমস্ত ভিতরটা—মেজে হইতে যতদূর উচ্চে দেয়াল আছে—একেবারে বালি দিয়া ভরাট করিয়া দিয়াছেন। এই ক্লোরাইট পাথর খানির নাম "নব-গ্রহ"। কারণ ইহাতে নয়টি মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি একটির পাশে অপরটি। সবগুলিই পাথরের এক-

দিককার গায়েই খোদাই করা। পাথরের ডান দিকে সব কেতুর মূর্ত্তি। সূর্য্যের পর সোম, তারপর মঙ্গল, তারপর বুধ, তারপর বৃহস্পতি, তারপর শুক্র, তারপর শনি তারপর রাহু। কেতু এবং রাহু ভিন্ন অন্য সবই আসন করিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া বসা। সূর্য্যের হাতে পদ্ম পুষ্প, সোমের বাম হাতে জপ-মালা, ডান হাতে সুধার পাত্র—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জল খাবার আপখোরার মত। রাহু ব্যতীত আর সবারই হাতে ঐ জপমালা এবং সুধার পাত্র। রাহুর এক হাতে সূর্য্যার্দ্ধ অপর হাতে চন্দ্রার্দ্ধ। বৃহস্পতি এবং রাহুর কেবল শ্মশ্রু আছে, অন্য কারুর শ্মশ্রু নাই। রাহুর সারাগালে অল্প অল্প চাপ দাড়ি কিন্তু বৃহস্পতির সেরূপ নয়। তার লম্বা ছাগল-দাড়ি। বৃহস্পতির এরূপ বড় বড় দাড়ি থাকিবার কারণ আছে। দাড়িতেই বুদ্ধি পাকায়। বৃহস্পতি তাই নাকি খুব জ্ঞানী। লোকে কথায় বলে—উনি যেন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। রাহুর হা করা মুখ। জিহ্বার দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণ দন্ত বাহির করা। দুইটাই উপরকার। জিহ্বা মুখগহ্বর হইতে কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কেতুর লম্বা লম্বা লেজ—বেশ জড়ান জড়ান। লেজের সারা গায়ে চক্র চক্র—মাছের আঁশের মত। দেখিলে গ্রীক্ পুরাণের অর্দ্ধেক মানুষ আর অর্দ্ধেক মৎস্য—মারমেড্ (Mermaid) প্রভৃতি অদ্ভুত জীবের কথা সহজেই মনে পড়ে।

শুনিলাম, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল ঐ নবগ্রহ পাথর খানিকে কলিকাতায় আনিয়া মিউজিয়ামে রক্ষা করেন এবং এই কার্য্যের জন্য তিন হাজার টাকাও নাকি মঞ্জুর করা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। পাথরখানা এতই ভারি যে উহার প্রস্থ হইতে অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিয়া কিছু হাল্কা করিয়া লইতে হইয়াছিল, অবশ্য নবমূর্ত্তির কোনই হানি না করিয়া। তবুও কলিকাতায় আনিতে পারেন নাই। রেলওয়ে লাইন বসান হইয়াছিল, তাহার কিছু এখনও বর্ত্তমান আছে দেখিলাম। কোন প্রকারে পাথরখানিকে যদি সমুদ্রের তীরে নিয়া ফেলিতে পারিতেন তবেই ওখান হইতে জাহাজে করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা পারিয়া উঠেন নাই।

বাস্তবিকই "নবগ্রহ" দেখিবার মত জিনিস। প্রকাণ্ড একখানা পাথর, তাহার উপরে নয়টি মূর্ত্তি কেমন সুন্দর ভাবে খোদাই করা। কলিকাতায় আনীত হইলে অনেকেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন সন্দেহ নাই।

এখন সেই পাথরের একার্দ্ধ মন্দিরের সম্মুখেই এবং অপরার্দ্ধ—যাহাতে মূর্ত্তি খোদাই করা, প্রায় মাইল খানেক দূরে পড়িয়া আছে। পাথর খানির উপরে ওখানকার পাণ্ডারা একখানা চালা উঠাইয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। দর্শকদের নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় করে। এইরূপে তাদের দিন বেশ সুখে কাটিয়া যায়।

মন্দিরের যাহা কিছু দেখিবার, একদিনেই সব দেখা হইয়া গেল। কিন্তু গাড়ী না পাওয়ায় সেদিন আর বাড়ী রওনা হইতে পারিলাম না। মনে আশা হইল, যাক্ সূর্য্যোদয়টা কাল দেখা যাইবে; কিন্তু সেদিনও সেই বিপদ—মেঘে আকাশ ঢাকা ছিল। উদয় আর দেখাই হইল না।

দিন অতিবাহিত হইলে বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশের নীচে সাগর-জলের গর্জ্জনে, মুক্ত বাতাসের শব্দে, জন-শূন্য সমুদ্রের তটে বঙ্কিম বাবুর কপাল কুণ্ডলা আমার মনকে ভূতে পাওয়ার মত অধিকার করিয়া বসিল। আমি তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে ষ্টেসনের দিকে চলিলাম।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

প্রস্তর-মূর্ত্তির ইতিহাস

(নরওয়ে দেশীয় কাহিনী)

নরওয়ে দেশে ড্রনথিয়াম নগরের সন্নিকটে একজন প্রভূত ধনসম্পদশালী লোক বাস করিত; চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান সমূহ তাহার সৈনিকবর্গের পদভরে কম্পিত

হইল; তাহার অশেষ ধন সম্পদের মধ্যে অতুল্য রূপসী কন্যা অসলোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, কন্যার গুণ গরিমার কথা সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত হইলে ধনসম্পদশালী সমস্ত যুবকের মনই লুব্ধ মৌমাছির ন্যায় তাহার প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণবান রূপবান ক্ষমতাশালী যুবাও যখন অপরাপর বিবাহাকাঙ্ক্ষী যুবার মত সমস্ত আশা ও আনন্দ ব্যর্থতার নীরব বেদনা ও ভ্রূকুটী দ্বারা ঢাকিয়া ফিরিয়া গেল, তখন অসলোগের পিতা বিমর্ষ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে বলিলেন—“যত উপযুক্ত বিবাহাকাঙ্ক্ষী যুবাকে তুমি ফিরাইয়া দিয়াছ, তোমার এ মূঢ়তা কিছুমাত্র সহনীয় নহে, আগামী শীতোৎসবের মধ্যে মন স্থির করিয়া উপযুক্ত পাত্রে বরমাল্য অর্পণ কর, অন্যথা আমার মনে যাহা আছে, তাহাই করিব।”

অসলোগ পিতার রক্তিম আননের মধ্য দিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ পাঠ করিয়া ভীত হইল। শীত-উৎসবও সন্নিকট প্রায়,—কি কর্ত্তব্য ভাবিয়া অসলোগ অস্থির হইল, সে যাহাকে হৃদয় অর্পণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি উচ্চবংশ-সম্ভূত ধনবান দাম্ভিক যুবক নহে, তাহার বাহ্যিক পরিচয়ের ভূষণ নিতান্ত সামান্য হইলেও তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ের জ্যোতিঃ অসাধারণ ছিল, সে অসলোগের পিতার একজন সামান্য সৈনিক মাত্র।

অসলোগ ইহা নিশ্চয় জানিত যে তাহার প্রিয়তমের পরিচয় পিতার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র নিরতিশয় ক্লেশকর শোণিতপ্লাবী ঘটনার সূত্রপাত হইবে। অসলোগের ভালবাসার পাত্র বীর ও তেজস্বী বলিয়া প্রখ্যাত হইলেও তাহার পিতার নিকট নিঃস্বতাই সকলের চেয়ে ক্ষুদ্র অধিকার, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

অসলোগ তাহার ভালবাসার পাত্র ওরমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সঙ্কল্প স্থির করিল।

গভীর রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে ওরম কম্পিত অসলোগের হাত ধরিয়া তুষার ও বরফাচ্ছন্ন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

চন্দ্র ও তারকাপুঞ্জের জ্যোতিঃ-রেখা সুদূর গগন হইতে নামিয়া আসিয়া অগম্য পথের রেখা দেখাইয়া দিতেছিল। পথহীন জনসমাগমবিরল সেই পর্ব্বতের মধ্যে একটী গুহার অভ্যন্তরে তাহারা বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে চতুর্দ্দিকের বরফ গলিয়া গেল; পাহাড়ের বৃক্ষরাজিতে ফুল ফুটিল, সমস্ত প্রান্তর ফুলে ছাইয়া গেল।

একদিন ওরম গুহাকক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া অসলোগকে বলিল,—“আজ এই পাহাড়ের সন্নিকটে তোমার পিতার এক ভৃত্যকে দেখিতে পাইয়াছি, নিশ্চয়ই তাহার চক্ষুর দৃষ্টি আমার দৃষ্টি অপেক্ষা ন্যূন ছিল না, সুতরাং কল্য তোমার পিতার সৈনিকেরা এ পাহাড় পরিবেষ্টন করিয়া আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। অতি সত্বর আমাদের এস্থান হইতে পলায়ন করা যুক্তিযুক্ত।”

সেই দিন রাত্রে দুই জনে পর্ব্বতের অপর প্রান্ত দিয়া অবতরণ করিয়া একটী নদীর ধারে উপস্থিত হইল। এবং সৌভাগ্যক্রমে সে স্থানে একখানি নৌকা দেখিতে পাইয়া দুই জনে তাহাতেই চড়িয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তীরে অসলোগের পিতার রাজ্য, তথায় অবতরণ করিলে শীঘ্রই বন্দী হইবার সম্ভাবনা, কাজেই উত্তাল সমুদ্রের লহরীমালা ভেদ করিয়া তাহাদের নৌকা সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দূরে তটের রেখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পর সূর্য্যও অকূল তিমির রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রস্থান করিল, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ, আর নিম্নে তরঙ্গ-গর্জ্জনক্ষুব্ধ অতল সমুদ্র বই আর কিছুই রহিল না।

তিন দিন পরে তাহারা একটা দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, নৌকা তীরভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই ফেনিল ঊর্ম্মি রাশি প্রচণ্ড বেগে আসিয়া সেই নৌকাখানি নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইল।

ওরম মূর্চ্ছিতপ্রায় অসলোগকে এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্তে নৌকা চালনা করিতে লাগিল—মৃত্যুর বিভীষিকা তাহাদের আননে অঙ্কিত।

ওরম নিরাশহৃদয়ে কাতরপ্রাণে ডাকিল—"প্রভু পরমেশ্বর, রক্ষা কর।"

উন্মাদ সমুদ্র শান্ত হইল, তাহারা তীরে অবতরণ করিয়া আশ্রয়স্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, দুই জনেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়।

অবশেষে তাহারা দ্বীপের এক স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী সুন্দর গুহা দেখিতে পাইল, এবং তন্মধ্যে আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত দেখিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইল, কিন্তু গৃহস্বামীর কোন সন্ধান না পাইয়া দুই জনে তাহাই তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া অবসন্ন দেহ নিদ্রার অঙ্কে ঢালিয়া দিল। ভোরের অরুণ-আলোকে সমস্ত দ্বীপ যখন রাঙিয়া উঠিল এবং দু একটী চূর্ণকর-রেখা গুহার অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মারিল, তখন ওরম ও অসলোগের নিদ্রাভঙ্গ হইল; এবং এ পর্য্যন্ত গৃহস্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাহাদিগকে জাগরিত করে নাই দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে একটী স্বর্গের শিশু তাহাদের গৃহে আগমন করিল এবং শিশুটীর প্রথম ক্রন্দনের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই একটী সৌম্য করুণ মুখশ্রী-মণ্ডিতা মহিলা তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার সহাস্য প্রসন্ন মুখ দেখিয়া দম্পতি-যুগলের নেত্রেও আনন্দ-হাস্য বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আগন্তুক মহিলাটী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন,—"এ শিশুটীর অপেক্ষায়ই আমি তোমাদের গৃহে আসি নাই, এ গৃহ আমারই; তোমাদের পবিত্রতা দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর, কিন্তু তোমাদিগকে এক প্রতিশ্রুতি পালন করিতে হইবে, কখনো তোমরা আমাদের উৎসবের মধ্যে উপস্থিত হইও না, এ দ্বীপের আমিই একমাত্র অধিপতি, আমার আরো এক আদেশ, তোমরা কখনো প্রভুর নাম উচ্চারণ করিও না, তাহা হইলে তোমাদিগকে উচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

এই বলিয়া প্রৌঢ়া অন্তর্হিত হইল। তার পর ওরম ও অসলোগ তথায় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কক্ষের বহির্ভাগে বহুসংখ্যক লোকের কলরব শ্রুত হইল এবং নানা প্রকার সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনিও তাহাদের কর্ণে আসিতে লাগিল।

ওরম ও অসলোগ কৌতূহল-পরবশ হইয়া বহির্ভাগের আনন্দ-উৎসব দেখিবার জন্য বাতায়ন প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরমূর্ত্তি এবং তাহার চতুর্দ্দিকে নানা সুবেশধারী পুরুষ ও মহিলা দণ্ডায়মান।

কিছুক্ষণ পরে তাহাদের পূর্ব্বদৃষ্ট সেই করুণাময়ী প্রৌঢ়া সেস্থানে আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে প্রস্তর-মূর্ত্তি যেন একটু নড়িয়া উঠিল; ক্রমেই প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে চৈতন্য সঞ্চারের লক্ষণ সকল স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। অবশেষে প্রস্তরমূর্ত্তি মানুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নেত্রপল্লব উন্মীলন করিল। প্রৌঢ়া তাহাকে চুম্বন করিলেন এবং প্রস্তরমূর্ত্তি সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল।

অসলোগ বাহিরের দৃশ্য দেখিবার জন্য সন্তান ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিছুক্ষণ মধ্যে ক্ষুদ্র শিশুর নয়নপল্লব নিমীলিত হইয়া আসিল। অসলোগ স্বাভাবিক রীতির অনুযায়ী হস্তদ্বারা শিশুর চক্ষু স্পর্শ করিয়া "প্রভু পরমেশ্বর রক্ষা করুন" এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র বীভৎস চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত দৃশ্য অন্তর্ধান হইল। বাহিরে পড়িয়া রহিল—বহু সহস্র স্বর্ণ ও ভোজনপাত্র, আর পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরমূর্ত্তি—যাহা এতক্ষণ সজীব ছিল, এখন তাহা কঠিন শিলায় পরিণত হইল; কেবলমাত্র সেই প্রৌঢ়া সেই প্রস্তর-মূর্ত্তির গলদেশ ধারণ করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেই প্রৌঢ়া রোরুদ্যমান মুখখানি অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া ওরম ও অসলোগের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"তোমাদের দোষ নাই, তোমরা ইচ্ছা করিয়া আমাকে এমন ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশায়

মধ্যে নিপাতিত কর নাই, জানি; ভুলেই এ ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে; কাজেই সেই জন্য আর তোমাদিগকে কোন প্রতিশোধ দিতে চাহি না। তোমরা অবশ্য জান না, তোমরা আমার কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করিয়াছ। এই যিনি কঠিন প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন তিনি আমার স্বামী। বহু বর্ষ পূর্ব্বে যখন এক ঋষি এই দ্বীপে আগমন করেন তখন আমার স্বামী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহাকে তরণীসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিতে প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু তিনি আমার স্বামী অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন, উত্তাল সমুদ্র বিমথিত করিয়া তাঁহার তরণী এই দুই দ্বীপের মধ্যস্থ পাষাণ পর্ব্বত ভেদ করিয়া তীরে সন্নিবিষ্ট হইল। তিনি তীরে অবতরণ করিয়া আমার স্বামীকে দেখিতে পাইয়া 'চিরকাল প্রস্তরমূর্ত্তি হইয়া থাক', এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন।

"তদবধি আমার স্বামী প্রস্তরমূর্ত্তি হইয়া রহিলেন। আমাদের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি বলিলেন, 'যদি কেহ একশত বৎসরের পরমায়ু প্রদান করে তবে তোমার স্বামী কয়েক ঘণ্টার জন্য পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইবেন।' আমার সমস্ত জীবন দিয়াও যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতাম তাহার ক্রটী করিতাম না, কিন্তু কেবল মাত্র মাসান্তে একদিন তাঁহাকে জীবিত করিবার অধিকার পাইয়াছি। আমি গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিলেই তিনি বাঁচিয়া উঠিতেন, কিন্তু আজ সমস্ত শেষ হইল; আজ হইতে তিনি কঠিন প্রস্তরে পরিণত হইলেন। ইহার পর আর তাঁহার জীবন সঞ্চার হইবে না। প্রলয়ের অসীম কাল পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহার বিরহ সহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কি হতাদৃষ্ট আমার!

"আজ আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এ স্থানের সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য তোমরাই লইবে। তোমরা স্বদেশে শীঘ্র ফিরিয়া যাও, সেখানে সকলেই তোমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিবে। তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না।"

এই বলিয়া প্রৌঢ়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ওরম ও অসলোগ তাহাদের নিজেদের কার্য্যে ও এই আকস্মিক বিয়োগান্তক ঘটনায় নিরতিশয় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিছুদিন পরে তাহারা সেই বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া দেশে রওনা হইল এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রচুর ধনশালী হইয়া উঠিল। অসলোগের পিতা ধনবান জামাতা ও কন্যার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন।

অসলোগ ও ওরম দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমনের সময় সেই প্রস্তরমূর্ত্তিটী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

লৌহ অপেক্ষাও সুকঠিন সেই প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে অনেকেই আসিত এবং তাহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা

আমাদের সমাজে অবরোধ-প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহা ভাল কি মন্দ সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই; এবং যাঁহারা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের শিক্ষার আলোচনাও আজ প্রয়োজনীয় নহে।

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণ কি প্রকারে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। সর্ব্বদা বদ্ধগৃহে বাস করিলে মনও সঙ্কীর্ণ হয়। রুগ্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের নিমিত্ত এবং মানুষের জীবনধারণের জন্য যেমন বাহিরের মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত প্রয়োজন, তেমনি মানবের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষের জন্য, মন সজীব উন্নত রাখিবার জন্য বাহিরের জ্ঞান আলো বাতাস চাই। তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া আমরা কখনই জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না; আমাদের মন উন্নত হইবে না। সেই উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, যাহাতে মহিলাগণ বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন এবং শিক্ষালাভে আগ্রহান্বিতা হন।

বাহিরে কত নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতেছে, কত পুরুষ ও মহিলা জ্ঞান-ধর্ম্মে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কি অমৃত আনন্দের অধিকারী হইতেছেন; আর এই নিখিল বিশ্বের উৎসব হইতে আমরাই শুধু বঞ্চিত—আমাদের জ্ঞানের অভাবে। আমরাও মানুষ, কোন অংশে অবহেলার পাত্র নহি। আমরাও ইচ্ছা করিলে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইতে পারি, জগতের একজন হইয়া মানুষের মত দাঁড়াইতে পারি। কিন্তু জীবনের কত বড় সরসতা হইতে আমরা স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া আছি। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন, এই সংস্কার আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই কুসংস্কার দূর করিতে হইবে; এবং পুত্রের ন্যায় কন্যার শিক্ষার জন্যও যত্নশীল হইতে হইবে।

যে মহিলা যে পরিমাণে শিক্ষিতা তিনি সেই পরিমাণে প্রতিবেশিনীকে অন্ততঃ আত্মীয়াকে শিখাইতে পারেন। কিন্তু আমাদের অন্তঃপুর খুঁজিলে প্রায়শঃ এমন একটিও মহিলা পাওয়া দুর্ল্লভ। তাঁহারা অপরকে শিখাইবেন কি? নিজেরাই শিক্ষালাভে উদাসীনা। সজীব বৃক্ষেই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে; ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।

যাহাদিগকে বই পড়িতে দেখা যায় প্রায় সর্ব্বত্রই তাহা শুধু তরলতাপূর্ণ উপন্যাস পাঠেই পরিসমাপ্ত। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য গ্রন্থপাঠ কেহই করেন না। যে বিষয় লইয়া আলোচনা করা যায় মনের গতি সেই দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা উপন্যাস লইয়া ব্যস্ত তাহাদের কাছে আমরা কতটুকু মঙ্গল আশা করিতে পারি?

পল্লীগ্রামে সর্ব্বদাই পাড়ার মহিলাগণ একত্র হইয়া তুচ্ছ এবং অবাঞ্ছনীয় নানা বিষয়ের আলোচনায় সময় কাটাইয়া আত্ম-বিনাশের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাহা না করিয়া অবসর সময়টা যদি তাঁহারা কাহারও কাছে শিক্ষা লাভ করেন, বা নিজেরাই (যাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিতা) কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা হইলেও অনেক উপকার হয়। শিক্ষা বলিতে শুধু বিদ্যাশিক্ষা নহে; শারীরিক মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা যাহাতে লাভ হয় তাহাকেই শিক্ষা বলা যায়। পথ চলিতে আলোক লাভের জন্যই বর্ত্তিকা, অন্ধকারে বিচরণ করিবার জন্য নহে। জ্ঞানের আলোক মানবের হৃদয়ান্ধকার দূর করে। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই পথের সহায়তা লাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষারও প্রয়োজন; সুতরাং মনুষ্যত্বের জ্ঞান যাহাতে জাগিয়া উঠে ও লব্ধজ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে হৃদয়ে শক্তি দান করে তাহাতেই বিদ্যালাভের সার্থকতা। সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সহৃদয় পুরুষগণ যদি আপনাপন পরিবারস্থ মহিলাদিগের শিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে বাহিরের কাহারও দ্বারা শিক্ষা অপেক্ষা সেই শিক্ষা সহজসাধ্য হয় না কি? পুরুষগণ নানাবিধ উন্নত দৃষ্টান্তের দ্বারা ও উৎসাহ দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষালাভে আগ্রহান্বিতা করিয়া তুলিবেন এবং সাক্ষাৎ হইলে শারীরিক কুশল প্রশ্নাদির ন্যায় শিক্ষা বিষয়েও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।

নানাবিধ সদ্‌গ্রন্থ ও জীবন চরিত নিয়মিত পাঠ্য হওয়া উচিত। মহিলাগণ যাহাতে আপনাদের দোষ ক্রটী সংশোধন করিয়া মানুষ হইতে পারেন, এবং জ্ঞানের আলোকে সেই পথে সাহায্য পান, সে বিষয়ে নারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য পুরুষদিগের সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পুরুষদিগের বিন্দুমাত্র অসন্তোষের কারণ হইলে পরিবারস্থ মহিলাগণের কোন প্রকার শিক্ষালাভ একেবারেই অসম্ভব হইয়া থাকে। আমার ভিতরে দোষ কি কি তাহা আমি নিজে যেমন বুঝিতে ও ধরিতে পারি অপর কেহ তেমন পারে না, যদি আমার সম্মুখে উন্নত জীবনের একটা আদর্শ (আমি যাহার মত হইতে চাই তিনি কখনও পরনিন্দা করেন না, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনি অক্রোধী, অনলস, সত্যবাদী এবং তিনি সর্ব্বদাই নূতন জ্ঞান ও অনন্ত উন্নতির প্রয়াসী ইত্যাদি) থাকে, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি আমরা আত্মগঠনে সচেষ্ট হই তাহা হইলে আমাদের ভিতরে দোষ কি কি, তাঁহার মত হইতে হইলে আমাদিগকে কি কি করিতে হইবে; কোন্ দোষ সংশোধন করিয়া কোন্ গুণ

অর্জ্জন করিতে হইবে তাহা নিজেরাই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও অন্তরে সদিচ্ছা জাগাইয়া তোলা সৎপথের প্রথম সোপান।

অন্তঃপুরবাসিনী অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এমন একদল মহিলার বাহির হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাঁহারা ঘরে ঘরে যাইয়া শিক্ষাদান করিতে পারেন। মানুষের নিন্দা অনাদর তাঁহাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে অথবা শৃঙ্খলানুসারে পাড়ায় পাড়ায় মহিলাসমিতি স্থাপন করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায় আহ্বান করিলে একটি দুইটি করিয়া তাঁহারা কি অগ্রসর হইবেন না? শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হইবেই হইবে। অন্তঃপুর-বাসিনীগণ যাহাতে সহজেই পুস্তকাদি পাইতে পারেন তাহার সুবিধা করিতে হইবে। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি পাঠ করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্বদেশের উন্নত-চরিত্র নর-নারীর জীবনচরিত পাঠ করিলে মনের গতি উন্নতির দিকে ও সৎপথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইবেই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চেষ্টা করিলেই যে হাতে হাতে সুফল পাওয়া যাইবে এমন আশা যাঁহারা করেন অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে ভগ্নোদ্যম হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ সফল চেষ্টা পূর্ব্বে সহস্রবার নিষ্ফল না হইয়াছে? ধৈর্য্যের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। কর্ম্মের পথ পুষ্পাবৃত নহে। হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; মনে রাখিতে হইবে বিফল চেষ্টা সার্থকতারই পূর্ব্ববর্ত্তী।

গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা দ্বারা মহিলাদিগকে শিক্ষালাভের জন্য অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথায় অনেক স্থলে নারীগণ বিশেষতঃ গৃহস্থ ঘরের বধূগণ সময়াভাবে আপনাদের কোন প্রকার উন্নতি করিতে পারেন না। অনেকে বলিয়া থাকেন সুশৃঙ্খলার জন্য সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোক গৃহসজ্জা করিবে, রন্ধন করিবে ইত্যাদি। গৃহের কর্ম্ম নারী করিবেন এবং পুরুষ বাহির হইতে নানা দ্রব্য আহরণ করিবেন, বাহিরের যাবতীয় কার্য্য পুরুষের। যিনি যে কাজের উপযুক্ত তাঁহার প্রতি সেই কাজের ভার অর্পিত হইয়াছে। শুনিতে এ নিয়ম মন্দ নহে, কিন্তু ফলে আপনাদের ছোট খাট সুখ দুঃখ লইয়া, সর্ব্বদা অনিত্য পদার্থ লইয়া ব্যস্ত নারীগণের আধ্যাত্মিক জীবন একেবারেই ম্লান অথবা নষ্ট হইয়া যায়।

যে সমাজে একপক্ষের আহার বিহারাদি শারীরিক সুখ সাধনের জন্যই অপর পক্ষকে অতি বড় মঙ্গল হইতেও বঞ্চিত রাখা হয়, সেখানে বাস করিয়া কোন মানুষ আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারে না। যাহারা অত্যাচারী, স্বার্থসাধনতৎপর, ধর্ম্ম তাহাদিগকে শাসন করেন। আপনাদের সুখের জন্য অপরকে যাহারা নত রাখিতে চায় তাহারাই অবনত হইয়া থাকে। যাহা সকলের প্রতি সমান মঙ্গলদায়ক নহে কখনই তাহা ধর্ম্মের বিধান নহে।

নারীগণ দিবসের অধিকাংশ সময়ই খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা যে ইহাতেও অনাবশ্যক রকমে কত সময় নষ্ট করি তাহা কেহই চিন্তা করিয়া দেখি না। জ্ঞানের আনন্দ এত মূল্যবান্ যে তাহার জন্য একটা সুস্বাদু তরকারীর লোভ ত্যাগ করা কিছুই কষ্টকর নহে।

অনেক স্থলে গৃহকর্ম্ম হইতে নারীগণের অবসর ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু পুরুষগণ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ঘুমাইয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইতে পারেন না। পুরুষ তাঁহার মাতা, সহধর্ম্মিণী বা ভগিনীর মানসিক উন্নতির বিষয় চিন্তা করেন না। নারী তাঁহার স্বামী পুত্র ভ্রাতার সঙ্গে পূর্ণ মিলনে এক ভূমিতে দাঁড়াইতে পারেন না। হায়! আমরা নারী ও পুরুষ উভয়েই অতি পিচ্ছিল সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছি; কে কাহাকে রক্ষা করিবে, কে কাহাকে শক্তি দিবে? আপনার মাতা ভগিনী সহধর্ম্মিণী প্রভৃতির মনুষ্যত্ব বিকসিত করিয়া তুলিবার জন্য যদি গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে হয়, তাহাতে বোধ হয় পুরুষদিগের অগৌরবের কারণ কিছুই নাই।

তিনিইত প্রকৃত স্বজনের কর্ত্তব্য পালন করেন যিনি মাতা ভগিনী সহধর্ম্মিণী প্রভৃতির আধ্যাত্মিক জীবন

লাভের জন্য সাহায্য করেন। তিনিই প্রকৃত স্বামী, রক্ষক ও পালয়িতা যিনি শুধু বাহিরের নহেন, যিনি ইহ-পরকালের রক্ষক, সুহৃদ্ ও সহায়। যিনি বাহিরের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সমভাবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমাদের শক্তি অল্প কিন্তু কর্ত্তব্য গুরুতর। অন্তরের সাধুতা লইয়া ভগবানের নামে আমরা যেন কর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট হই।

শ্রীসুধাসিন্ধু সেনগুপ্তা
(বিক্রমপুর)।

বনলতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে আমিয়াসকে বাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পাঠক পাঠিকা মনে করিবেন না, নিরাশ প্রেমের বেদনা হৃদয়ে লইয়া তিনি সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছেন। জননী বলিলেন, "নিশ্চয়ই আমিয়াস আয়র্লণ্ডের সৈনিক বিভাগে চাকুরী খুঁজিতে ষ্টো সহরে সার রিচার্ডের নিকট গিয়াছে।" তিনি ফ্রাঙ্ককে অশ্বারোহণে আমিয়াসের সন্ধানে পাঠাইলেন।

প্রায় দশ মাইল পথ অশ্বারোহণে চলিয়া ফ্রাঙ্ক দেখিলেন, তাঁহার অশ্ব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখনকার দিনে পথে পথে সরাই ছিল না, সুতরাং ক্ষুধার্ত্ত ফ্রাঙ্ক ক্লান্ত অশ্ব লইয়া বিশ্রাম ও আহারের জন্য কোথায় স্থান পাইবেন, ভাবিতে লাগিলেন। আর দুই তিন মাইল পথ চলিলে উইলিয়াম ক্যারীর বাড়ী মিলিবে সুতরাং সেখানে যাইয়া আহার ও বিশ্রাম করিবেন এই স্থির করিয়া তিনি পুনরায় চলিতে লাগিলেন। ক্যারীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ক্যারী ও আমিয়াস দুই জনে আহারে বসিয়াছে, ফ্রাঙ্ককে দেখিয়া উভয়েই আনন্দিত হইলেন। নানা কথার পর ক্যারী বলিল, "ফ্রাঙ্ক তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে। তোমার কথা আমার মনে হইতেছিল। এই দেখ আমি একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি, তোমাকে ইহার রহস্য ভেদ করিয়া দিতে হইবে। চিঠিখানা পড় এবং আমার কর্ত্তব্য কি বলিয়া দেও।"

ফ্রাঙ্ক চিঠি খানি খুলিয়া পড়িলেন, "মিষ্টার ক্যারী, অদ্য রাত্রে সাবধান হইয়া ডিয়ার পার্কের নিকটে উপস্থিত থাকিবে। যদি আইরিশ থ্যাক্‌শিয়াল পাহাড় হইতে বাহির হয়, খুব শক্ত করিয়া তাহাকে ধরিবে।"

ক্যারী বলিল, "বাবাকে আমি চিঠিখানা দেখাইতাম, কিন্তু মনে হয়, কেহ ঠাট্টা করিয়া আমাকে ঠকাইবার জন্য ইহা লিখিয়াছে। দেখ না, লেখকের হাতের লেখা বেশ সুন্দর, কিন্তু খারাপ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছে। তা ছাড়া ভাষা দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহা এ অঞ্চলের কোন লোকের লেখা নয়। এখন আমার কর্ত্তব্য কি বল?"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আচ্ছা, আমিয়াসের কি মত শোনা যাক্।"

আমিয়াস একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ক্যারী, তোমার উপর কি এখন ডিয়ার পার্কে পাহারা দিবার ভার?"

"কখনই নয়।"

"তবে কোথায় তুমি পাহারা দাও?"

"টাউন বীচে।"

"আর কোথায়?"

"টাউন হেডে।"

"আর কোথায়?"

"তুমি যে দেখিতেছি উকিলের জেরা আরম্ভ করিলে! আর ফ্রেস্ ওয়াটারে।"

"ফ্রেস্ ওয়াটার কোথায়?"

"কেন, ঝরণাটা যেখানে পাহাড় হইতে নামিতেছে! সহর হইতে আধ মাইল হইবে; সেখান থেকে জঙ্গলে ঢুকিবার একটা রাস্তা আছে।"

"আমি জানি। আমি আজ রাত্রে সেখানে পাহারা দিব। কিন্তু ডিয়ার পার্কেও দু চার জন বেশ সাবধান লোককে রাখিতে হইবে।"

এই সময়ে ক্যারীর পিতা গৃহে প্রবেশ করিয়া

তাঁহাদের নিকট সকল কথা অবগত হইলেন। তিনি আমিয়াসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমিয়াস, তুমি ফ্রেস্ ওয়াটারে পাহারা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ কেন?" আমিয়াস বলিলেন, "পোপের গুপ্তচর গোপনে আমাদের দেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। জলপথে ফ্রেস্ ওয়াটারই তাহাদের অবতরণ করিবার একমাত্র নিরাপদ স্থান। ক্যারীকে সেস্থান হইতে সরাইবার উদ্দেশ্যেই তাহারা এই পত্র লিখিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ক্যারীর পিতা বলিলেন, "বালকের দেহে তুমি বৃদ্ধের মস্তিষ্ক পাইয়াছ। তোমার অনুমান যে সত্য তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আচ্ছা, তুমি আর কাহাকে তোমার সঙ্গে লইবে?"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি আমিয়াসের সঙ্গে যাইব, আর কাহারও যাওয়া অনাবশ্যক।"

"অনাবশ্যক? সত্য বটে আমিয়াসের বীর-দেহ, তোমারও অতুল সাহস, তোমরা এক এক জন দশ জনের সমান, কিন্তু যত বেশী লোক ততই নিরাপদ।"

"আজ্ঞে হাঁ, তা বটে, কিন্তু কোন কারণে আপনার নিকট আজ আমার দুইটি নিবেদন আছে। প্রথম কথা, সুধু আমাকে ও আমিয়াসকেই আজ ফ্রেস্ ওয়াটারে যাইতে দিন্, আর কাহাকেও আমাদের সঙ্গে দিবেন না। দ্বিতীয় কথা, আমরা এই নৈশ অভিযানে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিব আপনি দয়া করিয়া তাহা গোপনে রাখিবেন। আপনি অবশ্যই আমাদিগকে বেশ ভাল করিয়াই জানেন, সুতরাং স্বদেশের অনিষ্টকর কিছু যে আমাদের দ্বারা ঘটিবে না, আপনি অবশ্যই তাহা বিশ্বাস করেন।"

"প্রিয় ফ্রাঙ্ক, আমি তোমাদের পিতৃবন্ধু, আমাকে এত কথা বলা অনাবশ্যক। তোমাদের অভিপ্রায় মতেই কাজ হউক।"

সকলেই লক্ষ্য করিলেন, গভীর বিষাদে ফ্রাঙ্কের মুখ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আমিয়াস্‌কে গোপনে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমিয়াস্, ঐ পত্র এই অঞ্চলের লোকেরই লেখা। ইহা ইউষ্টেসের হস্তাক্ষর।"

"অসম্ভব!"

"না আমিয়াস, এবিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। গুপ্ত লেখা আমি অনেক পাঠ করিয়াছি। এখানে আমার ভুল হয় নাই—যদি ভুল হইত তবে তাহা কি সুখেরই হইত! সে বংশের নামে কলঙ্ক স্পর্শিত না। চল এখন যাই।"

দুই ভাই মিলিয়া ফ্রেস্ ওয়াটারের দিকে চলিলেন এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহারা ঝোপের আড়ালে লুকাইলেন। সমুদ্রের দিকে রহিলেন ফ্রাঙ্ক, যেন আততায়ীর সঙ্গে প্রথমেই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আমিয়াস সেই স্থানে থাকিয়া ফ্রাঙ্ককে সহরের দিকে দাঁড়াইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ফ্রাঙ্ক তাঁহার কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা দুই ভাই নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে ফ্রাঙ্ক একটু একটু পাতা নড়ার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি আপনাকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া তরবারি হস্তে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ধীরে ধীরে একটি বালক তাহার চার পাঁচ হাত মাত্র দূরে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞীর নামে আদেশ করিতেছি, আর অগ্রসর হইও না, দাঁড়াও।" আগন্তুক জামার ভিতর হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া ফ্রাঙ্কের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল, কিন্তু ফ্রাঙ্কের তরবারির আঘাতে তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। আততায়ী তৎক্ষণাৎ ফ্রাঙ্কের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের আঘাত করিল, এবারও ফ্রাঙ্ক তাঁহার মাথা বাঁচাইলেন কিন্তু পিস্তলের আঘাত তাঁহার ঘাড়ের উপর পড়িল এবং তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আমিয়াস দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, হতাশ ভাবে আততায়ী তরবারির দ্বারা ফ্রাঙ্ককে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মাটিতে পড়িয়া উভয়ে হাতাহাতি করিতেছে। আততায়ীকে আক্রমণ করিলে ফ্রাঙ্কেরও আঘাত লাগিতে পারে, এজন্য তিনি তাহাকে আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইলেন না। অবশেষে তরবারির পৃষ্ঠদ্বারা আততায়ীর মুখ লক্ষ্য করিয়া এক কঠিন

আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে সে ভয়ানক চীৎকার করিয়া ফ্রাঙ্ককে ছাড়িয়া দিল। আমিয়াস মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার বুকের উপর বসিয়া তরবারির দ্বারা তাহার গলা কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন; এমন সময়ে ফ্রাঙ্ক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'থাম আমিয়াস, থাম, থাম, ও ইউষ্টেস্, আমাদের ভাই ইউষ্টেস্, "এই বলিয়া তিনি আর বলিতে না পারিয়া একটা গাছে হেলান দিলেন। আমিয়াস ছুটিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন কিন্তু ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আমার আঘাত সামান্য। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই গোপনীয় কাগজ পত্র আছে, সে গুলি কাড়িয়া লও; ঈশ্বরের দোহাই, উহাকে মারিও না, ছাড়িয়া দেও।"

আমিয়াস্ পুনরায় ইউষ্টেসের বুকের উপর পা দিয়া বলিলেন, "হতভাগ্য, কাগজগুলি আমায় দে!" ইউষ্টেসের অনেকগুলি দাঁত আমিয়াসের তরবারি আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি অহঙ্কার ও হিংসা তাহাকে ত্যাগ করে নাই, সে বলিল, "তুমি পেছন হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়াছ!"

"কুকুর, তোকে বুঝি আমি সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিতে পারি না? তোর নিকট যে সকল গোপনীয় কাগজ আছে, শীঘ্র সেগুলি আমায় দে! নতুবা এখনই তোর গলা কাটিয়া নিজ হাতে খুঁজিয়া তোর জামার ভিতর হইতে সেগুলি বাহির করিব! বিশ্বাসঘাতক! শীঘ্র কাগজগুলি দে।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া ইউষ্টেস্ কাগজগুলি বাহির করিয়া দিল।

আমিয়াস বলিলেন, "শপথ করিয়া বল্, আর কোন কাগজ তোর সঙ্গে নাই?"

ইউষ্টেস্ শপথ করিল। আমিয়াস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ হতভাগা, আর কে কে তোর সঙ্গী।"

ইউষ্টেস্ বলিল, "কখনই তাহা বলিব না! নিষ্ঠুর! তুমি কি এখনও আমাকে ঘৃণিত কর নাই?"

ইউষ্টেসের দুই চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে দুই হাতে তাহার রক্তাক্ত মুখ আচ্ছাদন করিল।

ইউষ্টেসের ব্যবহারে এই আত্মসম্মানের চিহ্নটুকু দেখিয়া আমিয়াসের মন কোমল হইল, তিনি ইউষ্টেসকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "জীবন লইয়া শীঘ্র পলায়ন কর।"

"আমার জীবনের জন্য আমি কি তোমার নিকট ঋণী?"

"না, লে-বংশে তোমার জন্ম, এইজন্য তুমি রক্ষা পাইলে, আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র পলায়ন কর।"

ইউষ্টেস্ চলিয়া গেল। আমিয়াস কাগজের প্যাকেটটি হাতে লইয়া ফ্রাঙ্কের নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি মূর্চ্ছা গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। আঘাত গুরুতর হয় নাই, অল্পক্ষণ শুশ্রূষার পরই ফ্রাঙ্কের চৈতন্য হইল। কে আসিয়াছিল, কাহার নিকট কাগজ পাওয়া গেল, কে ফ্রাঙ্ককে আঘাত করিল, সকলই গোপন রহিল; তাহার নাম প্রকাশ পাইল না।

(ক্রমশঃ)

ভিখারীর গান

প্রভু!

এবার আমি তোমার কাছে
মান্‌তেছি হে হার,
এবার থেকে ছাড়্‌ব আমি
আমার অহঙ্কার!
তোমার নামের ঝুলি লয়ে
বেড়াব আমি গাঁয়ে গাঁয়ে
তোমারি গান গেয়ে গেয়ে
ঘুর্‌ব দ্বারে দ্বার।
যা কিছু মোর ছিল প্রভু
দিনু তোমারে,
এবার আমি ভিক্ষু বেশে
বেড়াব ঘুরে;
এবার আমি ঐ চরণে
সঁপিয়ে দিব মন প্রাণে
তোমার চরণ-ধূলি শিরে,
ধর্‌ব অনিবার।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার দত্ত।

কুচবিহারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ও মহারাণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

(বিবাহ মাল্য-বন্ধনে)

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ:—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ:—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩২০ | ৭ম সংখ্যা।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নারী

চার বৎসর কাল ম্যাঞ্চেষ্টারে বাস করিয়া, আমি অনেক ইংরাজ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের অনেক রীতিনীতি আমাদের রীতিনীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু অল্পকাল তাঁহাদের সহিত মিশিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের সামাজিক ও পরিবারিক রীতিনীতির মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা গ্রহণ করিলে আমাদের সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। সেখানকার একজন ভদ্রমহিলার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাত্রী। তাঁহার সহিত মিশিয়া দেখিয়াছি, একজন নারী কত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

নামে সহধর্ম্মিণী হইলেও ভারতীয় নারীগণ প্রকৃত পক্ষে পুরুষদিগের ভারস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকেন। কেবল মাত্র বিবাহের মন্ত্র পাঠ দ্বারাই কি সহধর্ম্মিণী হওয়া যায়? প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য জীবনের ভার বহনে, কর্ত্তব্য সাধনে স্বামীর সহায়তা করা। আমাদের ন্যায় শক্তিহীন, অসহায় এবং বিশ্বজগত সম্বন্ধে অজ্ঞ নারীদিগের পক্ষে সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য-ভার বহন করা কি সম্ভব? আমরা পত্নীত্বের "অ আ ক খ"ই জানি না।

গৃহে আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহা আমরা গভীর ভাবে চিন্তাই করি না। আমরা গৃহকে দু'দিনের বাসা বলিয়া মনে করি; এই জন্য গার্হস্থ্য জীবনের প্রকৃত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারি না। আমাদের ধারণা, আহার নিদ্রা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি কার্য্য সম্পাদনের জন্যই গৃহের আবশ্যক; জীবন-নাটকের শ্রেষ্ঠ

অংশের অভিনয় গৃহের বাহিরে অন্য কোন স্থানে হইবে। এইজন্য গৃহে আমাদের জীবনের কাল দিকটা যেমন প্রকাশিত হয়, উজ্জ্বল দিক তেমন দেখা যায় না। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য পুরুষদিগকে কঠোর পরিশ্রম ও বিবিধ চিন্তায় শ্রান্তক্লান্ত হইতে হয়; অনেকে জনসাধারণের হিতকর বহু সৎকার্য্যে যোগদান করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া পত্নী কিম্বা ভগ্নীর সহিত তাঁহাদের জীবন-সংগ্রাম অথবা শুভ অনুষ্ঠানের বিষয় কোন কথাই বলেন না! ভারতীয় নারীগণ সুশিক্ষিতা না হইলেও যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে তাঁহাদের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণের অধিকার তাঁহাদের আছে।

কিন্তু আমাদের গৃহে যেন মহত্ত্বের স্থান নাই। বৃহৎ সম্মিলনীতে পুরুষদিগের মুখ খুলিয়া যায়, একজন বাহিরের লোক অতিথি হইলে কত আদর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়; কিন্তু নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগের সঙ্গে মিশিলে তাঁহারা যেন কেমন হইয়া যান; এসব যে প্রতিদিনের পুরাতন ব্যাপার! কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। সেখানে নরনারী বাহিরে যত বড় কার্য্যই সম্পন্ন করুন না কেন, গৃহকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন; প্রত্যেক নরনারী স্বীয় গৃহকে আরও মনোহর করিবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম ঢালিয়া দেন। গৃহের সকল ভার, সকল সুখ ও দুঃখ একসঙ্গে বহন করেন বলিয়া সেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি গভীর প্রণয় দেখা যায়! সেখানে নারীই গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্র, পুরুষ তাঁহার সহায় মাত্র। এ বিষয়ে ভারতীয় নারীদিগকে আপনার স্থান, প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর পদ গ্রহণ করিতে হইবে।

এদেশে নারীগণ গৃহে অবরুদ্ধ। সমাজে তাঁহাদিগের স্থান অতি নিম্নে। শিক্ষা নাই, বাহ্যিক জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; আমাদের চক্ষু আছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না, কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পাই না, মুখ আছে, কিন্তু কথা কহিবার অধিকার নাই। শুধু ইহাই নহে, অনেক পুরুষ এরূপও বলেন, যে নারীগণ গৃহের বাহিরে পদার্পণ করিলে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা হইবে না! এইরূপে অবরুদ্ধ ও অশিক্ষিত অবস্থায় জীবন যাপন করিয়া, আমরা কিরূপে অন্যান্য সভ্য দেশের নারীদিগের সমতুল্য হইব? ইংলণ্ডে পরোপকার এবং দীন দুঃখীর সংরক্ষণাবেক্ষণ-জাতীয় অধিকাংশ কার্য্যই নারীগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমার ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ম্যাঞ্চেষ্টারের নিকটবর্ত্তী সেন্ নামক স্থানে দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের সহায়তা কল্পে একটি নারীসমিতি গঠিত হইয়াছিল। আমিও তাহার একজন সভ্য ছিলাম। তাহার কোন কার্য্যেই কোন পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। দরিদ্রদিগের অভাব মোচন এবং রুগ্নদিগের সেবার জন্য মহিলাগণ নানা প্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতি মাসে একদিন সভ্যগণ সমিতি-গৃহে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার বস্ত্রাদি সেলাই করিতেন এবং এইরূপে নির্ম্মিত পরিচ্ছদ দ্বারা হতভাগ্য দরিদ্রগণের বস্ত্রের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। এই কার্য্য ব্যতীত, প্রত্যেক সভ্য কয়েকটি দরিদ্র পরিবার পরিদর্শনের ভার লইয়াছিলেন, সেই পরিবারগুলির মধ্যে কাহারও অসুখ হইলে নির্দ্দিষ্ট সভ্যকে পীড়িতের ঔষধ, পথ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিতে হইত, স্বয়ং গিয়া দেখিতে হইত। পর্দ্দার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এই প্রকার মহৎ কার্য্য সাধন কি সম্ভব? ভারতীয় ভগ্নিগণের প্রতি আমার নিবেদন, তাঁহারা শীঘ্র এই অবরোধ অতিক্রম করুন।

তার পরই, সেদেশের স্ত্রীশিক্ষার কথা আসে। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার অতি শোচনীয় অবস্থা। স্কুলের সংখ্যাই অতি সামান্য; সেই স্কুলের জন্যও শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। যাহা কিছু শিক্ষা হয়, তাহা কেবল মাত্র কয়েকখানি পুস্তক পাঠেই পর্য্যবসিত। প্রকৃত শিক্ষার অর্থ পর্য্যবেক্ষণ এবং অবগ্রহণ। কেবল পুস্তক পাঠদ্বারা তাহা হওয়া সম্ভব নহে। শিক্ষার এইরূপ দুর্দ্দশার মূলেও অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান।

যদি আমরা প্রকৃত শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে নারীদিগের অবস্থা নিশ্চয়ই উন্নত

হইবে। গার্হস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও সন্তান পালন এই কয়টি বিষয়ে আমাদের সর্ব্ব প্রথম মনোযোগ দেওয়া উচিত। শিক্ষার অভাবে আমাদের গৃহে শৃঙ্খলা সৌন্দর্য্য ও আনন্দ নাই; স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে আমরা কত অজ্ঞান, এবং শিশুদিগকে কেমন করিয়া প্রতিপালন করিতে হয় সেবিষয়ে কত অনভিজ্ঞ। গৃহকে কেমন করিয়া শান্তি, সুখ, বিশ্রাম ও আনন্দের লীলাভূমি করিতে হয়, সে কৌশল আমরা জানি না। আমাদের অজ্ঞতার জন্যই আমাদের গৃহের কোন আকর্ষণ নাই; আমরা যথা সময়ে রোগ দূর করিতে পারি না, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি না। আমাদের এইরূপ গৃহে মহৎ লোক কিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিবে ও বর্দ্ধিত হইবে! এবিষয়ে পুরুষগণ কখনই মনোযোগ দিতে পারে না। নারীগণই পুরুষগণের স্বাস্থ্য ও আনন্দের অভিভাবিকা। তাঁহারাই সন্তানগণের নিয়তি-বিধাত্রী।

এই কার্য্যে এ দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সাহায্য সমভাবে আবশ্যক। আসুন, আমরা স্ত্রীপুরুষে একত্রে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, আমাদের দেশকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নত করিতে চেষ্টা করি, যে যতটুকু পারি তাহাই করি।

শ্রীকাননকুমারী দেবী।

ইংলণ্ডে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ

দাসত্ব-প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে মানব সমাজে বিদ্যমান আছে। অসভ্য অবস্থায় পরাজিত শত্রুদিগকে মানুষ দাসত্বে নিযুক্ত করিত। ভারতবর্ষে অতি অল্প কাল পূর্ব্বেও দাসত্ব প্রথা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এদেশের দাসদাসীগণ সর্ব্বদাই স্বীয় প্রভুর পরিবারভুক্ত লোকের ন্যায় ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন রোম এবং গ্রীসেও দাসত্ব প্রথা বর্ত্তমান ছিল। গ্রন্থাদি পাঠে জানিতে পারা যায়, ঐ সকল দেশে দাস-দাসীর প্রতি অতি অমানুষিক ব্যবহার করা হইত। কোন দাসী হয়ত প্রভুপত্নীর চুল বাঁধিতেছে, চুলের কাঁটা (hair pin) রাখিবার কোন কিছু সম্মুখে পাওয়া যাই-তেছে না, প্রভুপত্নী দাসীকে বলিলেন, "তোর জিভ বাহির কর্।" দাসী জিভ বাহির করিলে জিভ ছেঁদা করিয়া তাহাতে চুলের কাঁটা রাখা হইল। পশুর প্রতিও সহজে মানুষ এত নির্দ্দয় হইতে পারে না।

এত গেল প্রাচীন কালের কথা। বর্ত্তমান যুগে—৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রথা ইউরোপে ও আমেরিকায় অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রচলিত ছিল। একজন সামান্য ব্যক্তির চেষ্টায় কিরূপে এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনের সূত্রপাত হইয়াছিল নিম্নে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বেও বড় বড় ইংরেজ জমিদারগণের ক্ষেতে মজুরের কাজ করিবার জন্য, তাঁহারা আফ্রিকা এবং আমেরিকবাসীদিগকে গরু ঘোড়ার মত কিনিতেন অথবা ধরিয়া আনিতেন। এই সকল নরনারী জমিদারদিগের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইত। ইহাদিগকে বলা হইত দাস (slave)। এই সকল দাস আনিয়া দিবার জন্য লোকে দল বাঁধিয়া দাসব্যবসায় করিত। তাহারা আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা স্থানে গিয়া, আদিম অধিবাসীদিগকে ভুলাইয়া অথবা জোর করিয়া, কারাগারের মত একটা স্থানে আনিয়া একত্র করিত। অনেক দাস সংগ্রহ হইলে, তাহাদিগকে নানা স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। দাস-সংগ্রহকারীগণ কখন একটি পরিবারের মাতাপিতা পুত্রকন্যা সকলকেই ধরিয়া লইয়া যাইত, কখন স্বামীকে রাখিয়া স্ত্রীকে লইয়া যাইত, অথবা মাতাপিতাকে রাখিয়া পুত্র বা কন্যাকে লইয়া যাইত; এবং এইরূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া, স্বামীকে এক স্থানে, স্ত্রীকে অন্য স্থানে, এবং মায়ের বুক হইতে ছিনাইয়া পুত্রকন্যাদিগকে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ও বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিব। এইরূপে হাজার হাজার স্বামীস্ত্রী, মাতাপিতা, ভাইবোন, পুত্রকন্যা চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় চলিয়া যাইত। ইহাদের করুণ ক্রন্দন ও অবিরল অশ্রুধারা নির্দ্দয় ব্যবসায়ীদিগের

* কানপুরের হিন্দু সভায় শ্রীমতী জেঃ পিঃ শ্রীবাস্তব কর্তৃক পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধের সারসংকলন।

অথবা দাসপ্রভু জমিদারদিগের হৃদয় স্পর্শ করিত না। হতভাগ্য দাসদিগকে যে কেবল এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে লইয়া যাওয়া হইত তাহা নহে; তাহার পরও তাহাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করা হইত। রৌদ্রবৃষ্টি, শীতগ্রীষ্ম সুস্থতা অসুস্থতা, জন্ম মৃত্যু, সকল অবস্থায় যন্ত্রের মত ক্ষেতে খাটা, একটু এদিক ওদিক হইলে বেত্রধারী প্রহরীর বেত্রাঘাত, অতি জঘন্য আহার, প্রভুর আদেশ মত উঠা বসা ও বিশ্রাম,—এই ছিল তাহাদের জীবন। কোন কোন ক্রীতদাস প্রভুর গৃহেও কার্য্য করিত, কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যবহার সর্ব্বত্রই সমান ছিল।

ইংলণ্ড চিরদিনই স্বাধীনতার দেশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু দাসগণ সেখানেও দাস;—তাহাদের আশ্রয় কোথাও ছিল না। এই সময় বার্বাডোজের একজন আইন-ব্যবসায়ী লণ্ডনে বাস করিতেন। জোনাথান ষ্ট্রং নামে তাঁর একজন ক্রীতদাস ছিল। জোনাথানের প্রভু তাহার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন, দিনরাত্রি খাটাইতেন, নামে মাত্র খাইতে ও পরিতে দিতেন। এইরূপ অবস্থায় কয়েক বৎসর যাপন করিয়া জোনাথান ক্রমে খোঁড়া এবং প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িল; বেচারার আর কাজ করিবার শক্তি রহিল না। তখন তাহার প্রভু, তাহাকে নিতান্ত অকেজো জিনিস মনে করিয়া, পথে বাহির করিয়া দিলেন!

লণ্ডনের ন্যায় প্রকাণ্ড সহরে, সে কোথায় যাইবে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। রোগের যাতনায় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থির হইয়া সে অত্যন্ত কষ্টে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত তাহা দ্বারা সামান্য কিছু কিনিয়া খাইয়া রাস্তায় বা গাছতলায় দিন কাটাইতে লাগিল। দিনের রৌদ্র এবং রাত্রির হিম তাহার মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার অসুখ বাড়িতে লাগিল, দৃষ্টিশক্তি একবারে নষ্ট হইয়া গেল, এবং সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায় সে একদিন উইলিয়াম্ সার্প নামক জনৈক সদাশয় ডাক্তারের ঔষধালয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার সার্প তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একটি চিকিৎসালয়ে তাহার বাসের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিছুকাল সেই চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া ষ্ট্রং আরোগ্য লাভ করিল। তখন তাহাকে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার উইলিয়াম এবং তাঁহার পরম দয়ালু ভ্রাতা গ্রেন্‌ভিল্ সার্প উভয়ে মিলিয়া তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে গ্রেন্‌ভিল্ তাহাকে একটি ঔষধের দোকানে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ষ্ট্রং স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল।

একদিন জোনাথান ষ্ট্রং রাস্তায় কি কাজ করিতেছিল, এমন সময় তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রভু তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে আপনার সেই ক্রীতদাস বলিয়া চিনিতে পারিয়াই তিনি দুইজন পুলিশ দ্বারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করিলেন। হতভাগ্য জোনাথান দিনরাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। তারপর তাহার মনে হইল, তাহার জীবনদাতা গ্রেন্‌ভিল্‌কে একখানা পত্র লিখিবে, যদি তিনি কোন প্রকারে তাহার উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। সে বহু কষ্টে একখানা পত্র লিখিয়া গ্রেন্‌ভিল্‌কে পাঠাইয়া দিল।

উইলিয়াম্ অথবা গ্রেন্‌ভিলের মনে কখনও এরূপ সন্দেহও হয় নাই, যে পরিত্যক্ত মৃতপ্রায় জোনাথান্‌কে কর্ম্মক্ষম দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব প্রভু পুনরায় তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। গ্রেন্‌ভিল্ জোনাথানের পত্র পাইয়া একবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি পত্র পাইয়াই সেই জেলে তাহার খোঁজ লইবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যে জেলের অধ্যক্ষ বলিলেন যে জোনাথান্ ষ্ট্রং নামক কোনও ব্যক্তি জেলে নাই। এই সংবাদে তাঁহার সন্দেহ হইল যে জেলের অধ্যক্ষ ঠিক কথা বলেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং জেলে গিয়া জোনাথানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তিনি জেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ষ্ট্রংকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথা বলিয়া তাহাকে অভয়-দান করিলেন। তারপর জেলারের নিকট গিয়া বলিলেন, যে সেই বন্দীকৃত ক্রীতদাসকে প্রধান মাজিষ্ট্রেটের

অনুমতি ব্যতীত যেন অন্য কোনও লোকের হাতে না দেওয়া হয়; কারাধ্যক্ষ এ কথার বিরুদ্ধাচরণ করিলে বিপদে পড়িবেন। এই কথা বলিয়াই গ্রেন্‌ভিল্ প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া জোনাথানের বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। যাহারা জোনাথান্‌কে বন্দী করিয়াছিল প্রধান মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার হুকুম অনুসারে দুই পক্ষ তাঁহার কাছারীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জোনাথানের পূর্ব্বপ্রভু তাহাকে অপর একজনের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, নূতন ক্রেতা সেই রসীদ দেখাইয়া বলিলেন, যে জোনাথান্ এখন তাঁহার বিষয় সম্পত্তির মধ্যে গণ্য, অতএব তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে চান। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, যে ষ্ট্রং যখন কোন অপরাধ করে নাই তখন তাহাকে আমি বন্দী করিতে পারি না, সে স্বাধীন কি কাহারও অধীন সে বিচার করিতে আমি অসমর্থ। তিনি ষ্ট্রংকে ছাড়িয়া দিলেন। ষ্ট্রং গ্রেন্‌ভিলের সঙ্গে তাঁহার গৃহে চলিয়া গেল। ষ্ট্রংকে যিনি কিনিয়াছিলেন তিনি গ্রেন্‌ভিল্‌কে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, যে তিনি তাঁহার ক্রীতদাসকে চুরি করিয়াছেন, শীঘ্র তাহাকে ফিরাইয়া দিন্। গ্রেন্‌ভিল্ এই কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি গ্রেন্‌ভিলের নামে নালিশ করিলেন। সে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

ইংলণ্ডে সকলেই স্বাধীন—ইহাই ইংরাজ জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরব। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইহা কেবল কথার কথা ছিল। তখন দরিদ্র ও সহায়হীন ইংরাজদিগকেও ধরিয়া জোর করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজ করিতে অথবা আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে কার্য্য করিতে পাঠান হইত। এখনও যেমন, অনেক সময়, আসামের চা-বাগানে কুলির কাজ করিবার জন্য, একদল লোক (আড়কাঠি) কত লোককে ভুলাইয়া বন্দী করিয়া লইয়া যায়, তখন তেমনি একদল ইংরাজই এইরূপে স্বদেশবাসী নরনারীকে ধরিয়া বিদেশে পাঠাইত। ইংলণ্ডের বড় বড় সংবাদপত্রে নিগ্রো দাস ক্রয় বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত; এবং পলাতক দাসদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইত। ইংলণ্ডে বড় বড় বিচারপতিগণ, এবং আইন ব্যবসায়ীগণ অনেকেই মনে করিতেন যে, দাস ইংলণ্ডেও দাস; সে ইংলণ্ডে স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রভুর ইচ্ছা হইলে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। পলাতক দাস সংক্রান্ত মোকদ্দমায় এক এক জন বিচারক এক এক রকম রায় দিতেন। এইরূপ সময়ে ষ্ট্রংএর ক্রেতা গ্রেন্‌ভিলের নামে নালিশ করিলেন এবং তাঁহাকে এই বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন, যে প্রধান বিচারপতি ম্যান্স্ফিল্ড্ এবং বড় বড় আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই মত, যে দাস ইংলণ্ডে আসিয়াও স্বাধীন হয় না।

গ্রেন্‌ভিল্ স্বয়ং যত বড় বড় আইনজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন, তাঁহারাও উক্ত মতই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গ্রেন্‌ভিলের মন মানিল না। ইংলণ্ডের আইনকানুনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়ে কি কি বিধি আছে তাহা স্বয়ং জানিবার জন্য তিনি আইন শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বড় লোক ছিলেন না। চাকুরীতে সমস্ত দিন একটি আফিসে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। তারপর সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া গভীর রজনী পর্য্যন্ত এবং প্রাতঃকালে আইন পাঠ করিতেন। ইংলণ্ডের যত আইন, যত রাজবিধি, পার্লামেন্টের যত বিধান, বিচারকদিগের রায়, উকিলদিগের মত ও ব্যাখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং প্রয়োজনীয় কথাগুলি লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া বিচার চলিতে লাগিল, দুই বৎসর তাঁহার অধ্যয়নও চলিল। অবশেষে তিনি ইংলণ্ডের সকল আইন ও রাজবিধি হইতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিলেন, এবং স্বহস্তে লিখিয়া তাহার এক একখানি বিখ্যাত বিচারক ও আইনজ্ঞদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইয়া দেন যে ইংলণ্ডের কোন আইন অনুসারে ইংলণ্ডে দাস-ব্যবসায় সমর্থন করা যায় না। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিজ্ঞ আইনজ্ঞদিগের মত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; যাঁহারা গ্রেন্‌ভিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাঁহারাও

তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে যথেষ্ট অর্থ দণ্ড দিয়া দাস-প্রভু অব্যাহতি পাইলেন।

এই সময়ের মধ্যে গ্রেন্‌ভিল হতভাগ্য নিগ্রো-দাসদিগের বন্ধু বলিয়া সকলের সুপরিচিত হইয়া গেলেন। জোনাথান ষ্ট্রং-এর মোকদ্দমা যখন চলিতেছিল, তখনও লণ্ডনে নিগ্রো চুরি অবাধে চলিতেছিল। গ্রেন্‌ভিল্ এইরূপ চুরির সংবাদ পাইলেই বিচারালয়ে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। এইরূপে কয়েকজন হতভাগ্য নরনারীকে উদ্ধার করায়, তিনি সর্ব্বসাধারণের পরিচিত এবং শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই শ্রেণীর কয়েকটি ঘটনার পর, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একটি গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইল।

লণ্ডনের এক দরিদ্র পাড়ায় নদীর ধারে কয়েক জন নিগ্রো বাস করিত। একদা ঘোর অন্ধকার রাত্রি-কালে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ দুইজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি আসিয়া একজন নিগ্রোকে তাহার ঘর হইতে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল, নদীর জলের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে একখানি নৌকায় তুলিল, এবং তাহার আর্ত্তনাদ বন্ধ করিবার জন্য তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল। তারপর তাহার হাত পা বাঁধিয়া, সেই নৌকা বাহিয়া সমুদ্রে গিয়া তাহাকে এক জাহাজে উঠাইয়া দিয়া আসিল। এই ব্যক্তির নাম লিউইস্। হতভাগ্য লিউইস্ প্রাণপণ সংগ্রাম ও চীৎকার করিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার কয়েকজন প্রতিবেশী তাহার চীৎকার শুনিয়া জাগিয়াছিল। তাহারা গৃহের বাহিরে নদীর তীরে আসিয়া বুঝিতে পারিল যে কয়েকজন লোক লিউইস্‌কে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল এবং এক নৌকায় তুলিয়া তাড়াতাড়ি সমুদ্রের দিকে চলিয়া গেল। তাহারা গরিব মানুষ, কি করিবে? হঠাৎ গ্রেন্‌ভিলের নাম মনে হইল। একজন তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গিয়া উক্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইল। সেই গভীর রজনীতে মহাত্মা গ্রেন্‌ভিল্ প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লিউইস্‌কে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার আদেশ লিখাইয়া লইলেন, এবং সেই আদেশ ও পুলিশের সঙ্গে বন্দরে (Graves-end) গিয়া দেখিলেন, জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে জাহাজের শেষ ষ্টেশন স্পিট্‌হেডে (Speat-head) গিয়া উপস্থিত হইলেন। জাহাজে চড়িয়া দেখিলেন, সেই হতভাগ্য মাস্তলের সহিত শিকল দিয়া বাঁধা রহিয়াছে, এবং চক্ষের জলে ভাসিতেছে। তিনি পুলিশের সাহায্যে তাহাকে মুক্ত করিয়া লণ্ডনে লইয়া আসিলেন। যে ব্যক্তির আদেশে লিউইস্ ধৃত হইয়াছিল তাহাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশকে আদেশ করিলেন। মোকদ্দমা চলিল। বিচারপতি ম্যান্স্‌ফিল্ড্ লিউইস্‌কে মুক্তিদান করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে প্রতিবাদী লিউইস্‌কে তাহার দাস বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিল না বলিয়াই লিউইস্ মুক্তিলাভ করিল; লিউইস ক্রীতদাস হইলে কি হইত তাহার মীমাংসা হইল না। কিন্তু গ্রেন্‌ভিলের প্রাণপণ চেষ্টায় ক্রমাগত অপহৃত নিগ্রোগণ মুক্তিলাভ করিতে লাগিল।

অবশেষে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হইল যদ্দ্বারা ইংলণ্ডে দাসদিগের অবস্থা যে কি তাহা স্থির হইয়া গেল। একজন জমিদারের অনেক দাস ছিল। তিনি তাঁহার একজন দাসকে লণ্ডনে আনিয়া পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, তিনি সেই দাসকে পুনরায় ধরিয়া লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে চান। এই দাসের নাম জেম্‌স্ সমার্‌সেট্। এই সংবাদ পাইয়াই গ্রেন্‌ভিল্ সমার্‌সেটের প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রধান বিচারপতি লর্ড ম্যান্স্‌ফিল্ড্ এতদিনে একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে চাহিলেন। ইংলণ্ডে ক্রীতদাসের অবস্থা কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি তাঁহার অধীনস্থ বিচারকদিগের মতামত জানিতে চাহিলেন এবং গ্রেন্‌ভিল্‌কে বলিলেন, যে এবার তিনি একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ছাড়িবেন, এ বিষয়ে তাঁহার এবং উকিলদিগের সহায়তা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রেন্‌ভিল্ ইংলণ্ডের অসংখ্য

আইন অধ্যয়ন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় বিধিগুলির সংকলন করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে নকল করিয়া প্রধান প্রধান আইনব্যবসায়ী ও বিচারকগণের নিকট তাহার এক এক খানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখন তাহা মুদ্রিত করিয়া ইংলণ্ডের প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহার এক এক খানি প্রেরণ করিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং গ্রেন্‌ভিল্ কর্তৃক পরিচালিত দাসদিগের মোকদ্দমার সংশ্রবে আসিয়া বিচারকগণ, উকীলগণ এবং সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণের এবং দাসগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ক্রমশঃ অধিক মনোযোগ দিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে এবিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা চলিতে লাগিল।

প্রধান বিচারপতি লর্ড ম্যান্সফিল্ড্, অপর তিনজন বিচারকের সহিত মিলিত হইয়া সমারসেটের মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিলেন। প্রধান প্রধান উকীলগণ ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে গ্রেন্‌ভিলের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, কয়েকজন উকীল অপর পক্ষ হইতে ইঁহাদের উক্তি ও যুক্তি খণ্ডন করিতে লাগিলেন, এবং বিচারপতিগণ পরামর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বিচারকার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমাগত প্রায় ছয় মাস ধরিয়া তর্কবিতর্ক ও গবেষণার পর প্রধান বিচারপতি সুদীর্ঘ রায় প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডে প্রত্যেক নরনারী,—কি গরিব, কি বড়লোক, কি ইংরাজ, কি অন্য দেশীয়—সকলেই স্বাধীন; ইংলণ্ডের রাজবিধি ব্যতীত ইংলণ্ডে অন্য কোন শক্তি কাহারও স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না। ইংলণ্ডে কেহ দাস থাকিতে পারে না; কেহ কাহাকেও দাস বলিয়া দাবী করিতে পারে না; অতএব সমারসেট্ মুক্তিলাভ করিল। এতদিন ইংলণ্ডেও প্রকাশ্যভাবে দাস ক্রয় বিক্রয় চলিতেছিল, এই দিন হইতে তাহার মূলে কুঠারাঘাত হইল। অতঃপর ইংলণ্ডে আসিয়া শত শত দাস স্বাধীনতা লাভ করিতে লাগিল।

গ্রেন্‌ভিল্ তখন মুক্ত দাসদিগকে আশ্রয় দান করিবার জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন করিলেন,—তাহারা সেখানে স্বাধীন ভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তারপর ইংলণ্ডের অধীন দেশ ও উপনিবেশ সকল হইতে যাহাতে দাসত্বপ্রথা উঠিয়া যায় তজ্জন্য তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং কয়েক জন সহৃদয় মহামনা ব্যক্তি লইয়া "দাসত্বপ্রথা নিবারিণী সভা" স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও প্রেমের দৃষ্টান্তে শত শত হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। এতদিন যে কার্য্য তিনি বীরের ন্যায় একাকী করিতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে শত শত লোক আসিয়া সেই কার্য্যে যোগদান করিলেন। তাঁহারই দেবত্বে আকৃষ্ট হইয়া ক্লার্কসন্, উইল্‌বারফোর্স, ব্রাউহ্যাম এবং বাক্স্‌টনের ন্যায় মহাত্মাগণ এই কুপ্রথা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হতভাগ্য দাসদিগের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য কঠোর সংগ্রাম করিয়া ক্লার্কসন্ প্রভৃতির হস্তে সেই মহা সংগ্রামের বিজয় নিশান অর্পণ করিয়া মহাত্মা গ্রেন্‌ভিল্ ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি যে আগুন জ্বালিয়া গেলেন তাহা শত শত হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল, এবং অবশেষে দাসত্ব প্রথার মূল পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ করিয়া নির্ব্বাপিত হইল।

মুক্ত বায়ুর ব্যবহার

দূষিত বায়ু স্বাস্থ্য নষ্ট করে, একথা আমাদের জানা থাকিলেও আমরা এসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হই না। ইহার জন্য আমাদের দেশে কত ব্যক্তি যে রোগাক্রান্ত হইতেছেন ও কত শিশু যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অজ্ঞতা বশতঃ আমরা নিজেরাই বায়ুকে দূষিত করি এবং এই দূষিত বায়ু সেবন করিয়া পীড়াগ্রস্ত হই। প্রকৃতির নিয়মে বিশুদ্ধ বায়ুর কখনই অভাব হয় না, কিন্তু কিরূপে তাহা উপভোগ করিতে হয় আমরা তাহা সম্যক্ বুঝি না। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে দূষিত বায়ু সেবনই আমাদের

দেশে যক্ষ্মারোগ বিস্তৃতির একটী প্রধান কারণ। দূষিত বায়ু যেরূপ রোগ উৎপাদনে সহায়তা করে বিশুদ্ধ বায়ু সেইরূপ রোগ আরোগ্যে সহায়তা করিয়া থাকে। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনই অনেক রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। মুক্ত বায়ুতে নানাপ্রকার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্যদেশ সমূহে বহুসংখ্যক স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে তুষারপাতাদির জন্য মুক্তবায়ু উপভোগ করা সকল সময়ে সহজসাধ্য নহে, এজন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহাতে সর্ব্বঋতুতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা যাইতে পারে তজ্জন্য নানারূপ যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সকল যন্ত্র ব্যয়সাধ্য, এজন্য সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। আমাদের অজ্ঞতা ব্যতীত ভগবানের কৃপায় আমাদের দেশে মুক্তবায়ুসেবনের কোনই অন্তরায় নাই। এদেশে মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য এক পয়সাও খরচ নাই।

আমরা এই প্রবন্ধে বায়ু সম্বন্ধে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রায় সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই আলোচনা করিব। সর্ব্বসাধারণে ঘরে বসিয়া কি কি উপায়ে নির্ম্মল বায়ু উপভোগ করিতে পারেন তাহারও বিশদ আলোচনা করা হইবে।

বায়ুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ।

আমাদের এই পৃথিবী নিরন্তর বায়ুসমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তর ঊর্দ্ধদিকে প্রায় ২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যতই ঊর্দ্ধে উঠা যাইবে বায়ুর ঘনত্ব ততই ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে দেখা যাইবে। পর্ব্বতোপরিস্থ বায়ুর ঘনত্ব সমতল প্রদেশের বায়ু অপেক্ষা অনেক অল্প।

এই বায়ুর সহিত আমাদের শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণের সময় আমরা শরীর মধ্যে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি এবং প্রশ্বাস কালে তাহা পরিত্যাগ করি। বায়ু শরীরের পক্ষে এতই প্রয়োজনীয় যে শরীরের দুইটী প্রধান যন্ত্র (ফুসফুস) সদাসর্ব্বদা বায়ু গ্রহণের জন্য নিযুক্ত আছে। পাঁচ মিনিটের জন্য নিশ্বাস গ্রহণ কোন কারণে বন্ধ হইলে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, কয়েকটী গ্যাসের সংমিশ্রণে বায়ু গঠিত। বায়ুতে শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন, ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন ও সামান্য পরিমাণ কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড, এমোনিয়া, জলীয় বাষ্প, ওজন প্রভৃতি গ্যাস বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত বায়ুতে আরগন, হিলিয়ম, নিয়ন, ক্রিপ্টন প্রভৃতি গ্যাস অতি অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত গ্যাসগুলির শরীরের উপর বিশেষ কোন প্রভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে অক্সিজেনই শরীর রক্ষার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বায়ুতে অন্যান্য গ্যাসগুলির অভাব হইলে শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু অক্সিজেনের অভাব হইলেই মৃত্যু ঘটে। কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড ব্যতীত বায়ুর অপর কোন উপাদানই শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। অপর উপাদানগুলির আধিক্য থাকিলে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হওয়ায় তাহা শরীরের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। বায়ুতে কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অধিক হইলে শরীরের ক্ষতি হয়।

নিশ্বাস গ্রহণকালে যে বায়ু ফুসফুস মধ্যে গৃহীত হয়, রক্ত তাহা লইতে কিয়ৎপরিমাণে অক্সিজেন শোষণ করিয়া লয়। এই অক্সিজেন রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে চালিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। অক্সিজেন শরীরের অঙ্গার (Carbon) জাতীয় পদার্থসমূহের সহিত মিলিত হয় এবং এই রাসায়নিক সংযোগ হইতেই শরীরের উত্তাপ ও শক্তির উৎপত্তি। অঙ্গার ও অক্সিজেনের সংযোগে শরীরের মধ্যে কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং এই গ্যাস শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া রক্তের সহিত তাহা ফুসফুসে উপস্থিত হয় এবং প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই কারণে আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি (নিশ্বাস বায়ু) ও যে বায়ু পরিত্যাগ করি (প্রশ্বাস

বায়ু) তদুভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। নিম্নে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর উপাদানের তালিকা দেওয়া গেল।

	নিশ্বাস বায়ু		প্রশ্বাস বায়ু
অক্সিজেন	২০.৯৬ ভাগ	শতকরা	১৬.০৩ ভাগ
নাইট্রোজেন	৭৯ ,,	,,	৭৯ ,,
কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড	.০৪ ,,	,,	৪.৪ ,,

নিশ্বাস বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঋতুভেদে কম বেশী হইয়া থাকে, কিন্তু আর্দ্র শরীরাভ্যন্তর হইতে নির্গত হয় বলিয়া প্রশ্বাস বায়ু সর্ব্ব সময়েই জলীয় বাষ্পে অনুসিক্ত থাকে।

নিশ্বাস বায়ু অপেক্ষা প্রশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প এবং কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অধিক। এজন্য রুদ্ধগৃহে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে তথাকার বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; গৃহস্থিত বায়ু কিয়ৎকালের মধ্যেই জলীয় বাষ্পে সিক্ত হইয়া পড়ে।

দূষিত বায়ু কাহাকে বলে ও কি প্রকারে বায়ু দূষিত হয়

যে বায়ু নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শরীরের অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে, তাহাকে দূষিত বায়ু বলা যায়। সাধারণতঃ যে যে কারণে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল ঃ—

(১) অক্সিজেনের অভাব।

(২) কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য।

(৩) জলীয় বাষ্পের অভাব বা আধিক্য।

(৪) অনিষ্টকর বাষ্পের সংমিশ্রণ।

(৫) বায়ুতে ধূলিকণার বা অন্য প্রকার ভাসমান পদার্থের আধিক্য।

(৬) রোগ-বীজাণুর বিদ্যমানতা।

অক্সিজেনের অভাব—বায়ুতে নানাকারণে অক্সিজেনের অভাব ঘটিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রুদ্ধ গৃহে অবস্থান করিলে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যায়। গৃহমধ্যে ল্যাম্প প্রভৃতি জ্বলিলেও অক্সিজেন কমে। জ্বলিবার সময় ল্যাম্পের তৈলের সহিত বায়ুস্থিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয় ও ইহা হইতে কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে খনি মধ্যে এবং গভীর কূপের বায়ুতে অনেক সময় অক্সিজেনের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য থাকে এজন্য সাবধান না হইয়া এরূপ কূপের মধ্যে অবতরণ করিলে মৃত্যু হইতে পারে। কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে ময়লা নির্গমনের জন্য মৃত্তিকা-নিম্নে বৃহৎ নলের ড্রেণ পরিষ্কার করিবার জন্য সময় সময় তন্মধ্যে মেথররা প্রবেশ করে। এইরূপ ড্রেণের ভিতরের বায়ুতে কখনও কখনও অক্সিজেনের নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে; এরূপ অবস্থায় ড্রেণের মধ্যে প্রবেশ করা বিপজ্জনক। সম্প্রতি কলিকাতায় এইরূপে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অনেকের ধারণা আছে ড্রেণের বিষাক্ত গ্যাসই এইরূপ মৃত্যুর কারণ। ড্রেণের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস থাকিলেও, অক্সিজনের অভাবেই যে সাধারণতঃ এইরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য—যে সকল কারণে বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব হয় প্রায় সেই সমস্ত কারণেই কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের আধিক্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহু দীপালোকিত বায়ুচলাচলবিহীন রুদ্ধ গৃহে অনেকের একত্রে অবস্থান ইহার মধ্যে অন্যতম। কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা অধিক ভারি। চুণের পাঁজা পোড়াইবার সময় এই গ্যাস প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং বায়ু নিশ্চল থাকিলে তাহা পাঁজার চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং বায়ুকে দূষিত করে। এইরূপে চুণের পাঁজার নিকট শয়ন করিয়া থাকায় মৃত্যু হইয়াছে এরূপ ঘটনাও দেখা গিয়াছে।

জলীয় বাষ্পের অভাব বা অধিক্য—জলীয় বাষ্পের অভাব বা আধিক্যেও শরীরে নানাপ্রকার কষ্ট বা পীড়া হইতে পারে; এজন্য নিতান্ত শুষ্ক বা আর্দ্র বায়ুকে দূষিত বায়ু বলা যাইতে পারে। বায়ুর এরূপ দোষ বিশেষ মারাত্মক নহে এবং অত্যন্ত হইলে শুষ্ক বা সিক্ত বায়ুতে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না।

অনিষ্টকর বাষ্পের সংমিশ্রণ—এরূপ অনেক বাষ্প আছে, যাহা শরীরের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। বায়ুর সহিত এইরূপ বিযুক্ত বাষ্প মিশ্রিত হইলে বায়ু দূষিত হয়। রাসায়নিক পরীক্ষাগারের বায়ু এই কারণে অনেক সময় দূষিত হইয়া থাকে। শয়ন গৃহের আলো জ্বালিবার গ্যাসের নল খোলা থাকিলে, বায়ু গ্যাসের সংমিশ্রণে দূষিত হয়। এইরূপ গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলে মৃত্যু হইতে পারে। গ্যাসের উপাদানের মধ্যে কার্ব্বণ মনক্সাইড নামক এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প আছে। ইহাই শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। রুদ্ধ গৃহে কয়লার আগুণ জ্বালিয়া রাখিলে অনেক সময় কার্ব্বণ-মনক্সাইড্ উৎপন্ন হয়। এই কারণে আমাদের দেশের নব প্রসূতিদিগের মাথাধরা প্রভৃতি নানারূপ পীড়া হইতে দেখা যায়। আঁতুড় ঘরে রাত্রে আগুণ রাখা উচিত নহে।

সাল্‌ফিউরিক এসিড প্রস্তুতের কারখানার নিকটস্থ বায়ুতে গন্ধকের ধূম থাকে বলিয়া তাহা অস্বাস্থ্যকর। চামড়ার কারখানা, মল প্রোথিত করিবার স্থান, হাড়ের কারখানা প্রভৃতির চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু সদা সর্ব্বদা দুর্গন্ধময় থাকে। এইরূপ বায়ুতে অবস্থান স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। দুর্গন্ধময় পায়খানা বা আঁস্তাকুড় থাকিলে বাসগৃহের বায়ু অপবিত্র হয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এক স্থানে বহু ব্যক্তি একত্রিত হইলে ঘর্ম্মসিক্ত বস্ত্রাদির ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ুতে এক প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। এরূপ বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এতদ্ব্যতীত পচা পুকুর বা যে কোন কারণে বায়ু দুর্গন্ধময় হইলে তাহা অহিতকর হইতে পারে। দরজা জানালায় রং দিবার পর যে দুর্গন্ধ হয় তাহা হইতেও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে।

ধূলিকণা বা বায়ুতে অন্য প্রকার ভাসমান পদার্থের আধিক্য—ধূলিকণা বায়ুর উপাদান না হইলেও প্রায় সকল স্থানের বায়ুতে তাহা অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ ধূলিকণা আমাদের চক্ষের অগোচর। কিন্তু গৃহ মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিলে এই সকল ভাসমান ধূলিকণা সহজেই দেখা যায়। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরের বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ অনেক অধিক। যে স্থানে অনেক লোক একত্র হইয়াছে, তথাকার বায়ুতেও অধিক পরিমাণে ধূলিকণা থাকিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ নিশ্বাস গ্রহণকালে, এই সকল ধূলিকণা নাসিকাভ্যন্তরে ও শ্বাসনালীতে আট্‌কাইয়া যায় এবং কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া হাঁচিবার ও কাশিবার সময় বিনির্গত হয়। ধূলিকণার পরিমাণ অত্যধিক হইলে তাহা ফুস্‌ফুসে পৌছিতে পারে ও পীড়া উৎপন্ন করে। বায়ুতে ধূলিকণা অধিক থাকিলে বীজাণুর সংখ্যা সেই অনুপাতে অধিক থাকিতে পারে। কল কারখানাপূর্ণ বৃহৎ নগরের বায়ু শুধু যে ধূলিপূর্ণ, তাহা নহে; ইহাতে ধূমেরও আধিক্য বেশ আছে। বলা বাহুল্য ঈদৃশ বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুপযোগী।

ময়দা, পাট, চূণ, তুলা, লৌহ, পিত্তলাদির কারখানার বায়ু ঐ সকল দ্রব্যের ভাসমান রেণু-সমাকীর্ণ। ধূলির মত এই সকল রেণুও নিশ্বাসের সহিত ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হয় ও স্বাস্থ্যহানি করে।

রোগবীজাণুর বিদ্যমানতা—যে স্থানে মনুষ্য বা গৃহপালিত জন্তু বাস করে, তথাকার বায়ু অল্প বিস্তর বীজাণু পূর্ণ। ইহার মধ্যে রোগ-বীজাণু অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বীজাণু মাত্রেই উড়িতে অক্ষম। ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া ইহারা বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। কতকগুলি রোগবীজাণু রোগীর মল, মূত্র, কফ প্রভৃতির সহিত নির্গত হয় ও এই সকল দ্রব্য শুষ্ক হইলে বীজাণুগণ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া নিশ্বাসের সহিত সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। বীজাণু আধিক্যের জন্য সহরের বায়ু পল্লীগ্রামের বায়ু অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর।

বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে যক্ষ্মা রোগীর গৃহের বাতাস অন্যের পক্ষে দূষণীয় হইতে পারে। রৌদ্র লাগিলে বায়ুস্থ বীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই কারণে অন্ধকারময় গৃহ অপেক্ষা সূর্য্যালোকযুক্ত গৃহ অধিকতর স্বাস্থ্যকর।

শরীরের উপর দূষিত বায়ুর ক্রিয়া

দূষিত বায়ু কি প্রকারে শরীরের অনিষ্টসাধন করে আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অক্সিজেনের অভাবে শরীরের অনিষ্ট হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগের ন্যূন হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হয়। সাধারণতঃ রুদ্ধ গৃহে যদিও অক্সিজেনের পরিমাণ কখনই অতখানি কম হয় না, তথাপি রুদ্ধগৃহে শয়ন করিলে পূর্ণমাত্রায় অক্সিজেন না পাওয়ায় ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। যাঁহারা রুদ্ধগৃহে শয়ন করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অপাততঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ না হউক, রোগবীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারা তাহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না—অর্থাৎ রোগে জখম হইয়া পড়েন। বায়ুতে কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা তিন ভাগের অধিক হইলে শরীরে কষ্ট অনুভূত হয়। মাথাধরা, আলস্য, নিদ্রাবেশ, তড়্কা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। রুদ্ধ গৃহের বায়ুতে যদিও কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কখনই এত অধিক হয় না, তথাপি নির্ম্মল বায়ুতে ইহা যে পরিমাণে থাকে রুদ্ধ গৃহে তদপেক্ষা অধিক থাকায় ক্রমশঃ স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

বায়ু অধিক আর্দ্র হইলে কেহ কেহ অবসাদ অনুভব করেন। সর্দ্দি, কাসি আর্দ্র বায়ুতে অধিক হইতে দেখা যায়। বায়ু অধিক শুষ্ক হইলে হাত পা ও চক্ষু করে, ঠোঁট ফাটে ও এক প্রকার শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়। অভ্যস্ত হইলে বায়ুর শুষ্কতা বা আর্দ্রতা হেতু বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। সাহারা মরুতেও মানব সুস্থ অবস্থায় কালাতিপাত করে।

বায়ুতে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসের সংমিশ্রণে শরীর বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমোনিয়া, ক্লোরিন, গন্ধকের ধূম ইত্যাদি গ্যাস শ্বাসনালীর ও ফুস্‌ফুসের প্রদাহ উৎপাদন করে ও নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। কার্ব্বন মনক্সাইড নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে রক্তের সহিত মিলিত হয়। ইহাতে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা হ্রাস হয় এবং অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিলে মৃত্যু ঘটে। ক্লোরোফরম, ইথার ইত্যাদির বাষ্পে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়।

দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুতে অবস্থান করিলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, এ কথা বলা হইয়াছে। দুর্গন্ধের জন্য কেন যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাহা অদ্যাবধি নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, বমনেচ্ছা ও নানাবিধ স্নায়বিক বিকার উৎপাদন করে। দুর্গন্ধময় বায়ুতে অবস্থান করিলে শরীরের রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বায়ুতে ধূলিকণা বা তদ্রূপ অন্য কোন ভাসমান পদার্থের আধিক্য থাকিলে তাহা ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া প্রদাহ উপস্থিত করে ও নিউমনোকনাইওসিস্ (Pneumonokoniosis) নামক রোগ উৎপন্ন হয়। যাহারা পাটের গুদাম প্রভৃতি ধূলি পূর্ণ স্থানে কার্য্য করে তাহাদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগ হইতে যক্ষ্মা হইতে পারে। শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে নির্ম্মল বায়ুসেবী পল্লীবাসীর ফুস্‌ফুস্ দেখিতে রক্তাভ অর্থাৎ তাহার বর্ণ স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ধূমাদি দূষিত-বায়ু-সেবী নাগরিকের শ্বাস-যন্ত্র কৃষ্ণবর্ণ।

চূণ, তামাকের গুঁড়া ইত্যাদি দ্রব্য রাসায়নিক উপাদান বিশেষের জন্য ফুস্‌ফুসের পক্ষে বিশেষ অপকারী।

প্রস্তর ও ধাতব পদার্থের ধূলি সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ; তজ্জন্য ইহারা ফুস্‌ফুসে ক্ষত উৎপাদন করে।

বায়ু মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন বীজাণু শ্বাস-যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন প্রকারের রোগ উৎপাদন করিতে পারে। সর্দ্দি ব্রন্‌কাইটিস্, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধি বায়ুস্থিত বীজাণু দ্বারাই উৎপন্ন হয়। প্লেগের বীজাণু নিশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হইলে প্লেগ নিউমোনিয়া উৎপাদন করে। যক্ষ্মা-বীজাণু অধিকাংশ স্থলে নিশ্বাসের দ্বারা ফুস্‌ফুসে উপনীত হয় ও যক্ষ্মা রোগ জন্মায়। যক্ষ্মা রোগীর গয়েরের সহিত যক্ষ্মা-বীজাণু প্রথমতঃ শরীর হইতে নির্গত হয়। পরে উহা শুষ্ক হইলে ধূলিকণার সহিত যক্ষ্মা-বীজাণু বায়ুতে ভাসমান হয়। নিশ্বাসের সহিত এই বীজাণু যে-কোন সুস্থ ব্যক্তির শ্বাস-যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে। এই জন্য যক্ষ্মা রোগীর যেখানে সেখানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা বিধেয় নহে। উহা জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত ও পরে ধ্বংসীভূত হইলে অপকারের সম্ভাবনা থাকে না।

হাম, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণু যদিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি এই সকল রোগ যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বায়ু দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

সৈনিকের স্বপ্ন *

১

ঢাকিল আকাশতল সান্ধ্য অন্ধকার,
"ক্ষান্ত হও"—তূর্য্যধ্বনি উঠিল ঘোষিয়া,
অম্বরে উদয় হ'ল লক্ষ তারকার—
প্রহরীর দল যেন চাহিল জাগিয়া।
বিবশ সহস্র যোদ্ধা পড়িয়া শয়নে,
শ্রান্ত ঘুমে, আহতেরা মৃত্যু মনে গণে।

২

রক্ষিবারে শবরাশি ব্যাঘ্র-গ্রাস হতে
প্রচণ্ড অনল শিখা জ্বলিছে ভীষণ;
তারি পাশে ছিনু শুয়ে তৃণ-শয্যা পেতে,
নিশীথে হেরিনু এক মধুর স্বপন।
মধুর যামিনী সেই না হইতে ভোর,
বারত্রয় হেরিনু সে স্বপন মধুর।

৩

মনে হ'ল যেন কোন দূর দুরান্তরে
ভ্রমিতেছি ত্যজি দৃশ্য যুদ্ধের ভীষণ।
হেমন্তের সে মধ্যাহ্নে তপনের করে
উদ্ভাসিত জন্মভূমি,—প্রীতি-নিকেতন,
সুদীর্ঘ বিরহ পরে হেরিয়া সন্তান,
সম্ভাষিল বুকে ল'য়ে করিয়া চুম্বন।

৪

আবেগের ভরে এক সুস্নিগ্ধ প্রান্তরে
চলিনু ছুটিয়া, যেথা ভ্রমেছি অনেক
প্রভাত-জীবনে সুখে বিমল অন্তরে,
না হ'তে শৈশব-সুখ-ক্রীড়া পরিত্যাগ।
আমারি ছাগের দল ডাকে গিরি 'পরে,
গাহিছে কৃষক-কুল সুমধুর স্বরে।

৫

স্বাস্থ্য-সুধা পান করি হরষে তখন
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি; 'যাব না-ক আর
পরিহরি দেশ গৃহ মিত্র পরিজন
ভীষণ সংগ্রাম মাঝে, জীবনে আমার।'
'বাবা' বলি' শিশুগুলি চুমিল হরষে,
পুরিত প্রিয়ার হৃদি প্রীতির পরশে।

৬

"দুর্ব্বার সংগ্রামে সখা যেও না-ক আর,
রণক্লান্ত এবে নাথ জুড়াও জীবন"—
ভাষিল সজল চোখে প্রেয়সী আমার;
নিশা অবসানে হায়, ভাঙ্গিল স্বপন!
স্বপন-জড়িত কর্ণে নীরবিল মম
প্রেয়সীর সুধা মাখা কণ্ঠ অনুপম!!

শ্রী প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Campbell's "The Soldier's dream" নামক ইংরাজী কবিতা অবলম্বনে লিখিত।

বাঙ্গালীর দৈহিক শক্তি

বাঙ্গালী এখন শারীরিক শক্তিহীনতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপরের কথা দূরে থাকুক, হিন্দুস্থানীগণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল বলিয়া তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু বাঙ্গালী চিরদিন এমন দুর্ব্বল ছিল না। এখনও চেষ্টা করিলে বাঙ্গালী শরীরের কত উন্নতি করিতে পারে তরুণ যুবক শ্রীমান যতীন্দ্রচরণ গুহ সম্প্রতি তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে। হিন্দুস্থানী অনেক পালোয়ান ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় পালোয়ান দিগের সহিত লড়িবার জন্য ইউরোপে গিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু শ্রীমান যতীন্দ্র ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী পালোয়ানের এরূপ খ্যাতি অর্জ্জনের কথা আমরা পূর্ব্বে শুনি নাই। বাঙ্গালীর সর্ব্বতোমুখী

প্রতিভা দিন দিন জগত ছড়াইয়া পড়িতেছে, আমরা আশা করি, শারীরিক শক্তিতেও বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। "সোপান"নামক বালকবালিকাদিগের পাঠ্য পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নে শ্রীমান্ যতীন্দ্রের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যতীন্দ্রের ডাক নাম 'গোবর'। তাহার বয়স এখন কুড়ি বৎসর মাত্র। তাহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামচরণ গুহ। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত হোরমিলার কোম্পা-

শ্রীমান্ যতীন্দ্রচরণ গুহ।

নীর বাড়ীতে চাকুরী করেন। রামচরণ গুহ মহাশয় বেশ সুস্থ ও সবল পুরুষ। গোবর প্রথমে তাহার খুল্লতাত ক্ষেত্রচরণ গুহ মহাশয়ের নিকট এবং তাঁহার মৃত্যুর পর গামা, কালু, প্রভৃতি বিখ্যাত পালোয়ানের নিকট কুস্তী শিক্ষা করে। গোবরের পিতামহ ৺ বাবু অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয়ও বিখ্যাত কুস্তীগির ছিলেন।

বিলাতের বিখ্যাত পত্র "স্বাস্থ্য ও শক্তি" (Health and strength) পত্রের সম্পাদক তাঁহার বিখ্যাত পত্রিকায় 'গোবর' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম সংকলন করিয়া দিলাম।

'আমি যখন গোবরকে দেখিতে গেলাম, তখন সে অক্সফোর্ডের বিখ্যাত পালোয়ান ফিল লেনের সহিত কুস্তী করিতেছিল। ফিলও গোবর অপেক্ষা কম মোটা নহে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সে গোবরকে হারাইতে পারিতেছিল না, ফিল ভয়ানক হাঁপাইতেছিল।

'গোবরের চেহারা কি শক্তির পরিচায়ক! তাহার

অপলক চোখ দিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহার বদন মণ্ডল আনন্দপূর্ণ। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধার সহিত কুস্তী করিয়া গোবর জগজ্জয়ী পালোয়ান গচের (Gofch) সহিত কুস্তী করিতে আমেরিকা যাইবে। ভারতবাসীগণ গোবরের কৃতিত্বে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিতেছে, তাহাদের গৌরবের কারণ আছে।

'গোবর ইংরেজী খানা খায় না। মুরগীর মাংস ও মাখন এবং বাদামই তাহার প্রধান খাদ্য। তাহার সঙ্গের চাকর তাহার রান্না করে। গোবর মদ্য স্পর্শও করে না।

"গোবর" প্রস্তরের চক্র গলায় পরিয়া ব্যায়াম করিতেছে।

'গোবরের দুই রকম মুগুর আছে। ভারী মুগুর এক একটির ওজন ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ আধ মণেরও উপর। এইরূপ দুইটি মুগুর দুই হাতে লইয়া গোবর অনায়াসে ঘুরায়।

'গোবর বলে, তাহার ঘাড়ের পেশীগুলি চালনার উপযোগী কোন ব্যায়াম না থাকায় তাহাকে একটা নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সে উপায়টি এই :— শূন্যগর্ভ চক্রের আকারে একটা প্রকাণ্ড পাথর কাটিয়া গোবর তাহা গলায় দেয়, এবং তাহা নিয়া কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করে। আমার সম্মুখেই সে উহা গলায় পরিয়া কিছুক্ষণ নীচ তলায় উপর তলায় ছুটাছুটি করিল। উহার ওজন কত জানেন? ১৮০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দুই মণ! দুই মণ পাথর ঘাড়ে করিয়া যে ব্যক্তি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছুটাছুটি করিয়া ব্যায়াম করে, তাহার শক্তি কত, ভাবিবার কথা বটে!'

"স্বাস্থ্য ও শক্তি" পত্রিকায় উক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর গোবর দুই জন বিখ্যাত ব্রিটিস পালোয়ানকে পরাস্ত করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গত ৩০শে আগষ্ট গ্লাসগো নিবাসী বিখ্যাত ব্রিটিস পালোয়ান মিঃ ক্যাম্বেলকে গোবর ৫০ মিনিট কুস্তীর পর পরাজয় করিয়াছে। এবার্ডিন সহরের পালোয়ান ইসন অজেয় (Unconquerable Esson) বলিয়া বিখ্যাত। গোবরের সঙ্গে সম্প্রতি তাহার শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এডিনবার্গের বিখ্যাত ব্যায়ামাগারে এজন্য লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ইসন বাস্তবিকই অতি বলবান পুরুষ; কিন্তু গোবর সহজেই তাহাকে কায়দায় ফেলিয়াছিল। ইসন বার বার কুস্তীর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নানা উপায়ে

গোবরকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; যিনি মধ্যস্থ ছিলেন, তিনি পুনঃ পুনঃ ইসনকে সাবধান করিয়া দিলেও সে অসদুপায় অবলম্বনে বিরত হয় নাই। কিন্তু গোবর তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে দুই বার মাটিতে ফেলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাটিতে ফেলিতে পারিলেই জয়। দুইবার ফেলিবার পরই ইসন "মরিয়া" হইয়া গোবরকে পরাস্ত করিবার জন্য নানা অসদুপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। এজন্য তাহাকে আর কুস্তী করিতে না দিয়া 'মধ্যস্থ' গোবরেরই জয় ঘোষণা করিলেন। শীঘ্রই গোবর ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা যাত্রা করিবে। সে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছে।"

পূর্ব্বরাগ

যতীন্দ্র বৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাড়াইয়া একটা কড়া ক্রূসের সাহায্যে মস্তকের বিদ্রোহী কুন্তলরাজিকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত ছিল! দুই ঘণ্টা অবধি চেষ্টা করিতেছে,—কোন সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, এমন সময় সিল্কের চাদর উড়াইয়া তাহার বন্ধু যোগেশ আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে মাথায় টোকা মারিল—

যোগেশ। কিরে, কি হইতেছে?

যতীন্দ্র। (ক্রূস সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া) যা-ইচ্ছা-তাই!

যোগেশ।—শান্ত হও বীরবর!

যতী। দেখ্ দেখি, এইরকম চুল লইয়া কেউ বিবাহ করিতে যাইতে পারে? সব সুগন্ধি কেশতৈল ওয়ালাদের জেলে দেওয়া উচিত।

যতীন্দ্র হতাশ ভাবে চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া যোগেশের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিল। যোগেশ একটু চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

যতীন্দ্র—(হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া) বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। ভগবান মানুষকে চুল দিয়াছেন কেন বলিতে পারিস্?

যোগেশ।—কঠিন প্রশ্ন,—আঁচড়াইবার জন্য দেন নাই, এটা ঠিক। মানুষ, যাহা করিবার দরকার নাই তাহাই করিতে যাইয়া নেহাৎই বৃথা নাকাল হইয়া পড়ে।

যতীন্দ্র। রাস্কেল, তবে তুই টেড়ি কাটিস্ কেনরে?

যতীন্দ্র উঠিয়া যোগেশের চুল এবং কান ধরিয়া টান দিল, মর্ম্মস্পর্শী টানে যোগেশ কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িল—

যোগেশ।—অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ—মান?—আমার কথা নয়,—বুদ্ধদেব বলে গেছেন!

একখানা চিঠি যোগেশের পকেটে অৰ্দ্ধেক দেখা যাইতেছিল, চিঠিখানা উঠাইয়া লইয়া যতীন্দ্র যোগেশের কান ছাড়িয়া দিল।

যতীন্দ্র। ব্যাপার?

যোগেশ। পড়েই দেখ!

যতীন্দ্র মনোযোগ দিয়া পত্রখানি পাঠ করিল। চিঠিখানা যোগেশের পিতার, তিনি লিখিয়াছেন যে, যে গ্রামে যতীন্দ্রের বিবাহ স্থির হইয়াছে সেই গ্রামের এক দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া যোগেশের পিতাকে আসিয়া অত্যন্ত ধরিয়া পড়ে। তাঁহার অনুরোধে তিনি নিজে যাইয়া তাঁহার মেয়েটিকে দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং কন্যা দেখিয়া তাঁহার এমন পছন্দ হইয়াছে যে তখনই যোগেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফিরিয়াছেন। একমাস পরে বিবাহ হইবে, এরূপ ধার্য্য হইয়াছে। মেয়েটি যে রূপে লক্ষ্মী এবং গুণে সরস্বতী পত্রে এরূপ আভাসও ছিল।

চিঠি পড়িয়া যতীন্দ্র উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল।

যতীন্দ্র। দেখ্! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ একেই বলে!

যোগেশ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এমন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইলে ত অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়, কি পরামর্শ দাও বন্ধুবর?

যতীন্দ্র। পরামর্শ!—এমন শুভ প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিলে আমি তোর নাক ভাঙ্গিয়া দিব।

যোগেশ। দোহাই;—কিন্তু দেখ্ যতীন, একেবারে না দেখিয়া শুনিয়া!

যতীন্দ্র। কি রকম? তোর বাবা যে দেখিলেন, তাতে হইল না?

যোগেশ। তবু—

যতীন্দ্র লম্ফ দিয়া উঠিল।

যতীন্দ্র। দেখ্—

যোগেশ। কি?

যতীন্দ্র। আমার ভাবী শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে ত?

যোগেশ। হাঁ।

যতীন্দ্র। আমার বিবাহের পরে ত বিবাহ হইবে?

যোগেশ। হাঁ।—

যতীন্দ্র। তবে আর কি? আমার বিবাহে তুই বরযাত্রী হবি, গ্রামের মেয়ে, নিশ্চয় বিবাহ দেখিতে আসিবে! তারপর চাই কি,—পূর্ব্বরাগ পর্য্যন্ত।

যোগেশ। কেউ যদি চিনিয়া ফেলে?

যতীন্দ্র। চিনিবে কি করিয়া? ও পক্ষের কেহ ত তোকে দেখে নাই, আর আমাদের পক্ষের কেউ যেন তোর পরিচয় প্রকাশ না করে, আমি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব।

যোগেশ। কিন্তু বাবা যদি জানিতে পারেন?

যতীন্দ্র। তাতে কি হইবে? তুই ত আমার বিবাহে বরযাত্রী স্বরূপ যাইবি মাত্র। তোর ভাবী শ্বশুরের নাম জানিস্ ত?

যোগেশ। জানি,—বরদা গাঙ্গুলী।

যতীন্দ্র। তবে নিশ্চিন্ত থাক্ গিয়ে,—ঠিকঠিক হবে।

যোগেশ আশ্বস্ত হইয়া বাসায় ফিরিল।

(২)

বর্ষার বিপুল জল-প্রবাহ প্রকাণ্ড হর্ষোচ্ছ্বাসের মত দেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

যতীন্দ্রের বিবাহের চারিদিন পূর্ব্বে প্রকাণ্ড দুই বজরা বোঝাই করিয়া বরযাত্রীগণ চলিল। যতীন্দ্রের শ্বশুরবাড়ী যাইতে জল পথে প্রায় দুইদিন লাগে। ঝড় তুফানের দিন বলিয়া চারি দিন আগেই ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িল। এক বজরায় বয়োবৃদ্ধগণ এবং অন্য বজরায় অল্পবয়স্কগণ চলিলেন।

প্রথম দিন বজরা খাল দিয়া চলিল, অল্পবয়স্কদিগের বজরার মধ্যে অবিরাম আনন্দের তুফান উঠিতে লাগিল। বজরায় খেলার উপকরণ এবং বাদ্য-যন্ত্রাদির অভাব ছিল না। ক্ষণে ক্ষণে তাস এবং পাশাক্রীড়া-রত যুবকদের আনন্দ-নিনাদে বজরা মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। একদল বাদ্য-যন্ত্রাদি লইয়া বসিয়া গেল; প্রথম প্রথম, যাদের সুকণ্ঠ বলিয়া সুখ্যাতি ছিল তাহারা গাহিল, তারপর একবার সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া গেলে যে-সে যেমন তেমন করিয়া করিয়া গাহিতে ও বাজাইতে আরম্ভ করিল। একজন উৎসাহী যুবক নৃত্যের প্রস্তাব করিল এবং নিজেই উঠিয়া সবেগে তাহার উদাহরণ দেখাইয়া দিল। উপর হইতে মাঝি হাঁকিল—"কর্ত্তারা নাও ভাইঙ্গা ফালাইবেন নাকি?" কাজেই নৃত্যচর্চ্চা আর হইল না।

বয়স্কদের বজরায় আনন্দটা কিছু ঘনীভূত। এমন কি, পাশার হাক-ডাকগুলিও যেন কতকটা অর্দ্ধোচ্চারিত হইতেছে মাত্র। যাঁহারা দাবা লইয়া বসিয়াছিলেন তাঁহারা ত প্রায় যোগাসনে ধ্যানে মগ্ন। এক খেলোয়াড় "নৌকা" হাতে তুলিয়া অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া চিন্তাই করিতেছেন, "নৌকা" যে আজ হাত হইতে অবতরণ করিবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, পার্শ্বেই আর এক দল তামাকের ধূমে ধূমলোক সৃষ্টি করিয়া সেই স্বর্গে সমাসীন হইয়া সমাজ-তত্ত্ব আলোচনায় নিমগ্ন।

যোগেশ ও যতীন্দ্র ইহার কোন দলেই যোগ না দিয়া তাহাদের বজরার ছাদে বসিয়া বর্ষা-প্লাবিত গ্রাম্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা উপভোগ করিতেছিল।

সে কি শোভা! দেখিতে দেখিতে যেন হৃদয় ভরিয়া উঠে। খালের দুই দিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত মাঠ, তার পরেই গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে ধান্য ক্ষেত্রে 'শিহরণ' জাগিতেছে, স্থানে স্থানে পাট ক্ষেতের এলো মেলো কর্কশ সবুজ সৌন্দর্য্য। মধ্যে মধ্যে দুই একখানা ক্ষেতের পাট কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, বহুদূর-বিস্তৃত সবুজ মাঠের মধ্যে সেই কালচিক্কন সলিল-খণ্ডগুলি সূর্য্যকিরণে হীরক-ক্ষেত্রের মত ঝিকি ঝিকি করিতেছে, তাহার উপর ইতস্ততঃ অগণিত শ্বেত সাপ্‌লা ফুটিয়া আবার বর্ণনাতীত শোভা বিস্তার করিতেছে। অনেক যায়গায় খাল গ্রামের মধ্যদিয়া

চলিয়া গিয়াছে। খালের জল গৃহস্থের গোশালা ভাসাইয়া তাহার বাতায়নের তলদিয়া ছুটিয়াছে, ঘাটে ঘাটে গৃহস্থ-বধূগণ স্নান করিতেছে। ছেলে মেয়েরা কোলাহলে ঘাট মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ পিতলের কলসী ধরিয়া সাঁতার শিক্ষা করিতেছে।

খালের দুই ধারের বেতস লতা আসিয়া খালের উপর পড়িয়াছে। সেই ঘন ঝোপের মধ্যদিয়া দুই পারের বাড়ীর টিনের ঘরগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে। কোথাও বাঁশঝাড় নুইয়া পড়িয়াছে, বাঁশতলা দিয়া অগভীর স্বচ্ছ জল আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়াছে। জলে চেলা, বাঁশপাতা, পুঁটি ইত্যাদি ক্ষুদ্র মৎস্য সকল খেলা করিতেছে। জলের নীচের মাটির উপর কয়েকখণ্ড গোলাকার সূর্য্যকিরণ চঞ্চল নৃত্য করিতেছে। মাঝে মাঝে হাটুরিয়া নৌকা দ্রুত গতিতে চলিয়া যাইতেছে, আর সেই ক্ষুদ্র খালের সমস্ত অঙ্গ তোলপাড় হইয়া দুইধারে তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দূরে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলদেশ সমস্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তরুবর নিস্তব্ধ হইয়া যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দুই ধারের গ্রামে ঘরে ঘরে প্রদীপ জলিয়া উঠিল। ঘন ঘন শঙ্খনিনাদে এবং অবিরাম হুলু ধ্বনিতে সন্ধ্যায় যেন গম্ভীর সঙ্গীত উঠিতে লাগিল।

সম্মুখে একটা বাজার ছিল, সেখানে সে রাত্রের জন্য বজরা রাখা হইল। পরদিন বজরা একটা প্রকাণ্ড নদীতে পড়িল। সেই নদী পার হইয়া আর একটা বড় নদী বাহিয়া কিছুদূর গেলে পরে যতীন্দ্রের শ্বশুর বাড়ীর গ্রাম পাওয়া যাইবে।

সারাদিন বাহিয়া নৌকা যেখানে আসিয়া পৌছিল, সেখানে তিনটি বড় নদী আসিয়া একত্র মিশিয়াছে। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কেবল একটা মোহময় রক্তিম-ছটায় পশ্চিম আকাশ আলোকিত। পশ্চাতে নদীর বিশাল বক্ষে সেই রক্তিম আকাশের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ যেন রঙ্গিন মায়া-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বভাগে যে দিকে দেখা যায়, কেবল দিগন্ত বিস্তৃত সলিলরাশি। দূরের গ্রামগুলি সন্ধ্যার আঁধারে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে। দুই একটা বাদুড় অনেক উচ্চে নদীর উপর দিয়া নিঃশব্দে উড়িয়া যাইতেছে।

যোগেশ ও যতীন্দ্র বজরার ছাদে বসিয়াছিল; এক অসীম অনন্তের আভাসে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল। যতীন্দ্র বলিল—"যোগেশ, ভাই একটা গান গা।"

যোগেশ গাহিল;—

"কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়!
সীমা অন্তরেখা নাহি যায় দেখা সিন্ধুতে সিন্ধু মিশায়।"

যোগেশের মিষ্ট কণ্ঠস্বর ক্ষণে ক্ষণে এক ভাষার অতীত আবেগে কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল। গান শেষ করিয়া যোগেশ যতীন্দ্রকে গান করিতে অনুরোধ করিল। দরাজ গলায় উন্মুক্ত নদীবক্ষ পূর্ণ করিয়া যতীন্দ্র গাহিল;—

"অনন্ত সাগর মাঝে দেও তরী ভাসাইয়া,
গেছে সুখ, গেছে দুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।"

সেই গম্ভীর সন্ধ্যানত আকাশতলে—বীচি-বিকম্পিত বিশাল নদীবক্ষে—উদাস বাগেশ্রী রাগিণী যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিতে লাগিল। মনে হইল, যুগ যুগান্ত যাহার সহিত একত্র কাটাইতে হইবে, নিমেষে সমস্ত প্রিয়তম পদার্থ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, যাহার মুখ চাহিয়া, যাহার হাত ধরিয়া মানুষ বিশাল বিশ্বে বাহির হইয়া পড়ে—সে যেন আজ পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। আজ তাই—"দাও তরী ভাসাইয়া।" দুই বন্ধুর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—বহুক্ষণ দুইজনে পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিল।

কে বলিবে, কেন এই অকারণ আকুলতা—এই অর্থশূন্য আঁখিজল? কি মহারহস্যময় মানব-জীবন!

৩

পরদিন ভোরে যাইয়া বজরা ঘাটে লাগিল। সংবাদ পাইবামাত্র যতীন্দ্রের শ্বশুর এবং অন্যান্য ভদ্রলোকগণ আসিয়া বর, বরকর্ত্তা এবং বরযাত্রীদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া উঠাইয়া লইয়া গেলেন। গ্রামের এক ভিন্ন বাড়ীতে বরযাত্রীদিগের বাসা দেওয়া হইয়াছিল; বয়স্কদিগের জন্য এক ঘর, অল্পবয়স্কদিগের জন্য

ভিন্ন এক ঘর, কাজেই আমোদ প্রমোদের বিশেষ ব্যতিক্রম হইল না। গ্রামের সমস্ত যুবকগণ যুবকদের দলে ও বৃদ্ধগণ যাইয়া বয়স্কদের দলে মিশিলেন।

যতীন্দ্র ও যোগেশ যাইয়া বসিবামাত্রই জামাই দেখিবার জন্য একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, ঘরে বাঁশের বেড়া ছিল, বেড়ার ফাঁক দিয়া সীমন্তিনীগণ জামাই দেখিবার জন্য উঁকি ঝুকি দিতেছিলেন, যোগেশ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বেড়ার গায়ে কেবল কাল কাল চোখই দেখা যায়। কঠোর শুষ্ক বেড়া যেন সেই নয়ন-মালায় সরস হইয়া উঠিয়াছিল!

যোগেশ বলিল,—"যতীন্, তোর মাথা ঠিক্ আছে ত?"

যতীন্দ্র। কেন রে?

যোগেশ। চারিদিকে যে দৃষ্টি লাগিয়াছে, তাতে মানুষ তো মানুষ—ইট কাঠও উড়িয়া যায়।

লজ্জা পাইয়া সীমন্তিনীগণ পলায়ন করিলেন।

বাহির বাড়ীর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড দীঘি দেখা-যাইতেছিল। তাহার তিন পাড়েই বসতি, কেবল দক্ষিণ পাড় খোলা। দক্ষিণ পাড়ের ভূমি কিছু উচ্চ, তাহার উপর একটি ফুলের বাগান ছিল। বাগানের নীচেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। দীঘির চারি পাড়ে চারিটি বাঁধা ঘাট, দীঘির পাড়ে পাড়ে অনেক নারিকেল ও সুপারি গাছ থাকায় দীঘিটিকে অত্যন্ত মনোহর দেখাইতেছিল।

দীঘির পাড় দিয়া রাস্তা। যতীন্দ্র বলিল, "চল যোগেশ, দক্ষিণ পাড়ের ঐ বাগানটা দেখিয়া আসি।" দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করিয়া দীঘির পূর্ব্বপাড় ধরিয়া চলিল।

পূর্ব্ব পাড়ের বাঁধা ঘাটের নিকট আসিয়া দুই বন্ধু দেখিল,—ভরা কলসী কক্ষে করিয়া ঘাটের সকলের উপরের সিঁড়ির উপর একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী সঙ্কোচানতনয়নে দণ্ডায়মানা। উন্মুক্ত অলকদাম পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, দেহ-যষ্টি ঈষৎ বক্র—সে এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রতিমা! জল লইয়া সে সিঁড়িদিয়া উঠিতেছিল, আগন্তকদ্বয়কে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই বন্ধু সেই ছবি চকিতে দেখিয়া লইল।

যোগেশ বলিল—"দাদা, নমুনা ত মন্দ দেখা যাইতেছে না।"

যতীন্দ্র। চুপ্!

যোগেশ। কুচ্ পরোয়া নেই দাদা, বরযাত্রীর সাতখুন মাপ!

যতীন্দ্র। চুপ কর্ মেয়েটি শুনিতেছে।

যোগেশ। শুনুক না, শুনিবার জন্যই ত বলিতেছি। আচ্ছা দাদা, এই যদি বরদা গাঙ্গুলীর মেয়ে হয়?

মেয়েটি চকিতে একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া গভীর লজ্জায় মুখ নত করিল।

যতীন্দ্র।—তবে?

যোগেশ। তবে পছন্দ এবং পূর্ব্বরাগ সমাপ্ত এবং অতঃপর হুলুধ্বনি, আর কি?

মেয়েটি পথ মুক্ত দেখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

যতীন্দ্র। গাধা! তুই মেয়েটিকে লজ্জা দিয়াছিস্।

যোগেশ। পা'ক না একটু লজ্জা দাদা! যার লজ্জা আছে সেই লজ্জা পায়।

দুই বন্ধু দক্ষিণের বাগানে গিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

গন্ধরাজ ও কামিনী ফুলের গন্ধে বাগান আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিকশিত-কুসুম করবী ডালে মত্ত মধুকর লুটোপুটি করিতেছিল। এক ধারে স্বর্ণাভ কেলিকদম্ব মদিরগন্ধ ছড়াইতেছিল। বেলফুল অভিমানিনীর গণ্ডের মত সৌন্দর্য্যে ভরপূর—স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।

যোগেশ বলিল—"এখন জানিবার উপায় কি?"

যতীন্দ্র।—তুই অস্থির হ'স্ না। আমি খবর পাইয়াছি, আমার এক শ্যালক নাকি বি, এ, ক্লাসে পড়ে। তাহাকে গুপ্তচর করিলেই কার্য্যসিদ্ধি।

এমন সময় দেখা গেল, একটি যুবক দীঘির পাড়দিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যতীন্দ্র। ও-কে বল্ ত?

যোগেশ। নিশ্চয়ই শ্যালক।

যতীন্দ্র। কি করিয়া জানিলি?

যোগেশ। এ নিশ্চয়ই শালা, এর শালার মতই চেহারা —

যুবকটি আসিয়া কোমল স্বরে বলিল "আপনারা এখন আসুন।"

যোগেশ। আপনি?

যুবক। (হাসিয়া) আপনার বেহাই।

যোগেশ। আর যতীন্দ্রের?

যুবক। ভগ্নীপতি,—

যোগেশ। অর্থাৎ শ্যালক, নয়?

যুবক। যাই বলেন।

যোগেশ। দেখ্ যতীন্ আমি যে বলিয়াছিলাম, মশায় মশায়, আপনাকে দিয়ে আমার অত্যন্ত দরকার, গুরুতর, গুরুতম ;—আপনার নাম?

যুবক। সুধীরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কি দরকার বলুন।

যোগেশ। আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি কি?

যুবক। বোধ হয়!

যতীন্দ্র। "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং"—

সুধীর। "স্ত্রীষু রাজকুলেষ্ চ,"—তা আমি স্ত্রী নই, বোধ হয় প্রমাণ আবশ্যক করে না, আর রাজকুল ত বর্ত্তমানে আপনারা।

যোগেশ। আচ্ছা বেশ! প্রথমে বলুন দেখি, বরদা গাঙ্গুলীর বাড়ী কোন্‌টা?

সুধীর। কেন?—ঐযে তাঁহার বাড়ী দেখা যাচ্চে দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে, ঘাটলার নিকট।

যোগেশ ও যতীন্দ্র পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল।

যতীন্দ্র। বরদাবাবুর ছেলেমেয়ে কয়টি?

সুধীর। একটি মাত্র মেয়ে।

যতীন্দ্র। বিবাহযোগ্যা?—বয়স?

সুধীর। পনর ষোল।

যতীন্দ্র। বর্ণনা,—

সুধীর। খুব ভাল মেয়ে—

যতীন্দ্র। অর্থাৎ—

সুধীর। অর্থাৎ এমন মেয়ে আর শুধু এই গ্রামে কেন, এই পরগণায়ও নাই।

যোগেশ। 'লাভ্‌কেস্' যতীন্ দা!

সুধীর। ছিঃ, নিরুপমা আমার জ্ঞাতি ভগিনী; কিন্তু আপনারা এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন কি? নিরুপমার ত শুনিয়াছি সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যতীন্দ্র। আরে তার জন্যই ত তোমাকে পাকড়ান গিয়াছে সুধীর বাবু। কিন্তু সাবধান, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

সুধীর। তা করিব না, ব্যাপার কি তাই বলুন।

যতীন্দ্র। তবে শুনুন।

যতীন্দ্র সমস্ত ঘটনা বলিল, সুধীর শুনিয়া হাসিতে লাগিল ;—

সুধীর। রীতিমত রোমান্স যে! এখন কি কর্ত্তে চান?

যতীন্দ্র। দেখো, তোমার বোনের দোহাই, একথা যেন প্রকাশ না হয়। নিরুপমাকে একবার কোন উপায়ে দেখাইতে হইবে।

সুধীর। তা আর কঠিন কি? তবে মেয়ে বড় বুদ্ধিমতী এবং সেয়ানা।

যোগেশ। আচ্ছা, আপনার ভগিনীর গুণ গ্রহণ আমরাই করিব, আপনি কেবল দূতীর কাজ করিবেন, বুঝিলেন?

সুধীর হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা তা হবে এখন, সম্প্রতি আপনারা চলুন।"

বৈকালে যখন সমস্ত গ্রাম বেড়াইয়া যতীন্দ্র, যোগেশ ও সুধীর বরযাত্রীগণের সঙ্গে নদীর পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বরযাত্রিগণের হঠাৎ খেয়াল চাপিল,—তাহারা নদীবক্ষে নৌকা-বিহার করিবে। সুধীর তাহাদিগকে নৌকা যোগাড় করিয়া দিয়া যতীন্দ্র ও যোগেশকে লইয়া বরদা গাঙ্গুলীর বাড়ী চলিল।

বর ও বরের বন্ধুকে সুধীরের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া বরদা গাঙ্গুলী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার কুটীরের বারান্দায় নিয়া বসাইলেন এবং ঈষদুচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"নীরু, কয়েকটা পান দিয়ে যাও ত মা।"

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কতক্ষণ

পরে, ধীর-মন্থর পদে লজ্জানত নয়নে একটি ষোড়শী আসিয়া অনেকগুলি নিপুণ-গঠন খিলি সমেত পানের রেকাব রাখিয়া গেল। তরুণীর দিকে চাহিয়াই যতীন্দ্র যোগেশকে গোপনে টিপিয়া দিল, ইহাকেই তাহারা প্রাতঃকালে ঘাটে দেখিয়াছিল। বরদা গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাবা, আমার একটি মাত্র মেয়ে; এমন লক্ষ্মী মেয়ে কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না! কিন্তু অর্থবল না থাকিলে সবই বৃথা! রূপ গুণ কিছুই নয়, আজকাল চাই কেবল টাকা। এর বিবাহ-চিন্তায় আমি পাগল হইয়া যাইবার মত হইয়াছিলাম। তারপরে বামনহাটির জমিদার যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিয়া পড়ি। তিনি মহদন্তঃকরণের লোক; তিনি নিজে আসিয়া দেখিয়া নিজের ছেলের সঙ্গে বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া-গিয়াছেন। ছেলেটি নাকি খুব ভাল, সহরে এম, এ, পড়িতেছে। আমার নীরুর যে এমন সৌভাগ্য হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

এদিকে মুখর যোগেশ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। কপাটের অন্তরাল হইতে এক জোড়া ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন তাহাকে সকৌতুকে লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া তাহার অবস্থা আরও কাহিল হইয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্র দুই চারি কথা কহিয়া যোগেশ ও সুধীরকে লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। দীঘির পাড়ে গিয়া যতীন্দ্র বলিল, "গাধা, সব মাটি করিয়াছিলি আর কি!"

যোগেশ। না দেখ, এই সরল-প্রকৃতির বৃদ্ধকে ছলনা করিতে গিয়াছি বলিয়া বিষম লজ্জা হইতেছিল।

সুধীর বলিল,—"কেমন, দেখিলেন?"

যতীন্দ্র। আমরা আগেই দেখিয়াছিলাম,—প্রাতে ঘাটে জল নিতে আসিয়াছিল, তখনই দেখিয়াছিলাম।

সুধীর। কেমন, আমি যা বলিয়াছি ঠিক কি না?

যতীন্দ্র যোগেশের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল—"যোগেশ তোর ভাগ্য ভাল।"

৫

বিবাহের দিন বিরাট ব্যাপার! সমাজের সমস্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। যতীন্দ্রের শ্বশুর নিমন্ত্রণের রান্না করিবার জন্য সহর হইতে রসুয়ে বামুন আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা সকলে একযোগ হইয়া আপত্তি করে। তাহারা বলে, যে তাহারাই পাক এবং পরিবেশন করিবে। সমাজে পাশ্চাত্য বিলাসিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্ম-বিমুখতা প্রবেশ করাতে ক্রমে ক্রমে এই পবিত্র আনন্দময় কার্য্য-ভার মেয়েদের হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল। এখন মেয়েরাই অগ্রণী হইয়া আগ্রহ সহকারে তাঁহা-দের প্রাচীন অধিকারের দাবী করিতেছে দেখিয়া গ্রামস্থ সকলেই অত্যন্ত খুসী হইলেন।

পরিবেশনের দলের অগ্রণী ছিল নিরুপমা। যতীন্দ্র ও যোগেশ একধারে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিতদের ভোজন দেখিতেছিল; দেখিল, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত নিরুপমা পরিবেশনের থালা হাতে করিয়া বিদ্যুতের মত এধার ওধার যাতায়াত করিতেছে। যোগেশ চুপি চুপি বলিল, "একবার দুটা কথা বলা যায় না যতীন্?"

যতীন্দ্র। কঠিন; চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিস্। ধরা পড়িস্ না কিন্তু!

যোগেশ। তুই বাসায় যা, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

প্রশস্ত উঠানে ব্রাহ্মণেরা ভোজনে বসিয়াছেন। চারি পাঁচটি মেয়ে তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছে, বধূগণ রান্নার ভার লইয়াছিলেন।

পোলাও এবং মাংস পাক হইতেছিল দূরের এক ঘরে। সেই ঘর হইতে উঠানে আসিতে হইলে দুইটি ঘরের উঁচু ভিটির মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া আসিতে হয়, যোগেশ গিয়া সে রাস্তার মুখে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই নিরুপমা পোলাওর থালা হাতে করিয়া রাস্তার অপর মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, রাস্তার মুখ বন্ধ করিয়া এক ভদ্রলোক দণ্ডায়মান। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াই তাহার মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়া উঠিল। কোমল স্বরে সে বলিল—"একটু রাস্তা দিন ত!" যোগেশ চকিতে ফিরিল এবং হাসিয়া বলিল—"কেন?" কৌতুক-উজ্জ্বল কটাক্ষে যোগেশকে আকুল করিয়া একটু

হাসিয়া নিরুপমা বলিল, "আপনি বুঝি যতীন্ বাবুর বন্ধু ?"—

যোগেশ।—এবং —

নিরুপমা লজ্জায় লাল হইয়া নয়ন নত করিয়া ত্বরিত পদে অন্যপথে চলিয়া গেল।

যোগেশ পুলক-কম্পিত চিত্তে ছুটিয়া একেবারে যতীনের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের পরদিন বরকন্যা বিদায়ের সময় নিরুপমা এবং লবঙ্গ (যতীনের স্ত্রীর নাম) পরস্পরের গলা ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যোগেশ ও যতীন অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেশ বলিল—"দুজনে বড় প্রণয় দেখিতেছি দাদা!"

যতীন্দ্র বলিল—"হবে না ?"

এদিকে লবঙ্গ অশ্রু মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"চল্ না, তুইও নিরি!"

নিরু। কোথায় ? কার সঙ্গে ?

লবঙ্গ। কেন, ঐ যে দাঁড়াইয়া আছেন যোগেশ বাবু, তোর মালিক! নিরুপমা হাসিয়া লবঙ্গের গালে টোকা মারিয়া বলিল—"তুই জানিলি কি করিয়া ?"

লবঙ্গ সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—"কাল রাত্রে সমস্ত বলিয়াছেন!"

নিরুপমা। তবে ত সব শুনেছিস্ ই। ভারী নির্লজ্জ, নয় ?

দুই ভগিনীর অশ্রুজলের মধ্যে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

ক্যানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে মেয়েদের জন্য অনেকগুলি কলেজ আছে। কিন্তু ক্যানাডায় মেয়েদের জন্য একটিও কলেজ নাই। সেখানে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই কলেজে অধ্যয়ন করে। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, বিবিধ ভাষা, ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ব এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ের ভিতর হইতে ছাত্র ও ছাত্রীগণ নিজ নিজ পছন্দ মত বিষয় বাছিয়া লয়। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কেবল মাত্র মেয়েরাই অধ্যয়ন করে। কোন কোন কলেজে, যে ছাত্র যে বিষয় গ্রহণ করে কেবল সেই সেই বিষয়েই তাহার অধ্যয়ন আবদ্ধ থাকে; কিন্তু বড় বড় কলেজে প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার নির্ব্বাচিত বিষয়ের সঙ্গে আরও তিন চারিটি বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়। ভাল কলেজ মাত্রেরই এই উদ্দেশ্য, যে ছাত্রদিগের পাঁচটা জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় হইবে, তাহাদের মন প্রশস্ত হইবে, জ্ঞান-তৃষ্ণা জন্মিবে, উপাধি লইয়া কলেজ ত্যাগের পরেও তাহারা কোন না কোন বিষয়ের অনুশীলন করিবে। যে কেবল ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাসে বি, এ, পরীক্ষা দিবে, তাহাকে উক্ত দুই বিষয়ের সঙ্গে কোনও বিজ্ঞান, গণিত, অপর কোন একটী ভাষা, দর্শন এবং বাইবেলও অধ্যয়ন করিতে হয়।

অধ্যাপকগণ সকলেই অতি বিজ্ঞব্যক্তি। মহিলা-অধ্যাপক নাই বলিলেই হয়। বড় বড় কলেজে ছাত্র-সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া ছাত্রদিগের সহিত অধ্যাপক-গণের সম্বন্ধ গভীর হয় না; কিন্তু ছোট ছোট কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে। অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের বিতর্ক সভায় সভাপতি, ও কলেজের পত্রিকার পরামর্শ-দাতারূপে ছাত্রদিগের সহিত মিশিয়া থাকেন। কলেজে প্রায়ই অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণের সম্মিলন হয়, তাহাতে আমোদ আহ্লাদ, পাঁচ রকম কথাবার্ত্তা, ও আহারের ব্যবস্থা থাকে। এই সকল ব্যাপারে অধ্যাপক-পত্নীগণ বিশেষ ভাবে ছাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া থাকেন। অধ্যাপকগণও সময়ে সময়ে ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করেন।

অনেক কলেজে ছাত্রীদিগের জন্যও বোর্ডিং আছে। সেখানে মেয়েরা পরম সুখে কালযাপন করে। একজন মাতৃস্থানীয় মহিলার উপর মেয়েদের ভার থাকে; তিনি সকল প্রকারে মেয়েদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা

করেন। মেয়েরা ঠিক বাড়ীর মত স্বাধীন ভাবে সেখানে বাস করে। কলেজের মধ্যে মেয়েদের বিশ্রামের জন্য দু-একটি স্বতন্ত্র ঘর থাকে; তন্মধ্যে টেবিলের উপর একখানি দৈনিক কাগজ, কয়েকখানি মাসিক পত্র ও চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি সোফা থাকে।

প্রত্যেক কলেজেই এক একটি লাইব্রেরী থাকে। লাইব্রেরী-গৃহে বসিয়া যাহাতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে পারে তজ্জন্য যথেষ্ট টেবিল-চেয়ারও থাকে। কোন কোন কলেজে মেয়েদের জন্য একটী স্বতন্ত্র টেবিলও থাকে।

প্রত্যেক শ্রেণীর বিবিধ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন সভাপতি ও কয়েকজন কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হন। কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে তিনজন ছাত্রীদিগের ভিতর হইতে মনোনীত হ'ন। এই তিনজন শ্রেণীর সকল প্রকার মিলন-উৎসবের প্রাণস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হ'ন। প্রতি বৎসর এক একদিন সন্ধ্যাকালে এক এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ মিলিত হইয়া খেলা, গল্প ও নানাপ্রকার আমোদ করে।

কিন্তু বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার—"স্থাপন কর্ত্তার স্মৃতি-রজনী" (Founder's Night) এবং সাহিত্যসমিতির বার্ষিক ভোজ। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতার সম্মানার্থে একদিন প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রগণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বর্ণে এক একটি ঘর সুসজ্জিত করে, সন্ধ্যাকালে নানাপ্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়, এবং তৎপর মহাভোজ হয়। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয় "অ্যাট্ হোম্" (At Home)।

প্রত্যেক কলেজ হইতে একখানি করিয়া মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ছাত্রগণ দুইজন অধ্যাপকের পরামর্শ লইয়া পত্র সম্পাদন করে। পত্রের কিয়দংশ বিশেষ ভাবে ছাত্রীদিগের জন্য রাখা হয়, সেই অংশের ভার ছাত্রীগণই বহন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি সাহিত্য সমিতি আছে। একটি সাধারণ সাহিত্য-সভা, সকল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের জন্য; অপরটি "মহিলা-সাহিত্যসভা,"—কেবল মাত্র ছাত্রীদিগের জন্য। প্রতি বৎসর একদিন "মহিলা-সাহিত্যসমিতির" এক প্রকাণ্ড অধিবেশন হয়—তদুপলক্ষে মেয়েরা ছেলেদিগকে নানাপ্রকার খেলায় আহ্বান করে। মেয়েদের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের জন্যও একটি সভা আছে। এই দুই সভাতেই অধ্যাপক-পত্নীগণ সভানেত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

এইরূপে কলেজে চারি বৎসর কাটিয়া যায়। এই চারি বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা—উপাধি গ্রহণ। চারি বৎসরের পরিশ্রম সার্থক, লক্ষ্যসিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া একদিকে গভীর আনন্দ; অপর পক্ষে সেই চারি বৎসরে অধ্যাপক ও তাঁহাদিগের পত্নীদিগের সহিত শ্রদ্ধার সম্বন্ধ, ছাত্রছাত্রীদিগের সহিত বন্ধুতা, কত অনুষ্ঠানের সহিত প্রীতির যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সে সকল ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া বেদনা—এই দুই প্রকার ভাব লইয়া ছাত্রীগণ উপাধিগ্রহণ করিতে যায়। উপাধি বিতরণের পূর্ব্বে একজন আচার্য্য উপাসনান্তে উপদেশ দান করেন, এবং একজন অধ্যাপক ছাত্রীদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন; তারপর রাত্রিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির (Chancellor) নিকট হইতে উপাধি লইয়া যখন তাহারা একে একে ফিরিয়া আসে, তখন বন্ধুগণ তাহাদের প্রত্যেকের উপর প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে।

সীতা-পরিত্যাগ

(নাট্য)

প্রথম দৃশ্য—অযোধ্যার প্রমোদ-কানন

ছদ্মবেশে ভদ্রের প্রবেশ

ভদ্র। আমি যে অযোধ্যাধিপতির অমাত্য ভদ্র, তা আমার এ বেশ দেখে কে বলতে পারে? আমাকে এখন যবদ্বীপ নিবাসী বণিক ব্যতীত আর কিছু বলবার উপায় নাই। দর্পণে নিজের চেহারা দেখে আমি নিজেই বিস্মিত হ'য়েছিলাম। আর কত রকম বেশই যে পরিবর্ত্তন ক'রতে হবে তার ঠিক কি? মান্ধাতার আমল

থেকে গুপ্তচরের মনে শান্তি নাই। এই সম্মুখের আসনে একটু উপবেশন করি। এই প্রমোদ-কাননে বহুলোকের সমাবেশ হয়। তাদের কথোপকথনে প্রকৃত ব্যাপার নির্ণয় করতে সমর্থ হব। মহারাজ আমাকেই গুপ্তচর বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছেন। কাজটা একেই উদ্বেগ ও অশান্তি পূর্ণ, তার উপর মহারাজ আমার উপর বিশেষ ভাবে এই কার্য্যের ভার দিয়েছেন যে, মহারাজের রাজকার্য্য ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রজাপুঞ্জের মতামত কি, আমাকে তাই অনুসন্ধান করে মহারাজকে জানাতে হবে। কোন প্রজা রাজার কোন কার্য্যের নিন্দা করে কিনা, মহারাজ তা বিশেষ ভাবে জান্‌তে চান্। তাঁর কোন বিষয়ে ত্রুটী থাক্‌লে তিনি তা সংশোধন ক'রতে প্রস্তত। সকল বিষয়েই রামরাজ্য তুলনা-রহিত। কেবল সীতার রাবণ-গৃহে অবস্থান নিয়েই প্রজাদের মধ্যে কেমন যেন একটা অসন্তোষের ভাব লক্ষিত হ'চ্ছে! (নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) ঐ যে কতকগুলা নাগরিক উত্তেজিত ভাবে কিসের আলোচনা কর্ত্তে কর্ত্তে এই দিকে আস্‌ছে। আমি একটু অন্তরালে গিয়ে এদের কথোপকথন শুনি।

(অন্তরালে অবস্থান)

কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাগরিক। এ নিতান্ত অন্যায়।

২য় নাগরিক। কি অন্যায়?

৩য় নাগরিক। অন্যায় নয় কেন? রাজার বাড়ীতে হ'য়েছে বলেই বুঝি অন্যায় নয়?

১ম নাগরিক। একশোবার অন্যায়, দুশোবার অন্যায়, হাজার বার অন্যায়!

২য় নাগরিক। অন্যায় অন্যায় বলেইত কেবল চীৎকার ক'রছ; বলি, অন্যায়টা কি, তাই বল না শুনি।

১ম নাগরিক। মশায় চক্ষু কর্ণের মস্তক ভক্ষণ ক'রে রাজ্যে বাস করেন তা আমরা কেমন ক'রে জান্‌ব? সকলেই বলে অন্যায়। আর আপনি বলেন—কি অন্যায়, কিসে অন্যায়?

২য় নাগরিক। আমার ত্রুটী আছে স্বীকার করি! এখন ব্যাপারটা কি খুলে ব'ল্‌বে, না কেবল চীৎকার করবে?

৩য় নাগরিক। ব্যাপার আবার কি?

২য় নাগরিক। অন্যায় কিসের, কে অন্যায় কর'লে তাই জান্‌তে চাই।

১ম নাগরিক। তা জানেন না! এই যে আমাদের রাজা অম্লানবদনে জনকদুহিতাকে অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছেন, এটা অন্যায় নয়?

২য় নাগরিক। তুমি বাতুল! বিদেহ-রাজ-কন্যা আমাদের রাজার কৃতাভিষেকা মহিষী, তাঁকে অন্তঃপুরে স্থান দেবেন না কেন?

৪র্থ নাগরিক। বিদেহ-রাজ-কন্যাকে রাবণ হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় রেখেছিল। অথচ রাজা সেই সীতাকে গ্রহণ কর'লেন কেমন করে? সীতার সহিত কোন সম্পর্ক রাখা রাজার উচিত হয় না।

৩য় নাগরিক। জনক-নন্দিনী রাক্ষসদের মধ্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত অশোক বনে ছিলেন, অথচ তাঁকে রাজা ঘৃণা করেন না।

৪র্থ নাগরিক। রাজা যা করেন, প্রজারা তারই অনুকরণ ক'রে থাকে। সুতরাং আমাদিগকেও স্ত্রীদিগের এ দোষ সহ্য কর'তে হবে।

১ম নাগরিক। অবিলম্বে এবিষয়ের প্রতীকার হওয়া কর্ত্তব্য।

২য় নাগরিক। লঙ্কায় জনক-দুহিতার যে অগ্নি-পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে তা কি তোমরা শোন নাই?

অন্যান্য নাগরিকগণ। আরে মশায়, ও সব অলৌকিক কথায় আমাদের প্রত্যয় হয় না। শীঘ্র এ বিষয়ের প্রতীকার কর'তে হ'চ্ছে।

(কোলাহল করিতে করিতে নাগরিকগণের প্রস্থান)

ভদ্রের পুনঃ প্রবেশ

ভদ্র। অধিকাংশ প্রজার মনের ভাবই যে এ সম্বন্ধে প্রায় এক প্রকার। আরও কয়েক স্থানে অনুসন্ধান ক'রে দেখি। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্ত্রণা-কক্ষ

রাম চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছেন

রাম। শ্রেয়ঃ কি প্রেয়ঃ। সীতা শুদ্ধা—অপাপবিদ্ধা, একথা আমার অন্তর জানে; আজ প্রজা সাধারণ সীতার সম্বন্ধে যে অপবাদ দেয়, তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এখন কি কর্ত্তব্য? প্রজাগণের অভিযোগে কর্ণপাত না করলে রাজার কর্ত্তব্যের ক্রটী হয়। বিশুদ্ধা জেনে সীতাকে পরিত্যাগ করলেও সীতার প্রতি অবিচার হয়। সীতা আমার ধর্ম্মপত্নী; কেবল মাত্র বিলাস-সহচরী নয়। সীতার সহিত একত্র বাস প্রেয়ঃ;—প্রজারঞ্জনের জন্য সীতা-পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ। শেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে কাকে অবলম্বন কর'ব? রাজ্যগ্রহণের সময় সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, প্রজারঞ্জনের জন্য আবশ্যক হ'লে জানকীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রব। প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য্য ক'রব। না করলে বিখ্যাত রঘুবংশের যশঃ আমা হ'তে মলিন হবে। না, আমি তা কখনই হতে দিতে পারি না। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু অকীর্ত্তিকর জীবন ধারণ করতে পারি না। রাজার কর্ত্তব্য পালন করব। আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিব; বৈদেহীকে পরিত্যাগ করব। কি ভয়ানক! সীতা-বর্জ্জনের চিন্তাই যে আমার হৃদয়কে তপ্তলৌহদণ্ডের ন্যায় বিদ্ধ করছে! কিন্তু নিরুপায়। রাজধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম এক নয়। ধর্ম্ম সম্পদের হেতু নয়। ধর্ম্ম ঐহিকসুখের ক্ষুদ্র সেতু নয়। ধর্ম্মই ধর্ম্মের শেষ। সীতা, সীতা! কেবল কি কষ্টভোগ করবার জন্যই বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি ক'রেছেন?

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্। কুমার ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন মহারাজের দর্শন প্রার্থী।

রাম। শীঘ্র কুমারদিগকে এখানে আনয়ন কর।

(দৌবারিকের প্রস্থান)

ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ ও রামকে অভিবাদন

রাম। এসো ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন! তোমরা উপবেশন কর। (ভরতাদির উপবেশন) ভাই, তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমাদের জন্যই আমি রাজ্য পালন করি। তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থ-পারদর্শী। অতএব আমি যা বলি স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর।

ভরত। (লক্ষ্মণের প্রতি জনান্তিকে) মহারাজের এরূপ গম্ভীর ও মলিন মুখ ত কখন দেখি নাই।

লক্ষ্মণ। (জনান্তিকে) না জানি কি অনর্থ সংঘটিত হয়েছে।

রাম। পুরবাসীরা সীতার সম্বন্ধে যা' বলে তা' শুনে থাক্‌বে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বিখ্যাত কুলে জন্মেছি, সীতাও মহাত্মা জনকের পবিত্র বংশে জন্মেছেন, সুতরাং পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা আমার যে নিন্দা করে, সেই নিন্দাই আমাকে যারপর নাই মর্ম্মপীড়া দিচ্ছে। সৌম্য লক্ষ্মণ, বিজন দণ্ডকারণ্যে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করে এবং আমি যেরূপে রাবণকে বধ করি, তা তুমি জান। সেই সময়ে সীতার বিষয়ে আমার এইরূপ মনে হ'য়েছিল যে তাঁকে কিরূপে গ্রহণ করব? তখন সীতা পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের পরীক্ষা দিবার জন্য তোমার সাক্ষাতেই অগ্নিতে প্রবেশ ক'রেছিলেন। তখন অগ্নি দেবতাগণের সমক্ষে মৈথিলীকে নিষ্পাপা ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে এইরূপ পবিত্র চরিত্রা সীতাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেন। বিশেষতঃ আমার অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতাকে বিশুদ্ধা ব'লে জানে। সেই জন্যই আমি সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন ক'রেছি। কিন্তু প্রজাপুঞ্জের এইরূপ নিন্দা শুনে আমার হৃদয়ে যারপর নাই কষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ইহলোকে অকীর্ত্তি অর্জ্জন করে, তার সকলই বৃথা। দেবগণ অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, আর কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে ও সর্ব্বকালে পূজিত হয়। ভাই, আমি লোকাপবাদ ভয়ে নিজের জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ ক'রতে পারি, সীতার ত কথাই নাই। এখন বিবেচনা করে দেখ, আমি কিরূপ অকীর্ত্তি-শোক-সাগরে পতিত হ'য়েছি।

ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি হ'তে পারে? লক্ষ্মণ, গঙ্গার পরপারে তমসানদীর তীরে মহাত্মা বাল্মিকীর স্বর্গতুল্য আশ্রম আছে। সেই বিজন প্রদেশে সীতাকে পরিত্যাগ করে আস্‌বে। এ বিষয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করবে না। আমার কথার প্রতিবাদ ক'রো না। আমার এই আদেশ মত কার্য্য না ক'রলে আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখান হবে। যারা আমার কথার কিছুমাত্র প্রতিবাদ ক'রবে তারা আমার অহিতাচারী বলে পরিগণিত হবে। তোমরা যদি আমার শাসনে থাক্‌তে চাও তো সমাদরে আমার এই আদেশ পালন কর। অদ্যই এখান হ'তে সীতাকে নিয়ে যাও। সীতা পূর্ব্বে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি গঙ্গাতীরে মুনিদের আশ্রম দেখবেন; সুতরাং তাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ কর।

(অগ্রে রাম এবং তৎপশ্চাৎ ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—তমসা-তীর

সূর্য্য উদিত হইতেছেন। একজন মুনিবালক তমসাতীরে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত ভাবের গান করিতেছেন।

"অয়ি সুখময়ি উষে,
কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দুর-ফোঁটা
কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল?
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে?
কমল-নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নবজীবন,
বারেক তুমি আমারে, দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল॥"

(গীতান্তে প্রস্থান)

লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ

সীতা। লক্ষ্মণ, বিধাতা দুঃখ ভোগের জন্যই আমাকে সৃষ্টি ক'রেছেন। বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কোন মহাপাপ করেছিলাম অথবা কোনো ব্যক্তির স্ত্রী-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলাম, সেইজন্য, আমি সতী এবং পবিত্রস্বভাবা হ'লেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ ক'রলেন। লক্ষ্মণ, পূর্ব্বে আমি স্বেচ্ছায় আর্য্যপুত্রের সহিত বনবাস-ক্লেশ সহ্য ক'রেও আর্য্যপুত্রের পাদচ্ছায়ায় বাস করতে ইচ্ছা করেছিলাম, এখন আমি আর্য্যপুত্র-বিরহিত হ'য়ে কেমন ক'রে এই আশ্রমে বাস করব? "মহাত্মা রঘুনন্দন তোমাকে কি জন্য পরিত্যাগ ক'রেছেন, তুমিই বা কি অসৎ কার্য্য করেছ?"—এই কথা যখন মুনিগণ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন তখন আমি কি উত্তর দিব?

লক্ষ্মণ। দেবী, অমি অতি হতভাগ্য, তাই মহারাজ আমাকে এই নিষ্ঠুর কার্য্যের ভার দিয়েছেন।

সীতা। লক্ষ্মণ, আমি নিতান্ত দুঃখভাগিনী, আমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ ক'রে রাজার আদেশ প্রতিপালন কর। লক্ষ্মণ, আমার গর্ভে সন্তান রয়েছে, এখন প্রাণত্যাগ ক'রলে আমার স্বামীর বংশ লোপ হবে। তা না হ'লে আমি আজই জাহ্নবী-জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম। লক্ষ্মণ, গুরুজন-পদে আমার প্রণাম জানাবে। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি বলবে, "রঘুনন্দন, সীতা কিরূপ ভক্তিমতী, এবং আপনার কিরূপ মঙ্গলাভিলাষিণী তা আপনি বিলক্ষণ জানেন। আপনি যে লোকাপবাদ ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করছেন তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। বিশেষতঃ আপনি আমার পরম গতি, সুতরাং যাতে আপনার নিন্দা হয় এরূপ কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য নয়।" লক্ষ্মণ, নিতান্ত ধর্ম্মশীল সেই রাজাকে বল্‌বে যে, তিনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যে রূপ ব্যবহার ক'রে থাকেন পুরবাসীদের প্রতি যেন সেইরূপ ব্যবহার করেন। "রাজন্, পৌরজনের ধর্ম্মরক্ষণে যে পুণ্য সঞ্চয় হবে, আপনার তাহাই ধর্ম্ম এবং তাতেই আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করবেন।" ভ্রাতৃবৎসল সৌম্য লক্ষ্মণ, আমি পৌরগণের নিন্দাবাদ এবং মহারাজের জন্য যেরূপ অনুশোচনা

করি, নিজের দেহের জন্য সেরূপ শোক করি না। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, পতিই গতি, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু, সুতরাং প্রাণ দিয়েও সর্ব্বতোভাবে পতির প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। আমার যদি পুনরায় জন্ম হয় তবে তিনি যেন আমার স্বামী হন; কিন্তু আমাকে যেন তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না হয়।

লক্ষ্মণ। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালিত হবে। এখন হতভাগ্য লক্ষ্মণকে বিদায় দিন্।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

সীতা। এখন আমি কোথায় যাই? অদূরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। তাঁরই শরণাপন্ন হইগে। এই দিকে একজন ঋষি আস্‌ছেন দেখছি, উনিই কি মহর্ষি বাল্মীকি?

বাল্মীকির প্রবেশ

সীতা। (প্রণাম করিয়া) মুনিবর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

বাল্মীকি। পতিব্রতা, তুমি রামের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ, জনক রাজার কন্যা। তোমার এস্থানে আগমন ও আগমনের কারণ আমি যোগবলে অবগত হ'য়েছি। ত্রিভুবনে যা কিছু ঘটনা ঘটে সে সমস্তই আমি জানিতে পারি। তপোলব্ধ দিব্যচক্ষু প্রভাবে তোমাকে আমি নিষ্পাপা ব'লে জানি। বৈদেহী, আশ্বস্তা হও। তুমি আমার আশ্রমে আমার সন্তানের ন্যায় বাস ক'রবে, এসো। তাপসীরা তোমাকে সন্তান-স্নেহে পালন করবেন। তুমি আমার আশ্রমে তোমার নিজের গৃহের ন্যায় নির্ভয়ে বাস কর।

সীতা। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

বনলতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ফ্রাঙ্কের চৈতন্য লাভের পরেই আমিয়াস, মিঃ কেরী ও তাঁহার পুত্র উইল কেরী তিন জনে গম্ভীর ভাবে বসিয়া ইউষ্টেসের নিকট প্রাপ্ত গোপনীয় কাগজ-পত্রগুলির পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সকল কাগজই গোপনীয় সাংকেতিক ভাষায় লিখিত, তাঁহারা সেগুলি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শুধু একখানি পত্র সাধারণ ভাষায় লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন, আটশত (রোমান ক্যাথলিক) স্পেনীয়, ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হইয়া আয়র্লণ্ডে পৌঁছিয়াছে এবং একজন ক্যাথলিক পুরোহিত আর্ল অব্ ডেস্‌মণ্ড নামক জমিদারের গৃহে উপস্থিত হইয়া সাংসারিক প্রলোভনে তাঁহার নির্ব্বাপিত-প্রায় ক্যাথলিক বিশ্বাসকে পুনঃ প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। অগোপে ইংলণ্ডের রাণীর বিরুদ্ধে কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ ও ইহ-সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া চিঠিখানি শেষ করা হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া মিঃ কেরী বলিলেন, "রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সার রিচার্ডকে এই সংবাদ দিতে হইবে, যে আট শত কুকুর আয়র্লণ্ডে অবতরণ করিয়াছে তাহাদের একটাও স্পেনে ফিরিয়া যাইতে পাইবে না।"

উইল কেরী বলিল, "না, এক কুকুরকেও ফিরিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু মিঃ উইন্টন ও তাঁর যুদ্ধ-জাহাজগুলি কোথায়?"

"তিনি মিলফোর্ড হাভেনে আছেন। তাঁহাকে অবিলম্বে সংবাদ দিতে হইবে।"

আমিয়াস। আমি তাঁর নিকট যাইব, কিন্তু মিঃ কেরীর কথা ঠিক, সর্ব্বাগ্রে সার রিচার্ডকে খবর দেওয়া আবশ্যক।

"সেই ক্যাথলিক পুরোহিত দুটাকেও ধরিতে হইবে।"

আমিয়াস। সেই মিঃ ইভান্‌স্ আর মিঃ মরগান্‌সের কথা বলিতেছ? তাহারা নিরাপদে আমার খুড়া মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করিতেছে!

মিঃ কেরী। বাছা আমিয়াস্, একবার ভাবিয়া দেখ, এমন জলন্ত প্রমাণ সত্বে এই শেয়াল দুটোকে পালাইতে দিলে কি রাজদ্রোহ হইবে না?

আমিয়াস। তা হলে আমি নিজেই সেখানে যাইতেছি।

মিঃ কেরী। কেন যাবে না? তুমি এখনই যাত্রা কর। উইলও তোমার সঙ্গে যাক্। উইল, একজন সহিসকে তোমার ঘোড়া সাজাইতে বল। আমিয়াসের জন্য আমার বড় ঘোড়াটা সাজাইতে বল, তার প্রকাণ্ড দেহটি বহন করিতে ছোট ঘোড়ার বড় কষ্ট হইবে। আর মেয়েরা ফ্রাঙ্কের সেবা করিবে। অমন সুন্দর পাখীকে দুই এক সপ্তাহ খাঁচায় পাইলে তাহারা খুবই খুসী হইবে!

আমিয়াস। আর আমার মা?

"তাঁহাকে ভোরেই আমি খবর পাঠাইতেছি।" এই বলিয়া মিঃ কেরী উইল কেরী ও আমিয়াসকে লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। শীতকালের চাঁদ তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

মিঃ কেরী বলিলেন, "তোমরা ত্বরা কর, নতুবা তোমাদের জলাভূমিটা পার হইবার পূর্ব্বেই চন্দ্র অস্তগমন করিবে।"

তাঁহারা দ্রুত অশ্বচালনা করিলেন। কয়েক মাইল চলিয়া গেলেন—উভয়ে নীরব, কাহারো মুখে কথাটি নাই। বংশের সম্মান কি করিয়া রক্ষা পাইবে, আমিয়াসের মন সেই ভাবনায় আকুল। আর আয়র্লণ্ড যাত্রা ও রোজ সল্টার্ণের সহিত বিবাহ-চেষ্টা, এই দুই পথের কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, সেই ভাবনায় উইল কেরীর মন ব্যস্ত। অবশেষে হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমিয়াস্, আমি যাব।"

"কোথায়?"

"তোমার সঙ্গে আয়র্লণ্ডে। আমি অবশেষে আমার নোঙ্গর তুলিয়াছি।"

"কিসের নোঙ্গর কেরী? তুমি যে বড় রূপক আরম্ভ করিলে?"

"এই দেখ, প্রকাণ্ড জাহাজ আমি—এখানে দাঁড়াইয়া!"

"তা'ত বুঝিলাম।"

"নোঙ্গর যেমন জাহাজ আটকাইয়া রাখে, ইচ্ছা তেমনি আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

"কাদায়?"

"না—গোলাপ-বাগানে! অবশ্য সে গোলাপ কাঁটা শূন্য নয়।"

"বটে! গাছে ঝিনুক ধরে—তা দেখিয়াছি, কিন্তু ভাই, গোলাপ-বাগে নোঙ্গর ফেলিতে ত কখনো দেখি নাই!"

"চুপ কর! তা না হ'লে আমার রূপক ফস্কে যায়!"

"আমার অনুমানের আঘাতে বুঝি!"

"ঠাণ্ডা কন্‌কনে কর্ত্তব্যের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর নোঙ্গর ফেলিয়া বসিয়া থাকা চলে না। তোমার সঙ্গে এখন পশ্চিম যাত্রা না ক'রে পারি না ভাই!"

"সত্যি, উইল?"

"নিশ্চয়!"

"বাহাদুর বটে! ধন্য তোমার মনের জোর ভাই! কাল সন্ধ্যাকালেই চল তবে?"

"এত তাড়াতাড়ি?"

"এখন কি একদিনও দেরী করা চলে?"

"তা ঠিক! এখন আরো জোরে ঘোড়া চালাও।"

আবার তাঁহারা নীরবে চলিতে লাগিলেন। আমিয়াস্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বটে, তিনি রোজ সল্টার্ণের চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু রোজের নৈকট্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ততঃ কিছু কালের জন্য দূরে চলিয়া যাইবে, শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

হঠাৎ আমিয়াস লাগাম টানিয়া বলিলেন, "তুমি কি বামদিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইতেছ?"

"বামদিকের জলাভূমি হইতে? অসম্ভব! এই গভীর রাত্রে ওখানে কে আসিবে? শূকর কি গরু হইতে পারে।"

"না হে না, আমি লাগামের লোহার শব্দ শুনিয়াছি! একটু স্থির হইয়া দাঁড়াই চল, কান পাতিয়া শুনি।"

তাঁহারা স্পষ্টই অনুভব করিলেন, একটি লোক অশ্বারোহণে পালাইতেছে। আমিয়াস বলিলেন, "এই লোকটি ইউষ্টেসের দলের কেহ হইবে। আমরা যেমন সদর রাস্তা দিয়া না চলিয়া তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য

এই জলাভূমি দিয়া চলিয়াছি, এ-ও তেমনি সোজা পথে চলিয়াছে।"

তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিলেন, কখনো বা অশ্বারোহীকে নিকটেই দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহারা সার রিচার্ডের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন তাঁহারা মীমাংসা করিলেন, পলায়িতের পশ্চাতে আর না ছুটিয়া সার রিচার্ডের নিকট যাওয়া যাক্।

অনেক পাহারা-ওয়ালার নিকট কৈফিয়ত দিয়া, অনেক শিকারী কুকুরের হাত এড়াইয়া তাঁহারা সার রিচার্ডের বাড়ী পৌঁছিলেন। সংবাদ পাইয়া রাত্রিবাস পরিধান করিয়াই সার রিচার্ড নীচে নামিয়া আসিলেন। ইউষ্টেসের নিকট প্রাপ্ত পত্রখানি পাঠ করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল সংবাদ অবগত হইয়া অবিলম্বে ঘোড়া সাজাইতে তিনি সহিসকে আদেশ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা বাড়ীর বাহির হইলেন। সার রিচার্ড কেরীকে বলিলেন, "মিঃ কেরী, ঐদিক দিয়া পালাইবার একটা পথ আছে, তুমি ঐদিকটায় অপেক্ষা কর।" কেরী সার রিচার্ডের নির্দ্দেশিত স্থানে চলিয়া গেলেন। তখন সার রিচার্ড আমিয়াস লে'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিঃ লে, তোমার কাকার এবং তোমার বংশের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি একাকী বাহির হইলাম। তোমার ও আমার কাহারো কর্ত্তব্য হানি না করিয়া আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, আমাকে বল।"

আমিয়াস সজল নয়নে কৃতজ্ঞ অন্তরে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, আজ আপনি পুনরায় আমাকে আপনার দয়া দিয়া কিনিয়া লইলেন। আপনার ঋণ জীবনে কখনো শোধ করিতে পারিব না।"

কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা আমিয়াসের কাকার বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সার রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিতে চাও বল!"

"আজ্ঞে আমার বোধ হয় ইউষ্টেস্ এখনও বাড়ী ফিরিতে পারে নাই। যদি আমাকে এখন আপনার আবশ্যক না হয়, তবে আমি বড় রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অপেক্ষা করি। সাক্ষাৎ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিরদিনের মত বিদেশে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিব, আর যদি তাহাতে সম্মত না হয় তবে তাহার জীবন শেষ করিব।"

"রিচার্ড গ্রেনভিল একাকী যাইতে বুঝি ভয় পাইবে! তুমি যাও।"

ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত স্বরে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে বাহিরে কথা বলিতেছে?"

"সার রিচার্ড গ্রেনভিল; মহারাণীর নামে আদেশ করিতেছি, দরজা খোল।"

"সার রিচার্ড! তিনি এখন তাঁর বাড়ীতে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। কোনও সৎ লোক এত রাত্রে আসিতে পারে না।"

সার রিচার্ড ডাকিলেন, "আমিয়াস্!" আমিয়াস ঘোড়া ফিরাইয়া সার রিচার্ডের নিকট আসিলেন। "আমি তোমার ঘোড়াটা ধরিতেছি, তুমি এই দরজাটা ভাঙ্গ।"

আমিয়াস ঘোড়া হইতে নামিয়া রাস্তা হইতে প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলিয়া দরজায় ঘা দিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই শক্ত দরজা ভূমিসাৎ হইল। সঙ্গে সঙ্গে যে ভৃত্য ভিতর হইতে কথা বলিতেছিল, সে-ও ভূপতিত হইল। সার রিচার্ড কঠোরস্বরে, তাহাকে উঠিয়া তাঁহার ঘোড়া ধরিতে আদেশ করিলেন। ভয়ে বিহ্বল হইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল।

সার রিচার্ড ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, সেই দরজা খোলা। বাড়ীর ভৃত্যগণ হয় পূর্ব্বেই জাগ্রত ছিল, অথবা গোলমালে এখন জাগিয়াছে।

সার রিচার্ড খোলা দরজায়ই ঘা দিলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, মিঃ লে স্বয়ং বাতি হস্তে উপস্থিত। এই গভীর রাত্রেও রাত্রিবাস পরিধানের পরিবর্ত্তে তিনি বেশ সাজসজ্জা করিয়া রহিয়াছেন। মিঃ লে সার রিচার্ডকে বলিলেন:—

"সার রিচার্ড, ইহা কি প্রতিবেশীর উপযুক্ত কাজ! আপনি আমার বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া এই গভীর রজনীতে আমার বাড়ী ঢুকিলেন কেন?"

"মিঃ লে, মহারাণীর নামে আদেশ করিলেও আপনার লোক যখন দ্বার খুলিল না, তখন না ভাঙ্গিয়া আর উপায় কি? আর আপনার ভিতরের দ্বার ত খোলাই ছিল। আপনার বাড়ীতে দুই জন জেস্থইট্ (ক্যাথলিক পুরোহিত) আছে, এই দেখুন মহারাণীর ওয়ারেণ্ট, আমি তাহাদিগকে চাই। আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আমি নিজে ইহা স্বাক্ষর করিয়াছি, নিজেই জারি করিতে আসিয়াছি, অপরের হাতে দেই নাই। এখন অবিলম্বে জেস্থইট্ দুই জনকে এখানে উপস্থিত করুন।"

"প্রিয় সার রিচার্ড!"

"মিঃ লে, আমি কোন কথা শুনিব না, শীঘ্র তাহাদিগকে উপস্থিত করুন, নতুবা আমি আপনার বাড়ী খানাতল্লাসি করিব।"

"প্রিয় সার রিচার্ড!"

"তবে কি আপনাকে নিজের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে আমায় আদেশ করিতে হইবে?"

মিঃ লে'র বাড়ীর ভৃত্য ও কর্ম্মচারীবর্গ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই সময় নিকটে আসিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া সার রিচার্ড সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার সিংহ-রবে ভীত হইয়া শৃগালের ন্যায় তাহারা পালাইয়া গেল। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন, "মিঃ লে, আর বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র জেস্থইটদিগকে বাহির করুন। গভীর রাত্রি, আপনার ও আমার—দুজনেরই শয়ন আবশ্যক।"

"সার রিচার্ড, জেস্থইটরা এখানে নাই!"

"এখানে তাহারা নাই?"

"আমার কথা অবিশ্বাস করিবেন না, সার রিচার্ড! এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহারা আমার বাড়ী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি শপথ করিতে পারি।"

"আমি বিনা শপথেই আপনার কথা বিশ্বাস করি। তাহারা তবে কোথায় গিয়াছে?"

"না মহাশয়, তাহারা কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না। তাহারা পলায়ন করিয়াছে।"

"আপনার সাহায্যে—অন্ততঃ আপনার পুত্রের সাহায্যে তাহারা পালাইয়াছে তাহারা কোথায় গিয়াছে শীঘ্র বলুন।"

"আমি তাহা জানি না সার রিচার্ড!"

"মিঃ লে, আপনাকে আমি রাজদ্রোহের শাস্তি হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি। আপনি রাজদ্রোহিতার সহিত পুনরায় মিথ্যা কথা যোগ করিতেছেন!"

এইবার মিঃ লে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"হায় ভগবান্! শেষে কপালে এই ছিল! হতভাগাগুলিকে বাড়ীতে স্থান দিয়া যে ভয় ও অশান্তি উদ্বেগ ভোগ করিবার তাহা ত ভোগ হইলই, এখন, এই বৃদ্ধ বয়সে কি-না রাজদ্রোহী ও মিথ্যাবাদী অপবাদও শুনিতে হইল? তাহাও আবার আমার পরম হিতৈষী সার রিচার্ড গ্রেনভিলের মুখ হইতে!"

বলিতে বলিতে মিঃ লে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সার রিচার্ডের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। "সার রিচার্ড,—শ্রদ্ধেয় সার রিচার্ড, আমায় ক্ষমা করুন; আপনাকে বসিতে না বলিয়াই আমি বসিয়া পড়িলাম। অনুগ্রহ করিয়া বসুন। শোকে দুঃখে ভাবনায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত, আর দাঁড়াইতে পারি না। জেস্থইটরা পালাইয়াছে, আমার ছেলে ইউষ্টেসও বাড়ী নাই। এই মাত্র শুনিলাম তাহার একটা সয়তান জেঠ্তাত ভাই তাহার থুতির হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই সংবাদে তাহার মা ত পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন।"

সার রিচার্ড তীব্র স্বরে উত্তর করিলেন, "আপনার পুত্র তার দেবতুল্য জেঠ্তাত ভাইকে প্রায় প্রাণে বধ করিয়াছিল মহাশয়!"

"কই! তা'ত আমায় কেহ বলে নাই!"

"আপনার পুত্র, ফ্রাঙ্ককে হত্যা করিবার জন্য তিন বার তরবারির আঘাত করিয়াছিল। তখন আমিয়াস তাহাকে আঘাত করে। সকল কথা ক্রমে বলিতেছি।"

এই বলিয়া সার রিচার্ড বাহির হইয়া উইলকে ডাকিয়া বলিলেন, "উইল, পাখী পালাইয়াছে। তুমি ঐদিকে এখনই ঘোড়া ছুটাইয়া যাও, যদি ধরিতে না

পার তবে আজ আর কিছু করা যাইবে না। কাল পুনরায় চেষ্টা দেখা যাইবে।"

উইল তখনই ঘোড়া ছুটাইলেন। স্যর রিচার্ডের নির্দ্দেশিত স্থানে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইউষ্টেস্ ও জেসুইটদ্বয় সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে।

এদিকে সার রিচার্ড মিঃ লে'কে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থ

আমি যত কথা বলি, যত গান গাই,
সবি ফাঁকি—সবি ফাঁকি!
তোমার নিচোল-আঁচল পূরা'তে
অনেক রয়েছে বাকী;
যে কথাটি মোর হৃদিতলে মরে লুটি',
যে ছবিটি ওঠে মরম মাঝারে ফুটি',
আমি যত তারে যাই বোঝাতে ফোটাতে,
তত ফেলি তারে ঢাকি'!
আমি যত কথা বলি, যত গান গাই,
সবি ফাঁকি—সবি ফাঁকি!

উতলা বাতাস কহে কানে কানে
ওগো কবি! গাহ গান!
শ্রাবণ-গগণে বিরহের গানে
কেঁদে মরে মরুপ্রাণ;
তরুরাজি কহে দুলি' দুলি' কত কথা,
কাননে কাননে জেগে ওঠে কল গাথা,
ওগো আমি গাহি যবে থেমে যায় গান,
জলে ভ'রে আসে আঁখি।
হায়, যত কথা বলি, যত গান গাই,
সবি ফাঁকি—সবি ফাঁকি!

দূরে বাজে কা'র মধুর বাঁশরী
ও কে গায়—ও কে গায়?
নিখিল ভুবন-হিয়াখানি বুঝি
পদতলে মূরছায়।
আমার রাগিণী, আমার ছন্দ রাশি,
যায় হের যায় তারি গানে আজি ভাসি,—
আজি সকল হারা'য়ে কেঁদে মরে প্রাণ,
কোথা তারে ঢেকে রাখি?
আমি যত কথা বলি, যত গান গাই
সবি ফাঁকি—সবি ফাঁকি!

ব্যর্থ কি তবে সকল প্রয়াস
নিশি দিন অনিবার?
বিফল কি হায় যত আয়োজন?
বৃথা যত উপচার?
সকল বিভব নীরবে অর্ঘ্য দিয়া
শুধু আঁখিজলে ফিরিবে কি আজি হিয়া?
তবু ভুবন-গরাসী আঁচল তোমার
কভু সে পূরিবে নাকি?
হায়, যত কথা বলি, যত গান গাই,
সবি ফাঁকি—সবি ফাঁকি!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শুভ-বিবাহ। সম্প্রতি কুচবিহারের শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সহিত বরদা-রাজকুমারী ইন্দিরা দেবীর শুভ পরিণয় ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিলাতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহের অল্পদিন পরেই রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুচবিহারের মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যুতে কুচবিহারের রাজসিংহাসন শূন্য হওয়ায় রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার নব-পরিণীতা পত্নী রাজকুমারী

ইন্দিরা দেবী মহারাজা ও মহারাণী রূপে কুচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

মহারাণী ইন্দিরা দেবী বর্ত্তমান সময়ের সুশিক্ষিতা ভারত-মহিলাগণের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গের বধূরূপে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করায় বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুমতি দেবীর পুত্র। বরদার বর্ত্তমান গাইকোয়ার সয়াজি রাও বাহাদুর ভারতবর্ষের সুশিক্ষিত ও উন্নতিশীল রাজন্যবর্গের অগ্রণী। এই মিলনের উপর বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী ইন্দিরা জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়স হইতেই ইনি মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১০।১১ বৎসর বয়সেই মহারাষ্ট্রী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং তৎসঙ্গে ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। বরদার রাজপ্রাসাদে রাজকুমার ও কুমারীদের জন্য যে বিদ্যালয় আছে সেইখানে পড়িয়া তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশের রাজান্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মহিলাগণ যেমন সুশিক্ষা লাভ করিতেন, নৃত্যগীত, চিত্র, শিল্প প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহারা তেমনি দক্ষতা লাভ করিতেন। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রণালীর মধ্যে যাহা গ্রহণীয় আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া সুশিক্ষিত বরদারাজ ও তাঁহার সুশিক্ষিতা মহিষী, রাজকুমারীকে অতি সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শুধু সাহিত্য ও ললিত কলায়ই জ্ঞান লাভ করেন নাই, অশ্বারোহণ, বন্দুক পরিচালন ইত্যাদিতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

রাজকুমারী এই অল্প বয়সেই পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান সকল স্থানই দেখিয়াছেন এবং এই বয়সেই পিতামাতার সঙ্গে পাঁচ বার ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন ইংলণ্ডের ইষ্টবোরণ বালিকা-বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রীরূপে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময়ে তিনি ইংলণ্ডে ভদ্রপরিবারের বালিকাদিগের সহিত মিশিয়া ইংলণ্ডের পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

মহারাণী যে সুন্দর মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহার প্রভাব তাঁহার চরিত্রেও অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতি সুলভ কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রে বিশেষ দৃঢ়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহার ব্যবহার অতি সরল ও অমায়িক, তাহাতে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। রাজকুমারী রাজরাণী হইয়াও তিনি সাধারণের সহিত মিশেন এবং তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়। অনাথ দুঃখীর প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। ভগবান নবীনা মহারাণীকে সুপথে রক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবিনী করুন।

মহিলার কৃতিত্ব। ত্রিবাঙ্কুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পিলাইএর পত্নী, পারিবারিক সকল প্রকার ভার মস্তকে ধারণ এবং স্বামীর নির্ব্বাণ-বেদনা অন্তরে বহন করিয়াও গত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মহীশুরে বি, এ, উপাধিধারিণী দ্বিতীয় নায়র-মহিলা।

মিসেস্ নর্ম্মান্ নামক একজন ইংরাজ-মহিলা, এডিনব্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, এস্, সি, উপাধি পাইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে রসায়ন এবং উদ্ভিদ্ বিদ্যাতে বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা উক্ত বৃত্তি লাভ করেন নাই।

জাপানী বধূ। জাপানী রমণীর সামাজিক অবস্থা কি প্রকার তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার মহিলাগণ বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন; পছন্দমত স্বামী না জুটিলে তাঁহারা চিরজীবন কুমারী থাকেন; এবং যদি কাহাকেও বিবাহ করেন, তাহা হইলে স্বামীকে সুখী করিবার জন্য অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করেন। কিন্তু জাপানে তাহা হইবার

যো নাই। সতের বৎসরের পরেই যদি কোন বালিকার বিবাহ না হয়, তাহা হইলেই সকলের মনে সেই কন্যা সম্বন্ধে নানা সন্দেহের উদয় হয়। অধিকাংশ স্থলেই জাপানী মেয়েরা দায়ে ঠেকিয়া বিবাহ করে,—বিবাহে কোন আনন্দ থাকে না; এবং স্বামীর গৃহও তাহাদের নিকট কারাগৃহ সদৃশ হয়। সেখানে শ্বশুর শাশুড়ী এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হয়। বধূর নিজের স্বতন্ত্র ঘর থাকে না, একটু বসিবার জায়গাও থাকে না। প্রাতঃকালে বধূকে সর্ব্বাগ্রে চাকরদের সহিত উঠিয়া গৃহ-মার্জ্জনাদি কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়। তারপর শ্বশ্রূমাতা উঠিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়াই, গৃহ-কার্য্যের খুঁৎ ধরিয়া বধূকে বেশ দুকথা শুনাইয়া থাকেন। তারপর শ্বশুর এবং স্বামী উঠিয়া খুব ধুমধাম আরম্ভ করেন; কিছুই যেন প্রভুদের মনের মত নয়! তারপর স্বামীকে আহার করাইয়া বধূ পরে ভৃত্যদিগের সঙ্গে আহার করেন। স্বামী যখন বাহিরে যান, বধূ দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। তারপর শাশুড়ীর শক্ত শক্ত বেশ দুকথা শুনিয়া স্বামীর জন্য জলখাবার প্রস্তুত করেন। স্বামী যখন ফিরিয়া আসেন, তখনও গেট পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে হয়। স্বামী জলযোগ করিতে বসিলে, পত্নী দূরে থাকিয়া অতি সন্তর্পণে খাদ্য পরিবেশন করেন। তারপর স্বামী চলিয়া গেলে, তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট হইতে শাশুড়ী দয়া করিয়া যাহা দেন, বধূ তাহা আহার করেন।

রমণী-পুলিশ। শোনা যাইতেছে যে ভারতীয় পুলিশের সংবাদ বিভাগে প্রায় চৌদ্দজন নারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই অবরোধ প্রথার দেশে মহিলা-পুলিশের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই প্রতি বৎসর মহিলানিগ্রহ মূলক ঘটনার সংখ্যা ২০,০০০ কুড়ি হাজার। ঐরূপ স্থলে মহিলা-পুলিশের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইবে।

নিউইয়র্কে ৩০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের কুড়ি জন মহিলাকে পুলিশ নিযুক্ত করা হইবে স্থির হইয়াছে। চিকাগোতে মিসেস্ জোসেফ্ বোয়ান্ নামক একজন পরোপকারপরায়ণা নারী এবং আরও চারিজন ধনশালিনী মহিলা স্বইচ্ছায় পুলিশের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-বালিকার বীরত্ব। কিছুদিন পূর্ব্বে "ভাগা-নাগপুর" রেলওয়ে লাইনে একটি গুরুতর দুর্ঘটনা হইয়াছিল। সেই ঘটনায় ৩২ জন আরোহী হত এবং ৫০ জন আহত হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে মহা গোলমাল ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। সকলেই যখন হতবুদ্ধি ও ভীত, তখন একটি ব্রাহ্মণ-বালিকা ছোট একটি বাল্‌তি হাতে করিয়া জল আনিয়া মুমূর্ষু ও আহত যাত্রীদিগের তৃষ্ণা দূর করিতেছিল। সেদিন সেই মৃত্যু ও বিপদের বিভীষিকার মধ্যেও এই ক্ষুদ্র বালিকা ঈশ্বরের প্রেমের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল।

মহিলা-বিচারক। আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত ইলিনয় প্রদেশে সম্প্রতি একটি "নীতি-বিচারালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার পাঁচ জন বিচারক—সকলেই স্ত্রীলোক। যে সকল বালিকা কলকারখানায় অথবা আফিসে কার্য্য করে, তাহাদিগকে দুষ্ট লোকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করাই এই বিচারালয়ের উদ্দেশ্য। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, শত শত বালিকা তাহাদের আফিসের ধর্ম্মজ্ঞানহীন কর্ত্তা অথবা অপর পুরুষ কর্ম্মচারীর প্ররোচনায় বিপথে পদার্পণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছে। বিপন্ন বালিকাগণ নিজেদের বিপদের কথা বলিয়াও নিন্দাভাগী হইয়াছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য অর্থাৎ আফিসে ও কলকারখানায় যে সকল বালিকা কার্য্য করে, তাহারা বিপন্ন হইয়া যাহাতে আশ্রয় পায়, এই জন্য উক্ত মহিলা-বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর বালিকাগণ নিঃসঙ্কোচে তাহাদের বিপদের কথা উক্ত বিচারালয়ে গিয়া বলিতে পারিবে, এবং অন্যায়কারীদিগের দণ্ডবিধান করিতে বিচারকদিগের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিবে।

কুমারী ফ্রান্সেস উইলার্ড।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩২০ | ৮ম সংখ্যা।

ফ্রান্সেস্ এলিজাবেথ্ উইলার্ড্

স্ত্রী পুরুষ, এ দুই স্বতন্ত্র পৃথক শক্তি; পুরুষ সবল, স্ত্রী দুর্ব্বল; পুরুষ জ্ঞানী, স্ত্রী অজ্ঞান; পুরুষ প্রভু, নারী সেবিকা; পুরুষ চালক, নারী "ছায়েবানুগতা"—ছায়ার মত অনুগমনকারিণী। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। এই মত সকল দেশেই বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এখনও বহু লোক এই কুসংস্কারের হাত হইতে উদ্ধার পায় নাই। কিন্তু প্রকৃত কথাটা ঠিক ইহার বিপরীত। আত্মার রাজ্যে কি স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে? শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে কি স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে? সত্যই কি পুরুষ যাহা পারে, নারী তাহা পারে না? এ প্রশ্নের সদুত্তর নারী-শক্তির পরিচয় দেওয়া—নারীর জীবন দেখান। এক একটি মহিলা যে কি করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন, তাহা দেখিলে, আর কেহ বলিবে না যে, নারীজাতি দুর্ব্বল ও অজ্ঞান, পুরুষের ন্যায় গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার বহনে অসমর্থ।

ফ্রান্সেস্ এলিজাবেথ্ উইলার্ড, একজন অতি তেজস্বিনী রমণী। তিনি বাল্যকাল হইতে আত্মশক্তির পরিচয় দ্বারা দেখাইয়াছেন, যে নারী-শক্তি কোনও রূপে পুরুষশক্তির অপেক্ষা হীন নহে। ইঁহার পিতামাতা উভয়েই ধর্ম্মনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ, সাধনশীল, সুশিক্ষিত এবং অতি বিনয়ী ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা হইত। ধর্ম্ম ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহারা সকল গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। মাতা তাঁহার ভক্তিপূর্ণ, সুমিষ্ট, ও কোমল প্রকৃতির গুণে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। গৃহকার্য্য শেষ করিয়া যখন অবকাশ পাইতেন, তখনই তিনি ধর্ম্ম-

শাস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিতেন। পিতাও অতি নিষ্ঠাবান খৃষ্টান ছিলেন। পরিবার পরিচালনের জন্য তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-নিয়মগুলি গৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বয়ং নিয়ম পালনে ও ধর্ম্মসাধনে অনুরাগী ছিলেন, এবং অপর সকলকেও সেই সকল নিয়ম পালনে বাধ্য করিতেন। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেও বলিতেন, "ছেলেদের অভ্যাস গঠিত হওয়া উচিত।" তিনি রবিবারে ধর্ম্ম সাধন ব্যতীত অন্য কিছু করিতেন না, অতি সামান্য কার্য্য পর্য্যন্ত করিতেন না, এমনকি চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতেন না। ছেলেমেয়েদেরও সেদিন অন্য কোন কাজ করিতে দিতেন না বা খেলিতে দিতেন না। ধর্ম্মগ্রন্থের ছবি প্রভৃতি সেদিন তাদের অবলম্বন ছিল। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও নিষিদ্ধ ছিল। রবিবার চার্চ্চে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতে হইত, এব গৃহে মাতা পিতা ধর্ম্মশাস্ত্রের গল্প, ছবি, নীতি উপদেশ প্রভৃতি দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিতে চেষ্টা করিতেন।

এইরূপ কঠোর ধর্ম্মনিয়ম ও শাসনপূর্ণ গৃহে, নিউইয়র্ক্ নগরের "চার্চ্চ্ভিল্" নামক গ্রামে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৮এ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সেস্ এলিজাবেথ্ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। তিন ভাইবোনের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা ছিল।

ফ্রান্সেসের দুই বৎসর বয়সের সময়, তাহার পিতা, সপরিবারে "ওবার্লিনে" গমন করেন এবং সেখানকার কলেজে কোন একটি বিষয় অধ্যয়নে লিপ্ত হন। অলিভার স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করে এবং ফ্রান্সেস্ গৃহে মাতার নিকট অতিসহজে বর্ণপরিচয় শেষ করিয়া বই পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়ই তাহার চিন্তাশীলতা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। কলেজের ছাত্রদের বক্তৃতা অভ্যাস করিতে দেখিয়া সে এক এক সময় কোন একটা উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া কত কি বকিত! সকলে তাহা দেখিয়া খুব হাসিত। সে তার দাদা ও তাহার সঙ্গীদিগের সঙ্গেই সর্ব্বদা খেলা করিত। মেরীর সহিত মেয়েলীখেলা তার একটুও ভাল লাগিত না। সে বাহিরে ছেলেদের সঙ্গে লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করিতে খুব ভালবাসিত। একদিকে অতি দুরন্ত মেয়ে, সকল সময় ছেলেদের সঙ্গে খেলায় তৎপর; অপরদিকে পড়াশুনায় অসাধারণ মাথা। ওবার্লিনে মাত্র চার বৎসর ছিল। এরি মধ্যে বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া কত বই পড়িয়াছিল, পড়িয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছিল। সকল ব্যাপার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিত, অতি বুদ্ধিমতীর ন্যায় নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিত। এইরূপে ছয় বৎসর বয়সের সময় তাহার অন্তরে পাঠে অনুরাগ এবং সূক্ষ্ম চিন্তার বিকাশ হইয়াছিল।

তারপর, মিষ্টার উইলার্ড্, উইস্কন্সিনে সুবিস্তৃত জমি ক্রয় করিয়া চাষবাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং তাহাতে যথেষ্ট লাভ হওয়ায়, অচিরে প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হন। সেখানে তিনি যে গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম হইল "অরণ্য-নিবাস" (Forest Home)। কারণ, ইহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকের বসতি ছিল না, বন্ধুবান্ধব পাড়াপ্রতিবেশী কেউ ছিল না। এজন্য গৃহে সন্তানদিগের শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। মাতা স্বয়ং শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। মাতাপিতা উভয়েই পড়াইতেন এবং আরও পড়িবার অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেন; সন্তানগণও পিতার লাইব্রেরী হইতে ভাল ভাল বই লইয়া পাঠ করিত। বই ছিল তাহাদের বন্ধু। তা'ছাড়া পিয়ানো বাজান, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতিতেও অনেক সময় কাটিয়া যাইত। সহরে বাস অপেক্ষা এই নির্জ্জন স্থানে শান্তিতে বাসই তাহাদের খুব ভাল লাগিত।

তিন ভাইবোন মিলিত হইয়া একটা সভা করিয়াছিল। সেই সভায় লেখাপড়া হইত। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহারা অভিনয় করিয়াছিল। বার বৎসর বয়সের সময় ফ্রান্সেস্ "গ্রাম্যগৃহের সৌন্দর্য্য-বিধান" (Embellishment of a country home) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখে। তাহাদের সভায় সেটি পঠিত হয়। সকলেই খুব প্রশংসা করেন। এবং পিতা সেটি এক পুরস্কার প্রদানকারী সভার সভাপতির নিকট পাঠাইয়া

দেন। উহাই সেবারকার পুরস্কারের রচনার বিষয় ছিল। কয়েকমাস পরে, একদিন ডাকে একটা ছোট বাক্স আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রান্সেস্ ব্যাগ্রভাবে খুলিতে লাগিল, ভিতরে না জানি কি আছে! খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতরে একটা রূপার মেডেলে লেখা আছে, "রচনার জন্য প্রথম পুরস্কার।" এবং তার পাশে একটী সুন্দর পেয়ালা আছে। এবং সব শেষে সেই সভার সভাপতির প্রশংসা পত্র। এই সব দেখিয়া সে একবারে লাফাইয়া চেঁচাইয়া দৌড়াইয়া নাচিয়া বাড়ী মাত করিয়া দিল; কুকুরগুলা ছুটিয়া আসিল। তারপর মাতা পিতা, ভাইবোন সকলে ব্যাপার কি তাহা জানিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহার এই আনন্দোচ্ছ্বাসে সকলেই আনন্দিত হইলেন।

এই গৃহে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইত না। যাহার যেরূপ স্বাভাবিক গতি তাহাকে সেইভাবেই ফুটিতে দেওয়া হইত। মাতা কোন দিন ফ্রান্সেস্‌কে বলেন নাই, "তুমি মেয়ে, তোমাকে রান্নাবান্না শিখিতে হইবে।" মেরী স্বভাবতই রান্নাবান্না ঘরকন্না ভালবাসিত। কিন্তু ফ্রান্সেস্ ছেলের মত বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করিত ও লাফাইত; এবং ছুতারের যন্ত্র লইয়া নানা প্রকার কাঠের জিনিষ তৈরি করিত।

ছেলেবেলা হতেই ফ্রান্সেসের স্বাধীন ভাব, স্বাধীন চিন্তা অত্যন্ত প্রবল ছিল। "বাইবেল যে ঈশ্বরের বাণী তাহার প্রমাণ কি?" "একথা যে ঠিক, তার প্রমাণ কি?"—ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া সে তাহার মাতাকে অস্থির করিয়া তুলিত। এই স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন ভাব কিরূপ প্রবল হইয়াছিল তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি।

যেদিন ফ্রান্সেসের বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইল সেদিন সে একখানা চেয়ারে বসিয়া স্কটের "আইভান্‌হো" উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। সেই পরিবারের নিয়ম ছিল, পিতামাতার অনুমতি না লইয়া সন্তানেরা কিছু পড়িবে না। তাহার নভেল পড়া বারণ ছিল। পিতা তাহাকে নভেল পড়িতে দেখিয়া বলিলেন, "ফ্রান্সেস্, আমি বোধ হয় তোমাকে নভেল পড়্‌তে বারণ করেছি?"

উত্তর—হাঁ, তুমি বারণ করেছ। আমিও তা শুনেছি। কিন্তু আজ কোন্ দিন জান?

পিতা—কেন, কোন্ দিন? দিনের সঙ্গে এ কাজের কোন সম্বন্ধ আছে নাকি?

উত্তর—আছে বই কি! আজ আমি আঠার বছরের হয়েছি; এখন তো আমি স্বাধীন! আমি মনে করি এই সুন্দর ঐতিহাসিক গল্প আমার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পিতা একটু অবাক্ হইলেন, তারপর হাসিয়া বলিলেন, "যেমন বাঁশ, তেমনি কঞ্চি!"

১৮৫১।৫২ খৃষ্টাব্দে একটি ভদ্রপরিবার তাঁহাদের নিকটে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সেই পরিবারের একটি সুশিক্ষিতা বালিকা ফ্রান্সেস্, মেরী এবং আরও দুইটি অন্য বাড়ীর মেয়ে লইয়া একটি স্কুল করেন। ইনি ছয়মাসের মধ্যে অনেক শিক্ষাদান করেন। তারপর ক্রমশঃ অনেক ভদ্র পরিবার আসিয়া সন্নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে ফ্রান্সেসের পিতার চেষ্টায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই স্কুলে সুযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকট ফ্রান্সেস্ সর্ব্বদা উৎসাহ পাইতে লাগিল। সাহিত্যজ্ঞানে এবং রচনায় দিন দিন উন্নতি-লাভ করিতে লাগিল। এই সময় সে একখানি বই লিখিতে আরম্ভ করে। তাহার পিতা এবং দাদা এই জন্য ঠাট্টা করায়, সে বলিয়াছিল—"আমি নিশ্চয়ই লিখ্‌তে পারি, আমি নিশ্চয়ই লিখ্‌ব; প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা ক'রেও লিখ্‌ব।"

অলিভারের সহিত ফ্রান্সেস্ ও মেরী শিকার করিতে যাইত, বন জঙ্গল পাহাড়ে বন্দুক কাঁধে করিয়া ঘুরিত, এবং গৃহেও শিকার ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিত। এইরূপে দুর্দ্দান্ত বালকের সকল লক্ষণ তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু গৃহের ধর্ম্মসঙ্গত শাসন এবং লেখাপড়ায় অনুরাগ তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

এই সময় দুইবোনে মিলিয়া একখানা মাসিক কাগজ বাহির করে। বাড়ীর সকলেই উহাতে লিখিতেন। এই সময়, ফ্রান্সেসের ছোট পিসীমা সেখানে আসিয়া কয়েক মাস বাস করেন। তিনি সাহিত্য, ইতিহাস

প্রভৃতিতে সুপণ্ডিতা ছিলেন। তিনি সেই কয়েকমাসে ফ্রান্সেস্‌কে এমন করিয়া সাহিত্যের সহিত পরিচিত করিয়া দেন যে তাহাতে তার উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়, তার জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়'।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, পিসীমা সারা (Sarah) ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া মিলোবী ফিমেল কলেজে (Milwabee Female Callege) গমন করেন। ফ্রান্সেস্ এবং মেরীও তথায় প্রেরিত হয়। সেখানে তাহারা মহা আনন্দে কিছুদিন শিক্ষালাভ করে। এই সময় ফ্রান্সেস্ "চিন্তা ও কার্য্যের মৌলিকতা" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ, এবং "প্রদীপ জ্বালা" বিষয়ে একটি কবিতা লিখিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

ইহার পর তাহারা দুই বোন, ইলিনয় (Illinois) ইভান্‌ষ্টন্ কলেজে পড়িতে যায়। তখন ফ্রান্সেসের বয়স প্রায় ২৭ বৎসর। প্রথম দিন তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়াই, তাহার উপর সকলের চোখ পড়িল। তারপর তাহার চিন্তাশীলতা, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা, এবং ভদ্রতা তাহাকে সকলের প্রিয়পাত্রী করিয়া তুলিল। ফ্রান্সেস্ প্রতিদিন এবং প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিল। সে সকলের সঙ্গে মিশিত, গল্প করিত, আমোদ করিত, কিন্তু কখনও পড়ায় একটু ঢিল দিত না। যাহা ভাল লাগে, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে যে কোথায় লইয়া যাইত, কে জানে? কেবল মাত্র জ্ঞানানুশীলনের অনুরাগই তাহাকে সুখপ্রিয়তার মোহজাল হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাইবেল, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার গভীর সন্দেহ ছিল। এই কলেজের সভাপতি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফ্রান্সেসকে স্বয়ং বাইবেল্ পড়াইয়া, তার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবশেষে তাহাকে ধর্ম্মবিশ্বাসী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চার বৎসর অধ্যয়নের পর ফ্রান্সেস্ শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, ও বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে।

এই পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহার শরীর অসুস্থ হয়। সেই সময় সে ডায়ারীতে লিখিয়াছিল,—"এইবার আরোগ্য লাভ করিয়া, আমি নিজে অর্থোপার্জ্জন করিব, এবং জগতের কিছু কাজে লাগিতে চেষ্টা করিব।"

উপাধি গ্রহণের পর, ফ্রান্সেস্ গৃহে গমন করিলেন। শরীর ভাল ছিল না বলিয়া, কিছুদিন বিশ্রামেই কাটিল। লেখা পড়াও চলিতেছিল। তবুও লক্ষ্যহীন জীবন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। পিতার প্রচুর সম্পত্তি, আদরের মেয়ে, পিতা বলিলেন, তাঁহার কোন কাজ করিয়া দরকার কি? তিনি গৃহে মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করুন। কিন্তু ফ্রান্সেস্ বলিলেন, তাহাতে কি তাঁহার জীবন সার্থক হইবে? জগতের সেবা, দরিদ্রের কল্যাণ যাহাতে হয়, এরূপ কার্য্য না করিলে কি জীবন সার্থক হয়? অতঃপর তিনি "চিকাগো"র সীমান্তের একটি সামান্য বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইয়া গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি প্রত্যেক ছাত্রী এবং প্রত্যেক অভিভাবককে নিজগুণে বশীভূত করিলেন, স্কুলের উন্নতি সাধন করিলেন, তারপর অপরের হাতে ভার দিয়া অন্যত্র গেলেন।

১৮৫৮ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি একাদশটি স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনা করেন। সর্ব্বত্রই সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। এই সময় তিনি সংবাদপত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মহৎ ও উদার ভাব সুন্দর ও সতেজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার প্রবন্ধ লাভের জন্য সংবাদপত্র সকল ব্যাকুল হইয়া থাকিত।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভগ্নী মেরী ১৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করে। প্রিয় ভগ্নীর মৃত্যুতে তিনি তাহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ, "মধুর উনিশটি বছর" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার জীবনের চিত্র অঙ্কিত করেন। নিউইয়র্কে এবং ইংলণ্ডে উহা মুদ্রিত হয়, এবং সর্ব্বত্র যথেষ্ট প্রশংসিত হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কুমারী উইলার্ড ইভান্‌ষ্টন্ কলেজের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন। ইহা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার বিশেষ পরিচায়ক। তিনি এই কলেজের সকল বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। আত্মশাসনের উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। পূর্ব্বে ছাত্রীগণ

রবিবারে লাইন বাঁধিয়া সমাজে যাইত। তিনি গিয়া বলিলেন, "তোমরা স্বাধীন ভাবে সমাজে যাও, কিন্তু নিজেকে নিজে শাসনে রাখিবে, আত্মসম্মান রক্ষা করিবে।" সকলে সেদিন হইতে স্বাধীন ভাবে গীর্জ্জায় যাইত, কোন গোলযোগ হইত না। এইরূপে শাসন ও শিক্ষায় তিনি নবজীবন আনিয়াছিলেন।

এই সময় একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার সকল ব্যয়ভার বহন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইউরোপ ভ্রমণ করিতে লইয়া যান। তিনি কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই ভ্রমণকালে তিনি চিকাগোর রিপাব্লিকান্ নামক কাগজে প্রায়ই পত্র লিখিতেন। সেই সকল পত্র সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল। দুইবৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সাত আটখানি কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

কুমারী উইলার্ড আশৈশব সংস্কারক। দুঃখীদিগের জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হইত। দুঃখে, দারিদ্র্যে, পাপে যে সকল নরনারী ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাদের উদ্ধার কি প্রকারে হইবে, এই চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বর্ত্তমান থাকিত। বাল্যকালে গৃহ-শিক্ষার মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত ছিল। সেই শৈশবে "ক্রীতদাসের বন্ধু" (The slave's friend) নামক বই পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠে, তাহা আর থামে নাই। অতঃপর আমেরিকার শত শত পরিবারে সুরাপান যে কি ভয়ানক দুঃখ দারিদ্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া তিনি এই পাপ দূর করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হন।

ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার পিতার কাছে বাস করিতেছিলেন। তিনি তখন ইভান্‌ষ্টনে থাকিতেন। ফ্রান্সেস্ কয়েক দিন মহিলা-দিগের ধর্ম্মপ্রচার সমিতিতে ইজিপ্ট, জেরুজেলম্ এবং অন্যান্য দেশের বিষয়ে অনেক কথা বলেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক-দিন ফ্রান্সেসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমি এখানকার সেণ্টিনারী চার্চ্চের ট্রাষ্টী; তুমি যদি এই চার্চ্চে বক্তৃতা কর, তবে যাহাতে যথেষ্ট লোক হয় এবং সংবাদ-পত্রে সেই বক্তৃতা প্রকাশিত হয় তাহার জন্য আমি চেষ্টা করিব। তোমার পরিশ্রমের যোগ্য মূল্যও তুমি পাইবে। এবং তাহাদ্বারা অনেকের কল্যাণ হইবে।" কুমারী উইলার্ড অনেক দিন হইতে বক্তৃতা করার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে রাজী হইলেন; এবং "নূতন বীরত্ব" (The New Chivalry) নামক বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বক্তৃতার দিন বহু সংখ্যক শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; সংবাদপত্রে একজন সুবক্তা বলিয়া তাঁহার নাম প্রকাশিত হইল। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার সকল লেখা এবং বক্তৃতাই কোন না কোন সংস্কার সম্বন্ধে।

কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি "মাদক নিবারণ সংস্কার।" তাঁহাদের গৃহে মদ্য কিম্বা ধূমপান কখনও স্থান পাইত না। বাল্যকালে তিনি "Youth Cabinate" নামে একখানা অতি সুন্দর বই পড়িয়াছিলেন। তাহাতে কবিতায় একটি প্রতিজ্ঞা-পত্র ছিল; তাহার মর্ম্ম এই :— "আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে কখনও কোন প্রকার মদ্য পান করিব না। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য শীতল জল পান করিব। সকল প্রকার মাদক দ্রব্য চিরদিনের মত আমাদের ঘৃণার বস্তু হইবে।"

এই প্রতিজ্ঞাপত্র পুস্তক হইতে কাটিয়া লইয়া, তিনি বাইবেলের এক স্থানে লাগাইয়া দিয়াছিলেন, এবং পরিবারের সকলকে সেই প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর করাইয়া-ছিলেন। অতঃপর তিনি অধ্যয়নে, অধ্যাপনায় এবং ভ্রমণে বহুকাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয় কখনও ভুলিয়া যান নাই। এখন কি প্রকারে কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাহা ভাবিতেছিলেন, এমন সময়, "ওহাইও" প্রদেশে "উম্যান্স্ টেম্পারেন্স্ ক্রুসেড্" নামক আন্দো-লনের প্রবল বন্যা, তাঁহাকে সংস্কারকের উচ্চ আসনে বসাইয়া দিয়া গেল। মদ্যপানে আমেরিকার গৃহে গৃহে হাহাকার উঠিয়াছিল, গৃহের রক্ষক পিতা, সকলের ভক্ষক শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল, সমাজের শান্তি

একবারে দূরে গমন করিয়াছিল, এমন সময় দুর্ব্বল, কোমল নারীহৃদয়ে কোথা হইতে বল আসিল, সাত শত নারী স্বামী ও ভাইভগ্নী এবং পুত্রকন্যাদিগের রক্ষার জন্য—সমাজের কল্যাণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল,—প্রতিজ্ঞা করিল, "মদের দোকান উঠাইব, দোকান আগুলিয়া বসিয়া থাকিব, কোনও ব্যক্তিকে মদের দোকানে যাইতে দিব না, তুমুল আন্দোলন করিয়া সর্ব্বনাশের মূল মদের দোকান উঠাইব।" একদিন চিকাগোর "সিটি হলে" বহু সংখ্যক রমণী দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মাদক নিবারণী আইন প্রচলনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তদনুসারে কার্য্য হইল না ; বরং উত্তেজিত পুরুষগণ মহিলাদিগকে আক্রমণ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিল, কেবল পুলিশের গুণে সে দুর্ঘটনা ঘটে নাই। সুতরাং মদিরা রাক্ষসী নগরে পূরামাত্রায় রাজত্ব করিতে লাগিল, এবং রাজনীতিবিদ্‌গণ তাহার মন্ত্রীত্ব করিতে লাগিলেন!

ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এই ব্যাপারে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা নানা স্থানে উক্ত বর্ব্বরতার প্রতিবাদ করিলেন। এই সময় কুমারী উইলার্ড একটি প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করিয়া বিরোধীদিগকেও কিছুক্ষণের জন্য শান্ত করিয়াছিলেন। এখন হইতে তিনি ক্রমাগত এই বিষয়েই লিখিতে এবং বলিতে লাগিলেন।

উক্ত ঘটনার কয়েকমাস পরে, তিনি "মেন্" (Main) নগরে "গস্পেল্ টেম্পারেন্স্" সভায় গমন করেন। সেই উপলক্ষে নীলডো, ফ্রান্সিস্ মার্কি, মেরীহার্ট, এবং মিসেস্ ষ্টিভেন্স্ প্রভৃতি বিখ্যাত সংস্কারকদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারা স্ত্রীলোক হইয়াও কিপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, কত সহস্র সহস্র টাকা খরচ করিয়াছেন ; তাহা অবগত হইয়া তাঁহার মনে গভীর চিন্তার উদয় হইল,—এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? উক্ত মহিলারা এত টাকা কোথায় পাইলেন? আমি এই কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলে, আমার অভাব কি দূর হইবে? আমার যে আবার মা-র খরচ আছে! (ইহার পূর্ব্বেই ইঁহার পিতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন) এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাসায় গিয়া বাইবেল খুলিলেন, এবং ধর্ম্মসঙ্গীতের এই অংশটিতে তাঁহার চোখ পড়িল—"ভগবানে বিশ্বাস কর এবং শুভ অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে তুমি স্বদেশে থাকিবে এবং তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে।" তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ হইবে, আর কি চাই! ফ্রান্সেস্ স্থির করিলেন, অতঃপর তিনি সেবাব্রত গ্রহণ করিবেন। এই মীমাংসার পর তাঁহার বিশ্বাস, নির্ভর ও শক্তি দশগুণ বাড়িয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে তিনি দুইখানি পত্র পান। একখানি পত্রে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন বিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (তাহার বেতন মাসিক ৬০০৲) ; অপরটিতে ইলিনয়স্থ মহিলাদিগের টেম্পারেন্স্ ইউনিয়নের সভাপতি হওয়ার জন্য, (তাহাতে কোন বেতন নাই, কেবল কোন প্রকারে দিন চলে এরূপ বৃত্তির উল্লেখ ছিল)। তিনি পূর্ব্বপত্রের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। দ্বিতীয় পত্রের আহ্বানকে ভগবানের সঙ্কেত বলিয়া আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কি পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিল! শিক্ষিতা ভদ্রকন্যা, শান্তি ও সম্মানের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পাপের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন ; প্রেম পূর্ণ গৃহের কোণ ছাড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লাইব্রেরীতে অধ্যয়নের বিমলানন্দে মগ্ন থাকার পরিবর্ত্তে, কেবল বক্তৃতাগৃহ এবং রেলে ঘুরিতে লাগিলেন ; এবং শিক্ষিত ও সুসভ্য নরনারীর সঙ্গ ছাড়িয়া, মাতালের আড্ডায় ও পাপের গহ্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহাকে তাঁহার মাসিক কত টাকা আবশ্যক ইহা জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "তা হবে এখন।" সকলে মনে করিলেন, তবে বুঝি তাঁহার কোন সম্বল আছে। কিন্তু তাহা ভুল। ইহার পর অর্থাভাবের জন্য ঝী চাকর ছাড়াইতে হইয়াছে। নিজে সব কাজ করিতে হইয়াছে। এমন কি, অনেকদিন খাবার খাওয়া হয় নাই, এবং গাড়ীভাড়া না থাকায় ইভান্‌ষ্টন্ হইতে চিকাগোতে হাঁটিয়া যাওয়া আসা করিতে

হইয়াছে। বাহিরে এই দুঃখ ও দারিদ্র্য; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন,—"এমন শান্তি, এমন আনন্দ জীবনে আর কখনও পাই নাই। আমার কিছু নাই, কিন্তু আমি রাজকন্যা।"

অতঃপর তিনি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা এখানে সম্ভব নহে। তিনি এখন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মহাশক্তি রূপে পূজা পাইতেছেন। তাঁহার গভীর ঈশ্বরপ্রীতিই এই শক্তির মূলে।

মধুরবাণী

তাঞ্জোরের মহারাজ রঘুনাথ সর্ব্বদা পণ্ডিত-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় বসিতে ভালবাসিতেন। মহারাজ সাতিশয় তত্ত্বপিপাসু ছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম্মের এবং কাব্যাদির আলোচনা করিতেন। এই পণ্ডিতমণ্ডলী প্রতিনিয়তই নূতন নূতন কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি বিধান করিতেন।

এই পণ্ডিতদিগের পার্শ্বে বসিয়া অনেক বিদ্যাবতী মহিলাও রাজসভার গৌরব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিলেন। পণ্ডিতগণের সঙ্গে তাঁহারাও সমানে সমানে ধর্ম্ম ও কাব্য চর্চ্চা করিতেন, এবং তাঁহারাও প্রতিদিন নূতন নূতন ছন্দে অভিনব কবিতা, গাথা, মহারাজকে শুনাইয়া হর্ষপুলকিত করিতেন। এই সকল নারীর মধ্যে মধুরবাণী নাম্নী রমণীই অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মধুরবাণীর মনোজ্ঞ রচনায় রাজা তাঁহাকে সকল পণ্ডিত হইতে অধিক সমাদর করিতেন।

একদা পণ্ডিত ও বিদুষী নারীগণ-বেষ্টিত হইয়া মহারাজ সভায় বসিয়াছেন,—কেহ তাঁহাকে ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনাইতেছেন, কেহ রামায়ণ গান করিয়া শুনাইতেছেন, কেহ কেহ সুললিত গাথা শুনাইতেছেন, কিন্তু এক রমণী রামচন্দ্রের প্রতি মহারাজের গভীর ভক্তিমাখা একটি মনোহর কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। সে কবিতা বড়ই সুন্দর ছিল। যেখানে রামচন্দ্রের প্রতি স্তুতি বর্ণিত ছিল, সেই অংশের পাঠ শুনিয়া মহারাজ বিমুগ্ধ হইলেন। কবিতা পাঠ শেষ হইলে, মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"বহুদিন আমি রামচরিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, যত শুনিয়াছি ততই আমার নিকট তাহা নূতন বোধ হইয়াছে। পণ্ডিতমণ্ডলী ও রমণীবৃন্দ অনেকবার আমাকে রামচরিত্র বিবিধ ছন্দে শুনাইয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে যেন একটা কেমন অভাব অনুভব করিয়াছি; যেন রামচন্দ্রের সব গুণ, সব কথা তাহাতে সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। আমার ঐকান্তিক বাসনা যে, সেই অভাবটুকু পূর্ণ করিয়া যদি কেহ রামায়ণ রচনা করিতেন, তবে আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।"

মহারাজ সভার প্রত্যেককে এই মহৎ কাজের ভার লইতে অনুরোধ করিলেন, পুরুষ বা রমণী কেহই সেই কার্য্যভার লইতে সাহস করিলেন না। সেদিন মহারাজ রঘুনাথ ক্ষুণ্ণমনে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

রজনীতে মহারাজ এক স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। স্বপ্ন এইরূপ:—

রামচন্দ্র মহারাজের শিয়রে বসিয়া বলিলেন,—"বৎস রঘুনাথ, তুমি বিষণ্ণ হইতেছ কেন? তোমার সভার মধুরবাণী সরস্বতী-প্রায়, তাহার উপর "রামায়ণ" রচনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হও। মধুরবাণীই এই কাজের উপযুক্ত; তাহার ভক্তিপূর্ণ গানে আমিও পরম পরিতুষ্ট।"

পর দিবস মধুরবাণীকে মহারাজ স্বপ্নের বিষয় বলিলেন। তখন মধুরবাণী বিনয় বচনে ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "দেবতার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। ভক্তের রাজা যখন স্বয়ং আমার সহায়তা করিবেন, তখন আর আমার ভাবনা কিসের? ত্রুটী হইলে অন্তর্য্যামীই ক্ষমা করিবেন।"

মহাকবি মধুরবাণী রামায়ণ রচনা করিয়া মহারাজ রঘুনাথের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তালপাতায় লেখা সেই বৃহৎ রামায়ণের চতুর্দ্দশ সর্গ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এই চৌদ্দটি সর্গ নানা ছন্দে দেড় হাজার শ্লোকে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমানে এই রামায়ণ বাঙ্গালোর মালেশ্বর বেদ-বেদান্তের মন্দিরের পাঠাগারে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

মধুরবাণী রামায়ণ ব্যতীত "কুমারসম্ভব" এবং "নৈষধ কাব্য"ও রচনা করিয়া মহাকবির আসন গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। মধুরবাণী সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

কবিতা রচনায় মধুরবাণীর অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। বার মিনিটে তিনি এক শত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।

মধুরবাণী সর্ব্বগুণে গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদন অতি চমৎকার ছিল। যখন তিনি বীণার তারে ঝঙ্কার দিতেন, তখন বোধ হইত যেন স্বয়ং বাণী বীণায় আলাপ করিতেছেন।

মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা।

জাতীয় উন্নতি সাধনে নারীজাতি

ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নতির কথা উঠিলেই একদল লোক বলেন, ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ, তাহাতে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিবিধ জাতির বাস; এ দেশে একজাতি গঠিত হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নতি আকাশ-কুসুম বিশেষ। কিন্তু, সুইজারল্যাণ্ডেরও বিভিন্ন বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, সেখানে যখন এক-জাতি গঠিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে; এবং যে আমেরিকা এককালে সকল প্রকার বিশৃঙ্খলার রাজ্য ছিল, সেখানেও যখন একতা সম্ভব হইয়াছে, তখন ভারত-বর্ষের বিবিধ জাতির মধ্যেও যে এক জাতীয় জীবন ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার বিস্তার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগকে একতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতাবন্ধনের প্রধান রজ্জু ইংরাজী ভাষা। অথচ এদেশের মহিলা-দিগের মধ্যে অধিকাংশই লেখা পড়া জানেন না, ইংরাজী শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা তো মুষ্টিমেয়; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার আরও দ্রুতগতিতে হওয়া আবশ্যক; এবং ইংরাজী শিক্ষিত পুরুষদিগের ভাব, চিন্তা ও আদর্শ মহিলাগণ যাহাতে ধারণা করিতে পারেন তাহারও চেষ্টা করা উচিত। নারীগণ এবিষয়ে অগ্রসর না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। নারীগণকে অগ্রগামী করিতে হইলে, সর্ব্ব-প্রথম তাঁহাদের মনে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা আবশ্যক। স্বাধীন ভাবে চাকরী করিয়া জীবন যাপন করিবার জন্য না হোক্, কিন্তু সমাজ ও পরিবার সম্বন্ধে জগতে যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য, জগতের মধ্যে মানুষ বলিয়া গণ্য হওয়ার জন্য নারীদিগের শিক্ষার আবশ্যক। লীলাবতী প্রভৃতি আদর্শ নারীদিগের জীবন বৃত্তান্ত বর্ত্তমান যুগের নারীদিগের অবগত হওয়া আবশ্যক। এদেশের নারীগণকে এ কথাও বলা উচিত, যে জাপানের বিস্ময়কর উন্নতির মূলে সে দেশের শিক্ষিতা নারীশক্তি বর্ত্তমান। এদেশের নারীজাতিকে যদি শিক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল ও ইচ্ছুক করিয়া তুলিতে পারা যায়, এবং তাঁহারা যদি আরও বেশী করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এদেশের জাতীয়-উন্নতির বিশেষ সাহায্য হইবে।

এদেশের নারীদিগের শিক্ষার অভাব ব্যতীত, আরও কয়েকটি দুর্ব্বলতার কারণ আছে। আমাদের নারীজাতি সম্বন্ধীয় ধারণাই অত্যন্ত হীন। স্ত্রীলোক পিতা, স্বামী, কিম্বা সন্তানের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিবে, তাহার কোন স্বতন্ত্র মতামত থাকিবে না, তাহাকে কোন গোপনীয় বিষয় বলা উচিত নহে; এই হইল নারীজাতি সম্বন্ধে এ দেশের ব্যবস্থা। কিন্তু ইংরাজ-রমণীর প্রতি চাহিয়া দেখ, তাঁহার সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, আরামের সময় রমণীকে সন্তুষ্ট করা কঠিন, কিন্তু দুঃখের সময় রমণী শান্তিদায়িনী, স্বর্গীয় দূতের ন্যায়। ইংরাজ সমাজে রমণী দেবীর ন্যায় পূজিতা। সীতা ও সাবিত্রী, দ্রৌপদী ও দময়ন্তী এদেশেই ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নারীর অন্তর্গত নহেন, এই বলিয়া

কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনের চেষ্টা করা যাইতেছে।

একদিক দিয়া এদেশের নারীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়েন আমাদের দিদিমারা। তাঁহারা কুসংস্কারের অবতার বিশেষ,—তাঁহারা চিরদিন অতীত কালকে সত্যযুগ এবং বর্ত্তমানকে ঘোর কলি বলিবেন, তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা সমূহের সংস্কার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। কিন্তু যাঁহারা ভবিষ্যতে দিদিমা হইবেন, তাঁহারা যাহাতে এরূপ না হন, তাহার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি;- আমাদের কন্যাদিগকে যদি আমরা সুশিক্ষা দান করি এবং সকল বিষয়ে স্বাধীন-ভাবে বিচার করিয়া সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে শিক্ষা দিই, তাহা হইলে কোন কুসংস্কার তাঁহাদের মনে স্থান পাইবে না।

তারপরই দৃষ্টি পড়ে, বিধবাদিগের উপর। এদেশের বিধবাগণ অনেক স্থলে এক একটি পরিবারের অশান্তির কারণস্বরূপ বাস করেন। কোন শিক্ষা নাই, কোন মহৎ চিন্তা নাই, কোন গুরুতর কার্য্যও নাই। বিধবা-গণের বিবাহ করা উচিত কি না এস্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। তাঁহারা শিক্ষালাভ করুন, কোন একটা দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য করুন, যথাসম্ভব নিজের ভার নিজে বহন করিয়া, অন্য সময় অপরের কল্যাণসাধনের আকাঙ্ক্ষা লাভ করুন, তাঁহাদের দ্বারা জাতীয় উন্নতির কত সহায়তা হইবে।

অতঃপর পতিতা নারীগণের কথা মনে পড়ে। ইহাদের উদ্ধার সাধন কি কঠিন কার্য্য! সমাজবক্ষে ঘোর কলঙ্কের ন্যায় ইহারা বর্ত্তমান। ইহাদের উদ্ধার সাধনের জন্য যতদিন আমাদের প্রাণ ব্যাকুল না হইবে, এবং যতদিন আমরা ইহাদের উদ্ধারের জন্য কোনও প্রকার ব্যবস্থা না করিব, ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে মহা অন্তরায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

এই সঙ্গে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য জাতি সকলও উল্লেখযোগ্য। তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিতে না পারিলে, জাতীয়-উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

বৃদ্ধা, বিধবা, পতিতা ও অস্পৃশ্যা নারীদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাঁহারা গৃহস্থ ঘরের কন্যা, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মাতা, তাঁহারা জাতীয় উন্নতি সাধনে কতদূর সাহায্য করিতে পারেন, চিন্তা করিয়া দেখা যাক্।

একথা প্রথমেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, নারীজাতি পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর নির্ব্বোধ বা বুদ্ধিমান নহেন। এবিষয়ে নরনারীর মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই। নারী স্বামীর সহধর্ম্মিণী বলিয়া পরিগণিত; অতএব নারীগণ যদি সত্যসত্যই সহধর্ম্মিণী হন তাহা হইলে এদেশের ভ্রম, কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করিবার ক্ষেত্রেও তাঁহাদিগের উচিত—পুরুষদিগের সহায় হওয়া।

কি কি উপায়ে মহিলাগণ জাতীয় উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিতে পারেন? প্রথমতঃ জননীরূপে তাঁহারা সন্তানদিগের অন্তরে মহৎ ভাব, মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া জাতীয় উন্নতির বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। জননীগণ যদি শৈশবে সন্তানদিগের অন্তরে মহত্ত্বের বীজ বপন করিতে পারেন, ভবিষ্যতে তাহারা সমাজের গৌরব স্বরূপ হইয়া উঠিবে। সন্তানদিগকে ভাল করিয়া মানুষ করাই দেশের মহা কল্যাণ সাধন।

দরিদ্র-ঘরের মহিলারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি-সাধনের ভিতর দিয়া দেশের উপকার করিতে পারে। নাগপুর ও বোম্বের অনেক মিলে (Mills) গরিব মেয়েরা কাজ করিয়া থাকে। এইরূপে কার্য্য করায় মিলের কার্য্য উদ্ধার হয় এবং তাহাদেরও দারিদ্র্য দূর হয়। এদেশের লোকেরা কাজকে বড় হীন চক্ষে দেখে। আমাদের উন্নতির পথে ইহা এক প্রধান অন্তরায়। কার্য্য গৌরবের মূল এবং সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল—দরিদ্র রমণীগণও কার্য্য করিয়া পরিশ্রম করিয়া তাহা শিক্ষা দিতে পারে। এই-রূপে সকল শ্রেণীর নারীর দ্বারাই জাতীয় উন্নতি-সাধনের সাহায্য হইতে পারে।

স্বাগত

ধন্য হইল "বাংলার মাটি", ধন্য "পুণ্যপীযুষ"-জল,
ধন্য "শীতল অতল দীঘী", "নির্ম্মল নীল" গগনতল,
"পল্লব ঘন কানন" ধন্য, ধন্য পেলব "পল্লীবাট",
ধন্য "হরিত ধান্য ক্ষেত্র" মুক্তা খচিত "মুক্তমাঠ"!

মুঞ্জি' উঠিল বাণীর কুঞ্জ শুনিয়া মঞ্জু-বীণার তান
জাগ্রত দীনা জননী-ভাষা পল্লবে পুন পাইয়া প্রাণ;
বন্দে তোমারে প্রতীচি-পূর্ব্ব—গরবে গৌড় দৃপ্ত শির
ভারত আজি গীতির তীর্থ! স্বাগত! গীরথ! বিজয়ী বীর!

ভাস্বর অতি ভারতী, তব পুণ্য কিরণে করিয়া স্নান,
সকল বঙ্গ মনীষি-সঙ্ঘ তোমারে অর্ঘ্য করিছে দান;
এসহে রবি! "এশিয়া"-কবি! "আনন্দ রহো" নক্তদিন
সিক্ত করহ ঊষর চিত্ত বাজায়ে নিত্য অমিয় বীণ্!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী

আমরা বাল্যকালে প্রতিদিন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগকে স্মরণ করিতাম। প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিবার সময়ই সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে হইত; ঐ শ্লোকের মধ্যে সাধু পুরুষদিগের নাম লিখিত ছিল। কই? এখন আর ত কোথাও ছেলেদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদিগের নাম স্মরণ করিতে দেখিতে পাই না। প্রাচীন নিয়মটা পুনর্ব্বার প্রচলিত করিলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং সাধু রামতনু প্রভৃতি পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগকেই স্মরণ করা আবশ্যক হইবে। এই জন্যই রামতনুকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেছি। স্বর্গীয় কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তৎপ্রণীত "সুরধুনী কাব্যের" মধ্যে লিখিয়াছেন:—

"পরম ধার্ম্মিক বর এক মহাশয়
সত্য বিমণ্ডিত তার কোমল হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা পরহিতে রত
সুখদুঃখে সমজ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর সঙ্গে করিলে যাপন
দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।"

সাধু রামতনু সম্বন্ধে এই উক্তিই সত্য। তাঁহার সরলতা ও পবিত্রতা মণ্ডিত মুখশ্রী দর্শন করিলে নয়ন সার্থক হইত; তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত; তাঁহার সংসর্গে একদিন যাপন করিলে সত্য সত্যই মলিন চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যাইত। সৌভাগ্য বশতঃ এই সাধু পুরুষকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখের বাণী শুনিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছি; সেই জন্য সেই ধার্ম্মিক পুরুষ সম্বন্ধে সকল কথাই সাহসের সহিত বলিতে পারিতেছি। রামতনুর সরলতা ও সাধুতা সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, আর কিছুদিন পরে লোকেরা হয় ত তাহা কল্পিত কথা বলিয়া মনে করিবে; কিন্তু আমরা জানি উহা মিথ্যা নহে। আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে গুটি কয়েক কথা বলিব। তাহার পর তাঁহার সদ্‌গুণের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮১১ সালে রামতনু কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ধার্ম্মিক ও মাতা গুণবতী রমণী ছিলেন। রামতনু কলিকাতায় গমন করিয়া বাঙ্গালীর পরমহিতৈষী হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুকলেজে বাংলা দেশের খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেক কৃতী পুরুষের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। হিন্দু-কলেজের সুবিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিও তাঁহাদের অন্তরে স্বাধীন চিন্তা ও সমাজ সংস্কারের ভাব জাগ্রত করিয়া

দেন। লাহিড়ী মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুগণ ডিরোজিও সাহেবের উত্তেজনায়ই আপনাদের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা প্রাচীন রীতিনীতি আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই তাঁহারা দেশের সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এখন ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের চেষ্টায় বাংলা দেশে সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইল।

লাহিড়ী মহাশয় হিন্দুকলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ১৮৩৩ সালে চল্লিশ টাকা বেতনে হিন্দুস্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সতীর্থদিগের মধ্যে কেহ কেহ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনিও ইচ্ছা করিলে ঐ রকমের কোন বড় কাজ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন; কিন্তু দেশের ছাত্রদিগকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। সেই জন্য তিনি রাজকর্ম্মচারীদিগের অনুরোধেও অধিক বেতনের অন্য কোন কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। লাহিড়ী মহাশয় আজীবন যুবকদিগকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দান করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। একজন কৃতবিদ্য ছাত্র শেষ বয়সে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। লাহিড়ী মহাশয় বেতন ত পাইতেন সবে চল্লিশ টাকা; কিন্তু তাঁহার করুণ হৃদয় দরিদ্র ছাত্রদিগের দুঃখের কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই; তিনি আপনার বাসায় কয়েকটি ছাত্র রাখিয়া তাঁহাদের অন্ন যোগাইতেন। এই সময় লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয় এবং আমাদের দেশপ্রিয় কবি ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় রায় মহাশয়ও তাঁহার বাসায় বাস করিতেন।

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া উক্ত স্থানে গমন করিলেন। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার দেবচরিত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া জীবনকে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগর হইতে বর্দ্ধমান গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না; জাতিভেদের দ্বারা দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে করিতেন। তখনও বাংলা দেশের মধ্যে কোন হিন্দুর সন্তানই পৈতা পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মগণও গলায় পৈতা রাখিতেন। সরলচিত্ত সত্যানুরাগী রামতনু ভাবিলেন—"আমি জাতিভেদকে দেশের অনিষ্টকর কুপ্রথা বলিয়া মনে করি; কাজেই আমার গলায় আর পৈতা থাকা উচিত নয়।" রামতনু উপবীত ত্যাগ করিলেন; এই কথা বাতাসের মুখে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন আর রামতনুর উপর নির্য্যাতনের সীমা রহিল না। তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ হইল, চাকর চাকরাণী কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই দুরবস্থার মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের পরমবন্ধু দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরই তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রামতনু উত্তরপাড়া স্কুলে বদলী হইলেন। স্বদেশ-হিতৈষী সুশিক্ষিত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার ছাত্র। তিনি লাহিড়ী মহাশয়কে এখনও গুরুর ন্যায় ভক্তি করেন। ইহার পর রামতনু বরিশালে কার্য্য করিয়া পুনরায় কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন। এই সময় দেশের অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গে বাস করিয়া তৎপ্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য ভক্ত ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সময়ই লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শের অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। নগেন্দ্র বাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন, "লাহিড়ী মহাশয়কেই আমি আমার ধর্ম্মগুরু বলিয়া মনে করি।" ইহার পর রামতনু বাবু গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সরলতা, সত্যানুরাগ, সরল বিশ্বাস এবং ভক্তি—এই সকল সৎভাবে লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জ্ঞানী, বৃদ্ধ এবং সাধুপুরুষের শিশুর ন্যায় সরলতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

তিনি পঁচাশি বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিম ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। আজ কাল চারিদিকে মানুষের বিষয় বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কত মানুষ ধূর্ত্ততা ও শঠতা করিয়া লোককে ঠকাইয়াই আপনাকে বাহাদুর মনে করিতেছে। যে সেয়ানা চতুর লোক জিলিপির মত বুদ্ধির প্যাঁচ খেলাইয়া মানুষের চোখে ধুলা দিতে পারে, সে আপনাকে সকলের সেরা বলিয়া মনে করে! এই কপটতার মধ্যে যিনি নির্ম্মল হৃদয়ে সরলতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনি যথার্থই ভক্তির পাত্র।

যেমন সরলতা, তেমনই সত্যানুরাগ। এই সাধুপুরুষ একবার যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহা ধরিয়া রহিয়াছেন। লোকের লাঞ্ছনা গঞ্জনার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। অথচ ইঁহার মধ্যে বিনয় এবং কোমলতাই খুব বেশি দেখা গিয়াছে। এই দুইটি মধুর ভাবে তাঁহার প্রকৃতি সুমধুর হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; প্রীতির অমৃতরসে বৃদ্ধের হৃদয়টুকু যেন পরিপূর্ণ ছিল। তাই তিনি ইংরাজ, বাঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই প্রেম আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সরলতা, সত্যানুরাগ ও বিনয় সম্বন্ধে দুইটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। বৃহৎ ঘটনা অপেক্ষা প্রতিদিনের তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্য দিয়াই মানুষকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারা যায়, সেই জন্যই এই দুইটি ছোট কথা লিখিতেছি।

একবার লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীর চাকরাণী পুত্র নবকুমারকে কোলে লইয়া বেড়াইতেছিল। নবকুমার কান্না জুড়িয়া দিল। চাকরাণী তাহার মন ভুলাইবার জন্য কহিল,—"খোকা, কেঁদ না, তোমাকে খাবার কিনে দিব।" নবকুমার প্রলোভনে ভুলিয়া গেল। কথাটা লাহিড়ী মহাশয় শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি চাকরাণীকে কহিলেন, "ঝি, তুমি কি নবকুমারকে খাবার কিনে দিয়েছ?" ঝি কহিল,—"খাবার কিনে দেব কেন? তাকে যে খাবার দেবার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছি।" রামতনু বাবু কহিলেন,—"তুমি ছেলেকে মিথ্যাকথা শিখাইতেছ? আর এরকম কাজ করিও না। এই তোমাকে পয়সা দিতেছি, তুমি এখনি খাবার কিনিয়া দাও।"

লাহিড়ী মহাশয়ের মধু নামে একটি ভৃত্য ছিল। একবার ঘরের একখানি জিনিষ হারাইয়া যাওয়ায় বাড়ীর লোকেরা মধুকেই চোর বলিয়া সাব্যস্ত করিল। লাহিড়ী মহাশয় প্রথম ত সে কথায় কানই দিলেন না; কহিলেন, "তাও কি কখন হয়? মধু আমাদের ভালবাসে, সে কি কখনো আমাদের জিনিস চুরি করিতে পারে?" ইহার পর সকলেই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, মধু ভিন্ন এরকম চুরি আর কেহই করিতে পারে না। তিনি মধুকে চোর মনে করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিলেন না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, জিনিষটি চুরি হয় নাই; সেটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল। তখন সেই ধার্ম্মিক পুরুষ ভৃত্যের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মধু, তুমি আমাকে মাপ কর, আমি তোমার কাছে বড় অপরাধ করিয়াছি; তুমি নির্দ্দোষ ভালমানুষ, আর আমি কি না তোমাকে চোর মনে করিয়াছি!" যে মানুষ ভৃত্যের নিকট করযোড়ে ক্ষমা চাহিতে পারে, তাঁহার সরলতা, সত্যানুরাগ ও বিনয় যে কত, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে।

লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয় যে কি পবিত্র ছিল, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হইবে। সেই জন্য তাঁহার সরল বিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তির কথা বলিয়াই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহার উপরই সমস্ত আশা ভরসা। এই সময় সেই সচ্চরিত্র যুবক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। গুণবতী কন্যা ইন্দুমতী সুশিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। তিনি ভ্রাতার সেবার জন্য স্কুল ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিলেন। সেবাপরায়ণা নারী ভ্রাতার রোগ নিজের শরীরে গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্যা কহিলেন,—"বাবা, বড় যন্ত্রণা!" ধার্ম্মিক পুরুষ কহিলেন,—"মা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে গ্রহণ করুন; তাহা হইলেই পিতার কোলে গিয়া তুমি শান্তি লাভ

করিতে পারিবে।" কন্যার মুমূর্ষু অবস্থায় কোন্ পিতা কন্যাকে সরল ও সহজভাবে এই রকম কথা বলিতে পারে? হায়, প্রিয় কন্যা ইন্দুমতী চলিয়া গেল! জননী "ইন্দুরে—মারে" বলিয়া কান্না আরম্ভ করিলেন। সরল বিশ্বাসী রামতনু পত্নীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিতে লাগিলেন—"কর কি? কর কি? ঈশ্বরের কন্যা ঈশ্বর লইয়া গিয়াছেন—ভালই করিয়াছেন; সেজন্য ক্রন্দন করিলে যে অপরাধ হইবে!" কি প্রবল বিশ্বাস! ঈশ্বরের প্রতি কি অটল নির্ভর!

এ স্থানে বিশ্বাসী পুরুষের সাধুতা বিষয়ে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি শৈশবকালে সঙ্গীদের কুপরামর্শে লোকের সামান্য একটি দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিলেন। সেজন্য ষাটবৎসর বয়সের সময়ও অনুতাপ করিতেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের ভক্তির কথা আর কি বলিব? ঈশ্বরের নাম শুনিলে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। একবার সূর্য্যোদয়ের সময় তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা হইবে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিবেন। নিজেই মেয়েদের একটি স্থানে বসাইয়া কহিলেন—"মা, তোমরা গান কর, তোমাদের মুখে ঈশ্বরের নাম বড় মিষ্টি লাগে।" মেয়েরা গান করিলেন; শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনান্তে ভক্ত রামতনুর দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, লাহিড়ী মহাশয় ভাবাবেশে আর বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। গলবস্ত্র হইয়া দুখানি হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার নয়নজল শ্বেতশ্মশ্রু ভিজাইয়া নীচে টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে।

ভক্ত রামতনুর পঁচাশি বৎসর বয়সের সময় মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঋষি ও ভক্তের মিলনে সেদিন দর্শকেরা অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর সাধু রামতনু ১৮৯৮ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে ইহলোক হইতে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার জন্য দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই রকম সাধুপুরুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশও ধন্য।*

শ্রীঅমৃতলালগুপ্ত।

মুক্ত বায়ুর ব্যবহার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রুদ্ধ গৃহে বহু ব্যক্তির একত্রে অবস্থান

বায়ু কি প্রকারে দূষিত হয় ও কিরূপে তাহা রোগ উৎপাদন করে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যে সকল কারণে আমাদের দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে আসিতে হয় তন্মধ্যে সম্যক্ বায়ুচলাচলবিহীন গৃহমধ্যে অবস্থানই প্রধান কারণ। এরূপ গৃহে একজন অধিককাল থাকিলেই যখন স্বাস্থ্যহানি ঘটে তখন বহু ব্যক্তি একত্রে অবস্থান করায় যে কিরূপ বিষময় ফল ফলে তাহা সহজেই অনুমেয়। সাধারণের এসম্বন্ধে অজ্ঞতা এতই অধিক যে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিলাম।

থিয়েটার, বিদ্যালয়, সভাগৃহ প্রভৃতি স্থানেই সাধারণতঃ বহুব্যক্তি একত্রিত হইয়া থাকেন। প্রায়ই এই সকল স্থানে বায়ুচলাচলের যথেষ্ট সুবিধা থাকে না। অল্পকাল মধ্যেই এরূপ স্থানের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্বাসের সহিত যথেষ্ট জলীয় বাষ্প নির্গত হওয়ায় বায়ু আর্দ্র হইয়া উঠে; এজন্য ঘর্ম্মোদ্গমও অধিক হইয়া থাকে এবং ইহাতেও বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। শরীরের উত্তাপে ক্রমশঃ এই আর্দ্র বায়ু গরম হইলে সাতিশয় অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। রাত্রিকালে বহুসংখ্যক গ্যাস বা কেরোসিনের আলো থাকিলে তদ্দারাও বায়ু উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক আলোক ব্যতীত অন্য সকল প্রকার আলোকেই বায়ুতে কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও বায়ু ধূমযুক্ত হয়। এই আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ু নিশ্বাস

---

* লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

প্রশ্বাসের দ্বারা ও ঘর্ম্মসিক্ত বস্ত্রাদির সংস্পর্শে আসিয়া দুর্গন্ধময় হয়। যাঁহারা গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা এই দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু বাহিরের নির্ম্মল বায়ু হইতে ঈদৃশ বায়ুতে প্রবেশ করিলে দুর্গন্ধ সহজেই অনুভূত হয়। কথা কহিবার সময়, হাঁচিবার সময় ও কাসিলে মুখলালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয় ও বায়ুকে আরও দুর্গন্ধময় ও দূষিত করিয়া তুলে। যক্ষ্মা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগবীজাণুও এইরূপে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং পদোত্থিত ধূলির সহিত গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। দূষিত বায়ু উষ্ণ ও লঘু বলিয়া গৃহের ছাদের দিকে উঠিতে থাকে। এই কারণে এরূপ গৃহের মেজের নিকটস্থ নীচের বায়ু গৃহের উপরিভাগের বায়ু অপেক্ষা বিশুদ্ধ। থিয়েটারে যাঁহারা উচ্চ গ্যালারিতে বসেন দূষিত বায়ু তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। থিয়েটার দেখিলেই যে শরীর খারাপ হয় তাহা কেবল রাত্রি জাগরণের ফল নহে দূষিত বায়ু সেবনও ইহার অন্যতম কারণ। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পর হইতে কোন কোন বালকের স্বাস্থ্যভগ্ন হইতে দেখা যায়; অনেক সময়ই দূষিত বায়ুপূর্ণ স্কুল গৃহই ইহার কারণ।

দূষিত বায়ু সেবনের ফলে শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, অনিদ্রা ও সময়ে সময়ে উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইতে দেখা যায়। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা প্রভৃতি যাবতীয় ফুস্‌ফুস্‌ সংক্রান্ত রোগের আক্রমণের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

আমাদের সাধারণ বাস প্রণালী, দূষিত বায়ু সেবনের অভ্যাস ও কতকগুলি কুসংস্কার

সাধারণতঃ আমাদের বাস গৃহে বায়ু চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকিলেও কতকগুলি প্রচলিত কুসংস্কার বশতঃ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই বিশুদ্ধ বায়ু উপভোগ করিতে পান। আমাদের দেশ উষ্ণ প্রধান হইলেও 'ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়টা আমাদের অত্যন্ত অধিক। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই আঁতুড় ঘরের দরজা জানালা এমন কি দরজার ফাঁক ও নর্দ্দমা পর্য্যন্ত অতি সাবধানে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তদুপরি গ্রীষ্ম কালেও অনেকেই আঁতুড় ঘরে আগুন রাখেন। এরূপ রুদ্ধগৃহে অবস্থান শিশু ও প্রসূতির স্বাস্থ্যের পক্ষে কখনই অনুকূল হইতে পারে না। শিশুকাল হইতেই দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ প্রথা অনিষ্টকর জানিয়াও আমরা সকল সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাহাই সয়," দূষিত বায়ু সেবন অভ্যস্ত থাকায় সকল সময় আমরা ইহার বিষময় ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে অহিফেনের ন্যায় বিষাক্ত দ্রব্যও নিরাপদে সেবন করা যাইতে পারে তথাপি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অহিফেন সেবন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। দূষিত বায়ুর পরিবর্ত্তে নির্ম্মল বায়ু সেবন অভ্যাস করিলে আমাদের যে স্বাস্থ্যোন্নতি হয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা অনেকেই রাত্রিকালের মুক্ত বায়ু শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি; এজন্য যাঁহারা দিবাভাগে নিঃসঙ্কোচে মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া থাকেন তাহারাও অনেকে রাত্রিকালে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করেন। এই ধারণা কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। ম্যালেরিয়া প্রধান দেশে রাত্রে মুক্ত বায়ুতে শয়ন করিলে কাহারও কাহারও জ্বর হইতে দেখা যায় একথা সত্য কিন্তু এ দোষ নৈশ বায়ুর নহে; ম্যালেরিয়া বীজাণুবাহী মশক দংশনই ইহার কারণ। বস্তুতঃ নৈশবায়ু দিবসের বায়ু অপেক্ষা বিশুদ্ধ। দরজা জানালা উন্মুক্ত রাখিয়া মশারির মধ্যে শয়ন করিলে মশকাদি দংশনের কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

অনেকেই মনে করেন জানালা উন্মুক্ত রাখিয়া শয়ন করিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হয়। গ্রীষ্মকালে এরূপ ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শীতকালেও নাক, মুখ খুলিয়া রাখিয়া গায়ে লেপ ঢাকা দিয়া শয়ন করিলে ঠাণ্ডা লাগিবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। আপাদ-মস্তক মুড়ি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদের বহুকাল হইতে বদ্ধ গৃহে শয়ন করা অভ্যাস

তাঁহাদের অল্পে অল্পে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। মনে রাখা উচিত কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কোন সময়েই বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে অপকার হয় না। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন প্রভৃতি সকলেরই নির্ম্মল বায়ুতে শয়ন করা কর্ত্তব্য।

"নিদ্রিতাবস্থায় গায়ে বাতাস লাগিলে অসুখ হয়" এই কুসংস্কারও অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত-ভাবে শরীর গঠিত হইলে সামান্য বায়ুতে বা জলে শরীরের কোনই অপকার হয় না। কি জাগ্রতাবস্থায় কি নিদ্রিতাবস্থায় গায়ে বাতাস লাগিলে শরীরের উপকারই হইয়া থাকে। ত্বক্ হইতে শরীরের অনেক ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়। বাতাসের ভয়ে দিবারাত্র গাত্র আবৃত রাখিলে ত্বকের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় না। সভ্যতার খাতিরে ও কার্য্যাদির জন্য আমাদের অনেককেই দিবাভাগে জামা জুতা আঁটিয়া থাকিতে হয় এজন্য কেবলমাত্র রাত্রিকালেই গাত্রে বাতাস লাগাইবার সুবিধা পাওয়া যায়। এ সুযোগ কাহারই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিশুদ্ধ বায়ু—দূষিত বায়ু কিরূপে বিশুদ্ধ হয়

যে বায়ুতে পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহ বিদ্যমান নাই, তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু বলা যাইতে পারে। সহরের বায়ু কখনই একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। ইহাতে প্রায়ই ধূম, ধূলিকণা ও অল্পবিস্তর বীজাণু বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। সমুদ্র ও উচ্চ পর্ব্বত-শিখরস্থ বায়ুতে ধূলিকণা, বীজাণু বা অন্য কোন প্রকার দোষ নাই। এই সকল স্থানের বায়ু সম্পূর্ণ নির্ম্মল। নির্ম্মল বায়ুতে ওজোন নামক এক প্রকার গ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। অক্সিজেন রূপান্তরিত হইয়াই ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়। চিকিৎসকেরা বলেন, ওজোন গ্যাসযুক্ত বায়ুতে অবস্থান করিলে যক্ষ্মা রোগের উপশম হয়। পল্লীগ্রামের বায়ুতেও সামান্য ওজোন আছে কিন্তু সহরের বায়ুতে ইহার লেশমাত্রও নাই। বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহা সামান্য কারণেই দূষিত হয় কিন্তু মুক্তবায়ু সহজে কলুষিত হয় না। আবাস ভূমির সন্নিহিত বায়ু অপেক্ষা জনশূন্য প্রান্তরের বায়ু অধিক নির্ম্মল।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মুক্তবায়ু দূষিত হইলেও সহজেই তাহা পুনরায় নির্ম্মল হয়। নানারূপ কারণে বায়ুমণ্ডল নিয়তই দূষিত হইতেছে কিন্তু প্রকৃতির আশ্চর্য্য নিয়মে এই দোষ অধিককাল স্থায়ী হয় না। মনুষ্য ও পশ্বাদির প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড নামক যে বিষাক্ত বায়ু পরিত্যক্ত হইতেছে তাহাই আবার উদ্ভিদ্‌গণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে। সূর্য্যালোকের সাহায্যে বৃক্ষপত্র কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করে; ইহার অঙ্গার (Carbon) ভাগ খাদ্যরূপে গৃহীত হয় ও অক্সিজেন ভাগ পরিত্যক্ত হইয়া বায়ুর অক্সিজেনের অভাব পূরণ করে। বায়ুস্থিত ভাসমান পদার্থ ও ধূলিকণা সমূহ ক্রমে ক্রমে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বায়ুকে নির্ম্মল করে। বৃষ্টির দ্বারাও বায়ু পরিষ্কৃত ও ধূলিশূন্য হয়। সূর্য্যালোক বায়ুর অনেক দোষ নষ্ট করে; যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার বীজাণুই সূর্য্যালোকে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বায়ু নিয়তই সঞ্চরণশীল এজন্য কোন স্থানের বায়ু দূষিত হইলেও কিয়ৎকাল মধ্যেই তাহা স্থানান্তরিত হয় ও নির্ম্মল বায়ু আসিয়া সেই স্থান অধিকার করে। ঝড়ের সময় এই প্রকারে সমস্ত সহরের বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

বায়ুর আর্দ্রতা, উষ্ণতা ও চাপ

স্থান ও ঋতুভেদে বায়ুতে জলীয় বাষ্প ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়। খোলা পাত্রে জল ঢালিয়া রাখিলে তাহা অল্পকাল মধ্যেই শুকাইয়া যায়। এই জল বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিলিত হয়। গ্রীষ্মকালে ভিজা কাপড় শীঘ্রই শুষ্ক হয় কিন্তু বর্ষাকালে শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে; ইহার কারণ এই যে বর্ষাকালের বায়ু জলীয় বাষ্পে পূর্ণ বা অনুষিক্ত থাকায় তাহা আর জল শোষণ করিতে পারে না। বায়ু যতই উষ্ণ হইবে ইহার জল শোষণের ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ণ মাত্রায় অনুষিক্ত শীতল বায়ু অপেক্ষা তদ্রূপ উষ্ণ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশী। জলীয় বাষ্পে অনুষিক্ত বায়ু কোন কারণে শীতল হইলে বায়ুর অদৃশ্য জলীয় ভাগ কুয়াশারূপে পৃথক হইয়া যায়। এইরূপে মেঘের উৎপত্তি হয়।

শীতল শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা শীতল আর্দ্র বায়ু আমাদের অধিক ঠাণ্ডা বোধ হয়। এইরূপ গরম আর্দ্র বায়ুও আমাদের অধিক কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকিলে বায়ু ও শরীরের মধ্যে তাপের আদান প্রদান অধিক মাত্রায় ঘটিয়া থাকে। এই জন্য শীতকালে হঠাৎ বৃষ্টি হইলে অর্থাৎ বায়ু আর্দ্র হইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা। বায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র হইলে শরীরে জড়তা ও আলস্য বোধ হয়। এরূপ বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলেও শরীর হইতে যথেষ্ট তাপ নির্গত হওয়ায় সর্দ্দি হইতে পারে। আর্দ্র বায়ুতে গাত্র সর্ব্বদাই ঘর্ম্মসিক্ত থাকে ও প্রস্রাব অধিক মাত্রায় হয়। শুষ্ক বায়ুতে প্রস্রাবের মাত্রা হ্রাস হয় ও যদিও ঘর্ম্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তথাপি গাত্র শুষ্ক থাকে। শুষ্ক বায়ুতে শরীর হইতে প্রভূত পরিমাণে জল নির্গত হইয়া যাওয়ায় কোষ্ঠ কাঠিন্য হইতে পারে।

পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বঙ্গদেশের বায়ু অধিক আর্দ্র, এ কারণে বঙ্গদেশে সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যাধি অধিক হইতে দেখা যায়।

শরীরকে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করাইলে বায়ুর আর্দ্রতা হেতু শরীরে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না এবং সর্দ্দি প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনাও কমিয়া যায়। ঋতুভেদে ও স্থান ভেদে বায়ুর তাপের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শীতল বায়ুতে চর্ম্মস্থ রক্তবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী সমূহ সঙ্কুচিত হয় ও রক্ত অধিক পরিমাণে শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিতে যাইয়া উপস্থিত হয়। উষ্ণ বায়ুতে ইহার বিপরীত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে আমাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত গরমে আলস্য বোধ হয় ও নিদ্রা আইসে। শীতকালে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বায়ুর তাপ অত্যধিক হইলে সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। অতিরিক্ত শীতেও মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে। শীতকালে প্রস্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

বায়ুর যে চাপ বা ভার আছে, সে কথা আমরা অনেকেই মনে করি না। একটী সহজ পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই চাপের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটী গেলাস জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে একখণ্ড কাগজ চাপা দাও। কাগজের উপর হাত দিয়া গেলাস আস্তে আস্তে উল্টাইয়া হাত টানিয়া লও। কাগজ গেলাসের মুখে লাগিয়া থাকিবে এবং গেলাসের জল পড়িবে না। এস্থলে বায়ু কাগজের উপর চাপিয়া আছে বলিয়াই জল পড়িতে পায় না। জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে আমরা যেমন জলের কোনরূপ ভার বা চাপ জানিতে পারি না; সেইরূপ বায়ু-সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকার জন্য আমরা বায়ুরও কোনরূপ চাপ অনুভব করিতে পারি না। ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর চাপ মাপা যাইতে পারে।

যত উচ্চে উঠা যাইবে বায়ুমণ্ডলের চাপও ততই হ্রাস হইবে। পর্ব্বত শিখরস্থ বায়ুর চাপ সমতল ক্ষেত্রের বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক কম। বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম হইলে আমাদের কতকগুলি শারীরিক কষ্ট উপস্থিত হয়। এইজন্য বেলুনে চড়িলে বা উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে উঠিলে মাথাঘোরা, গা-বমি, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ, হাঁপানি, নাক হইতে রক্তপড়া ইত্যাদি নানাপ্রকার অসুস্থতা অনুভূত হইয়া থাকে। বায়ুর চাপের উপরে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা কতক পরিমাণে নির্ভর করে; উচ্চ স্থানে বায়ুর চাপ কম, এজন্য শরীরের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবসমূহ লক্ষিত হয়। পর্ব্বত-শিখরে বাস করা অভ্যস্ত হইলে এই সকল কষ্ট বোধ হয় না; কারণ উচ্চ স্থানে বাস করিলে কিছুদিনের মধ্যে রক্তের লাল কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণের সুবিধা হইয়া থাকে। পর্ব্বত শিখরে বাস করা অভ্যস্ত হইলে বক্ষের পরিধি বৃদ্ধি পায় ও নিশ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয়।

মুক্তবায়ু সেবন পদ্ধতি

সহরের বায়ু অপেক্ষা পল্লীগ্রাম বা স্বাস্থ্যকর স্থান-সমূহের বায়ু যে অধিক নির্ম্মল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই এজন্য রোগীর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য সহর পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু নানা কারণে অনেকে

সহর ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। এরূপ স্থলে সহরের মধ্যে থাকিয়াও কিরূপে বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইতে পারে তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু কেবল যে রোগীরই আবশ্যক তাহা নহে, সুস্থব্যক্তির পক্ষেও ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়াও অনেকে ঘরের দরজা জানালা রুদ্ধ করিয়াই সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন; বলা বাহুল্য ইহাতে শরীরের কোনই উপকার হয় না। রৌদ্র ও বৃষ্টিতে কষ্ট না পাইয়াও বিনা ব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে কিরূপে বিশুদ্ধ বায়ু উপভোগ করা যাইতে পারে আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিলাম

শয়নগৃহের বায়ু কিরূপে বিশুদ্ধ রাখা যায়:— নিদ্রাকালে আমাদের দিবসের ক্লান্তি দূর হইয়া শরীরে নব শক্তি উৎপন্ন হয়। এই সময়েই বিশুদ্ধবায়ুর প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের শয়নগৃহের অবস্থা অতীব শোচনীয়। স্থানাভাবের জন্য শয়নগৃহ তৈজসপত্রাদি নানাবিধ আসবাবে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে এজন্য গৃহমধ্যে বায়ু চলাচলের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে গৃহমধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ততঃ ১০০০ ঘনফুট বায়ু আবশ্যক এবং ঘণ্টায় ৩ বার এই বায়ুর পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত অর্থাৎ এক ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বায়ু প্রত্যেক ব্যক্তি কলুষিত করে। বায়ু ঘণ্টায় আরও অধিকবার বদলাইতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প বায়ুতে প্রত্যেক ব্যক্তির চলিতে পারে। কিন্তু ঘণ্টায় ৩ বারের অধিক বদলাইলে বায়ুর প্রবাহ অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যনীতির এই নিয়ম মানিয়া চলিলে ১০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ একটী ঘরে কেবলমাত্র একব্যক্তির শয়নকর কর্ত্তব্য। ঘরে কোনরূপ আসবাব থাকিলে এক ব্যক্তির পক্ষেও এরূপ ঘর উপযুক্ত নহে। সাধারণ গৃহস্থদিগের মধ্যে এরূপ ঘরে অন্ততঃ ৫।৬ জন শয়ন করেন এবং অধিকাংশ সময়ে গৃহের দরজা জানালা বন্ধ থাকে। এরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে বিচিত্র কি? দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুরবস্থা এইরূপ বা ইহা অপেক্ষাও অধিক, কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে তাঁহাদের মধ্যে এরূপ শয়নের জন্য স্বাস্থ্য নাশের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প।

দরিদ্র ব্যক্তিদিগের গৃহ সাধারণতঃ বাঁশের বেড়া, খড়, হোগলা ইত্যাদিদ্বারা গঠিত, এই সকল পদার্থের মধ্য দিয়া যথেষ্ট বায়ু চলাচল ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ চালের নীচে প্রায়ই ফাঁক থাকায় দূষিত বায়ু সহজেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে পারে। দরজা জানালার ফাঁক দিয়াও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিবার সুবিধা পায়। খড়ের বাড়ীর প্রচলিত জানালাগুলি যদি আরও বড় হইত তাহা হইলে এরূপ গৃহের আর কোনরূপ অসুবিধার কথা থাকিত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত বলিয়া গৃহের দেওয়াল ও ছাদের মধ্য দিয়া অতি সামান্য বায়ু চলাচল করিতে পারে। বড়লোকের গৃহে খড়খড়ির ও সাশি আঁটার জন্য একেবারে বায়ু চলাচল হয় না। গৃহমধ্যস্থ লোকেরা যেন একটী বড় আলমারিতে বাস করেন; এই জন্য তাহাদের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রায়ই মুক্ত বায়ুতে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় এজন্য রাত্রে দূষিত বায়ু সেবন করিলেও তাহার ততটা ক্ষতি হয় না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের চাকরীই প্রধান উপজীবিকা। তাহাদিগকে অধিকাংশ সময়ই বায়ু চলাচলহীন অফিস গৃহে কাটাইতে হয়। দিবারাত্রের মধ্যে অতি অল্পক্ষণই তাঁহারা মুক্ত বায়ু উপভোগ করিতে পান।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ গৃহ স্বাস্থ্যনীতির নিয়মানুযায়ী নির্ম্মিত নহে, দরজা, জানালা ঋজু ঋজু ভাবে না থাকিলে ভালরূপ বায়ু চলাচল হয় না। অনেক গৃহেই এক দরজা ব্যতীত বায়ু প্রবেশের আর দ্বিতীয় পথ নাই, অতি অল্পসংখ্যক গৃহেই একটীর অধিক জানালা দেখিতে পাওয়া যায়।

উপায় থাকিলে শয়নগৃহে কোন দ্রব্যই রাখিবে না। সমস্ত দরজা জানালা সকল ঋতুতেই খুলিয়া রাখা উচিত, চোরের ভয় থাকিলে দরজা খোলা চলে না; এরূপ স্থলে দরজায় লোহার জাল অথবা শিকের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, দিবসে ইহা খোলা থাকিবে এবং রাত্রে চাবি বন্ধ থাকিবে। গৃহের কিরূপ স্থলে বিছানা রাখা

উচিত তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ঝড় বৃষ্টি না লাগে অথচ বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব না হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাম্‌না সাম্‌নি দুটী জানালা খোলা থাকিলেও গৃহের কোণের বায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত বিছানার স্থান পরিবর্ত্তনও আবশ্যক হইতে পারে।

গৃহ মধ্যে রৌদ্র, বৃষ্টি নিবারণের উপায়

অনেক সময় রোগীকে দিবসেও শয়ন গৃহে থাকিতে হয়, এরূপস্থলে রৌদ্রের জন্য মুক্ত বায়ু সেবনের অসুবিধা হইতে পারে। কি কি উপায়ে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণ হইতে পারে নিম্নে তাহা বলা গেল। জানালা বন্ধ করিয়া খড়খড়ি তুলিয়া রাখিলে রৌদ্র বৃষ্টি আসিতে পারে না, এবং বায়ু চলাচলেরও অসুবিধা হয় না। পাতলা কাপড়ের পর্দ্দা দ্বারাও রৌদ্র নিবারণ হইতে পারে, জানালায় চিক থাকিলে অল্প স্বল্প বৃষ্টিও নিবারণ হয়। স্বল্প ব্যয়ে Folding Screen (যে পর্দ্দা ভাঁজ করা যায়) তৈয়ারী করা যাইতে পারে, ইহাতে রৌদ্র ও বৃষ্টি দুই ই নিবারিত হয়।

বারান্দা, দরদালান—প্রভৃতি স্থানও মুক্তবায়ু সেবন করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরূপ স্থানে শয়ন করিবারও বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। শীত ও বর্ষাকালে আবশ্যক মত দুই একটী পরদা দেওয়া যাইতে পারে। বারান্দায় শয়ন করিবার উদ্দেশ্যই মুক্ত বায়ু সেবন করা, তজ্জন্য পরদা লাগাইবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বায়ু চলাচল বন্ধ না হয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের গৃহে যেরূপ স্থানাভাব তাহাতে বারান্দা প্রভৃতি স্থান শয়নের জন্য ব্যবহৃত হইলে যে বিশেষ সুবিধা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ছাদে শয়নের ব্যবস্থা—বঙ্গদেশে অধিকাংশ ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহেরই ছাদ আছে। ছাদে অনায়াসেই মুক্ত বায়ু সেবনের ও শয়নের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে কেহ কেহ গ্রীষ্মকালে ছাদে শয়ন করেন কিন্তু সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে অনাবৃত স্থানে শয়ন করিলে অসুখ হয়। অভ্যস্ত না হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইতে পারে, এ কথা সত্য, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই যে কেহ ক্রমে ক্রমে অনাবৃত স্থানে শয়নে অভ্যস্ত হইতে পারেন এবং ইহাতে শরীরের উন্নতি ব্যতীত কখনই স্বাস্থ্যহানি হয় না। অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে হইলে গাত্র আবৃত রাখা আবশ্যক এবং মশক দংশন ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মশারি ব্যবহার করা উচিত। শীত ও বর্ষাকালে অনাবৃত ছাদে শয়ন করা চলে না। অতি সামান্য খরচেই ছাদের উপর খড়, কাঠ বা হোগলা ও দরমা দ্বারা ঘর বাঁধা যাইতে পারে। এক ব্যক্তির পক্ষে ঘর ১২´ ফুট × ১২´ ফুট হওয়া উচিত। দুই ব্যক্তির পক্ষে ১৬´×১৬´ ফুট। এরূপ গৃহে বৎসরের সকল ঋতুতেই শয়ন করিয়া নির্ম্মল বায়ু উপভোগ করা যাইতে পারে। বিলাতের বহুস্থানে এরূপ গৃহে যক্ষ্মা রোগীকে রাখিয়া যথেষ্ট সুফল পাইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশেও এরূপ গৃহের বহুল প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

মুক্তস্থানে শয়ন—আকাশের অবস্থা ভাল থাকিলে মাঠের মাঝখানে খাট পাতিয়া মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করা যাইতে পারে। সকল ঋতুতে শয়নের জন্য হোগলা প্রভৃতির ঘর প্রস্তত করাও বিশেষ ব্যয় সাধ্য বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। এরূপ ঘর নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থান নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

স্যাঁৎস্যাঁতে বা দুর্গন্ধময় স্থানে এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। ঈষদুচ্চ শুষ্ক স্থানে এরূপ গৃহ নির্ম্মাণই প্রশস্ত। সর্প বা অন্যরূপ হিংস্র জন্তু যাহাতে গৃহ মধ্যে না আসিতে পারে তজ্জন্য গৃহের চতুর্দ্দিকে লোহার জালের বেড়া দিলে ভাল হয়। বিলাতে মুক্ত স্থানে শয়নের জন্য Revolving shelter নামক একপ্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ বিক্রয় হয়, এই গৃহ মধ্যে বসিয়া ইহাকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরান যাইতে পারে। কোন দিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকিলে গৃহের সম্মুখভাগ তাহার বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইলে কোনই অসুবিধা থাকে না।

যাঁহাদের উপায় বা অবকাশ আছে বা যাঁহারা স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছেন, তাঁহাদের দিবসের অধিকাংশ সময়ই গৃহ মধ্যে না থাকিয়া মুক্ত বায়ুতে থাকা উচিত।

মুক্তবায়ু সেবনের উপকারিতা ও ইহাতে কি কি রোগ আরোগ্য হয়

সুস্থ ব্যক্তির বিশুদ্ধ বায়ুর যেরূপ আবশ্যকতা, অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাদির ক্রিয়া যত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে ব্যাধি তত শীঘ্র আরোগ্য হইবে। বিশুদ্ধ বায়ু ব্যতীত শরীরের যন্ত্রাদি উপযুক্তভাবে কার্য্য করিতে পারে না। রোগীর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু যে ঔষধস্বরূপ আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। রোগ হইলে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে প্রথমেই আমরা গৃহের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করি; তদুপরি রোগীর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি রোগীর নিকট একত্রে হওয়ায় গৃহের বায়ু বিষতুল্য হইয়া পড়ে। এরূপ বায়ু সেবন রোগীর পক্ষে যে কতদূর অনিষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্বাস যন্ত্রাদির পীড়ায় ফুসফুসের পূর্ণমাত্রায় অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা না থাকায় বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্দ্দি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া হইলেই আমরা দরজা জানালা বন্ধ করিবার জন্য সমধিক উৎসুক হইয়া পড়ি।

অনেক ধনিগৃহে বালকবালিকাদিগকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে দিবারাত্র জামা, জুতা, মোজা, কম্ফর্টার ইত্যাদি পরাইয়া রাখা হয়। এই সকল বালকবালিকাদিগের শরীরে কখনও মুক্তবায়ু লাগিতে পায় না। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে লালিত পালিত হইয়া সামান্য কারণেই ইহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং পাছে অসুখ আরও বৃদ্ধি পায় এই ভয়ে মাতা পিতা দরজা জানালা বন্ধ করিতে অধিক যত্নবান্ হন। অপর পক্ষে কৃষক-সন্তান বিনা আবরণে সমস্ত দিবস মাঠে উন্মুক্ত বায়ুতে ঘুরিয়া বেড়ায়; উপযুক্ত বস্ত্রাদির অভাবে শীতকালে তাহাকে যথেষ্ট কষ্টও পাইতে হয়, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত বালকবালিকাদের স্বাস্থ্যের তুলনা হয় না।

মুক্তবায়ুতে যাহাদের সদা সর্ব্বদা অবস্থান করিতে হয় তাহাদের মধ্যে সর্দ্দি, কাসি, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ব্যাধি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অফিসের কেরাণীদের সম্যক্ বায়ু চলাচলহীন কক্ষে একভাবে বসিয়া অনেকক্ষণ কার্য্য করিতে হয়; পরে, গৃহে আসিয়াও কুসংস্কার বা ছেলে মেয়ের ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করেন। এজন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিসমূহ অফিসের কেরাণীদের মধ্যেই অধিক দেখা যায়।

মুক্তবায়ু সেবনের অভ্যাস দ্বারা কি কি রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল।

সর্দ্দি—যাঁহাদের "সর্দ্দির ধাত" বা অল্পেতেই সর্দ্দি হয়, তাঁহাদের মুক্তবায়ু সেবন অভ্যাসে বিশেষ ফললাভ হইতে দেখা যায়। রুদ্ধগৃহে শয়ন অভ্যস্ত থাকিলে ক্রমে ক্রমে মুক্ত বায়ু সেবন অভ্যাস করা উচিত। শিশুকাল হইতে এই অভ্যাস থাকিলে সর্দ্দিতে কখনও কষ্ট পাইতে হয় না। বালক বালিকাদিগকে শিশুকাল হইতেই মধ্যে মধ্যে খালি গায়ে থাকিতে দেওয়া উচিত। শীতল বায়ু লাগা অভ্যস্ত হইলে চর্ম্মস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীসমূহ সুচারুরূপে নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে এবং সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগে না।

কাসি—কাসি পুরাতন হইলে ঔষধে তাহা সহজে আরোগ্য হয় না; এরূপ অবস্থায় মুক্তবায়ু সেবনে অনেক সময় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কাসি পুরাতন হইলে যক্ষ্মা রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা আছে; মুক্ত বায়ু সেবনে এই আশঙ্কা দূর হয়। আর্দ্র বায়ু অপেক্ষা শুষ্ক বায়ুতে পুরাতন কাসি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

নিউমোনিয়া—এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে এমন কোন ঔষধই আমাদের জানা নাই। ইহা আপনা হইতেই আরোগ্য হয়। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে বিশুদ্ধ বায়ুই নিউমোনিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। যে নিউমোনিয়া-রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং সুনিদ্রা হইতেছে না, তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনিলে রোগের উপশম হইতে দেখা যায়। মুক্ত বায়ু সেবন অভ্যাসে নিউমোনিয়ার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

যক্ষ্মা—সাধারণের ধারণা, যক্ষ্মা শিবের অসাধ্য ব্যাধি। এই ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রথমাবস্থায় রোগ নির্ণীত হইলে ও উপযুক্তভাবে চিকিৎসিত হইলে যক্ষ্মা রোগ অনেক সময়েই আরোগ্য হয়। যে যে চিকিৎসায় যক্ষ্মা রোগে সুফল পাওয়া যায় তন্মধ্যে মুক্ত বায়ু সেবন অন্যতম। প্রথমাবস্থায় মুক্তবায়ুতে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে প্রায় ছয় মাসে রোগ আরোগ্য হয়। দ্বিতীয়াবস্থায় ১॥ হইতে ২ বৎসর কাল সময় লাগে, এবং তৃতীয়াবস্থায় রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে। ৫।৬ বৎসর চিকিৎসার পর তৃতীয়াবস্থা হইতেও ২১ টি রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। যে বায়ু একবার নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইয়াছে, যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে তাহার সামান্য ভাগও পুনর্ব্বার নিশ্বাস-রূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আরোগ্যলাভ করিতে হইলে যক্ষ্মা-রোগীকে কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকল ঋতুতেই দিবা রাত্রি মুক্তবায়ুতে থাকিতে হইবে। ইহাতে রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতির জন্য যে সকল অসুবিধা আছে ও কি উপায়ে তাহা নিবারণ করিতে পারা যায়, আমরা এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যক্ষ্মা-রোগীকে মুক্তবায়ুতে রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর জ্বর ও কাসি কমিয়া যায়; রাত্রে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া বন্ধ হয়। রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লক্ষিত হয়। রোগের অবস্থা বুঝিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম বা ক্রমিক ব্যায়াম, টিউবারকুলিন চিকিৎসা ও উপযুক্ত খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসার ভার কোন বিচক্ষণ ও উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।

রক্তাল্পতা—এই রোগ নানা কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময় কেবল মাত্র বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহাতে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এই দুই দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ। মুক্তবায়ু সেবনে যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং শরীরের সমস্ত যন্ত্রেই বলাধান হইয়া থাকে। এইরূপে ভুক্ত দ্রব্য সহজেই জীর্ণ হয় ও অন্ত্রপেশী সমূহের শক্তিসঞ্চয় হওয়াতে মল নিঃসরণের সহায়তা হয়।

পুরাতন জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধি—অনেক দিন পর্য্যন্ত যাঁহারা রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের বায়ু পরিবর্ত্তনে সময়ে সময়ে বিশেষ ফল লাভ হয়। বিশুদ্ধ বায়ু ও স্বাস্থ্যকর স্থানের গুণেই এরূপ উপকার হইয়া থাকে।

মুক্তবায়ুতে শিশু-বিদ্যালয়

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিদ্যালয়-গৃহের বদ্ধ বায়ুতে থাকার জন্য অনেক বালকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক স্থানে মুক্তবায়ুতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে আটচালা বা বৃক্ষতলে গুরু মহাশয়ের যে পাঠশালা বসিত স্বাস্থ্যের হিসাবে তাহা এখনকার বিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। শিশুকালে পুনঃপুনঃ স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে ভবিষ্য জীবনে নীরোগ অবস্থায় কাল কাটান দুরূহ; এজন্য শৈশবাবস্থায় যাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয় আমাদের সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বহু ছাত্র এক স্থানে একত্র হওয়ার দোষ অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে সন্দেহ নাই; তথাপি যতদিন না স্কুল-গৃহের উন্নতি হইতেছে ততদিন ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী।

বড় সহর ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র মুক্ত স্থানের অভাব নাই। শিক্ষকেরা যদি এই সকল স্থানে বৃক্ষতলে ছাত্রদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহাদের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। অবশ্য ঝড় বৃষ্টির সময় মুক্ত স্থানে পড়ান সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় ছাত্রদিগকে স্কুল-গৃহেই বসাইতে হইবে। বিদ্যালয়ের সন্নিকটে আটচালা বাঁধিতে পারিলে মুক্ত বায়ুতে পড়ানের আর কোনই অসুবিধা থাকিবে না। বিশেষ প্রয়োজনের সময় ছাত্রেরা কেবলমাত্র স্কুল-গৃহে বসিবে। এরূপ আটচালার খরচাও অধিক নহে।

বালক বালিকাদিগকে শিশুকাল হইতে মুক্ত বায়ু সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। শিশুকালে আমাদের মনে যে ধারণা জন্মে সমগ্র ভবিষ্য জীবনে তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। যে সকল কাজ মুক্ত বায়ুতে হইতে পারে তাহার কোনটাই বালককে গৃহমধ্যে করিতে দেওয়া উচিত নহে। বালক যাহাতে দিবসের অধিকাংশ সময়ই মুক্ত বায়ুতে থাকিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ খাদ্য অধিক মাত্রায় সেবনে অসুখ হয়, বিশুদ্ধ জলও অধিক মাত্রায় পান করিলে পীড়া হয় কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে উপকার ব্যতীত কখনই অপকার হয় না।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

আহুতি

১

শ্রাবণের শেষ ভাগ; ঘোর ঘনঘটায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। প্রায় সারাদিন বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে; প্রকৃতি দেবী কাঁদিতেছে কি? বঙ্গে আজ ঘোর ছুর্দ্দিন; অন্নাভাবে চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে; প্রকৃতি কাঁদিবে না কেন? ক্ষুধার জ্বালায় কৃষক হাল বেচিতেছে,—পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা পরিত্যাগ করিতেছে, দরিদ্র গৃহস্থ মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া চক্ষুর জলে অভিষিক্ত হইতেছে, প্রকৃতি কাঁদিবে না কেন?

আজ রবিবার। জানালার ধারে বসিয়া একটা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা এক খানা খাতা লইয়া অন্যমনে লিখিতেছিল। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বালিকার মুখখানি ঐ প্রকৃতি-রাণীর মতই বিষণ্ণ। চক্ষু দু'টি মাঝে মাঝে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছে। আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা মুক্তাফলের ন্যায় সেই শুভ্র অশ্রুবিন্দু মুছিয়া সে আবার খাতায় মনঃসংযোগ করিল।

নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া বর্ষার দুর্গম পথেও দু'একটি লোক চলাচল করিতেছে। দূর জলাশয়-হইতে ভেকের উৎকট চীৎকার শ্রুত হইতেছে।

বালিকা অনিন্দ্য সুন্দরী নহে। তথাপি কি এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে। তাহার আয়ত শান্ত চক্ষু দুইটির দিকে চাহিলে হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে।

তক্তপোষের পাশে—নীচে দাঁড়াইয়া একটি সুন্দর কুকুর লাঙ্গুল নাড়িতেছে। সেই শান্তস্বভাব প্রভুভক্ত প্রাণী, বালিকার ভূলুণ্ঠিত শুভ্র বস্ত্রাঞ্চল স্বীয় দশনাগ্র দ্বারা ঈষৎ আকর্ষণপূর্ব্বক ইঙ্গিতে যেন কি অভিযোগ জ্ঞাপন করিতেছে।

এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে দিদি ডাকিলেন—"লিলি, ও লিলি, ও লক্ষ্মীমণি!"

লিলি ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"কি দিদি!"

"তোর কি হয়েছে বোন্?" বলিতে বলিতে এক শ্যামাঙ্গিনী বিধবা যুবতী একটি ক্ষুদ্র শিশুর হাত ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

এই যুবতীর নাম শৈল। খোকা অবিলম্বে মাসিমার ক্রোড় হইতে খাতাখানা সরাইয়া আপনার সেই চিরাধিকৃত স্থানে যাইয়া বসিল। শৈল লিলির দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল, "লিলি, ওকি, কাঁদছিস্ যে? কেঁদে কেঁদে চোক দুটি ফুলে গিয়েছে!"

লিলি কথা কহিল না।

দিদি। রাঁধুনী বলেছে, লিলি আজ ভাত স্পর্শও করে নাই। ওপাড়া থেকে এসে কেবলই কাঁদ্‌ছে। কি হয়েছে, বল্ দেখি?

লিলি চুপ করিয়া রহিল। শৈল লিলিকে আপনার কোলের কাছে টানিয়া লইল। সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল—"এই বাদ্‌লার দিনে বৃষ্টিতে ভিজে ওপাড়া কেন গিয়াছিলি বোন্?"

লিলি। তখন বৃষ্টি ছিল না; খোতার অসুখ করেছে শুনে তাদের বাড়ী গিয়াছিলাম।

শৈল। রাস্তায় জল ছিল না?

লিলি। বৃষ্টির সামান্য জল মাত্র। খালে চমৎকার সাঁকো আছে।

শৈল। তারপর কি হয়েছে, বল্।

লিলি। তারপর শুন্‌লাম, ক্রমাগত অনাহারে থেকে থেকে ওর অসুখ করেছে। এখন আর বেচারী বিছানা থেকে উঠতে পারে না।

শৈল। ওরা তো খুব গরীব। এম্‌নি অবস্থা যে না খেয়ে থাক্‌তে হয়?

লিলি। কাল নাকি ওদের এক মুষ্টিও চাল ছিল না। সকলে মিলে একেবারে উপবাস করেছে। আজ কোথা হ'তে অল্প কিছু চাল ছেলে মেয়ে কয়টিকে রান্না করে দিয়েছে। শোভার বাবা ও মা আজও উপবাসী।

এই দরিদ্র পরিবারের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া দয়াবতী শৈলের চক্ষে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া কহিল, "শোভা চমৎকার মেয়ে। তোর সঙ্গেইতো স্কুলে পড়তো?"

লিলি। আজ মাসেক যাবৎ পড়া বন্ধ করেছে। শোভা আর বাঁচবে না, এমনি অবস্থা; দিদি, তুমি যদি ওদের খাবার উপায় না কর তবে আমি ভাত স্পর্শও করব না।

শৈল লিলিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আদর করিয়া কহিল, "লিলি, বোন্ আমার! তোর আর ওদের জন্য ভাবতে হবে না।"

সেই সময় একজন ঝি আসিয়া কহিল—"দিদি, বাবা তোমাকে ডেকেছেন। ছোট দিদির বিয়ের কথা বার্ত্তা বলবার জন্য একজন ভদ্রলোক এসেছেন।"

শৈল উঠিয়া ধীরে ধীরে পিতার নিকট চলিয়া গেল।

রমেশচন্দ্র বসু কায়স্থ সমাজের একজন প্রধান পরিচালক; বরপণ-নিবারণী সভার গণ্য মান্য সভ্য। যখন তিনি প্রশংসা-মুখরিত, করতালি ধ্বনিতে উদ্বোধিত সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বরপণের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হইতেন তখন সেই নানা অলঙ্কার রঞ্জিত বাক্যজাল, লোক-কোলাহলময়ী নগরী অতিক্রমপূর্ব্বক নিভৃত পল্লীসমূহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনাথ সম্প্রতি সসম্মানে বি, এস্-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। রমেশচন্দ্র পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া শ্বশুরের ব্যয়ে তাঁহাকে বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে উচ্চ হইতে উচ্চতর ডাক আরম্ভ হইল।

উপেন্দ্রনাথ সৌরভপূর্ণ পুষ্পগুচ্ছ আহরণপূর্ব্বক শ্বেত শতদলবাসিনী বাণীর চরণপদ্মে অঞ্জলি পূরিয়া অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সে বাসনা আজ কন্যার বাজারে রৌপ্যখণ্ড গণনায় পরিণত হইল।

তারাপদ দত্তের কন্যা লীলার সহিত উপেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিতে লাগিল।

তারাপদ বাবুর ধনমানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক সময় বিদ্বেষপরায়ণ নিষ্কর্ম্মা প্রতিবেশিগণের রসনা-প্রসাদে পদস্থ গৃহস্থের শূন্য লোহার সিন্ধুক সহসা ধনরত্নে পূর্ণ হইয়া যায় এবং পল্লী-পুর-রমণী-গণের অনুকম্পায় কাহারও এক সহস্র রৌপ্যমুদ্রা ত্রিশ সহস্রে পরিণত হয়। বিশেষতঃ লীলার বালিকাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের বিষয়ও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং পুষ্পসৌরভলুব্ধ ভৃঙ্গকুলের মত উপেন্দ্রের বন্ধুগণ তারাপদ বাবুর বাটিতে যাতায়াত আরম্ভ করিল।

তারাপদ বাবুর বিশ্বাস ছিল যে বরপণ-নিবারণী সভার সভ্য মহোদয় আপনার কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাহা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। অনেকের সমাজ-সংস্কার ব্রতই কার্য্যকালে এইরূপ পরিহাসে পরিণত হইতে দেখা যায়।

বাংলায় কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের অভাব নাই। সূতিকাগৃহে কন্যার চন্দ্রমুখ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবাহের আতঙ্ক পিতামাতার প্রাণে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে।

রমেশচন্দ্র তারাপদ বাবুর নিকট হইতে আট সহস্র টাকা গ্রহণ করিয়া লীলার সহিত উপেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

উপেন্দ্র আপনার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন জন্য একদিন স্বয়ং আসিয়া ভবিষ্যৎ শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিলেন। লীলা যে ইংরেজী ভাষায় একেবারেই অনভিজ্ঞা, ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

লীলা যবনিকার অন্তরাল হইতে ভাবী পতির মুখ একবার দেখিয়া লইল।

ইহার কয়েক দিন পর উপেন্দ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন।

৩

উপেন্দ্রনাথ গৌরবের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যথাসময়ে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পুত্র-বিচ্ছেদকাতর পিতামাতাকে এক দিনের জন্য দর্শন দিয়া তাঁহাদের অর্থসাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে তিনি নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন।

পুত্রবধূর মুখচন্দ্রমা দর্শন জন্য জনকজননী অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে নবীন ডাক্তার উপেন্দ্র কহিলেন যে, উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হইলে তিনি দারপরিগ্রহ করিবেন না।

নবঘন-বারি সম্পাতে মীনের হৃদয়ে যেমন আনন্দের সঞ্চার হয় তেমনই উপেন্দ্রের আগমন সংবাদ পাইয়া লীলার তরুণ হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপেন্দ্র তাহাদের আর কোন সংবাদই লইলেন না।

কোমল উর্ব্বর মৃত্তিকায় রোপিত বীজের ন্যায় লীলার কোমল সরস বালিকা-হৃদয়ে প্রেমের বীজ নিপতিত হইয়া সহজেই অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই স্বচ্ছ মানস-মুকুরে একখানি সুন্দর মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল তাহা দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

বাল্যে তাহার প্রতি অঙ্গে লাবণ্যের যে উন্মেষ দেখা গিয়াছিল তাহা আজ যেন উষার রাগরঞ্জিত অরবিন্দের ন্যায় দলে দলে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেক সময়ই তাহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ দেখা যাইত এবং বড় বড় চক্ষু দুইটী সহসা জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিত না। যেন সে আপনাতে আপনি মিশিয়া থাকিতেই চাহিত।

কয়েক মাস পরে প্রকাশ পাইল, উপেন্দ্র দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেই এই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পাছে রুষ্ট হইয়া পিতা অর্থ-সাহায্য বন্ধ করেন, এই ভয়ে কলিকাতা আসিয়া স্ত্রীকে এক খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজিকার বাটিতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ইংরেজ-মহিলাটি অধিক দিন স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সম্মত হইলেন না।

তারাপদ বাবু উপেন্দ্রের এই বিশ্বাসঘাতকতায় অতিশয় বিরক্তি ও মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিলেন। অনেকেই উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু উদারহৃদয় তারাপদ বাবু বলিলেন যে, "ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর গোলযোগ করিয়া দরকার নাই।"

তিনি লীলার জন্য একটি সৎপাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু লীলা কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। বঙ্গ-পল্লী-নিবাসিনী বালিকার হৃদয়-বল দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল।

পুত্রের অভাবনীয় ব্যবহারে রমেশচন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার মাসিক খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন।

পিতামাতার উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস, নিদারুণ মর্ম্মবেদনা উপেন্দ্রের মস্তকের উপর যে এক দুর্নিবার অভিশাপের সৃষ্টি করিল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে একটী সুন্দর বাটীতে নবীন ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ এবং তাহার পত্নী এমিলি বাস করিতেছেন।

উপেন্দ্র সাহেব হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চালচলন পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার সমস্তই সাহেবী। বাঙ্গালীর খাদ্য, বাঙ্গালীর বসন ভূষণ—বাঙ্গালীর বন্ধুতা এখন তাঁহার নিকট নিম্বপত্র হইতেও তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। জ্বর-রোগীর নিকট সুখাদ্য যেমন অরুচিকর, বাঙ্গালী পিতৃমাতৃ স্মৃতিও উপেন্দ্রের নিকট তেমন

অরুচিকর হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং দেশীয় আত্মীয় স্বজনগণ হইতে তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

উপেন্দ্রের সুখের আর সীমা নাই। স্বর্ণাভকুন্তলা শ্বেতাঙ্গিনী এমিলি যখন বিচিত্র পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা হইয়া পরীর মত শোভা পাইতেন, তখন উপেন্দ্রের দেখিয়াও যেন পিপাসা মিটিত না। এমিলি অনেক দিন পিতার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি যখন সেই মহাদেশের সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বিষয় অথবা নানাপ্রকার অদ্ভুত মনুষ্য ও বৃক্ষলতাদির কথা সুললিত ভাষায় বর্ণন করিতেন, উপেন্দ্র তখন আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।

কত বিশ্রাম-সন্ধ্যায় এমিলি ইংরেজের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে পরাধীন বাঙ্গালী স্বামীর ভীরুতা হীনতা স্মরণ করাইয়া ধিক্কার দিতে ত্রুটি করিতেন না। যখন তিনি নিজের নিকট উপেন্দ্রকে নিতান্তই অপদার্থ রূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহার রসনা হইতে কাল বাঙ্গালীর নিন্দা সহস্রধারে বর্ষিত হইত, তখন জানি না কেন সেই অযোগ্য স্বামীটির হৃদয়ে অলক্ষ্যে একটি আঘাত লাগিত।

পিতা খরচ বন্ধ করিয়াছেন, তাহাতে প্রথমতঃ বেশী কিছু ক্ষতি হইল না। তিনি ঋণ করিয়া খরচ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। উপেন্দ্র সময়ে একজন বড় ডাক্তার হইবেন এই আশায় ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার বন্ধুতা ক্রয় করিতে অনেকেই অসম্মত হইলেন না।

এইরূপে কিছুকাল নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত হইল। কিন্তু ধীরে ধীরে সুখের শুভ্র আকাশে কাল মেঘ দেখা দিল।

৪

কয়েক মাস ঋণ করিয়াই চলিল বটে, কিন্তু বন্ধুগণ যখন দেখিলেন, উপেন্দ্র ডাক্তারীতে বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন আর তাঁহাকে ঋণ দিতে কাহারও তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। উপেন্দ্রের মনে বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের একটি বড় কাজ পাইবেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাহা মিলিল না।

মেম সাহেবের ব্যয়ও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তিনি নিত্য নূতন নূতন পরিচ্ছদ মনোনীত করিয়া ধারে ক্রয় করিয়া আনিতেন। দোকানদার যখন দেখিল যে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও সাহেবের নিকট টাকা পাওয়া যায় না, তখন সে পুনর্ব্বার বস্ত্রাদি ধারে দিতে অসম্মত হইল। উপেন্দ্রের দৈনিক খরচপত্রেরও তেমন সচ্ছলতা রহিল না। এমিলির অসন্তোষ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি ধরিয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। যেন এক অলক্ষ্য দেবতা দুষ্টগ্রহের মত অদৃশ্য থাকিয়া ধীরে ধীরে—অতি ধীরে উভয়ের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়াছিলেন।

এখন তাঁহাদের দাম্পত্য আলাপ প্রায়ই ক্ষুদ্র কলহে পরিণত হইতে দেখা যাইত। উভয়ের সামান্য সামান্য কাজেও পরস্পর কত ত্রুটি,—কত অপ্রীতির মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকিয়া লইতেন। কল্পনা পরে বাস্তব আকারে দেখা দিতে লাগিল।

এমিলি যে এখন স্বামীকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন, ইহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। একদিন তিনি কলহের সময় স্বামীকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার মত একজন ইংরেজ-মহিলার পক্ষে এইরূপ একটা অপদার্থ নেটীভকে বিবাহ করা নিতান্তই অপরিণামদর্শিতার কার্য্য হইয়াছে।

উপেন্দ্র দেখিলেন, এতদিন প্রাণপণ যত্নে তিনি যে সুখের মনোরম প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি বালুকার উপরে গ্রথিত। সামান্য ভূকম্পনে কোন্ মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইবে।

কোন্ এক অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিক তাঁহার চক্ষুর উপর হিমঋতুর প্রভাত-কুজ্ঝটিকার মত যে মোহ-আবরণ বিস্তার করিয়াছিল তাহা যেন ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি-পথ একেবারেই রুদ্ধ। ইংরেজ মহলেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা নাই, তিনি স্বজাতি-তাড়িত ময়ূরপুচ্ছ বিশিষ্ট কাকের দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপেন্দ্রকে চিকিৎসা উপলক্ষে মাঝে মাঝে বাহিরে যাইতে হয়। তিনি অনেক দিনই অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন এমিলি বাড়ী নাই। সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

একটি প্রেমপিপাসু প্রাণ,--স্নেহ-নির্ঝরবর্ষী সতৃষ্ণ আঁখি তাঁহার জন্য যে পথ চাহিয়া থাকিবে, প্রেমাস্পদের প্রতিপাদক্ষেপে সেই করুণ আঁখি দুইটি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনন্দের আভাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, উভয়ে সমভাবে সুখ, দুঃখ, দারিদ্র্য বহন পূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি-বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকিবেন, উপেন্দ্রের এ কল্পনা মরীচিকায় পরিণত হইল। তিনি এতদিন কেবল দুঃসহ তৃষ্ণা বুকে লইয়া অমৃত-বারি ভ্রমে মরীচিকার পশ্চাতেই ধাবিত হইয়াছেন! সম্মুখে অনলবর্ষী তপনতপ্ত বিশাল মরুপ্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই নাই।

আর লীলা! সেই তুচ্ছ গ্রাম্য বালিকা যে প্রেমের বীজটিকে আপনার প্রাণে অঙ্কুরিত দেখিয়া সযত্নে তাহাতে জল সেচন করিতেছিল, সেই দীনা ক্ষীণা লীলা কোথায়?

লীলা রোগশয্যায়! ভগ্নীবৎসলা শৈল দিন রাত্রি শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। যে দিন সংবাদ আসিল যে উপেন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন সেই দিন হইতেই লীলার অল্প অল্প জ্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আর সে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। আত্মীয় স্বজনের সেবা-চিকিৎসা অশ্রুজলের সহিত দিন দিন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

৫

বৈশাখের প্রথম ভাগ। কলিকাতার গ্রীষ্ম বৃটননন্দিনী এমিলির পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাহির ভ্যান্‌ত্যানানির ন্যায় কাল বাঙ্গালীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানী অধিকতর অসহ! শৈলমালা-শোভিত দারজিলিংএর শীতল তরু-নিকুঞ্জে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন উপেন্দ্র তাঁহার কোন বন্ধুকে দেখিবার জন্য যাওয়ায় গিয়াছিলেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিতে পাইলেন, যে মেমসাহেব দারজিলিং চলিয়া গিয়াছেন। স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই।

উপেন্দ্র যে স্নেহের বিমল উৎস পরিত্যাগ করিয়া অমৃতভ্রমে গরলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়াছেন এই চিন্তা তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্তলে পীড়া দিতে লাগিল। তিনি শূন্য মনে—শূন্য গৃহে একাকী পাদচারণা করিতে লাগিলেন, তিনি যেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একেবারেই সঙ্গীহীন!

লীলার জীবনব্রত তাঁহার অবিদিত ছিল না। সেই নিরপরাধা বালিকার বিষণ্ণ মুখকমল,—রোগশীর্ণ কমনীয় দেহকান্তি কল্পনায় একবার প্রাণের উপর ভাসিয়া উঠিল।

উপেন্দ্র একাকী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা ঈজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি অবহেলায় যে অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া লওয়ার আর পথ দেখিতেছেন না!

এখন এমিলির সহিত চিরবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকার জন্যই তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত হইয়াছে।

কলিকাতার একটি দ্বিতল বাটীতে লীলা রোগশয্যায় শায়িতা। সুচিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা আনা হইয়াছে; কিন্তু ব্যারাম দিন দিনই বৃদ্ধির মুখে চলিয়াছে। এখন সকলেই তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তারাপদ বাবু কন্যারত্ন হারাইতে বসিয়াছেন, এ সংবাদ রমেশচন্দ্রের অজ্ঞাত নহে। তাঁহার পুত্রের দোষেই যে সেই সদাশয় ভদ্রলোকের ঘোর বিপদ ঘনীভূত আকারে দেখা দিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া রমেশ বাবু মনে মনে বেদনা অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্তই কৃপণ; তারাপদ বাবুর প্রদত্ত সেই আট হাজার টাকা প্রত্যর্পণ করিতে কিছুতেই তাঁহার মন উঠিতেছে না।

রমেশচন্দ্র যে ইন্দিরার মণি-মন্দির হইতে তারকে

নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে সকলেই তাঁহাকে ধিকার দিতে লাগিল। বিশেষতঃ উন্নতিশীল নব্য যুবকবৃন্দ,—যাহারা দেশের কল্যাণের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে বদ্ধপরিকর,—তাহারা রমেশ বাবুকে এই জানাইল যে, তিনি তারাপদ বাবুর টাকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিলে সমাজে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

লোকলজ্জা এবং অপমান ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও রমেশচন্দ্র তারাপদ বাবুর সমস্ত টাকাই প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন এবং একজন বিশ্বাসী লোক দ্বারা ঐ টাকাগুলি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

৬

বেলা এক প্রহর অতীত-প্রায়। ডাক্তার লীলাকে দেখিয়া এই মাত্র চলিয়া গিয়াছেন। প্রেমের যজ্ঞে একটি তরুণ প্রাণের আহুতি দেখিতে দেখিতে তরুণ রবি ক্রমেই প্রখর হইয়া উঠিতেছে।

গৃহখানি নীরব নিস্তব্ধ। চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি-প্রতিভাসিত কক্ষটি যেন বিষাদ ও নিরাশার কৃষ্ণচ্ছায়ায় সমাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

শৈল লীলার জ্বর-শীর্ণ হাতখানি আপনার হাতের উপর লইয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"লিলি!"

লীলা শান্ত দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিল।

শৈল। কাল কি কথা বল্‌তে চেয়েছিলি বোন্?

লীলার মুখের উপর কি এক অবর্ণনীয় ভাবের ছবি ভাসিয়া উঠিল। উদাস দৃষ্টিতে একবার উর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল—"বেশী কিছু নয়।"

শৈল বুঝিয়াছিল—লীলা স্বর্গের ফুল—এ মর্ত্ত্যলোকে আর তাহাকে কিছুতেই রাখা যাইবে না। এসময় তাহার যে-কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে। সজল নয়নে কহিল,—"কি কথা বল না?" লীলা ছল ছল নয়নে কহিল,—"একবার—" এই মাত্র বলিয়া চুপ করিল। শৈল বুঝিয়াছিল তাহার প্রাণ কি চাহিতেছে। চক্ষু মুছিয়া সস্নেহে কহিল,—"একবার কি?" এবার লীলা সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—"একবার তাঁকে দেখাবে দিদি?" এই বলিয়া সে নয়ন মুদ্রিত করিল। দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া শয্যার উপর পড়িল।

ইহার পর আরও এক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। এখন লীলার আর কথা বলিবার শক্তি নাই। মৃত্যুর দূত দাঁড়াইয়া যেন অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। দিনের পর দিন সকল দুঃখ সকল জ্বালা সকল বিচ্ছেদের চির অবসানের জন্য সে প্রস্তুত হইতেছে।

লীলা তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল,—যেন দুইটি পরিচিত চক্ষু তাহার মস্তকে স্বর্গের মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিতেছে;— একটি পরিচিত কণ্ঠ তাহার কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিল—"লীলা, লীলা!"

লীলা সচকিতে নয়ন উন্মীলন করিল,—দেখিল সত্যই অভীষ্ট দেবতা শিরোদেশে বসিয়া তাহার জ্বরতপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া মধুর স্বরে ডাকিতেছেন,—"লীলা, লীলা!"

বালিকার ম্লান চক্ষু দুটি জলে ভাসিয়া গেল। সে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না।

উপেন্দ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—

"লীলা, আমাকে ক্ষমা কর!"

শোকাবেগ ও অনুতাপের অশ্রুতে তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল।

হায়! নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ আর জ্বলিল না। সেই দিনই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় লীলা আত্মীয়স্বজনগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরলোকে প্রস্থান করিল।

রমেশচন্দ্রের প্রত্যর্পিত আট হাজার টাকা দ্বারা তারাপদ বাবু পুণ্যবতী লীলার ইচ্ছানুসারে তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার গঠন করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন, —"লীলাবতী ফাণ্ড।"

শ্রীকুমুদিনী বসু।

রবীন্দ্রনাথের সম্মান

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি "জগৎ কবি-সভায়" রাজতিলক লাভ করিয়াছেন। আমরা দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি, আমাদের "বঙ্গভাষা দীনা" ;—জাতীয় পতনের ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন নীরব কবিকাননে ভারতীর জীর্ণমন্দিরে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির পর রবীন্দ্রনাথ প্রধান পূজারীর স্থান গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিবিধ ও বিচিত্র ভাব-পুষ্পের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনায় লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনকে সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র রাখেন নাই ; জীবন যেমন শৈশব কৈশোর যৌবন প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া নূতন নূতন বিকাশের স্তরে উপস্থিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার জীবনের রসই ভাব-পুষ্পরূপে কবিতার আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তিনি সেই জীবন-পুষ্প দিয়া ভারতীর অর্চনা করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার অর্চনা ভারতীর বিশ্ব-সভাক্ষেত্রে বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছে।

বাংলা দেশের কয়েকজন বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের কোন্ স্তরে স্থান দিবেন,—এত ছোট করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আর উপায় নাই। বহুদিন হইতে আমরা অনুভব করিতেছিলাম যে, মহর্ষি-সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঋষির ন্যায় যে সকল সত্যতত্ত্বকে সুকোমল ভাবে ও সুমধুর সৌন্দর্য্যে সঞ্জীবিত ও প্রবাহিত করিয়া তুলিতেছেন, তাহা এদেশের শত শৃঙ্খলের ভারে জর্জ্জরিত পঙ্গু জীবনে প্রসার লাভ করিবার পূর্ব্বেই হয়ত জীবন্ত ও উন্নত জাতির মধ্যে সাদরে গৃহীত ও পূজিত হইবে। গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনীতে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তখন আমরা এত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম যে অন্যান্য প্রদেশের নরনারীগণ তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিলেন বলিয়া আমাদের দুঃখ হইয়াছিল, অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ কেবল মাত্র তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার ভাবসম্পদ হইতে বঞ্চিত থাকিলেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অতি বিনয়ের সহিত এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সর্ব্বজনবোধ্য ইংরাজী ভাষায় আত্মভাব প্রকাশ করিতে অনভ্যস্ত। ইহার পরই তিনি বিলাত গমন করিলেন, এবং কয়েকটি মাত্র কবিতার অনুবাদের দ্বারা বিশ্বসাহিত্য-মন্দিরে ভারতীর বরপুত্ররূপে বিজয়মাল্য লাভ করিলেন।

যদিও এদেশে অনেক বিজ্ঞ এবং অজ্ঞ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গসাহিত্য-সমাজের কোথায় স্থান দিবেন সে বিষয় স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তবুও তাঁহার আসন বহু পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ যুবক মাত্র। কোন বিবাহ-সভায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণ সকলে একবাক্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় পুষ্পমাল্য দিয়া তাঁহাকে সাহিত্যসম্রাট রূপে বরণ করিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই মাল্য উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "এখন রবীন্দ্রই এ মাল্যের যোগ্য" এবং তাহা তাঁহার গলায় পড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লঘুভাবে কোন কাজ করিবার লোক ছিলেন না। বোধ হয় তাহারও পূর্ব্বে কোন সভায় যুবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া মনস্বী কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে কবিকুঞ্জের কোকিলরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আজ তিনি কেবল বঙ্গের নহে, সমস্ত জগতের কবি-সম্রাট রূপে বৃত। আজ কৃষ্ণমোহনের অভ্যর্থনা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা সার্থক হইয়াছে।

এখন আর বাঙ্গালীর ভাষা ও ভাব দীন হীন নহে। কারণ, তাহার অনুবাদও সমস্ত উন্নত ও সুসভ্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ আহার দান করিতে সমর্থ। আমাদের ন্যায় পতিত নির্জ্জীব নির্ব্বাক জাতির জীবনে এই ঘটনা মহা সুপ্রভাতের রক্তিম অরুণ-রাগ-রশ্মি, ভগবানের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতাকে ধন্যবাদ দিই।

রবীন্দ্রনাথের এই জগদ্ব্যাপী খ্যাতির কারণ তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্ব কি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তাঁহার যে গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকা মুগ্ধ, সেই গীতাঞ্জলির একটি সঙ্গীতের প্রথম ছত্র—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।"

সীমার মাঝে অসীমের সুর, ক্ষুদ্রের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ, আমাদের জীবনের ও এই জগতের প্রত্যেক অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে প্রেমস্বরূপ ভগবানের লীলা বর্ত্তমান,—কিছুই ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়, অনর্থক নয়,—এই সত্য তত্ত্বটিকে তিনি এমন করিয়া কবিত্বময়ী কমনীয়তার আকারে প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুর্গম বন্ধুর পর্ব্বতশিখরের ন্যায় শুষ্ক ধর্ম্মতত্ত্ব স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় সরস ও অনায়াসলভ্য হইয়া গিয়াছে।

তত্ত্ব এবং ভাব এই উভয়ের মধ্যে চিরদিনের একটা বিরোধ ছিল। তত্ত্ব হ'লেন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে কোন্ কন্দরে যোগধ্যানে বা বিচার বিতর্কে মগ্ন, তাঁর দেখা পাওয়া সহজ নহে, আর ভাবের প্রবাহ মানবের হৃদয়ে বাহিরে, গৃহে গৃহে, রাস্তা ঘাটে, পুষ্পপত্র ফলে; মানুষ তাতেই আছে, তাতেই বাঁচে, ভাব পথের ধূলিমুষ্টি অপেক্ষাও সস্তা; এই শিক্ষা জগতের সর্ব্বত্র প্রবল। তত্ত্ব ঠাকুর সর্ব্বদা চোখ রাঙ্গিয়ে বলিতেছেন, অনন্তকে চাও তো ক্ষুদ্রকে ছাড়, ধর্ম্ম চাও তো সংসার ছাড়, সত্য চাও তো কবিত্ব ছাড়, মুক্তি চাও তো স্নেহ ভালবাসার বন্ধন মোহপাশ কাট। কিছুদিন হইতে কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই চিরপ্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতার রথে চড়াইয়া তত্ত্বকে একবারে রাজপথের জনকোলাহলের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তাহাকে নিগূঢ় প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তিনি শুষ্ক ব্রহ্মতত্ত্বকে সরস ভাবস্রোতের প্রবল বন্যার ন্যায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন এবং তৃষিত উত্তপ্ত নরনারী অনায়াসে সেই স্রোতে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হইতেছে। অমৃতের এক বিন্দুই যথেষ্ট; তাই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মাত্র পরমতত্ত্বগীতির অনুবাদ পাঠ করিয়া জগতের বরণীয়গণ নবজীবনের স্পন্দনে জাগ্রত হইয়া তাঁহার গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন।

যাঁহারা এই তত্ত্ব-ভাব-প্রবাহে ভাল করিয়া অবগাহন করিতে চান তাঁহাদিগকে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর লাঞ্ছনা

সকল দেশের লোকই স্বদেশ হ'তে বিদেশে যায়। কেহ চাকরী করিয়া বা ব্যবসা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে, কেহ কেহ বিদেশেই ঘরবাড়ী তৈরি করিয়া, জমিজমা কিনিয়া স্থায়ী হইয়া যায়। ইংরাজগণ নানা দেশে গিয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছেন, আবার স্থায়ীভাবে বাসও করিতেছেন। ইংলণ্ডে গিয়া আমাদের মধ্যে যে কেহ ব্যবসাবাণিজ্য বা চাকরী করিতে পারি, এবং যতদিন ইচ্ছা বাস করিতে পারি। ভারতবর্ষেও সকল দেশের লোক আসিতেছে,—বাস করিতেছে, নানা কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে।

বহুদিন হইল, আফ্রিকায় কুলির কার্য্য করার জন্য মজুরের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই সময় নিরক্ষর ও দরিদ্র অনেক ভারতবাসী কুলিসংগ্রহকারীদিগের প্রলোভনে ভুলিয়া চুক্তিবদ্ধ কুলি হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছিল। সেই হইতে শত শত ভারতবাসী আফ্রিকায় গিয়া জীবন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে, শত অসুবিধা সত্ত্বেও চুক্তি হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া অনেকে সেখানেই বাস করিতেছে এবং স্ত্রীপুত্রদিগকেও লইয়া গিয়াছে। ক্রমে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে কোন কোন সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী আফ্রিকায় গমন করিয়াছেন। এইরূপে ভারতবাসীগণও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী সমষ্টির একটি অংশস্বরূপ হইয়াছেন।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ ও বুয়ারগণ সেখানে ভারতবাসীদিগকে কুলির অধম করিয়া রাখিতে চান। সেখানকার আইন অনুসারে ভারতবাসী মাত্রেই কুলি, ক্রীতদাস, তাহাদের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, এমন কি, স্বামীস্ত্রীর বিবাহ সম্বন্ধও সেখানে অগ্রাহ্য হইতেছে! ভারতবাসীদিগকে সেখানে জনপ্রতি বার্ষিক ৪৫ টাকা বিশেষ কর দিতে হয়, এই কর দিতে না পারিলে অতিবৃদ্ধ অক্ষমকেও জেলে যাইতে হয়। ভারতবাসী ব্যবসাদার সেখানে দোকান করিবার অনুমতি সহজে পায় না, যদি একবার

পায়, পরবৎসর আর পায় না, এইরূপে তাহারা ধনেপ্রাণে মারা যায়।

রাস্তায়, ট্রামে, ট্রেনে, কোথাও ভারতবাসীগণ শ্বেতকায়দিগের সঙ্গে যাতায়াত করিতে পারে না। এইরূপে নানা প্রকারে ভারতবাসীদিগকে সে দেশ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবাসীগণ সে দেশে মানুষের মত বাস করিতে চাহিতেছেন। এই অপরাধে তাঁহারা দলে দলে জেলে যাইতেছেন; ইতিমধ্যে শত শত কুলি-মজুরের সহিত বহুসংখ্যক ভদ্র শিক্ষিত নরনারী শিশুসন্তান সহ জেলে গিয়াছেন। কত ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত প্রভৃতিও তাঁহাদের উপর বৃষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হওয়ায়, এদেশের জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বিপন্ন ভারতবাসীদিগের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতেছে, অনেক সহৃদয় ইংরাজ মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন, কলিকাতার লর্ডবিশপ ভারতবাসীর অবস্থা স্বয়ং দেখিবার জন্য এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য আফ্রিকা রওনা হইয়াছেন, এবং আমাদের উদার হৃদয় বড়লাট ভারতবাসীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই দুর্গতি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রবাসী ভারতসন্তান-দিগের এই সংগ্রামের সহিত আমাদের মানসম্ভ্রম ও ভবিষ্যৎ জড়িত, ইহা আমাদেরই সংগ্রাম। আমাদের সকলেরই এই সংগ্রাম পরিচালনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি কলিকাতার টাউন হলে এই উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলেই এগার হাজারের অধিক টাকার দান ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। টাউন হলে এই সভার যখন আয়োজন হইতেছিল, তখন দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত নরনারীগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতার এক বিরাট মহিলা-সভার অধিবেশনের ইচ্ছা অনেকেরই হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল। বিডন ষ্ট্রীটে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনে মহিলাগণের চেষ্টায় এই মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, সর্ব্ব শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ এই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে শ্রীমতী সেখ মহতাব নাম্নী মুসলমান মহিলা ও কারারুদ্ধ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের চিত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে শ্রীমতী মহতাব সর্ব্ব প্রথমে ইচ্ছাপূর্ব্বক দক্ষিণ আফ্রিকার অবৈধ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভলক্রাষ্টে যাত্রা করিয়াছিলেন—তিনি জানিতেন, দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবে—তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই নিগ্রহ ও নির্য্যাতনের চিত্রও তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই—তাই তিনি স্বেচ্ছায় কারাগারে গমন করিয়াছেন—দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

এই মহিলা-সভায় লেডি আর, এন, মুখার্জি, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী এস, আর, দাস, শ্রীমতী বি, এন, চৌধুরী, শ্রীমতী ডি, এন, মল্লিক, শ্রীমতী পি, চাটার্জি, শ্রীমতী এস, সি, গুপ্ত, শ্রীমতী এ, গুপ্ত, শ্রীমতী এ, এন, চৌধুরী, শ্রীমতী পি, কে, রায়, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী ডি, এন, দাস, শ্রীমতী আর, এস, হোসেন, শ্রীমতী এম, এম, বসু, শ্রীমতী এম, ঘোষ, শ্রীমতী পি, কে, সেন, শ্রীমতী বি, এল, মিত্র, শ্রীমতী আর, এন, রায়, শ্রীমতী কে, বি, দত্ত, কুমারী কুমুদিনী মিত্র, কুমারী বাসন্তী মিত্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী, কুমারী জে, সি, বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে স্ত্রীলোকগণ সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৭০ টাকা নগদ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ৯৭০ টাকার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রথমে সুপ্রভাত-সম্পাদিকা কুমারী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত ভারতীয় নরনারীগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার

ভারতীয় নরনারীর নির্য্যাতনের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত নরনারীগণের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বাঙ্গলা দেশের স্ত্রীলোকগণ এই সঙ্কল্প করুন, তাঁহারা একদিন উপবাসে থাকিয়া সেই দিবসের অর্থ দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত ভ্রাতা ভগিনীর দুঃখ মোচন কল্পে দান করেন।" শ্রীমতী পি, বসু বি, এ. এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থানুসন্ধানের জন্য অবিলম্বে এক উপযুক্ত কমিটি গঠন প্রয়োজন।" শ্রীমতী মিলি চৌধুরী এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। শ্রীমতী নলিনী রায় তৃতীয় প্রস্তাবে লর্ডহার্ডিংকে দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত ভারত সন্তানগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীমতী কমলা গুপ্তা এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

শ্রীমতী আর. এস হোসেন চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাবে বাঙ্গলার সমস্ত মহিলা-সভাকে দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত ভারতসন্তানগণের সাহায্যার্থে অর্থ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যান্য যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১নং ব্রাইট ষ্ট্রীটে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও ৬১ নং হ্যারিসন রোডে শ্রীমতী নির্ম্মলা সরকারের নিকট সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন। সংগৃহীত অর্থ মিঃ গোখেলের নিকট প্রেরণ করা হইবে। শ্রীমতী এম, এম, বসু এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা

যাঁহার আনন্দ-ভুক্ হৃদয়ের পুণ্যরশ্মি বিশ্বমানবের প্রাণে জ্যোতির্ম্ময় রেখা অঙ্কিত করিয়াছে; যাঁহার অমৃত-বাণী যুগযুগান্তের ব্যবধানকে মিলনের মধুর ধারায় বিলীন করিয়া দিয়াছে, আত্মগৌরব বোধের স্বাভাবিক প্রেরণা সেই স্মরেণ্য বরেণ্য ধ্যানরসিক কবিসম্রাটের সম্বর্দ্ধনায় আমাকেও উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছিল; তাই বিরাট জনসঙ্ঘের সহিত বোলপুর অভিমুখে রওনা হইলাম।

হিন্দু-মুসলমানে, জৈন-খৃষ্টানে, ছেলে-বুড়োয়, স্ত্রী-পুরুষে, সাহিত্যিক-অসাহিত্যিকে প্রায় পাঁচশত লোক বক্ষে লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ অতীতে (দিবা ১০-১১ মিনিটের স্থলে ১০-৩০ মিনিটে) ট্রেন হাওড়া হইতে যাত্রা করিল। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে গাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। স্থানে অস্থানে থামিয়া থামিয়া স্পেসেল ট্রেন আপনার বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের কামরায় উৎসব-যাত্রী একদল রোসনচৌকি বাদ্যকর ছিল, খানিক যাইতেই তাহারা বাজ্না আরম্ভ করিল। সেই সানাইর সুর, আমাদের আনন্দে একেবারে অনলে ঘৃতাহুতি আর কি! পথে এক ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে একজন লোক অন্য কামরা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বাদ্যকরদিগকে বিশেষ গরজ দেখাইয়া বলিলেন—"চল, চল।" আমাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন—"কোথায় চলিবে, মশায়?" আগন্তুক—"অন্য কামরায়।"

"সে কি মশায়! তাও কি হয়!"—বেগতিক দেখিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। একটু পরে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় আমাদের কামরার দিকে আসিয়া খানিক দূর হইতেই আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফিরিলেন। বুঝিলাম তিনিও পরাজিত হইয়াছেন। এবার যে আর একজন আসিলেন তিনি কিছুতেই ছাড়িবার নন। আমাদের একজন বলিলেন—"মশায়, আপনাদের কি দয়ামায়া নাই? আমরা এতক্ষণ কি আমোদেই আছি, এরা চলিয়া গেলে আমাদের কি অবস্থাটাই হবে একবার ভাবুন দেখি।" আগন্তুক শুনিলেন না, দুইটি যুক্তি দেখাইয়া উহাদিগকে লইয়া গেলেন—

(১) "গাড়ীস্থিত ভদ্রমহিলারা বাজ্না শুনিতে চাহিয়াছেন।

(২) "আপনারা একাই এই আনন্দ উপভোগের অধিকারী নন, সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে।"

অগত্যা সকলেই নীরব রহিলেন। আমরা নূতন আমোদে আসর জমাইয়া লইলাম।

পুণ্যতীর্থ "বেলুর", রামনাথের বাড়ী "বালি", ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "চন্দনগর", সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় "কোন্নগর", বৈষ্ণব কবির জন্মভূমি "বৰ্দ্ধমান" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ অনেক স্থান ছাড়াইয়া খর্জ্জুর-বীথি, আম্র-কুঞ্জ ও "অঘ্রাণের ভরা ক্ষেতের মধুর হাসি" দুই পার্শ্বে রাখিয়া প্রায় দুটা পঞ্চাশে ট্রেন আসিয়া বোলপুর পৌঁছিল। গৈরিক আলখেল্লাধারী আশ্রম-ব্রহ্মচারিগণ সারি বাঁধিয়া আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া আছে। বিপুল জনস্রোতে মিশিয়া আশ্রম অভিমুখে রওনা হইলাম। একটু অগ্রসর হইতেই একদল বালক কোমল কণ্ঠে একটী মধুর সঙ্গীত গাহিয়া আমাদের "মনের মাঝে প্রেমের সেতার" বাজাইয়া তুলিতেছিল।

কি বিরাট জন-বাহিনী! দুই দিকে চাহিয়া দেখি অসীম! তখন আমি ভাবিতেছিলাম, ধন্য রবীন্দ্রনাথ! কত পরিচিত-অপরিচিত জাতি বিজাতি, কত ছোঁয়া অছোঁয়াকে এক পরিবার-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া এমন আকুল করিয়া তোমার পানে টানিয়া নিতেছে! আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যখন ভাবিলাম যে শুধু ইহাই নহে—বাহিরকেও তাঁহার মন্ত্রশক্তি এমনি আপনার মধ্যে আনিয়া বাঁধিয়াছে, তখন কি আনন্দই না প্রাণে লহরী জাগাইতেছিল!

আশ্রমের নিকট আসিয়া দেখি, রাস্তার দুই পার্শ্বে আম্র-পল্লব, মঙ্গলকলস, স্থানে স্থানে ধূপধুনা জ্বালান হইতেছে। আর আশ্রম গুলজার করিয়া অজস্র শঙ্খ-ধ্বনি আকাশ পূর্ণ করিতেছে। চন্দনের বাটি হস্তে আশ্রমের প্রবেশ-পথে শিক্ষকগণ দাঁড়াইয়া আছেন। একে একে অভ্যাগতদের ললাট তাঁহারা চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া দিতেছেন।

আশ্রমের তরু-ছায়ায় সভার আয়োজন। সতরঞ্চিতে অনেকে বসিয়া গেলেন, কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের জন্য একখানা প্রস্তরাসন এবং কবির জন্য পদ্মপত্র-রচিত একটি তাম্রিকাসন সজ্জিত হইয়াছিল। জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি নির্ব্বাচন ও শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কবি-সম্বর্দ্ধনার মুসাবিদাটা একবার সভা হইতে মঞ্জুর করাইয়া লইলেন।

কবি আসিতেই সকলে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি ও করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ এবং কবিকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। হর্ষোল্লাসে, ভক্তিপ্রেমে উৎসব-সভা উদ্বেল হইয়া উঠিল। পদ্মাসনে উপবিষ্ট সৌম্য-শান্ত-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথকে তপোবনের ঋষির ন্যায়ই মানাইয়াছিল। একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরব্ধ হইল। মাননীয় সভাপতি মহাশয় কবিকে সম্বোধন করিয়া সংক্ষেপে বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার শেষ অংশটি এই—"তুমি অনেক দিন যাবত আমাদিগকে বন্দী করিয়াছ, সেই বন্দীরা আজ তোমার জয়গান করিতে আসিয়াছে।" বক্তৃতাশেষে তিনি কবির কণ্ঠে মাল্যোপহার প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"যাঁহার কাব্যবীণায় বিকাশোন্মুখ শিশু-হৃদয়ের প্রভাতী কাকলী হইতে অধ্যাত্ম রাগ-রঞ্জিত প্রৌঢ়-বৈরাগ্যের বৈকালী সুর পর্য্যন্ত নিখিল রাগিণী নিঃশেষে ধ্বনিত হইয়াছে, যাঁহার নব নব উন্মেষ-শালিনী প্রতিভার অজস্র কিরণসম্পাতে বঙ্গীয় নরনারীর দৈনন্দিন জীবন আজ সমুজ্জ্বল, যিনি বিশেষভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় কবি হইয়াও সার্ব্বভৌমিক গুণিগণের গণনায় জগতের কবি-সভায় সম্মানের মহোচ্চ-আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই ভাব ও জ্ঞান-রাজ্যের বর্ত্তমান সম্রাট ধ্যানরসিক স্বদেশের প্রিয়তম কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধবনিতা শ্রদ্ধার স্রকচন্দনে অভিনন্দিত করিতেছে।"

একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দন জানাইলেন। একে একে মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায় হইতেই কবিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল। জৈন-পক্ষ হইতে রজতের অর্ঘ্যপাত্রে ও ধাতুনির্ম্মিত মাল্যে কবি-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। বঙ্গীয় শিল্পী-মণ্ডলী হইতে একখানা আলোক-চিত্র

কবিকে উপহার দেওয়া হয়। পরিশেষে কবি আপনার আন্তরিক বিনয় জ্ঞাপন করিলেন। কবি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এই সম্মানের সুরাপাত্র তিনি মুখে স্পর্শ করিবেন মাত্র, উহা পান করিবেন না। কারণ ইহাতে তাঁহার মত্ততা আসিতে পারে; সকলের সম্মান রক্ষার্থ তিনি উহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলেন না। তিনি বারংবার এ সম্মান গ্রহণে আপনার অযোগ্যতার কথা বলিতেছিলেন।

সভাভঙ্গে কবির পদধূলি লইবার জন্য ভয়ঙ্কর ভিড় বাঁধিয়াছিল। বলাবাহুল্য এই ক্ষীণদেহ নিরাশ হইয়া ভিড়ের মাঝে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

হুড় হুড় করিয়া সকলেই ষ্টেসনের দিকে ছুটিলেন। ভাবিলাম, একি হইল! চর্ব্বচোষ্যের অব্যবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহাহউক, অগত্যা রওনা হওয়া গেল। পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ। আমার দুঃখের কথাটি যে তাঁহারও ভাবনার বিষয় হইয়াছিল, তাহা তিনিই আগে ভাগে জানাইলেন। ক্রমে এই আনন্দানুষ্ঠানের অনেক কথাই উঠিল। কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম—"সত্যেন বাবুর রবি-সম্বর্দ্ধনার কবিতাটি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে, ইহার চেয়ে সুন্দর কবিতা যে আর কি হইতে পারে জানি না।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"সত্যেন বাবুর ক্ষমতা কি আর কম; তবে আরবী পারসী শব্দের আধিক্যে কবিতাকে পীড়িত ও দুর্ব্বোধ্য করেন বলিয়াই অনেকে তাঁহাকে পছন্দ করে না।"

এরূপ কথোপকথনে তিনি বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"আজকালকার কবিদের কেমন ফুরফুরে, উড়ো উড়ো সব ভাব—প্লট জমাইয়া তাঁহারা বড় একটা কবিতা লেখেন না।" আমি বলিলাম "সেরূপ কবিতাকে আপনি অপছন্দ মনে করেন কেন? আমার তো মনে হয়, স্থান বিশেষে এইরূপ প্লট-হারা ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই কবি-হৃদয়ের প্রকৃত মাধুর্য্য। কবি-হৃদয় যখন নিঃশেষে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে, তখনই প্লট ডুবিয়া যায়। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের "Hooting to the Owls" নামক প্লট-হীন কবিতা তাহার প্রমাণ। সেই কবিতার সমালোচনায় Hutton প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"No other poet but Wordsworth could have written these lines." আর তাহারই স্থান বিশেষ পাঠে Coleridge বলিয়াছিলেন—"Had I met these lines, running wild in the deserts of Arabia, I would have instantly screamed out, Wordsworth!" কবি দেবেন্দ্রনাথের কথা তুলিয়া তিনি বলিলেন—"তিনি emotional, কিন্তু তাহার কবিতায় অনেক প্রাণের কথা আছে।"

ষ্টেসনে আসিয়াই দেখি সকলের হাতে হাতে টোপ ভরা বুঁদে ও কমলালেবু। অমনি ছুটিয়া গিয়া দেখি এক স্থানে খুব ভিড়, চাহিয়া দেখি, গাড়ীর একটা কামরা ভরা খাবার। তখন নিবেদন জানাইয়া অতি কষ্টে খাবার সংগ্রহ করিলাম। তারপর বেশ সুস্থ হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল। একটু পরে পরেই কামরায় কামরায় আসিয়া খাবার সাধিয়া যায়। ইচ্ছামত সকলেই উদর পূর্ত্তি করিয়া লইতে লাগিলেন।

আমাদের কামরায় অনেক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যজ্ঞের মিলন হইয়াছিল। আমার পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মণিলাল গাঙ্গুলি। তদ্ব্যতীত একজন হাস্যরসিক ছিলেন। বোলপুর হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি আসর গরম রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রসিকতায় গাড়ী সর্ব্বদাই হাস্য-মুখর থাকিত।

এইরূপ আনন্দউল্লাসে, হাস্যকৌতুকে আলাপবৈচিত্র্যের উপভোগে ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হইয়া হাওড়া আসিয়া পৌঁছিলাম। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে সারাদিনের আনন্দটা একটা স্বপ্নের মত অনুভূত হইতে লাগিল।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | পৌষ, ১৩২০ | ৯ম সংখ্যা।

মহিলার কার্য্য

মধ্য যুগে ভারতে এমন এক সময় গিয়াছে যখন মহিলাগণ বিড়াল কুকুর অপেক্ষাও ঘৃণিত ও অসম্মানিত জীবন যাপন করিয়াছেন। তখন তাঁহারা পুরুষের হস্তে ক্রীড়ার পুতুল মাত্র ছিলেন। তাঁহাদের জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ সমস্তই পুরুষের হস্তে নিবদ্ধ ছিল। পুরুষের দয়ার উপরেই সম্পূর্ণরূপে রমণীর জীবন নির্ভর করিত। ইচ্ছা হইলে পুরুষগণ রমণীর জীবন রক্ষা করিতেন আর কখনো বা অবজ্ঞাভরে তাঁহাদের তুচ্ছ জীবন নিমেষ মধ্যে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন। চিরপ্রসিদ্ধ সতীদাহ প্রথা, রাজপুতনার শিশুকন্যা হত্যা প্রভৃতির বিষয় কে না জানেন ? আর, মুসলমানগণ রমণীর উপরে কি নির্ম্মম, কঠোর অত্যাচার করিতেন তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। নবাব বাদসাহদের ক্রীড়ার পুতুলস্বরূপ হিন্দু মুসলমান শত শত রমণী তাঁহাদের গৃহে বিরাজিত থাকিতেন। সময় বিশেষে কারণে অথবা অকারণে কখনো তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলে শত শত অসহায়া নির্দ্দোষ রমণীর মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইত।

জ্ঞানচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনা, রাজনীতি প্রভৃতি দেশ-হিতকর উচ্চতর বিষয়ের অধিকারে তাঁহারা বঞ্চিতা ছিলেন। সুতরাং সে সময়ে দেশের সাধারণ অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। ইহা ত গেল মধ্য যুগের কথা।

অতি প্রাচীনকালে হিন্দুযুগে ভারতের নারীদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল না। যদিও প্রাচীন

আইনজ্ঞ পণ্ডিত মনু বলিয়াছেন—"নারী বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বা বৃদ্ধাই হউন স্বীয় গৃহেও স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিবেন না," তিনিই আবার ইহাও বলিয়াছেন—"নারীগণ যেখানে সম্মান পান সেখানে দেবতাগণ প্রসন্ন, যেখানে ইঁহাদের আদর নাই সেখানে সমুদয় ক্রিয়া বিফল।" তখন রমণীগণ জ্ঞানালোচনায় বঞ্চিতা ছিলেন না। বিদ্যাশিক্ষায় পুরুষের সহিত তাঁহাদের প্রায় পূর্ণ অধিকার ছিল। প্রাচীন কালের ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং বিদুষী খনা ও লীলাবতীর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন। গার্গীদেবী প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া মহাজ্ঞানবান পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্তা হইতেন। ভারতে এমন দিনও গিয়াছে, যখন নারীগণ দেশের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপা ছিলেন এবং তাঁহাদের যশঃ-সৌরভে দেশ বিদেশ আমোদিত হইত। যাহা হউক, ইহাও গেল পৌরাণিক সময়ের কথা।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক সময়ে নারীর অবস্থা ও নারীর কার্য্যক্ষেত্র। ইংরাজ কবি টেনিসন বলিয়াছেন—"Old order changeth yielding place to new" অর্থাৎ "পুরাতন নিয়মাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া নূতন নিয়মের প্রচলন হইতেছে।" সত্যই কি তাই নয়? এখন কি আর ভারতে সেই পুরাতন সময় আছে—যখন নারীগণ কঠিন অবরোধ প্রথায় আবদ্ধা হইয়া গৃহ হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে নিষিদ্ধা ছিলেন? কত শত রমণীর অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গুণরাশি লোকচক্ষুর অগোচরে লুক্কায়িত থাকিয়া বা কঠোর শাসনে নিয়মিত হইয়া অচিরে বিনষ্ট হইত। তখন স্কুল কলেজ বা সভাসমিতি কিছুই ছিল না। শতকরা ৯৯ জন রমণীই নিরক্ষরা অবস্থায় শুধু গৃহকর্ম্মমাত্র সমাপন করিয়া জীবন যাপন করিতেন। এখন কি আর সেদিন আছে? চারিদিকেই কি আমরা পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না? পুরাতন নিয়মাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া কি নূতন নূতন নিয়মের সংস্থাপন হইতেছে না? সমস্ত [illegible]ব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে রমণীদের ভিতরেও যেন নূতন জাগরণ, নূতন জীবন উপস্থিত হইয়াছে। আর যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অন্যদেশে দৃষ্টিপাত করি, তবে কি দেখিতে পাই? সমস্ত জগতের নারীগণ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা অলসতায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আর কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছেন না—চারিদিকেই শুধু কর্ম্ম আর ব্যস্ততা। ইংলণ্ড আর আমেরিকার কথা কি বলিব? তাঁহারা ত স্বীয় স্বীয় অধিকার লাভের আশায় কোমর বাঁধিয়া দুরন্ত লড়াইএ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। চীন জাপানের কথাও আপনারা জানেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে চীন-জাপান অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া সভ্যজগতে স্থান পাইত না—আজকাল তাহারাই সভ্যতার অতি উচ্চ সোপানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে কি রমণীর হস্ত নাই? নারীগণ আপনাদের অলসতা ও অনর্থ লজ্জাশীলতা ঘুচাইয়া দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন; এবং পুরুষগণ নব বলে বলী হইয়া দেশসংস্কারে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন। আরব, পারস্য, তুর্কীস্থান—যেস্থানের রমণীগণ কঠোর অবরোধ প্রথায় আবদ্ধা হইয়া অসূর্য্যম্পশ্যা বলিয়া জগতে বিখ্যাত ছিলেন—এখন দেখুন, তাঁহারাও তাঁহাদের জাতীয় বিপদের সময়ে কি আশ্চর্য্য কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা আর অলসতায় নিদ্রিত নহেন; কালের পরিবর্ত্তনচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহারাও কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কত সাহায্য করিতেছেন। সমগ্র পৃথিবীর জাগরণ দেখিয়াও ভারতের ললনাগণ কি এখনো নীরবে ঘুমাইয়া থাকিবেন? না—তাঁহাদেরও সময় এবং সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—তাঁহারাও কর্ম্মে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিবেন; তাঁহারাও কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন; নতুবা দেশ উন্নত হইবে কি প্রকারে? রমণীর সাহায্য ব্যতীত পুরুষগণ কি করিতে পারেন? তাই পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গাহিয়াছেন—

আর কারে ডাকি উঠগো ভগিনী!
ভারত ললনা কারায় বন্দিনী,
তোরা না উঠিলে দেশ যে উঠে না;
তোরা না জাগিলে দেশ যে জাগে না;
উঠ একবার, দেশের উদ্ধার

কেবল পুরুষে হবে না হবে না,
এক পায়ে দেশ কভু দাঁড়াবে না।

রমণীর কার্য্য অতিশয় কঠিন—তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র কোথায় তাহাই এখন আমরা আলোচনা করিব। রমণীর কার্য্য প্রধানতঃ দুই প্রকার:—

(১) পারিবারিক কার্য্য ও (২) সামাজিক কার্য্য। গৃহপরিবারে রমণী দেবীস্বরূপা। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ গৃহিণীর সুমিষ্ট সংস্পর্শে আসিয়া শান্তি ও আরাম লাভ করেন। পরিবারের কর্ত্রী গৃহিণী। পরিবারে তাঁহার প্রথম কার্য্য পতি-সেবা ও সন্তান-পালন। সন্তানদিগকে দাসদাসী অথবা অন্য কাহারো হস্তে সমর্পণ করিয়া জননী কখনো নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। শিশুগণ জননীর হস্তে যেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় সেরূপ আর কাহারো নিকট পাইতে পারে না। তাহাদের স্বভাবের দোষ ও গুণের জন্য জননীই প্রধানতঃ দায়ী। আজকাল সভ্যজগতে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে নারীগণের বিলাসিতাও অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক গৃহে দেখা যায়—রমণীগণ নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে ব্যতিব্যস্ত থাকেন বলিয়া শিশুদের যত্ন ও স্বামীসেবায় অবহেলা করিতেছেন। সন্তানগণ আপন আপন বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কত সুখ ও আরাম লাভ করিবে—তাহার পরিবর্ত্তে গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহারা হয়ত শ্রবণ করিল জননী কোন আমোদে যোগদান করিবার জন্য গৃহের বাহিরে গিয়াছেন। সারাদিন কঠোর কর্ম্মে বিব্রত থাকিয়া সন্ধ্যাকালে স্বামী গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীর সঙ্গসুখ ও সেবালাভের পরিবর্ত্তে হয়ত শ্রবণ করেন—তিনি গৃহে নাই। তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষগুলি যাহাতে নারীগণের মধ্যে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে বিদ্যালয়ে অল্পবয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে অপরিষ্কার ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতে দেখা যায় এবং সময় সময় তাহাদের মধ্যে চুরি, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি অনেক দোষ দেখা যায়। এসকল কাহার জন্য হইয়া থাকে? দোষ কি শিশুগণের, না জননীর? সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত ও সুবিনীত করা তাঁহারই প্রধান কার্য্য। যদি জননী বাহিরের কার্য্যে অধিক ব্যস্ত থাকেন অথবা গৃহেরই অন্যান্য কার্য্যে অধিক মনোযোগ প্রদান করেন, তবে সন্তান পালনে অবশ্যই তাঁর ত্রুটী হইবে এবং শিশুদের মধ্যে উল্লিখিত দোষগুলি সহজেই প্রবেশ করিবে। সুতরাং জননীকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, সন্তান পালনই তাঁহার প্রধান কার্য্য।

নারীর দ্বিতীয় কার্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগকে নানা প্রকার সামাজিক দুর্নীতি হইতে রক্ষা করা। কোন পরিবার সমাজের বাহিরে অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং সামাজিক দোষ ও গুণগুলি প্রত্যেক পরিবারে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। পিতা মাতাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে তাঁহাদের সন্তানগণ যেন সভ্যতার নামে সেই দুর্নীতিগুলি গ্রহণ না করে। পিতা অপেক্ষা মাতার দায়ীত্বই অধিক; কেননা মাতার চক্ষুই সর্ব্বদা সন্তানদের উপরে রহিয়াছে। উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে সন্তানকে মাতার কিছু না কিছু বলিবার অবসর রহিয়াছে। গৃহমধ্যে ধর্ম্ম, নীতি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ভার গৃহকর্ত্রী জননীর উপরেই ন্যস্ত। সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া দাস দাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকে শৃঙ্খলামত চলিতেছে কিনা তাহা তিনিই দেখিবেন। গৃহে নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান, নীতিশিক্ষা ও চর্চ্চা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ বিষয়ে গৃহিণীকে বিশেষ যত্নবতী হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানচর্চ্চা ও জ্ঞানোন্নতির দ্বার দিন দিন উন্মুক্ত হইতেছে। কত সভা সমিতি, কত স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কত নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করিয়া জগতকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছেন। জগতের এই নূতন জাগরণের সময়ে কোন ব্যক্তিরই জ্ঞানশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনায় উদাসীন হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক গৃহস্থেরই দেখা উচিত আপন আপন পরিবারে জ্ঞান ও শিক্ষার হাওয়া প্রচলিত হইতেছে কি না। এস্থলেও গৃহিণীকেই অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি

নিজে অশিক্ষিতা ও নিরক্ষরা হইলে শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং অগ্রে তাঁহাকে শিক্ষিতা ও জ্ঞানোৎসাহিনী হইতে হইবে। যাহাতে সন্তানদের হৃদয় ও মন জ্ঞানচর্চ্চার দিকে ধাবিত হয় সে বিষয়ে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে জ্ঞানোলোচনার জন্য সভা ইত্যাদি থাকা আবশ্যক। জনক জননী প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সন্তানদের সহিত আলোচনা সভায় যোগদান করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে যাহাতে কলাবিদ্যার প্রচলন হয় সেই বিষয়েও গৃহিণীর যত্নবতী হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কলা-বিদ্যা অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা, সীবন ও অন্যান্য শিল্প বিদ্যার বিশেষ আদর নাই। ইহা দ্বারা যে হৃদয়ের কোমল গুণাবলী বিকশিত হইয়া মানবকে কতদূর উন্নত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হয়ত আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি না। প্রাচীন গ্রীক ও ইটালীয়গণ জগতে এই কলা বিদ্যার জন্যই বিখ্যাত ছিলেন। আধুনিক সময়ে ফরাসি, জাপান প্রভৃতি দেশও কলা বিদ্যার জন্য সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক গৃহিণীরই এই বিদ্যায় সুশিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তিনি আপন আপন পরিবারে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় কন্যাদিগকে সেলাই ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প ও কারুকার্য্যে সুপরিপক্ক করিয়া তুলিতে পারিবেন। সুতরাং ইহার জন্য পরিবারে আর অতিরিক্ত ব্যয় করিবারও আবশ্যক হইবে না।

চতুর্থতঃ, গৃহিণীকে সর্ব্বদাই সদ্বিষয়ে আলোচনা দ্বারা পুত্র কন্যাদের হৃদয় পরহিতৈষণার দিকে ধাবিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জগতে কত প্রকার শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। সকলেই কোন না কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া নানা প্রকার শুভকার্য্য করিতে পারেন। দেশে কত দুঃখী ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হইতেছে, কত অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞানালোকের আবশ্যক হইতেছে, কত রোগ-শোক-তাপিত নরনারীর সেবার প্রয়োজন হইতেছে। এই সকল হিতকর কার্য্যে নারী স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া পুত্র কন্যাদিগকে আপন আপন শক্তি ও সুযোগ অনুসারে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। মাতার উৎসাহে সন্তানগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিবে।

নারীর শেষ কর্ত্তব্য, জীবন সংগ্রামের কঠোরতার মধ্যে পতি, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে শান্তিবারি প্রদান করা। জননী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁহার স্বভাব এমন মধুর ও কোমল হইবে, হৃদয় এমন স্নিগ্ধ ও সরস হইবে যে আত্মীয়স্বজন, অতিথি অভ্যাগত সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া প্রাণ জুড়াইবে; তাঁহার মিষ্টবাক্যে শোকতাপ ভুলিবে। তবেই তিনি প্রকৃত গৃহিণী নামের উপযুক্তা।

এইত গেল নারীর পারিবারিক জীবনের কার্য্য। সামাজিক জীবনেও তাঁহার নানাবিধ কার্য্য আছে। মহিলাগণ সামাজিক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে অনেক কার্য্য, অনেক সংস্কার অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। পুরুষশক্তির সহিত নারীশক্তি যুক্ত না হইলে কোন্ সমাজ কোন্ জাতি উন্নত হইতে পারিয়াছে? নারীজাতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীলা। তাঁহাদের প্রকৃতিতে বিনয়, ভক্তি, সরলতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণরাশি বিদ্যমান। তাঁহারা স্বভাবতঃ পাপ ও অসাধুতাকে ভয় করেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রধান কার্য্য বিলাসিতা হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়া সামাজিক জীবনে ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানা প্রকার বিলাসিতা, পাপ ও অসাধুতা আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। সভ্যতার নামে অনেক দূষণীয় ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্য্য সাধিত হইতেছে। রমণীকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে সভ্যতার বিকৃতি—পাপ, অসাধুতা, ও দুর্নীতি পরিত্যক্ত হইয়া সামাজিক জীবনে প্রকৃত শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদিগকে এমন একটী সামাজিক শাসনে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহার ভয়ে দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষ ও রমণীগণ সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভাল ভাল সভা সমিতি থাকা আবশ্যক। সেখানে উৎকৃষ্ট বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবার ও নানাবিধ হিতকর কার্য্য সাধনের ব্যবস্থা থাকিবে।

শিক্ষিতা নারীর আর এক কার্য্য— জ্ঞানশিক্ষা বিস্তার করা। আমাদেরই কত শত ভগিনী নিরক্ষরা হইয়া অতি দীন ভাবে কত কষ্টে কালযাপন করিতেছে, তাঁহার খবর কে রাখে? এই সুসভ্য গভর্ণমেণ্টের অধীনেও শতকরা ৮ জন বালক ও ৪টী বালিকার অধিক শিক্ষা পাইতেছে না। সুতরাং দেখুন দেশের অবস্থা কিরূপ, শিক্ষা বিস্তারের কত প্রয়োজন! ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক স্থানে শিশুশিক্ষার ভার একপ্রকার স্ত্রীলোকেরই হস্তে ন্যস্ত। আর আমাদের দেশে আমরাও যদি সচেষ্ট হইয়া যত্নের সহিত কার্য্যে অগ্রসর হই তবে ক্ষুদ্র আমরাও কিছু না কিছু অবশ্যই করিতে পারিব। আমাদের সমাজে কলাবিদ্যার অত্যন্ত অভাব। সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, শিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্য অন্যান্য দেশে যেরূপ দেখিতে পাই, সেরূপ আমাদের দেশে কোথায়? জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যার প্রচলনও বিশেষ প্রয়োজন। লেখাপড়া শিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, তেমনি কলাবিদ্যার জন্যও বিদ্যালয় স্থাপন বিশেষ আবশ্যক।

নারীর শেষ কার্য্য পরসেবা। সেবা রমণীর পরম ধর্ম্ম। প্রতি দেশে, প্রতি সমাজে নারীগণই সেবার জন্য প্রসিদ্ধা ও সম্মানিতা হইয়া আসিয়াছেন। আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে এ দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই দেখা যায়। হিন্দুমহিলাগণ যেমন আপন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নীরবে পরসেবায় জীবন কাটাইয়া দিতেছেন সেরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। তবে ইঁহাদের মত পরসেবা শুধু পরিবার বিশেষেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—সমাজের ও দেশের কার্য্যে তাহা পরিব্যাপ্ত করিতে হইবে। ভারতের ন্যায় এত দুঃখ দরিদ্রতা, এত রোগ শোক কোথায়? যে দেশে কোটী কোটী নিরক্ষর নরনারী উন্নত-সমাজের ঘৃণিত হইয়া অস্পৃশ্যরূপে জীবনযাপন করিতেছে, যে দেশে সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারী অনাহারে হাহাকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যে দেশে লক্ষ লক্ষ রুগ্ন, ভগ্ন ও দুর্ব্বল নরনারী রোগের যন্ত্রণায় করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, সে দেশে পরসেবার স্থানের অভাব কোথায়? সেবা বিষয়ে ইংরাজ রমণীগণ যে অগ্রগণ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগিনী ডোরা, কুমারী নাইটিঙ্গেল, কুমারী গ্রেস ড্বার্লিং প্রভৃতির খবর হয় ত অনেকেই জানেন। আমাদের দেশে মহাভারতেও ইহার দুই একটী দৃষ্টান্ত আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অর্জ্জুনের পত্নী সুভদ্রা কত যত্নের সহিত আহত ব্যক্তিদের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার করুণাপূর্ণ দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া রোগীগণ রোগশোক ভুলিয়া যাইত। খুঁজিয়া দেখিলে এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ধনরত্নের আকর এই ভারতভূমি সৎকার্য্য-রূপ ধনেও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই হীনা নহে। ভারতে এমন দিন গিয়াছে, যখন সমগ্র পৃথিবী ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিতা ও ভারতের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিল। আবার কবে ভারতে সেই সীতা সাবিত্রীর পতিভক্তি, গার্গী মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান, লীলাবতী খনার বিদ্যাবুদ্ধি, দ্রৌপদী সুভদ্রার সেবাপরায়ণতার দিন উপস্থিত হইবে? ঈশ্বর-কৃপায় ভারতে যে নবযুগের ও পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে রমণীগণ পুরুষের সহযোগিনী ও সহধর্ম্মিণী হইয়া নিশ্চয়ই সেই যুগকে ক্রমে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবেন। আমরা ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের হৃদয়ে বল প্রদান করুন; তাঁহার বলে বলী হইয়া আমরাও দেশের কার্য্যে, সমাজের কার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিই। তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের উপরে বর্ষিত হউক।

শ্রীপ্রতিভা নাগ।

লুইসা মে অল্কট্

শিশুদিগকে আনন্দ দানের ভিতর দিয়া, তাহাদের অজ্ঞাতসারে, তাহাদের উচ্চ বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করা, অত্যন্ত কঠিন কাজ। শিশুদিগকে আনন্দ দান করিতে গেলে শিক্ষাদান হয় না, আবার শিক্ষাদান করিতে গেলে, তাহা নীরস ব্যাপার হইয়া পড়ে; আমরা পদে পদে ইহা অনুভব করি। আজ যাঁহার

বিষয় বলিতেছি, তিনি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার গল্প পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধগণও আপনাদিগকে শিশু বলিয়া অনুভব করেন। ইঁহার নাম লুইসা মে অল্কট্।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে, আমেরিকার পেন্‌সিল্‌ভানিয়ার অন্তর্গত জার্ম্মান্ টাউন্ নামক স্থানে এমস্ ব্রন্সন্ অল্কট্ নামে একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আমেরিকায় আগমনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বেশ অবস্থাপন্ন এবং শিক্ষিত পরিবার ছিলেন। ইঁহার পিতা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের মধ্যে একজন। ব্রন্সনের অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁহার সামান্য পৈতৃক জমি ও গৃহ ছিল, আর তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই এক রকম করিয়া দিন চলিত। দরিদ্র হইলেও তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল, বিজ্ঞ, গভীর অধ্যয়ন-পরায়ণ, ধর্ম্মানুরাগী এবং পরোপকারী প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা, মত ও কার্য্য তৎকালীন লোকদিগের অপেক্ষা বহু অগ্রসর, উন্নত ও উদার ছিল। লুইসার শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অপর দিকে তিনি অপরের দুঃখ-বিপদের সময় নিজের অভাব সত্ত্বেও আনন্দের সহিত তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন। নিজেদের কত প্রকার অভাব, তবুও নিরাশ্রয় বিপথগামী বালিকাদিগকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।

মাতাও শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের কন্যা ছিলেন। তিনি স্বয়ং সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারদিগের পুস্তক অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। নিজেও সুন্দর গদ্য ও পদ্য লিখিতেন। তিনি সকল বিষয়ে স্বামীর সহকারিণী ছিলেন। অপরের দুঃখ-দুর্দ্দিনে তিনি অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া, যথাশক্তি তাহাদের সাহায্য করিতেন। কতবার নিজেদের তৈয়ারী সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন অপরকে দিয়া নিজেরা সামান্য কিছু খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন। এইরূপ সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তাঁহারা সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

এই দরিদ্র পরিবারের একটি বিশেষত্ব ছিল—নিরামিষ আহার। ব্রন্সন্ অনেক পাঠ ও চিন্তার পর স্থির করিয়াছিলেন যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরামিষ আহারই ঠিক। স্বামী স্ত্রী উভয়ে এবিষয়ে এক-মত হইয়া পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। ডাল ভাত, ব্রাউন ব্রেড, তরকারী প্রভৃতি তাঁহাদের খাদ্য ছিল। এই খাদ্যে তাঁহাদের সকলেরই শরীর যথেষ্ট সুস্থ ও সবল ছিল।

এইরূপ পবিত্র ভালবাসা-পূর্ণ গৃহে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ নবেম্বর লুইসা মে অল্কট্ জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই লুইসার শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যেমন সবল দেহ, তেমনি সতেজ মন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ব্রন্সন্ বোষ্টন নগরে গিয়া বাস করেন। বোষ্টনে যাইবার সময় তাঁহারা একটি ষ্টিমারে গমন করেন। লুইসার বয়স তখন প্রায় দেড় বৎসর। ষ্টিমার দেখিয়া তাহার মন সেই অদ্ভুত ব্যাপারটার সমস্ত ভাল করিয়া দেখিবার জন্য এরূপ ব্যাকুল হইল যে সে ধীরে ধীরে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় যে উঠিয়া গেল, ষ্টিমারে চড়িবার কিছুক্ষণ পরে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। অনেক অন্বেষণের পর দেখা গেল, সে এঞ্জিন ঘরে বসিয়া এক মনে এঞ্জিনের ক্রিয়া দেখিতেছে; তাহার কাপড় কালীতে ধূলাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে দিকে তার দৃষ্টিই নাই।

ব্রন্সন্ বোষ্টনে গিয়াছিলেন এইজন্য, যে সেখানে তিনি একটা স্কুল খুলিয়া, ছাত্রদিগকে সক্রেটিসের প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবেন। তিনি ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতি ও ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সে সময় খুব কম লোকই ব্যায়ামের মর্য্যাদা বুঝিতেন। এই কারণেই তিনি স্বাধীন ভাবে স্কুল খুলিয়া, তাঁহার উন্নত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তখন স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। সেইজন্য ব্রন্সন স্বীয় কন্যাদিগকে কোন বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠান নাই। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে কন্যাদিগকে গৃহেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। লুইসার শিক্ষার ভার প্রধানতঃ পিতার উপরই ছিল। তিনি পরম

আনন্দে কন্যাকে স্বীয় উন্নত আদর্শ অনুসারে শিক্ষা দিতেন এবং তাহার উন্নতি দেখিয়া পরিশ্রম সার্থক বোধ করিতেন। শারীরিক শক্তির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সব শিক্ষা ও উন্নতির মূল সুস্থ সবল দেহ। এই কারণে তিনি কন্যাদিগকে সর্ব্বদা বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দিতেন; লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে উৎসাহ দিতেন। লুইসাও ছেলেদের মত এইসকল খুব ভালবাসিত। জন্ম হইতেই তাহার শরীর সুস্থ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার শারীরিক শক্তিও যথেষ্ট বিকশিত হইয়াছিল। সে অধিকাংশ সময়ই ঘরের বাহিরে থাকিত।

মিষ্টার অল্কট্ দৌড়ান, লাফান এবং বাহিরে মুক্ত-বায়ুতে বহুক্ষণ যাপন যেমন শিক্ষার মূল বলিয়া মনে করিতেন, তেমনি শিশুদের ক্রিয়াগুলিকেও নানাবিধ শিক্ষা ও শাসনের উপায় বলিয়া জানিতেন।

লুইসা খেলাতেও বিশেষ তৎপর ছিল। সে তার বোনকে যেমন সত্য জীবন্ত মানুষ বলিয়া জানিত, তার পুতুলগুলিকেও সে ঠিক সেইরূপ মনে করিত। সে তার পুতুলকে কাপড় পরাইত, আবার ছাড়াইত; শোয়াইত, উঠাইত; তার জন্য জামা, জুতা, টুপী তৈরি করিত; দুষ্টামী করিলে শাস্তি দিত; অসুখ করিলে ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দিত। ঠিক যেন সত্যসত্যই সে মা, এবং পুতুল তার ছেলে।

বালিকা লুইসা পশুপক্ষীদিগকেও খুব ভালবাসিত। গৃহপালিত বিড়ালটা তার অতি প্রিয়পাত্র ছিল। পিতামাতা কন্যাদিগকে কখনও কোন জন্তুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে দিতেন না। মেয়েরা বিড়ালটাকে ছেলে সাজাইয়া খেলা করিত, তাকে আদর করিয়া ঘুম পাড়াইত, অসুখ করিলে ঔষধ দিত এবং সে মরিয়া গেলে, তারা তার শ্রাদ্ধ করিত। এইরূপে তাহারা খেলার ভিতর দিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিত।

একদিকে পশুপক্ষী ও প্রকৃতির সহিত নিজ জীবনের ক্রীড়াময় সম্বন্ধের ভিতর দেহ মন ও হৃদয়ের বিকাশ হইতেছিল, অপর দিকে স্নেহময় পিতার নিকটে উন্নত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা লাভ করিয়া লুইসা অতি দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। পিতামাতা সর্ব্বদা সন্তানদের ভাষা ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং সকল বিষয়ে তাহাদিগকে ভদ্র হইতে শিক্ষা দিতেন। সন্তানগণ যাহাতে পরিষ্কার রূপে মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা মনোযোগী ছিলেন, এবিষয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন।

সাত বৎসর বয়সের সময় পিতার পরামর্শ অনুসারে লুইসা ডায়েরী লিখিতে আরম্ভ করে। এই ডায়েরী লেখার ভিতর দিয়াই তাহার ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত হইতে লাগিল। পিতা তাহার চিন্তা সকল লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহ দিতেন, এবং স্বয়ং তাহা দেখিয়া দিতেন। এইরূপ অতি অল্প বয়সেই লুইসা মনের ভাব সুন্দর সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল।

গৃহশিক্ষা সম্বন্ধে অল্কট্ পরিবারের আর একটি বিশেষত্ব ছিল,—সন্তানদিগকে পত্র লেখা। কেহ কোন দোষ করিল, তাহাকে মুখে কিছু না বলিয়া, মা কিংবা বাবা পত্র লিখিয়া তাহা জানাইলেন এবং অতি মিষ্ট ও সুন্দর ভাবে উপদেশ দিলেন। মুখে বলার চেয়ে, পত্রদ্বারা উপদেশ গভীরতর রূপে হৃদয়ে বসিয়া যাইত। একবার পিতা "ধর্ম্মযুক্তির আনুগত্য" সম্বন্ধে লুইসাকে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রের উপদেশ লুইসার মনে জন্মের মত মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। কন্যাদিগের জন্মদিনে উপহারের সঙ্গে মাতা কিংবা পিতা একখানি সুন্দর পত্র লিখিতেন। এই পত্র উপহারকে জীবন্ত করিয়া তুলিত। মিষ্টার্ অল্কট্ দরিদ্র স্কুলমাষ্টার ছিলেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে সংসার চালাইবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। তবুও তাঁহারা সন্তানদের কল্যাণের জন্য, সময় করিয়া, পত্র লেখা, ডায়েরী দেখা প্রভৃতি কার্য্য যথারীতি করিতেন। এজন্য শুধু সময় নয়, যথেষ্ট মনোযোগ এবং চিন্তা আবশ্যক হইত।

তাঁহারা লুইসাকে কি প্রকার পত্র লিখিতেন তাহার কয়েকটী নমুনা দিতেছি :—

(১)

বীচষ্ট্রীট্, বোষ্টন, ১৮৮৯।

"আমার প্রিয়———, তোমার সপ্তম জন্ম দিনে আমার উপহার স্বরূপ এই পুতুলটি লও। এই "ডল্"টি আমার কর্ম্মিষ্ঠা লুইসার সাত বছরের খেলার সাথী হইবে। তুমি এর ভাল মা হইবে এবং একে ভালবাসিবে।"

তোমার মা।

(২)

"স্নেহের———, আজ তোমার দশম জন্মদিন। আশীর্ব্বাদ করি, আজ তুমি সুখী হও, ভবিষ্যতে প্রত্যেক জন্মদিনে তুমি যেন নূতন শান্তিলাভ কর ও এই প্রতিজ্ঞা নূতন করিয়া করিতে পার যে, তুমি ভগ্নীদিগের প্রতি কোমল হইবে, পিতামাতার বাধ্য হইবে, সকলকে ভালবাসিবে এবং স্বয়ং সুখী হইবে। তুমি লিখিতে ভালবাস ব'লে, তোমাকে উৎসাহ দিবার জন্য একটি পেন্সিলের বাক্স দিলাম। লক্ষ্মী মা, ক্রমাগত চেষ্টা কর। ভাল হওয়া, ভাল করা প্রতিদিন সহজ হইয়া আসিবে। তোমার উন্নতির জন্য তোমাকেই চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ তোমার কষ্টের কারণ তোমার নিজেরই ভিতরে আছে। কেবল সাহস ও সহিষ্ণুতার দ্বারাই তুমি ভাল মেয়ে হবে, সুখী হবে। তোমার মা তোমার জন্য এই প্রার্থনা করেন।"

(৩)

"তোমার পত্র পাঠে আনন্দে আমার দুই চোক জলে ভরে গেল। তুমি আমাকে এত সুখী করলে। ভগবান তোমার হৃদয়ে মার জন্য এত ভালবাসা দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।"

(৪)

"আজ সকালে তোমার স্বার্থপর ব্যবহারে বড় দুঃখিত হয়েছি; কিন্তু তোমার বাবার তিরস্কার তুমি যে নীরবে গ্রহণ করেছ তজ্জন্য আনন্দিত হয়েছি। অন্যায় কাজ করে, এই রকমই করতে হয়। নম্রভাবে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং আর অমন কাজ করো না।"

"আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তুমি ঠিক জায়গায় তোমার নির্ভর রেখেছ। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃত শক্তি ভগবানের কাছেই পাওয়া যায়। মা লক্ষ্মী, তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিতে চেষ্টা কর যে ভগবান তোমার নিকটে আছেন; তোমার দুর্ব্বলতার সময় তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

এইরূপ পত্রের দ্বারা সন্তানদিগের শিক্ষা ও শাসন কি সুন্দর প্রণালী! ইহার দ্বারা সন্তানদিগের মানসিক ও নৈতিক উভয়বিধ শিক্ষাই হইত। ডায়েরী লেখার উদ্দেশ্যও এই শিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠন। একখানা পত্রে মাতা লুইসাকে লিখিয়াছিলেন,— "মা, মনে রেখো, তোমার ডায়েরী তোমার ছোট জীবন-চরিত। এই ডায়েরী পবিত্র চিন্তা এবং শুভকার্য্যের ইতিবৃত্ত হোক এই প্রার্থনা করি। তা হ'লে তুমি সত্যসত্যই তোমার মাতার অমূল্য রতন হবে।"

এইরূপ পত্র এবং ডায়েরী লেখার ভিতর দিয়া, একদিকে যেমন ভাষা শিক্ষা—অতি সহজে সুন্দর ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের শক্তি লাভ হইতে লাগিল, তেমনি আত্মচিন্তা, আত্মপরীক্ষা ও শুভ সঙ্কল্প চরিত্রে দৃঢ়ভাবে বসিতে লাগিল।

এইবার লুইসার ডায়েরী হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বুধবার। আজ চিন্তা পুস্তকে লিখে বড় আনন্দ হচ্ছে। আজ জীবন অন্য সব দিনের চেয়ে অনেক বেশী আনন্দে পূর্ণ; আর এখন মরিতে ভয় করি না। খুব দৌড়িয়েছি। অনেকক্ষণ বসে বসে পাইন গাছের গান শুনেছি। সন্ধ্যার সময় ব্রেমারের "হোম" পড়েছি। আমার মনে আনন্দ আর ধরে না!"

"শুক্রবার। পড়া তৈরি করেছি। সন্ধ্যার সময় আমরা সেলাই কচ্ছিলাম, আর মা আমাদিগকে 'বোনিস্ওয়ার্থ' পড়ে শোনাচ্ছিলেন। কি চমৎকার!"

"বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যার সময় তিনি বল্লেন আমাদের শরীরের হাড়গুলি কোথায় কি ভাবে আছে এবং কেমন করে সরে যায়। আমি এত লাফালাফি করি এ বিষয়ে সাবধান হব।"

"শনিবার। আজ রেগে 'আনাকে' গাল দিয়েছি। বাবা সে কথাটার মানে দেখতে বল্লেন। তাই দেখে আমি আমার স্নেহের বোনকে এমন বিশ্রী কথা বলেছি ব'লে দুঃখে খুব কেঁদেছি।"

তের বৎসর বয়সের সময় লিখিত ডায়েরীতে এক স্থানে আছে—"আজ সকালে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠে, শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর দিয়া, গাছের ডালের তলা দিয়া আমি দৌড়াইতে লাগিলাম। শেওলা সব মখমলের মত দেখাচ্ছিল। আমি আনন্দে গান করিতে লাগিলাম। জগৎ কি সুন্দর! হৃদয়ে কি আনন্দ! শেষে আমি থামিলাম, দেখিলাম সমস্ত "ভার্জ্জিনিয়া" আলোকিত করিয়া সূর্য্য উঠিতেছে। এ যেন কবরের অন্ধকারময় জীবন হইতে স্বর্গের আলোকময় জীবনে প্রবেশ! সম্মুখে আলোকময় প্রকাণ্ড সূর্য্য, চতুর্দ্দিকে পাইন বৃক্ষের সঙ্গীত। একাকী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে একটি আশ্চর্য্য ভাব আমার মনে উদয় হইল। আমি যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিতে লাগিলাম—এমন আর কখনও করি নাই। নীরবে প্রার্থনা করিলাম, তাঁহার এই উপস্থিতির অনুভূতি যেন চির-জীবন রক্ষা করিতে পারি।"

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, অল্কট্-পরিবার বোষ্টন পরিত্যাগ করিয়া "কংকার্ড" (ম্যাসাচুসেটে) গমন করেন। সেখানকার বন জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র, পাহাড়, উপত্যকা দেখিয়া লুইসা আনন্দে মাতিয়া গেল। নগর অপেক্ষা সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ পল্লীগ্রাম তাহার অত্যন্ত প্রিয় স্থান হইয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে তাহার বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া তাহার হৃদয় এমন জাগিয়া উঠিল যে একদিন একটী "রবিন্" দেখিয়া আপনিই একটা কবিতা বাহির হইয়া পড়িল।

"এস এস, ছোট অতিথি, কোন অনিষ্ট কিংবা বিপদের ভয় করো না; তোমাকে এখানে দেখে আমরা আনন্দিত; কারণ তুমি গাও, "আনন্দময় বসন্ত নিকটবর্ত্তী।"

একাদশ জন্মদিনে মাতার পত্রের উত্তরে লুইসা একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিল। তাহাতে লিখিয়াছিল, "কবে স্বয়ং অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মাকে বিশ্রাম এবং সুখ দান করিতে পারিব, সেই আমার বাসনা।" তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় "নীরানা", "আমার রাজ্য" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা ডায়েরীতেই লিখিত হইয়াছিল। সে কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা উচ্চদরের কবিদের উপযুক্ত। একটি কবিতায় তিনি মনকে বলিতেছেন, "ওরে আমার মন, তুই এত বিষণ্ণ কেন, তোর এত ভয়, এত অশ্রু কেন? জগতের চারিদিকে এত আনন্দ, এত পুষ্প, এত সঙ্গীত, তুইও পাখীর গানের সঙ্গে মিশে জীবনটাকে যৌবনময় ক'রে তোল্।" "আমার রাজ্যে" লিখিয়াছেন—"আমার একটা ছোট রাজ্য আছে, চিন্তা এবং ভাব সেই রাজ্যের অধিবাসী; এ রাজ্য সুশাসনে রাখা বড় কঠিন। আমি কেমন ক'রে আপনাকে সাম্‌লাব এবং জীবনকে আলোকময় ও সঙ্গীতপূর্ণ করে তুল্‌ব।" এইরূপে লুইসা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। চঞ্চল বালিকা ক্রমশঃ তেজস্বিনী নারীতে পরিণত হইলেন।

অল্কট্ পরিবারে একদিকে সন্তানদিগের শিক্ষার প্রতি, স্বভাব চরিত্রের শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতি যেমন দৃষ্টি ছিল, তেমনি জগতের দুঃখদারিদ্র্যে হৃদয় যাহাতে ব্যথিত হয় সে শিক্ষার জন্যও যথেষ্ট আয়োজন ছিল। কয়েকজন বালিকা পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; অল্কট্গৃহিণী তাহাদিগকে পাপের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বগৃহে স্থান দান করেন। বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজের মেয়েদের মধ্যে এমন বিষ তিনি কেন রাখিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন,—"এসব তো জানতে মেয়েদের বাকি থাকবে না, ওদের তো সংসারে ঘুরতে ফিরতে হবে; তা ওরা আমার কাছে থেকেই জানুক যে পাপ এবং তজ্জনিত দুঃখ কেমন ব্যাপার, এবং তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করুক।"

একদিন সমস্ত রান্না হইয়া গিয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, একটি দরিদ্র পরিবার অনাহারে মারা যাইতেছে, তৎক্ষণাৎ মাতা ও কন্যাগণ নিজেদের আহার সেই পরিবারে লইয়া গেলেন, তাহাদিগকে

খাওয়াইয়া আসিলেন। আর একদিন রাত্রে আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় এক প্রতিবেশীর বাড়ী অনেক গণ্যমান্য অতিথি এসেছেন জেনে, সমস্ত খাদ্য তাঁহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন; নিজেরা অল্প কিছু খাইয়া থাকিলেন। আর একদিন, তখন শীতকাল, শনিবার, সন্ধ্যার সময় হইতে খুব বরফ পড়িতেছিল। একটি ছেলে আসিয়া বলিল, যে তাহার বাবা বাড়ীতে নাই, মার কোলে কচি ছেলে, বড় শীত পড়েছে, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া কিছু কাঠ দেন। তাঁহাদেরও সেদিন কাঠ কম ছিল এবং ঘরে ছোট ছেলে ছিল, সোমবারের পূর্ব্বে কাঠ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মাতা ভাবিতেছিলেন, কি করিবেন। পিতা বলিলেন, "অর্দ্ধেক কাঠ ওকে দাও এবং ভগবানের উপর নির্ভর কর; হয় কাঠ আসিবে, না হয় শীত কমিবে।" ছেলেটিকে অর্দ্ধেক কাঠ দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরেই একজন কৃষক এক বোঝা কাঠ আনিয়া যাচিয়া দিয়া গেল। লুইসার জননী প্রায়ই বলিতেন, "জলে তোমার রুটির টুকরা ফেলে দাও, কিছুদিন পরে তা' মাখন-মাখান হ'য়ে ফিরে আসবে।" কি জীবন্ত বিশ্বাস ও নির্ভর! কি দয়ামায়া পূর্ণ হৃদয়! এমন গৃহের সন্তান হইয়া লুইসা যে দেবী সদৃশ হইয়াছিলেন, তাহা আর বিচিত্র কি! অপরের জন্য ইচ্ছা করিয়া (বাধ্য হইয়া নয়) কষ্ট স্বীকার না করিতে পারিলে আর প্রেমের মূল্য কি? ধর্ম্মই বা কি?

সন্তানদিগের সুশিক্ষাবিধানের পূর্ব্বোক্ত অমূল্য উপকরণগুলি ব্যতীত, আর একটি উপকরণ ছিল—দারিদ্র্য। ব্রন্সন্ প্রায়ই বলিতেন, ধন সম্পদ সন্তানশিক্ষার একটি গুরুতর অন্তরায়। পরিশ্রম, আত্মনির্ভর প্রভৃতি যে অবস্থায় অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়, সে অবস্থা সন্তানশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। লুইসা এবং তাঁহার ভগ্নীগণ বাল্যকাল হইতেই সকল প্রকার গৃহকার্য্যে মাতার সহায় ছিলেন। লুইসা পিতামাতার গুরুতর পরিশ্রম ও নানা প্রকার অভাবের কষ্ট দেখিয়া, অতি অল্প বয়স হইতেই কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবেন এই চিন্তা করিতেন। এইজন্য চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় হইতে তিনি গল্প লিখিয়া ছাপিতে আরম্ভ করেন। শেলাই করিয়াও যথাসাধ্য উপার্জ্জন করিতেন।

পিতা কখনও স্কুলে পড়াইতেন, কখনও কাগজে লিখিতেন, কখনও বা বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন; এইরূপে যে অর্থাগম হইত তাহাতে কোনরূপে দিন চলিত। একবার অল্কট্ বক্তৃতা দিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে, একদিন রাত্রে সকলে ঘুমাইয়াছে, খুব শীত, কন্‌কনে বাতাস, এমন সময় কে বেল্ ধরিয়া টানিল। মাতা গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। কন্যাগণ পেছনে পেছনে গেলেন। অল্কট্ এবং তাঁহার সঙ্গে পাঁচজন দীন-দরিদ্র গৃহে প্রবেশ করিল। সকলেই শীতে, অনাহারে মরণাপন্ন, কিন্তু তবুও অল্কটের দৃষ্টি প্রসন্ন, উজ্জ্বল। মাতা ও কন্যাগণ তাঁহাকে এবং সেই দরিদ্রদিগকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন, সমস্ত শরীর ঘষিয়া গরম করিলেন, তারপর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। কেহই টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। অনেক রকম কথা বলার পর বালিকা 'মে' জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, তুমি কত টাকা পেয়েছ?" পিতা চারটি মাত্র শিলিং (প্রায় ৩৲ টাকা) পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলেন—"এই মাত্র।" বড় মেয়েদের চক্ষে জল আসিল,—এত পরিশ্রমের এই ফল! কিন্তু মাতা সপ্রেমে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি বলি, ওই-ই ঢের, তুমি নিরাপদে এবারে ফিরে এসেছ, আর কিছু চাই না।" স্বামী ও স্ত্রীর দৃষ্টিতে এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত হইল। কন্যাগণ এই প্রেম দেখিয়া অবাক্ হইল, কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল।

অতঃপর আঠার বৎসর হইতে লুইসা গৃহকর্ম্ম করিতেন, এবং সেলাই করিয়া, গল্পের বই লিখিয়া, স্কুলে পড়াইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহারই মধ্যে চ্যারিটি (দাতব্য) স্কুলের গরিব ছেলেমেয়েদের একদিন করিয়া পড়াইতেন। অপরের সাহায্য করা অল্কট্ পরিবারের বিশেষত্ব। উনিশ বৎসর বয়সের সময় লুইসা এক গৃহস্থ পরিবারে গৃহকার্য্য পরিদর্শকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা লুইসাকে সব কার্য্যই করিতে দিতেন। গুণবতী কন্যা নীরবে রাঁধুনীর কাজ

হইতে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কাজ সকলই সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং দুই মাস পরে গৃহে আসিয়া সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া অতি সুন্দর একটি গল্প লিখিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই তাঁহার নিজের জীবনের অনেক ঘটনা গ্রথিত হইয়াছে।

একুশ বাইশ বৎসর বয়সের সময়, তাঁহার মনে অভিনেত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে লইয়া স্বয়ং নাটক লিখিয়া গৃহে অভিনয় করিতে থাকেন। মাতা কন্যাকে গৃহে অভিনয় করিতে উৎসাহ দিলেন, কিন্তু অভিনেত্রী হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইতে দিলেন না। সুতরাং লুইসা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া, গল্প লিখিয়া এবং শেলাই করিয়াই অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন; এবং পিতামাতার যৎসামান্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখ দূর হইল না। পঁচিশ বৎসর বয়সেও এক একটি গল্প লিখিয়া, ১৫।২০।২৫ অথবা ৩০ টাকার বেশী পাইতেন না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লুইসার হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল। এই ব্যাপারে তাহা জাগিয়া উঠে। তখন তিনি আহত সৈন্যগণের সেবার জন্য ওয়াশিংটনের এক হাঁসপাতালে নার্স (nurse) বা শুশ্রূষাকারিণী হইয়া গমন করেন। তাঁহার সেবায় নিরাশের প্রাণে আশা হইত; সকলেই বলিত, "তুমি যেন সত্যই আমার মা!" এইরূপে দিনরাত্রি সেবার গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, অবশেষে 'নিউমোনিয়ার' লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পিতা সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কংকর্ডে লইয়া গেলেন। গৃহে গিয়া কয়েক দিন প্রাণ যায় যায় অবস্থায় যাপন করিয়া, অবশেষে আরোগ্য লাভ করিলেন; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। আরোগ্যলাভ করিয়াই এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, তিনি "হাঁসপাতালচিত্র" লেখেন। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ার পর চতুর্দ্দিকে তাঁহার নাম পড়িয়া গেল। পূর্ব্বে প্রকাশকগণকে সাধিয়া বই দিতে হইত, এখন তাহারাই লুইসার বই ছাপিবার জন্য সাধাসাধি করিতে লাগিল। পনর বৎসরের পরিশ্রম এতদিন পরে সার্থক হইল। এতদিন পরে, নিজের উপার্জ্জিত অর্থে পিতামাতার দুঃখ দূর করিয়া, আনন্দে লুইসার মনে হইল,—জন্ম সার্থক। অতঃপর স্বীয় ভগ্নী 'মে'কে শিক্ষার জন্য তিনি ইটালী প্রেরণ করেন, এবং অন্যান্য আত্মীয়দিগকেও অর্থ সাহায্য করেন।

১৮৬৪ সালে, "মুড্‌স্" নামে একখানি বই লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালেও যথেষ্ট অর্থের অধিকারিণী হইয়াও, তিনি গৃহকার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সব বিক্রয় হইয়া গেল। চারিদিকে লুইসার নাম পড়িয়া গেল। এই সময় তাঁহার প্রবন্ধের জন্য সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ ৫০০৲ হইতে ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিতেন। তিনি এক সঙ্গে ছয় সাত বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করিতেন। সমস্ত রাত্রি লিখিতে পারিতেন। কিন্তু মাতা কন্যাকে এইরূপ পরিশ্রম করিতে দিতেন না। কারণ এরূপ পরিশ্রমে দুদিনেই শরীর খারাপ হইত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে একজন মহিলার সহচরী হইয়া, তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হন, এবং নানা স্থান দর্শন করিয়া যথেষ্ট শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করেন। ১৮৭০ সালে, তিনি পুনরায় স্বয়ং ইউরোপ যাত্রা করেন, এবং প্রায় দুই বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর ক্রমাগত তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার আয় বাড়িতে লাগিল। পুস্তক লিখিয়া তিনি মোট প্রায় ৬,০০,০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অর্থাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতে লাগিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মাতার মৃত্যু হওয়ায় বৃদ্ধ পিতার সকল ভার তাঁহাকে লইতে হইল। নিজের শরীর অসুস্থ বলিয়া স্বয়ং পিতার যথেষ্ট সেবা করিতে পারিতেন না। কিন্তু অর্থের অভাব ছিল না। অর্থ দ্বারা যতদূর সম্ভব পিতার যত্নের আয়োজন করিলেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর যাপনের পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২।৩ রা মার্চ্চ পিতার মৃত্যু হয় এবং ৬ই মার্চ্চ লুইসা পিতার অনুসরণ করেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী ২৫ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই সে সকল অনুবাদিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেওয়া হইল না। ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অশ্রুর ভাষা

সহসা বুঝাতে গিয়া ভাষা গেল থামি,
একি মহা জলোচ্ছ্বাস পারাবার-লীলা,
আত্মার গহন পুরে কোথা তল! নামি
তীরহারা কোন্ পথে ভাসাইবে ভেলা?
অনন্ত প্রান্তর একি বিরাট দুস্তর,
অরণ্য শ্বসিছে কোথা অলক্ষ্য পশ্চাতে,
শ্যাম শষ্পাস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাদিত গহ্বর,
আলোক তিমিরে হারা তিমির জ্যোতিতে!
একি উন্মথিত ঝঞ্ঝা বিদ্যুজ্জ্বলিত,
ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘোরারাব জগত প্রমাথী
ভাস্বর আলোকচ্ছটা রঙ্গে লীলায়িত,
স্বপ্ন-সাগরের-কূলে জ্যোৎস্নাময়ী রাতি।
নীরবে দাঁড়াল অশ্রু নয়নের কোণে
ভাষা হোল পূর্ণপ্রাণ সে পরশ-ক্ষণে!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার

সকলেই জানেন আমরা জানিয়া শুনিয়া অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি। তস্করেরা জানে যে চুরি করা দোষ, তথাপি চুরি না করিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য চৌর্য্যবৃত্তির সহিত আমাদের প্রবন্ধের কোনই সম্বন্ধ নাই;—চৌর্য্যবৃত্তি রাজনৈতিক বা পারমার্থিক হিসাবে দোষ। আমরা কেবল যে কারণে স্বাস্থ্যের অপচয় হয় তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

জ্ঞানের গোচরে আমরা যে সব স্বাস্থ্যহানিকর কার্য্য করিয়া থাকি তাহার চাক্ষুষ কারণ বর্ত্তমান। ইহার প্রধান হেতু অভ্যাস বলিতে হইবে। অর্থাভাব, নিন্দা প্রভৃতিও কখন কখন ইহার কারণের অন্তর্গত। আবার সভ্যতার সহিত ঐ সকল দোষ মানব-সমাজে প্রবেশ করিয়া থাকে। যে জাতি যত সভ্য সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানের অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত তত অধিক।

পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য উদাহরণের অপ্রতুল হইবে না।

প্রথমে ভোজনের বিষয় দেখা যাউক—

(১) অতিভোজন—প্রাণী মাত্রেরই আহার দরকার। আহার ব্যতীত শরীরের বৃদ্ধি বা দৈনিক পরিশ্রমজনিত শরীরের ক্ষয়ের পূরণ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়াই অতিভোজন যে অপকারী তাহা বোধ হয় আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন। ইংরাজি প্রবাদ—We eat to live and not live to eat ইহার অর্থ—আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য আহারের দরকার, রসনার পরিতৃপ্তির জন্য জীবন ধারণ নহে। সাধারণতঃ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমাদের শরীরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব ২৫ বৎসর অবধি আমাদের বেশী আহার দরকার। কারণ তখন শরীরগঠন ও ক্ষয়পূরণ উভয়ই আহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ২৫ বৎসরের পরে কেবলমাত্র ক্ষয়পূরণের জন্যই আহার প্রয়োজন।

একটী ইমারৎ তৈয়ারি হইবার পর কেবল মাঝে মাঝে মেরামৎ দরকার হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া সুরকি, ইট, কড়ি, বরগা দিন দিন উক্ত বাড়ীর মধ্যে জমা করিলে যেমন উহা মূষিক, আরসুলা প্রভৃতির বাসস্থান হইয়া উঠে, সেইরূপ শরীর গঠনের পর (অর্থাৎ ২৫ বৎসরের পর) অধিক আহার করিলে শরীর ব্যাধি-মন্দির হইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা অনুরোধ করিয়া খাওয়াইতে বড় পটু, এবং যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণবাড়ীতে ২০০।৫০০ লোকের মধ্যে দশ গণ্ডা লুচি, পাঁচ সের মিষ্টান্ন প্রভৃতি উদরস্থ করিলেন, তাঁহাকে সুবর্ণপদক দেওয়া না হইলেও দেশময় তাঁহার নাম বাহির হইয়া যায় যে "বেশ খাইয়ে লোক।"

বড় দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে যাঁহারা স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া লোককে মিতাহার প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা প্রদানে ব্যস্ত, তাঁহারাই নিজে অমিতভোজী ছিলেন।

মিতাহার যে স্বাস্থ্যের কল্যাণ সাধন করে তাহা বঙ্গবিধবাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয়।

অতি ভোজনে অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্লশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যাধি ঘটিয়া থাকে।

(২) ক্ষিপ্রভোজন —আহার চিবাইবার জন্য ঈশ্বর দন্তপাটিকে যে পেষণযন্ত্র স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। অবশ্য দন্তের অন্যান্য গৌণ কার্য্য বর্ত্তমান, কিন্তু পেষণ ক্রিয়াই যে ইহার মুখ্য কার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আহার চর্ব্বণের বিষয়ে আমরা উদাসীন। আহার্য্য বস্তু ভাল করিয়া না চিবাইলে সম্যকরূপ হজম হয় না তাহা আমরা জানি, আমরা আরও জানি যে, ভারতবাসীর পক্ষে চর্ব্বণ আরও বেশী দরকার; যেহেতু এদেশের আহার সাধারণতঃ শর্করা জাতীয় (ভাত, ডাউল, আটা, ময়দা ইত্যাদি) এবং শর্করাজাতীয় খাদ্য লালার দ্বারা অনেক পরিমাণে হজম হইয়া থাকে।

কেরাণীসম্প্রদায়ই সাধারণতঃ ক্ষিপ্রভোজী। অবশ্য ইহা কেবল অফিসের দেরী হওয়ার ভয়ে। তথাপি তাঁহাদের বুঝা উচিত যে চাকুরি অপেক্ষা প্রাণের মূল্য অধিক।

শিশুরাও তাড়াতাড়ি আহার করিয়া থাকে। অবশ্য ইহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই; কারণ তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান কোথায়? শিশুদের অভিভাবকেরা তাহাদের এই দোষ সংশোধন না করিয়া বরং যাহাতে তাহাদের তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়, সে বিষয় উৎসাহ দিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা জানেন ইহা একটী স্বাস্থ্যহানিকর কার্য্য।

(৩) দন্ত পরিষ্কার —দন্তের উপকারিতার বিষয় সকলেই জানেন, অথচ দন্তরক্ষণের উপর আমাদের কাহারও যত্ন নাই। ইহা বাঙ্গালীদের একটী জাতিগত দোষ। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর এবং আহারান্তে যে দন্তপরিষ্কার করা হয় তাহা কেবল নাম মাত্র। দন্তের মধ্যস্থলে ফাঁকে ফাঁকে যে সব ময়লা আবদ্ধ থাকে তাহা পচিয়া দন্তমূল খারাপ করিয়া দেয় এবং তজ্জনিত দন্তশূল প্রভৃতি ব্যাধি বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে বর্ত্তমান। অনেক সময় উক্ত ময়লা পচিয়া মুখে দুর্গন্ধ আনয়ন করে। দন্ত রক্ষণের প্রধান উপায় কেবল দন্তপাটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

(৪) বায়ু (Ventilation)—বায়ু-আতঙ্ক আমাদের একটী বিষম ব্যাধি। আমরা জানি, বায়ু ব্যতীত আমাদের প্রাণ একদণ্ডও রক্ষা পায় না। উদ্বন্ধনে বা জলমজ্জনে মৃত্যুর কারণ কেবলমাত্র বায়ুর অভাব। অনেক সময় দেখা গিয়াছে—আবদ্ধ ঘরে অধিক লোক একত্রে শয়ন করিলে উক্ত সুপ্তব্যক্তিরা অচৈতন্য হইয়া পড়ে, ইহাও বায়ুর অল্পতার ও বায়ু দুষ্টির ফল।

আমাদের প্রাণের সহিত বায়ুর খুব নিকট সম্বন্ধ ইহা আমরা সকলেই জানি; অথচ আমরা শয়ন ঘরে বায়ু চলাচলের কোনরূপ ব্যবস্থা করি না। অনেকের আবার বায়ু-আতঙ্ক এত বেশী যে যাহাতে বিন্দুমাত্র হাওয়া ঘরে প্রবেশ না করিতে পারে সে বিষয়ে তাহারা বিশেষ যত্নবান। অনেক বাড়ীতে দেখিয়াছি যে, গবাক্ষাদির ফাঁক পর্য্যন্ত কাগজদ্বারা আবদ্ধ, পাছে ঘরের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে। আবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই উক্ত ব্যাধির প্রাবল্য বেশী। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অনাবৃত বা ঈষদাবৃত স্থানে শয়ন করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত বা গরিব উচ্চ বর্ণের লোকেরা (যাঁহারা কলিকাতাবাসীর নিকট অসভ্য নামে অভিহিত) সাধারণতঃ মেটে ঘরে বাস করিয়া থাকেন। মেটে ঘরের উপরের দিকের খানিকটা স্থান (অর্থাৎ দেওয়াল ও আচ্ছাদনের সঙ্গমস্থল) আবরণহীন। একারণ ঘরের দূষিত বাষ্প সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে এবং বাহিরের পরিষ্কার বাতাস অনায়াসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে কম সুবিধা নহে। যদি বঙ্গপল্লীতে ম্যালেরিয়াদেবী বিরাজ না করিতেন, তাহা হইলে আজ হাওয়া বদলানের জন্য কলিকাতাবাসীদিগকে দেওঘর, রাঁচি, পুরীতে যাইতে হইত না, ইহা "হলপ" করিয়া বলা যাইতে পারে।

আজকাল যক্ষ্মারোগ এদেশে দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। যে বাড়ীতে অদ্যাপি এই সাংঘাতিক ব্যাধি

আবির্ভূত হয় নাই, সে গৃহস্থকে খুব ভাগ্যবান বলিতে হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন যে, ফুসফুসের ব্যাধির পক্ষে (বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগের পক্ষে) নির্ম্মল বায়ু বিশেষ ঔষধ, অথচ আমরা বাসগৃহে বায়ু রোধের পক্ষপাতী। জ্ঞানের অপব্যবহারের ইহা অপেক্ষা জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে!

অনেকে বলিয়া থাকেন, "নিদ্রিতাবস্থায় শরীরে বায়ু লাগান উচিত নহে"—এজন্য তাঁহারা রাত্রিকালে গবাক্ষাদি বন্ধ রাখিয়া দেন। কেবল অভ্যাসের দোষে সুপ্তাবস্থার বাতাস লাগানের জন্য আমরা অসুস্থতা বোধ করি। ইতর জন্তু বা নিম্ন জাতীয় লোক অনাবৃত স্থানে বাস করিয়া কোনরূপ অসুস্থতা বোধ করে না; বরং তজ্জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিই হইয়া থাকে। আর আমরা পুরুষানুক্রমে আবৃতস্থানে বাস করিয়া আসিতেছি এবং ইহার ও অন্যান্য অভ্যাসের ফলে দিন দিন আদিম মনুষ্য অপেক্ষা দুর্ব্বল হইতেছি।

সকলেই জানেন যে, বায়ু অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ এই দুইটী বাষ্পের মিশ্রণে গঠিত। অক্সিজেন্ শরীরের উত্তেজক; ইহার উত্তেজনা শক্তি মন্দীভূত করিবার জন্য ইহার সহিত নাইট্রোজেন মিশান থাকে। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে কারবন্ ডাইঅক্সাইড্ (Carbon dioxide) বাষ্প বাহির হইয়া বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলে; অতএব দেখা যাইতেছে যে লোকসংখ্যার উপর বায়ুর অবস্থা নির্ভর করে। আবার সবুজ বৃক্ষাদি রৌদ্রের সংস্পর্শে প্রাণী পরিত্যক্ত উক্ত কারবন্ ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে অক্সিজেন্ ছাড়িয়া দেয়। অতএব বাসস্থানের নিকট বৃক্ষাদি রোপণ করা খুব দরকার; কারণ তাহাতে নির্ম্মল বায়ু প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাসস্থানের নিকট বৃক্ষাদির অভাব অল্পায়ুর অন্যতম কারণ—ইহা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত। বায়ুর উপকারিতা উপলব্ধি করিবার জন্য উপসংহারে আমরা বায়ুকে সম্বোধন করিয়া গুপ্ত কবির উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"জগতের আয়ু তুমি বায়ু নাম ধর।
বায়ু রোধ করি শেষে আয়ু বায়ু হর॥
জলের জীবন নাম, নাম মাত্র সার।
তুমি কর জীবনের জীবন সঞ্চার॥"

(৫) পরিধান—স্বাস্থ্যের জন্য পরিধেয় বস্ত্রাদি যে সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার হওয়া দরকার তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই; তথাপি আমরা অনেক অছিলা করিয়া ময়লা কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকি।

বাড়ীর স্ত্রীলোকদের "কাচা কাপড়" প্রথম সমস্যা। পাচিকা ও অন্যান্য মহিলারা তাঁহাদের "শুদ্ধীকৃত কাচা কাপড়" লইয়াই ব্যস্ত, পাছে অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে। অথচ সাধারণতঃ উক্ত "কাচা কাপড়" তৈলাক্ত ও মসিনিন্দিত। শাস্ত্রকারেরা স্বাস্থ্যের জন্যই সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। রন্ধনাদি সকল কার্য্য শুদ্ধাচারে হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই জন্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন "কাচা কাপড়" ঐ সকল কার্য্যে প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল কাপড় জলে ধুইলেই শুদ্ধ হইল, তাহা মলিন হউক আর পরিষ্কৃত হউক, সে বিষয় কাহারও লক্ষ্য নাই। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অপকারী।

অনেকে বাহিরের আবরণ বেশ পরিষ্কার রাখিয়া থাকেন, কিন্তু ভিতরে সাধারণতঃ ময়লা জামা পরিধান করেন। দীন বাঙ্গালী জাতি আত্মীয় স্বজনকে নিজের দৈন্য দেখাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন, সেই জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। উক্ত ময়লা জামা ত্বকের উপর থাকায় লোমকূপ আবদ্ধ থাকিলে অনেক ব্যারাম ঘটিয়া থাকে। তবে ইচ্ছা করিলে ইহার প্রতিকার সহজে করা যাইতে পারে। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন উক্ত ভিতরকার জামা সাবান দ্বারা ধৌত করিলে আর স্বাস্থ্যের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না।

ছত্র বা ছাতা—আজ কাল ছাতা ব্যবহার করা একরূপ অসভ্যতার মধ্যে। প্রচণ্ড সূর্য্য মস্তকের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আমরা তাহা সহ্য করিতে কুণ্ঠীত নহি; মুষলধারায় বৃষ্টি আপাদমস্তক একেবারে সিক্ত করিয়া গেল, তাহাও অম্লানবদনে সহ্য করিতেছি, তথাপি ছাতা স্পর্শ করিব না। কারণ লোকে তাহা হইলে বিদ্রূপ করিয়া "বাঙ্গাল" বলিবে। যদি ছাতা ব্যবহার করা "বাঙ্গালের" লক্ষণ, তাহা

হইলে বুঝিতে হইবে, "বাঙ্গালেরা" আমাদের অপেক্ষা সভ্য।

রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে বিচরণ করিলে অনেকসময় মাথা ধরিতে দেখা যায়; কখন কখন সর্দ্দিগর্ম্মি বা সন্ন্যাস রোগও হইয়া থাকে। অধিকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ব্রঙ্ক ইটিস্, বাত প্রভৃতিও ইহা হইতে আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে।

বোধ হয় আমরা ইংরাজদিগের অনুকরণেচ্ছায় ছাতা লইতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সাহেবেরা যে টুপি মাথায় দেন, তাহা অন্ততঃ রৌদ্র নিবারণে বিশেষ কার্য্যকারী। যদি বল—অনুকরণই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যের শুভাশুভ গ্রাহ্য করিব না, তবে কাপড়ের সঙ্গে সাহেবদের সোলার হ্যাট্ পরিয়া বহুরূপী সাজি না কেন? বোধ হয় তাহা হইলে প্রদর্শনীতে দু-পয়সা রোজগারের ব্যবস্থাও হয়।

পক্ষান্তরে, ছাতা আমাদের (কেবল আমাদের কেন, সমগ্র প্রাচ্যজাতির) চিরন্তন সামগ্রী। ইহা প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আমাদের আচার ব্যবহারের সহিত বিজড়িত। স্বাধীন হিন্দু রাজত্বকালে রাজদণ্ড ও রাজচ্ছত্র রাজার চিহ্ন ছিল। রঘুবংশের সিংহ "একাতপত্রম্ (একচ্ছত্রম্) জগতঃ প্রভুত্বম্" ইত্যাদি বলিয়া মহারাজ দীলিপের সার্ব্বভৌমত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। শ্যামদেশে ছাতাকে দেবসম্মান দেওয়া হয়। শুনিতে পাই, এতদ্দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত জমিদার-পুত্র তাঁহার হীরামুক্তা খচিত ছাতা বন্ধক দিয়া এক লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ছাতা আমাদের কেবল নিত্য ব্যবহার্য্যের সামগ্রী নহে; ইহা অনেক সময় বাবুগিরির মধ্যেও পরিগণিত হইত। আর ৫০ বৎসরের মধ্যে ঐ নিত্য ব্যবহার্য্য ও বাবুয়ানার জিনিষ আজ অসভ্যতার চিহ্ন!

মলমূত্র ত্যাগ—মলত্যাগের সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। তবে আজ কাল সভ্যসমাজে যে একটী কদর্য্য অভ্যাস মস্তক উত্তোলন করিতেছে তাহা দেখিয়া যথার্থই মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আজকাল অনেক দেশী সাহেব মলত্যাগের পর জল ব্যবহার করেন না—কাগজ দ্বারা জলের অভাব পূরণ করেন। হিন্দুসমাজে ইহা নিন্দনীয় ত বটেই, উপরন্তু ইহা গালির মধ্যে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ধরিতে হইলে ইহা অতীব কু-অভ্যাস; যেহেতু, এতদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে। বিষ্ঠা কাগজ দ্বারা কোনমতেই সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা যায় না। এবং সকলেই জানেন, বিষ্ঠায় অতি সহজেই কীটাণু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের অনেকে বাসভবনের সন্নিকটে বা পুষ্করিণীর কিনারায় মলত্যাগ করিয়া থাকেন। যে বাড়ীতে তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইতেছে, সেই গৃহের নিকটে মলত্যাগ করিয়া যে তাঁহারা তথাকার বাতাস কিরূপ বিষময় করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শারীরিক অবস্থা কিরূপ বিপজ্জনক করিতেছেন তাহা একমুখে বলা যায় না।

আবার পুষ্করিণীর ধারে মলত্যাগ করা আরও অনিষ্টজনক, যেহেতু সেই পুষ্করিণীর জলের উপর তাঁহাদেরই জীবন নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা সকলেই জানেন যে উক্ত মল বৃষ্টির দ্বারা পুষ্করিণীর মধ্যে নীত হইয়া জলকে কিরূপ বিষাক্ত করিতেছে। এই সকল কারণেই পল্লীগামে মধ্যে মধ্যে "ওলাবিবি", "শীতলাদেবী" প্রভৃতি ভৈরবীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন এবং শত শত নরনারী তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কালের কবলে পতিত হইয়া থাকেন।

ডুব দিয়া জল খাওয়ার মত অনেকে স্নানের জন্য জলে নামিয়াই প্রস্রাব করিয়া থাকেন।* হয়ত সেই মূত্র, পানীয় জলের সহিত তাঁহারই ঘরে নীত হইয়া তাঁহারই উদরে পুনঃ প্রবেশ করিবে। এ অভ্যাস ভাল কি মন্দ তাহা তাঁহারা একবার অনুগ্রহ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন কি?

আমাদের দেশে খুব অল্প সংখ্যক লোকই প্রস্রাবান্তে জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রস্রাবের পর জল

* অনেকে জলের ভিতর প্রস্রাব শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহা গল্প করেন। ইহা হইতেই আমরা এ কু-অভ্যাসের বিষয় জ্ঞাত আছি।

ব্যবহার করা অতি উত্তম প্রথা। তবে দেশের পনর আনা তিন পাই লোক এ অভ্যাসের বহির্ভূত। যাঁহারা প্রস্রাবের পর জল ব্যবহার না করেন অনেক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করেন না।

তবে এদেশের আচার ব্যবহারের দোহাই দিলে অনেকে তাহা গ্রাহ্যই করিবেন না—বিলাতি "নজীর" দেখান আবশ্যক। মল মূত্র ত্যাগের পর আমাদের জল ব্যবহার করা খুব উত্তম প্রথা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির অনুকূল বলিয়া এক ইংরাজ শিক্ষক নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত শিক্ষক এক কালে কলিকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন; এক্ষণে ইনি লণ্ডন নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।

নেসা—আমাদের দেশে প্রধান নেসা মদ, আফিং এবং তামাক। গঞ্জিকা প্রভৃতিও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজ কাল আবার কোকেন, মর্‌ফিয়াও দেশে চলিতেছে। চা-পায়ীরা চা-পানকে নেসার মধ্যে ধরেন না—তবুও ইহা নেসা ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। অতি মাত্রায় তাম্বুল চর্ব্বণও যে নেসা নহে তাহাও এ পাপমুখে বলিতে পারিতেছি না। তবে সুরা ও তাম্বুলের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। আহারান্তে দুই একটী পান খাইলে হজমের সুবিধাই হইয়া থাকে। ইহাতে অম্ল ব্যারাম দমন রাখে এবং দন্তমূল শক্ত করে। কিন্তু মাত্রা অধিক করা খারাপ।

মদ—একেত নেসামাত্রই কদর্য্য, তাহার উপর মদ্যপান যে অতীব ঘৃণাজনক তাহা নিশ্চয়ই সকলে জানেন। ইহাও সাহেবদের অনুকরণের ফল। অনেকে আবার, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মদ্যপান করিতেন ও গো-মাংস ভক্ষণ করিতেন"—ইত্যাদি তর্ক করিয়া মদ্যপান প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা তর্কস্থলে মুখে যতই বলুন, কিন্তু মনে মনে জানেন যে ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সুরাপান হইতে যে কি ব্যারাম হয় না, তাহা জানি না। সকলেই জানেন মদ্যপান হইতে যকৃৎ খারাপ [illegible] শেষে উক্ত যন্ত্র পাকিয়া যাওয়া, বদ্‌হজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদ্‌রোগ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মস্তিষ্কের ব্যারাম প্রভৃতি যাবতীয় দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ইহা হইতে উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

নিধি

কোন্ গগনে উঠ্‌বে এ চাঁদ
শুভ্র জ্যোতিঃ, পূর্ণ কলা?
কোন্ দেশেতে ঝর্‌বে এ মেঘ—
সজল আকাশ-নয়ন-গলা?
কোন্ বাগানে ফুট্‌বে এ ফুল
মাতিয়ে বিশ্ব সৌরভে?
কোন্ অরণ্য হবে ধন্য
এমন ছায়ার গৌরবে?
কোন্ মেঘেরি বুকের আলো,
কোন্ মেঘেরি কণ্ঠহার,
জ্ব'লে অম্‌নি নিভে যাবে
স্থির বিজুলী এই আমার?
কোন্ তাপিত কর্‌বে সিনান
এম্‌নি শীতল সরসে?
কোন্ লৌহ স্বর্ণ হবে
এমন মণির পরশে?
কোন্ বিজনে কল্‌কলিয়ে
বহিয়ে যাবে নদী এ,
রোঁয়ার ক্ষেতে, কাশের বনে
ঝলক্ ঝলক্ ঢেউ দিয়ে?
আমার সাধা, মন্ত্র-পড়া
বীণার যন্ত্রী হবে কে?
আমার বীণা ঝঙ্কারিবে
এমন মানুষ ভবে কৈ?
ক'দিন নিয়ে রাখ্‌বে আটক্
আমার খাঁচার পক্ষীটি?
আমার বুকে আস্‌বে ফিরে
আমার বুকের লক্ষ্মীটি।*

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

* লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "পল্লী" হইতে।

মাল্য ও নির্মাল্য

আমরা আলো ও ছায়া-প্রণেত্রী রচিত "মাল্য ও নির্মাল্য" গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। কবি অনেক বৎসর পূর্ব্বে "নির্মাল্য" শীর্ষক ক্ষুদ্র একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার অপ্রকাশিত পুরাতন ও নূতন রচিত কবিতাগুলি নির্মাল্যের সঙ্গে একত্র করিয়া এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি কবির মর্ম্মোচ্ছ্বসিত করুণ ও মধুর ভাবে সিক্ত হইয়া হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে। এজন্য কোথায়ও কৃত্রিম ভাব অথবা অযথা বর্ণনা নাই; কবি নরনারীর হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিশাইয়া দিয়া তাঁহাদের গোপন মর্ম্মস্থানে যে প্রেম, যে বেদনা, যে আশা নিরাশা, যে হর্ষ বিষাদ, যে সংগ্রাম, যে মর্ম্মস্পর্শী ভাব দর্শন করিয়াছেন, তাহাই যেন প্রাণের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলির এমনই একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে, পাঠকের মনকে উদাস করিয়া উহার ভাবে তন্ময় করিয়া ফেলে। পাঠক কবিতার ভাবের মধ্যে ডুবিয়া নরনারীর মনোরাজ্যের ঘটনাগুলি যেন ছবির মত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই এমন করুণ ও বিষাদময় ভাব রহিয়াছে, উহা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে, প্রাণের মধ্যে বেদনা জাগাইয়া দেয়; এ সংসারে যাঁহারা মর্ম্মবেদনায় চোখের জল ফেলিতেছেন, তাঁহাদের অশ্রুর সঙ্গে নয়নজল মিশাইতে ইচ্ছা হয়। কবির চিন্তাশক্তিও অসাধারণ। মানুষের এক একটি গভীর ভাবকে মনের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া অতি অল্প কথায় উহা প্রকাশ করেন। এজন্য গ্রন্থের এক একটি ছোট কবিতা অল্প সময়ের মধ্যেই পড়া হইয়া যায় বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা ভাবিতে হয়, উহার রস সম্ভোগ করিতে হয়। গ্রন্থকর্ত্রীর বাহুল্যবর্জ্জিত প্রাঞ্জল ও সুমধুর ভাষা তাঁহার নিজস্ব; তিনি আপনার ভাবের অনুরূপ ভাষা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। এক এক স্থানে অল্প গুটিকয়েক শব্দের মধ্য দিয়া কত ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। "সংসার জ্ঞান" শীর্ষক কবিতায়—কবি লিখিয়াছেন—

"মোর সুখ ছিল যবে তোমরা বলিতে সবে
এতটুকু নাহি ওর সংসারের জ্ঞান?
না ছিল কি ছিল ক্ষতি? এ কি নিদারুণ অতি
জ্ঞান বিষ, মরে প্রেম, ভেঙ্গে যায় প্রাণ।"

আবার "নারীর অভিমান" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

"যত চল বাড়ে পথ, পূরেনাকো মনোরথ
তৃষা বাড়ে, শান্তি মরে, জনমে সংশয়।"

উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকের "জ্ঞান বিষ, মরে প্রেম" ও "তৃষা বাড়ে, শান্তি মরে" এই ছোট দুটি পংক্তির মধ্যে অনেকগুলি কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থের মধ্যে "আধঘুমে" একটি সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতাটি অতি উৎকৃষ্ট; উহার ভিতর গ্রন্থকর্ত্রীর প্রগাঢ় চিন্তা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। "হিসাব" আর একটি বড় কবিতা। তন্মধ্যে একটি জীবনের বিষাদ-কাহিনী অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রন্থের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রহিয়াছে। দুই তিনটি কবিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"নিরুপায়" কবিতাটি বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর নারীর অতি উজ্জ্বল চিত্র। উপেক্ষিতা নারী স্বামীকে বলিতেছেন—

"প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব,
যত রুক্ষ তীক্ষ্ণ বাণী আছে গো ভাষায়
সব আনি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব
সিক্ত চোখে মৌন মুখে, আমি নিরুপায়।"

এই দীর্ঘ কবিতার শেষ কথা এই:—

"আজ শত কর্ত্তব্যের মাঝখানে আনি,
গুণিতেছ মোর ভ্রান্তি ত্রুটি অপরাধ।
কর তুমি, প্রিয়তম, যা হয় বিহিত
তোমার বিচারে; মোর কেহ নাহি আর
এ ধরায়, যার দ্বারে হব উপনীত
তব অবিচার হতে লভিতে বিচার।"

কি মর্ম্মস্পর্শী উক্তি, কবিতাটি পড়িতে পড়িতে বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে, অশ্রুতে নয়ন সিক্ত হইয়া যায়।

গ্রন্থকর্ত্রী "সংকীর্ণ ও স্বাতন্ত্র্য" শীর্ষক ক্ষুদ্র একটি কবিতার মধ্যে অতীতের পক্ষপাতী এক শ্রেণীর রক্ষণশীল লোকের চিত্র কেমন উৎকৃষ্ট রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ভুলে ওরা বর্ত্তমান গাহে অতীতের গান
আঁখি দুটি পিছু পানে চায়,
চরাচর নিরন্তর হইতেছে অগ্রসর
সে কথা কেবলি ভুলে যায়!
ক্ষুদ্র রেখাটির মত থেকে যাবে অল্পায়ত
মৃদুগতি, অতি অগভীর।
বহুল সরিতে মিশে, জানে না হইবে কিসে
মহানদ বিশাল শরীর।
জানেনা যে কি নীরধি সম্মুখেতে নিরবধি
বক্ষঃ পাতি সকলেরে লয়,
সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য তরে এরা যে শুকায়ে মরে
কিবা অর্দ্ধ পথে পড়ে রয়।

কবি অনেক কবিতার এক একটি ছোট ছোট প্যারার মধ্যে সুন্দর ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রন্থকর্ত্রী "কর'না জিজ্ঞাসা" শীর্ষক কবিতার এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"ওগো প্রিয়, মোর মনে হয়,
প্রেম যদি থাকে মাঝখানে,
আনন্দ সে দূরে নাহি রয়।
প্রাণ যবে মিলে যায় প্রাণে,
সঙ্গীতে আলোক পায় লয়,
যত ভয় যতেক সংশয়।"

"আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক কবিতার এক স্থানে—

"কি যেন গো কি যেন গো চাই
স্বপনের ছায়া তাহা নয়,
এত খুঁজি তবু নাহি পাই
তারি তরে তৃষিত হৃদয়।"

"সুলভ" শীর্ষক কবিতার এক স্থানে—

"সুলভ সমীর, রবি-চন্দ্রিমা-কিরণ,
কি সুলভ বিধাতার প্রেমের সমান,
যে হবে দুর্লভ হয়ে হোক মূল্যবান্,
আশীর্ব্বাদ কর হোক সুলভ এ জন।"

"আক্ষেপ" শীর্ষক কবিতার এক স্থানে—

"জগত হইত যদি কেবল হৃদয়ময়
হ'ত শুদ্ধ আত্মার আলয়,
মলিন ধূলির স্তূপ না থাকিত দেহ যদি
ধরা বুঝি হত সুখময়।"

এই সকল শ্লোকগুলি বার বার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয়। ছোট ছোট সঙ্গীত যেমন মনের মধ্যে গভীর ভাব জাগাইয়া দেয়, তেমনি এই ছোট ছোট কথাগুলি অন্তরে গভীর ভাব উদ্দীপিত করে।

"অজানারে হবে জানিতে" এই কবিতাটিও আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। গুটি কয়েক কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"দেখা দিয়া যায়, নাহি দেয় ধরা,
বিজলীর মত বিহ্বলতা ভরা,
খেলে এ হৃদয় খানিতে;—
তারে ভাল করে হবে জানিতে।

* * *

লক্ষ ঢেউ আসি পড়িছে বেলায়,
কোন্ মায়াবিনী তা লয়ে খেলায়,
কোথা হতে উঠি কোথা ফিরে যায়,
কাহার অমোঘ বাণীতে?
তাহারে হইবে জানিতে।"

অজ্ঞাত অজানিতকে একজন হৃদয়ের সম্মুখে তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য ও অসীম প্রেমের ঈষৎ আভাস দিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে, আবার কোন্ রহস্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইতেছে; এই অজানিতকে জানিতে পারিলেই নরনারীর অনন্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়।

তাই আমরাও কবির সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া বলিতেছি—

"সেই অজানারে হবে জানিতে,
যে পলায় দূরে তারে বিশ্বে ঘুরে
নিজপুরে হবে আনিতে।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

স্ত্রীজাতির পরাধীনতা

প্রকৃতি (Nature) মানবজাতির প্রধান শিক্ষক ও উপদেষ্টা। সামাজিক ব্যবস্থা যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত হয়, সেই পরিমাণে সমাজের উন্নতি হয়। তাহার বিপরীত ব্যবস্থাই পতনের লক্ষণ। দিনের পর যেমন রাত্রি হয়, তেমনি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অকল্যাণ হয়। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যজাতি সকলের শিক্ষাপ্রণালী, সামাজিক রীতি, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতিরও সমাজে সেই স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত, যে স্থান প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত। স্বভাবতঃ নারীগণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছেন। এই সকল গুণের সদ্ব্যবহার করিবার অধিকার তাঁহাদের পূর্ণমাত্রায় থাকা উচিত। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বিবাহের আদর্শ ইহা নহে যে, পত্নী স্বামীর দাসী হইবেন; কিন্তু, উভয়ে পরস্পরের প্রেমের সাহায্যে সমান ভাবে জীবন যাপন করিবেন। স্ত্রী কেবল সন্তান প্রসবের যন্ত্রস্বরূপ, এবং নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য পতি-সেবা, একথা সেই পরিমাণে সত্য যে পরিমাণে পুরুষের জীবনের উদ্দেশ্য পত্নীসেবা। প্রত্যেক নরনারীর জীবন এক একটি অমূল্য পদার্থ। তাহার বিকাশের বিঘ্নসাধন মহা অপরাধ। যে সমাজে সকলেই নিজ নিজ শক্তির বিকাশের সুযোগ পায়, তাহাই আদর্শ-সমাজ।

বৈদিক যুগে, নারীজাতির অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতি-সঙ্গত ছিল। কেবল যে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা নহে, নারীগণ পুরুষদিগের ন্যায় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। বেদের অনেক শ্লোক নারীগণ কর্ত্তৃক রচিত। পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্য করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল। অবরোধের অভাব বশতঃ, নারীগণ নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন, এবং নানা প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতেন। কিন্তু জাতিভেদের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ পূজাপার্ব্বণাদির অধিকার হইতে অপর জাতিদিগের সহিত নারীগণকেও বঞ্চিত করেন। সেই হইল পতনের মূল। তারপর ক্রমশঃ এই মত প্রচারিত হইল, যে "নারীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পতিসেবা।" ক্রমশঃ যতই অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই একদিকে যেমন পুরুষগণ আপনাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে লাগিলেন, অপর পক্ষে তেমনি নারীর পতিপরায়ণতা সম্বন্ধে দিন দিন নূতন শাস্ত্র সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ভারতীয় নারীর পতিপরায়ণতা বা "পাতিব্রত্য" জগতে অতুলনীয়। "পাতিব্রত্য" রমণীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। কিন্তু "অতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।" পতিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে, এবং শান্তচিত্তে তাঁহার সেবা করিবে, নারীর প্রতি এই উপদেশ কখনও কল্যাণকর নহে। এইরূপে নারী-জীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে হইতে অবশেষে, বৌদ্ধযুগের শেষে, নিদারুণ সতীদাহ প্রথার অবির্ভাব হইল। এই প্রথা শত শত নিরীহ রমণীর জীবন-পুষ্প অকালে নিষ্ঠুর ভাবে ভস্মসাৎ করিতে লাগিল, এবং সমাজে নারীজাতির স্থান অত্যন্ত হীন করিয়া দিল। তারপর দিন দিন অজ্ঞানতা ও অনাচার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই অজ্ঞান অন্ধকারে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখনও সেই অজ্ঞান অন্ধকার নিশার অবসান হয় নাই।

(২)

জ্ঞানই শক্তি। যে দেশে বা যে সমাজে জ্ঞানের উন্নতি নাই, সে দেশ ও সে সমাজের মর্য্যাদাই নাই। অন্যান্য সকল জাতিই তাহাদের জীবন ও সুখ সুবিধা তুচ্ছ করিয়া তাহাদের দ্বারা আপন আপন স্বার্থ সাধন করিতে চেষ্টা করে। অবশেষে মূর্খদিগকে শিক্ষিত

ব্যক্তিদিগের অন্যায় আচরণ সহ্য করিতে হয়। ধীরে ধীরে হতভাগ্যগণের এমন অবনতি হয়, যে তাহারা অন্যায়কে অন্যায় বলিয়াও বুঝিতে পারে না; এবং নিরন্তর অত্যাচারে তাঁহাদের শক্তি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভারতীয় স্ত্রীজাতির ঠিক এই অবস্থা হইয়াছে। জ্ঞানের অভাবেই ভারতের নিম্নজাতি সকল ও নারীগণ অত্যাচার ও হীনতার পঙ্কে ডুবিয়াছে। একমাত্র জ্ঞানই এই দুর্গতি হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে।

মুসলমান আগমনের সময় হইতে এদেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, এবং হাজার বৎসর ধরিয়া সেই কুপ্রথা সমাজের শক্তিশোষণ করিতেছে। সেই সঙ্গে অবরোধের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপে ভারতীয় নারীগণ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সকল জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহাদের শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই রহিল না। জ্ঞানহীন বলহীন, এবং পরাধীন হইয়া ভারতীয় রমণী-গণের জীবন দুঃখ ও বিষাদের আলয় হইয়া রহিয়াছে।

দেশাচারের প্রভাব সভ্যদেশেও আছে। কত কুপ্রথা ও দুর্নীতি সভ্য সমাজেও প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এত অধিক কুপ্রথা কোনও সমাজে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে পারে না। এইজন্য আমরা স্ত্রীজাতির সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের কোনও আবশ্যকতাই দেখিতে পাই না। স্ত্রীজাতির প্রতি শত শত বৎসর ধরিয়া যে অত্যাচার হইয়াছে, সেই সকল আচার প্রতিরোধ করিবার কোন কারণই আমরা খুঁজিয়া পাই না! আমাদের তো এই অবস্থা। আমরাই আবার আমাদের সভ্যতা ও জাত্যভিমানের গর্ব্ব করি। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতসন্তানদিগের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করি! আমরা স্বরাজ চাই! আমাদের পরিবারের অবস্থা কি একবার ভাবিয়া দেখ; সেখানে স্বরাজ ও স্বাধীনতা কতটুকু স্থাপন করিয়াছ, তাহা অগ্রে নির্ণয় কর।

নারীজাতির এইরূপ পরাধীনতা ও দুর্গতিতে পুরুষ-দিগের ক্ষতি হইতেছে, কি লাভ হইতেছে? বালিকা মাতার সন্তান-প্রসব, অশিক্ষিতা মাতাকর্ত্তৃক সন্তান পালন, এবং গৃহে কেবল অশিক্ষিতা নারীদিগের সঙ্গ—ইহাদ্বারা গৃহে সুখ, আনন্দ ও শিক্ষা কি প্রকারে স্থান পাইবে? ভারতের ১৫ কোটি প্রাণীকে জ্ঞান, শক্তি ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া কখনও ভারতের কল্যাণ হইতে পারে না। এই মহা আপদ হইতে ভারত-রমণীকে উদ্ধার করা আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের প্রকৃত স্বার্থ।

প্রাচীন কালে গ্রীস্ দেশে বহুসংখ্যক দাস ছিল। গ্রীক্‌গণ শিল্প সাহিত্যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাসদিগকে শিক্ষাদান করিতে ভয় পাইতেন, পাছে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল পরে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে সামান্য লেখা পড়া জানা দাস হইলে কাজের সুবিধা হয়, অতএব তাহাদিগের জন্য একটা প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিলেন। সেখানে দাসদিগের সন্তানগণ একটু লেখাপড়া শিখিত এবং ভাল দাস কি করিয়া হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ করিত।

আমাদের এখন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যেরূপ ভাব দেখা যায়, তাহা সেই প্রাচীন গ্রীকদিকের দাস শিক্ষার ন্যায়। কন্যাদিগকে এতটুকু শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা যেন ভাল করিয়া পতিসেবা করিতে পারে, গৃহের কায কর্ম্ম ভাল করিয়া করিতে পারে,—ভাল দাসী হইতে পারে।

সর্ব্বসাধারণের সুখ সুবিধা এবং উন্নতির জন্য শিক্ষা আবশ্যক। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য অবরোধ, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা দূরীকরণের সহিত শিক্ষা বিস্তার আবশ্যক। কেবলমাত্র শিক্ষাই এদেশীয় রমণীকুলকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত জননীর গৌরব-ময় পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। কিন্তু সে শিক্ষা প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা নহে। যতদিন নারীগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইবেন, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন সমাজে তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান লাভ ঘটিবে না। নারীগণ যতদিন রাজনীতি, সমাজসংস্কার, পরিবার

প্রতিপালন প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত যোগদান করিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না। অতএব আমাদের কন্যাদিগের জন্য দেশের সর্ব্বত্র বহু সংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এত বড় দেশে, দুচারিটি নহে, দুচারি শত কলেজ এবং সহস্র হাই স্কুল আবশ্যক। শিক্ষার দ্বারা কখনও অকল্যাণ হয় না।

শ্রী——

প্রেমের প্রকৃতি

(১)

প্রকৃতির একটি সুনীল চক্ষের মত উদয়সাগর রুদ্র মরু উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত,—চারিদিকে ঘনপুঞ্জ গিরিশৃঙ্গ আঁখি-পল্লবের মত তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে;—সেই ছায়াস্নিগ্ধ উদয়সাগর প্রেমপ্লব আঁখির মত সদাই টলটলায়মান! তীরে কমলমীর একটী পার্ব্বত্য দুর্গ,—রাজপুতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির-প্রহরী, বীর-হৃদয়ের মণিহারের মত উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করিতেছে!

দুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী অরুণা সহচরী পরিবৃতা হইয়া উন্মুক্ত বাতায়ন-তলে বসিয়া উদয়সাগরের নীলজল ও মুণ্ডিতমস্তক তাপসবৃন্দের মত আরাবলি পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, আর সমীরহিল্লোল রাজকুমারী অরুণার কৃষ্ণ কেশগুচ্ছে দোল দিয়া সৌরভসিক্ত হইয়া পলাইয়া যাইতেছিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চন্দাবৎ সিংহ ও কুশাবৎ সিংহের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—সখি!"

সহচরী মুন্না বলিল—"চন্দাবৎ সিংহ রাজবারার কুঙ্কুম-কুসুম, তাঁর সৌন্দর্য্যে যেন দিক উছলিয়া উঠে;—তাঁর প্রতি শর চালনে যেন রূপ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়; রাজবারার মাঠে মাঠে যেমন আফিং ফুলের মাদক সৌন্দর্য্য পাষাণ কঙ্কর ভূমির গোপন হৃদয়ের রক্তভপ্ত কাহিনী সৌন্দর্য্যের তুলিকায় ফুটিয়ে তুলে, দু'দিনের জন্য প্রাণকে মুগ্ধ করে, এ ঠিক তেমনি। পরিণাম যা'ই হোক সখি, কিন্তু সত্যই ইহা প্রাণ-তৃপ্তিকর। প্রাণের উন্মত্ত তৃষা দু'দিনের এ ক্ষণিক আমোদে পরিতৃপ্ত হ'তে চায়—বাসনা শাশ্বত ছেড়ে এমনি অতৃপ্তির অগ্নি-শিখায় আত্মদান করে। আর কুশাবৎ সিংহের চেহারা যেন বন্য হস্তীর মত; কিন্তু শুনেছি, মহারাণা বিগত মোগল যুদ্ধে কুশাবৎ সিংহের বীরত্বেই বিজয়ী হইয়া ফিরিয়াছেন। দ্বাদশবার মোগল যুদ্ধে অবগাহন করিয়া কুশাবৎ সিংহের যশঃসূর্য্য মেবারের মধ্যগগনে উদিত হইয়াছে; কিন্তু কি বলিব রাজকুমারী, তার রূপ দেখে তুমি মূর্চ্ছা যাবে।"

রাজকুমারী। রূপ যাই হোক সখি, সে বাহিরের ক্ষণিক তৃপ্তির আপাত সুখ বই কিছুই নয়। রক্ত মাংস ও প্রাণের সহিত সে রূপের যোগ নাই। যে রূপের আলোর আভা প্রাণে পৌঁছে না তাহা কখনই সত্যরূপ হ'তে পারে না। রূপ—আলো, প্রাণের আলোই সত্যরূপ। বাহিরের চোখে তুই সেরূপ দেখবি কি করে! কুশাবৎ সিংহকে আমায় দেখাতে পারিস্?

মুন্না। কাল যখন চন্দাবৎ সিংহ ও কুশাবৎ সিংহ ফিরে আস্‌বেন, তখন দুর্গতোরণে আমাদের মহারাণা তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করবেন। পুর-মহিলারাও সে দৃশ্য দেখবার জন্য দুর্গতোরণের শীর্ষ-প্রকোষ্ঠে সমবেত হইবেন। সেখানে গেলেই চন্দাবৎ ও কুশাবৎ সিংহ উভয়কে দেখতে পাবে। রাজকুমারী, চন্দাবৎ সিংহকে দেখলে নিশ্চয়ই তুমি মোহিত হবে। চন্দাবৎ মেবারের প্রস্ফুটিত কমল।

রাজকুমারী। মুন্না, চন্দাবৎ সিংহ সুন্দর, কিন্তু তুই কি কুশাবৎ সিংহের বীরদেহে কোন সৌন্দর্য্যই দেখ্‌লি না?

মুন্না। কি বলিব রাজকুমারী, কুশাবৎ সিংহকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাঁর বীরত্বের কথা মনে পড়ে, তখন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে।

রাজকুমারী। কাল আমরা দুর্গতোরণশিরে বসিয়া তাঁহাদিগকে দেখ্‌ব—কাল তুই খুব ভোরে বাগান থেকে ফুল নিয়ে আসিস্, বীরদ্বয়ের মাথায় আমরা পুষ্পবৃষ্টি করব।

(২)

পরদিন কমলমীর দুর্গের সিংহদ্বারে কাতারে কাতারে লোক জমা হইয়াছে। সশস্ত্র সৈনিকবৃন্দ বাসন্তী রঙের পাগড়ী বাঁধিয়া রাস্তার উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুর্গতোরণশিরে পুরমহিলারা সমবেত হইয়াছে। দুর্গদ্বারে রত্নাসনে মহারাণা উপবিষ্ট। শৈলপ্রান্তে চন্দাবৎ ও কুশাবৎ সিংহকে দেখা যাইতেছে। ক্রমে তাঁহারা দুর্গপ্রান্তে উপনীত হইতেই লক্ষকণ্ঠে "মেবার ভূমির জয়" শব্দ ধ্বনিয়া উঠিল। চন্দাবৎ ও কুশাবৎ সিংহ সে নিনাদে প্রতিধ্বনি করিয়া "জয় মেবারেশ্বরের জয়" বলিয়া মহারাণাকে অভিবাদন করিলেন। মহারাণা কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের হস্তধারণ করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। লক্ষকণ্ঠে "বীরমাতা মেবার ভূমিকি জয়" শব্দ ধ্বনিয়া উঠিল। রাণার সমভিব্যাহারে বীরদ্বয় তোরণদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দুর্গশিরস্থ পঞ্চরঙী জাতীয় পতাকার প্রতি কিছুক্ষণ অবনতশির হইয়া রহিলেন। দুর্গশিরোপরি উপবিষ্ট মহিলারা তাঁহাদের মাথায় পুষ্পচন্দন বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরদ্বয় ঈষৎ উন্নত নয়নে পঞ্চরঙী পতাকার দিকে নিরীক্ষণ করিতেই দেখিলেন—অলোকসামান্যা রূপবতী রাজকন্যা অরুণার হস্ত হইতে অজস্র পুষ্পসম্ভার তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। উভয়েই সেই রূপ দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইলেন; এমন অসামান্য রূপরাশি তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই, এ যেন স্বর্গসুষমার মহিমাময় বিকাশ!

বীরদ্বয় আনন্দঝঙ্কারের মধ্যে নগরে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

পরবৎসর মহারাণাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। সমস্ত সর্দ্দারবৃন্দ রাণার মন্ত্রণাগৃহে পরামর্শ করিবার জন্য সমবেত হইলেন। সম্রাট এবার অগণিত সেনাবাহিনী লইয়া মেবার ধ্বংশের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। রাজপুতের মুষ্টিমেয় সৈন্য এ বিশাল সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। রাজপুত ভয় করে না,—বীরত্ব তাহাদের চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম, অসি তাহাদের শাস্ত্রানুশাসন এবং সাহস তাহাদের পদমর্য্যাদা। মোগল সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া জীবন ত্যাগের প্রস্তাবই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া সভায় গৃহীত হইল। দিবারী গিরিবর্ত্মে কে মোগল-বাহিনীকে বাধা দিবে?—কুশাবৎ সিংহ সগর্ব্বে এ "বীড়া" গ্রহণ করিলেন।

দিবারী গিরিসঙ্কটে শত্রুকে বাধা দেওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। স্থির হইল, কুশাবৎ সিংহ পঞ্চসহস্র সৈন্য লইয়া দিবারী গিরিবর্ত্মের দ্বার অবরোধ করিয়া থাকিবেন, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মহারাণা মীরপুর গিরিসঙ্কটের নিকট অবস্থান করিবেন।

এই যুদ্ধের পূর্ব্বে নগরীতে আনন্দ উৎসবের সহিত রাজকুমারী অরুণার বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে, স্থির হইল। কে জানে এই উৎসবই নগরীর শেষ উৎসব কি না!

(৪)

বিবাহের দিন সমাগত হইল। রাজকুমারী স্বয়ম্বরা হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, রাজ্যের রাজন্যবর্গ বিবাহ-মণ্ডপে সমাগত হইয়াছেন। আজ চন্দাবৎ সিংহের বদন-মণ্ডল হাস্যচ্ছটায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি মহারাণার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পার্শ্বচর এবং সমস্ত রাজকার্য্যে রাণার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। স্বয়ং মহারাণা তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী। বৎসরাধিক যাবৎ যে লাবণ্যময়ীকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আজ সেই রমণী-রত্নহার গলায় পরিবেন! আনন্দে চন্দাবৎ সিংহের স্বভাব-সুন্দর মুখশ্রী আরও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে কুশাবৎ সিংহের মুখে একটি গম্ভীর সৌন্দর্য্য ভাসিয়া উঠিয়াছে—সে যেন আত্মত্যাগের মহিমা;—হিমালয়-শৃঙ্গ হইতে বিগলিত জাহ্নবী-ধারার মত পরের উপকারের জন্য সম্পূর্ণ আত্মদান! কুশাবৎ সিংহ সভার এক কোণে বসিয়া আছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কদাকার, সুতরাং রমণীরত্ন লাভের আশা পোষণ তাঁহার পক্ষে শুধু বিড়ম্বনা। কিন্তু ভালবাসার অন্তঃসলিল প্রবাহ তাঁর হৃদয়ভূমি সতত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। বাহিরের চক্ষু তাঁহার সেই সূক্ষ্ম মর্ম্মস্থানটুকু খুঁজিয়া দেখে নাই।

স্বয়ং মহারাণার একান্ত ইচ্ছা কন্যা অরুণা চন্দাবৎ সিংহকে বরমাল্য অর্পণ করেন; তিনি একজন চারণকে কীর্ত্তিগান গাহিতে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন।

চারণদেব রাজকুমারী অরুণার সমীপবর্ত্তী হইয়া গাহিলেন—

"ফুটিয়া উঠেছে কমল যত
আকুল ভ্রমর গুঞ্জন রত।
কোমল কোরকে মধুর সুধা
ঘুচায় সতত জগত ক্ষুধা।
প্রেম গুঞ্জনে প্লাবিয়া দিক
গাহিছে যতেক পাগল পিক।
"চাদোয়া কমল" মেবার স্থলে
ফুটিয়া উঠেছে সুধা-হিল্লোলে
পর গো তাহারে কণ্ঠে তুলিয়া
প্রেম আনন্দে সকল ভুলিয়া।"

রাজকুমারী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিলেন—"চারণদেব কি বীর-সঙ্গীত সব ভুলিয়া গিয়াছেন? পুষ্পপেলব বর্ণনা বীরাঙ্গনার নিকট শোভা পায় না।"

চারণদেব লজ্জিত হইয়া গাহিলেন;—

"ঐ শোণিতসিক্ত পতাকা স্মৃতি
তুলিয়া মহান্ মহিমা কীর্ত্তি
মাখিয়া অঙ্গে বীর-রুধির
মর্ত্তে মেবার জাগায় শির।
প্রতাপ যাহার বন্দিত বীর
ভুবনে কীর্ত্তি যাহার স্থির;
সমরে বাপ্পা অজেয় বীর
নাশিল সমরে তুচ্ছ শরীর;
সংগ্রামে কেশরী অমর বীর
ধরিয়া পতাকা রহিল স্থির
কঠিন মৃত্যু চরণে ধরি
অবশ অঙ্গ রহিল পড়ি।
বীরের জননী মেবার ভূমি!
পর্ব্বত মত আকাশ চুমি,
তব মুখরিত কানন ভূমি
গাহিছে কীর্ত্তি দিবস যামী।"

রাজকুমারী সহাস্যে বলিলেন—"এই ত চারণদেবের উপযুক্ত গান হইয়াছে।"

চারণদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী অরুণা বিবাহ-মণ্ডপে আগমন করিলেন। সভার সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করিয়া সভার এক কোণে মৌন উপবিষ্ট কুশাবৎ সিংহকে দেখিতে পাইলেন। কুমারী অরুণা পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

রাজকুমারীর এ হেন নির্ব্বাচনে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন!

বিবাহানুষ্ঠানের পর কুশাবৎ সিংহ নববধূকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তারপর দিন কুশাবৎ সিংহ সসৈন্যে দিবারী গিরিবর্ত্মের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রেম যেখানে উজ্জ্বল,—কর্ত্তব্য সেখানে স্থির। এ বিবাহের পর সকলেই স্থির করিয়াছিল কুশাবৎ সিংহ এবার দিবারী গিরিবর্ত্মের ভীষণ যুদ্ধাভিযান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন;—কিন্তু তাঁহার নিষ্কলঙ্ক প্রেম কর্ত্তব্যকে বরং আরো অবিচল রাখিল।

নূতন উৎসাহে, বর্দ্ধিত তেজে কুশাবৎ সিংহ দিবারী গিরিবর্ত্মের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দিবারী গিরিবর্ত্মে উপনীত হইয়া কুশাবৎ সিংহ যথাযথ ভাবে সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন। কয়েক দিন পরে সাগর-তরঙ্গের ন্যায় মোগলবাহিনী দিবারী গিরিবর্ত্মের সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রবেশ করিতে সমুদ্যত হইল, কিন্তু রাজপুতের খর অসি প্রতিবারই সে চেষ্টাকে ব্যাহত করিতে লাগিল। পনর দিনের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় সৈন্যের নিকট মোগলের বিপুল বাহিনী বিপর্য্যস্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে মোগল-সৈন্যবাহিনী শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সমস্ত সৈন্য বিপুল শৈল-শিখরের মত কুশাবৎ সিংহের সৈন্যরেখার উপর আপতিত হইল। রাজপুত সৈন্য অগণ্য প্রতিযোগী মোগল সৈন্যগণের খণ্ডিত দেহের উপর সমাধি রচনা করিতে লাগিল।

কুশাবৎ সিংহ সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া অগণ্য মোগল দেহরাশির মধ্যে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। একে

একে সমস্ত রাজপুত দেহ বিসর্জ্জন করিল। স্বল্পাবশিষ্ট মোগল্ সৈন্যও হতোদ্যম হইয়া সেখান হইতেই দিল্লীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দিবারী-গিরিসঙ্কটের পার্শ্বে চিতা জ্বালিয়া স্বামীর দেহ বুকে লইয়া অরুণা চম্পকপুষ্প-দাম তুল্য তনু বিসর্জ্জন করিলেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

কল্পনা

মনে নাই হে শুভদে! কবে কোন্ দিনে,
ঘন ঘোর বরষায়,
শারদ তপনাভায়
কিংবা পুষ্প পল্লবিত বসন্ত নবীনে;
কবে তুমি কোন্ সাজে
এসেছিলে হৃদি মাঝে,
অতীতের কোন্ শুভ কোন্ পুণ্যক্ষণে।

উষার আলোকে কিংবা রক্তিম সন্ধ্যায়,
পূর্ণ চন্দ্র উদ্ভাসিত,
পিকবর মুখরিত,
মনে নাই কবে কোন্ মাধবী নিশায়;
পুলকে আকুল প্রাণে
কবে শুনিয়াছি কানে
তোমারি অস্ফুট গীতি মৃদু মূর্চ্ছনায়।

শ্যামল প্রান্তর কিংবা তটিনীর কোলে,
অভ্রভেদী গিরিশিরে,
উত্তাল সাগর পারে,
মনে নাই কিংবা কোন্ নির্ঝরের তলে,
কবে গো মানস-রাণী,
কমনীয় তনু খানি
এসেছিলে ঢাকি চারু চিত্রিত অঞ্চলে।

সেই দিন হতে দেবি! হৃদয়-বীণাতে,
কি যেন নূতন সুরে—
সঙ্গোপনে অতি ধীরে
প্রাণের আকুল ভাষা চাহে গো ধ্বনিতে,
সঞ্জীবন কর স্পর্শে,
যেন গো নূতন হর্ষে,
মরুভূমে কিশলয় চাহে মুঞ্জরিতে।

মনে হয় যেন তুমি নহ গো নূতন,
যেন গো চিরবাঞ্ছিতা,
যেন গো চিরলাঞ্ছিতা,
যেন কোন্ যুগান্তের বহু পুরাতন;
তোমার কোমল করে
আজি হৃদয়ের তারে
ধ্বনিছে করুণ সুরে নব আবাহন।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল।

আফ্রিকায় সংকট

(১)

সম্প্রতি আফ্রিকার ভারতবাসীগণ অত্যন্ত নিগৃহীত হইতেছেন। কিন্তু প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে শ্বেতকায়গণ যখন আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতেন, তখন তাঁহারা সেটা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তখন আফ্রিকা একপ্রকার অজ্ঞাত জঙ্গলা দেশ ছিল; ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা জঙ্গল কাটিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছিল এবং পদে পদে আদিম নিবাসীদিগের হস্তে নিগৃহীত হইতেছিল। তখনও ইংরাজ কিংবা ফরাসী উপনিবেশের কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; যে যেখানে সুবিধা পাইত সেইখানেই ঘর বাড়ী, জমা জমি করিয়া, গরু ঘোড়া ছাগল হাঁস মুরগী পুষিয়া একটি নূতন জমিদারী ফাঁদিবার চেষ্টা করিত।

এই সময়, ডুপ্লে নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, কেপ্‌কলনীর সন্নিকটে একটি উচ্চ ভূমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করেন, এবং সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে ও অন্যান্য নানা স্থানে জঙ্গল কাটিয়া জমি চষিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করিতে থাকেন এবং নানা প্রকার পশু পক্ষী প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। ডুপ্লে তাঁহার সদ্ব্যবহার এবং অর্থ প্রলোভনে কয়েকজন অরণ্যবাসী অসভ্যকে বশীভূত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং পরে তাহারা বিশ্বাসী ভৃত্যের স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার গৃহেই বাস করিতে থাকে। এইরূপে তাঁহার কাজ কর্ম্ম চাষ বাস বেশ চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে অসভ্যগণ তাঁহার ক্ষেত্র হইতে শস্য এবং পশুশালা হইতে পশুপক্ষী চুরী করিয়া লইয়া যাইত, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষতিও হইত; কিন্তু তবুও মোটের উপর শস্য ও পশু পক্ষীর ব্যবসায় করিয়া তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইত। ক্রমশঃ তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল।

ডুপ্লের ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু কয়েক বৎসর গত না হইতেই তাঁহার স্ত্রী প্রাণত্যাগ করিলেন। গৃহে আপনার বলিতে রহিল কেবল একমাত্র কন্যা; তখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র।

এই সময় একদিন ডুপ্লের একজন বিজ্ঞ-বন্ধু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু অত্যধিক পান দোষের জন্য এক এক দিন ভাল করিয়া পড়াইতে পারিতেন না এবং নানা প্রকার অসঙ্গত আচরণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার জ্ঞান হইলে এই সকল ব্যাপারের জন্য তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হইতেন। তিনি একজন বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে কয়েকবার ক্ষমাও করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার ব্যবহার ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ হওয়ায় তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। কার্য্য ছাড়িয়া তিনি ভাবিলেন, তাঁহার যেরূপ অবস্থা তাহাতে কোন বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা; সুতরাং তিনি তাঁহার বন্ধু ডুপ্লের নিকট গিয়া কিছুদিন বাস করিবার ইচ্ছা করিয়া কেপ্‌কলনীতে গিয়া উপনীত হইলেন।

পত্নীবিয়োগের অব্যবহিত পরে বাল্যবন্ধুকে পাইয়া ডুপ্লের বড়ই আনন্দ হইল। গভীর জ্ঞানানুরাগবশতঃ ইঁহার নাম হইয়াছিল "প্রফেসার"। ডুপ্লে তাঁহাকে দেখিয়াই গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "প্রফেসার, তুমি এসেছ, আজ আমার ঘর শূন্য, গিন্নি চ'লে গিয়েছেন; এ সমাজবিহীন বিদেশে জঙ্গলে মৃত্যুর ছায়া বড় অন্ধকার। এ সময় তুমি এসেছ, ঈশ্বরের দয়া! একজন কথা বলিবার লোক ছিল না।"

ডুপ্লের স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে ভাবপ্রধান প্রফেসার খানিকক্ষণ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিলেন, তারপর চোক মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেরী কই?"

মেরী ডুপ্লের একমাত্র কন্যা। প্রফেসার তাঁহাকে অতি শৈশবে দেখিয়াছিলেন। আজ মাতৃহীন বালিকাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ডুপ্লে মেরীকে ডাকিতেই একটি সুশ্রী বালিকা সেই গৃহে প্রবেশ করিল; এবং ডুপ্লে সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা, ইনিই তোমার প্রফেসার-কাকা, নমস্কার কর।" মেরী নমস্কার করিতে না করিতে প্রফেসার তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন এবং মাথায় হাত দিয়া ও চুম্বন করিয়া তাঁহার স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রফেসার বলিলেন, "আজ হতে তুমিই আমার মা হ'লে, আমি তোমার ছেলে।"

ডুপ্লে। কিন্তু প্রফেসার, তোমাকে ভাই আর ছাড়ব না। তুমিই এখন আমাদের পরমবন্ধু এবং গৃহের আলোক। তোমার মাতৃহীন ছোট্ট মা-টিকে তুমিই পড়াবে, তুমিই খাওয়াবে। এতদিন ওর ফ্রেঞ্চ একেবারেই শেখা হয় নাই, এইবার ওর সে সাধ পূর্ণ হইবে।

প্রফেসার। আমি আর কোথায় যাব! তোমার বাড়ীই এখন আমার বাড়ী। আমি সব কাজ কর্ম্ম ছেড়ে এসেছি।

তারপর মেরী খাবারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেল। তখন প্রফেসার তাঁহার পানা-

সক্তির ও কর্ম্মত্যাগের কথা খুলিয়া বলিলেন; এবং অতঃপর সেখানেই থাকিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

প্রফেসারের জন্য একটি সুসজ্জিত ঘর, একটি সুন্দর ঘোড়া এবং একজন বিশ্বাসী ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। প্রাতঃকালে খাবার খাইয়া তিনি অনেকক্ষণ পড়িতেন, তারপর স্নান আহার করিয়া ঘুমাইতেন, কখন বা মেরীর সঙ্গে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে নানা প্রকার গল্প বলিতেন। বৈকালে ঘোড়ায় চড়িয়া জঙ্গলে বা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতেন, এবং সন্ধ্যার সময় মেরীকে ফ্রেঞ্চ্ শিখাইতেন। বন্ধু প্রফেসারকে গৃহে পাইয়া ডুপ্লে আরও অধিক সময় চাষবাস এবং ব্যবসা বাণিজ্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মেরী তাহার প্রফেসার-কাকার নিকট আগ্রহের সহিত ফরাসী ভাষা শিখিতে লাগিল।

সেই সময় কেপ্‌টাউনে কয়েক ঘর ইংরাজ এবং একজন ইংরাজ ধর্ম্মাচার্য্য বাস করিতেন। তিনি কয়েকজন আদিম নিবাসীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ভদ্র করিয়া লইয়াছিলেন; তাহারা সকলেই ইংরাজের বিশ্বাসী বন্ধুস্বরূপ হইয়াছিল। এই নবদীক্ষিত আফ্রিকাবাসীগণ ইংরাজদিগের অধীনে নানা কার্য্য করিত। জন দুইতিন পাদ্রীমহাশয়ের বাসায় কাজ করিত। একটি যুবক পাদ্রীর যুবকপুত্র হেন্‌রীর বিশেষ অনুগত সেবক ছিল। সে হেন্‌রীকে খুব ভালবাসিত, প্রাণদিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত।

হেন্‌রীর পিতা রেভারেণ্ড্ ভিন্সেণ্ট্ অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইংরাজ ও ফরাসী, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়, এই সকল ভেদজ্ঞান তাঁহার মনে স্থান পাইত না, তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকেই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া প্রেমের চক্ষে দেখিতেন; সকলেরই প্রতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি নিকটবর্ত্তী ইংরাজ ও ফরাসী ভদ্রলোকদিগের সুখে দুঃখে বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের গৃহে গৃহে গিয়া সংবাদ লইতেন, রোগে শোকে সাহায্য করিতেন। অপর পক্ষে, অরণ্যনিবাসী অসভ্যদিগের ছোট ছোট পল্লীতে গমন করিয়া তাহাদেরও সংবাদ লইতেন এবং রোগে ঔষধ এবং শোকে সান্ত্বনা দান করিতেন। এই দেবতুল্য ব্যবহারের জন্য তিনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

যুবক হেন্‌রী পিতার সদ্গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে তাহার "বয়"কে (ভৃত্য) অত্যন্ত ভালবাসিত, অবসর সময়ে তাহাকে লেখা পড়া শিখাইত, এবং সর্ব্বদা তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিত। "বয়" হেন্‌রীর সমস্ত কাজ সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিত। সে ঘর পরিষ্কার করিত, টেবিল চেয়ার ঝাড়িত, আলো সাফ্ করিত, জুতা ব্রাস্ করিত, বন্দুক পরিষ্কার করিত, কাপড় চোপড় গুছাইয়া রাখিত; এবং হেন্‌রী যখন যেখানে যাইত তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। হেন্‌রী তাহার "বয়"কেও একটা ছোট ঘোড়া এবং একটি বন্দুক দিয়াছিল।

রেভারেণ্ড ভিন্সেণ্টের গৃহ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী য়ুরোপীয়দিগের সাধারণ মিলন স্থান ছিল। সকালে, দ্বিপ্রহরে, বিকালে, সর্ব্বদাই কোন না কোন ব্যক্তি তাঁহার গৃহে উপস্থিত থাকিতেন, নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। অসভ্যগণের লুটপাট, তাহাদিগের সঙ্গে লড়াই এবং সন্তানগণের শিক্ষা এই সব বিষয় লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কথাবার্ত্তা হইত। কারণ, সে দেশে তখন শ্বেতকায়গণ একবারে নব আগন্তুক, কঠোর পরিশ্রম করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া, বহু কষ্টে চাষবাস ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইতেছিল; তাঁহারা স্বয়ং সন্তানদিগের লেখাপড়া দেখিতে পারিতেন না। বিদ্যালয় ছিল না, একখানা বই পাওয়াও সহজ ব্যাপার ছিল না; ইহার উপর অসভ্যগণ হঠাৎ আক্রমণ করিত, এবং শস্যাদি কিছু লইয়া যাইত এবং বহুল পরিমাণে ধ্বংস করিয়া যাইত।

ডুপ্লের সহিত রেভারেণ্ড ভিন্সেণ্টের বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। ডুপ্লের পত্নীবিয়োগের পর ভিন্সেণ্ট্ প্রায়ই তাঁহার নিকটে যাইতেন এবং শাস্ত্রপাঠ, সদালোচনা, পরলোক সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ ও প্রার্থনাদির দ্বারা তাঁহার হৃদয় মনকে সুস্থ সবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন ভিন্সেণ্ট্ ডুপ্লের গৃহে গিয়া দেখিলেন সেখানে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক এক পার্শ্বে বসিয়া এক মনে একখানি বই পড়িতেছেন। নানা প্রকার কথা-বার্ত্তার পর, ডুপ্লে বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে আমার একজন বাল্যবন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই।" এই বলিয়া তিনি প্রফেসারকে ডাকিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন; তার পর বলিলেন—"ইনি এখন এখানেই থাক্‌বেন। এঁকে পেয়ে আমি এবং মেরী, আমরা দুজনেই বিশেষ ভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ইনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,—এই জঙ্গলে ইনি থাকাতে মেরীর পক্ষে স্কুল কলেজের অভাব দূর হ'ল। মেরী এঁর কাছে এখন রীতিমত পড়ে।"

ভিন্সেণ্ট। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ সুখী হইলাম। এঁর মত লোকের দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হবে। এখন ইনি কেবল মেরীর শিক্ষার ভার নিয়েছেন, ক্রমে আরও অনেক ছেলেমেয়ের শিক্ষার ভার হয়ত এঁকে বহন ক'ত্তে হবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি মেরীকে ডাকিয়া তাহাকে আদর করিলেন, এবং তাহার পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মেরী বলিল—"আমি এখন সব চেয়ে বেশী মন দিয়েছি ফরাসী ভাষায়—এতদিন তো ভাল করে পড়া হয় নাই, আমি ফরাসী ভাষা কিছুই জানি না। প্রফেসার-কাকার কাছে ফ্রেঞ্চ্ পড়্‌তে আরম্ভ ক'রে আমি বেশ আনন্দে আছি। এমন সুন্দর ক'রে পড়ান।"

এইরূপ কথা-প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ যাপনের পর ভিন্সেণ্ট প্রফেসারের কর মর্দ্দন ও মেরীকে আদর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ডুপ্লে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎদুর গমন করিলেন; গেটের কাছে গিয়া উভয়েই দাঁড়াইলেন। ভিন্সেণ্ট্ বলিলেন—"দেখুন, একটি কথা মনে পড়ে গেল; হেন্‌রীর বড় ইচ্ছা যে ফ্রেঞ্চ্ পড়ে, সে যদি এখানে এসে পড়ে যায় তা' হ'লে মেরীর সঙ্গেই পড়্‌তে পারে, আপনার বন্ধু কি তা'তে কিছু অসুবিধা বোধ কর্ব্বেন?"

ডুপ্লে বলিলেন—"বেশ্‌ত, বেশ্‌ত! প্রফেসার কখনই অসুবিধা বোধ কর্ব্বেন না, বরং মেরী এবং তিনি উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হবেন। মেরী সপ্তাহে তিন দিন ফ্রেঞ্চ পড়ে, সন্ধ্যার সময়; সেই তিন দিন হেন্‌রী রাত্রে এখানেই খাবে এবং শোবে। পরদিন সকালে যাবে। মাতৃহীন সঙ্গীহীন বালিকা একজন বন্ধু পাবে, তার একটা কষ্টকর অভাব দূর হবে।

ভিন্সেণ্ট। আচ্ছা, ধন্যবাদ, আমি তবে কালই হেন্‌রীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেব। কাল বৈকালে সে আস্‌বে।

এই কথার পর উভয়ে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন, ভিন্সেণ্ট্ অশ্বারোহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

(৩)

সেদিন রাত্রে আহারের সময় ডুপ্লে কন্যাকে বলিলেন, যে পরদিন বৈকালে তাহার একজন বন্ধু আস্‌বেন,—রেভাঃ ভিন্সেণ্টের ছেলে হেন্‌রী, সে খুব ভাল ছেলে, তাহার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ পড়বে এবং রাত্রে সেখানেই থাকবে। তদনুসারে পড়িবার ঘরে হেন্‌রীর জন্য চেয়ার টেবিল প্রভৃতি রাখা হইল এবং তাহার শয়নের জন্যও একটি গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল।

পরদিন বৈকালের বহু পূর্ব্ব হইতে মেরী বাগানে বেড়াইতে লাগিল এবং হেন্‌রীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন প্রদেশে বালিকার একজনও সমবয়সী ছিল না, বৎসরের মধ্যে কদাচ কখন দুই একজন বালক বালিকার সঙ্গে দেখা হইত। আজ একজন বালক নিয়মিতরূপে তাহার সহিত পড়িবে, সপ্তাহে তিন দিন রাত্রে একত্রে আহার করিবে, এবং কিছুক্ষণ তাহার সহিত গালগল্প ও ভ্রমণ করিতে পাইবে, সে খুব ভাল ছেলে, তার সঙ্গে মিশিয়া সে কত ভাল বিষয় শিখিতে পারিবে; এইরূপ কত প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মেরী গেটের নিকটে বেড়াইতে লাগিল।

ছোট খাট পাহাড়ের ন্যায় একটা উচ্চ ভূমির উপর চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ডুপ্লের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথমেই নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ ও লতামণ্ডপে শোভিত সুন্দর বিস্তৃত উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হওয়া যায়, তাহার পর সুন্দর বাস-

ভবন, এবং উহার চতুর্দ্দিকেই বিচিত্র ফল ও ফুলের বাগান। মেরী সেই বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি প্রকাণ্ড গোলাপ ফুল দেখিতে পাইল, এবং সেই প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল দিয়া হেন্‌রীর অভ্যর্থনা করিবে বলিয়া গেটের দিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ঘড়িতে চারটা বাজিল। সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়িয়া একজন সুশ্রী ষোড়শ বর্ষীয় যুবক গেট অতিক্রম করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল। মেরী তাহাকে দেখিয়াই কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমিই কি হেন্‌রী?" সে হাসিয়া বলিল—"হা, আমিই হেন্‌রী," এই বলিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া মেরীর নিকটে গিয়া বলিল, "তোমাকে এখানে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি।" "মেরী তাহার হাতে গোলাপ ফুলটি দিয়া বলিল—"এই ফুলটি আমি তোমার জন্য তুলেছি।" হেন্‌রী সেটিকে সযত্নে বক্ষের নিকট কোটে গুজিয়া বলিল—"তোমার এই অভ্যর্থনা কখনও ভুলিব না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাহারা উদ্যান অতিক্রম করিয়া বসিবার ঘরের নিকট উপস্থিত হইল. তখন মেরী বলিয়া উঠিল—"বাবা, হেন্‌রী এসেছে।" তাহারা উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল। ডুপ্লে সস্নেহে হেন্‌রীকে নিকটে বসাইয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রফেসারের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। বৈকালের খাবার খাওয়ার সময় আসিল। সকলে এক সঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। অহারান্তে মেরী হেন্‌রীকে তাহাদের পড়িবার ঘর, শয়নগৃহ প্রভৃতি দেখাইল, বাড়ীর অন্যান্য স্থান দেখাইল, এবং বাগানে কত রকম ফুল ও ফলের গাছ আছে, তাহা দেখাইতে লাগিল। এইরূপে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন মেরী ও হেন্‌রী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রফেসার আসিয়া তাহাদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ধ্যা এবং রাত্রের আহার শেষ হইলে হেন্‌রী নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, মুখ ধুইয়াই সকলের নিকট বিদায় লইয়া সে গৃহে যাত্রা করিল। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। মেরী ও হেন্‌রী উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিতে লাগিল। উভয়েই একসঙ্গে পড়িত, একই বই পড়িত; হেন্‌রী ফরাসী শব্দ ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া প্রফেসার মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিতেন, ইংরাজ যুবক হেন্‌রীর তাহা ভাল লাগিত না। মেরী ইহা বুঝিতে পারিয়া, হেন্‌রীকে প্রফেসারের বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, স্বয়ং তাহাকে ফরাসী শব্দের উচ্চারণ শিখাইয়া দিত। উভয়ে ফরাসী ভাষায় কথা বলিত ও গল্পের বই পড়িত। এক একদিন প্রফেসার অত্যধিক পরিমাণে মদ খাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। সে দিন মেরী ও হেন্‌রী নিজেরাই পড়িত, এবং গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দিত। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

(৪)

বৃহস্পতিবার রাত্রি। হেন্‌রী তাহার শয্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ কাহার হস্তস্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হেন্‌রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিল, তাহার "বয়" তাহাকে জাগাইতেছে। হেন্‌রী জিজ্ঞাসা করিল—"কি, ব্যাপার কি? কি হ'য়েছে?"

বয়। মাষ্টার (প্রভু), বড় বিপদ!

হেন্‌রী। কি বিপদ? পরিষ্কার ক'রে বল কি হ'য়েছে।

বয়। তবে শোন, আমি আজ পাহাড়ে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম, হাজার হাজার লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একত্র হ'চ্ছে। একজন আমাকে বল্লে যে, সেই তুমি যে বাড়ীতে পড়্‌তে যাও, সেই বাড়ীর একজন সাহেব পাহাড়ের দলপতির ছেলেকে গুলি ক'রে মেরেছে; তাই দলপতি সমস্ত পাহাড়ের লোকদের একত্র হতে হুকুম ক'রেছেন, আজ ভোরে সেই বাড়ী লুটপাট হবে, আর সব সাহেবদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে। এই কথা শুনে আমি ছুটে আস্‌ছি। এখন উপায়!

এই কথা শুনে হেন্‌রীর সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিল। তখন রাত্রি ১টা।

ব্যাপারটা এই ঃ—বুধবার হইতেই প্রফেসারের মদ্য পানের ঝোঁকটা কিছু বাড়িয়াছিল। বৃহস্পতিবার সকালে হেন্‌রীর সঙ্গে সঙ্গেই ডুপ্লে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, যে তিন চার দিন পরে তিনি ফিরিবেন। বন্ধুর অবর্ত্তমানে প্রফেসারের আর কোন শাসন রহিল না, দ্বিপ্রহরে খাওয়ার পরই তিনি অত্যধিক মাত্রায় মদ্যপান করিলেন, এবং কিছু-কাল ধরে পড়িয়া থাকার পর নেশার ঝোঁকে ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেন। কিছু দূর গিয়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়া থাকা অসম্ভব বোধ হইল; তখন তিনি ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিয়া, একটা গাছের তলায় শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘোড়াটা ঘাস খাইতে খাইতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। সেই পাহাড়ের দলপতির এক ছেলে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে প্রথমে দেখিল, একটি গাছের তলায় একজন সাহেব শয়ন করিয়া আছেন, তারপর খানিকদূর গিয়া দেখিল, একটি জিন আঁটা ঘোড়া ঘাস খাইতেছে। সে মনে করিল, "সাহেবের ঘোড়াটা এতদূর চলিয়া আসিয়াছে, তিনি হয়ত খুঁজিয়া পাইবেন না, যাই, ঘোড়াটা তাঁকে দিয়া আসি।" এই ভাবিয়া সে ঘোঁড়াটাকে ধরিয়া সেই দিকে লইয়া চলিল, তাহার সঙ্গে এক জন চাকর ছিল।

অপর দিকে, প্রফেসারের ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্র তিনি লাফাইয়া উঠিলেন; এবং ঘোড়াটাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, যে একজন অসভ্য যুবক তাঁহার ঘোড়াটা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। সে তাঁহার দিকেই আসিতেছিল; কিন্তু তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কে ধারণা হইল, সে ঘোড়াটা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। যেই একথা মনে হইল, অমনি তিনি পকেট হইতে রিভলভার্ বাহির করিয়া তাহাকে গুলি করিলেন। যুবক তাঁহার নিকটে আসিয়া ঘোড়াটা তাঁহাকে দিবে বলিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হইল, এবং তাহার সঙ্গী ভৃত্যাটি ভয়ে প্রাণপণে দৌড়াইয়া পলাইয়া গিয়া দলপতির নিকট এই ঘটনা জ্ঞাপন করিল।

প্রফেসার অশ্বারোহণে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং আরও মদ্যপান করিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। তিনি যে কি করিয়াছেন সে চিন্তা করিবার শক্তিও তাঁর ছিল না।

অসভ্য দলপতি উক্ত সংবাদ শুনিবা মাত্র দলবল সহ পুত্রের ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন দূরে একজন সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া ডুপ্লের গৃহে প্রবেশ করিতেছে। ভৃত্য বলিল—"ঐ সেই সাহেব, যে যুবককে হত্যা করিয়াছে।" পুত্রের মৃতদেহ এবং হত্যাকারীকে একই সময় দেখিয়া বিশালদেহ পার্ব্বত্য দলপতির চক্ষুদুটি দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। একবার তিনি বলিলেন, "চল, এখনই ঐ গৃহ এবং গৃহবাসীদিগকে ধ্বংশ করিয়া প্রতিশোধ লই; আবার কি ভাবিয়া স্থির করিলেন, আরও লোক-জন একত্র করিয়া ভোর রাত্রে শ্বেতকায়দিগকে বিনষ্ট করিবেন।

অতঃপর কয়েক জনে ধরিয়া পুত্রের মৃতদেহ গৃহে লইয়া গেলেন, এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার এই আদেশ প্রচা-রের জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন যে, "আজ মধ্যরাত্রির মধ্যে পর্ব্বতবাসী সমস্ত অস্ত্রধারী ব্যক্তি আপন আপন অস্ত্র লইয়া শত্রু নাশের জন্য দলপতির ক্রীড়াক্ষেত্রে সম-বেত হইবে।" অগ্নির ন্যায় এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে অসভ্যগণ আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। এই সংবাদই হেন্‌রীর "বয়" তাহাকে রাত্রি একটার সময় জানাইল।

হেন্‌রীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ডুপ্লে বাড়ীতে নাই, প্রফেসার তো এসকল ব্যাপারে একজন অকর্ম্মণ্য লোক, তার উপর আবার মাতাল, হয়ত মদ খাইয়া পড়িয়া আছে। ভৃত্যগণ পুরাতন ও বিশ্বাসী হইলেও পর্ব্বতবাসী, সামান্য প্রলোভনে এবং প্রাণের দায়ে স্বজাতীয়দিগের সহিত যোগ দিতে পারে, মেরীকে কে রক্ষা করিবে? আমার দ্বারা কি হইতে পারে, দেখি! এই ভাবিয়া হেন্‌রী তাড়াতাড়ি তাহার পিতাকে

জাগাইয়া সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করিল এবং তাঁহার পরামর্শ চাহিল। ভিন্সেণ্ট বলিলেন—"প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও আট নয় ঘণ্টার পূর্ব্বে অপর ইংরাজ ও ফরাসী বন্ধুদিগকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। ততক্ষণ কি হইবে, কে সে বাড়ী রক্ষা করিবে?"

হেন্‌রী। বাবা তুমি, লোকজন নিয়ে পরে যেও; আমি বয়কে নিয়ে রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছিতে চেষ্টা করি, যত পারি গোলাগুলি নিয়ে যাই। আর কথা বলিবার সময় নাই, তুমিও যাও, আমিও যাই।

ভিন্সেণ্ট। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন; তুমি যাও।

হেন্‌রী তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঘোড়া সাজাইয়া আনিতে বলিল, এবং স্বয়ং তিনটি ভাল বন্দুক এবং যথাসম্ভব গুলি বারুদ ঠিক করিয়া লইয়া যুদ্ধের যোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিল। এবং দুটি বন্দুক বয়ের হাতে দিয়া তাহাকে পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিয়া, ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। তখন রাত্রি ২টা।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে জঙ্গল, ঝড়ের ন্যায় বাতাস বহিতেছে, পদে পদে শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভয়, অথচ প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে হইতেছে। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে, অন্ধকারে লুকাইয়া কোন প্রকারে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেই হইবে, নতুবা সকল শ্রম, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মেরীর কি দশা হইবে কে জানে? হেন্‌রী ক্ষিপ্রের ন্যায় অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

ডুপ্লের বাটীর সন্নিকটে আসিয়া হেন্‌রী বুঝিতে পারিল অদূরে বনমধ্যে বহু জনসমাগম হইয়াছে। তখন তাহারা উভয়ে ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়া দুটিকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিল। এবং নিঃশব্দে ডুপ্লের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে দিকে যায় সেই দিকেই অসভ্যগণ বর্ত্তমান; অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিকে দেখিল অসভ্যগণ তখনও সে স্থান অবরুদ্ধ করে নাই। হেন্‌রী বিদ্যুৎগতিতে সেই স্থান দিয়া ডুপ্লের বাটীর প্রাচীর পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল; বয় তাহার অনুগমন করিল। (ক্রমশঃ)

বর্ষা-ধারা

১

বর্ষাকালের ভরা গাঙ্গের স্রোতের মত একটানা
চল্‌ছে ছুটে সংসারটার ধারা;
লক্ষ্য পথে সাগর কোথা, আছে যেন ঠিক্ জানা,
হাজার বাঁকেও নয়ক পথ হারা।
দাগ থাকে না, কোথায় ডোবে ঘূর্ণিপাকের মাঝখানে
স্নেহ প্রীতির বোঝাই করা তরী;
কল্লোলিয়া ছোটে নদী, মত্ত যেন নাচ্‌গানে,
তরঙ্গেতে কিরণ পড়ে ঝরি'।

২

বিশাল বনের সেই গরিমা, যতই পাতা যাক্ ঝরে',
ঝঞ্ঝাবাতে যতই ভাঙ্গুক শাখা,
নূতন কচি পাতায় ফুলে সাজে তরু ঝাঁক্ করে'
শিউরে সুখে পাখী ঝাড়ে পাখা।
আঁধার কোণায় মৃত্যু মরে, জন্ম উঠে ভূঁই ফুঁড়ে
আকাশ খানার খোলা ছাতের নীচে;
রে একাকী! লাখের মাঝে মরিস্ যদি তুই পুড়ে
ছাইএর দাগও থাক্‌বেনাক পিছে।

৩

শুকিয়ে গেছে চোখের জলের উৎসটুকু; যায় ক্ষরে'
অনুভূতি বক্ষশিলা হ'তে,
এখন খাসা মরুভূমে দম্‌কা বাতাস ধায় বয়ে'
উড়িয়ে বালি শূন্য আকাশ-পথে।

৪

জলে শোকের রক্তসন্ধ্যা! সুখের দিবা যায় টুটে—
এযে আলো আঁধার আনে ডেকে!
ভরা সন্ধ্যার ডাকিনীটি স্মৃতির পথে ধায় ছুটে
তাম্রঅঙ্গে শ্মশানভস্ম মেখে।

৫

পাষাণ সমান অচল অটল ব্যথা বুকের মাঝখানে;
হায়! এ বোঝা কোথায় টেনে ফেলি!
চেনা গলার মিঠে সুরে পশে গীতি আজ্ কাণে!
একি ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে গেলি!

৬

ভাসিয়ে দে যা! ডুবিয়ে ভেজা, দগ্ধ মরুর ক্ষেতখানা
উচ্ছ্বসিত প্রীতির ধারে আবার!
ভেঙ্গে নে যা পুড়িয়ে দে যা স্মৃতির ঘরের প্রেতখানা
ওরে নিঠুর! ওরে সখা আমার!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে হিন্দুবিধবা

বয়স	সংখ্যা	
৫ বৎসর	৯৬	
৫ হইতে ১০ „	৮,৬৮১	
১০ „ ১৫ „	৩২,০৭৫	
১৫ „ ২০ „	৯৫,৩৬৩	
		১,৩৭,০৮১
২০ „ ২৫ „	১৪৪,৩২৯	
২৫ „ ৩০ „	২১৫,৬৭৪	

উক্ত তালিকা অনুসারে প্রায় ১০ হাজার শিশু-কন্যা পতিহীনা।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতি। ইহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা এইরূপঃ—

বয়স	ব্রাহ্মণ	বৈদ্য	কায়স্থ	
০—৫ বৎসর	৪২	—	৩৯	=১৪০৭৩
৫—১২ „	৬০৩	২০	৪২০	
১২—১৫ „	১,৩৫০	৩২	১,৭০১	
১৫—২০ „	৫,৪৫১	১৮৪	৪,৪৬১	
২০—৪০ „	৪২,৩৫৭	১,৯৭৩	৪৪,৭৯২	

বঙ্গের উচ্চজাতিত্রয়ের মধ্যেও বিধবা শিশুকন্যার সংখ্যা ৮১ এবং ২০ বৎসরের কম বয়স্ক বিধবার সংখ্যা ১৪,০৭৩!

সংক্ষেপে—

হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা—	...১,১৫,০০,০০০
মোট বিধবার সংখ্যা—	... ২৬,০০,০০০
তন্মধ্যে, ২০ বৎসরের কম বয়স্কা বিধবা— ...	১,৩৭,০৮১
১০ বৎসরের কম বয়স্কা বিধবা— ...	১০,০০০

এবং উচ্চ জাতির ২০ বৎসরের কম বয়স্কা বিধবা ১৪,০৭৩,

নিম্ন জাতির মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু উচ্চ জাতিত্রয়ের বিধবাগণ কি শিশু, কি বালিকা, কি যুবতী, চিরবৈধব্য-পাশে আবদ্ধ। বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণের শক্তি সে পাশ ছিন্ন করিতে পারে নাই। এই বালবিধবাদিগের সংখ্যা এবং অবস্থা চিন্তা করিয়া বঙ্গের হিন্দু জনক জননীর হৃদয়, মন কত দিন নীরব ও নির্জ্জীব থাকিবে?

অষ্টাবিংশতি সহস্র বীরাঙ্গনা। ফরাসী বীরাঙ্গনা জাঁদার্কের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের আর এক বীরাঙ্গনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইনি সমগ্র ফ্রান্সদেশে বীরাঙ্গনা-সৈন্যদল গঠন করিতেছেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন জর্ম্মণ ও ফরাসী জাতির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ম্যাডাম ডুপানিয়ান নাম্নী এক ফরাসী রমণী ফরাসী সৈন্যদলের মিশিয়া যুদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের সময়েও ইনি রণভূমির অনেক দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল স্থানে গমন করতঃ অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ম্যাডাম ডুপানিয়ানের পূর্ব্বে আর কোন রমণী ফরাসী-সৈন্যদলে যোগদানের অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। সম্প্রতি ম্যাডাম ডুপানিয়ান তাঁহার জীবনের মহাব্রত সাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অনলবর্ষিণী বক্তৃতা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে সমর বিভাগে প্রবেশ

করিবার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহারই উত্তেজনায় বহু রমণী সমর-সচিবের নিকট এই আবেদন করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক রমণী-পল্টন গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে তাহাতে প্রবেশের আদেশ প্রদান করা হউক। প্রকাশ, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ-পরিচ্ছদ কিরূপ হইবে তাহাও স্থির হইয়া গিয়াছে।

ম্যাডাম ডুপানিয়ান ২৮ হাজার যুবতীকে মহিলা-পল্টনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ৭॥০ হাজার সামরিক কর্ম্মচারীর কার্য্য করিবেন। যুদ্ধের সময় এই সকল মহিলা পুরুষদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া আপনারা গৃহ-রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, প্রয়োজন হইলে আপনারাও কৃপাণ-হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দানে প্রস্তুত হইবেন।

প্রকৃত সদিচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে একজন স্ত্রীলোকের সাহায্যে কিরূপ মহদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে পারে, ম্যাডাম ডুপানিয়ানের জীবনবৃত্ত হইতে তাহার পরিচয়-প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নারীর কার্য্য ক্ষেত্র। কলিকাতার একটিং হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার ক্রেক বিগত বর্ষের স্বাস্থ্য-বিবরণীতে বড় শোচনীয় কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে কলিকাতায় শিশুমৃত্যু কিরূপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিগত বর্ষের স্বাস্থ্য-বিবরণী হইতে তাহার সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার ক্রেক বলিয়াছেন,—বিগত বর্ষে সমগ্র কলিকাতা সহরে মোটের উপর ৫,০৪৪ অর্থাৎ যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রতি হাজারে ২৫৭টীর মৃত্যু হইয়াছে। শতকরা ৩.৬৫ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের অধিক শিশুর এক সপ্তাহের পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়। নিয়মিত কালের পূর্ব্বে প্রসব, প্রসূতির দুর্ব্বলতা ও ধনুষ্টঙ্কার—যাহাকে সাধারণ কথায় পেঁচোয় পাওয়া বলে—এই কয়েক কারণেই অধিকাংশ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তার ক্রেক বলিয়াছেন,—গৃহের যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা জীর্ণ, যাহাতে শিশুর জীবন রক্ষার সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন আলোক ও বায়ু চলাচল করিতে পারে না, যে গৃহে অবস্থান করিলে সুস্থকায় ব্যক্তিও পীড়াগ্রস্ত হয়, সেই গৃহটীই সাধারণতঃ প্রসূতির জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। দরিদ্র লোকেরা আর্দ্র, দুর্গন্ধ যুক্ত কাঁচা ঘরই প্রসূতির বাসের জন্য নির্দ্দেশ করে। অজ্ঞ "ধাই" দিগের দ্বারা যে উপায়ে শিশুর নাড়ীচ্ছেদ করা হয় তাহাতে অনেক শিশুই এক সপ্তাহের পূর্ব্বে ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক মাসের পূর্ব্বে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদিগের শতকরা ৩৩ জনকে বাঁচান যাইতে পারে। ডাক্তার ক্রেক নাড়ীচ্ছেদের পরে ক্ষত স্থান বাঁধিবার জন্য টিনের কৌটায় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতে চাহিয়াছেন। ইহার সহিত "ধাই" দিগের জন্য উপদেশও লিখিত থাকিবে। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতিও শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ, ডাক্তার ক্রেক এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম পালন করিলে এই সকলের হাত হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে। অনেক সদ্যোজাত শিশু উপযুক্ত বস্ত্রাচ্ছাদনের অভাবে প্রাণ হারায়। ডাক্তার ক্রেক্ এই সকল বিষয়ে এদেশের শিক্ষিতা মহিলাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগকে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দেন, একটি সমিতি গঠন করিয়া তাহা হইতে সদ্যোজাত শিশুদিগের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের দরিদ্র ভগ্নীদিগের অনেক অসহায় শিশু রক্ষা পায়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। শিক্ষিতা মহিলাগণ দল বাঁধিয়া দরিদ্র অশিক্ষিতা নারীদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করুন। শিক্ষিতা নারীদিগের সম্মুখে এই এক মহাকার্য্য বর্ত্তমান।
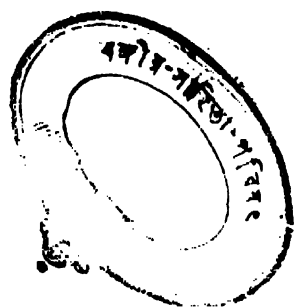
বল্কান সমরে মণ্টেনেগ্রো-নারীগণ কামান ঠেলিয়া স্বামী পুত্রকে সাহায্য করিতেছেন।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch ——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD-GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। মাঘ, ১৩২০ ১০ম সংখ্যা।

শ্রীমতী মেরিয়া হেয়ার

১

উন্নত পদস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা মহৎ-হৃদয় নরনারীর দ্বারা জগতের অধিক কল্যাণ হইয়াছে। আড়ম্বর-বিহীন, শান্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের প্রভাব নীরবে সমাজের মধ্যে যে কল্যাণ সাধন করে, তাহার পরিমাণ করিতে স্থূলদর্শী মানব অসমর্থ। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে বা ধর্ম্ম-সংস্কারে যে সকল বিশেষ প্রতিভাশালী নরনারী নেতৃত্ব করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের অনুকরণ করা একপ্রকার অসম্ভব। প্রতিভার অনুকরণ হয় না। কিন্তু যাঁহারা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ও শান্তভাবে গৃহীর কর্ত্তব্যভার বহন করেন, সকলের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করেন, এবং নিত্যকাল ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলেন, তাঁহাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণ-যোগ্য। মেরিয়া হেয়ারের জীবন এইরূপ শান্ত গৃহীর জীবন ছিল। পুষ্পের সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের ন্যায় তাঁহার জীবন শান্ত, স্নিগ্ধ ও নীরব প্রভাব বিস্তার করিয়া সকলকেই আনন্দিত ও উন্নত করিত।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ২২এ নবেম্বর চে-সায়ার প্রদেশে মেরিয়ার জন্ম হয়। মেরিয়ার পিতামাতা অত্যন্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা সন্তানগণকে যেমন ভাল-বাসিতেন, তেমনি সুশাসনেও রাখিতেন। অতি অল্প-বয়সেই মাতার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু ৭০ বৎসর বয়সের সময়ও মেরিয়ার মনে শৈশবের মাতৃ-স্মৃতি অতি উজ্জ্বল ছিল। মাতা তাঁহাকে সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন। মেরিয়া ভাল করিয়া পড়া তৈরি না করিলে মাতা তাহাকে সিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া দিতেন ; পড়া

ঠিক হইলে পরে মেরিয়া নিস্তার পাইত। মেরিয়ার মাতার মৃত্যু হইলে, পিতা অপর একজন ধর্ম্মপরায়ণা গুণবতী রমণীকে বিবাহ করেন, ইনিও মেরিয়ার বাল্য-জীবনের অনেক কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেরিয়াকে কোন সুখকর কর্ত্তব্য পালন করিতে বলিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "বলত মা-লক্ষ্মী, একাজটা কি কেবল ভাল লাগে বলিয়াই করিবে, না আরও কোন কারণ আছে?" বালিকা উত্তর দিত—"কারণ? হাঁ, একাজ করা আমার কর্ত্তব্য, আমার উচিত।" গুণবতী জননীর শিক্ষা ও চরিত্র-প্রভাব এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধাত্রীর সঙ্গগুণে মেরিয়ার শৈশব সুশিক্ষা ও আনন্দের আলয় হইয়াছিল।

তাঁহার এক দিদি এবং দুই দাদা ছিল। পরিবারটি সত্যসত্যই "ভাই ভগিনী মিলি সুধাময় গেহ।" দুই ভাই ভবিষ্যতে কি কি বড় বড় ব্যাপার করিয়া তুলিবে সে বিষয়ে অনেক পরামর্শ করিত, এবং মেরিয়াকেও কিছু কিছু বলিয়া তাহাকে একবারে অবাক্ করিয়া দিত। এইরূপ কার্য্যের মধ্যে একটি প্রধান কাজ ছিল—গর্ত্ত খনন করিতে করিতে পৃথিবীর অপর পার্শ্বে পৌঁছান। স্কুলের ছুটির দিন মেরিয়ার বড় আনন্দে কাটিত। সে সকলের ছোট—সকলেরই আদর পাইত। দাদারা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া "সিন্ধবাদের" গল্প, "আলিবাবার" গল্প প্রভৃতি কত বিস্ময়কর গল্প শুনাইত। এইরূপে পরম সুখে বাল্যকাল কাটিতে লাগিল।

মেরিয়ার পরিচ্ছদ ও খাদ্য অত্যন্ত সাদাসিদে রকমের ছিল। মোটা কাপড়ের শাদা ফ্রক্, তাহাতে কোন প্রকার বাহার থাকিত না, এবং হরিৎ বর্ণের ছোট কোট—এই ছিল তাহার পোষাক। এবং দুধ ও আলু সিদ্ধ ছিল তাহার প্রধান খাদ্য।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মেরিয়ার দিদি স্কুল পরিত্যাগ করিয়া গৃহেই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং ভগ্নীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে একটি ক্ষুদ্র গৃহে পাঠ করিতেন। এই বৎসরেই মেরিয়ার পিতা (Stoke-upon-Terne) ষ্টোক্-আপন্-টার্ণ নগরের ধর্ম্মাচার্য্য হইয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। চার বৎসর পরে দিদির বিবাহ হইয়া গেল। তখন মেরিয়ার বয়স মাত্র ১২ বৎসর। পিতা কিয়ৎপরিমাণে কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু প্রধানতঃ দিদিই তাঁহার শিক্ষার পরিচালিকা রহিলেন। তিনি নিয়মিত রূপে পত্র লিখিয়া বলিয়া দিতেন কোন্ বই কি প্রকারে অধ্যয়ন করিতে হইবে; তারপর যথাসময়ে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইতেন এবং মেরিয়া উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সাহায্যে মেরিয়ার শিক্ষা চলিতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার সুশিক্ষার আর এক প্রধান উপকরণ ছিল—ভদ্রসমাজ। শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে বিনয় ও শিষ্টাচার অজ্ঞাতসারে সহজেই সকলের ব্যবহারকে মিষ্ট ও শোভন করিয়া তোলে। ভদ্রসমাজে মিশিয়া মেরিয়ার চরিত্রে এই সহজ বিনয় ও শিষ্টাচার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। পিতা প্রায়ই পুত্র-কন্যাদিগকে সঙ্গে করিয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের গৃহে গমন করিতেন, এবং নানাপ্রকার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মেরিয়ার মাতা পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হন। তখন হইতে মেরিয়া প্রতি রাত্রে ভাল ভাল বই পড়িয়া মাতাকে শুনাইতেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করিতেন। চার মাস অক্লান্ত সেবার পর ১৩ই অক্টোবর জননী দেহত্যাগ করিলেন। বালিকা মেরিয়ার নিকট সমস্ত সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে প্রভু, আমার জননী নিকটে বর্ত্তমান থাকিলে আমি যে ভাবে চলিতাম, এখনও যেন সেই ভাবে তাঁর মনের মত হইয়া চলিতে পারি। মাতৃ-স্নেহরূপ পরম অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।" এই শোকের তাড়নায় তাঁহার হৃদয় মন ইহ সংসারের সকল অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া একবারে সেই পরম সম্বল ভগবানেই একাগ্র হইয়া পড়িয়াছিল; এবং ভগবানের প্রতি এইরূপ উন্মুখ ভাব হইতে জগতের সেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিতে লাগিল। এই সময়

তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রেমপূর্ণ পত্রাবলী মাতার অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিত।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পিতা পুনরায় মেরিয়ার এক মাসীকে বিবাহ করেন। এই সহৃদয়া গুণবতী রমণী গৃহে আসিয়া মাতৃহীন সন্তানদিগের মাতার অভাব সম্পূর্ণ দূর করিয়াছিলেন।

২

মেরিয়ার পিতৃগৃহের সন্নিকটে বিশপ হিবারের বাসা ছিল। তিনি তখন 'হড্‌নটের' আচার্য্য ছিলেন। হিবারের সদাপ্রফুল্ল, প্রেমপূর্ণ ও তেজোব্যঞ্জক চরিত্র-প্রভাবে তাঁহার গৃহ আনন্দ-নিকেতন স্বরূপ ছিল। মার্কাস্ ষ্টো এবং অগষ্টাস্ হেয়ার নামক দুইজন যুবক হিবারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; তাঁহারা প্রায়ই তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। মেরিয়াও পিতার সহিত সেখানে যাইতেন। ক্রমশঃ সকলের সহিত মেরিয়ার বন্ধুতা হইল। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গে মেরিয়ার বিশেষ উপকার হইতে লাগিল; তাঁহার আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি দশগুণ প্রবল হইল। বিশপ হিবারের চরিত্র প্রভাবে তিনি দ্রুতগতিতে উন্নতি করিতে লাগিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে মার্কাস্ ষ্টো এবং অগষ্টাস্ হেয়ারের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। কিন্তু এই আনন্দময় মঙ্গলকর বন্ধুতার বিকাশের অতি অল্পকাল পরেই হিবার ভারতবর্ষে চলিয়া গেলেন। সে সময় ষ্টোর সহিত মেরিয়ার বিবাহ প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু পিতার অনিচ্ছা বশতঃ তাহা হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে গমনের কিছুদিন পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টো পরলোক গমন করেন। শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে মেরিয়া এবং হেয়ার উভয়েই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই শোকাহত অবস্থায় যখন উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন পরস্পরের সহানুভূতির জন্ম উভয়েরই হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বন্ধুতা পূর্ব্ব হইতেই ছিল, পরস্পরের গুণে উভয়ে মুগ্ধ; এখন সেই বন্ধুতা অনুরাগে পরিণত হইল, উভয়ে এই শোকের অবস্থায় উভয়কে আশ্রয় করিবার জন্ম এবং আশ্রয় দানের জন্ম ব্যাকুল হইল। এই সময় বিশপ হিবারও ভারতবর্ষে দেহত্যাগ করেন। এই নূতন আঘাত, দুইটি শোকসন্তপ্ত ব্যাকুল প্রেমপূর্ণ আত্মাকে আরও নিকটতর করিয়া দিল।

ইহার পর প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। হেয়ার ধর্ম্মপ্রচার ও সেবার ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রিয় ভ্রাতা জুলিয়াসের সহিত তত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই আলোচনার ফলে তাঁহারা একখানি অতি সারগর্ভ পুস্তক প্রকাশ করিলেন—("Guesses at Truth") সত্য-অনুমান বা সত্যানুসন্ধান। সর্ব্বত্র এই গ্রন্থ প্রশংসা অর্জ্জন করিল। মেরিয়ার মনে আনন্দ আর ধরে না। অতঃপর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুন অগষ্টাস্ হেয়ারের সহিত মেরিয়ার শুভ বিবাহ হইয়া গেল। মেরিয়া এই বিবাহের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বন্ধুদিগকে পত্র লিখিলেন।

বিবাহের পর তাঁহারা একটি সুন্দর নির্জ্জন বাটীতে পাঁচ মাস বাস করেন। প্রার্থনা, অধ্যয়ন, সৎপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মপ্রচার, মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া দিন কাটিয়া যাইত। রবিবার বিশেষ ভাবে ধ্যান ধারণা ও শাস্ত্র পাঠে কাটিত। এইরূপে বিমল আনন্দে পাঁচ মাস অতিবাহিত হইল।

অতঃপর, হেয়ার দরিদ্র নরনারীর আধ্যাত্মিক সেবার ভার লইয়া আল্টন্-বার্ণেস্ নামক একটি অতি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সপরিবারে গমন করিলেন। সেই গ্রামে মাত্র ৭০ জন লোকের বাস, তাহারা সকলেই নিরক্ষর ও অত্যন্ত দরিদ্র এবং ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত। একবার একজন পঞ্চাশ বৎসর বয়সের লোককে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কি যিশুখৃষ্ট কে, তা জান?" সে একটু ভাবিয়া উত্তর দিল—"আজ্ঞে, মশায়, আমি তো তা জানি না।" এইরূপ গ্রাম্য অধিবাসীদিগের সেবার জন্ম, কল্যাণ সাধনের জন্ম, জ্ঞানী, সুপণ্ডিত ও ভদ্রবংশীয় যুবক হেয়ার, বড় বড় নগর ও ভদ্রসমাজ ছাড়িয়া সেই নগণ্য পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মেরিয়া আনন্দের সহিত স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

হেয়ার সেই গ্রামের উপাসনালয়ে সাপ্তাহিক উপাসনা করিতেন; তাঁহার নিরক্ষর গ্রাম্য উপাসক মণ্ডলীর

বোধগম্য করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় এবং নিত্যব্যবহার-যোগ্য আকারে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি কেবল ধর্ম্মোপদেশ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, দীনদরিদ্রদিগের পিতা, পরামর্শদাতা ও বন্ধুর ন্যায় তাহাদের সকল সংবাদ লইতেন, এবং অন্নবস্ত্র, ঔষধপথ্যের অভাবও প্রাণপণে দূর করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"দরিদ্রদিগের আত্মায় পৌঁছাইতে হইলে শরীরের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। দারুণ শীতে যাহার পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, তাহার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া অতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।"

এইরূপ প্রসঙ্গ তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই হইত। জীবন্ত ও জীবনগত ধর্ম্ম কি, এবং তাহা কেমন করিয়া করা যায় বা পাওয়া যায়—এই বিষয়েই তিনি উপদেশ দিতেন এবং নিজে সেই ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ দেখাইতেন। নিয়মিতরূপে দরিদ্রদিগকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আদর করিয়া খাওয়ান, বস্ত্রহীনদিগের জন্য বস্ত্র ও জামা কিনিয়া আনিয়া তাহা বিতরণ, সপ্তাহে একদিন নানাপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যের দোকান খুলিয়া প্রায় অর্দ্ধমূল্যে সে সকল বিক্রয় করা, রুগ্নদিগকে ঔষধ ও পথ্যদান করা, বৃদ্ধদিগকে আশ্রয়দান করা, এবং বালকবালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই মেরিয়া স্বামীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি রবিবারের রবিবাসরীয় বিদ্যালয় (Sunday School) করিয়া বালিকাদিগকে নীতি শিক্ষা দিতেন। সময়ে সময়ে মেরিয়া উপদেশ লিখিয়া রাখিতেন এবং হেয়ার রবিবারে উপাসনার পর সেই উপদেশই পাঠ করিতেন। খৃষ্টমাসের সময় তাঁহারা দরিদ্রদিগের জন্য প্রচুর পরিমাণ কম্বল এবং ফ্লানেল আনাইয়া বিতরণ করিতেন।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন, মেরিয়া লিখিয়াছেন—"আজ আমাদের বিবাহের তৃতীয় সাম্বৎসরিক। দুই বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে কাটিয়াছে। এমন সুখের দিন আর হয়ত না। আমাদের উভয়ের প্রেমের সম্বন্ধ দিন দিন গভীরতর হইয়াছে, এবং সকলেরই সঙ্গে আমাদের সুখের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আমাদের ভগবদ্ভক্তি কি সেই পরিমাণে গভীরতর হইয়াছে?"

ইহার কিছুদিন পরে পৈত্রিক প্রচারক্ষেত্রে হেয়ারের ডাক পড়িল। হেয়ার ছিলেন এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, সেখানে ছোট ছোট গ্রাম্য ঘরে তাঁহারা বাস করিতেন। বাগান ছিল না, ভদ্রলোকের উপযোগী কোনও দ্রব্যই নিকটে পাওয়া যাইত না; কিন্তু তাঁহার পৈত্রিক ভবন প্রকাণ্ড জমিদারী বিশেষ, সেখানে প্রাসাদতুল্য গৃহ, দাসদাসী, সহরের সকল প্রকার সুবিধা এবং শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ। কিন্তু অগষ্টাস্ হেয়ার তাঁহার ছোট ভ্রাতা জুলিয়াস্‌কে তাহা ছাড়িয়া দিয়া, স্বয়ং সেই নীরব কর্ম্মক্ষেত্রেই রহিলেন। উভয়ের হৃদয়-মন মিলিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু জীবনের এই গতি বেশী দিন অব্যাহত রহিল না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হেয়ারের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। ডাক্তারগণ তাঁহাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কোন উষ্ণতর দেশে গিয়া বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি ইটালী যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

বিদায়ের কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় উপাসকবৃন্দকে তিনি একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা সমবেত হইলে তিনি প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে কয়েকটি কথা বলিয়া, শয়নগৃহে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সমাজের গায়কগণ তাঁহার জানালার নিকট দাঁড়াইয়া সান্ধ্য-বন্দনা গাহিতে লাগিল; সেই সঙ্গীত শুনিয়া, তিনি ভাবাবেশে দাঁড়াইয়া জানালা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বৎসগণ, আমি কি তোমাদের ছেড়ে যেতে পারি?" এই কথা বলিতেই তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং ভয়ানক কাশী আরম্ভ হইল। ডাক্তারদিগের বিশেষ চেষ্টায় এবং মেরিয়ার প্রাণপণ সেবায় সে রাত্রি তিনি রক্ষা পাইলেন। তারপর তাঁহারা রোমে গমন করিলেন। কিন্তু শরীর আর সারিল না, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে, সকলের নিকট বিদায় লইয়া মেরিয়াকে অনেক আশাপূর্ণ প্রেমের

কথা বলিয়া, হেয়ার শান্তচিত্তে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মেরিয়া এই অবস্থায় লিখিয়াছেন—"আমার জীবনের আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা ভগবানের প্রেম-উদ্যানে সাধুতার বৃক্ষরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার ইহজীবনের দেবতাকে গ্রহণ করিয়া তিনি আমাকেও তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। এতদিন তিনি আমাকে যে রত্ন, যে আনন্দ সম্ভোগ করিতে দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। * * * প্রেমময় ঈশ্বরের মঙ্গলকর বিধি অনুসারেই প্রিয়জন দেহত্যাগ করেন, ইহাই আমার প্রধান সান্ত্বনা। যে আনন্দ তিনি দয়া করিয়া দিয়াছেন, তারই জন্য কৃতজ্ঞ থাকিব। তিনি জানেন—কি করিলে আমার কল্যাণ হইবে। আমি নিরাশ হৃদয়ে যখনই তাঁহার নিকট ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছি, তখনই তিনি আমাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, কখনও বিমুখ করেন নাই।"

৩

তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। স্বামীও চলিয়া গেলেন। কিন্তু মেরিয়া একবারও অভিযোগ করিলেন না। শোকানলে পবিত্রতর হইয়া তাঁহার হৃদয় মন আরও উন্নত হইয়াছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে ভগবানের দয়ার নিদর্শন দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় অবনত হইলেন। আল্টন্-বাসীদিগের মধ্যে কয়েক দিন যাপন করিয়া তিনি দেবতাতুল্য দেবর জুলিয়াসের নিকট গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, জুলিয়াস্ও তাঁহাকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্থান দান করিলেন। অপর এক দেবরের একটি পুত্রকে তিনি সন্তানের ন্যায় পালন করিতে চাহিলেন, তাঁহারাও দিলেন। এই বালক তাঁহাকে ঠিক আপনার মায়ের মতই মনে করিত। দেবর, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানগণ এবং তাঁহার পুত্র এই সকল লইয়া তিনি একটি বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী হইলেন। এই পরিবার, সদ্গ্রন্থ সকল, শিল্প, সঙ্গীত, স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ, এ সকলই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সহায়, ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ তিনি গ্রহণ করিতেন। দেবর জুলিয়াসের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; মেরিয়া সেই লাইব্রেরী হইতে উচ্চশ্রেণীর সারগর্ভ গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ বাইবেল পাঠ করিতেন। এই মহাগ্রন্থই তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ করিত। এতদ্ব্যতীত তিনি বহুক্ষণ গভীর ধ্যানে ও প্রার্থনায় যাপন করিতেন এবং ভগবানের ইচ্ছা জ্ঞাত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার "গ্রীনবুক্" নামক ডায়ারীতে তিনি তাঁহার অন্তর্জীবনের অতি সুন্দর ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছেন। একস্থানে লিখিয়াছেন—"হে প্রভু, তুমি আমাকে জ্ঞান দাও, তোমার ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশিত কর; কেমন করিয়া আমি তোমার মনের মত করিয়া ঘরকন্না সাজাইব, কি প্রণালী অনুসারে আমার সন্তানকে শিক্ষাদান করিব এবং কিরূপে আমার প্রিয়জনদিগকে তোমার প্রতি আরও ঘনিষ্ঠতররূপে আকর্ষণ করিব, তাহা আমি জানি না, তুমি আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দাও, আমার যেন ভুল না হয়। আমার সকল অহংকার চূর্ণ কর, সকল ক্ষুদ্রতা দূর কর, প্রেম ও পবিত্রতায় আমার হৃদয় পূর্ণ কর।"

তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, নানা দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানকে মানবের অতি মূল্যবান সম্পদস্বরূপ মনে করিতেন, জ্ঞানালোকে বিশ্বময় ভগবানের লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানেই ক্ষান্ত বা তৃপ্ত হইতেন না; হৃদয়ের ব্যাকুল অনুরাগ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রেমস্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া, তবে নিরস্ত হইতেন।

কেবল স্তুতি, বন্দনা ও প্রার্থনা দ্বারাই তিনি ভগবানের অর্চ্চনা করিতেন না, দরিদ্রের সেবা তাঁহার অর্চ্চনার একটি বিশেষ প্রণালী ছিল। প্রতিদিন প্রাতর্ভোজনের পর তিনি বিস্তৃত মাঠ অতিক্রম করিয়া একটি গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়াইতে যাইতেন। প্রত্যেক বালিকার গৃহের সকল সংবাদ অবগত হইতেন, তাহাদের প্রত্যেকের সুখ দুঃখের সহিত তাঁহার সমমর্ম্মীতা প্রকাশ করিতেন। বালিকারা সকলেই নিজের নিজের সুখ দুঃখের কথা তাঁহাকে বলিবার জন্য ব্যস্ত হইত। তাঁহার কাছে পড়িয়া তাহারা অনন্দ পাইত। তিনি বর্ত্তমান

থাকিয়া উৎসাহ না দিলে তাহারা খেলিয়াও সুখী হইত না। কোন বালিকার অসুখ করিলে, সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাঁহাকেই দেখিতে চাহিত। তিনিও বালিকাদিগকে নিজের সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। স্কুলে গমনের পথে মাঠের উন্মুক্ত উদার দৃশ্য, খোলা বাতাস ও অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া তিনি ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিতে করিতে যাইতেন, স্কুলে বালিকাদিগের সঙ্গেও সেই প্রেমস্বরূপের অর্চ্চনা করিতেন।

যিশুখৃষ্টের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন তাঁহার নিকট অতি পবিত্র বিশেষ দিন স্বরূপ ছিল। উক্ত দিনে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া বহু সময় যাপন করিতেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল প্রেম ;—ভগবানে প্রেম, মানবে প্রেম। এই প্রেম সংসারের তরঙ্গাঘাতে কখনও বিক্ষুব্ধ হইত না। কারণ তিনি অপরকৃত সকল ক্ষতি তাঁহার প্রাপ্য ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন। সুতরাং ক্ষতিকারীকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতেন।

তাঁহার পালিত-পুত্র অগষ্টাস্ যখন ষোল বৎসর অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ বৎসরে পদার্পণ করিতে যাইতেছিল, সেই সময় তিনি তাহাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন— "আর দুই দিন পরে তোমার বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হইবে। সেই যে ছোট শিশু তুমি আমার পার্শ্বে ফুল লইয়া খেলা করিতে, সেই তুমি একজন যুবাপুরুষ হইয়াছ, ইহা মনে করিয়া বিস্মিত হইতেছি! 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান অন্বেষণ' অর্থ কি, তাহা এখন তোমার বুঝিবার বয়স হইয়াছে। যাহা কিছু শিখিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। কতকগুলি বিষয়ে কিছু কিছু জানা কোন কাজের শিক্ষা নহে; আশা করি, তুমি কেবল নানা বিষয়ের তৃপ্তিকর এবং অনায়াসে অধিগম্য অংশটুকু জানিয়াই ক্ষান্ত হইবে না; প্রত্যেক বিষয়েরই ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কি ভাষা শিক্ষা, কি ড্রইং শিক্ষা, শুষ্ক কঠিন ব্যাকরণ এবং রেখাঙ্কন, কঠিন পরিশ্রম দ্বারা আয়ত্ত না করিলে কিছুই ভাল করিয়া শিক্ষা করা হয় না। এতদ্ব্যতীত, কঠোর পরিশ্রম করিবার অভ্যাস ও তাহাতে অনুরাগ না জন্মিলে চরিত্রই গঠিত হয় না, এবং কল্পনার আবেগ প্রশমিত করিয়া কোন বিষয় যথাযথরূপ বুঝিবার শক্তিলাভ হয় না। সক্রেটিসের জীবনে দেখিতেছি, তিনি নানা প্রকারে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, 'সকলে প্রকৃত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জ্ঞানের ভাণ লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে।' তুমিও অধিক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিবে যে, এখন তুমি যাহা জান তাহা জ্ঞানের বাহিরের আবরণ মাত্র।"

এইরূপে সাধন ভজন, অধ্যয়ন, ও দরিদ্রসেবার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি বাগানে বেড়াইতেছিলেন, হঠাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যান। সেই হইতে কয়েক মাস তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। সমস্ত শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইত ও কাঁপিত, কর্ণ বধির হইত, সামান্য ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর শীতল হইয়া যাইত এবং কখন কখনও বহুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকিতেন, তখন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। একবার এইরূপ প্রায় জীবনহীন অবস্থায় ১১ ঘণ্টা ছিলেন। এইরূপ যাতনা এবং মূর্চ্ছার অবস্থাতেও তাঁহার মনে ও মুখশ্রীতে কোনরূপ কষ্টের চিহ্ন দেখা যাইত না; দেহ মন সৌন্দর্য্যে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকিত। মূর্চ্ছার অবসানে তিনি প্রায়ই বলিতেন, যে তিনি স্বর্গের আনন্দ-সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন।

কিছুকাল পরে ডাক্তারদিগের পরামর্শ অনুসারে, তিনি ইটালী ভ্রমণ করিতে যাত্রা করেন, এবং প্রায় দেড় বৎসর কাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ শরীরে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ডায়ারীতে লিখিয়াছেন—"হে প্রভু, হে ঈশ্বর, যদি আবার স্বাস্থ্য দিলে, গৃহে আনিলে, তবে আমার হৃদয়কে পুনরায় স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ কর, আমি যেন তোমার ইচ্ছা পালনের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া সকলের সেবা করিতে পারি, সকলকে তোমার পথে চলিতে সহায় করিতে পারি।"

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জানিতে পারিলেন, উকিলের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি হইতে তাঁহারা একবারে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পৈত্রিক

বাসগৃহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই অবস্থায় পড়িয়া তিনি নিজের ক্ষতির কথা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার দেবর ও সন্তানগণের যে ক্ষতি হইল তজ্জন্য হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনি ধীরভাবে আপনার শক্তি ও অর্থ যাহা কিছু ছিল তাহা দ্বারা সকলেরই অভাব দূর করিয়া সকলকে শান্ত করিয়া ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সময় প্রার্থনা করিয়াছেন—"হে প্রভু, জটিল ব্যাপারকে সরল কর; পাপ ও কুসংস্কারের মেঘ সকল দূর কর; অমঙ্গলের ভিতর হইতে তুমি কল্যাণ আনয়ন কর; বঞ্চিত প্রিয়জনদিগকে তুমি তোমার দিকে ফিরাও, তারা তোমার কাছে আসিয়া শান্তি লাভ করুক। এই পরীক্ষায় তুমি আরও বিশ্বাস, দীনতা ও প্রেম দান কর। অন্যের পাপাচরণের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়া, নিজের প্রতি যেন তীব্র হইতে পারি।"

স্বাস্থ্যের জন্য আরও দুই তিনবার তাঁহাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণান্তে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, সকলকে ধন্যবাদ দান করিয়া, প্রফুল্লমনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার সন্তান কবিতায় লিখিয়াছেন—"মাতার প্রভাব সর্ব্বদা আমার সঙ্গে বর্ত্তমান—তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ এখনও অক্ষুণ্ণ।"

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

সুন্দর সাজসজ্জার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ যেন মেয়েদের একটা ব্যাধিবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত গভীর ও মহৎ ভাব সমূহের জীবন্ত প্রবাহ আমাদের সমাজের মধ্যে এখনও স্থান পায় নাই, মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার ব্যতীত এদেশের পারিবারিক জীবনের সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য বিলাসিতার লঘু মলয়ানিল আমাদের সমাজে ও পরিবারে অবাধগতিতে প্রবাহিত হইয়া বিচিত্রবেশী প্রজাপতির উৎপাত দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছে। স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় করিয়াও সুন্দর দেখান চাই; আমি মরি আর বাঁচি তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমাকে দেখিয়া সকলে যেন বাহবা দেয়—এইরূপ মনোভাব যেরূপ কুৎসিত, সেই ভাব-প্রণোদিত সাজসজ্জার আড়ম্বরও সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে তদনুরূপ কদর্য্যতারই সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর." ইহাই পাপের শাস্তি! এ একপ্রকার তীব্র নেশা। বুঝিতেছি এই উপায়ে প্রকৃত সৌন্দর্য্য লাভ হয় না, তবুও ছাড়িতে পারি না। এই চিন্তার উদ্বেগ স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখেও কালিমা সঞ্চার করে, জীবনের সকল প্রকার মহত্ত্ব ও গভীরতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

প্রকৃত সৌন্দর্য্যের মূল স্বাস্থ্য—সবল দেহ ও সজীব মন। সুস্থ সবল কর্ম্মঠ শরীর সৌন্দর্য্যের উৎস। ইহার উপর যে কোন প্রকার পরিষ্কার লজ্জানিবারক ও শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ পরিচ্ছদ রমণীকে রমণীয় করিতে সমর্থ। রমণীর যে রূপ দেখিয়া অপরের হৃদয়ে সম্ভ্রম এবং বিমল আনন্দ জাগিয়া উঠে, তাহাকেই আমরা সৌন্দর্য্য বলিতেছি।

শরীরের সৌন্দর্য্য সাধন প্রয়াসী অনেক মহিলা দিনের পর দিন অঙ্গমার্জ্জন বা বস্ত্র পরিবর্ত্তন স্থগিত রাখিয়া, কেবল মাত্র হাত দুখানি এবং মুখখানি সাবান দিয়া ধৌত করিয়া মনে করেন, সৌন্দর্য্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। আমাদের দেহের আবরণ যে ত্বক্, তাহা মৃত বস্তু নহে, তাহা সজীব পদার্থ, তাহারও কার্য্য আছে। ত্বকের কার্য্যতৎপরতার উপর আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

আমাদের দেহে প্রধানতঃ দুইপ্রকার ত্বক্ আছে, বাহ্যত্বক্ এবং অন্তস্ত্বক্। বাহ্যত্বক্ সমস্ত দেহের স্বাভাবিক ব্যাপার, দেহের স্নায়ুসকলের রক্ষাকারী আবরণ, এবং ইহার মধ্যে অন্তত্বক্ অসংখ্য ছিদ্রের দ্বারা অভ্যন্তরস্থ ক্লেদরাশি নির্গত করিবার যন্ত্র। শীত কিম্বা গ্রীষ্ম অধিক হইলে বাহ্যত্বকের দ্বারা আমরা তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু যখন নানা কারণে অন্তত্বকের ছিদ্র সমূহ বন্ধ হইয়া গিয়া কোন ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ রূপে

অত্যধিক শীত ও কম্পন উপস্থিত হয়, তখন আমাদের অন্তস্ত্বক্ শীর শীর করিয়া উঠে এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে বাহিরের চর্ম্মের নীচে আর এক স্তর চর্ম্ম আমাদের দেহ আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অন্তস্ত্বক্ যে আবর্জ্জনারাশি বহিয়া আনে, বাহ্যত্বক্ যদি তাহা টানিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে সেই সঞ্চিত আবর্জ্জনার সংস্রবে আসিয়া রক্ত দূষিত হয় ও তাহার অন্তর্গত রোগবীজ-নাশকারী পরমাণু সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহাই রোগের মূল। সুতরাং যদি বাহ্যত্বক্ সতেজ ও কর্ম্মক্ষম না থাকে, তাহা হইলে অন্তস্ত্বক্ এবং শোণিতপ্রবাহ হীনবল হইয়া পড়ে। ত্বকের সহিত দেহের সকল যন্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেহাবরণ ত্বক্ এবং দেহের অন্তর্নিহিত যন্ত্র সকল সর্ব্বদাই পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে; কোন যন্ত্রে গোলমাল হইলে ত্বকে তাহা প্রকাশ পায়, এবং ত্বকে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিলে সমস্ত যন্ত্রই কিয়ৎ পরিমাণে বিকল হইয়া থাকে। যখন আমাদের ত্বক্ নাতিশীতোষ্ণ ও স্বচ্ছন্দ-ভাবময়, তখন আমরা সুস্থ; যখন ত্বক্ শুষ্ক, উত্তপ্ত বা শীতল, তখনই আমরা অসুস্থ। সুতরাং ত্বক্ যাহাতে সজীব (Active) থাকে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য।

যেমন দেহের দিক হইতে সৌন্দর্য্যের মূল ত্বকের সজীবতা, তেমনি মনের দিক হইতে লাবণ্যের মূল স্থিরতা, ধীরতা বা শান্তভাব। সুন্দর গঠন, সুন্দর বর্ণ ও মিষ্ট মুখশ্রী চঞ্চলতাদের জন্য শ্রীহীন হইয়া পড়ে। অনেক নবীনা রমণীর মন এত চঞ্চল, যে তাহাদের হাত পা চোখ মুখ এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না, তাহারা সর্ব্বদাই এই ভাবনায় ব্যস্ত—কে তাহাদিগকে দেখিয়া কি ভাবিতেছে। এই শ্রেণীর মহিলাদিগের প্রতি যিনি কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এই চঞ্চলতা দূর করিতে না পারিলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য কিছুই লাভ হয় না।

খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও সুবিবেচনা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার আর এক উপায়। যেরূপ বস্তু আহার করিলে শরীর সুস্থ সবল থাকে, তাহাই ঠিক আহার। শরীর ভাল থাকিলে আহারের জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ছাত্রাবস্থা হইতেই খারাপ বোধ করিতে অভ্যস্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয়;—তাহাদিগের কিছুই ভাল লাগে না, কোন খাদ্য মুখে রোচে না, কোন রকমে লম্ফ দিয়া দুগ্রাস মুখে দিয়া উঠিয়া যায়। শরীর রক্তহীন, শক্তিহীন ও শীর্ণ না হইয়া আর কি হইবে? খাদ্য সম্বন্ধে এই ভাব সহজেই দূর করা যায়। সকলেরই গোড়ার কথাটা মনে রাখা আবশ্যক যে, সুস্থ না হইলে সুন্দর হওয়া যায় না। এবং খাদ্য সম্বন্ধে নিয়মিত না হইলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। পান আহার সম্বন্ধে এই কয়টি নিয়ম প্রত্যেকেরই পালন করা কর্ত্তব্য।

১ম। তাড়াতাড়ি খাইবে না, ধীরে ধীরে চিবাইয়া খাইবে।

২য়। খাওয়ার সময় বেশী তরল বস্তু পান করিবে না।

৩য়। ঝাল, নুন, মশলা প্রভৃতি বেশী খাইবে না।

৪র্থ। এক সঙ্গে অনেক প্রকার খাদ্য খাইবে না।

৫ম। একবারে বেশী খাইবে না।

৬ষ্ঠ। খাওয়ার সময় বেশী কথা বলিবে না।

৭ম। চা ও কফি পান করিবে না।

৮ম। দুধ, দই ও ঘোল যথেষ্ট পরিমাণে পান করিবে।

৯ম। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, তাহারা পরিষ্কার জলে লেবুর রস মিশাইয়া পান করিবে।

১০ম। সোডা, লিমনেড প্রভৃতি ও বরফ-জল কখন পান করিবে না। বরফ-জল শরীরের শক্তি নাশ করে।

একদিকে যেমন নারীদিগের পক্ষে দুর্ব্বল ও শীর্ণ হওয়া সৌন্দর্য্যের বিরোধী, তেমনি পুরুষোচিত ব্যায়াম ও ক্রীড়া দ্বারা শরীর ও মন কঠোর ও কর্কশ করিয়া তুলিলেও নারীর কমনীয়তা দূরে পলায়ন করে। ভগবান নারীকে কোমলতা, পবিত্রতা ও মিষ্টতার আধার করিয়া রচনা করিয়াছেন। ক্রিকেট ও হকি খেলিয়া, গাছে চড়িয়া, স্বীয় প্রকৃতিকে কঠোর করিয়া তোলা রমণীর কর্ত্তব্য নহে। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন বিষয় পার্থক্য না থাকিতে পারে। কিন্তু তারপর বালিকাদিগের শ্রেষ্ঠ ভূষণ

নম্রতা। রমণীর সকল কার্য্যে ও কথায় কোমলতা যেন প্রকাশ পায়।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের আর একটি উপকরণ পরিচ্ছন্নতা। দেহ, গৃহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখিতে না পারিলে স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। শয়নগৃহে শয্যা ব্যতীত আর কিছুই না রাখা ভাল। কারণ, শেল্‌ফ্ ও ব্র্যাকেটে যত জিনিষ থাকে, তাহার সঙ্গে সেই পরিমাণে ধূলা ও তন্মধ্যে নানা রোগের বীজাণু সঞ্চিত হয়। শয়নগৃহের দরজা জানালা সমস্ত দিন সম্পূর্ণ খোলা রাখা উচিত, যাহাতে আলোক ও বায়ু সর্ব্বদা অবাধে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। রাত্রিতেও শয়নগৃহে মুক্ত বায়ু প্রবেশের পথ এরূপ ভাবে রাখা কর্ত্তব্য যে শয্যায় বায়ু না লাগিয়া, গৃহের অপর কোন স্থান দিয়া বহিয়া যাইতে পারে। শয়নগৃহের শয্যা এবং গৃহের অন্যান্য দ্রব্যাদি মাঝে মাঝে সরাইয়া ঝাড়িয়া রাখিতে হয় নতুবা গৃহ সম্পূর্ণ রূপ পরিষ্কার থাকে না।

এইবার স্নানের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। স্নান দেহের কান্তি ও মুখশ্রী সংবর্দ্ধনের এক প্রধান উপায়; স্নান দেহের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া স্নান করিলেই হয় না.—বিশেষ বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলেই শরীর সুস্থ এবং মুখশ্রী সুন্দর হয়।

প্রাতঃকাল স্নানের অতি প্রশস্ত সময়। শীতকালে গৃহমধ্যে স্নান করা কর্ত্তব্য, নতুবা বিপরীত ফল ফলিতে পারে। গরম জল ও ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া সেই জলে তোয়ালে ভিজাইয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘসিতে হইবে; তিন চার মিনিটে ইহা শেষ হইলে, পুনরায় কয়েকবার জলে তোয়ালে ডুবাইয়া জলসুদ্ধ তোয়ালে সর্ব্বাঙ্গে তাড়াতাড়ি বুলাইয়া, শেষে একখানি শুষ্ক তোয়ালে দিয়া সমস্ত শরীর ঘসিয়া টিপিয়া মর্দ্দন করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে এবং ক্ষিপ্রহস্তে বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম গা ঘসিবার সময় সিক্ত তোয়ালেতে একটু সাবান মাখাইয়া লইতে পারা যায়, অথবা অগ্রে তেল মাখিতেও পারা যায়। মাথায় তেল দিয়া ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়া ফেলা খুবই ভাল। বস্ত্র পরিধানের পর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়া. দশ মিনিট খোলা বাতাসে ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। তারপর খাবার খাইয়া. দিবসের অন্যান্য কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। এই ব্যবস্থা অনুসারে চলিলে একমাসের মধ্যে দুর্ব্বল দেহে ও মনে নূতন শক্তি ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইবে এবং দেহের কান্তি বর্দ্ধিত হইবে।

এইরূপ স্নানের ব্যবস্থা কেবল দুর্ব্বল ও রুগ্নদিগের জন্য। সুস্থ সবল ব্যক্তি অবস্থা অনুসারে স্নান করিবেন। ভোরে স্নান সকলের পক্ষেই বিশেষ উপকারী।

দুর্ব্বল ও রুগ্নদিগের জন্য নানা প্রকার স্নান ও ফুটবাথের ব্যবস্থা আছে। তাহা অনর্থক নহে।

ভোরে দেহ মার্জ্জন, উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, নিয়মিত পানাহার, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ ও ঘরবাড়ী, আলোক ও বায়ুর অবাধ গতির মধ্যে বাস, এবং সর্ব্বোপরি শান্ত মন, স্বাস্থ্য ও প্রকৃত সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক ও সহজ পথ।

প্রথম প্রভাতে

প্রথম প্রভাতে দাঁড়াও যখন
কামিনী তরুর তলে,
আকুল কোকিল কাকলি ঢালিয়ে
কত কথা যায় ব'লে!
অরুণ তখন তরুণ রাগেতে
পূরব গগনে জাগে!
সুপ্ত হৃদয় নয়ন মেলিয়ে
তোমার প্রণয় মাগে।
তখন প্রথম মলয়-মারুত
আকুল করে এ প্রাণ,
ছিন্ন বীণায় উঠেগো বাজিয়ে
আবার নূতন তান।
তখন তোমার অনিমেষ আঁখি
হেরিগো নয়ন ভ'রে,
কত প্রেম, প্রীতি সুখময় স্মৃতি,
রাখগো আমার তরে।

বসন্তের হাসি লয়ে রূপ রাশি
জাগে এ হৃদয়-বনে !
আশার কুসুম উঠেগো ফুটিয়ে
মৃদু মধু-সমীরণে !
কনক-তপন মলয়-পবন,
কতবার যায় আসে,
প্রভাতের সেই সোনার স্বপন
দুনয়নে মোর ভাসে।
প্রথম প্রভাতে ফুল তরু তলে
যখন প্রথম দেখা,
তখন তোমার নধর অধরে
ফোটেগো হাসির রেখা !
যবে রাঙ্গা রবি হাসি সেই রূপ রাশি
জড়ায় কিরণ জালে,
মধুর প্রকৃতি বুকে ক'রে তোমা'
কি নব সুষমা ঢালে !
আকুল বাসনা সে নব মাধুরী
দুনয়নে মোর মাখে !
সেই স্মৃতিটুকু আদরে যতনে
হৃদয় আঁকিয়া রাখে—
হাসি ভরা সেই মধুর স্মৃতিতে
নবীন আলোক-রেখা,
প্রথম প্রভাতে দাঁড়াও যখন
হে মোর হৃদয়-সখা !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

আদর্শ-রমণী

যেমন সাধনা, তেমনি সিদ্ধি ; এবং যেমন আদর্শ, তেমনি সাধনা। যাহার আদর্শ যত উচ্চ, যত সুস্পষ্ট, যত উজ্জ্বল এবং যত নিখুঁৎ, তাহার সাধনাও তদনুরূপ সুশৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণ।

উচ্চশ্রেণীতে ভূগোল পড়াইতে গিয়া দেখা গিয়াছে, এমন ছাত্রও আছে যে হিমালয় পর্ব্বতের উপর, কাশ্মীর হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত, কুমারিকা অন্তরীপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অনেক ছাত্র ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের তীরদেশে অন্তরীপ খুঁজিতেছে। অপর ছাত্রগণ নাম করিবামাত্র একবারে দৌড়িয়া গিয়া কুমারিকায় হস্তার্পণ করিতেছে।

এরূপ হয় কেন ? যাহারা হিমালয়ের উপর কুমারিকা খুঁজিয়া বেড়ায় তাহারা সকলেই যে নিতান্ত নির্ব্বোধ, বিকৃতমস্তিষ্ক, তাহা নহে। অন্যান্য বিষয়ে তাহারা এক একজন ওস্তাদ। কেউ খেলাতে, কেউ বাক্‌পটুতাতে সকলের নেতা। তবে এরূপ হয় কেন ? কারণ, শিক্ষা সম্বন্ধে কোন আদর্শ মনে নাই, অন্ততঃ ভূগোল যে একটি শিক্ষণীয় বিষয় এবিষয়ে তাহাদের ধারণা অত্যন্ত অপরিষ্কার। শিক্ষা এবং পরীক্ষার আদর্শ অনুসারে একজন ছাত্র কোন প্রকারে প্রমোশন পাইয়াই সন্তুষ্ট, আবার কোন ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৮ কেন পাইল, ২ নম্বর কেন কাটা গেল, এই চিন্তায় নিজের উপর কত অসন্তুষ্ট ! সকল বিষয়েই আদর্শটাই গোড়ার কথা, তাহার উপর আর সমস্ত নির্ভর করে।

স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের ব্যবহার, তাহাদের শিক্ষা ও কার্য্য,—এ সকলই নির্ভর করে স্ত্রীজাতির জীবনের আদর্শের উপর। বর্ত্তমান যুগ সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ও উন্নতির যুগ। যাহা প্রাচীন ও জীর্ণ তাহার স্থানে নূতন সুস্থ সবল জীবন্ত সত্তার সমাবেশ—নিত্য-নূতন, নব-সৌন্দর্য্য, নব-আনন্দ, নব-উৎসাহ, নব-সাধনা, নব-সম্ভোগ, নব-ত্যাগ—অনবরত অগ্রসর হওয়া ; প্রাচীন ও বর্ত্তমানকে অন্বেষণ করিয়া, খনন করিয়া, তাহার রস শোষণ করিয়া, তাহা আয়ত্ত করিয়া, এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া, সর্ব্বদা নব-উষার নবতর আলোক ও আনন্দের জন্য, উজ্জ্বলতর ও বিস্তৃততর জীবনের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকা—বর্ত্তমান যুগের লক্ষণ। এই নিত্য-নব জীবন-লাভের প্রেরণা—যিনি চিরনবীন তাঁহারই প্রকাশ। এই যুগ সত্যযুগের প্রথম প্রভাত।

এই আলোকময় যুগের প্রখর কিরণে সমস্ত জগতের এবং এই ভারতের মানবমনের উন্নতি ও বিকাশের

ইতিহাস পাঠ করিলে, আমাদিগের সম্মুখে নারীজীবনের কোন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ প্রকাশিত হয় না কি? এই জগতে আমাদের স্থান কোথায়? শারীরিক শক্তি হিসাবে আমরা জগতের পথপার্শ্বে খঞ্জ, জাতীয় শিক্ষার হিসাবে আমরা মহা অন্ধ, অন্তর্নিহিত ভগবৎবাণী শ্রবণ ও কর্ত্তব্য-বোধের অনুসরণ বিষয়ে আমরা বধির, আত্মানুভূতির প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা মূক ;—আমাদিগের সম্মুখে সুদীর্ঘ জীবন-সংগ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা কোন্ পথে যাইব? নির্জ্জীবতা অজ্ঞতা প্রভৃতি শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আমরা কোন্ উন্নত জীবনাদর্শের দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইব? আমাদের সম্মুখে নারী-জীবনের কোন্ উন্নত আদর্শ বর্ত্তমান, যাহার অভ্রভেদী বিজয় পতাকা দেখিয়া আমরা অগ্রসর হইব? সে আদর্শ যে কি, তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদিগের সম্মুখে থাকা আবশ্যক।

গৃহ রমণীর রাজ্য, গৃহই রমণীর কার্য্যক্ষেত্র। স্বামীর স্ত্রী এবং সন্তানের জননী, অথবা গৃহিণী হওয়াই রমণীর জীবনের লক্ষ্য। রমণী গৃহের সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা ও আনন্দ বিধান করিবেন, বাহিরের গুরুতর সংগ্রামে লিপ্ত স্বামী ও সন্তানগণ গৃহে আসিয়া তাঁহাদের প্রভাবের মধ্যে, তাঁহাদের বিধিব্যবস্থা ও পরিচর্য্যার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করিবেন, নববল নব উৎসাহ লাভ করিবেন,—ইহাই সংক্ষেপে রমণীর আদর্শ। কিন্তু যে দিন একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম স্বামী রোগশয্যায় শয়ন করিবেন, সেদিনও কি রমণী কেবল গৃহিণী হইয়া বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিবেন? অথবা সেদিন রমণী, প্রয়োজন হইলে, অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য গৃহের বাহির হইবেন, লক্ষ লক্ষ পুরুষ এবং শত শত অপর নারীর সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া দণ্ডায়মান হইবেন? যখন স্বামী রুগ্ন এবং বয়স্ক পুত্র পরলোকগত, তখন স্বামীর শস্য-ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন এবং শস্য কর্ত্তন কি আর হইবে না? নারী কি কেবল গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনাহারের প্রতীক্ষা করিবেন? অথবা যেদিন কোন পুরুষ গৃহে নাই, সেদিন যদি শত্রু আসিয়া নগর আক্রমণ করে, নারী কি সেদিন তাঁহার কোমলাঙ্গে প্রাণঘাতী অস্ত্রধারণ করিয়া বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইবেন না?

আমাদের এই হতভাগ্য দেশের সম্মুখে এই সকল প্রশ্ন বর্ত্তমান। আমরা কি মীমাংসা করিব? ভারত-বর্ষকে,—এই বঙ্গভূমিকে যদি আমরা উন্নত ও জীবন্ত দেখিতে চাই,—এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। এই মীমাংসার উপর ভারতীয় নারীজীবনের আদর্শ নির্ভর করিতেছে।

বিগত বল্কান সমরে সার্ভিয়া, বুল্‌গেরিয়া প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের মুষ্টিমেয় নাগরিকগণ যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহাদিগের দেশের নারীশক্তি বর্ত্তমান। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের রমণীগণও প্রধানতঃ পতির পত্নী এবং সন্তানের জননী—গৃহের গৃহিণী। তাঁহারা গৃহের পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য-বিধানের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়, এই রমণীগণ আনন্দের সহিত হল চালনা করেন ও শস্য-কর্ত্তন করেন, বস্ত্রবয়নাদি শিল্পকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস হইলে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সে অভাব পূর্ণ করেন। এইরূপ নারীজীবনের উন্নত-শক্তি পশ্চাতে বর্ত্তমান থাকিয়া বল্কানদিগের শক্তি ও সাহস শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তুর্কীরমণীগণ এইরূপ হইলে আজ তুরস্কের চেহারা অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম।

আজ আমাদিগের দেশে সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর আবশ্যক হইয়াছে। শিক্ষা ও শক্তি, শিষ্টতা ও তেজের সম্মিলনে ইঁহাদের জীবনে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকল দেশের, সকল কালের উপযোগী। ইঁহারা একদিকে ভগবানে ভক্তিমতী, পতিগত-প্রাণা, সন্তানবৎসলা, কোমল-হৃদয়া, পরদুঃখ-কাতরা, অতিথিসৎকার-পরায়ণা সুগৃহিণী, অপর পক্ষে সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, তেজস্বিনী, সকল অবস্থায় স্বামী ও সন্তানগণের সহায় ও শক্তি স্বরূপিণী।

এদেশের নারীদিগকে গৃহের কার্য্য আরও সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে শিখিতে হইবে, সন্তানপালন-বিজ্ঞান নূতন করিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু তাহাই যথেষ্ট

নহে; তাঁহাদিগকে পুরুষদিগের পার্শ্বে গিয়াও দাঁড়াইতে হইবে, এবং তাঁহাদিগের স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের ভারও বহন করিতে হইবে।

এই সঙ্গে একথাও বলিয়া রাখিতেছি যে এই বিধি পুরুষদিগের পক্ষেও প্রযুজ্য। পুরুষগণকেও গৃহের বাহিরে দিনরাত্রি না থাকিয়া, কিয়ৎক্ষণ গৃহের ভিতরে কাটাইতে হইবে। স্ত্রীর সহায় ও সঙ্গী হইতে হইবে, কত সময় তাঁহার স্থান অধিকার করিতে হইবে।

এই আদর্শ জীবন্ত সমাজের আদর্শ। আমরা জীবন্ত জাতি হইব, আর মরিয়া থাকিব না—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সম্মুখে যেমন সংগ্রাম, এমন আর কাহার আছে? আমাদের পক্ষে নরনারীর পরস্পর সহায়তা, পুরুষ-শক্তির সহিত নারী-শক্তির যোগ যেরূপ অত্যাবশ্যক এমন আর কোনও দেশে নয়। তাই স্বদেশপ্রেমিক কবি গাহিয়াছেন,—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

আফ্রিকায় সংকট

(৫)

সংগ্রাম।

হেন্‌রী ফটকের নিকটে গিয়া দেখিল কপাট উন্মুক্ত! "তবেকি অসভ্যগণ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে?" সে আর কোন চিন্তা না করিয়াই ভিতরে গিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ভৃত্যদিগের গৃহে গিয়া দেখিল, তাহারা ঘুমাইতেছে। সে তাহাদিগকে এক এক ধাক্কা দিয়া উঠাইল, জাগাইল, তারপর এক একজনকে এক একটা বন্দুক ও কয়েকটা গুলি দিয়া এক এক দরজার পার্শ্বে প্রাচীরে বসাইয়া দিল। এবং হুকুম দিল, 'অসভ্যগণ দরজার দিকে অগ্রসর হইলেই গুলি করিবে। আরও বলিল, "যদি কেহ আদেশ অমান্য করে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ যাইবে।"

হেন্‌রীর বীরের ন্যায় বেশ, কোমরে ছোরা এবং রিভলবার, হাতে প্রকাণ্ড সুদৃঢ় বন্দুক, এবং তাহার দৃঢ় কণ্ঠস্বর, এই সকল যুগপৎ তাহাদের মনে সম্ভ্রম এবং বাধ্যতা আনয়ন করিল। তাহারা অবনত মস্তকে তাহার আদেশ স্বীকার করিল। তখন হেন্‌রী প্রধান গেটে (ফটকে) বয়কে প্রহরী রাখিয়া, মেরীর শয়নগৃহের দিকে গমন করিল।

মেরীর ঘরের দরজা বন্ধ। হেন্‌রী ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিল। মেরী দরজা খুলিয়া হেন্‌রীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হেন্‌রী বলিল "চুপ্ কর, চুপ্ কর। বিশেষ কথা আছে!"

মেরী ভীত হইল। কিছু বলিতে পারিল না। হেন্‌রী তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিল এবং তাহাকে সংক্ষেপে বিপদের কথা বলিল। প্রথমে মেরী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু হেন্‌রীর আশ্বাস বাক্যে স্থির হইয়া বলিল—

"তবে এখন কি হবে? তারা হাজার হাজার লোক, আমরা কয়জন?"

হেন্‌রী। তোমার কোন ভয় নাই। অসভ্যগণ আগ্নেয় অস্ত্রকে অত্যন্ত ভয় করে। অন্ততঃ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিতে কেহ তোমার গাত্রস্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি স্থির হও। আমার কথা মত কাজ কর।

মেরী। তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব।

হেনরী। আচ্ছা, তুমি এই বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিবে, এবং আমি শত্রু নিপাত করিব। আমি জানালার উপরে বসি, তুমি নীচে বসিয়া থাক, যেই একটি বন্দুক খালি হবে, অমনি তুমি সেটিতে গুলি ভরিবে।

তখনও রজনীর অন্ধকার দূর হয় নাই। পূর্ব্বাকাশের সুদূর প্রান্তে উষার প্রথম রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দুটি একটি পাখী অস্পষ্ট রব করিতেছিল। চতুর্দ্দিকের জঙ্গলে বিদ্যমান অসভ্যদিগকে তখনও দেখা যাইতেছে না। হেন্‌রী জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মেরীর হাত ধরিয়া, প্রফেসারের সন্ধানে তাঁহার ঘরে

গিয়া দেখিল, তিনি তখনও নেশায় মগ্ন হইয়া যা'তা' বকিতেছেন!

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হেন্‌রীর মনে রাগ ও দুঃখ দুই-ই এক সঙ্গে উদয় হইল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া পুনরায় মেরীর হাত ধরিয়া তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল, এবং জানালা খুলিয়া অসভ্যদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে দেখিল, চতুর্দ্দিকে অগণ্য পর্ব্বতবাসী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছে, গৃহ আক্রমণ করিতে তাহারা প্রস্তুত। মেরীর শয়নগৃহের জানালা হইতে বাটী প্রবেশের রাস্তা বেশ দেখা যায়, এবং সে পথে আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেওয়াও হেন্‌রীর পক্ষে সহজ। সুতরাং হেন্‌রী উদ্বিগ্ন চিত্তে বন্দুক হস্তে শত্রুদিগের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ অসভ্যদিগের মধ্যে একটা হৈ হৈ রব পড়িয়া গেল। তাহারা দলে দলে চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। হেন্‌রী ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা বাটী আক্রমণ করিবে। কিন্তু একজনকেও বাটীর দিকে আসিতে দেখা গেল না। সে বুঝিতে পারিল না ব্যাপারটা কি! তাহাকে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেরী জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেখ্‌ছ?"

হেন্‌রী। বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, ওরা কি কচ্ছে! এখনও বাটী আক্রমণ করে নাই; কিন্তু এত চীৎকার কচ্ছে এবং এক একদল এমন লাফাচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে যে মনে হচ্ছে, ওদের ভিতরে কিছু একটা হ'য়েছে, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

মেরী। ওঃ, বুঝেছি। ওরা সব কলরব ক'রে, আমাদের পশু পক্ষী লুঠ কচ্ছে। হায়! হায়! আমাদের কি হবে!

এই কথা বলিতে বলিতে মেরী ভয়ে কাতর হইয়া পড়িতেছিল। হেন্‌রী তাহার অবস্থা দেখিয়া, তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মেরী, বীরনারীর মত ধৈর্য্য ধর, এখন কি শোক দুঃখ করিবার সময়? সব যে মাটি হ'য়ে যাবে।"

মেরী পুনরায় উঠিয়া বসিল। হেন্‌রী দৃঢ়স্বরে বলিল, "কোন ভয় নাই, তুমি স্থির হও। আমার গুলির আঘাতে কয়েকজন নিহত হ'লেই অসভ্যগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পালাবে।"

এমন সময় হঠাৎ নূতন করিয়া একটা বিকট হুঙ্কার শোনা গেল। হেন্‌রী দেখিল, একজন বিশালদেহ নেতার অধীনে একদল অসভ্য বিকট চীৎকার করিতে করিতে বাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র হেন্‌রী একবারে দুটি গুলি ছুঁড়িল। নেতা হত এবং একজন অসভ্য গুরুতর রূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেল। বন্দুকের আওয়াজ এবং তৎসঙ্গেই দুজনের পতন অগ্রগামী অসভ্যদিগকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল। তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে পশ্চাৎপদ হইয়া জঙ্গলে অপর শত শত অসভ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হইল।

ততক্ষণ মেরী ভাল করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিল না। হেন্‌রী প্রসন্নমুখে বলিল—"অসভ্যদের দুই জন নিহত হ'য়েছে, এবং যা'রা অগ্রসর হ'য়েছিল তারা সকলেই পালিয়েছে। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ওরা বন্দুকের শব্দে খুব ভয় পেয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া মেরী মৃতদেহে যেন প্রাণ পাইল। কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার ম্রিয়মান চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

প্রায় ১৫ মিনিট পরে, আবার অসভ্যগণ চতুর্গুণ উৎসাহে এবং চতুর্গুণ সংখ্যায় বাটীর প্রতি ধাবিত হইল। পুনরায় হেন্‌রী গুলি ছুঁড়িল, অপরদিক হইতে দুইজন ভৃত্যও গুলি করিল; আবার দুইজন হত এবং তিন চার জন আহত হইল এবং পুনরায় অসভ্যগণ পলায়ন করিল।

এইরূপে পাঁচবার অসভ্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় এবং দৃঢ়তার সহিত বাটী আক্রমণ করিল, এবং পাঁচবারই তাহারা কয়েকজন লোক

হারাইল ও হটিয়া গেল। এদিকে হেন্‌রীর গুলিও নিঃশেষ হইয়া গেল।

তখন হেন্‌রী মেরীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এবাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত কোন্ ঘর? চল আমরা সেই ঘরে যাই। এবার যদি অসভ্যগণ আসে, আর তো গুলি নাই। তবে অনেক বেলা হইয়াছে। আশা করি, বাবা শীঘ্রই এসে পৌঁছাবেন।"

মেরী নীরবে হেন্‌রীর হাত ধরিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল, তাহাতে একটি মাত্র সুদৃঢ় দরজা এবং বহু উচ্চে লোহার বার আঁটা একটি জানালা ছিল। হেন্‌রী ও মেরী অস্ত্রশস্ত্রসহ যে মুহূর্ত্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই অসভ্যগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার অপেক্ষা শতগুণ বিক্রমে বাটী আক্রমণ করিল, এবং কোন বাধা না পাইয়া, কয়েক মিনিটের মধ্যে একবারে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। অচিরে দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। ভৃত্যগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। আক্রমণ-কারীগণের বীরদাপে বাটী কম্পিত হইতে লাগিল।

মেরী সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে হেন্‌রীর হাত ধরিয়া বলিল—"তারা যদি এই ঘরে ঢোকে, তবে কি হবে হেন্‌রী? তুমি আমাকে ওদের হাতে দিও না। তুমি আমার জন্য প্রাণ দিতে এসেছ, আজ হতে আমি তোমার, তুমি আমাকে রক্ষা কর্‌তে পার কর। নতুবা প্রতিজ্ঞা কর যে ওরা আমার গায়ে হাত দেবার পূর্ব্বে তুমি আমার প্রাণনাশ করিবে, আমাকে তোমার রিভলবার দিয়ে গুলি কর্‌বে।"

হেন্‌রী। মেরী, বেশী কথা বল্‌বার সময় নাই, হয় আমি তোমাকে রক্ষা করিব, নতুবা তোমাকে গুলি করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিব। ওদের হাতে তোমাকে দিব না। তুমি স্থির হও। প্রার্থনা কর।"

উভয়ে নীরব।

অসভ্যগণ উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সব চুরমার করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ কোলাহল করিতে করিতে শত্রুগণ সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের নিকটে আসিয়া দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল।

মেরী কম্পিতবক্ষে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"হেন্‌রী, এইবার, আর দেরী ক'রো না, গুলি কর। পরলোকে মিলিত হব।"

হেন্‌রী। ভয় নাই, স্থির হও, আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।

হেন্‌রী নিজের শরীর দিয়া দরজা সজোরে চাপিয়া ধরিল। শত্রুগণ ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল, কপাটের দুই এক স্থান ভেদ করিয়া বর্শাফলক হেন্‌রীর দেহের কয়েক স্থান আহত করিল। হেন্‌রীর আহত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। আর বুঝি আত্মরক্ষা করা যায় না। মেরী হেন্‌রীর রক্তপাত দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "প্রিয়তম হেন্‌রী, আর কেন, গুলি কর, বিদায়; তুমিও এসো।"

মেরী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। হেন্‌রী ঈশ্বর স্মরণ করিয়া রিভলবার হাতে তুলিয়া লইল। দরজা ভাঙ্গিয়া যায় আর কি?

হঠাৎ উপর্য্যুপরি বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। গৃহ-আক্রমণকারীগণ হঠাৎ থামিয়া গেল। শত্রুদিগের মধ্যে পলায়নের গোলমাল পড়িয়া গেল। হেন্‌রী বলিয়া উঠিল, "মেরী, বাবা এসেছেন, ঐ গুলির শব্দ!" এই কথা বলিতে বলিতে হেন্‌রীও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

(৬)

কাল মেঘ।

যখন হেন্‌রীর জ্ঞান হইল তখন রাত্রি ১০টা। হেন্‌রী শয়ন করিয়া আছে। তাহার মাথা ধরিয়াছে, শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, কয়েক স্থানে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা। গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল। হেন্‌রী তাকাইয়াই বলিল, "বাবা, মেরী কোথায়!"

ডুপ্লে। বাবা, তোমার চেতনা হ'য়েছে, মেরী অন্য ঘরে আছে,—ভাল আছে, তুমি কথা ব'ল না।

সে রাত্রি নীরবে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে হেন্‌রীর নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার পর, ডুপ্লে ও মেরী তাহার

পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ডুপ্লে সস্নেহে হেনরীর মাথায় ও কপালে হস্তার্পণ করিলেন। মেরী কেবল ছল ছল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর ডুপ্লে ও মেরী ধীরে ধীরে তাহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

আজ মেরী স্বয়ং খাবার আনিয়া হেনরীকে খাওয়াইল, ভাল বই পড়িয়া শুনাইল, এবং যত প্রকারে সম্ভব হেনরীর সেবা করিতে ও তাহাকে আনন্দ দান করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আজ হেনরীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। বৈকালে পিতার নিকট তাঁহাদের সংগ্রামের কথা শুনিয়া হেনরী ভগবানকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগিল; আর তিন চার মিনিট বিলম্ব হইলেই তো তাহারা বন্দী হইত, তাহা হইলে আজ তাহাদের কি দশা হইত! তারপর প্রফেসারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, তাঁহাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই, খুব সম্ভব অসভ্যগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পাপের কি বিষম শাস্তি!

সন্ধ্যার সময় সকলে বাহিরে গিয়াছেন। কেবল মেরী হেনরীর শয্যাপার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিয়া দু'একটি কথা বলিতেছে। একজন ফরাসী যুবক সেই ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে মেরীকে তদবস্থায় দেখিয়া সন্দিগ্ধনেত্রে ক্ষণকাল গৃহপানে চাহিয়া রহিল, তারপর কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

এই যুবক মেরীর দূর সম্পর্কীয় এক ভাই, ধনী পিতার একমাত্র সন্তান—প্রচুর অর্থ সম্পদের অধিকারী। ইহার যেমন কর্কশ স্বভাব তেমনি অস্থির প্রকৃতি। হিতাহিত বোধও কিছু কম। সে বসিবার ঘরে গিয়া বসিয়াই মেরী সম্বন্ধে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া উত্তেজিত হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল—"একি বিশ্রী ব্যাপার; মেরী সম্ভ্রান্ত ফরাসী বংশের মেয়ে। হেনরী একজন ইংরেজ যুবক, তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা কখনই শোভা পায় না। দেখে মনে হয়, দুজনে যেন প্রেমে পড়েছে। কি অন্যায়! আমি এই অসভ্য দেশে তো কেবল মেরীর জন্যই এসেছি, সে আমার ত্যাগস্বীকার ভুলে গিয়ে, হেনরী যে তার জন্য কি সামান্য কষ্ট স্বীকার ক'রেছে তারই জন্য কত কৃতজ্ঞ! এমন কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না। পিসেমশায় আসুন, এর একটা কিছু ক'ত্তে হবে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল।

এমন সময় ডুপ্লে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"একি জন্, তুমি এসময় ঘরের ভিতর কেন? বেড়াতে যাও নাই?"

যুবকের নাম জন্। সে ডুপ্লের এক সম্বন্ধীর ছেলে।

জন্ ডুপ্লের কথা শুনিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"দেখুন পিসেমশায়, মেরীর কাণ্ড দেখুন, সকলে বাহিরে গিয়াছে, ও একাকী হেনরীর কাছে ব'সে কত গল্প ক'চ্ছে! এটা কি ঠিক হ'চ্ছে? ওর নিজের শরীরের কথাও তো ভাব্‌তে হয়! আর ও হ'ল ফ্রেঞ্চ, হেনরী হ'ল ইংরেজ, এমন মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা কি শোভা পায়?"—ইত্যাদি কত কথা বকিয়া যাইতে লাগিল।

ডুপ্লে বলিলেন—"জন্, তুমি ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। ওরা দুই বৎসরের বেশী দুজনে একসঙ্গে প'ড়েছে, বেড়িয়েছে, গল্পসল্প ক'রেছে, তারপর এই সেদিন হেনরী প্রাণ দিয়া মেরীকে রক্ষা ক'রেছে, তাই স্বভাবতঃই মেরীর কোমল হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ও সদ্ভাবে অবনত হ'য়ে পড়েছে। সে নানা প্রকারে হেনরীর সেবা ক'রে তার যাতনা দূর কর্‌বার চেষ্টা ক'রে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ কর্‌ছে। ও আর কিছু নয়।"

জন্। না পিসেমশায়, আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না; মেরী এমন ভাবেই মিশ্‌ছে যে ওদের মাঝখানে যেন আর কোন বাধা নাই; হেনরী যে ইংরেজ সে কথা মেরী যেন ভুলেই গিয়েছে! এতো দেখ্‌তেও খারাপ। ইংরেজের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা আমার সহ্য হয় না।

ডুপ্লে। জন্, তুমি শান্ত হও। এই বিদেশে ইংরাজ ও ফরাসীতে এত ভেদ ক'ল্লে কি চলে! বিশেষতঃ রেভাঃ ভিন্সেণ্ট একজন দেবতুল্য লোক এবং আমার বিশেষ বন্ধু, হেনরী আমাদেরই জন্য আহত হ'য়েছে এবং সে অতি ভাল ছেলে,—এমন সহজ বন্ধুতাতে তোমার আপত্তি কি?

জন্। তা'হোক্ দেবতুল্য লোক, আর উপকারী বন্ধু, ইংরেজ তো বটে? ওদের সঙ্গে মেশাই উচিত নয়।

জন অত্যন্ত ঘৃণার সহিত এই কয়টি কথা বলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

ডুপ্লে বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি তোমার বিরক্তির কারণ দূর কত্তে চেষ্টা কর্ব্বো, তুমি স্থির হও।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। জন্ মনে মনে হেন্‌রীর উদ্দেশে তাহার নীচ অন্তঃকরণের বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। হেন্‌রী যেন তাহার মানসপটে একটি কৃষ্ণকায় রাক্ষসের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে আহারের সময় জন্ নানা প্রকারে মেরীর মনে আঘাত দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহার অভদ্র আচরণে ডুপ্লে এবং অন্যান্য বন্ধুগণ লজ্জিত হইতেছিলেন, জন্ তাহা বুঝিতেই পারিল না, অথবা গ্রাহ্য করিল না; মেরীও তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, মিষ্ট ও নম্রভাব রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল, তাহার যত শক্ত কথা ও নির্দ্দয় ব্যবহার স্বীয় সংযম ও ভদ্রতার দ্বারা সামলাইয়া লইতে লাগিল। গর্ব্বান্ধ জন্ আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

পরদিন জন্ নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে মেরী তাহার কাছে থাকে এবং হেন্‌রীর কাছে যাওয়ার অবসর না পায়। মেরী কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে গল্প করিয়া, বেড়াইয়া, তারপর হেন্‌রীর কাছে চলিয়া গেল, তাহার ঔষধ ও পথ্য স্বহস্তে তুলিয়া দিল, এবং একখানা ভাল বই পড়িয়া তাহাকে শুনাইতে লাগিল। জন্ তাহা দেখিয়া কয়েকবার মেরীকে ডাকিল ও নানা প্রকারে অন্য ঘরে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিল; মেরী কেবলই পাশ কাটাইল। জনের হৃদয় ভীষণ আকার ধারণ করিল।

রাত্রিতে আহারের পর, ডুপ্লে তাঁহার ভৃত্যদিগকে ডাকাইয়া ফসল ও পালিত পশুপক্ষী এবং জমিজমার কি প্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলেন; অবশেষে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সবই গিয়াছে। অর্থপূর্ণ সিন্দুকও শত্রুগণ লইয়া গিয়াছে। তিনিই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি এখন দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ভৃত্যগণ চলিয়া গেল। তিনি স্বীয় অবস্থার চিন্তায় ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক ঘুমের পর জনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কাহার দ্রুত পদবিক্ষেপ শব্দ ও মৃদু প্রলাপোক্তি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। জন্ জানালা খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার পিসামহাশয় ক্ষিপ্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, এবং বিড়্ বিড়্ করিয়া কত কি বকিতেছেন। সে জানালার পার্শ্বে একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল এবং তিনি কি বলিতেছেন তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

ডুপ্লে একবার গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, আবার বাহিরে আসিতেছেন, কখন বক্ষে করাঘাত করিতেছেন, কখনও করে করমর্দ্দন করিতেছেন, কখন দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন—"যাঃ গেল, সব গেল, কিছুই রইল না।" আবার দ্রুতগতি গৃহে প্রবেশ করিয়া বাক্স খুলিয়া কি দেখিতেছেন, কি খুঁজিতেছেন, বিছানার নিম্নে, বাক্সের ফাঁকে, কোটের পকেটে ব্যস্তভাবে কি অন্বেষণ করিতেছেন, এবং তাহা না পাইয়া, মস্তকে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িতেছেন, আবার বলিতেছেন, "হায় হায়! আমি আজ গরিবের গরিব!"

জন্ কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া এবং তাঁহার আক্ষেপোক্তি শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, তিনি সেদিনকার লুটপাটে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দুশ্চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন এবং হাহাকার করিতেছেন। তখন জন তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া অতি নম্র স্বরে বলিল—"পিসেমশায়, একি? আপনি একি করচেন!" ডুপ্লে একদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তুমি কে? এত রাত্রে—" এই কথা বলিতেই, তাঁহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া, জন্ তাহার নাকের কাছে একটি "স্মেলিং সল্টের" শিশি ধরিল, অমনি তাঁহার তন্দ্রা দূর হইল, তিনি ক্লান্ত দৃষ্টিতে জনের পানে তাকাইয়া বলিলেন—"কি জন্, আমি কি স্বপ্নে চীৎকার করেছি? ওঃ আমার শরীর ও মন বড় অবসন্ন!"

জন্। কেন, আপনি এত অবসাদ বোধ করছেন কেন?

ডুপ্লে। তা আর তোমাকে কি ব'ল্‌ব বল,—সে অনেক কথা। হায়, হায়!

জন্। আমাকে আর বল্‌তে হবে না; সে দিন অসভ্যগণ আপনার সব লুট পাট ক'রে নিয়ে গিয়েছে, একবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছেন, এই না আপনার দুশ্চিন্তা? কিন্তু আমি কি কর্ত্তে আছি? আমার টাকা নিয়ে আমি কি কর্ব্বো! এসব তো আপনারই।

এই বলিতে বলিতে জন্ একটা পাঁচশত গিনিপূর্ণ ব্যাগ আনিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল। এবং বলিল, "আমার যা আছে সবই আপনার। আপনি শান্ত হউন্।"

একরাশি টাকা পদপ্রান্তে বর্ত্তমান, তাহাতে তাঁহার পূর্ণ অধিকার, দেখিয়া, ডুপ্লের হৃদয় হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি আবেগভরে জনের হাত ধরিয়া বলিলেন—"তা তুমি এত ভাল! ভগবান তোমার কল্যাণ কর্ব্বেন। আমারও যা কিছু আছে সে সবই তোমার।"

জন। দেখুন, মেরী কিন্তু আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর্চ্ছে না। আমি তা'কে কত ভালবাসি, তা সে গ্রাহ্যই করে না। আপনি তাকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন।

ডুপ্লে। ও সব ঠিক হয়ে যাবে; ও এখনও ছেলে-মানুষ—, কিছু বোঝে না।

জন্। এখন ওর বুঝবার বয়েস হয়েছে, নিশ্চয়। যদি ও হেনরীকেই বিয়ে কর্ত্তে চায়, তখন কি হবে? আমরা ফরাসি সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে! এখন হ'তে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

এইরূপ কথা বার্ত্তার দ্বারা জন্ নানাপ্রকারে ডুপ্লের মাথায় এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিল যে, মেরীর জন্য সে সব করিবে, তাহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিবে, ডুপ্লেই তাহার ধন সম্পত্তির অভিভাবক হইয়া থাকিবেন; কিন্তু মেরী যদি হেন্‌রীর প্রেমে আসক্ত হয়, তাহা হইলে মনের দুঃখে সে তাঁহাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিবে।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই জন্ মেরীর গৃহে গিয়া তাহার প্রতি প্রচুর সৌজন্য প্রকাশ করিয়া অতি মিষ্ট ভাষায় গত রজনীর কথা বলিতে লাগিল। মেরী জনের সঙ্গে দু'একটী কথা বলিয়া গম্ভীর ভাবে পিতার গৃহে গিয়া দেখিল, ডুপ্লে তখনও ঘুমাইতেছেন, তাঁহার মুখে বিষাদের কালিমা ফুটিয়া রহিয়াছে। মেরী ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সেই মুখ দেখিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিল। আজ তাহার মাকে মনে পড়িল, আজ মা থাকিলে বাবার এ দুশ্চিন্তা-ভার একাকী বহন করিতে হইত না।

মেরী চিন্তাব্যাকুল চিত্তে বাগানে বেড়াইতে গেল। সেখানে সব শ্রীহীন। তাহার মনে হইল, "এই বাগানের দশা এবং আমাদের অন্তরের অবস্থা ঠিক এক প্রকার!" এইরূপ কত চিন্তায় তাহার মন ভারাক্রান্ত, এমন সময় জন্ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল এবং একটুও অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, "মেরী, আজ পিসে মশায়ের শরীর ভাল নাই, মনও খারাপ, আজ আর হেন্‌রীর কাছে থেকে সময় নষ্ট করো না?" হেন্‌রীর কথা বলিতে গেলেই জন্ যেমন সহজ ভাবে কিছু বলিতে পারিত না, মেরীও তেমনি সহজ ভাবে শুনিতে পারিত না। মেরী জনের কথার শুষ্ক ভাবে উত্তর দিল—"তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।"

জন্ নানাপ্রকারে মেরীর সঙ্গে একটু ভাল করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, মেরীও কেবল পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। জনের শরীর মন রাগে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে বহু কষ্টে মনোভাব সাম্‌লাইয়া কথা বলিতেছিল, পাছে দুএকটী কথায় সব মাটি হইয়া যায়! কিন্তু কোনও প্রকারে ভাল করিয়া কথা বলিবার সুযোগ না পাইয়া, জন্ ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

নিদ্রা ভঙ্গের পর ডুপ্লে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাগানে গেলেন এবং মেরীকে সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। মেরী জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, কাল রাত্রে তোমার অসুখ করেছিল, তা আমাকে ডাক নাই কেন?"

ডুপ্লে। ও কিছু না, নানা চিন্তায় ভাল ঘুম হয় নাই। তুমি ভাল আছ তো মা!

মেরী। হ্যাঁ বাবা, আমি ভাল আছি। তুমি কেন এত ভাব? প্রথমে যখন এখানে এসে তখন তো তোমার কিছুই ছিল না। আবার সব হবে।

ডুপ্লে মেরীকে কোলের কাছে টানিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমার এমন মা থাকতে আর ভাবনা কি!"

তারপর উভয়ে হেন্‌রীর কাছে গেলেন। হেন্‌রী নম্রভাবে উভয়কেই অভিবাদন করিল। তৎপর পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর সকলেই স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

প্রাভাতিক জলযোগের পর ডুপ্লের সহিত জনের সুদীর্ঘ কথাবার্ত্তা চলিল। উভয়েই অতি গম্ভীর ভাবে, অতি সন্তর্পণে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ শেষ হওয়ার পর জন্ অন্যত্র চলিয়া গেল। ডুপ্লে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, মেরীকে নিকটে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে অনেক কথা বলিলেন, মেরীও দু-একটা কথা বলিয়াছিল, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আজ হ'তে তুমি যখন তখন ওঘরে যেতে পাবে না। আমি যখন নিয়ে যাব তখন যাবে।"

মেরী তাহার ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। ডুপ্লে কি যেন অন্যায় করিলেন এইরূপ একপ্রকার উৎকণ্ঠায় জর্জ্জরিত ও ভারাক্রান্ত হইয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। যে হেন্‌রীকে পরিত্রাতা দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেছিলেন, এখন এই বাটীতে তাহার বাসও যেন অপ্রিয় হইয়া উঠিল।

সেদিন যথাসময়ে হেন্‌রীর খাবার আসিল না, কেহ তাহার সংবাদ লইল না। ভৃত্যেরা আসিয়া অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গেল। অপরাহ্নে ভিন্সেণ্ট আগমন করিলেন। কি কথাবার্ত্তা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে লোকজন আসিয়া কৃত্রিম পাল্কী প্রস্তুত করিয়া হেন্‌রীকে গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। যাত্রাকালে মেরী ডুপ্লের সহিত একবার আসিয়া হেন্‌রীর সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। কোন কথা হইল না। (ক্রমশঃ)

আকবরের নিকট গাভীর নিবেদন *

(হিন্দী হইতে অনূদিত)

আসে যদি অরি
দন্তে তৃণ ধরি
তারেও বিনাশ করে না কেহ,—
আমি অভাগিনী
শুন নৃপমণি,
তৃণ খেয়ে সদা ধরি এ দেহ;
হিন্দু মুসলমান
নাহি ভেদজ্ঞান
সুরস পীযুষ বিতরি সবে,
তবুও যবন
আমার নিধন
সাধিবারে দ্বিধা করে হে কবে?
চর্ম্ম আমার
ক'রে ব্যবহার
রক্ষ পদযুগ হে মহাশয়!
হ'লেও মরণ
যে সেবে চরণ
তাহার হনন উচিত নয়।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত।

রোগীর সেবা

পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, কেহ পীড়িত হইলে দলের অন্যান্য সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করে; অসভ্য ও আদিম মনুষ্যদিগের মধ্যেও

---

* কবি অমাল দাস একটী গাভীর গলদেশে উক্ত কবিতাটী বাঁধিয়া গাভীকে আকবরের সভায় পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে, আকবর বাদশাহ ঐ কবিতা পাঠান্তে তাঁহার রাজ্যে গো-বধ বন্ধ করিয়া দেন এবং কবিতার রচয়িতা কবি অমাল দাসকে অর্থ দানে পুরস্কৃত করেন।

এই প্রথা প্রচলিত আছে; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পীড়িত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলে। কিন্তু সভ্য মানবসমাজে রোগীর সেবা একটী প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়।

পাশ্চাত্য দেশের অনেকেরই ধারণা যে ভারতবর্ষীয়েরা রোগীর সেবা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

যখন দেখি মাতা তাঁহার অসুস্থ সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া সন্তানকে কোলে করিয়া দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত অনায়াসে কাটাইয়া দিতেছেন ও বলিতেছেন যে, আমার প্রাণ লইয়া কন্যা এবং সন্তান নিরাময় হইক; যখন দেখি পীড়িত স্বামীর সেবায় অনন্যমনা হইয়া স্ত্রী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা-রাত্র অসুস্থ স্বামীর সেবা করিতেছেন, তখন কি করিয়া বলিব যে আমাদের দেশে সেবার অভাব? আপনারা যখন জ্বরে পীড়িত হইয়া পা হাত কামড়ানির জ্বালায় ছটফট করিতেছেন, তখন ভ্রাতা কিম্বা ভগিনীরা আপনার গা হাত পা টিপিয়া দিতেছেন, মাতা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এবং স্ত্রী ঘৃণাশূন্য হইয়া মলমূত্রাদি অবলীলাক্রমে পরিষ্কার করিতেছেন, তখন কিসে বলি যে আমাদের দেশে সেবার অভাব? পল্লীগ্রামে এরূপ দেখা গিয়াছে যে কোন বাড়ীতে কাহারও অসুখ করিয়াছে, সেখানে সাহায্যকারী দ্বিতীয় লোক নাই; সে অবস্থায় অন্য বাড়ীর লোকেরা আসিয়া রোগীর যারপরনাই সেবা করিতেছেন, তখন কিরূপে বলিব যে আমাদের দেশে রোগীর সেবা হয় না? পুরাণ ও উপাখ্যানেরই বা কত দৃষ্টান্ত দিব? যাঁহারা মহাভারতে সুভদ্রার উপাখ্যান পড়িয়াছেন অথবা কবি নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন কি মাতৃমূর্ত্তি আর কি মূর্ত্তিমান স্নেহ লইয়া সুভদ্রাদেবী রোগীর ও আহতের সেবা এবং শুশ্রূষা করিতেন। অশোকের সময় যতি ও শ্রমণদিগের রোগীর সেবা ও শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত একটী উল্লেখযোগ্য কথা। বুদ্ধনীতির একটী প্রধান কথা রোগীর সেবা। তৎপরে চিকিৎসা শাস্ত্রেও পরিচারকের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ আছে। চরকে উক্ত আছে, ভিষক্, দ্রব্য, পরিচারক, ও রোগী এই পাদচতুষ্টয় সুম্পূর্ণ গুণযুক্ত হইলেই রোগ প্রশমন হয়; চিকিৎসক দেখাইলেই রোগ প্রশমন হয় না বা ঔষধ খাইলেই রোগ আরোগ্য হয় না। ডাক্তার যাহা বলিয়া যাইবেন, হিতকারী পরিচারক সেই সমস্ত বিশেষ অনুধাবন করিয়া রোগীকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে তবে রোগ প্রশমিত হয়।

ইংরাজের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে নার্স সেবা করে, ইহার উপর যদি সাহেব কিম্বা মেম (যিনি সুস্থ আছেন), দুইবারের উপর তিনবার খোঁজ করেন তাহা হইলে বাহবা পড়িয়া যায়। এই ব্যবহার আজকাল আমাদের দেশে অনুকৃত হইতে দেখা যাইতেছে। জমিদারের পরিবারের কিংবা সন্তানের অসুখ হইলে কলিকাতা হইতে নার্স আসিল; বাবু শিকারে কিংবা আমোদ প্রমোদ বহির্গত হইলেন, দিনান্তে একবার খোঁজ লইলেন, অবস্থা কিরূপ? এরূপ দেখা গিয়াছে যে, সন্তানেরা রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে আর পিতামাতা অনায়াসে ফেটিংএ চাপিয়া হাওয়া খাইয়া আসিলেন।

ভূদেব বাবুর কথা—ভূদেববাবু বলিয়াছেন—"যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল নয় সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ মমতা কম, স্বার্থপরতা বেশী, আর আত্মত্যাগ কম, বিলাসিতা বেশী। রোগীর সেবা করিতে গেলে স্বার্থত্যাগ ও সংযম শিক্ষা করিতেই হইবে, নতুবা পরিষ্কাররূপে কোন মতেই রোগীর সেবা হইতে পারে না।"

রোগীর সেবা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা বিশেষ আবশ্যক:—

(১) বাটীর পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কাহারও কোন পীড়া হইলে বাটীর কর্ত্তাকে তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া উচিত।

(২) বাটীর কাহারও অসুখ করিলে বাটীস্থ সকলের শান্তভাব ধারণ করা, কলহ বর্জ্জন করা, এমন কি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(৩) রোগীর কাছে দিবা রাত্রি থাকিবার জন্য বাটীর পুরুষ কিম্বা স্ত্রীদিগের মধ্যে বন্দোবস্ত হওয়া দরকার।

(৪) রোগীর পথ্য ও ঔষধ যাহাতে ঠিক সময়ে দেওয়া হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত।

(৫) ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে রোগীর লক্ষণ অবগত করান সর্ব্বতোভাবে উচিত।

রোগীর চিকিৎসায় কার্পণ্য করা অনুচিত।

আবশ্যকীয় জিনিস পত্রাদি

রোগীর সেবা করিতে গেলে নিম্নলিখিত জিনিস পত্রাদির আবশ্যক :—১। থার্ম্মমিটার। (২) প্রস্রাব করিবার পাত্র (Urinal)। একটী মেলিন্সফুডের ১৮ আউন্স বোতল থাকিলে রোগীকে বিছানা হইতে উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হইবে না। অনেক রোগ আছে যে সহসা উঠিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে। (৩) Bedpan (বাহ্যি করিবার পাত্র)। (৪) থুথু ফেলিবার পাত্র (Spitoon)। কোনও কোনও রোগীর এরূপ অভ্যাস যে জ্বর হইলে অনবরত থুথু ফেলে। তাহাতে বিছানা, ঘর, দেওয়াল ইত্যাদি বিশেষ অপরিস্কার হয়। ইহা করিতে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ কাঁসগ্রস্ত রোগীর ও যক্ষ্মারোগীর থুথু কোন মতে যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নহে। ডাক্তার কে, সি, বসু তাঁহার দেওঘর সেনিটেরিয়মের জন্য এক প্রকার Spitoon (থুথু-পাত্র) তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা অতিশয় সস্তা এবং বিশেষ আবশ্যকীয়। আর এক প্রকার কাগজের থুথু-পাত্র আছে তাহাও অতি সস্তা ও প্রত্যহ পুড়াইয়া ফেলা যায়। যক্ষ্মারোগীর পক্ষে এরূপ থুথু-পাত্র বিশেষ আবশ্যকীয়। আর কিছু না পারেন ত ছেলেবেলায় যেরূপ কাগজের নৌকা করিয়া খেলা করিয়াছেন সেইরূপ নৌকা করিয়া থুথু-পাত্র তৈয়ার করিলে বিনা খরচায় হইতে পারে। প্রত্যহ তাহা পুড়াইয়া ফেলিলেও কোন বিশেষ খরচা নাই। (৫) ঔষধ খাইবার গেলাস, (Measure Glass) (৬) খল ও ডাঁটী (৭) ব্যাণ্ডেজ (Bandages) (৮) খানিকটা পরিস্কার কাপড় (৯) চারিটী গরম জলের বোতল (১০) খানিকটা ফ্লানেল। আর যাঁহারা পারেন তাঁহারা নিম্নিক্তি কিনিয়া রাখিলেও কিছু ক্ষতি হইবে না। (১১) ফিডিংকাপ (Feeding cup) একটী বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য। যে রোগী উঠিয়া খাইতে পারে না তাহাকে পূরা বাটী দুধ কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য চুমুক দিয়া খাইতে দিলে বিছানা ও রোগীর মুখ ইত্যাদি ছাপিয়া যাইতে পারে। অনেক সময় ইহাতে দম বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইতে দেখা গিয়াছে; ফিডিং-কাপে এ সে ভয় কিছুই নাই।

পরিচারকের কর্ত্তব্য—এক্ষণে পরিচারকের কি করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে আমি উপদেশ দিব। ভূদেব বাবু বলিয়াছেন—"রোগীর সেবকের রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকা উচিত, তাহার কি কষ্ট হইতেছে, তাহার বিনা কথায় ও বিনা ইঙ্গিতে বুঝা উচিত এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহার প্রয়োগ করা উচিত।" নিজে ধীর শান্তমূর্ত্তি হইয়া রোগমুক্তিরূপ দেবতার পূজা করা উচিত।

* * * *

পরিচারকের গুণ (চরক)—উপচারজ্ঞ (সর্ব্ববিধ কার্য্যাভিজ্ঞ, দক্ষতা, রোগীতে অনুরাগিতা ও আত্মপবিত্রতা। বোধ হয় ইহা অপেক্ষা বিশদরূপে পরিচারকের গুণ বলা যায় না; যদি কার্য্যাভিজ্ঞতা না-ই থাকিল, তবে আর সে সেবা করিবে কিরূপে? কারণ সেই গুণের অভাবে অনেক সময় কি করিতে কি করিবে তাহা বলা যায় না। হয়ত প্রলেপ দিতে বলিলে সেঁক দেয়, সেঁক দিতে বলিলে খাওয়াইয়া দিয়া রোগীকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করাইতে পারে। ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার বিপদ হইতে পারে। দক্ষতা না থাকিলে পরিচারক সেবা করিবে কি প্রকারে? মণ্ড, পেয়, পাচনাদি যথানিয়মে, যথামাত্রায় প্রস্তুত না করিয়া বিকৃত করিয়া তুলে, সুপাকের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধপক্ক বা দগ্ধ করিয়া ফেলে। যাহার রোগীতে অনুরাগিতা নাই তাহাকে সেবা করিতে দেওয়া অন্যায়, কেননা সে কখনও প্রাণের টানে অনন্যচিত্ত হইয়া কাজ করিতে পারে না। সে হয়ত হেলায় অশ্রদ্ধায় যেটুকু না করিলে নয় তাহাই করে। এজন্য অনেক সময় বিষময় ফলও ফলে। ঠিক সময়ে সস্নেহে সম্পূর্ণ ঔষধাদি খাওয়াইতে পারে না। এইরূপে, সময়ে রোগী উপযুক্ত নিয়মে ঔষধাদি না পাওয়ায় হয়ত তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পরিচারক যদি অশুচি

ও অপরিষ্কৃত হয় তবে তাহাকে রোগীর কাছে কোনও মতে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে রোগ বাড়ে বই কমে না।

আমি ইহার উপর আর একটী গুণ বসাইতে চাই—দৃঢ়তা। যে কাজটী করিতে হইবে, তাহা দৃঢ়তার সহিত করাই উচিত। আর একটী কথা আমি বলি যে "আহা" এই কথাটী পরিত্যাগ করা বিশেষ দরকার। আহা! এটা থাক, কিম্বা আহা! এটী করুক, এইরূপ ভাব মনের কোণেও স্থান দেওয়া উচিত নহে।

পরিচারকের আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য—রোগীর সম্মুখে রোগের জল্পনা না করা ও কাহাকেও করিতে না দেওয়া, নিজে একেবারে গম্ভীর বা হতাশভাবে বসিয়া না থাকা অথবা হাসি তামাসা করা, কিম্বা রোগীর সামনে চোখের জল ফেলা বা অন্যকে ফেলিতে দেওয়া একটী মহৎ দোষ; ইহাতে রোগীর অর্দ্ধেক আয়ুঃ শেষ হইয়া যায়।

রোগবিশেষে সেবার পরিবর্ত্তন—টাইফয়েড্ (Typhoid) জ্বরে অতিশয় সাবধানতার সহিত রোগীকে নাড়া চাড়া করা উচিত। কেননা হঠাৎ জোরে নাড়া-চাড়ায় অনেক সময়ে রক্তস্রাব হইতে দেখা গিয়াছে।

সংক্রামক রোগ, যথা—বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি রোগে পরিচারকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। সেবার পর প্রত্যেকবার সাবানে হাতে ধুইয়া অন্য কাজ করা উচিত। এরূপ দেখা গিয়াছে যে বাড়ীতে অধিক লোক নাই, ছেলের কলেরা হইয়াছে, মা ময়লা সাফ করিয়া সামান্যমাত্র জলে হাত ধুইয়া অন্য ছেলেকে ভাত দিলেন। সে হাতে ভাত দিলেন, না একেবারে বিষ দিলেন। এইগুলি বিশেষভাবে দেখা উচিত। সংক্রামক রোগে রোগীর ঘরের জিনিষ-পত্র অন্য জিনিষের সহিত মিশান উচিতনহে। যক্ষ্মারোগে কাস থুথু-পাত্র ছাড়া যেখানে সেখানে ফেলিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

রোগীর বিছানার সহিত আর কাহারও বিছানা মিশান উচিত নহে।

সাংঘাতিক রোগ, যথা—বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি রোগে একটী বিশিষ্ট পরিচারক নিযুক্ত করা উচিত।

কতকগুলি অবশ্যপালনীয় নিয়ম

১। সাংঘাতিক রোগ হইলে কলহ ও চেঁচামেচি একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত, এবং পরিচারক কোনও মতে কলহপ্রিয় না হওয়া আবশ্যক।

২। রোগীর মল মূত্রাদি পরিষ্কারের পর সাবান দিয়া হস্ত প্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩। পরিচারক দৃঢ়চিত্ত ও আশাশীল হওয়া উচিত।

৪। পরিচারক সর্ব্বদা তন্ময়ভাবে রোগীর সেবা এবং মনে মনে সর্ব্বদা তাহার আরোগ্য কামনা করিবে।

৫। রোগীর পথ্য বিষয়ে পরিচারকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত এবং দেখা উচিত ঠিক পথ্য হজম হইতেছে কি না?

৬। রোগীর অবস্থা ও রোগের লক্ষণ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া চিকিৎসককে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদয় বলা।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে পরিচারকে ও সাধকে বিশেষ পার্থক্য নাই। সাধক যেমন তন্ময় হইয়া পরম আরাধ্য ভগবানের উপাসনা করেন, পরিচারকেরও সেইরূপ তন্ময় হইয়া রোগীর সেবা করা উচিত। এরূপ পরিচারক ঘরে আসিলে রোগী প্রফুল্ল হয়। তিনি জানেন কখন বেদানাটী দিতে হইবে, কিম্বা হয়ত মাথায় হাত বুলাইতে হইবে, প্রস্রাব করাইতে হইবে বা দুটী মিষ্ট কথা বলিতে হইবে। এরূপ অভিজ্ঞ পরিচারকের অধীনে রোগী প্রফুল্ল মনে থাকে ও শীঘ্র রোগমুক্ত হইয়া নিরাময় হয়।

স্বাস্থ্য-সমাচার।

কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ

(নাট্য)

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার প্রাসাদ—কৈকেয়ীর কক্ষ।

কৈকেয়ী পর্য্যঙ্কে শয়ানা

মন্থরার-প্রবেশ।

মন্থরা। ওগো মেজরাণী, খবর শুনেছ?

কৈকেয়ী। কি খবর?

মন্থরা। ওমা, বল কি গো! এখনও কি কিছু শোন নাই! রাজ্যের লোক শুনেছে আর তুমি শোন নাই!

কৈকেয়ী। কি হ'য়েছে তাই বল্; অত ভণিতার দরকার কি!

মন্থরা। তাই ভাল। বলি, তোমার যে কপাল একবারেই পুড়লো; আজ বাদে কাল যে রাম রাজা হ'চ্ছে।

কৈকেয়ী। কি! রাম কাল রাজা হবে? একথা কি সত্য? তোকে এ সংবাদ কে দিলে?

মন্থরা। সত্যি নয়ত কি মিছে? কত লোকের কাছে এ সংবাদ শুনলাম। রামের ধাত্রী সুনন্দার কাছে শুন্‌লাম। বড় রাণীর মহলে আজ আনন্দের ছড়াছড়ি। রাজ্যিশুদ্ধ লোক শুনেছে, কেবল তুমি শোন নি!

কৈকেয়ী। (সহর্ষে) মন্থরা, তুই আমাকে যে-সুসংবাদ দিলি তা'তে তো'কে আমার অদেয় কিছুই নাই। এখন নে, আমার গলার এই হার তোকে পুরস্কার দিলাম। (গলা হইতে হার খুলিয়া মন্থরাকে দিবার উদ্‌যোগ)

মন্থরা। (হাত মুখের ভঙ্গী করিয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া) বলি হ্যাঁগা মেজো রাণী, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে, না তুমি আমার সঙ্গে তামাসা ক'চ্ছো? তা বাছা আমি তোমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ ক'রেছি, তোমার কি আমার সঙ্গে তামাসা করা সাজে? হ'লামই বা আমি বুড়ী, হ'লামই বা আমি কুঁজী, হ'লামই বা আমি দাসী।

কৈকেয়ী। মন্থরা, তুই রাগ করিস্ নে, সত্যই তোর ওপোর আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি। তুই আজ আমাকে বড় সুসংবাদ দিয়েছিস্।

মন্থরা। সে তামাসা নয়ত কি? যদি তোমার এভাব সত্যি হয় তাহ'লে আমি বলি যে তুমি যদি না ক্ষেপে থাক তাহ'লে তোমার মত বুদ্ধিহীনা, রাজকুলে এপর্য্যন্ত কেহ জন্মে নাই।

কৈকেয়ী। মন্থরা, নিশ্চয়ই তুই ক্ষেপেছিস্, নৈলে এখন সুখের সময়ে তোর এ ভাব কেন? নে, এই হার নে। তোকে আরও পুরস্কার দিব।

মন্থরা। কৈকেয়ী, ভরতের জননী, যা বলি মন দিয়ে শোন। রাম তোমার সপত্নী কৌশল্যার পুত্র। তার অভিষেকে তোমার এ আনন্দ কেন? রাম রাজা হ'লে তোমার আর তোমার ভরতের যে কি দশা হবে তা একবার ভেবেছ কি? তোমাকে যে বড় রাণীর দাসীর দাসী হয়ে থাক্‌তে হবে। রাজা কেবল মুখে তোমাকে ভালবাসা জানান, নৈলে ভরতকে রাজা না করে রামকে রাজা করতে ইচ্ছে করেছেন কেন?

কৈকেয়ী। মন্থরা, তুই বলিস্ কি? রাম আমাকে ভরতের চেয়ে বেশী ভক্তি করে। আমিও রামকে ভরতের অধিক দেখি। বিশেষতঃ রাম সকলের প্রিয়, সকল গুণে ভূষিত, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শাস্ত্রানুসারে রামই তো রাজ্যাধিকারী। রাম রাজা হ'লেই আমার ভরতের রাজা হওয়া হ'ল, আমিও রাজমাতা হ'লাম।

মন্থরা। কৈকেয়ী, তুমি যে এতদূর বুদ্ধিহীনা, তা আমার বিশ্বাস ছিল না। 'রাম রাজা হ'লেই ভরত রাজা হ'ল,' এও কি একটা কথার মত কথা হ'ল? রাম রাজা হ'ল। তারপর রামের ছেলে রাজা হবে। তারপর তার ছেলে রাজা হবে। তোমার ভরত হবে রামের নফর। ভরতের ছেলে হবে রামের ছেলের নফর। এই রকমই চল্‌তে থাক্‌বে, আর তোমরা যে কি নাকাল হবে তা আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি বড় অভি-মানিনী, কারও কথা সইতে পার না। রাম রাজা হ'লে কথায় কথায় কৌশল্যা তোমার অপমান করবে। এখন রাজার ভয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারে না। রাম রাজা হ'লে কৌশল্যার আর সে ভয় থাক্‌বে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হওয়ার যে কথা বল্‌লে, সেটা হ'চ্ছে মুনিগুলোর কারসাজি। যার রাজ্য সে যাকে ইচ্ছে তা'কে সেই রাজ্য দিয়ে যাবে, তাতে আবার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র কি? রাজা যা ক'রবেন তাই হবে। ওমা! আজ রামের ধাত্রী সুনন্দার যে দেমাক দেখলাম, তা আর কি ব'লব? অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। আমার দিকে এমন ক'রে চাইতে লা'গল, যেন পায় তো খেয়ে ফেলে। মাগো, রাম রাজা হবে শুনেই যখন এতদূর, তখন রাম রাজা হ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? তাই বলি কি, তোমার

যদি কৌশল্যার দাসী হয়ে থাক্‌বার ইচ্ছা থাকে ত কোন কথা নাই, আর তা যদি না থাকে, তা হ'লে যাতে রাম রাজা না হ'য়ে ভরত রাজা হয়. তাই কর।

কৈকেয়ী। মন্থরা, মন্থরা, আর বলিস্ নি। আমি কৌশল্যার পদানত হ'য়ে থাক্‌তে পা'রব না। তুই বল্, কেমন করে রাম রাজা না হয়ে ভরত রাজা হয়। আমি তাই কর'ব।

মন্থরা। এই এতক্ষণে তোমার সুবুদ্ধি হ'য়েছে। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। তোমার মনে আছে যে অনেক দিন পূর্ব্বে মহারাজ অসুরের সহিত যুদ্ধে আহত হ'লে তুমি দুই বার সেবায় তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলে; দুই বারই তিনি তোমাকে বর দিতে চা'ন? তুমি আমার পরামর্শে সেই বর দুইটী তখন লও নাই। পরে নেবে বলেছিলে। সেই বর দুইটী মহারাজের নিকট তোমার পাওনা রয়েছে। খানিকক্ষণ পরেই মহারাজ তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবেন, তখন তুমি ঐ বর দুইটী চেয়ে নিও। এক বরে রামের বদলে ভরতকে রাজা কর, আর এক বরে চৌদ্দ বছরের জন্য রামকে বনে পাঠাও।

এখন এক কাজ কর। পালঙ্ক হ'তে নেমে এই নীচে ব'স। চুল আলুথালু ক'রে দাও। অলঙ্কার-গুলি গা হ'তে খুলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ফেলে দাও। মহারাজ এলে প্রথমে কথা কয়োনা। মহারাজ অনেক সাধ্য সাধনা করলে পর প্রথমে তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে তারপর তাঁর কাছে ঐ বর দুইটী চেয়ে নিও। মহারাজ একবার সত্য কর'লে পর আর তা লঙ্ঘন করতে পারবেন না। কেমন করে যে মান ক'রতে হয় তা তো তোমার বেশ জানাই আছে।

কৈকেয়ী। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক হবে। দে তো সব ঠিক ঠাক ক'রে দে তো। (মন্থরা কৈকেয়ীর চুল খুলিয়া আলুথালু করিয়া দিল এবং কৈকেয়ীর শরীর হইতে অলঙ্কার খুলিয়া এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। কৈকেয়ী পালঙ্ক হইতে নামিয়া অধোমুখে ভূতলে বসিয়া রহিলেন)।

মন্থরা। হাঁ, এইবার ঠিক হ'য়েছে। আমি এখন চল্লাম, আড়ালে থেকে কি হয় না হয় সব দেখ্‌বো।

(মন্থরার প্রস্থান)

দশরথের প্রবেশ

দশরথ। রাণী, আজ তোমাকে একটী সুসংবাদ দিতে এসেছি। আজ স্থির করেছি যে আগামী কল্য রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রব। কৈ? রাণী কৈ? একি! রাণী, তোমার এ অবস্থা কেন? তোমাকে এ সুসংবাদ দিতে বিলম্ব হ'য়েছে বলে কি অভিমান ক'রেছ? বিলম্বের কারণ হচ্ছে এই, আমি নিজে তোমাকে এ সংবাদ দেব মনে করে অন্যদ্বারা তোমার নিকট এ সংবাদ পাঠাই নাই। অভিষেকের আয়োজন ক'রতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে। সে জন্য তোমার অভিমান করা উচিত হয় না। একি! রাণী! তুমি ক্রন্দন কচ্ছ না কি? এখনও কথা ক'চ্ছ না যে? তোমার কি হ'য়েছে বল? বল, তোমার কি কোন পীড়া হ'য়েছে? তোমাকে কি কেহ অপমান ক'রেছে? এক রাম ব্যতীত তোমার অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কেহ নাই। বল, তোমার কি হ'য়েছে? তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

কৈকেয়ী। মহারাজ, বহু দিনের কথা স্মরণ করুন। আপনি অসুর-যুদ্ধে আহত হ'লে দুইবার আমি সেবা দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করি। আপনি সেই দুইবারে আমাকে দুইটী বর দিতে স্বীকৃত হ'ন। আমি তখন সে বর গ্রহণ করি নাই। তারপরে আবশ্যক মত গ্রহণ করব বলি, আপনিও তা'তে সম্মত হন। এখন সেই বর গ্রহণ করবার সময় হ'য়েছে। মহারাজ, আপনি প্রতিশ্রুত হন যে আজ আমার সেই বর দুইটী আমাকে প্রদান করবেন।

দশরথ। কৈকেয়ী, আমি আমার প্রিয়তম পুত্র রামের শপথ করে বলছি যে তোমার প্রার্থিত বর তোমাকে প্রদান ক'রব।

কৈকেয়ী। মহারাজ, আপনি সত্যপাশে বন্দী হলেন। এখন আমার প্রার্থনা শুনুন। আমার প্রার্থনা

এই যে, রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের যে আয়োজন হয়েছে তদ্দ্বারা ভরতের অভিষেক করুন। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রাম জটাবল্কলধারী হ'য়ে বনে বাস করুক।

দশরথ। (কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া) একি! আমি স্বপ্ন দেখছি, না আমি জাগ্রত আছি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই তো? একি!

কৈকেয়ী। মহারাজ, সত্য পালন ক'রে রঘুকুলের উচিত কার্য্য করুন। এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করা আপনার উচিত হয় না।

দশরথ। কৈকেয়ী, তুমি কি সত্যই কৈকেয়ী, অথবা কৈকেয়ী বেশ-ধারিণী কোন মায়াবিনী রাক্ষসী?

কৈকেয়ী। মহারাজ, প্রতিজ্ঞা পালন করে, আপনার কুলের উচিত কার্য্য করুন। আমি কৈকেয়ী।

দশরথ। কৈকেয়ী, কেন তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল? তুমি এ বাসনা ত্যাগ কর। তুমি কি জাননা যে রাম আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? রামের অদর্শনে আমি এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ ক'রতে পারি না। চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামের অদর্শনে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হবে। যে ভরতের জন্য তুমি রাজ্য প্রার্থনা কর'ছ, সেই ধার্ম্মিক ভরত কখনই তোমার এ কার্য্যের অনুমোদন করবেন না। কৈকেয়ী, তোমার এ পাপ-সংকল্প পরিত্যাগ কর। তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হ'য়ো না। তোমার নিজের, কৌশল্যার ও এ রাজ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হ'য়ো না। আমাকে রক্ষা কর।

কৈকেয়ী। মহারাজ, পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে আপনি একি ব'লছেন! রঘুবংশীয়দের চিরন্তন রীতি এই যে, প্রাণ যায় তথাপি তাঁদের বাক্যের অন্যথা হয় না। আপনি সেই বিখ্যাত রঘুবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে কি সত্যের অপলাপ ক'রবেন? স্মরণ করুন মহারাজ, আপনার পূর্ব্বপুরুষ হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্র এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত বিক্রয় ক'রে প্রতিজ্ঞাপালন ক'রেছিলেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষ সগর রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলেন।

দশরথ। কৈকেয়ী, সগর রাজা অসমঞ্জকে পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, প্রজারঞ্জনের জন্য। অসমঞ্জ প্রজাদের উপর অত্যাচার ক'রতো। আমি কি দোষে সকলের প্রিয় রামকে পরিত্যাগ ক'রবো। কৈকেয়ী, তুমি বারংবার আমাকে রঘুকুলের রীতির কথা কি শুনাচ্ছ? আমি তা বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি যদি নিতান্তই বর চাও, আমাকে তা প্রদান কর'তেই হবে। কারণ, রঘুকুলের সনাতন রীতিই এই যে, প্রাণ যায় তথাপি বাক্যলঙ্ঘন হয় না। সেই জন্য আমি করযোড়ে তোমার নিকট অনুনয় ক'রছি যে তুমি তোমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করো না। ভরতের অভিষেক হ'ক; রামের বনগমন নিবারিত হ'ক।

কৈকেয়ী। মহারাজ, আপনি প্রভু, আপনি বর প্রদান ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে যদি সেই বর না দেন, তা হ'লে আমার প্রতীকার করবার ক্ষমতা নাই। আমি কখনই বর প্রার্থনা ক'রতে বিরত হ'ব না। আপনি ইচ্ছা করেন, আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য ক'রতে পারেন।

দশরথ। কৈকেয়ী, আজ রাত্রি আগত প্রায়। আজ রাত্রি তোমাকে সময় দিলাম। তুমি বিবেচনা কর, আগামী কল্য যদি তোমার মতের পরিবর্ত্তন না হয়, তা হ'লে প্রতিজ্ঞানুসারে অবশ্য কার্য্য ক'রব।

(প্রস্থানোদ্যত)

কৈকেয়ী। মহারাজ, হয় কাল প্রাতে রাম বনে যাবে, না হয় আমি প্রাণত্যাগ ক'রব। আপনাকে বৃথাপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে স্ত্রীহত্যার পাতকী হ'তে হবে।

(প্রস্থান)

দশরথ। কি কুক্ষণে কৈকেয়ীকে বিবাহ ক'রেছিলাম। দুর্ব্বিষহ-বিষলতাকে এত দিন চন্দন মনে করে এসেছি। হতভাগ্য দশরথ, এই বার বুঝি অন্ধমুনির অভিশাপ ফললো। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অযোধ্যার প্রাসাদ—বহিঃকক্ষ।

লক্ষ্মণ ও কয়েকজন অমাত্য আসীন

লক্ষ্মণ। এরূপ অনিয়ম কখনই হ'তে পারে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পুত্র কখনই রাজা হ'তে পারে না।

১ম অমাত্য। কখনই না। প্রজাপুঞ্জ এরূপ রাজাকে কখনই রাজা বলে স্বীকার ক'রবে না। যা কখন হয় নাই, তাই হবে?

২য় অমাত্য। তা তো বুঝ্‌লাম। কিন্তু রাজা যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন তা'র কি? প্রতিজ্ঞা পালন করতে হ'লেই তাঁকে, ভরতকে যুবরাজ করতে হবে, আর রামকে বনে পাঠাতে হবে।

লক্ষ্মণ। রাজা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ, লোকাচারবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, প্রজা সাধারণের মতবিরুদ্ধ কোন অন্যায় কার্য্য করেন, প্রকৃতিপুঞ্জের কি তার প্রতিবাদ ক'রবার অধিকার নাই? রাজা প্রতিজ্ঞা পালন করুন, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ক'রব।

২য় অমাত্য। তা'হলে ত রাজার বিদ্রোহাচরণ করা হয়।

৩য় অমাত্য। এ-কে রাজবিদ্রোহ বলা যেতে পারে না।

লক্ষ্মণ। যদি কেহ এ-কে রাজবিদ্রোহ বলে ত বলুক। আমি সেনাপতি হ'য়ে সেনা চালন ক'রব। পুরী অবরুদ্ধ করে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রবো। ভরতের পক্ষ হয়ে যদি কেহ প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়, তাহ'লে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে হবে। অধিক বাক্য ব্যয়ের সময় নাই। এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত কি?

অমাত্যগণ। আপনার প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত।

লক্ষ্মণ। তাহ'লে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? আসুন, সৈনিকগণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত ক'রে,—

রামের প্রবেশ

রাম। লক্ষ্মণ, সৈনিকগণকে উৎসাহিত ক'রবার কি প্রয়োজন উপস্থিত হ'য়েছে? বহিঃশত্রু কি রাজ্য আক্রমণ করেছে?

লক্ষ্মণ। আর্য্য, আপনার প্রতি মহারাজ যে অন্যায় আচরণ করেছেন, তার প্রতিবিধানের জন্যই সৈনিকদিগকে——"

রাম। লক্ষ্মণ, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র ভক্তি থাকে তাহ'লে ওরূপ কথা মনেও স্থান দিও না। আমি এইমাত্র পিতার নিকট হ'তে আস্‌ছি। পিতৃসত্য পালনের জন্য আমি রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনগমনে প্রতিশ্রুত হ'য়ে তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রতে এসেছি।

লক্ষ্মণ। আর্য্য, জ্যেষ্ঠ পুত্র শাস্ত্রানুসারে রাজ্যাধিকারী, আপনার ক্ষেত্রে তার অন্যথাচরণ হবে কেন?

রাম। লক্ষ্মণ, আমাদের সে বিষয় বিচার করবার প্রয়োজন নাই। পিতা মধ্যমা মাতাকে দুইটী বর দিতে সত্য ক'রেছিলেন। সেই পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রাজ্যত্যাগ করে বনে যেতে হবে। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্যত্যাগ ও বনবাস ত অতি সামান্য কথা, সে জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত আছি। (অমাত্যদের প্রতি) আপনারা এ সম্বন্ধে অন্যমত ক'রবেন না। আপনারা ভরতকে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'রবেন। ভরতের সুশাসনে আপনারা পরমসুখে কালযাপন কর'বেন।

অমাত্যগণ। আপনাদের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য। আমরা এখন বিদায় হ'লাম।

(অমাত্যগণের প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। আর্য্য, আমার একটী নিবেদন আছে। আপনার যদি বনবাস করাই সংকল্প হয়, তা'হলে আমাকে আপনার সহিত বনগমনের অনুমতি করুন।

রাম। লক্ষ্মণ, তুমি অযোধ্যায় না থাক্‌লে পিতাকে, মাতাকে এবং অন্যান্য সকলকে কে সান্ত্বনা করবে?

লক্ষ্মণ। আর্য্য, আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে আপনার বনবাসের সহচর করুন। আপনি ব্যতীত আমি এক মুহূর্ত্তও অযোধ্যায় বাস ক'রতে পা'রব না, এবং আমার দ্বারা অন্যের সান্ত্বনাও সম্ভব নয়।

রাম। লক্ষ্মণ, চল এখন মাতার নিকট যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সহজ পরিচয়

সহজ সরল দৃষ্টিতে যাহা ভাল লাগে তাহাই ভাল এবং যাহা ভাল লাগে না তাহা ভাল না—যাঁহারা এই বলিয়া ভারতীয় চিত্রশিল্পের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ তাঁহাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ভাল লাগিতেও একটা শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন মানবে বিভিন্ন প্রকার। বিপক্ষের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ ও বাদ্যযন্ত্রে অঙ্গুলিচালনা এই উভয়েই হস্তের শক্তির প্রয়োজন কিন্তু উভয়ে প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। এ স্থলে শক্তি অর্থ—সমর্থতা।

যাঁহারা সে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্ এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদিগকে সাধনার সাহায্যে অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু কোনো বিশেষ শক্তিলাভ আর কিছু দু'একদিনের চেষ্টায় হয় না; দৈহিক শক্তি সম্বন্ধেই এ কথা খাটে, অনুভব শক্তি ত দূরের কথা। সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত "ছিন্নপত্রের" একস্থানে এমন একটা কথা পড়িয়াছিলাম যে, রেলপথে কোনো স্থানে যাইতে যাইতে তিনি একটি ভৈরবী গুণ্‌গুণ্ করিয়া গাহিতেছিলেন এবং ভৈরবীর মোচরগুলি শুনিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল যেন নিয়মযন্ত্র-হস্তনিপীড়িত পৃথিবীর মর্ম্মস্থল হইতে একটা সকরুণ ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কথাটিতে আমার হৃদয় এত সাড়া দিয়াছিল যে সহানুভূতি লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় দু'একটি বন্ধুর কাছে তাহা পড়িয়া ফেলিলাম, কিন্তু তাঁহারা ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না;—মোচরগুলির অনির্ব্বচনীয়তা বচনে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইল।

কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় চিত্রকলার তাৎপর্য্য সকলেই অল্পাধিক বুঝিবেন না এমন ত হইতে পারে না। গত কয়েকবৎসর যাবত দেশীয় চিত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার ব্যাপার উপলক্ষে শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে বেশ একটু নাড়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে প্রায় সর্ব্বত্রই বিপক্ষ ও সপক্ষ এই দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ (School) দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদিও প্রকাশিত হইয়াছে বিস্তর। কিন্তু দুইটি কারণে এই দুই দলের বিভাগরেখা এত সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—প্রথমতঃ অনেকেই ঐ সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিষয়ের প্রকৃতির দরুণ উহার মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে নিঃসন্দেহ এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ধীমান। কিন্তু মস্তিক ও হৃদয় যে বিভিন্ন। যাঁহারা পড়েন নাই তাঁহারা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ কুমারস্বামী, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলী এবং হ্যাভেলের "The ideals of Indian art" পাঠ করিতে পারেন।

আর যাঁহারা পড়িয়াও বিদ্রোহী রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে আজ সহজ কথায় আমাদের আপন ঘরের চিত্রশিল্পের সহিত পরিচয় করাইবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

ইতিহাস ও শিক্ষা—এই দুইদিক হইতে চিত্রের বিচার হইতে পারে। শিল্পের আবার দুইটি বিভাগ—গঠন-নির্ম্মাণ ও ভাবপ্রকাশ (Aanatomy and Expression)। ইতিহাসই চিত্রকে ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য (Individuality) দিতে পারে। ইতিহাসের দিক হইতে গ্রীসীয় স্থাপত্যের একটা বিশেষ মূল্য আছে। পথে কুড়াইয়া পাওয়া একটি ভগ্নমূর্ত্তি যখন দেখি, তখন শিল্পসৌন্দর্য্যই বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু যদি তখন কেহ বলিয়া দেয় যে মূর্ত্তিটি গ্রীসদেশীয়, তবে মূর্ত্তিটির স্বাতন্ত্র্য যেন মাথা জাগাইয়া উঠে।—নয়নের সমক্ষে যেন ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে—বহু দিবসের পুরোণো সেই সুদূর গ্রীসের চিত্র;—দেখিতে পাই সুগঠিত বলিষ্ঠ-দেহ গ্রীক শিল্পী উঁচু হইয়া একাগ্র মনে যন্ত্রদ্বারা আকার প্রকারহীন জড় শিলাখণ্ডকে কুঁদাইয়া কুঁদাইয়া গঠন প্রদান করিতেছে, তাহার আশে পাশে ছোট বড় কত প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং শিল্পী ক্ষণে ক্ষণে পশ্চাতে সরিয়া মূর্ত্তিগ্রাহী শিলাখণ্ডের সৌন্দর্য্য দেখিতেছে,—নিকটে তাহার ক্ষুদ্র পুত্রটি আপন খেয়ালে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডগুলি দিয়া খেলা করিতেছে ও মাঝে মাঝে নানা অপ্রাসঙ্গিক

প্রশ্নে পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে,—আরো কতকিছু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাই। গ্রীসের সমাজ-চিত্র, গ্রীকের হৃদয় ইত্যাদি আরো কত কথা মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিতে করিতে মনে হয়। আমরা বলি—কুড়াইয়া পাওয়া মূর্ত্তিটি বেশ—কারণ ইহা যে গ্রীসদেশীয়।

ভারতীয় চিত্রকলাসম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে এতদিন ভারতীয় আধুনিক শিল্পী তাহার আপন চিত্রশিল্পের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল; কিন্তু এখন এ অভিযোগ অনেকটা দুর হইয়াছে।

ইহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে ব্যক্তিত্বের গৌরব কম নহে। ধার-করা বিদেশীয় চিত্রপদ্ধতি অনুসারে চিত্র আঁকিয়া ঘর বোঝাই করিলে ঘর বোঝাই হইবে বটে কিন্তু তাহা ধার করা।

প্রশ্ন হইবে—যাহা ভাল তাহা গ্রহণ এবং যাহা খারাপ তাহা বর্জ্জন করিব না কেন?

সুতরাং গঠন-নির্ম্মাণ ও ভাব প্রকাশের হিসাবে ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনার আবশ্যক হইয়া পড়িল। গঠনের হিসাবে ভারতীয় চিত্রে কৃতিত্ব নাই ইহা স্বীকার করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই, পরন্তু উহা না-থাকাই ভারতের গৌরব। তপঃক্লিষ্ট, ক্ষীণ-শরীর চেতনাময় ভারতবর্ষ রক্তমাংসকে চিরকালই নিম্নে আসন দিয়া আসিয়াছে;—নিখিল বিশ্বে যাহা শাশ্বত, সেই পরমাশ্চর্য্য মানবাত্মাকেই সে চিরদিন পূজা করিয়াছে, তাহার উৎকর্ষই তাহার চরম সাধনা এবং আত্মার বিচিত্রলীলার প্রকাশই সে যথার্থ সম্ভোগের বস্তু মনে করিয়াছে। চিত্রগঠন ও ভাব এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ইহার উত্তর এক কথায় হইতে পারে না। সুগোল সুডোল মুখমণ্ডল ও অনিন্দনীয় দেহভঙ্গী চর্ম্মচক্ষের নিকট পরম সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু চিত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে হৃদয়ের আবশ্যক।

বলা যাইতে পারে—ধরিলাম ভাবপ্রকাশে কৃতিত্বই অসাধারণ কৃতিত্ব; কিন্তু তা বলিয়া গঠন ও ভাব পাশাপাশি থাকিতে পারিবে না কেন, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। ইহার উত্তর এই যে, ভারতের শিল্পী কোন বিশেষ মূর্ত্তিকে ভাব পরিগ্রহ করাইতে চাহে নাই,—কোনো বিশেষ ভাবকেই মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করাইতে চাহিয়াছে। মানবমুখমণ্ডলের মধ্যদিয়াই ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, কাজেই মানব দেহকে বাহন মাত্র করিয়া কোনো অনির্ব্বচনীয় ভাবধারা পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে; সেজন্যই দেখিতে পাই প্রাচীন চিত্রাবলীর অধিকাংশই রূপক।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনো ইংরাজী মাসিক-সাহিত্যে দুইখানা চিত্র দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একখানায় এরূপ একটি ভাব ছিল যে গির্জ্জায় পুণ্যলোভাতুর উপাসক-মণ্ডলী তন্ময় হইয়া সমস্বরে প্রার্থনা করিতেছেন এবং সেই সমবেত প্রার্থনা বাক্যগুলি একটি ধারারূপে ধীরে ধীরে আকাশের পানে উঠিতেছে; অপর খানায় স্বর্গস্থিত দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার আশীর্ব্বাদ পুষ্পরূপে ভক্ত-মণ্ডলীর মস্তকে বর্ষণ করিতেছেন। ধারাটি এবং পুষ্পগুলি এইরূপ একটি পরমাশ্চর্য্য অস্পষ্টতায় মণ্ডিত ছিল যে পুলকে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভারতীয় প্রাচীন চিত্র-শিল্পের কথা মনে হইল—ভাবিলাম যাঁহারা আত্মার বিচিত্র প্রকাশকে দেহদান করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারেন তাঁহারাই ত যথার্থ শিল্পী। কারণ, আত্মা অবিনশ্বর সুতরাং ঐ শিল্পই স্থায়ী। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, বটিবেলির মাতৃমূর্ত্তি, জশুয়া রেণ্‌ল্ডসের চিত্রাবলীতে মনুষ্যই আগে দেখিতে পাই—হয়ত বলি "কি করুণাময়ী মূর্ত্তি!" কিন্তু ভারতচিত্রশিল্পে বলিব "ইহাই মূর্ত্তিমতী করুণা।"

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

সূর্য্যলোকের অতিথি

(ইলেক্ট্রন্)

সূর্য্য আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ দান করে। কোন জলাশয়ে একটা পাথর নিক্ষেপ করিলে, যে স্থানে পাথরটা পড়ে সেই স্থান হইতে ঢেউ উঠিয়া যেমন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া যায়, তেমনি সূর্য্য হইতে একপ্রকার আলোক-তরঙ্গ আসে, তাহাই আমাদিগকে আলোক

ও উত্তাপ দান করে। এই সৌরকর-তরঙ্গ আমাদের জীবন রক্ষা করে, শস্য জন্মায়, ফল পাকায়, সকল বস্তুতে রং দেয়, ফটো তুলিতে সাহায্য করে। ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

আরও এক প্রকার বস্তু সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে ক্রমাগত আসিতেছে। তাহা চোখে দেখা যায় না। সূর্য্য এই পৃথিবীর গায়ে সর্ব্বদা অতি ছোট ছোট একপ্রকার পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছে। সেই পুষ্প তরল পদার্থ কি কঠিন পদার্থ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, অতি ক্ষুদ্র এক ফোঁটা জলও এই পদার্থের হাজারটির চেয়ে অনেক বড় এবং কঠিন। মৌমাছির শরীরে একপ্রকার মধুর কলসী থাকে, সে অতি ছোট একটি থলে, সেইরূপ এক কলসী এই পুষ্প, সমস্ত বাংলা দেশে ছড়ান যায়। এই ক্ষুদ্র অদৃশ্য পুষ্পগুলিকেই সূর্য্য-লোকের অতিথি বলিতেছি।

এই অদৃশ্য পুষ্প-বৃষ্টির সংবাদ কি প্রকারে আমরা জানিতে পারিলাম, বলিতেছি :—

একদিন একজন বিজ্ঞানবিৎ, বৈদ্যুতিক আলোর গ্লোবের মত একটা কাচের নল লইয়া, তাহার ভিতর হইতে সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ প্রেরণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলেন একপ্রকার অতি সূক্ষ্মবস্তু অতিক্রত বেগে সেই নলের গায়ে আঘাত করিতেছে, এবং তাহার ফলে নলের নানা স্থানে হরিৎ ও নীল বর্ণ দীপ্তি পাইতেছে।

হরিদ্বর্ণ ও সবুজ বর্ণের দীপ্তি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এইরূপ হওয়ার কোন কারণ আছে। সেই কাচের নলের উপর ধাতু রাখিলেন, তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কাচ গলিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল; কোন পাতলা বস্তু তন্মধ্যে রাখিলেন, তাহা সরিয়া গেল। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইল যে, কোন অতি সূক্ষ্মবস্তু প্রবল বেগে সেই কাচের নলে আঘাত করিতেছে, এই সকল বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল গমন করে, ইহাদের মধ্যে তাড়িত আছে, এবং চুম্বক দ্বারা ইহারা আকৃষ্ট হয়। ইহাদের নাম দেওয়া হইল "ইলেক্ট্রন্।"

সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে ইলেক্ট্রন্ পতিত হইতেছে।

আর একজন পণ্ডিত নির্ণয় করিয়াছেন যে, রেডিয়াম্ নামক ধাতু হইতেও এইরূপ পুষ্প-বৃষ্টি বা ক্ষুদ্র গোলাবৃষ্টি হয়। এই ক্ষুদ্র বস্তুর আঘাতে ফটো-প্লেট্ কাল হয়, ইহা জিঙ্ক্ সাল্ফাইডে আঘাত করিলে, উজ্জল দীপ্তি হয়।

ইহার আঘাতে মানুষ মরে না, কিন্তু আহত হইতে পারে। এক ব্যক্তি একটু রেডিয়াম্ পকেটে রাখিয়াছিলেন; এই সূক্ষ্মপদার্থ তাঁহার চর্ম্মে প্রবেশ করিয়া এরূপভাবে তাঁহাকে আহত করিয়াছিল যে, সেই স্থান আরোগ্য হইতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। আর একজন বিজ্ঞানবিৎ একটা কাগজের কৌটার ভিতর একটু রেডিয়াম্ রাখিয়া সেই কৌটা দেড়ঘণ্টা হাতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহার ফলে তাঁহার হাতের উপর এমন একটা ঘা হইয়াছিল, যে তাহা আরোগ্য হইতে তিন মাস লাগিয়াছিল।

জলন্ত গ্যাস এবং উত্তপ্ত ধাতু হইতেও এইরূপ ক্ষুদ্রকায় গুলিবর্ষণ হয়। তাড়িতালোকে যে কার্‌বন্ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে, সূর্য্যকিরণও সেই কার্‌বনের ফল। উত্তপ্ত জলন্ত কার্‌বন হইতে এই গোলাবৃষ্টি অতি সুস্পষ্ট। সুতরাং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সূর্য্যমণ্ডলের জলন্ত কার্‌বন্ হইতে লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রন্ বৃষ্টি হইতেছে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে বর্ত্তমান। এই ক্ষুদ্রকায় পুষ্পসকল এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া কিরূপে পৃথিবীতে আগমন করে, তাহা চিন্তার বিষয়। ঘণ্টায় ৫০ মাইল যে গাড়ী চলে, সেই গাড়ী পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোকে গমন করিতে ২০০ বৎসর লাগে। এত সূক্ষ্ম বস্তু কি প্রকারে এতদূর আসে?

আমরা যদি শূন্যে গুলি ছুঁড়ি, তাহা কিছুদূর পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় পতিত হয়। এই সূক্ষ্ম গুলিরাশি কিন্তু সূর্য্য হইতে উঠিয়া আবার সূর্য্যের মধ্যেই পতিত হয় না। সূর্য্যের আলোক-তরঙ্গ এই অসংখ্য সূক্ষ্ম পুষ্প বহন করিয়া লইয়া আসে। এই সূক্ষ্ম পুষ্পরাশি সূর্য্য-কিরণ-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যখন এই পৃথিবীর আবেষ্টনস্বরূপ বায়ুমণ্ডলে আসিয়া উপনীত হয়, তখন উত্তরমেরু প্রদেশে মহাশূন্যে এক প্রকার চঞ্চল দীপ্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে,—তাহার হরিৎ, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণ-আভা জগতের একটি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য মধ্যে পরিগণিত। এই আলোকের নামই "অরোরা-পোলারিস্।"

ইলেক্ট্রন্ সূর্য্য হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমাগত সরল গতিতে পৃথিবী অভিমুখে আগমন করে; কিন্তু বায়ু-মণ্ডলে প্রবেশ করিয়াই ইহাদের গতি ফিরিয়া যায়; তখন ইহারা প্রধানতঃ মেরুপ্রদেশে ধাবিত হয় এবং অত্যাশ্চর্য্য আলোকমালা রচনা করে।

নারীর আত্ম-বলি

যে সকল কারণে এই হতভাগ্য দেশ বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে, নারীর প্রতি অবমাননা তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ। শিক্ষা ও বিধাতার সার্ব্বজনীন দান আলোক-বাতাসে বঞ্চিত করিয়া ভারতের পুরুষ ভারত-নারীকে যে প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছে ও করিতেছে তাহাতে তাহাদের নিজেদেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে। বরপণ প্রথা নারীজাতির অবমাননার জীবন্ত সাক্ষী। হিন্দুজাতি বিবাহে আধ্যাত্মিকতার বড়াই করে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই বিবাহ প্রথাকে বাজারের মাছ কেনা-বেচার ব্যাপার করিয়া তুলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সৌভাগ্যক্রমে বিবাহের বয়স দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, বিবাহযোগ্যা বালিকারা এই অবমাননা দিন দিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃগণের বিবাহযোগ্যা কন্যার মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা আত্মবলি দান করিয়া কবির কবিত্বকে জীবন্ত মূর্ত্তি দান করিয়াছে। ঘটনাটি এই:—ফরিদপুরের অন্তর্গত কাগদি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করেন। স্নেহলতা তাঁহার প্রাণোপমা দুহিতা—বয়স ১৪ বৎসর। স্নেহলতাকে এই বয়স পর্য্যন্ত পাত্রস্থ করিতে না পারিয়া পিতামাতার মুখে অন্ন রোচে না, অথচ মেয়েকে যার তার হাতে সম্প্রদান করিতে তাঁহাদের কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। কন্যাবৎসল পিতামাতা

অবশেষে বি, এ, উপাধিধারী এক পাত্র স্থির করিলেন। নগদ ও দানসামগ্রীতে পাত্রকে দুই হাজার টাকা দেওয়া স্থির হইল। দরিদ্র পিতা নিজ ভদ্রাসন বাটী বাঁধা দিয়া টাকা সংগ্রহের আয়োজন করিলেন। স্নেহলতা তাহা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। তাহার বিবাহের জন্য তাহার পিতামাতা মানুষের শেষ অবলম্বন ভদ্রাসন বাটী হইতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইবেন, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। স্নেহলতা পিতৃগৃহে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল, নারীর আত্মমর্য্যাদা তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে সংকল্প করিল তাহার জন্য পিতামাতাকে কিছুতেই এমন বিপদগ্রস্ত হইতে দিবে না। স্নেহলতার মাতার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; গৃহকর্ম্ম অধিকাংশই স্নেহলতা সম্পন্ন করিত। ঘটনার দিবস অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রসন্নচিত্তে সে সকল গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া পিতামাতা তাহার মনের বিষম সংকল্পের কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকার সময় স্নেহলতা তাহার ভাল কাপড় পরিয়া এক বোতল কেরোসিন তৈল ও একটী দেশলাই লইয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং তাহার সমস্ত বস্ত্র কেরোসিনে ভিজাইয়া তাহাতে দেশলাই লাগাইয়া দিল। দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। নিকটবর্ত্তী মন্দিরের এক পুরোহিত অগ্নিশিখা দেখিয়া বাড়ীর লোকজনসহ ছাদে উঠিয়া দেখিতে পাইল, অচল বৃক্ষের ন্যায় স্নেহলতা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, প্রবল অগ্নি তাহার সুকোমল দেহখানি পোড়াইতেছে, কিন্তু তাহার করপদ এবং মুখখানিতে অগ্নি স্পর্শ করে নাই, অধিকন্তু বদন মণ্ডলে একটী প্রশান্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইল, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অপদার্থতার কথা ঘোষণা করিতে করিতে স্নেহলতার জীবন-প্রদীপ অস্তমিত হইল।

ধর্ম্মের জন্য, আত্মীয়জনের সুখবিধানের জন্য ভারত-নারী কোন দিনই আগুনে পুড়িয়া মরিতে কাতর হয় নাই। তরুণ বালিকা স্নেহলতা আমাদের সম্মুখে সেই আত্মত্যাগের ও নারীমর্য্যাদার গৌরব প্রচার করিয়া গেল। তাহার এই আত্মবলিদানে বরপণ-লোলুপ কাপুরুষ শিক্ষিতগণের অন্তরে যদি একটু লজ্জা ও ঘৃণার উদয় হয়, মনে করিব স্নেহলতার আত্মত্যাগ সার্থক হইল। আজ দেশমাতার যে অমূল্য কন্যারত্নের জীবন কাপুরুষদের নিকট বিসর্জ্জনের আবশ্যক হইল, তাহা যদি উৎকৃষ্টতর বিষয়ের জন্য সমর্পিত হইবার সুযোগ পাইত, তবে তাহাতে দেশের আরো অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত।

স্নেহলতার শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে আমরা আমাদিগের তরুণী ভগিনীদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, আমাদের একটী ভগিনীর এই প্রকার জীবনদানেও যদি দেশের কাপুরুষদিগের চৈতন্য না হয়, তবে আর কেহ আগুনে পুড়িয়া মরিও না, এই পশুদের পশুত্ব তাহাতে ঘুচিবে না, বিধাতার প্রদত্ত এই অমূল্য জীবন নরপশুদিগের পাপক্ষয়ের জন্য তোমরা কেন পুনঃপুনঃ বিসর্জ্জন করিবে? কবির বাণীকে অন্তরের দৃঢ় সংকল্পে পরিণত করিয়া বল:—

বাবা, থাকুক আমার বিয়ে—
কার্পেণ্টার নাইটিঙ্গেল ডোরা লিটল্ সিষ্টার হব মোরা
থাকব বাবা! দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়ে,
দেশের হবে সুখ সুবিধা, বজ্জাতেরা হবে সিধা,
নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে, পশুর গৌরব গিয়ে
বাঞ্ছা পূরুক আশীষ কর, চরণ-ধূলি দিয়ে।
ঘৃণা কি নাই নারীর মনে, সিদ্ধি নাই কি নারীর প্রাণে?
সংযমে তার যমে ডরায়,—সরে দাঁড়ায় গিয়ে।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি বিবাহ-যোগ্যা বালিকার উক্তি

(১)

বাবা! থাকুক আমার বিয়ে,
চাইনে আমি এম, এ, বি, এ, কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে,
ছাগল গরুর মত যাদের, ছেলের হাটে গিয়ে,
সোনার চেইন—সোনার ঘড়ি, গর্ব্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনোনাক কাণা কড়ি দিয়ে!

(২)

থাকুক আমার বিয়ে,

বিবাহ যে কি পদার্থ, বোঝে না যে অপদার্থ,
অর্থলোভে পুরুষার্থ যে ফেলে বেচিয়ে,
অমন শিক্ষায় ধিক্ শত ধিক্, দর্শনে সে অন্ধ অধিক,
বিজ্ঞানে তার জ্ঞান নাই মোটে—ময়না শালিখ টিয়ে!

(৩)

থাকুক আমার বিয়ে,

চাইনা ভণ্ড দেশহিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশী,
ভাম্পায়ার বাদুড়ের মত বাতাস দিয়ে দিয়ে!
ধিক্ সে ওদের উচ্চ শিক্ষা, ধিক্ ওদের স্বদেশী দীক্ষা,
কিসে তরবে এ পরীক্ষা পশুর আত্মা নিয়ে!

(৪)

থাকুক আমার বিয়ে,

এটা নয় যে রাজনীতি, রাজদ্রোহের নাই সে ভীতি,
এটা কেবল মোহের প্রীতি টাকার লাগিয়ে!
কেউ না এতে কাটে মারে, ইচ্ছা কর্‌লে সবাই পারে,
শান্তি সুখে দেশ ভরিতে ভ্রান্তি বিনাশিয়ে।

(৫)

থাকুক আমার বিয়ে,

কুলীন চেয়ে ভাল কুলী, মুচি ডোম কসাইগুলি;
সারা জীবন ফেরে কেবল ছুরী শানাইয়ে।
যখন যারে কায়দা পায়, যে ঠেকেছে মেয়ের দায়,
ধর্ম্ম ভুলে চর্ম্ম খুলে কর্ম্ম সারে গিয়ে!

(৬)

থাকুক আমার বিয়ে,

বেচবে কেন ভিটে মাটি, বেচবে কেন ঘটী বাটী,
মজ্‌বে কেন আমার তরে ভিটেয় পুকুর দিয়ে?
যে করবে তোমার দুর্গতি, ভজ্‌ব কি সেই পশুপতি?
পূজ্‌ব না হয় পশুপতি উমার মত গিয়ে।

(৭)

থাকুক আমার বিয়ে,

রেখে কোলে কাঁখে বুকে, পালন কর্‌লে কত দুখে,
আজো তোমার স্নেহ দয়ায় রয়েছি বাঁচিয়ে;
আজো তোমার এম্নি ব্যথা, যা কিছু পাও যখন যেথা,
পাখীর মত দিচ্ছ এনে নিজে না খাইয়ে!
সেই তোমারে চির দুখে, ফেল্‌বে যে গো পাষাণ বুকে,
সে পশুকে পতি ব'লে পূজ্‌ব লুটাইয়ে?
ঘৃণা কি নাই নারীর মনে, সিদ্ধি নাই কি নারীর পণে?
সংযমে তার যমে ডরায়,—স'রে দাঁড়ায় গিয়ে।

(৮)

থাকুক আমার বিয়ে,—

দড়ী আছে কলসী আছে, ডুব্‌ব কিম্বা ঝুল্‌ব গাছে,
দুষ্ট সমাজ তুষ্ট হোক সে নারীর রক্ত পিয়ে,
রাজপুতানার মেয়ের মত, কর্ব্ব না হয় জহর ব্রত,
তারাও নারী মোরাও নারী, নারীর হৃদয় দিয়ে!

(৯)

থাকুক আমার বিয়ে,—

কোন্ জন্মে কি কল্লে পাপ, বাংলাতে হয় মেয়ের বাপ,
বুঝ্‌তে নারি আমি নারী বিধাতার কি হিয়ে!
আবার যদি জন্মে মেয়ে, চোখ তুলে না দেখো চেয়ে
হাত পা বেঁধে দিও বাবা! গঙ্গায় ডুবাইয়ে!

(১০)

থাকুক আমার বিয়ে,—

বাংলা দেশের সবাই পশু, কিসের ঘোষ কিসের বসু,
মুখুয্যে চাটুয্যে কিসের? সবই পশুর হিয়ে!
কার বা গর্ভে কার ঔরসে, সাত পুরুষের পুণ্য বশে,
মানুষ জন্মায় কটা ছেলে বংশ উজ্জ্বলিয়ে?

(১১)

থাকুক আমার বিয়ে,—

হায়রে পোড়া বাংলা দেশ! মেয়ের বাপ যেন দুম্বা মেষ,
নিতি নিতি খাচ্ছে তার মাংস কেটে নিয়ে!
কি কুক্ষণে আদিশূর আন্‌লে দেশে এ অসুর—
মারে না কেন খরাদেরে চোখেতে নুন দিয়ে।

(১২)

থাকুক আমার বিয়ে,—

কিসের ডিগ্রি কিসের প্যাশ, ঐট হ'ল গলায় ফাঁস,
কল্লে দেশের সর্ব্বনাশ কলেজ বসাইয়ে,
কলে জন্ম কলে তৈয়ার, (কই) নরপশু কলেজ বই আর?
কলেজ হ'তে জঙ্গল ভাল পশু জঙ্গলিয়ে,
তাদের ডিগ্রিতে নাই বিয়ে।

(১৩)

থাকুক আমার বিয়ে—

কার্পেণ্টার নাইটিঙ্গেল ডোরা, লিটল্ সিষ্টার হব মোরা,
থাক্‌ব বাবা! দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়ে,
দেশের হবে সুখ সুবিধা, বজ্জাতেরা হবে সিধা,
নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে, পশুর গৌরব গিয়ে;
বাঞ্ছা পুরুক আশীষ্ কর চরণ-ধূলি দিয়ে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কুচবিহারের নূতন মহারাণীর অভ্যর্থনা।

কুচবিহারের নূতন মহারাণী (বরোদার রাজকুমারী) শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতার "মহিলা সমিতি" গত ১৮ই জানুয়ারী রবিবার, অপরাহ্নে, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন্ গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন।

ডিজিয়ানা গ্রামের মহারাণী, বর্দ্ধমানের মহারাণী, মিসেস্ এ, চৌধুরী, মিসেস্ এস্, পি, সিংহ, মিসেস্ দত্ত, মিসেস্ পি, কে, রায়, মিসেস্ ব্যানার্জ্জী, মিসেস্ পি, চৌধুরী, মিসেস্ পি, সেন, মিসেস্ এস্, আর, দাস, মিসেস্ এস্ সি, মহলানবিস, মিসেস্ এস্, এন্ সেন, কুমারী এস্, নারায়ণ, মিসেস্ পি, কে, সেন, মিসেস্ রায়, এন, রায়, মিসেস্ এ, এন্, চৌধুরী, মিসেস্ আর, সি, ব্যানার্জ্জী, মিসেস্ পি, কে, মজুমদার, মিসেস্ এ, গুপ্ত প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্ব প্রথম বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত গান করে; তৎপর মিসেস্ পি, চৌধুরী (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী) ইংরাজীতে একটি সাদর-সম্ভাষণ পাঠ করেন। তাহার মর্ম্ম এই:—

বঙ্গ রমণীদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনি কেবলমাত্র কুচবিহারের মহারাণী নহেন, আপনি ইন্দিরা—লক্ষ্মীস্বরূপিনী। আদর্শ রমণীর সকল সৌন্দর্য্য ও মহত্ব আপনার মধ্যে বর্ত্তমান। আপনি যে গৃহ অলঙ্কৃত করিয়াছেন সেই গৃহের উপর ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক্।

আমাদিগের সকল শুভ চেষ্টায় আপনার সুপ্রসিদ্ধ পিতামাতার সহানুভূতি আমরা চিরদিন পাইয়াছি। এখন তাঁহাদিগের সুযোগ্যা কন্যার নিকট হইতেও আমরা তদনুরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করি।

আপনার শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গত ২৫ বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার সাধনে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। আমরা আশা করিতেছি, আপনার পিতৃকুল এবং শ্বশ্রূকুলের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে, আপনি এই প্রদেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকর অনুষ্ঠানের সহায় ও উৎসাহদায়িনী হইবেন।

"মহিলা সমিতি" সাধ্যানুসারে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ কার্য্যে আপনার মাতৃদেবী একজন প্রধান সহায় ছিলেন; অতএব এই সমিতি বিশেষরূপে আপনার সহায়তার আশা করে।

ভগবান আপনাদের মিলিত জীবন আনন্দময় ও গৌরবময় করুন। আপনি সাবিত্রীর ন্যায় সৌভাগ্যবতী হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বর্গীয়া কুমারী স্নেহলতা

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। ফাল্গুন, ১৩২০ ১১শ সংখ্যা।

লেডী হেষ্টার ষ্ট্যান্‌হোপ্‌

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত মন্ত্রী মহাত্মা উইলিয়াম্‌ পিটের দৌহিত্রী। অতি শৈশব কালেই হেষ্টার বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুষ্ট ঘোড়া দুরস্ত করিতে ভালবাসিতেন, এবং সমাজের অর্থহীন আদব কায়দা অগ্রাহ্য করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিতেন। তিনি সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী ও শক্তিশালিনী রমণী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় পিট্‌ অনেক বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন।

পিটের মৃত্যুর পর, লেডী হেষ্টার, দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। য়ুরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি এথেন্সে উপনীত হইলেন। তথায় বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড্‌ বাইরণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হইল। কিছুকাল এথেন্সে বাস করিয়া তিনি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে গমন করেন। সেখানে প্রতীচ্য জাঁকজমকে তিনি নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন এবং কয়েক বৎসর কনষ্টাণ্টিনোপলে বাস করিয়া তিনি যথেষ্ট মণিমুক্তা সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর রাশিরাশি মণিমুক্তা সহ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ঝটিকায় তাঁহার জাহাজ ডুবিয়া গেল, বহু কষ্টে একটি ক্ষুদ্র জীবহীন দ্বীপে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। পরদিন কয়েকজন মৎস্যজীবী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রোড্‌স দ্বীপে লইয়া গেল।

ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া, সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করতঃ তিনি পুনরায় বিদেশ যাত্রা করিলেন। এবার তুরস্কাধিকৃত ত্রিপলীর নিকটে একস্থানে একটি বাসা ভাড়া করিয়া তিনি বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আরবদিগের ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সকল বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভের পর, তিনি একদল আরব সংগ্রহ করিয়া অসাধারণ জাঁকজমকের সহিত জেরুজালেম, ডামস্কস্, আলেপো, পালমিরা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। তাঁহার জাঁকজমক দেখিয়া আরববাসীগণ তাঁহাকে রাণীর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। অনেক দিন ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে, তিনি ডিউন্ নামক গ্রামের রাণীরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই স্থানের একটি প্রাচীন দুর্গ মেরামত করিয়া তিনি তাঁহার প্রাসাদ করিয়া লইলেন, এবং বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক শরীররক্ষক, প্রহরী ও সৈনিকে গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; বহুসংখ্যক দাসী নিযুক্ত করিলেন, নূতন নূতন আইনকানুন রচনা করিয়া তদনুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিকের অন্যান্য দেশাধিপতিদিগের সহিত বন্ধুতা ও সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার বহুমূল্য উপহার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসাধারণ শক্তির নিকট অন্যান্য রাজা ও সর্দ্দারগণ মাথা তুলিতে পারিতেন না, পরন্তু তাঁহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলিতেন।

এইরূপে বহুকাল গত হইলে একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইতেছে। তিনি তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—নিকটবর্ত্তী একজন পরাক্রমশালী রাজা তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে যদি আমরা আমাদের রাণীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ না করি, তাহা হইলে তিনি আমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। আমরা আপনাকে সেই রাজার হাতে কিছুতেই সমর্পণ করিতে পারিব না, আপনার জন্য প্রাণ দিব, তাই প্রস্তুত হইতেছি। তাহারা আপনাকে পাইলে পশুর ন্যায় হত্যা করিবে। তিনি এইকথা শুনিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"তোমরা থাক, আমিই যাইব।" এই বলিয়া তিনি সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুপক্ষের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদল অশ্বারোহী বেদুইন্ বর্শা আস্ফালন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল এবং বিকট চীৎকার করিয়া বর্শা নাচাইতে লাগিল।

তিনি নির্ভয়ে তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং যে মুহূর্ত্তে অগ্রগামী অশ্বারোহীর বর্শা তাঁহার অশ্বের মস্তকোপরি উত্থিত হইল, তিনি সেই মুহূর্ত্তে স্বীয় মুখের আবরণ অপসারিত করিয়া সমস্ত দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়া ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তফাৎ যাও।" তাঁহার স্থির উজ্জ্বল মুখশ্রী, জ্বলন্ত দৃষ্টি, দৃঢ়তাব্যঞ্জক হস্তসঞ্চালন এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অশ্বারোহীগণ পশ্চাৎপদ হইল এবং পরমুহূর্ত্তে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। উহারা তাঁহারই অনুগত প্রজা, তাঁহার সাহস পরীক্ষা করিবার জন্য এই ফন্দী করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ সাহস এবং অকুতোভয় ভাব দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া পড়িল। এই ঘটনা উপলক্ষে সেদিন তাঁহার রাজ্যে মহা আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান হইল।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য, মূল্যবান মনোহর পরিচ্ছদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসীম ক্ষমতা, মানসম্ভ্রম, ধনবল ও জনবলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল তো চিরস্থায়ী নয়!

ক্রমে তাঁহার অর্থবল কমিয়া আসিল এবং তজ্জন্য জনবলও ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দুর্দ্ধর্ষ বেদুইন্‌গণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি সেই প্রাচীন দুর্গে কয়েকজন প্রহরী এবং দাসদাসী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমেই বুঝিতে পারিলেন, এতদিন যাহা লইয়া ছিলেন, তাহা নিতান্তই অসার। অতঃপর তিনি ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ

করিলেন এবং অচিরে গভীর ধর্ম্মসাধনের সৌন্দর্য্যে তাঁহার মুখমণ্ডল নূতন শোভা ধারণ করিল। চতুর্দ্দিকের লোক তাঁহাকে পূর্ব্বে ভয় করিত, এখন ভক্তি করিতে লাগিল। এই সময়ে কোন কোন বিজ্ঞ পর্য্যটক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, প্রসন্নমূর্ত্তি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরের সহিত ফিরিয়া যাইতেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসি-পণ্ডিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পরমা সুন্দরী। পবিত্রতা, মহত্ত্ব এবং গভীর চিন্তার আভা তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট। তিনি আরব দেশের উপযোগী পোষাক পরিধান করিতেন। মাথায় শাদা পাগ্‌ড়ী, মুখের উপর উলের ঘোম্‌টা, হরিদ্রা বর্ণের কাশমিয়ার শাল, পা পর্য্যন্ত লম্বা শাদা রেশমের ঢিলে জামা, তুর্কি-বুট—ছিল তাঁহার পরিচ্ছদ। তাঁহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গি অতি মনোহর ছিল। তাঁহার কাছে বসিয়া দর্শন, রাজনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইতে হইত। তাঁহার গৃহসজ্জাও অতি সামান্য। একটি মশারিবিহীন বিছানা, জানালায় পর্দা নাই, একটি জলপাত্র এবং গাম্‌লা। লর্ড চ্যাথামের (উইলিয়াম পিট্‌) পৌত্রীর গৃহের এই অবস্থা! কিন্তু তাঁহার বাগান গোলাপ ও জেস্‌মিন পুষ্পের সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

তাঁহার জীবনের শেষ কয়দিনের দৃশ্য অত্যন্ত শোচনীয় এবং মর্ম্মস্পর্শী।

তিনি রুগ্ন-শয্যাগত; এই অবস্থায় দাসদাসীগণ তাঁহার টাকাকড়ি কাগজপত্র, এবং যাহা কিছু ছিল সব আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিল। সেই স্থানের অতি নিকটে একজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী এবং একজন আমেরিকান ধর্ম্ম-প্রচারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখিলেন, একাকী সেই পুরাতন দুর্গের মধ্যে তাঁহার প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে; তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি। তাঁহারা মশাল জ্বালিয়া তাঁহার প্রিয় উদ্যানে গর্ত্ত খনন করিয়া সেই দেহ সমাধিস্থ করিলেন।

যে দেহ ও মনের অসাধারণ শক্তি, অগাধ ধন এবং উন্নত সামাজিক অবস্থা ঠিক পথে পরিচালিত হইলে জগতের কত কল্যাণ হইত, খেয়ালে পরিচালিত হওয়ায় তাহার এইরূপ পরিণাম হইল!

আফ্রিকায় সংকট

(৭)

যাত্রা।

অনেক পরামর্শ ও চিন্তার পর স্থির হইল, ডুপ্লে আর কেপকলনীতে থাকিবেন না।

বহু দূরে আরও কয়েকটি ফরাসি পরিবার নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। স্বদেশ পরিত্যাগের সময় সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে আফ্রিকার কোন স্থানে একটি ফরাসি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া স্বাধীন ভাবে কালযাপন করিবেন। কিন্তু কেপকলনীতে ইংরাজ আধিপত্য সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল; তাঁহারা কোনও সুবিধা করিতে পারিতেছিলেন না। বহুদিন হইতে তাঁহাদের মধ্যে অতৃপ্তি ঘনীভূত হইতেছিল। কিন্তু একবার যখন ঘরবাড়ী জমাজমি ফাঁদিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, তখন উঠিয়া যাওয়াও সহজ নয়, এবং সুবিধাজনক স্থানও সুলভ ছিল না।

কিন্তু এবার যখন ডুপ্লের গৃহ, উদ্যান, পশুপক্ষী ও ফসলপ্রভৃতি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অসভ্যগণ কর্ত্তৃক ছারখার হইয়া গেল, তখন সকলের মনে নূতন করিয়া বিভীষিকার সঞ্চার হইল। সেদিন ডুপ্লের গৃহে যতক্ষণ সকলে ছিলেন, কেবল এই কথাই হইয়াছিল, কি প্রকারে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে ঘননিবিষ্ট উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করা যায়।

তারপর তাঁহাদিগের মধ্যে ঘন ঘন পরামর্শ হইতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, তাঁহারা কেপকলনী

পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব অথবা উত্তর-পশ্চিমদিকে যাত্রা করিবেন, উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেলে সেখানেই নুতন উপনিবেশ স্থাপন করিবেন, অথবা কোন ফরাসি উপনিবেশে গিয়া বাস করিবেন। কিন্তু আফ্রিকার কোন্‌দিকে যে কোন্ স্থান এবং কোন্ পথে সে স্থানে যাইতে হয় প্রভৃতি ভুগোল বিষয়ক জ্ঞান তাঁহাদের সকলেরই সমান ছিল। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ব্যতীত আর উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহারা উত্তর-পূর্ব্ব দিকেই যাত্রা করা স্থির করিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া এক-জনকে তাঁহাদের দলপতি স্থির করিলেন। তিনি তাঁহাদের সেনাপতি, তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা শুনিতে সকলে বাধ্য, তিনিই বিচারক, তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা।

এইরূপে সব স্থির হইয়া গেল। সকলে আপন আপন জিনিষপত্র গাড়ী বোঝাই করিয়া ডুপ্লের গৃহে আসিয়া একত্রিত হইতে লাগিলেন।

সেখানে কোন প্রকার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইত না। সকলে নিজেই কাঠ কাটিয়া, গাড়ী তৈরি করিয়া, তাহা গরু, ঘোড়া বা মহিষ দ্বারা টানাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কত দিনের পথ, এবং কেমন পথ, কিছুই জানা ছিল না, কাজে কাজেই, নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু, গরু, ভেড়া, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি জন্তু এবং পানীয় জল যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গে লইতে হইল। সৈন্যগণ যেমন প্রণালীবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্যত্র গমন করে, তাঁহারাও সেইরূপ সমর-সজ্জায় যাত্রা করিবার সকল আয়োজন পূর্ণ করিলেন।

আর একদিন পরেই তাঁহারা যাত্রা করিবেন।

ডুপ্লে রেভাঃ ভিন্সেণ্ট্ ও হেন্‌রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভিন্সেণ্ট্ শুভকামনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

হেন্‌রী কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া, তার বাবাকে বলিল—"বাবা, আমি একবার মেরীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসুব ?"

ভিন্সেণ্ট্। তোমার শরীর এত দুর্ব্বল, তুমি এতদূর ঘোড়ায় চ'ড়ে গেলে তোমার কষ্ট হবে না ? যদি ক্ষতি না হয়, যাও।

হেন্‌রী। না বাবা, কাল আমি একবার ঘোড়ায় চ'ড়েছিলাম, কোন কষ্ট হয় নাই। আমি বেশ যেতে পারব ? এই বলিয়া হেন্‌রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল এবং তাহার "বয়"কে ডাকিয়া ঘোড়া সাজাইয়া আনিতে বলিল। তখন বেলা ৯টা।

হেন্‌রী তখনই মেরীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। হেন্‌রী সেখানে গিয়াই দেখিল অনেক গাড়ী দ্রব্যাদিতে পূর্ণ, অনেক গরু ঘোড়া দাঁড়াইয়া আছে, একজন লোক বন্দুক, তরবারী, ছোড়া প্রভৃতি সাফ করিতেছে, গুলি বারুদ ঠিক করিয়া লইতেছে।

হেন্‌রীকে আসিতে দেখিয়াই জন্ একটু বিদ্রূপের ভাবে বলিয়া উঠিল—"ঐযে সেই ইংরাজ বীর আস্‌ছেন।" কথাটা হেন্‌রীর কানে গেল না, কিন্তু সে তাহাদের ভাবভঙ্গিতে বুঝিতে পারিল যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই কথা চলিতেছিল।

হেন্‌রী ঘোড়া হইতে নামিয়াই জন্‌কে অভিবাদন করিল এবং সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিল; তারপর ডুপ্লের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল।

ডুপ্লে হেন্‌রীকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"দুর্ব্বল শরীরে আবার তুমি এলে কেন ? এসো, বসো; মেরী এখনই আস্‌বে। যাওয়ার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে একবার মেরীর দেখা হবে, ভাল হোল; নৈলে, তার মনে বড় একটা কষ্ট থেকে যেত।"

মেরী তখনই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেন্‌রীকে দেখিয়া সে একটু হাসিল, তারপরই তার হৃদয় মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে একটি চেয়ারে বসিয়া বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিল। তাহার হৃদয় মন পূর্ণ করিয়া একটি মহা ঝড় উঠিল—"হায়, আর হয়ত দেখা হবে না !"

হেন্‌রী ক্ষণকাল নীরব বেদনার তীব্রতা নীরবে বহন করিয়া, মেরীকে বলিল—"তুমি চলে যাবে তাই দেখ্‌তে এলাম।"

তাহাদের মধ্যে এইরূপ দুচারিটি কথা হইতে না

হইতে জন্ এবং কয়েকজন ফরাসি যুবক ও প্রৌঢ় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জন্ আসিয়াই বলিল —"আচ্ছা হেন্‌রী, তুমি তো খুব বীর, উড়ন্ত পাখী তুমি মারতে পার, গুলি দিয়ে?"

হেন্‌রী। পারি বৈ কি!

জন্। এ তোমার বৃথা গর্ব্ব। আমি কত দিন কত খরচ করে, কষ্ট করে তবে শিখেছি। তুমি কখনও উড়ন্ত পাখী মারতে পার না।

হেন্‌রী। আমি মিছে কথা বল্‌তে অভ্যস্ত নই, বুঝেছ?

জন্। আচ্ছা, তবে আজ বিকালে পরীক্ষা করা যাক, এসো।

হেন্‌রী। আচ্ছা, তাই হবে।

একজন ভদ্রবেশী ফরাসি বলিলেন—"হেন্‌রীর এখন শরীর খারাপ,—এরূপ কাজে তাকে এখন আহ্বান করা অন্যায়। সেদিনই সে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

হেন্‌রী বলিল—"আপনাকে ধন্যবাদ। আমার শরীর এখনও দুর্ব্বল, কিন্তু আমি গুলি ছুঁড়তে পারব।"

উক্ত ভদ্রবেশী ব্যক্তি তাহাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি একজন সাহসী পুরুষ, অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। তিনি সকলের নিকট ক্যাপ্টেন্ নামে অভিহিত। তিনি হইলেন মধ্যস্থ—তিনি বিচার করিবেন কে হারিল, কে জিতিল। স্থির হইল, হেন্‌রী এবং জন্ প্রত্যেকে পাঁচটা করিয়া গুলি ছুঁড়িবে, যে বেশী পাখী মারিতে পারিবে, তারই জিত।

জন্ বলিল—"যদি আমি হারি, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিব।"

বড়লোক বলিয়া তার বড় অহঙ্কার।

সব কথাবার্ত্তা স্থির হওয়ার পর হেন্‌রী গৃহে চলিয়া গেল।

বৈকালে হেন্‌রী তাহার ভৃত্য সঙ্গে, দুটি বন্দুক সহ উপস্থিত হইল।

জন্ সেদিন সমস্ত দিন হাত ঠিক করিয়াছিল। এখন সে বীরবেশে দুজন চাকরের হাতে দুটি বন্দুক দিয়া গৃহের বাহির হইল। ক্যাপ্টেন্ এবং অন্যান্য সকলে একত্র হইয়া একটু দূরে একটা মাঠের ধারে গিয়া প্রত্যাগমনকারী পক্ষীদিগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য মহিলাদিগের সহিত মেরীও একটি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া সেই বীরত্ব পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সকলেই গল্পসল্প করিতেছে; কিন্তু মেরীর মুখে কথা নাই, তার যেন কি সঙ্কট উপস্থিত!

কয়েক মিনিট পরে, দুটি একটি করিয়া পাখী দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল।

ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতমত জন্ বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইল।

একে একে পাঁচটি গুলি ছোঁড়া হইয়া গেল, তিনটি পাখী ভূপতিত হইল।

তারপর, হেন্‌রী দাঁড়াইল। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, এবং জনের বন্দুকের শব্দে পক্ষী সকল ভয় পাইয়া অনেক দূর দিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তবুও হেনরী গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। পাঁচ গুলিতে তিনটি পাখী পতিত হইল।

জন্ বলিয়া উঠিল—"দুজনেই সমান সমান। আমি আগে মেরেছি আমারই জিত!"

ক্যাপ্টেন্। তুমি থাম। আমি দেখ্‌ছি; তোমার কোন কথা বল্‌বার অধিকার নাই, জান?

এই বলিয়া তিনি জনের পক্ষী এবং হেন্‌রীর পক্ষী তাঁহার দুই পার্শ্বে রাখিলেন; এবং পক্ষীগুলির আহত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জনের একটি পাখীর পেটে তিনি দুই তিনটি ক্ষত দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ছুরি দিয়া সেই পাখীটির পেট চিরিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে তিনটি ছোট ছোট গুলি বর্ত্তমান। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"জন, তুমি ভদ্রলোকের মত কাজ কর নাই। একটা গুলিতে একটা পাখী মারা, আর তিনটা ছিটাদ্বারা একটা পাখী মারা এক কথা নয়। এরূপ ছিটা ব্যবহার করা তোমার অন্যায় হ'য়েছে। সুতরাং আজ হেন্‌রীরই জয়।"

জন্ কোন কথা না বলিয়া, রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে চলিয়া গেল। হেন্‌রী সকলকে অভিবাদন করিয়া ঘোড়ায় চড়িবে এমন সময় অদূরে মেরীকে

দেখিয়া তাহার নিকট গেল। মেরী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমাকে ভুলো না; আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো।"

তারপর দু'একটি কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে উভয়ে পরস্পরের নিকট বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে ফরাসিগণ যাত্রা করিলেন।

(৮)

পথ-ভ্রান্ত।

ফরাসিগণ ধীরে ধীরে অজ্ঞাতদেশের সন্ধানে সেই অপরিচিত জঙ্গলের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পদে পদে বাধা। কোন স্থানে নদী, কোন স্থানে পাহাড়, কোন স্থানে দুর্দ্দান্ত নরভোজী অসভ্য জাতির আক্রমণ এড়াইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গল আর শেষ হয় না, কোন সভ্যজাতির উপনিবেশের সন্ধান আর মিলে না।

এইরূপে দুই মাস অতিবাহিত হইল। বর্ষাকাল সমাগত। সকলেই পথশ্রমে কাতর। বাসের উপযোগী একখণ্ড জমি পাইলেই তাঁহারা অস্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বর্ষাকাল কাটাইবেন, এবং চতুর্দ্দিকে কোথায় কি আছে তাহারও অনুসন্ধান করিবেন—এইরূপ স্থির করিয়া, তাঁহারা কোন জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী উচ্চ ও শুষ্কভূমির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শীঘ্র এইরূপ একটি স্থানও মিলিল।

অদূরে একটি নদী প্রবাহিত, তাহার জল সুস্বাদু ও পরিষ্কার। এই স্থানটি চতুর্দ্দিকের জঙ্গলময় প্রদেশ অপেক্ষা কিছু উচ্চ এবং শুষ্কতর। উহার উপর বড় বড় গাছ আছে, কিন্তু বেশী আগাছার জঙ্গল নাই।

ফরাসিগণ সেই উচ্চভূমিতে তাঁহাদের জিনিষ পত্র গাড়ী ঘোড়া পশু পক্ষী সব লইয়া গেলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে সেই স্থানটি পরিষ্কার করিয়া, কাঠ কাটিয়া, তক্তা চিরিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। অসভ্যদিগের আক্রমণ হইতে যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায় তাহারও [illegible] করিলেন। কাঠ পাথর দিয়া তাঁহারা একটি [illegible] ছোট দুর্গ প্রস্তুত করিলেন।

এই সকল কার্য্য করিতে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। যখন সব কাজ শেষ হইল, তখন সকলেরই শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন। দেখিতে দেখিতে ঘোর বর্ষা আসিল। অনবরত বৃষ্টি পড়ে, সকলেই গৃহে আবদ্ধ,—বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। যাঁহারা ভিজিয়া শিকার করিতে গেলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। গৃহে বসিয়া থাকিয়াও শরীর খারাপ হয়, বাহিরে গিয়া ভিজিলেও জ্বর হয়। অথচ বাহিরে না গেলেও নয়;—শিকার না করিলে সকলে কি খাবে? সেই ঘোর বর্ষায় সহজে পশুও পাওয়া যাইত না, অনেক ঘুরিয়া একটি পশু পাওয়া যাইত, তাহাতেই কোন প্রকারে সকলের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত।

একদিকে গৃহে অবরোধ, অপরদিকে বৃষ্টিতে ভিজা, দুই-ই রোগের কারণ হইল। একদিকে অল্পাহারে সকলের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল, অপর দিকে কেপ্‌কলনী হইতে আনীত সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যও শেষ হইতে লাগিল। গরু ঘোড়া প্রভৃতিও মরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রায় তিন মাস পরে বর্ষা কমিয়া আসিল। কিন্তু মাটি হইতে এক প্রকার স্যাঁৎ-সেঁতে বাষ্প উঠিতে আরম্ভ হইল। সেই বাষ্প সকলের শরীরের উপর বিষের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল; সকলেরই শরীর স্ফূর্ত্তিহীন, কাহার গায়ে ব্যথা, কাহার মাথা ধরা, কাহারও কাসি, কাহারও জ্বর প্রভৃতি নানা ব্যাধি আরম্ভ হইল।

ঔষধ, পথ্য, এমন কি চা পর্য্যন্ত ফুরাইবার উপক্রম হইল। সে প্রদেশে পশু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত না; কিন্তু যাহা পাওয়া যাইত তাহারও পথ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল, গুলি বারুদ শেষ হইতে চলিল। কেবল খরচ, আমদানি নাই। সবই আর কিছুদিন পরে শেষ হইয়া যাইবে, তখন কি হইবে, এই ভাবিয়া, সকলে চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে ভবিষ্যৎ মৃত্যুর কালিমায় ভীষণ হইয়া উঠিল।

প্রত্যেকের আহারের পরিমাণ কমাইতে হইল। সকলের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দুর্ব্বল দেহে ব্যাধির প্রকোপ আরও খরতর হইয়া উঠিল। অবশেষে মৃত্যু দেখা দিল।

সেকি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! সেই অজ্ঞাত জঙ্গলে, কয়েকজন সাহসী পুরুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া শত প্রকার প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। একজন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; সকলের হৃদয়মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহিলাগণ ব্যাকুল ক্রন্দনে হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত করিলেন, কিন্তু পুরুষগণ ক্ষণকাল মুহ্যমান থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে গহ্বর খনন করিয়া, সেই দেহ সমাধিস্থ করা হইল। সেই দুর্গ আজ যেন কত শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

কেমন করিয়া এই স্থান হইতে উদ্ধার হইবেন, এই চিন্তায় সকলে আকুল হইয়া পড়িলেন। গুলি বারুদ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, খাদ্যদ্রব্য কিছু নাই বলিলেই হয়, কোন ঔষধ নাই, পথ্য নাই; সেই জঙ্গল হইতে কোন লোকালয়ে যাওয়ার পথ এপর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। আর কয়েকদিন পরে সকলের গতি কি হইবে, কিরূপে প্রাণ বাঁচিবে, কে কাহাকে দেখিবে? সকলেই রুগ্নভগ্ন জীর্ণশীর্ণ।

এইরূপ অবস্থায় মৃত্যুর আবির্ভাব হইল। মৃত্যুর গ্রাস একজনকে গ্রহণ করিয়াই বিরত হইল না। প্রতি সপ্তাহে একজন করিয়া দেহত্যাগ করিতে লাগিল। জীবিতদিগের এরূপ অবস্থা যে সেই মৃতদেহ বহন করিয়া সমাধিস্থ করাও কঠিন হইল। কয়েকজন মিলিত হইয়া বহু কষ্টে, ভগবানের নাম করিয়া মৃতদেহের সৎকার করিতেন। এইরূপে সেই স্থান একপ্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। গৃহে গৃহে রুগ্ন শীর্ণ নরনারী নিরাশ প্রাণে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। শব্দ নাই, হাসি নাই, কথা নাই, চলাফেরা নাই, ক্রন্দনও নাই, প্রাণের সকল চিহ্ন সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; মৃত্যুর কাল মেঘে সেই প্রাণগুলিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে!

ডুপ্লে কন্যার ভাবনায় অকালে বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, মেরী পিতার অবস্থা দেখিয়া মরমে মরিয়া দিন কাটাইতেছে। খাদ্যের পরিমাণ কমাইতে হইয়াছে, কিন্তু কন্যার ইচ্ছা বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা ভাল করিয়া আহার করেন, অপর দিকে পিতার ইচ্ছা তিনি অনাহারে থাকিয়া বা নামমাত্র আহার গ্রহণ করিয়া কন্যাকে পূর্ণমাত্রায় আহার করান। এই লইয়া প্রতিদিন কত কান্নাকাটি চলিতে লাগিল। কে কাহাকে বঞ্চিত করিয়া আহার করিবে? অবশেষে সকলেই কিছু কিছু খাইত। কিন্তু সেই স্বল্পাহারে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। দুর্ব্বলতা ও দুশ্চিন্তায় ডুপ্লের মাথা খারাপ হইয়া গেল। তিনি পাগলের ন্যায় কত সময় কাঁদিতেন, আবার হাসিতেন।

ডুপ্লের এইরূপ পরিবর্ত্তনে সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কেবল একজন মুখে দুঃখের ভান করিলেও, অন্তরে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিল। সে ব্যক্তি জন্। জন্ ডুপ্লের এই অবস্থাকে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির মহাসুযোগ বলিয়া মনে করিল। তাহাদের ভবিষ্যৎ যে কি হইবে, যদি তিনি প্রাণত্যাগ করেন তাহা হইলে মেরীর কি হইবে, এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সে প্রায়ই ডুপ্লেকে অস্থির করিয়া তুলিত। ইহাতে এক এক সময় ডুপ্লে অধীর হইয়া কন্যাকে জনের হস্তে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। কন্যাকেও তিনি সে কথা বলিতেন, কিন্তু কন্যা গভীর দুঃখ ও দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করায়, কখনও তিনি নীরব হইতেন, কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় কন্যাকে অত্যন্ত গালাগালি দিতেন। শেষে উভয়েই ক্রন্দন করিতেন।

জনের ইচ্ছা, সে কোন প্রকারে মেরীকে হস্তগত করিয়া পলায়ন করে। কিন্তু যখন তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না, অথচ প্রাণ যায় যায়, আর মোটে ৫০টি মাত্র গুলি আছে, এই কয়টি খরচ হইয়া গেলে হয় অনাহারে মরিতে হইবে নতুবা অসভ্যদিগের হাতে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; তখন সে একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই ৫০টি গুলি, দুটি বন্দুক এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আহার্য্য পশু বধ করিবার জন্য যাত্রা করিল। সকলেই তাহার আশায় বসিয়া রহিল। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি গেল, আবার দিন আসিল, জন্ আর ফিরিল না। সকলেই বুঝিল হয় জন্ কোন বিপদে পড়িয়াছে, না হয়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে।

শেষ আশাটুকুও শূন্যে মিলাইয়া গেল। সকলের হৃদয় ভেদ করিয়া নিরাশার আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ঘরে ঘরে জীবন্ত দেহে মৃত্যুর আবির্ভাব হইল। সকলেই শয্যাশায়ী হইলেন। (ক্রমশঃ)

আকাঙ্ক্ষা

হৃদয় আমার চাহেনাক প্রভু
সম্মান অতুলন
অপমান দাও শিরে চাপাইয়া
নহিগো ক্ষুণ্ণমন।
সুখ সান্ত্বনা চাহিনাক নাথ!
চাহিনা অর্থ আমি
দুখেরে লইয়া কাটাব জীবন
হে মোর জীবন স্বামী!
উচ্চ হইতে নাহি সাধ মোর
ক'রে দাও মোরে নীচু,
শোভা সম্পদ—উচ্চ-অঙ্গ—
চাহিনাক আমি কিছু।
সুখ-সহচর হাস্য যদি বা
না দেখায় মোরে মুখ,
ব্যথিতের সাথী অশ্রু আমার
মুছা'বে সকল দুখ।
আকাঙ্ক্ষা মোর—শুধু প্রিয়তম!
বাঁধ বিশ্বাস-ডোরে
'আছ কি না-আছ' সন্দেহ যেন
পাইয়া না বসে মোরে।

শ্রীতরুবালা গুপ্তা।

ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত দুই দিন

ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কয়েকদিন কাটাইয়া আসিয়াছি। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও আমি—দুইজনে বাল্যকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের বড় প্রিয়পাত্র ছিলাম। বস্তুতঃ আমাদের বাল্যকালের স্মৃতির মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিস্তৃত অধিকারের কথা কখনো ভুলিতে পারিব না।

আমরা যখন ছোট, তখন শাস্ত্রী মহাশয় কিছুদিনের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, সে কথা আজও আমাদের বেশ মনে আছে। অজিত ও আমি উভয়েই তাঁহার আনীত অনেকগুলি খেলনা পাইয়াছিলাম। বোধ হয় ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে একটা বালসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টিও হইয়াছিল। যাহাই হউক আমার যাত্রার কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "আমি ছয় মাসে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার সুফল ভোগ কর্‌ছি. তুমি দীর্ঘতর কালের জন্য যাচ্ছ, তুমি আরো কত সঞ্চয় করিয়া আনিতে পারিবে!" এই বলিয়া তাঁহার বিলাতে অবস্থানকালের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "বিলেতে আমি সব রকম আন্দোলনে যোগ দিতাম; আন্দোলনকারিদের বক্তব্য কি তা' বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌তাম, তাদের উদ্দেশ্য কি তা' ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌তাম। সোসিয়ালিষ্টিক মত, অজ্ঞেয়বাদ, নিরীশ্বরবাদ, যেখানে যে মতেরই প্রচার হোক্ না কেন, আমি সময় কর্‌তে পারলেই সেখানে গিয়ে জুট্‌তাম। চুপ করে এক কোণে বসে তাদের বক্তব্য শুনে যেতাম। অ্যানি বেশান্টের তখন ভারি সোসিয়ালিষ্টিক মত। তিনি 'ব্রাড্‌ল' প্রভৃতির সঙ্গে ভারি উৎসাহের সঙ্গে ঐ মত প্রচার কর্‌তেন। আমি তাঁদের বক্তৃতা শুন্‌তে যেতাম। এমন হয়েছে যেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এদের বক্তৃতা শুনেছি।

"তখন বিলেতে সুরাপান নিবারণের জন্যেও বেশ আন্দোলন দেখে এসেছি; আমরা তো সুরাপানের একান্ত বিরোধী; আমাদের পক্ষে নূতন কথা না হই-লেও তারা কি ভাবে কাজ করে তাই দেখ্‌বার জন্য অনেক সময়ে তাদের দলে গিয়াছি। একবার এক সভায় উপস্থিত হ'লে সভায় উদ্যোগকারিগণ আমাকে

কিছু বল্‌বার জন্যে ধর্‌লেন। আমি তো বক্তৃতার মধ্যে বলে ফেল্লাম যে তাদের জাতটাই মাতালের জাত। আমার চৌদ্দ পুরুষেও কেউ মদ ছোঁয় নি' শুনে সভাশুদ্ধ লোক একেবারে অবাক হ'য়ে গেল!"

রিভিউ অফ্ রিভিয়ুসের সম্পাদক স্বর্গীয় ষ্টেডের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ষ্টেডের উদার প্রেম সকল জাতির মহৎ ভাবকেই শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। শাস্ত্রীমহাশয়কে একদিন তিনি আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যাকাল তাঁহার নিকট যাপন করেন। দীর্ঘ কাল তাঁহার সহিত নানাবিধ বিষয়ে প্রসঙ্গ হইলে, রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া তিনি ষ্টেডের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী যাইবার জন্য ট্রেণে উঠিলেন। (লণ্ডনের বিভিন্ন অংশে সাধারণতঃ রেলপথে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে)। তখন রাত্রি দশটা। ট্রেণে উঠিয়াই শাস্ত্রী মহাশয় দেখিলেন, গাড়ীশুদ্ধ পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা মাতাল হইয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্ত্রী-যাত্রীদের মধ্যে একজন মদের ঝোঁকে শাস্ত্রী মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "Here's my man!" শাস্ত্রী মহাশয় অনেক কষ্টে তাহার হাত ছাড়াইলেন। বস্তুতঃ অল্প সময়ের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি কঠোর হইলেও সত্য, একথা বলিতে দ্বিধা বোধ হইতেছে না। আর একবার লণ্ডনে একজন লোক শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল; শাস্ত্রী মহাশয় তাহার ভিক্ষা চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল যে অর্থের অভাবে তাহার স্ত্রী-পুত্রকন্যা মৃতপ্রায় হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার বাড়ীতে গিয়া, তাহার কথা সত্য হইলে ভিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সে ব্যক্তির সঙ্গে চলিলেন। অনেক রাস্তা হাঁটিয়া অবশেষে এক নোংরা গলির মধ্যে একটা বিশ্রী বাড়ীতে লোকটি তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু সে লোকটিও ফেরে না, অন্য কাহারও দেখা নাই; তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের একটু ভয় হইল। তিনি বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় লোকটি দেখা দিল; শাস্ত্রী মহাশয় অধিক বাকব্যয় না করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মদে লোকটির সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় অনেকগুলি শিশুবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলিতে তিনি শিশুদের সহিত শিক্ষকদিগকে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। গাম্ভীর্য্যের মুখোস ফেলিয়া শিক্ষক যে শিশু হইয়া শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতে পারেন, ইহা দেখিতে এখনো আমরা অভ্যস্ত হই নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধেও শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এই কয়দিন কথা হইয়াছে। অন্যের সম্বন্ধে কোনো অভিযোগের কথা একবারও তাঁহাকে বলিতে শুনি নাই। ব্রাহ্ম-জীবনের আদর্শ নিজের জীবনে ভালো করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, এই কথাই তিনি বেশি করিয়া বলিয়াছেন। এখন তাঁহার দৃষ্টি প্রধানতঃ আপনাতেই আবদ্ধ; পরমাত্মার সহিত আরো নিকটতর যোগ সাধনের জন্য তাঁহার খুব ব্যাকুলতা দেখিলাম। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নহেন, তাঁহার প্রতিদিনকার প্রার্থনা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ ভিক্ষা করিয়া থাকে; তিনি ব্রাহ্মসমাজের স্থূল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ।

প্রসঙ্গক্রমে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় হাফিজের ভক্ত ছিলেন, সাদীকেও প্রাণে স্থান দিয়াছিলেন কিন্তু মহাপুরুষ ঈশাকে তিনি আদর করিতে পারিলেন না, এ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়!" এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বলিলেন, "সে অনেক কথা।" তাহার পর বলিলেন যে, মহর্ষির সময়ে খ্রীষ্টানদের ধর্ম্ম গছিয়ে দেওয়ার চোটে লোকে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষির এক কর্ম্মচারীর ছেলেকে ডাক্তার ডফ্ পাকড়াও করিয়া ফেলেন। কর্ম্মচারীর খাতিরে মহর্ষি বালককে উদ্ধার করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন তাহাকে হাতে পাওয়া গেল তখন তাহার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় হিন্দু

সমাজের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গেল; "হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়" স্থাপিত হইল। মহর্ষি তাহার সম্পাদক হইলেন। তৎকালীন প্রধান প্রধান হিন্দুগণ এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক হইলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ এই বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতে লাগিল। ইহার পর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রীষ্টান হইলেন। খ্রীষ্টান-দের সহিত মহর্ষির বিষম বিরোধ বাঁধিল। তখন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইত সে অতি সঙ্কীর্ণ জিনিস। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মনের ভাবটা এই ছিল যে তাঁহারা কতকগুলি নরকের কৃমিকীটকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়া করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের প্রচারিত ধর্ম্ম-পুস্তিকা সকল হিন্দুদের বিরুদ্ধে কেবলি গরল উদ্গীরণ করিত এবং এই পুস্তিকাগুলি প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের বালকদের মধ্যে বিতরিত হইত। মহর্ষি এ সব দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। এই সব কারণে মহর্ষি কতকটা খ্রীষ্টবিরোধী ভাব পোষণ করিতেন। আর একটি বড় কথা এই যে, মহর্ষির ধর্ম্মজীবন বহুলভাবে উপনিষদ হইতে অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিল, এ জন্যও তাঁহার খ্রীষ্টানুরাগ জন্মে নাই। নানক, কবীর, হাফিজ এবং অন্যান্য সুফী ভক্ত কবির কথা তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত। ইঁহাদের সঙ্গেও তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল। রামমোহন রায় একটা খুব বড় ভাব ধারণা করিয়াছিলেন; তিনি একদিকে যেমন ভারতীয় ঋষিদিগের ধ্যান স্বীকার করিয়াছিলেন তেমনি আর এক দিকে খ্রীষ্টের পবিত্রতা ও সেবার ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সেই মহান্ ভাবের এক অংশ মহর্ষির জীবনে ও অন্য অংশ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

খ্রীষ্টপ্রসঙ্গে আচার্য্য বলিলেন, "খ্রীষ্টানরা বলেন, 'খ্রীষ্ট জুডিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।' বেশ কথা। কিন্তু তা'তে আমাদের কি? শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা'তেই বা আমাদের কি? আমরা এই যে বর্ত্তমান যুগের লোক, আমরা কই খ্রীষ্টকে বা কৃষ্ণকে পাচ্ছি না। যেন তাঁরা সত্য সত্যই কোনো যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তা'তে বর্ত্তমান যুগের অভাব তো দূর হয় না। আসল কথা তা' নয়; ভগবান প্রত্যক্ষ, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে লীলা কর্‌ছেন,—এ উপলব্ধি কর্‌তে হবে। Providence অর্থাৎ বিধাতৃত্ব বুঝ্‌তে হবে; শুধু উপনিষদের ব্রহ্ম-সত্তার কথা বল্‌লে হবে না। সাধারণ সমাজের চেয়ে নববিধান সমাজে এই ভাবটি বেশী ফুটেছে। সাধারণ সমাজের লোকে অনেক সময়ে মনে করে. 'আমরা কর্‌ছি, আমরা ঘটাচ্ছি,' কিন্তু নববিধানীরা বলেন, 'ভগবান আমাদের যন্ত্র ক'রে লীলা কর্‌ছেন।' Providence নববিধানীরা অনেকটা বুঝে চলেছেন, কাজেই তাঁদের মধ্যে ভক্তির ভাব বেশি ফুটেছে। ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব-জ্ঞান পরিস্ফুট হ'লে অবতারবাদের প্রয়োজন নাই—ভক্তি Providenceকে আশ্রয় করে বেশ ফুটতে পারে।

"ধর্ম্ম সব রকম উন্নতির সহায়,—কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সে ভয় করে না—কারণ সে যে তার সহায়। সমগ্র মানব-সমাজের ভ্রাতৃত্বের ভাব (Brotherhood of man) এখন ফুটে উঠ্‌ছে—একটা জাতকে বাদ দিয়ে আর একটা জাতকে নিয়ে 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা বল্লে কেউ শুনবে না। বর্ত্তমানের ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন হওয়া ছাড়া আর গতি নাই—সাম্প্রদায়িক হ'লে চল্‌বে না। এই ধর্ম্মের বড় প্রয়োজন হয়েছে। Electricity সমস্ত দুনিয়াকে pervade কর্‌ছে বল্‌লে হবে না;—electricity যেমন পাখা টান্‌ছে, আলো দিচ্ছে, গাড়ী চালাচ্ছে, সেই রকম 'ব্রহ্ম আছেন' বল্লে হবে না, সমস্ত জীবনে তাঁকে পেতে হবে। সামাজিক পারিবারিক জীবন পূর্ণ ক'রে তাঁর আসা চাই। জগৎটা এমন একটা যুগের মধ্যে এসে পড়েছে, যেখানে মানুষের চিরন্তন ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ বাধ্‌ছে। যেমন কেউ বল্‌ছেন—'সাত দিনে সমস্ত পৃথিবীটার সৃষ্টি হয়েছিল,' বৈজ্ঞানিক বল্‌ছেন—'বহু যুগ ধরে এর নির্ম্মাণ কার্য্য চলেছে তবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে;' ও পুরাণো মত ছাড়্‌তে হবে, কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে ও মত খাপ্ খায় না।

"অবতারবাদীদের একটা প্রধান যুক্তি—'তিনি তাঁর লীলা সম্বরণ না কর্‌লে, আমাদের মত না হ'লে তাঁকে

আমরা পেতে পারি না। একবার একজন আমেরিকার লোক বিলেতে গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ব্যক্তি দেখতে পেলে প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন ঘোড়া সাজিয়া ঘরের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার পিঠে তাঁহার দৌহিত্র সওয়ার হইয়া বসিয়া হ্যাট্ হ্যাট্ করিতেছে, আর এই দৃশ্য দেখিয়া গ্লাডষ্টোনের কন্যাগণ হাসিয়া 'কুটপাট' হইতেছে। ঈশ্বরের অবতরণ কতকটা এই গ্লাডষ্টোনের গ্লাডষ্টোনত্ব পরিহার করার মত। বিশ্বরূপ সম্বরণ না করলে তাঁকে দেখা যায় না—এই তাঁ'দের বিশ্বাস। কিন্তু তা' নয়। তাঁ'কে ছোটক'রে চোখে চোখে দেখাটা দেখাই নয়—তেমন দেখা তিনি দেন না—তা'তে তাঁর মহিমা খর্ব্ব হয়। তাঁর লীলার মধ্যে তাঁ'কে দেখতে হবে, সেই দেখাই যথার্থ দেখা। এই যে তিনি রয়েছেন, তিনি তো দূরে নয়, আমাদের জীবনে তিনি কত কাজ করছেন। বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মজ্ঞান শুধু ব্রহ্ম-সত্তা নয়, তার সঙ্গে ব্রহ্মলীলা, বিধাতৃত্ববোধ চাই। ব্রাহ্মসমাজে যতদিন এই বোধ যথার্থভাবে না জন্মাচ্ছে ততদিন ব্রাহ্মদের কথা কেউ শুনবে না। যখনি জগৎ ব্রাহ্মসমাজে এই বোধের পরিচয় পেয়েছে তখনি তার কথা শুনেছে।"

বর্ত্তমান যুগে ত্যাগের যূপকাষ্ঠে যাঁহারা স্বেচ্ছায় আপনাদের মস্তক বলিদান দিয়াছেন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ করিবার নাই। তিনি জগতের স্থূল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একপ্রকার বিদায় লইয়া নিভৃতে অবস্থান করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার বাহিরের অনেকে হয় তো তাঁহার কথা শুনিয়া সুখী হইবেন এই জন্য তাঁহার উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। যে কণ্ঠস্বর প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল বাঙালীর ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে অনুপ্রাণনা দান করিয়াছে, সে কণ্ঠস্বর আজ নীরব হইলেও লোকে তাঁহার কথা ভুলিতে পারিবে না, এ কথা ধ্রুব নিশ্চয়।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিস্থল দর্শনে *

১

এই সে পবিত্র ভূমি এখানে রয়েছ তুমি,
ক্ষোদিত লিপির হেথা নাহি প্রয়োজন,
কারুময় শোভাকর নাহি স্তম্ভ মনোহর
অচিহ্নিত † রাজা! তব সমাধি বিজন!—
ছায়াশালী তরুবর কিন্তু নত শাখা থর
এরি পরে ক'রে আরো অধিক নমন
রেখেছে সে মৃত তনু, তারি হিম হিম অণু
সাদরে সাগ্রহে ঢালি কতই যতন,
পবিত্র আঁধার ছায়ে করি আবরণ।

২

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী— তাহ'তে সুদূর অতি
মোদের উদীচ্য এই গগনের তলে,
রেখেছে বিদেশী-কর তোমায় ভূগর্ভ'পর
বিষাদ-মালিন্য মাখা নিকুঞ্জের কোলে;
অন্ত্যেষ্টিও সমাপন করেছে বিদেশীগণ
মরমের ব্যথা আর নয়নের জলে;

৩

বিদেশী?
না না না বিদেশী নয় স্নেহের স্বজনচয়,
মানব-মণ্ডলী হয় জাতি যে তোমার!
জ্যোতির্ম্ময় স্বাধীনতা বিতরে আলোক যথা,
সেই তব সুখময় শান্তির আগার!
উষ্ণীষ ভূষিত শিরে ভারত-সন্তানবরে
ইংলণ্ডেরো কত জন উন্নত উদার
বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে নি'ছিল প্রেমের বাসে,
নি'ছিল ভাবের রাশি দিয়ে ভারে ভার,
মরমের উচ্চতম মন্দির মাঝার।

* মিস্ এ্যাক্ল্যাণ্ড কর্ত্তৃক রচিত ইংরাজী কবিতার ভাবাবলম্বনে লিখিত।

† পরে ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয় কর্ত্তৃক তথায় সুন্দর সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪

কি উদার পূতচিত্ত! যাহা কিছু ন্যায় সত্য
যা' কিছু সুন্দরতম শ্রেষ্ঠ সমুজ্জ্বল,—
বিজ্ঞানোদ্ভাসিত তব মহদাত্মা অভিনব
জ্বালাত স্বহৃদে তারি জ্বলন্ত অনল!
সে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ রাশি বাগ্মিতা-হিল্লোলে ভাসি
পড়িত, কাঁপাত প্রতি হিয়া-তন্ত্রী-তল,
জাগাইত মহাভাব স্বর্গ নিরমল!

৫

পাশ্চাত্য সন্তানগণ ঘেরি তোমা মহাত্মন্!
স্বাধীনতা সাম্যগীতি করিত শ্রবণ,
যবে ভারতীয় মুখে উল্লাসপূর্ণিত-বুকে
বিপুল মহিমা তার করিতে কীর্ত্তন!
শুনিত রমণীদল ব্রাহ্মণের যুক্তিবল
বিরুদ্ধে সে ভীমমূর্ত্তি—'সতীর দাহন'—
নারী-জীবনের মূল্য; গৌরব বচন!

৬

শতেক যোজন দূরে, প্রবাসে পরের পুরে,
হায়রে! ধরিল তোমা দুরারোগ্য রোগে;
পাশ্চাত্য-মিলন-ফল হতে তব করতল
হায়, কাল ফেলে দিল নিয়তির যোগে;
জন্মভূমি পূজিবারে রেখেছিলে প্রাণভ'রে
যে সব কুসুমরাশি পূর্ণ অনুরাগে,—
নিরমম রূপ ধ'রে সে সব বিশুষ্ক ক'রে
ছড়াইয়া দিল তাহা সমাধি উপরে
হায়, হায়, না আসিল স্বদেশের ঘরে!

৭

বিলাপে কি ফল এবে! হে স্বরগ-যাত্রী! ভবে—
অজ্ঞান-তিমির নাশি, বিজয়ী তোমায়
করেছিল যাঁর স্বর সেই বিশ্ব-অধীশ্বর
ডাকিলেন স্নেহ-অঙ্কে বিশ্বাসী আত্মায়;
দিলেন নিবাস হ'য়ে দ্যুলোক বিধান ক'রে
সৃষ্টি-দুরলভ-আলো যে লোকেতে ভায়,
অপূর্ব্ব ভবন পূর্ণ পুণ্য-জ্যোছনায়!

৮

নাশিয়ে কুপ্রথা সবি, ন্যায় ধরমের রবি
শোভিবে কালেতে তব জাতীয় গগন,
প্রকৃত জ্ঞানের জ্যোতি সত্যের বিমল ভাতি
বিতরিবে খরতর মধ্যাহ্ন কিরণ
তখন সে অগণন ভারত-সন্তানগণ
পূজিবে চরিত্র তব করিয়া যতন,
করিবে তোমারি পুণ্য-পথানুসরণ,—

৯

হবে হেথা তীর্থধাম, আসিবেক অবিরাম
অনন্ত উৎসাহে সবে তীর্থযাত্রী যত
সুপবিত্র, সুগম্ভীর, তাঁদের নয়ননীর
করিবে নিষিক্ত এই ভূমি অবিরত;—
যথায় জাতীয় রবি, মহাপুরুষের ছবি,
দেশের সুহৃদ, ভুলি মর্ম্মব্যথা যত
অনন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে গভীর নিদ্রিত! *

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

উকিলের পরামর্শ

তরুণী বিধবা বীণা যখন পতিশোকে বৃন্তচ্যুত গোলাপ পুষ্পের মত, একেবারে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় চারি বৎসরের বালিকা ননী এবং এক বৎসরের একটি বালক ভিন্ন এই মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার প্রকৃত সান্ত্বনার স্থল আর কিছুই ছিল না। নন্দনের মন্দার-সৌরভটুকুর মত এই শিশুদুইটি বুকে লইয়া তিনি আপনার অসহনীয় শোকজ্বালা কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া লইলেন এবং পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় মন দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের জরাজীর্ণ দেহে এই নিদারুণ শোকভার অধিক দিন সহিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অষ্টাদশবর্ষীয়া ভার্য্যা কাত্যায়নী এবং

---

* মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায় লেখিকা কর্তৃক পঠিত।

দুই বৎসরের একটি শিশুপুত্র গৃহে রাখিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন।

মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমার মত অভাগিনী বীণা অবগুণ্ঠণে মুখ আবৃত করিয়া সংসারের তত্ত্বাবধান ও পুত্রকন্যার রক্ষণাবেক্ষণে রত রহিলেন। রাত্রিতে যখন জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িত,—ঝিল্লীর নিশীথ-বীণাঝঙ্কার নীরব প্রকৃতিকে সঞ্জীবতা দান করিত এবং মানবের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় দ্বিগুণ দগ্ধ হইবার জন্যই যেন কর্ম্মকোলাহল হইতে অবসর গ্রহণ করিত, সেই সময় বীণা নিদ্রিত শিশুর মুখকমল দেখিতে দেখিতে অশ্রুজলে অভিষিক্তা হইতেন। এই বিশাল ভবন—দাসদাসী পূর্ণ সুন্দর অট্টালিকা—বীণার নিকট সকলই যেন শূন্য!

মৃত বৃদ্ধের নবীনা সহধর্ম্মিণী কাত্যায়নী অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই বৃদ্ধা সাজিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে এ ধারণা সহজেই বদ্ধমূল হইল যে, তিনিই ভর্ত্তৃ-আলয়ের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং সপত্নী-পুত্রবধূর একমাত্র অভিভাবিকা। কাত্যায়নীর বয়স বীণার অপেক্ষা ৩।৪ বৎসর ন্যূন হইবে, কিন্তু তিনি সহসা অভিভাবিকার পদে অভিষিক্তা হইয়া বয়োজ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর প্রতি অসঙ্কোচে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

কাত্যায়নীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু এই নগণ্য গৃহস্থের জীর্ণ কুটীরখানি যদিও কমলা ও বাগ্‌দেবীর চরণরেণুতে কখনও অলঙ্কৃত হয় নাই, তথাপি তাঁহার প্রতি ষষ্ঠীদেবীর কৃপা অল্প ছিল না। পৃথিবীতে যাহার অন্ন জোটে না তাহার প্রতি প্রায়ই ষষ্ঠীর অযাচিত দয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কাত্যায়নীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতিও অল্প ছিল না, সেই জন্যই অদূর পল্লীবাসী বৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর শুভ-দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইয়াছিল।

দরিদ্র পিতারও অপর কোন সম্বল ছিল না। তিনি গঞ্জিকাপ্রসাদে ঘরের ঘটি-বাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দারিদ্র্য প্রযুক্ত কেহ ঋণ দিতে অসম্মত হইলে পরিশেষে আত্মীয় কুটুম্বের নিকট ভিক্ষাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহিণীর কলহপ্রিয়তার জন্য তাঁহার প্রতি প্রতিবেশিগণের সহানুভূতিও অধিক প্রকাশ পাইত না। অবস্থাপন্ন বৃদ্ধের হস্তে কন্যাদান করিয়া তিনি জীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

কাত্যায়নী নিজ প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা ও কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি মাতৃগুণের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। এক্ষণ তাঁহার পুত্র পতির পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী কেন না হইবে, এবং কি উপায়ে বীণা ও তাঁহার পুত্রকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করা যায়, কাত্যায়নী সেই চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বীণা গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা। তাঁহার প্রতি পদে দয়া, স্নেহ, মমতা যেন ঝরিয়া পড়িত। বৃদ্ধ দেওয়ানজি অনেক সময়ই বৌদিদির নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে গমন করিতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বীণা বিষয়ের আয় ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত কথাই বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ সর্ব্বদা শুভফলপ্রসূ হইত; এজন্য তাঁহার প্রতি কাত্যায়নীর অসন্তোষ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

চির বিশ্বাসী দেওয়ান কাশীনাথ বিশ্বাস অনেক দিনের পুরাতন কর্ম্মচারী। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, সত্যপরায়ণতা ও বুদ্ধিবলেই জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

২

"মা, মা,—ওমা!"

"কি বল্ না, ননী,"

"ঐ হরিণটা দাও না, মা?"

"এখনি যে ভেঙ্গে চুরমার করবি!"

"না, না, দাও—আমি ভাঙ্‌ব না"

এই বলিয়া পাঁচ বৎসরের বালিকা ননী শুভ্র সুগোল বাহু দুটি দ্বারা আবদার ভরে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। মাতা আদর করিয়া নিজ সুকুমারী দুহিতাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণ-রশ্মি-রেখা মুক্ত-বাতায়ন-পথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। দেয়ালের গায়ে একটি কাচ-মণ্ডিত আলমারাতে সুদক্ষ কুম্ভকার-নির্ম্মিত

মৃণ্ময় হরিণ-শাবক, ইলিশ মৎস্য, আম, লিচু, আনারস প্রভৃতি শোভা পাইতেছিল। অতি সামান্য হইলেও এগুলিতে বীণার অনেক স্বপ্নময়,—আশাময়, অতীত-স্মৃতি জড়িত ছিল। যাঁহার সুন্দর হস্তদ্বারা এই তুচ্ছ জিনিষগুলি দূরদেশ হইতে আনীত ও মনোমত ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, তিনি বীণার হৃদয়-দেবতা। সুতরাং পতিপ্রাণা, পতির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বহুদিন যাবৎ এগুলি যত্নে রক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু ননীর উৎসুক-দৃষ্টি ঐ হরিণ-শাবকটির প্রতিই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

দুই বৎসরের ক্ষুদ্র শিশু সমীপস্থ তক্তপোষ-পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রজাপতিটিকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা দিদিকে আপনার চিরাধিকৃত মাতৃক্রোড় অধিকার করিতে দেখিয়া সে হেলিতে দুলিতে, টলিতে টলিতে সেই স্নেহময়ীর নিকট উপস্থিত হইল এবং মাতার বাহুস্পর্শ করিয়া অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে দুই একটি কথা বলিতে লাগিল।

বালিকার জেদ ক্রমশঃই অধিকতর বাড়িয়া উঠিল। পরে প্রার্থনা ক্রন্দনে পরিণত হইল। মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু বর্ষণে ননীর স্বর্ণ নিন্দিত উজ্জ্বল কপোল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

মাতাপুত্রীতে এই ক্ষুদ্র সংগ্রামে অবশেষে বালিকারই জয় হইল। বীণা হস্তস্থিত অর্দ্ধপ্রস্তুত ফ্রকটি মাদুরের উপর রাখিয়া আলমারা খুলিয়া ঐ সুন্দর খেলেনা ননীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

খোকা দিদির নিকট এই অপূর্ব্ব জিনিষটি দেখিয়া উচ্চ হাসির লহর তুলিয়া দিল এবং আপনার ক্ষুদ্র বলে তাহা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল।

সেই সময় হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে তিন বৎসর বয়স্ক আর একটি বালক সেখানে প্রবেশ করিল,—সে উল্লাসভরে বলিয়া উঠিল,—"আমাকে দাও মা বৌদি।"

বালকের নাম নলিন। বীণা আদর করিয়া কহিল,—"এস নলু,—আচ্ছা বেশ, তোমরা তিন জনেই এই হরিণটিকে নিয়ে খেলা কর।"

কিন্তু খোকা কিছুতেই স্বকরগত মনোরম খেলেনা ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল না। সে উহা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

দুরন্ত বালক নলু যেমন উহা বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইল, অমনি তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া সেই মৃণ্ময় মৃগশিশু ইষ্টক নির্ম্মিত মেজের উপর পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

প্রিয়তমের মধুর-স্পর্শ-অনুভূতিময় স্মৃতিচিহ্নটি হঠাৎ নষ্ট হওয়াতে বীণার হৃদয়ে অলক্ষ্যে একটি আঘাত লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না। আদরের জিনিস হারাইয়া ননী অতিশয় দুঃখিত হইল। সে আপনার নবনীত তুল্য কোমল হস্তে নলুর পৃষ্ঠে একটি চপেটাঘাত করিল। নলু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ননীর সুকুমার করাঘাতে সে যে বিশেষ কিছু কষ্ট অনুভব করিয়াছিল এমন নয়, সুন্দর খেলেনাটি নষ্ট হওয়ার পরাভবের বেদনাই অভিমানী বালককে পীড়া দিয়াছিল। তখন আটগাছি কাচের চুড়ী হাতে দিয়া ঝন্ ঝন্ করিতে করিতে নলুর ঝি অলি ওরফে অলকমণি তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—

"কি হয়েছে? মেরেছে বুঝি?"

নলু ক্রন্দন-গদ্‌গদ আধ আধস্বরে কহিল,—"মেলেছে—ননী।"

"হাঁ, বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না—" এই বলিয়া অলি বীণাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া, নলুকে লইয়া ঝড়ের মত বেগে প্রস্থান করিল এবং প্রভুপত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার মিথ্যাকথা সাজাইয়া বলিল,—"বউ দিদি এখন আর কেউকে গ্রাহ্যই করেন না।"

কাত্যায়নী গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

"বটে! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যার খেয়ে মানুষ, তাকেই মানেন না! যখন পথে দাঁড়াতে হবে তখনই টের পাবেন!"

৩

নিদাঘের প্রখর-রবিতাপে সন্তাপিতা হইয়াও যেমন সূর্য্যমুখী অধিকতর উজ্জ্বলতা লাভ করে, তেমনই প্রথম

যৌবনের মাধুর্য্যময় উন্মেষে ব্রহ্মচর্য্যের প্রখর জ্যোতিঃ নিপতিত হইয়া বীণাকে লোকাতীত সৌন্দর্য্যে আভাময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

পরোপকার-ব্রতেই বীণার বিশেষ অনুরাগ। প্রতিবেশিগণের মধ্যে যাহার দিনান্তে অন্ন জুটিত না, বীণা তাহাকে অন্ন দিতেন। অর্থাভাবে যে বালক স্কুলে পড়িতে পারিত না, বীণা তাহার স্কুলের খরচ চালাইতেন। যে চির-দরিদ্র,—ঝড়ে বা অগ্নিদাহে আপনার ক্ষুদ্র কুটীর খানি হারাইয়া যে চক্ষে অন্ধকার দেখিত, বীণা নিজব্যয়ে তাহার গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বীণা প্রতিমাসে জমিদারী হইতে হাত খরচ বাবদ যে সামান্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেন তাহার অধিকাংশই পরোপকারে ব্যয়িত হইয়া যাইত! এজন্য লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

কাত্যায়নীর প্রাপ্য অর্থের অধিকাংশ লগ্নি কারবারেই খাটিত। দরিদ্র প্রতিবেশী এবং প্রজাগণ অবস্থার নিপীড়নে তাঁহার নিকট হইতে বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ লইতে বাধ্য হইত। কিন্তু পরিশোধ করিবার সময় অনেকেরই জিনিষপত্র, গরুবাছুর, জমাজমি পর্য্যন্ত নিলামে উঠিত।

তাঁহাদের প্রজা কৃষক নিধিরাম অতিশয় দরিদ্র। পুত্রের বিবাহে নিতান্ত বাধ্য হইয়া সে কাত্যায়নীর নিকট হইতে ৫০৲ টাকা ধার লইয়াছিল। সুদ যোগাইতে না পারিলে তাহার পরিবর্ত্তে সেই টাকার পরিমাণ ফলশস্য দিতে হইবে, মনিবপত্নীর নিকট সে এই করারে আবদ্ধ ছিল।

নিধিরাম আশা করিয়াছিল যে এবার সে পাট বেচিয়াই টাকাগুলি পরিশোধ করিতে পারিবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাটের ফসল একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। প্রাণপণ চেষ্টায়ও সে টাকার সুদ যোগাইয়া উঠিতে পারিল না; এক বৎসরের সুদ বাকী পড়িল। ধান যাহা কিছু পাইয়াছিল, পূর্ব্ব বৎসরের সুদ যোগাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠ মাস;—অদ্য হাটবার। নিধিরাম আজ স্ত্রী-পুত্রে উপবাসী। গৃহে একটি পয়সা সম্বল নাই, একমুষ্টি চাউল নাই। গাছের সুপক্ক আম্রগুলি বিক্রয়ার্থ লইয়া সে হাটে চলিল; উহাই অদ্যকার হাটের অবলম্বন। আশা,—ফলবিক্রয়লব্ধ অর্থে দুই তিন দিনের জন্য পরিবারের জীবন রক্ষা হইবে।

নিধিরাম যখন আমগুলি বহন করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিতেছে, তখনি কাত্যায়নীর একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য তাহাকে আটক করিল; কৃতান্তের দূতের ন্যায় তাহার বিনয়-ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, সেই অনাহারক্লিষ্ট প্রজার ঘাড় ধরিয়া প্রভুপত্নীর নিকট উপস্থিত করিল। তিনি প্রাপ্য টাকার আংশিক সুদ স্বরূপ সমস্ত আমগুলি রাখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে উষ্ণ অশ্রুজল ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে সে জঠরানলে অস্থির হইয়া জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিল। তাহার উপর ক্ষুধাতুর বালক বালিকাদের ক্রন্দন;—ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল।

নিধিরাম কাঁদিতে কাঁদিতে বীণার নিকট উপস্থিত হইল। সেই করুণাময়ী দেবীই তাহার একমাত্র ভরসা;—তিনি দুঃখীর জননী!

সহৃদয়া বীণা এই বিষণ্ণ গৃহস্থের সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। অবিলম্বে পাচক ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া তাহাকে সপরিবারে নিজ গৃহে আহার করাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

বীণা স্বহস্তে পঞ্চাশটি টাকা আনিয়া ঐ দরিদ্র প্রজার হস্তে তাহার ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অর্পণ করিলেন। সে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

সুরধুনী মন্দাকিনীর ন্যায় দয়ার যে নির্ম্মল প্রবাহ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যোগ স্থাপন করিয়াছে, নারী-হৃদয় হইতেই তাহা উৎসারিত হইয়া থাকে; জানি না কাহার অভিশাপে কোথাও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়।

বীণার প্রশংসা মুখে মুখে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনা কাত্যায়নীরও অগোচর রহিল না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হিংসা-বিষে দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"আচ্ছা তোমাকে একবার দেখিব।"

৪

কাত্যায়নী অপরাহ্নে সুবিখ্যাত উকিল হরিপদ বাবুর নিকট লোক প্রেরণ করিলেন।

প্রবীন উকিল হরিপদ দত্ত এই গ্রামেরই অধিবাসী। মৃত ভূম্যধিকারীর অধিকাংশ মামলা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইত। তিনি সমস্ত মোকদ্দমাই সুচারুরূপে পরিচালন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এইক্ষণ হরিপদ বাবু নাবালকের অভিভাবক স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় সহরেই বাস করেন; কখন কখন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে বাটীতে আসিয়া থাকেন।

হরিপদ দত্ত পরম বৈষ্ণব। মালাজপ ও ভাগবত পাঠ না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করেন না। তাঁহার স্তাবকগণের মুখে এরূপ শুনা গিয়াছে,—তিনি যখন মালা তিলকে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া, ললাটে ব্রজরজঃ মাখিয়া, সুর ধরিয়া ভাগবত পাঠে নিযুক্ত হন, তখন বনের পশুপাখী পর্য্যন্ত ভাবভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে।

হরিপদ বাবু যখন কাত্যায়নীর বাটী পদার্পণ করিলেন, তখন বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের প্রখরতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু লাল পাগড়ী-ওয়ালার রক্তচক্ষুর ন্যায় তাহা এখনও সন্তাপ দায়ক। মক্ষিকার উপদ্রব, কাকের কলরব, পচা আম কাঁঠালের দুর্গন্ধে দিনটি যেন উকিলের জটিল বুদ্ধির মতই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

কাত্যায়নী যবনিকার অপর পার্শ্বে বসিয়া উকিল মহাশয়ের নিকট আপনার অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। বিশ্বস্তা দাসী অলকমণি সাক্ষী-গোপালের মত নিকটে উপবিষ্ট ছিল। কাত্যায়নী নিজ মুখেই কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উকিল বাবু অতিশয় গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"মা, আপনার স্বামী কোন উইল করে গিয়েছেন কি?"

কাত্যায়নী। না, তিনি কোন উইল করেন নাই; তা হলে তো কোন গোলই ছিল না; এইটিই ভুল হয়েছে।

হরিপদ। তবে উপায় কি? আইনতঃ পৌত্রও তো বিষয়ের একজন মালিক।

কাত্যায়নী বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—"তাতো সকলেরই জানা আছে; এর একটা কিনারা করবার জন্যই তো আপনাকে ডাকা হয়েছে।"

হরিপদ। আইনের বিধান লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়।

কাত্যায়নী। আমি কখনও আর কেউকে নন্টুর অংশী হতে দিব না। এর উপায় আপনাকে অবশ্যই কর্‌তে হবে।

হরিপদ। সকল কার্য্যই নিজ ইচ্ছামত হলে সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যেত। অনেক সময়ই ব্যাপার উল্টা হয়ে দাঁড়ায়।

কাত্যায়নী। আমি জানি বুদ্ধির অসাধ্য কিছুই নাই। আপনার সুপরামর্শের গুণে অনেক দিন কত কঠিন বিষয় সহজ হয়ে পড়েছে।

হরিপদ। বিষয়টি যেরূপ গুরুতর, তাহার সুমীমাংসাও অর্থ-সাপেক্ষ।

কাত্যায়নী উকিল বাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"অর্থের কোন অভাব হবে না।"

হরিপদ নীরবে মালাজপে প্রবৃত্ত হইলেন, নিকটস্থ লাউ গাছের উপর একটি বায়স উচ্চরবে কর্কশধ্বনি করিয়া উঠিল।

কাত্যায়নী মৃদু ভাবে কহিলেন,—"আপনার সুপরামর্শই আমার একমাত্র ভরসা। যে অবস্থায় পড়েছি তা আর কি বল্‌ব? তিনি আমাকে একেবারে অকূলে ভাসায়ে গিয়েছেন।"

হরিপদ বাবু কিয়ৎক্ষণ বিমনা থাকিয়া উত্তর করিলেন,—"আপনার নিকট কর্ত্তার স্বাক্ষরিত কোন চিঠি পত্র আছে কি?"

কাত্যায়নী। হাঁ।

এই বলিয়া কাত্যায়নী নিকটস্থ বাক্স খুলিয়া কতকগুলি চিঠি উকিলের হস্তে প্রদান করিলেন।

হরিপদ। আমি তবে বিদায় হই। এ বিষয়ে অনেক চিন্তা ক'রে পরামর্শ দিতে হবে।

৫

আজ দিবা অবসানের পূর্ব্বেই একখানা মেঘের কৃষ্ণ ছায়া সূর্য্যদেবের বিশ্ব উজ্জ্বলকারী মুখ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। প্রকৃতি দেবী যেন সহসা আপনার চির-হাস্য-বিলসিত ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিতে বিষাদের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। ঘনবর "গুম্ গুম্" রবে জয়ঢক্কা নিনাদিত করিয়া জগৎবাসীর নিকট বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল এবং প্রকাণ্ড দৈত্যের মত নিজ বিশাল মস্তক ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া বসুন্ধরার প্রতি অবজ্ঞা ভরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কাত্যায়নী নিতান্ত উৎসুকচিত্তে যবনিকার পার্শ্বে বসিয়া উকিল বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নানা চিন্তায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিতেছিল। অদূরবর্ত্তী পথে প্রত্যেক পদশব্দে তিনি ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষণ্ণভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তাঁর বুঝি আজ আর আসা হল না।"

তাঁহার প্রিয় পরিচারিকা অলি নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে নানা চাটুবাক্যে প্রভুপত্নীকে হস্তগত করিয়া লইয়াছিল, এবং অপূর্ব্ব কৌশলে কাত্যায়নীর অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল।

সে হাসিয়া কহিল,—"আপনার টাকাগুলিই তাঁকে টেনে আনবে।"

কাত্যায়নী। তিনি কর্ত্তার আমলের লোক কিনা, সেই জন্যই আমার কার্য্যে তাঁর এত মনোযোগ। তাঁর সুপরামর্শগুণেই আমাকে দেশ ছেড়ে পলাতে হয় নাই।

অলি। তিনি সুপরামর্শ না দিবেন কেন? তাঁর প্রতি আপনার কত দয়া। আপনি কাকেই বা দয়া না করেন?

ইতিপূর্ব্বে প্রভুপত্নী তাহাকে মিছরীকাটা চুড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

দাসীর নিকট নিজ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কাত্যায়নীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন সময় উকিল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নীল যবনিকার সন্নিকটে অপরকক্ষে আসন গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন,—"ঝড়ের সম্ভাবনা দেখে ইতস্ততঃ করছিলেম, তাই আসতে একটু বিলম্ব হল।"

নলিন্ এতক্ষণ খেলা করিয়া খাটের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘুমন্ত শিশুর সরলতাপূর্ণ স্বাভাবিক প্রফুল্ল মুখের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কাত্যায়নী কহিলেন,—"সেই পরামর্শের বিষয় কি স্থির হয়েছে?"

উকিল। এই কয়দিন তাই নিয়েই অস্থির ছিলেম, কাল রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত খাটতে হয়েছে।

কাত্যায়নী। দেওয়ান বাবুও বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন। যেন আমাকে গ্রাহ্যই নাই।

উকিল। তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক তো অনেক আছেন।

হরিপদ বাবু আপনার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিলেন।

কাত্যায়নী। কর্ত্তা রেখে গিয়েছেন, তাই চক্ষুলজ্জায় পড়তে হয়েছে।

উকিল। চক্ষুলজ্জার বিষয় চিন্তা করলে আজকাল সংসারে বাস করাই কঠিন;—এই কাগজটা দেখুন।

এই বলিয়া তিনি একখানি কাগজ কাত্যায়নীর নিকট প্রদান করিলেন।

কাত্যায়নী একটু ব্যস্তভাবে কহিলেন,—"কিসের কাগজ?"

উকিল। যে পরামর্শের বিষয় আপনি জানতে চেয়েছিলেন, তারই একটা খসড়া। একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখুন।

কাত্যায়নী কাগজ পাঠ করিতে লাগিলেন।

উকিল। মনোমত হয়েছে তো?

কাত্যায়নী সুশিক্ষিতা নহেন। সুতরাং উকিল বাবুর লিখিত কাগজখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছিল। অনেক কষ্টে কাগজ পাঠ সমাপ্ত হইলে কি এক অব্যক্ত আতঙ্কে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্বেদ-জল নির্গত হইতে লাগিল।

তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘন্ ঘন্

রবে বায়ু গর্জ্জিয়া উঠিল। তীব্র বিদ্যুদালোকে যেন চক্ষু ঝলসিয়া গেল এবং সমীর-তাড়নে দ্বার ও গবাক্ষের কপাট সকল পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে শব্দায়মান হইতে লাগিল। ঘোর নিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া অদূরবর্ত্তী উদ্যানস্থিত তাল গাছের উপর একটি বজ্র নিপতিত হইল।

সহসা কাত্যায়নীর মনে হইল, তাঁহার মস্তকে পতিত হইবার জন্যই যেন এইরূপ আর একটি বজ্র উদ্যত রহিয়াছে। তিনি রুদ্ধ নিশ্বাসে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"এ হবে না উকিল বাবু; হাজার হলেও আমি স্ত্রীলোক। কি জানি কিসে কি হয়; আপনি অন্য পরামর্শের বিষয় বলুন।"

৬

বিধাতার বিশ্বরাজ্য আশ্চর্য্য রহস্যময়। মানুষ যতই কেন মন্দ হউক না, তাহার প্রাণ পাপের নিম্ন হইতে নিম্নতর কূপে যতই না অবতরণ করুক,—মঙ্গলময়ের কৃপা-হস্ত তাহারও উদ্ধারের জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। একটি পাপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে প্রাণে সহসা কেন আতঙ্ক উপস্থিত হয়? কে অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের অন্তস্তলে আঘাতের উপর আঘাত দিতে আরম্ভ করে? উহাই ভগবানের করুণা। যেমন সুনির্ম্মল স্বচ্ছ জলে মুখের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, তেমনি পবিত্র নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবানের করুণা বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাণ যতই মলিন হইতে আরম্ভ হয়, বিবেকের আঘাত-অনুভূতি ততই হ্রাস পায়।

উকিল বাবু যখন কাত্যায়নীর নিকট জাল উইলের খসড়া উপস্থিত করিলেন, তখন দুষ্কৃতির সেই সুস্পষ্ট মূর্ত্তি তাঁহার নিকট যেমন ভয়ানক বোধ হইয়াছিল, পরে স্বার্থের প্রবল উত্তেজনায় তাহার ভীষণতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে কিছুতেই তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

ইহার পর দুই দিন ব্যাপিয়া উকিল বাবুর সহিত কাত্যায়নীর কি পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহা অপর কাহারও জানিবার সাধ্য রহিল না।

পরদিন হইতে কলহ-বিদ্যা-নিপুণা কাত্যায়নী অকারণে বীণাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; সেই জ্বালাময় আগ্নেয়াস্ত্রসকল প্রতিবেশিগণকেও সন্তাপিত করিয়া তুলিল। সুশীলা বীণার ক্লেশসহিষ্ণুতার সীমা নাই। দুর্ভর পর্ব্বতের ন্যায় যে শোকভার তাঁহার বক্ষ চাপিয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট অন্য কষ্ট কোন ছার্? তিনি মুখ তুলিয়া কোন কথাই বলিলেন না।

কাত্যায়নী বীণার উপর শুধু অগ্নিবাণ সকল বর্ষণ করিয়াই যে ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে, তাঁহার আরাধ্য মৃত পতিকে লক্ষ্য করিয়াও নানা কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

বীণা আপনার নিন্দাবাদ অনায়াসেই সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহার স্মৃতি তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন,—যাঁহাকে দেবতার মত হৃদয়-মন্দিরে রাখিয়া ভক্তিপুষ্পে নিয়ত পূজা করিয়া থাকেন, সতীর পক্ষে তাঁহার নিন্দা নিতান্তই অসহ্য।

এইরূপে সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইল। অষ্টম দিনে বীণা পুত্রকন্যাসহ পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

মধুর শৈশবে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীণা যে আনন্দের নিকেতনে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, প্রিয়তমের প্রেমস্মৃতি যে স্থানের প্রতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে,—যে স্থানের বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত সেই পবিত্র স্মৃতি বহন করিয়া তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা আনয়ন করিত,—সে স্থান পরিত্যাগ করিতে তাঁহার প্রাণ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কিন্তু নিয়তি কে অতিক্রম করিতে পারে?

উকিল বাবুর সুপরামর্শের ফল আরও ফলিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ দেওয়ান কাত্যায়নীর দুর্ব্ব্যবহারে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং হরিপদ বাবুর এক ভ্রাতা তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

অদৃষ্টের দারুণ অনুশাসন নতশিরে বহন করিয়া বীণা পিতৃগৃহে পুত্রকন্যার প্রতিপালনে রত রহিলেন। এইরূপে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল।

বিভা গ্রাম-সম্পর্কে বীণার ঠাকুর-ঝি। এই সরল-স্বভাবা রমণীর সহিত বীণার বড়ই ভাব ছিল। বীণার নির্ব্বাসনে সে আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার পত্রেই বীণা পতি-ভবনের সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিতেন।

একদিন প্রাতঃকালে বীণা বিভার একখানি চিঠি পাইলেন। বিভা অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছে,—

"বউদি, আপনাদের বাড়ীর অবস্থা কি লিখিব? লক্ষ্মী বিনে গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় থাকিলে সকলই যাইবে। বাবা বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল অন্যস্থানে থাকিলে আপনার পুত্রের সম্পত্তি নানারূপে নষ্ট হইতে পারে। আপনি একবার আসিবেন। আপনাদের কুশল লিখিবেন, আমরা একমত আছি।

ইতি,—　　　　আপনার স্নেহের

বিভা।"

কূট-বুদ্ধি-সম্পন্ন হরিপদ বাবুর পরামর্শেই যে কাত্যায়নী বীণাকে গৃহত্যাগিনী করিয়াছেন, ইহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। বৃদ্ধ দেওয়ান কাশীনাথ বিশ্বাসের কর্ম্মত্যাগের পর জমিদারীতে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। মোকদ্দমার সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঋণজালে জড়িত হইয়া সম্পত্তি দিনের পর দিন বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং অনেক জায়গাই হাতছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। মোকদ্দমা উপলক্ষে এখন যে জমিদার-বাড়ীর প্রায় সমস্ত অর্থই হরিপদ বাবুর লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিতেছে, ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই জমিদারী শীঘ্রই হরিপদ বাবুর করায়ত্ত হইবে।

বিভার পত্রের উত্তরে বীণা লিখিলেন,—

"প্রিয় ঠাকুর-ঝি, তোমার পত্র পাইলাম। সংসারে আমার মন নাই। যেখানে আমার অভীষ্ট দেবতার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে হয় সেখানে আমি কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারি না। আমি আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি, সম্পত্তি লইয়া কি করিব? খোকা বড় হইয়া আপনার পথ চিনিয়া লইবে। সে একটু বড় হইলেই আমি শ্রীবৃন্দাবন চলিয়া যাইব। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল চাই। ইতি—　　　তোমার বউদি

বীণা।"

৭

বসন্তের অপূর্ব্ব শ্রীতে ধরা-রাণী ভূষিতা হইয়া উঠিয়াছেন, মলয়ানিলস্পর্শে সকলেই আনন্দিত। কিন্তু বীণার প্রাণে আনন্দ কোথায়?

ননী মাষ্টারের নিকট বসিয়া তাহার পাঠ অভ্যাস করিতেছিল,—খোকা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার পাঠের বিঘ্ন জন্মাইতেছিল। এমন সময় একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি বিভার। বীণা পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"বৌদি, অনেক দিন যাবৎ আপনার পত্র পাইতেছি না। আমাদিগকে ভুলে গেলেন কি? গ্রামে বসন্তের ধূম পড়িয়াছে। নলু ও তাহার মাতা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; ভয়ে বাড়ীর ঝি চাকর সকলেই পলায়ন করিয়াছে। নলুর মার কতকগুলি জিনিষ পত্র চুরি করিয়া অলি ঝি ইতিপূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন যে বোধ হয় সুশ্রূষার অভাবেই নলু ও তাহার মা মারা পড়িবেন। আমরা বাবার সহিত কালই সহরে চলিয়া যাইব। ইতি—

আপনার স্নেহের

বিভা।"

বীণা পত্র পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কালের গতি বিচিত্র; কিন্তু যাঁহার হস্তে ন্যায়-দণ্ড নিয়ত পরিচালিত হইতেছে তাঁহার কিছুই অগোচর নাই।

বীণার হৃদয় কাত্যায়নীর বিপদে ব্যথিত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ নলু তো তাঁহারই দেবর। যিনি তাঁহাকে নির্ব্বাসিতা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, বীণা তাঁহারই জন্য,—তাঁহার সেবার জন্য আকুল হইলেন! এদৃশ্যে যদি স্বর্গ দেখিতে না পাই, তবে জানি না স্বর্গের শোভা কোথায়?

বীণা স্বামী-গৃহে যাত্রার উদ্‌যোগ করিলেন। সভয়ে তাঁহার পিতা মাতা শিহরিয়া উঠিলেন;—বসন্ত যে

ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি! তাঁহারা কাত্যায়নীর নির্ম্মম আচরণ স্মরণ করাইয়া দিয়া কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু সকলই বৃথা হইল। ননী ও খোকাকে মাতার নিকট রাখিয়া বীণা সেই দিনই স্বামী-গৃহে রওয়ানা হইলেন।

বীণা বাড়ী গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে পাষাণও ফাটিয়া যায়! তাঁহাদের এত বড় বাড়ী যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে;—একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে দুএকজন পুরাতন ভৃত্য ভিন্ন সকলেই প্রস্থান করিয়াছে। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা কোনমতে কাত্যায়নী ও নলুর পথ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রতিবেশী ও প্রজাগণ কাত্যায়নীর দুর্ব্ব্যবহারে সকলেই অসন্তুষ্ট। সুতরাং এই বিপদ সময়ে কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। নূতন দেওয়ান বিশেষ জরুরী কার্য্যের ভাণ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেছেন। ডাক্তার রোজ এক বার আসিয়া দূর হইতে দেখিয়া যান।

বীণা ধীরে ধীরে ম্লানমুখে যাইয়া কাত্যায়নীর শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নলু ও তাহার মাতা সংঘাতিক ব্যারামে শয্যাগত। তাঁহাদের সুশ্রূষা এক-বারেই চলিতেছে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নলুর জীবনের আশা নাই। সেই চিরচঞ্চল সুন্দর বালক একবারে সংজ্ঞাশূন্য!

বীণাকে দেখিয়া কাত্যায়নী কাঁদিয়া উঠিলেন। রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—"এস মা আমার! তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমাকে তাড়াইয়া আমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছে! একটু জল দাও মা!"—কাত্যায়নী আর বলিতে পারিলেন না।

বীণা তাঁহার মুখে একটু জল দিলেন। কাত্যায়নী কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করি-লেন,—"মা, আমাকে ক্ষমা কর। আজ আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি। আর সেই বৃদ্ধ দেওয়ান! তাঁর অভি-শাপেই বোধ হয় আমার এ দুর্দ্দশা। তুমি আমার হয়ে তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দাও মা!"

বীণার চক্ষেও জল আসিল। তিনি প্রাণপণ যত্নে কাত্যায়নীর ও নলুর শুশ্রূষায় রত হইলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া মৃত্যুর কবল-কবল-গতপ্রায় বালকের শয্যাপার্শ্বে দিন রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তিনি অবিলম্বে সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া অবসর-প্রাপ্ত দেওয়ান কাশীনাথ বিশ্বাসের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন।

হরিপদ বাবু কাত্যায়নীকে বুঝাইয়াছিলেন যে বীণা ও তাঁহার পুত্রকে দীর্ঘকাল অন্যত্র রাখিতে পারিলে তাঁহারা সম্পত্তি হইতে বেদখল হইবেন এবং পরে সমস্ত সম্পত্তি নলুরই হইবে। কিন্তু ইহা যে ছলনা মাত্র,—তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বীণাকে স্থানান্তরিত এবং হিতৈষী দেওয়ানকে অপসৃত করিয়া উকিল বাবু ক্রমে ক্রমে সমস্ত সম্পত্তি আপন করায়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন,—ইহা কাত্যায়নী এখন চক্ষের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ দেওয়ান কাশীনাথ বিশ্বাস সত্বর তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নলু ও তাহার মাতার জন্য ভাল ভাল চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন।

ডাক্তারগণের সুচিকিৎসা এবং বীণার শুশ্রূষাগুণে কাত্যায়নী আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু নলুর বাঁচিবার কোন সম্ভবনা রহিল না; সমস্ত যত্ন চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইল। কাত্যায়নীর প্রাণের আলোক চির দিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইল।

পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় কাত্যায়নী বৃদ্ধ দেওয়ানকে পূর্ব্বপদে অধিষ্ঠিত এবং বীণার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবনবাসিনী হইলেন।*

শ্রীকুমুদিনী বসু।

---

* আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, এই গল্পের লেখিকা কবি কুমুদিনী বসু মহাশয়া অল্প দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা ছিলেন। তাঁহার রচিত "অমরেন্দ্র" নামক উপন্যাস ও "আভা" নামক কবিতা গ্রন্থ সুখপাঠ্য বলিয়া সাধারণের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত কয়েকটী গল্প ও প্রবন্ধ ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গল্পটী তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। বারান্তরে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ভাঃ সঃ।

স্নেহলতার বিদায়

চলিলাম ! —এ জগতে আমার হ'লনা ঠাঁই ;
পথ ভুলে এসেছিনু,—ফিরে যাই ! ফিরে যাই !
কি সুন্দর এ ধরণী ! কি উল্লাসে ভরপূর !
ফুল ফুটে, নদী ছুটে, বেজে উঠে কত সুর !
আজিকার এ নিশীথে আকাশের কি বাহার !
মায়াবীর মন্ত্রে যেন শূন্যে গাঁথা মণি হার !
কোথায় ভেঙ্গেছে কোন্ নীল-দরিয়ার বাঁধ,—
নীলে নীলে ভেসে যায় আকাশ তারকা চাঁদ !
এমন সুন্দর ধরা – ছেড়ে যেতে কাঁদে প্রাণ ;
তথাপি যেতেই হবে, হেথা মোর নাহি স্থান !
মায়ের অমিত স্নেহ, পিতার মমতা রাশি,
সুন্দর এ ধরণীর শোভন সুষমা হাসি,
আমার শৈশব-চক্ষে না আনিতে স্বপ্ন ঘোর,
চকিতে ভাঙ্গিয়া গেল সাধের স্বপন মোর !
বিধাতার ভুল সৃষ্টি আমি এক মহাপাপ ;
জগতের ঘৃণ্য আমি, আমি এক অভিশাপ !
আমারে চাহেনা কেহ, চাহে—যদি অর্থ পায় !
অর্থ বিনা এ জগতে আমাকে বিলানো দায় !
পিতার বিষণ্ণ মুখ, জননীর দীর্ঘশ্বাস,
দেখেছি শুনেছি সবি, দিবা নিশি বর্ষ মাস,
কত দিন ভাবিয়াছি বিরলে বসিয়া তাই,—
—পথ ভুলে এসেছিনু, ফিরে যাই ! ফিরে যাই !
আজি তবে চলিলাম ! বিদায় গো দেশবাসি !
চির অফুরন্ত থাক্ তোমাদের হর্ষ হাসি !
শুধু, শুধু একবার—এই মোর শেষ বাণী—
ভেবে দেখ—তোমাদের সমাজের যন্ত্রখানি
বেসুর বাজিছে নাকি ? ভুল কোথা নাহি তার ?
তবে কেন 'স্নেহলতা' পুড়ে হয় ছার খার ?
এমন সুন্দরতম—বিধাতার এ ধরায়,
এ কি গো উচিত রীতি—মানুষ মানুষ খায় ?

নীহার।

―――

উপবাস দ্বারা রোগ চিকিৎসা

যতই আধুনিক চিকিৎসকগণ শরীরের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছেন ততই তাঁহারা স্বাভাবিক উপায়ে বিনা ঔষধ প্রয়োগে কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে উপবাস একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

উপবাস দ্বারা রোগ চিকিৎসা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উপবাস আমরা কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক।

কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য (তরল বা কঠিন) অহোরাত্র পান বা ভক্ষণ না করার নাম একদিন উপবাস। খাদ্য দ্রব্য আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি—যথা, আমিষ-জাতীয়, স্নেহ-জাতীয়, শালি-জাতীয়, লবণ-জাতীয় ও জল। উপবাস করিতে হইলে আমিষ, স্নেহ, শালি ও লবণ ভোজন নিষিদ্ধ। কেবল আবশ্যক মত জল পান করা যাইতে পারে। অবশ্য জলের সহিত যে সামান্য লবণ দ্রবভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহাতে উপবাসের বিশেষ কোন বাধা হয় না। তবে রোগবিশেষে পরিস্রুত জল (Distilled water) ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদে "লঙ্ঘন" শব্দ উপবাসের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। লঙ্ঘনের মধ্যে উপবাস ও আরও অন্যান্য প্রকার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে লিখিত হইল

লঙ্ঘন শব্দার্থ—

যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্।

যে কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার দ্বারা শরীর লঘুতা প্রাপ্ত হয় তাহাকেই লঙ্ঘন কহে।

লঙ্ঘন সংখ্যা—

চতু-প্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ।
পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্॥

চারি প্রকার সংশোধন (বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন) পিপাসা, বায়ু, আতপ, পাচন, উপবাস ও ব্যায়াম এই সকল লঙ্ঘন পদবাচ্য অর্থাৎ ইহারা শরীরের লঘুতা সম্পাদনকারী।

লঙ্ঘনের ফল—

লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নীতে দোষে সংধুক্ষিতেঽনলে।
বিজ্বরত্বং লঘুত্বঞ্চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে॥ ইত্যাদি

উপবাস দ্বারা দোষক্ষয় হইলে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে জ্বরনাশ, শরীর লঘু এবং ক্ষুধা হইয়া থাকে।

অসুস্থ শরীরে উপবাস স্বাভাবিক চিকিৎসা

—মনুষ্য ব্যতীত যখন কোন প্রাণীর রোগ হয়—তখনই তাহাদের আহারে অনিচ্ছা লক্ষণটী প্রথমেই দেখা যায়। মনুষ্য মধ্যে প্রায়ই প্রকৃতির এই সাধারণ নিয়মটীর বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। যেখানে যতদূর সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেইখানেই রোগের সময় উপবাসের পরিবর্ত্তে নানারূপ আহার্য্যের ভোগ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। মনুষ্য ভিন্ন প্রাণীরা একমাত্র উপবাস দ্বারাই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোন ঔষধও আবশ্যক হয় না, বা তাহাদের মধ্যে তৈয়ারি কোন প্রকার বলকারক পথ্যও ব্যবহার হয় না। রুগ্ন অবস্থায় তাহারা নিজ হইতেই ভক্ষণ করিতে বিরত হয়। রোগ আরোগ্যের সহিত তাহাদের ভক্ষণ স্পৃহা পুনরায় ফিরিয়া আসে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যাহা অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষে স্বাভাবিক, মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হইবে। কিন্তু মনুষ্য সভ্যতার সহিত বহুদিন যাবৎ এই নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করায় তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে।

রোগের অবস্থায় মনুষ্যকে খাইতে দেওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ যে বিষবৎ কার্য্য করিয়া আরোগ্যকে আরও সুদূরপরাহত করে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে অনেকেই উপবাস দ্বারা রোগ দূরীকরণে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অধুনা উপবাস প্রক্রিয়া রোগ আরোগ্য করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং এইরূপ উপবাস দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সুফল দেখা গিয়াছে।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল আমেরিকাতে ডাক্তার হেন্‌রি ট্যানার চল্লিশ দিন উপবাস দিয়াছিলেন। প্রথম দুই সপ্তাহ তিনি জল পর্য্যন্ত পান করেন নাই। ইহাতে তাঁহার শক্তির হ্রাস হয়, কিন্তু তারপর হইতে যখন তিনি জল গ্রহণ করিতে লাগিলেন তখন ক্রমশঃ তাঁহার শরীরে বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রথমতঃ জল গ্রহণ করিয়া তিনি বাজী রাখিয়া একটী লোকের সহিত দৌড়ান ; এই লোকটীর ধারণা ছিল যে উপবাস করিলে বলক্ষয় হয়। কিন্তু এইরূপ দৌড়ানর পর তাহার ভ্রম দূর হয়। র‍্যাল্টো (Rialto) সহরের ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধ (Ambrose Taylor) বাত রোগাক্রান্ত হইয়া উপবাস করিতে আরম্ভ করেন। বাতরোগ তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলে। প্রথম তিন চারি দিন উপবাস করিতে তাঁহার বড়ই ক্ষুধা বোধ হইতে লাগিল এবং পঞ্চম দিবসে তাঁহার প্রায় পক্ষাঘাত হইয়া গেল। ইহাতে তিনি বড়ই ভীত হইলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে রোগ দূরীকরণার্থ তাঁহার শরীরের স্নায়ু ও পেশীসমূহ যে কার্য্য করিতেছে তাহারই ফলে এইরূপ হইয়াছে। কিছুদিন পরে আবার একবার পক্ষাঘাতের আক্রমণ হয় এবং তাহার পরে আরও একবার পক্ষাঘাতে তাঁহাকে জখম করিয়া ফেলে ; কিন্তু তথাপি তিনি উপবাসে নিরস্ত হইলেন না। আরও কিছুদিন পরে তিনি দেখিলেন যে তাহার বাতগ্রস্ত পদটী বেশ সরল হইয়া পড়িয়াছে এবং অনায়াসেই তিনি তাহা নাড়িতে পারিতেছেন। ২০ দিনের দিন তাঁহার পক্ষাঘাত ও বাতরোগ দুই-ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

মানব-দেহ কতকগুলি কোষের সমষ্টি মাত্র। যখনই এই কোষগুলি কার্য্য করে তখনই ইহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতে থাকে এবং পুরাতন কোষগুলির স্থানে নূতন কোষের উৎপত্তি হয়। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এই সমস্ত ব্যাপারটীকে Metabolism কহে। ক্ষয়প্রাপ্ত কোষ-

গুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব শরীর হইতে দুর করিয়া ফেলা আবশ্যক; নচেৎ এইগুলি বিষে পরিণত হয়। এই জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র আছে যদ্দ্বারা অনাবশ্যক বস্তু শরীর হইতে দুরীকৃত হয়। মল-নাড়ী ও মূত্র-গ্রন্থি দ্বারাই প্রধানতঃ শরীরের ময়লা নিষ্কাসিত হয়। ঘর্ম্মদ্বারাও শরীর মধ্যস্থ বিষ প্রভূত পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরস্থ অনেক বিষ নির্গত হইয়া যায়। সর্দ্দিরূপে নাসারন্ধ্র দিয়াও অপকারী পদার্থসমূহ বাহির হইয়া যায়।

অধিকন্তু আমরা শরীর-বিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে ক্ষয়ের জন্য যেমন কার্য্যের প্রয়োজন সেইরূপ উহার পূরণের জন্য বিশ্রামেরও আবশ্যক। যেখানেই কার্য্য হইতেছে সেইখানেই আবার বিশ্রামের প্রয়োজন। সেই জন্যই ভগবানের রাজত্বে ক্লান্তি নিবারণের জন্য নিদ্রার বিধান। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই শরীরেরই ভিতর ত আমরা এই নিয়মের বৈষম্য দেখিতে পাইতেছি। আমরা যত কালই জীবিত থাকি না কেন তত কালই হৃৎপিণ্ড কার্য্য করিতে থাকে। ইহার কার্য্যের ত বিরাম দেখি না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যদিও আমাদের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭২ বার ধরিয়া সঙ্কোচন ও প্রসারণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে তথাপি প্রত্যেক সঙ্কোচন ও প্রত্যেক প্রসারণের মধ্যে কিছুক্ষণ হৃৎপিণ্ড বিশ্রামলাভ করে।

পূর্ব্বে যে Metabolismএর নিয়ম দেওয়া গেল সেই নিয়মের উপরেই ব্যায়াম ও উপবাস দুইয়েরই ফলাফল নির্ভর করে। যত শীঘ্রই কোষগুলির ক্ষয় হয়, তত শীঘ্রই নূতন নূতন কোষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ব্যায়াম বিষয়েও সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত কার্য্য করা উচিত। কারণ কেহ যদি অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যায়াম করে তাহা হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, ইহাতে শরীরের কোষগুলি এত শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে যে সেইগুলি শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যাইবার সময় পায় না। কেহ যদি অত্যন্ত বেগের সহিত দৌড়ায়, তাহা হইলে আমরা দেখি যে কিছুক্ষণ পরেই সে হাঁপাইতে থাকে এবং তাহার মুখমণ্ডল ও সর্ব্বশরীরের আকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাহার শরীরে যে সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ একত্রিত হয়, তাহা উপযুক্তরূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু যদি এইরূপ দৌড়ানর পর সেই ব্যক্তি কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার শরীরের গ্লানি ও শ্রান্তি সমস্তই দুরীভূত হয়; কারণ ঐ বিশ্রাম সময়ে তাহার শরীরস্থ অতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়।

আমাদের ভোজন বিষয়েও উপর্য্যুক্ত যুক্তি সম্যক্‌-রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধুনিক সভ্যজগতের পদ্ধতি অনুসারে খাদ্য গ্রহণ করায় আমাদের শরীর মধ্যস্থ পরিপাক যন্ত্রগুলির এরূপ পরিশ্রম হয় যে ইহাদেরও বিশ্রামের আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি ইহাদিগকে উপযুক্ত বিশ্রাম লাভে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে আমাদের শরীরে উৎকট উৎকট ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ব্যাধি হইলেই বুঝা উচিত যে আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলির বিশ্রামের প্রয়োজন। এইরূপ ভাবে বিশ্রাম হইলে শরীর মধ্যস্থ বিষগুলি আপনা আপনিই বাহির হইয়া যায় ও দেহও নিরাময় হয়। কিন্তু যদি এই স্বাভাবিক চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া আমরা অন্যায়রূপে ভেষজদ্রব্য প্রয়োগদ্বারা রোগ দমন করিতে যাই তাহা হইলে যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্যই করিয়া থাকি।

এক্ষণে কি কি রোগী বিশেষতঃ উপবাস দ্বারাই আরোগ্য-লাভ করিতে পারে আমরা তাহা বিশদ ভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উপবাসের বিধি ও কতদিন উপবাস করা যুক্তিসঙ্গত, সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া লইব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দুই তিন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৭০।৮০ বা ততোধিক দিবস উপবাস করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন্‌ রোগে কত দিন উপবাস করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। রোগীর

শরীরের সামর্থ্য ও রোগের অবস্থার উপরে উপবাসের সময় বেশী ও কম হয়। কিন্তু সাধারাণ লোকেও যাহাতে চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত উপবাস করিতে পারে সেই জন্য আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

শরীরের কোন্ কোন্ অবস্থায় উপবাস করা উচিত—যখন আমরা বুঝিতে পারি যে কেবলমাত্র আহার্য্যের ভোগ প্রাচুর্য্যবশতঃ রোগ হইয়াছে অর্থাৎ শরীরে মেদ বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রস্রাবে শর্করা বা এলবুমেন হইয়াছে, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হইয়াছে, অন্ত্র মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক পচন জন্য উদরাময় হইয়াছে, অজীর্ণতা জন্য বুকজ্বালা উদ্গার ইত্যাদি উপসর্গ সদাই কষ্ট দিতেছে, প্রস্রাব ঘোলা হইয়াছে বা মূত্রনালীতে ময়লা জমায় তাহাদের আক্ষেপ জন্য কষ্ট (Renal colic) হইতেছে,—এই সকল অবস্থায় উপবাসের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। এই সকল রোগে অধিক দিন যাবৎ উপবাস আবশ্যক হয়।

কিন্তু যদি রোগী কৃশ ও দুর্ব্বল হয় এবং তাহার অজীর্ণতার সকল লক্ষণই উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে কেবল ২।৩ দিন উপবাস করিতে পারিবে এবং উপবাসের দ্বারা তাহার পরিপাক-যন্ত্রাদিকে বিশ্রাম দিতে সক্ষম হইবে। এই বিশ্রামের ফলে পরিপাক-যন্ত্রাদিতে নব বলসঞ্চার হইবে এবং পুনরায় অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর লঘু পথ্য দ্বারা তাহার দেহে অধিক বল সঞ্চয় হইবে এবং রোগীও শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে।

যাবতীয় ক্ষয়রোগে উপবাস দ্বারা চিকিৎসা নিষিদ্ধ। তবে কেবলমাত্র পরিপাক যন্ত্রাদিকে বিশ্রাম দিবার জন্য অল্প সময়ের জন্য উপবাস করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

উপবাসকালীন শরীরের অবস্থা—সাধারণতঃ মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ ২।৩।৪ বার পর্য্যন্ত আহার করিয়া থাকে। নিজ নিজ আহারের সময় আসিলেই একটু ক্ষুধা বোধ হয় এবং কিছু খাইবার পরই তাহা নিবৃত্ত হয়। ইহাকে অভ্যাস ক্ষুধা (Appetite habit) বলা হইয়া থাকে। শরীর রোগাক্রান্ত হইলে এই ক্ষুধা বোধ লোপ পায়, কিন্তু আমরা প্রায়ই অভ্যাসবশতঃ ক্ষুধা না থাকিলেও খাইয়া থাকি। এই প্রকারে আমরা নিজে নিজেই নিজ রসনার পরিতৃপ্তির সহিত রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকি এবং অকাল-বার্দ্ধক্য, জরা ও মৃত্যুকে শীঘ্রই আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হই।

উপবাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে চিত্তে দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প ব্যতীত এই মহাব্রত কদাপি সমাধা হইবে না। সর্ব্ব প্রথমে মনে সঙ্কল্প করিতে হইবে—যে অত্যধিক আহারে আমার শরীরে রোগ প্রবেশ করিয়াছে, তাই অনাহার দ্বারা সেই শরীরকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। ক্ষুধার সময় উপস্থিত হইলে, সেই সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত—অন্য কার্য্যে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিতে হইবে;—ইহাই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সঙ্কল্প। পিপাসা বোধ হইলে ঈষদুষ্ণ জল আবশ্যক মত পান করিবে। জল প্রত্যেক ঘণ্টাতেও পান করা যাইতে পারিবে। প্রথমতঃ ২।৩ দিন বিশেষ কষ্ট বোধ হইবে, ক্ষুধা বড়ই কষ্ট দিবে এবং খাইবার ইচ্ছাও বলবতী হইবে। শরীরের মধ্যস্থিত রোগের বিষের অনুপাতে জিহ্বা অপারস্কৃত হইবে, মুখে দুর্গন্ধ হইবে এবং ক্ষুধাও ক্রমশঃ লোপ পাইবে এবং খাদ্যদ্রব্যে অরুচি আসিবে। পরে উপবাস দ্বারা শরীরস্থ বিষ বহির্গত হইয়া গেলে পর জিহ্বা পরিষ্কৃত হইবে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হইবে এবং পুনরায় খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এই ক্ষুধা অতি সামান্য স্বাভাবিক আহার্য্য দ্বারা নিবৃত্ত হইবে ও তাহাতেই রোগী আনন্দ বোধ করিবে। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই উপবাস শেষ করা উচিত।

কেবল যে উপবাস দ্বারা রোগ আরোগ্য হয় তাহা নহে। এই সঙ্গে স্বাভাবিক অন্যান্য বিধিও প্রয়োগ করিতে হয়। রোগী যতদূর সম্ভব মুক্ত বায়ুতে অবস্থান করিবে। যথেষ্ট নিদ্রা যাইবে এবং প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যালোকও ভোগ করিবে।

উপবাসের সময় প্রত্যহ সহমত স্নান করিতে হইবে। শরীর দুর্ব্বল হইলে কেবলমাত্র গাত্রমার্জ্জনা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিবে। ক্রমশঃ ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা বেশ

করিয়া স্নান করিতে পারিবে ও সহ্য হইলে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল লাভ করিবে।

প্রচুর পরিমাণে জল খাইলে উপবাসের উপকারিতা পূর্ণমাত্রায় লাভ করা যায়। এই জল দ্বারা শরীরস্থ পেশী ও রক্তের শিরাসমূহও বিধৌত হয় এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ ক্লেদসমূহ পরিষ্কৃত ও শরীর হইতে নিষ্কাসিত হইয়া যায়।

উপবাসের অবস্থায় কোষ্ঠ স্বভাবতঃই কঠিন হয় এবং ক্রমশঃ বদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পেট পরিষ্কার রাখা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। এই জন্য ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা প্রত্যহ অন্ত্র ধৌত করা উচিত।

সময় সময় উপবাসের প্রথম কয়েকদিন পরিপাক-যন্ত্রমধ্যে পূর্ব্বকার যে সকল খাদ্যদ্রব্য থাকে তাহারা অস্বাভাবিকরূপে শীঘ্রই পচিয়া উঠে ও অনেক গ্যাস উৎপন্ন করে। এইজন্য পেটে বেশী কামড়ানি হইতে পারে। ইহার প্রতিকারের জন্য পেটে গরম জলের সেঁক ও ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা অন্ত্রধৌতি প্রভৃতি করিবে।

কখন কখন উপবাসকালে রোগীর সামান্যরূপ শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। অপর পক্ষে যাহারা দুর্ব্বল ও যাহাদের রক্তাল্পতা আছে তাহাদের ৯২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শরীরের তাপ কম হইয়া যায়।

উপবাসকালে অনেকের শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহাতে খুব দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের দুর্গন্ধ হইতে পারে। এই ঘর্ম্ম দ্বারা শরীরস্থ রোগের বিষ সকল বহির্গত হইয়া যায়।

৪.৫ দিন উপবাসের পর অনেকের মুখমধ্যস্থিত লালার পরিবর্ত্তন হয়। মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, লালা ঘন, চটচটে ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পিত্ত বমন হইতেও দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ দ্বারা কোন প্রকার ভয় নাই।

উপবাসকালীন বিপদ—সাধারণতঃ উপবাসে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তবে যদি নাড়ীর গতি দ্রুত হয় বা খুব মৃদু হয়, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং সেই সময়ে উপবাস ভঙ্গ করা উচিত।

যদি মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং উপবাস করিতে ভয় বোধ হয় তাহা হইলে উপবাস ভঙ্গ করিবে। অধিক দুর্ব্বলতা বোধ হইলে অর্থাৎ সামান্য চলাফেরা করিতে কষ্ট বোধ হইলে এবং রোগীকে বাধ্য হইয়া সদা সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে হইলে উপবাস ক্ষান্ত করিবে।

যখন শরীরস্থ সূক্ষ্ম অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং জীবনীশক্তি কমিতে থাকে তখন উপবাস বন্ধ করা উচিত।

যখন দুই দিন উপবাসের পর প্রত্যহ দুই তিন পাউণ্ড পর্য্যন্ত শরীরের ওজন কমিয়া যায় তখন উপবাস ভঙ্গ করা বিধেয়।

সাধারণতঃ উপবাসকালে মনের অবস্থা অতি সুন্দর থাকে—মন বেশী কার্য্যক্ষম হয় এবং জটিল বুদ্ধির কার্য্য সহজে সমাধা হয়। কিন্তু যদি মনের ভাব বিকৃত হয় এবং মনের তেজ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে উপবাস বন্ধ করিবে।

উপবাসকালীন অনিদ্রা—অনেকের উপবাসকালে নিদ্রা আসে না। তাহাদের সমস্ত শরীর মধ্যে এক প্রকার টান বোধ হয় এবং তাহারা নিদ্রার জন্য শরীরকে এলাইয়া ফেলিতে পারে না। যথেষ্ট জলপান করিলে বা গরম জলে স্নান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং সহজেই নিদ্রা আবির্ভূত হয়।

উপবাসকালীন চিকিৎসা

উপবাসকালে কোন ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। তবে রোগীকে যথেচ্ছ মুক্তবায়ু সেবন, প্রচুর পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল পান, সহ্যমত স্নান ও অন্ত্রধৌতি করিতে হইবে। কোন প্রকার বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা একেবারে উচিত নহে। ইহার দ্বারা বিশেষ কুফল দেখা গিয়াছে।

কত বয়স পর্য্যন্ত উপবাস করা উচিত

সাধারণতঃ সকলের বিশ্বাস যে যৌবনাবস্থায় অর্থাৎ যখন শরীরে বেশ বল থাকে, তখন উপবাস করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। শিশু ও বৃদ্ধেরা একেবারে উপবাস

করিবে না। কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। সদ্যোজাত শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই উপবাস দ্বারা কঠিন কঠিন মৃত্যুরাত্মক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। রোগবিশেষের চিকিৎসার সহিত ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

উপবাসকালের বিস্তৃতি নিরূপণ

কোন্ রোগে কতদিন পর্য্যন্ত উপবাস করিলে রোগ আরোগ্য হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে দুর্ব্বল, শিশু ও বৃদ্ধেরা যে কোন রোগের জন্যই উপবাস করুক না কেন, তাহারা ২।৩ দিন যাবৎ উপবাস করিবে কিম্বা ১ দিন উপবাস দুই দিন আহার—দুই দিন উপবাস ৪ চারি দিন আহার, এই প্রকারে আস্তে আস্তে শরীর হইতে রোগের বিষ সকল নিষ্কাসিত করিবে। স্থূলতা, বাত, মধুমুত্র, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগের জন্য অধিক কাল পর্য্যন্ত উপবাস করা উচিত। কি কি লক্ষণ উপস্থিত হইলে উপবাস বন্ধ করা উচিত তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সমাচার।

উপাসিকা

কখন দেবতা হারাল কে জানে
খেলা-ঘরে সুখ-স্বপনে ;—
পড়ে কি না পড়ে ছায়াটী ধেয়ানে
জাগে কি না জাগে নয়নে!
তবু বালিকার সারা প্রাণ-মন
এ ভুবন হতে করি আহরণ
করিয়াছে হায়, সুখে নিবেদন
সে অতুল দেব-চরণে!
কখন দেবতা হারাল কে জানে
খেলা-ঘরে সুখ-স্বপনে!

২

লহরের মত কত সাধ-আশা
মিলায় মরমে বিকাশি'—
নীরবে জাগিয়া কাঁদে ভালবাসা
যেনগো কাহারে তলাসি'!
জগতের গান হাসি ও কৌতুক,
পলে পলে চাহে আকুলিতে বুক,
অটল বালিকা রহে হেঁট-মুখ
সুখ-দুখ সব বিনাশি'!
লহরের মত কত সাধ-আশা
মিলায় মরমে বিকাশি'!

৩

অশন ভূষণ সকলি তেয়াগি'
যৌবনে যোগিনী বালিকা ;—
যেন ভোলানাথ দেবতার লাগি'
অযতনে গাঁথা মালিকা!
সবাকার সেবা, সবাকার কাজ,
যেন আপনার হ'ল তার আজ,
বাঁধন-বিহীনা তবু ধরা মাঝ
অতুলন ব্রত-সাধিকা!
অশন ভূষণ সকলি তেয়াগি'
যৌবনে যোগিনী বালিকা!

৪

একের অভাবে সকলি ঘুচেছে
শূন্য বিশাল অবনী ;—
জীবনের আলো সবি তো নিভেছে
জীবন কেবলি যায় নি!
ধূপ নিজে দহি' সবারে মাতায়
তেমতি কি বালা? নাহি বুঝি হায়,
অসীম সাগরে কিবা ভেসে যায়
কাণ্ডারী-হীন তরণী!
একের অভাবে সকলি ঘুচেছে
শূন্য বিশাল অবনী!

৫

কবে ফুল-কলি উঠিয়াছে ফুটি'
সে খবর নিজে রাখে না!
কবে দেব-পায় পড়িবেরে লুটি'
এ বিনে যে কিছু ভাবে না!
কি উদাস ভাব যুগল নয়নে,
কি উদাস ভাব মৃদুল বচনে,
বাসনা-তিয়াস লুটায় চরণে,
পুলক কেমন জানে না!
কবে ফুল-কলি উঠিয়াছে ফুটি'
সে খবর নিজে রাখে না!

৬

নিঠুর মানব না জানে করিতে
আদর-যতন তাহারে,—
কেহ নাই কভু ভুলে মুছাইতে
আকুল নয়ন-আসারে!
তাহার সোহাগ, তার অভিমান,
চিরতরে গেছে হয়ে অবসান,
অপমানে মানে বিধাতার দান
বিপুল বসুধা মাঝারে!
নিঠুর মানব না জানে করিতে
আদর-যতন তাহারে!

৭

ত্রিলোকের যত শোভা আহরিয়ে
গড়েছে মানস-প্রতিমা;—
অরপিল তায় ভুবন ছানিয়ে
সকল করুণা মহিমা!
তরুণ মনের গোপন কাহিনী,
বিষাদ-বেদনা যাতনাদায়িনী
তারে কহে বালা দিবস-যামিনী
তা'রি সনে করে গরিমা!
ত্রিলোকের যত শোভা আহরিয়ে
গড়েছে মানস-প্রতিমা!

পতি-দেবতার সে স্মৃতি জপিয়ে
উপাসিকা সদা রহে গো!
নিমেষে নিমেষে কালে অপেখিয়ে
বিফল-জীবন বহে গো!
চির-মিলনের দেশ সে কোথায়,
চেয়ে আছে বালা তা'রি পানে হায়,
ধরণীর শত নিদারুণ ঘায়
কথাটী যে নাহি কহে গো!
পতি-দেবতার সে স্মৃতি জপিয়ে
উপাসিকা সদা রহে গো!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জলন্দর কন্যা-বিদ্যালয় *

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ কর্তৃক জলন্দরে কন্যা-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমে এটী বালিকাদের দৈনিক স্কুলই ছিল; ক্রমশঃ ইহার সঙ্গে কন্যাশ্রম (বোর্ডিং), বিধবাশ্রম ও অনাথাশ্রম যুক্ত হওয়াতে বিদ্যালয়টীকে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাপ্রদ ও উপকারী করে' তোলা হয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরে এখানে ৪০৫টী বালিকা ও বয়স্থা মহিলা শিক্ষা পাচ্ছে। তার মধ্যে ১৫০টী কন্যাশ্রমে থাকে, ৫০টি বিধবাশ্রমে ও ১০০টী অনাথাশ্রমে বাস করে। অবশিষ্টগুলি দৈনিক ছাত্রী। এই মহৎ শিক্ষাকার্য্যে ১০ জন পুরুষ শিক্ষক ও ১৫ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। শিক্ষয়িত্রীরা প্রায় সকলেই সেখানকার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী, সেজন্য তাঁরা ঐ কাজ ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করে' উহার উন্নতির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আর্য্যসমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে' বা ভিক্ষা দ্বারা চাঁদা তুলে এই স্কুলটী চালাচ্ছেন। বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ বড় হওয়াতে স্কুল-কমিটি জলন্দর সহরের এক ক্রোশ দূরে প্রায় ৫০ বিঘা জমি

* গত ডিসেম্বর মাসে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শেষ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে পঠিত। "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

গিয়েছেন। সেখানে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের জন্ম নানা স্থান হ'তে অর্থ সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছেন। এ দেশ থেকেও তাঁরা প্রায় দশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে গেছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের ন্যায় তাঁদেরও মুখ্য বাক্য—"ভগবানে নির্ভর করে' যে যার কর্ত্তব্য করে' যাও, তিনিই ফলাফলের কর্ত্তা।"

জলন্ধর-কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের ধর্ম্ম, নীতি ও ব্রহ্মচর্য্য শিখান হয়। কন্যা-শ্রম ও বিধবাশ্রমের মেয়েরা প্রত্যহ বেদপাঠ, স্তবগান প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করতে বাধ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে শিখে। এইরূপে আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ হওয়াতে এই অল্প সময়ের মধ্যে পাঞ্জাবী নারীদের ভিতরে যে কিরূপ স্ত্রীশক্তি জেগে উঠেছে তা দেখলে বাস্তবিক আমরা আনন্দের সঙ্গে আশ্চর্য্য বোধ করি। এই ১৮ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-জাতির যেরূপ উন্নতি হয়েছে, বাঙ্গালা দেশে ৬০ বৎসরে তা হয় নাই।

ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা কুমারী ও বিধবা কন্যারা অল্প বয়স হতেই ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বদেশের জন্যে ও স্বজাতির উন্নতির জন্যে সুখারাম বিসর্জ্জন দিতে পারেন। আর্য্যসমাজের শিক্ষিতা মহিলারাই সর্ব্ব প্রথম প্রচারিকা হয়ে মহলায় মহলায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়ে মূর্খ ও দরিদ্র নারীদের মধ্যে ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন। সেই সমাজের মেয়েরাই কত কষ্ট ও অসুবিধা সয়ে দেশে দেশে চাঁদা-সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছেন। কি তাঁদের শারীরিক ক্ষমতা! কি তাঁদের মনের তেজ! কি তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে, বিনা আত্মবিসর্জ্জনে, বিনা ত্যাগে আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এ শক্তি কোথায় পাব?

ঐ পাঞ্জাবী মেয়েদের উদাহরণ দেখে কি আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি না যে আর্য্যসমাজের জলন্ধর-মহা-বিদ্যালয়ে যে প্রথা অবলম্বন করে' স্ত্রীশিক্ষা চলছে উহাই ঠিক পথ? আমাদেরও সেই শিক্ষাপন্থা ধরে' চলা উচিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে পাঞ্জাবের চেয়েও কত বেশি শিক্ষা বিস্তার হয়েছে, এ প্রদেশে শতকরা ৪ জন মেয়ে লিখতে পড়তে পারে, সে দেশে ২০০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র। আমাদের মধ্যে কত মেয়ে উপাধি পেয়েছেন, কত বালিকা সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা হয়েছেন, কতজন ডাক্তারও হয়েছেন—কিন্তু বঙ্গমহিলার সে মনের বল, হৃদয়ের উচ্চতা, প্রাণের গভীরতা কোথায়? প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষকে মানুষ করা, মানুষের ভিতর মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা, মানুষকে পার্থিব লাভা-লাভের উপরে তুলে দেবতার আসনে বসান। ঐ পাঞ্জাবী মহিলাগুলি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দ্বারা দেহের শক্তি ও আত্মার তেজ লাভ করেছেন, যাহা দ্বারা তাঁরা শত শত পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছেন, কত পথ হেঁটে পল্লীতে পল্লীতে পরিদর্শন করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মিতাহারে কঠোর শয্যায় কত দিবারাত্রি যাপন করছেন। কিন্তু তাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, দেশের কাজের জন্য, নারীজাতির উদ্ধারের জন্য, তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতা ভারতীয় জননী গঠন করা তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এত শিক্ষিতা হয়ে ও এত শিক্ষার সুযোগ পেয়েও পাঞ্জাবী ভগিনীদের ন্যায় মনের বল ও হৃদয়ের তেজ সঞ্চয় করতে পারছি না কেন? প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে একটা কথা বল্‌তে হ'লে আমরা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি, রাস্তায় এক পা চল্‌তে হলে আমাদের যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়! তাঁদের সাদাসিদে পরিচ্ছদের কাছে আমাদের পোষাকটা পর্য্যন্ত যেন আড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়! এই সব দেখে স্পষ্টই বোধ হয়, আমরা যে-পথ ধরে' চলেছি, ভারতীয় নারীর পক্ষে তাহা প্রকৃত আদর্শস্বরূপ ঠিক পথ নয়। এ পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা কেবল পাশ্চাত্য বা বিলাতীর অনুকরণেই হয়েছে; অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা ইংরেজী স্কুলে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে শিক্ষা পাচ্ছেন। তার ফলে অনেক মেয়ে ড্রইংরুমে অতি সুন্দর ইংরেজী কথা কইতে ও পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতে পারেন; অনেক মহিলা বিলাতী আদবকায়দায়

অতি সুন্দর ভাবে নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পারেন—কিন্তু জীবনের কঠোর ব্রতসাধনে জয়ী হতে পারবেন কয়জন? প্রকৃত আদর্শ-নারীর উচ্চাসনে বসবার যোগ্য হয়েছেন কয়জন?

অবশ্য আমি ২।৪টী বঙ্গমহিলা বাদ দিচ্ছি, যাঁরা সকল বিষয়েই পারদর্শিনী হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়েদের দেখে আমাদের ইহা স্পষ্ট বোধ হয়েছে যে পাশ্চাত্য অনুকরণে শিক্ষা আমাদের ভারতীয় রমণীর পক্ষে কিছুমাত্র হিতকরী নয়। আমরা বহুকাল অশিক্ষা ও অবরোধের মধ্যে থেকে দেহের শক্তি, মনের বল ও সাহস হারিয়েছি। আমরা যে-শিক্ষা দ্বারা সেই স্ত্রীশক্তি ফিরে পাব যার চর্চ্চায় ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মভাব আমাদের মজ্জাগত হয়ে যাবে, যে-সংযমের দ্বারা আমরা সকল অবস্থায় নিজেদের সমান ভাবে চালাতে পারব, যাতে আমাদের সংকীর্ণ মন প্রশস্ত ও উদার হয়ে সকলকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারবে—যাতে আমরা পরস্পরের দোষ ক্ষমা ও গুণ গ্রহণ করতে শিখব—সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিক্ষাপ্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে।

পাঞ্জাবী মেয়েদের দেখে ইহাও স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, আমাদের এ প্রদেশের নারীর উচ্চশিক্ষা বাহিরের দিকে খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু আপনারা তলিয়ে দেখবেন ইহা অন্তঃসারশূন্য। এ শিক্ষা দ্বারা আমাদের মনের বল ও আধ্যাত্মিক শক্তি না বেড়ে আরো কমে যাচ্ছে। আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের নারীদের তুলনায় যতই শিক্ষার অভিমান করি না কেন, যতদিন না আমরা বর্ত্তমানের সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী বর্জ্জন করে' ভারতীয় বা প্রাচ্য ভিত্তির উপর শিক্ষাপ্রথা স্থাপিত করব, আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ করব, ততদিন আমাদের প্রকৃত শিক্ষা বা উন্নতি কখনই হতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে ২।১টী মেয়ের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু জাতিগত ভাবে বাঙ্গালীমেয়েরা কখনই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

উপসংহারকালে মাননীয় লর্ড বিশপের কথাগুলি উদ্ধৃত না করে' থাকতে পারছি না। গত সপ্তাহে ডায়োসিসন বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাইজ-বিতরণ উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন,"ভারতীয় নারীদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী কখনই ঠিক হবে না। আদর্শ-রমণীর উদাহরণ খুঁজবার জন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোন দেশে যাবার দরকার নাই। এ দেশের মহিলারা যে রকম উচ্চ ধর্ম্মের, সতীত্বের ও শাসনকার্য্যের পর্য্যন্ত আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, সে রকম জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। সেই সব উন্নত নারীচরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের অনুসরণ করে' চললেই বর্ত্তমান ভারতীয় কন্যাদের শিক্ষা যথেষ্ট ফলপ্রদ হবে।"—তিনি বিদেশী হয়েও বুঝেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাচ্য মহিলাদের পক্ষে কখনই প্রকৃত উপকারী হতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা অনেক সময় ছায়াটা ধরে প্রকৃত বস্তুকে হারিয়ে ফেলি। সে কারণে প্রথম থেকেই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল যাতে পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন ক'রে বাঙ্গালী মেয়েদেরও তাঁদের মত শক্তিশালিনী ক'রে গড়তে সক্ষম হয়, আমাদের সকলেরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

বনলতা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(কার্ত্তিক সংখ্যার পর)

উইল কেরী ইউষ্টেস্ ও জেস্যুইট্‌দ্বয়ের সন্ধানে যেখানে গিয়াছিলেন সেই স্থানটি নিতান্তই দুর্গম। কিন্তু সেখান হইতেও তাহারা সহজে অব্যাহতি পায় নাই। ইউষ্টেস্‌দের সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আরো দুইটি লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত রোজের স্বপ্নবৃত্তান্ত ও যাদু-মন্ত্রাভিজ্ঞা লুসির সহিত তাহার কথোপকথনের বিবরণ বোধ হয় পাঠকপাঠিকা ভুলেন নাই। সেই সংকল্পানু-সারে রোজ গভীর নিশীথে নদীতীরে উপস্থিত হইল। পার্ব্বত্য নদী, পাহাড়ের নীচ দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তীরভূমি নিতান্ত দুর্গম। এক স্থানে একটা খাটের

ঘাট আছে বটে কিন্তু তীর হইতে সেখানে নামা সহজসাধ্য নহে। সেই ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা থাকে, লুসির স্বামী তাহাতে চড়িয়া মাছ ধরে।

গভীর রজনী, ঈষৎ চন্দ্রালোকে জলস্থল আলোকিত। লুসির নির্দ্দেশ অনুসারে রোজ তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য সেই দুর্গম নদীর ঘাটে উপস্থিত। লুসিও ঠিক সেই সময়েই নিজেও সেখানে উপস্থিত হইল। লুসি রোজকে বলিল, "বাছা, তোমার কোন চিন্তা নাই, এই নিশুতি রাতে কেউ আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার স্বামী নাক ডাকাইয়া বিছানায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি ছাড়া আর জনপ্রাণী রাত্রে এদিকে কখনো আসে না। কিন্তু একি গো! আমাদের নৌকাখানি যে ঘাটে দেখিতেছি না! ওমা, আমার নৌকা কি হইল?"

একটু দূরে একটা স্থানে নৌকাখানি দেখা যাইতেছিল, রোজ লুসিকে তাহা দেখাইয়া দিল। লুসি বলিল, "দেখ, কুড়ে বুড়োর আক্কেল! এদিকে এতটুকু বাহিয়া আনিতে কষ্ট হইবে বলিয়া ওখানেই নৌকাটা ফেলিয়া গিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আজ মজাটা দেখাব! চল ত দেখি, নৌকাখানা ভাল করিয়া বাঁধিয়া গিয়াছে কিনা!"

লুসি ও রোজ নৌকার নিকট গেল। লুসি বলিল, "হাঁ, বেশ শক্ত করিয়াই বাঁধিয়াছে বটে! কিন্তু একি! দাঁড় বৈঠা সব যে নৌকার উপর পড়িয়া রহিয়াছে! হায় হায়! এই কুড়ের সঙ্গে আমি আর পারিলাম না! এতক্ষণ যে এগুলি চুরি যায় নাই এই ঢের! যাও বাছা, তুমি আর দেরী করিও না, রাত ঠিক দুপুর হইয়াছে। আর বিলম্ব না করিয়া তিন বার নদীর জলে ডুব দেও, যে মন্ত্রগুলি বলিয়া দিয়াছি, চোখ বুজিয়া তাহা আওড়াও, তারপর আয়নাখানিতে কার মুখ ভাসিয়া উঠে দেখ। যার মুখ দেখিবে সেই তোমার বর। আমি নৌকায় বসিয়া থাকি, তুমি একেলা একটু দূরে যাইয়া স্নান কর, একেলাই যাইতে হয়, কিছু ভয় নাই, আমি এখানেই আছি।"

[illegible] রোজ লুসির উপদেশানুসারে একটু দূরে স্নান করিতে [illegible] আয়নার দিকে মাত্র চাহিয়াছে, এমন সময় তীরে দ্রুতগামী অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া সে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং খুব তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া উচ্চ তীরের নীচে একটা গহ্বরের মত স্থানে লুকাইল। অশ্ব আরোহী লইয়া নৌকার দিকে চলিল। সেই স্থান হইতে গলা বাড়াইয়া রোজ দেখিল, দুইটি লোকে ঘোড়া হইতে নৌকার নিকট নামিল এবং ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গীয় অপর দুইটি লোক সহ নৌকায় উঠিল। লুসি নৌকায় শুইয়া ছিল, লোক দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং সেই নীরব নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া কঠোর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "হতভাগা চোরেরা, গরীবদের নৌকা চুরি না করিলে বুঝি তোদের চলে না!"

আগন্তুকগণ ভয়ে থতমত খাইয়া গেল। একজন বলিল, "ওরে, নৌকায় একটা উপদেবতা শুইয়া আছে!"

আগন্তুকদিগের মধ্যে লুসির স্বামীও ছিল, সে বলিল, "উপদেবতা হইলে ত ভালই ছিল, তাত নয়, এ যে আমার স্ত্রী! সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

লুসি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, শীঘ্র বাড়ী যাইয়া শুইয়া থাকিতে তাহাকে আদেশ করিল। চারিজনের মধ্যে আর একজনকে লুসি চিনিত। তাহাকে পোপের দলের লোক বলিয়া লুসির বরাবর সন্দেহ ছিল। স্বামীকে এই রাজদ্রোহী দলের লোকের সঙ্গে দেখিয়া তাহার ভয়ও হইল। আগন্তুকদিগের ভীতি প্রদর্শন, আস্ফালন—কিছুতেই লুসি থামিল না। সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, "বিশ্বাসঘাতক, তুমি এই সকল রাজদ্রোহীর সঙ্গে মেশামেশি কর, তাদের সাহায্য কর, এই জন্যই আজ নৌকা ঘাটে না নিয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছ? আরে হতভাগারা, তোরা আমাকে ভয় দেখাস্! তোরা কি স্ত্রীলোকের গায় হাত তুলুবি?" এই বলিয়া লুসি একখানা দাঁড় তুলিয়া সবেগে তাহা ঘুরাইতে লাগিল। ফাদার পার্সন্সের হাটুতে দাঁড়ের আঘাত লাগিল, তিনি চেঁচাইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। লুসির স্বামী বলিল, "লুসি, লুসি, তুমি কি পাগল হইয়াছ? এঁদের পার করিয়া দিলে এঁরা আমাকে দশ টাকা দিবেন।"

"দশ টাকা! তুমি কি মানুষ না গাধা! দশটী টাকার লোভে তুমি এমন কাজ করিবে! পঞ্চাশ টাকার কমে তোমার এমন কাজ করা উচিত?"

ফাদার কাম্পিয়ান তখন বলিলেন, "দেও দেও, পঞ্চাশ টাকাই উহাকে দেও।" তাড়াতাড়ি তাহারা লুসির হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিল। অগৌণে নৌকা বন্ধনমুক্ত হইল। কিন্তু নৌকা ভাসাইতে না ভাসাইতেই অদূরে অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল। রক্তাক্ত দেহে ইউষ্টেস্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘোড়া হইতে নামিল। তাহার এই দশা দেখিয়া সকলে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রোজ ইউষ্টেসের মুখ দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সমবেদনায় তাহার নারী-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নৌকা চলিয়া গেলে লুসি রোজকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দর্পণে কিছু দেখিতে পাইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় রোজ উত্তর করিল, "কিছুই দেখি নাই, কিন্তু মিঃ ইউষ্টেসের রক্তাক্ত মুখ যেন আমার চক্ষে ভাসিতেছে।"

লুসি বলিল, "সে ত আর আয়নায় দেখ নাই, বোধ হয় কোন বিদেশী লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হইবে, তাই দূর হইতে তাহার আত্মা আসিতে দেরী হইয়াছে। ইউষ্টেস্ ত ক্যাথলিক পুরোহিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ কি করিয়া হইবে?"

রোজ বলিল, "না লুসি, মিঃ ইউষ্টেসের সঙ্গে বিয়ে হইলেও আমার দুঃখ নাই।" তারপর ইউষ্টেসের সম্বন্ধে সকল কথা লুসির নিকট বলিতে বলিতে উভয়ে বাড়ী ফিরিল। অল্পক্ষণ পরেই উইল কেরী নদীতীরে উপস্থিত হইল। (ক্রমশঃ)

পূর্ব্ববঙ্গ

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি

(Eastern Bengal Women's Home Reading Society.)

উদ্দেশ্য—যে সকল স্ত্রীলোক অধিক দিন, অথবা একবারেই বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পান না, তাঁহাদিগকে অধ্যয়নে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরীক্ষা-প্রণালী—প্রতি বৎসর জানুয়ারী, মে ও আগষ্ট এই তিন বার সমিতির নির্দ্ধারিত পরীক্ষার বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশ্নপত্র মুদ্রিত হইয়া পরীক্ষার্থিনীদিগের নিকট প্রেরিত হইবে। পরীক্ষার্থিনীগণ এপ্রিল, আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর সমিতির কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। প্রধানতঃ সমিতির নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক হইতেই প্রশ্ন নির্ব্বাচিত হইবে। পরীক্ষার্থিনী-উত্তর প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে যে কোন পুস্তক ও আত্মীয় বা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু উত্তর লিখিবার সময় পুস্তক বা কোন লোকের নিকট হইতে কোন সাহায্য লইতে পারিবেন না। উত্তরগুলি নিজ ভাষায় ও নিজের হস্তাক্ষরে লিখিতে হইবে। প্রশ্নগুলি এমন ধরণের হইবে যে, তাহার উত্তর দিতে হইলেই বেশ চিন্তা করিয়া পাঠ করিতে হইবে, নানা দৃষ্ট বিষয় হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইবে এবং অভিজ্ঞ আত্মীয়দিগের নিকট হইতে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে হইবে। এই সকল উপায়ে উত্তর সংগ্রহ করিলে নিশ্চয়ই পরীক্ষার্থিনীগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে।

প্রতি বারের উত্তরগুলি সংগৃহীত হইলে পরীক্ষকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া নম্বর দিবেন। বৎসরের তিন বারের উত্তর পরীক্ষা করিয়া উত্তীর্ণা মহিলাদিগের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে এবং বৎসরান্তে তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পরীক্ষার্থিনীগণ আবেদনের ফারম ও পাঠ্যতালিকার জন্য নিম্নঠিকানায় অর্দ্ধ আনার টিকেটসহ চিঠি লিখিলেই ফারম ও তালিকা প্রাপ্ত হইবেন। ফারম পূর্ণ করিয়া তাহার সঙ্গে অর্দ্ধ আনার টিকেট পাঠাইলেই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থিনীর নিকট প্রেরিত হইবে।

সমিতির কার্য্যপ্রণালী।

অধ্যক্ষ সভা—ঢাকা সহরে সমিতির প্রধান কার্য্যালয় থাকিবে। সমিতির কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত

[illegible] এই সমিতির নিম্নলিখিত কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট বা সভানেত্রী—মিস গ্যারেট, ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেকট্রেস্।

সহকারী সভাপতি—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব এম, এ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

সম্পাদিকা—শ্রীমতী সরযুবালা দত্ত।

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিত্র বি, এ, বি, টি, অধ্যাপক গবর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

জেলা কমিটি—সমিতির কার্য্য সুচারু রূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলায় জেলায় জেলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আশা করা যায়, এই সমিতির সহিত যে সকল সমিতির উদ্দেশ্যের একতা আছে তাঁহারাও ইহার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন।

সভ্য—একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি বার্ষিক অন্ততঃ এক টাকা চাঁদা দিলে অধ্যক্ষ সভার [illegible] তাঁহাকে সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

শ্রীসরযুবালা দত্ত
সম্পাদিকা, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি।
উয়ারী, ঢাকা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহিলার আবিষ্কার।—সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর বুদ্ধি কম, মস্তিষ্ক চালনার শক্তি অল্প। কিন্তু নিম্নে যে কয়েকটি রমণীর আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করা হইল, তাহা দেখিয়া হয়ত সে বিশ্বাস কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইবে।

(১) হারিয়েট্ হস্‌মার নামক একটি মহিলা চুম্বকের সাহায্যে প্রকাণ্ড ধাতুখণ্ড উত্তোলন প্রণালী, এবং চুন হইতে প্রস্তর নির্ম্মাণ প্রণালী আবিষ্কার করেন।

(২) মিসেস্ ডার্লি [illegible] নামক এক জন মহিলা [illegible] বসাইবার যন্ত্র প্রস্তুত করেন।

(৩) জেনেট্ পাউয়াস্ নামক এক মহিলা জলজন্তু ও জলচর পক্ষীদিগের জন্য প্রকাণ্ড জল-পাত্র প্রস্তুত করেন।

(৪) মিসেস্ মে ওয়াট্‌সন্ রেলগাড়ীর শব্দ কমাইবার জন্য একটি এবং ধূম নিবারণের জন্য একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন।

(৫) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, বোষ্টন্ নিবাসী মার্গারেট্ নাইট্ কাগজের ব্যাগ্ তৈরি করিবার এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের দৈনিক সুখ সুবিধা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

দন্তধাবন বিধি।—অনেকে অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবন করেন। ইহাতে দন্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ময়লা পরিষ্কৃত হয় না। আজকাল অনেকে মাজনের সহিত টুথব্রাস্ ব্যবহার করেন। তাহা মন্দ নহে। কিন্তু হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত নিম, বগভেরাণ্ডা, আসসেওড়া প্রভৃতি দন্তকাষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও হিতকর। ঐ সকল দন্তকাষ্ঠিকার মাথা চিবাইয়া বা ছেঁচিয়া ব্যবহারে ব্রাসের কার্য্য হয়, আটা ও রসে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় এবং মুখও পরিষ্কার হয়।

মাটিতে পাখা ঠেকা।—স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্য একদিন স্বামিজীকে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিয়া বাতাস করিতেছিল। স্বামিজীর গায়ে পাখা ঠেকায় যাওয়ায় শিষ্য মাটিতে পাখাখানি তিনবার ঠুকিয়া লইয়া পুনরায় বাতাস করিতে লাগিল। স্বামিজী শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ দেখি ঐরূপে পাখা ঠোকার অর্থ কি?' শিষ্য যখন ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই বলিতে পরিল না, তখন স্বামিজী বলিলেন, 'আর যেন অসাবধানে গুরুজনের বা রোগীর গায়ে ঐরূপে পাখাখানা না ঠেকে, এইটী দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়া মনকে ঐ প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখাইবার জন্য ঐরূপ করা হইত—এখন উহা একটা অর্থহীন প্রথা বা কুসংস্কার মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের সব বিষয়ই তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করিতে হয়। অতি সুন্দর ব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।'

স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসু

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch ——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৯ম ভাগ। | চৈত্র, ১৩২০ | ১২শ সংখ্যা।

বীরবল

প্রথম অধ্যায়

গাছে ফুল ফুটে, সকল ফুলে ফল হয় না। সকল ফলে বীজ থাকে না। সকল বীজে অঙ্কুর হয় না। সকল অঙ্কুরে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীতেও মানুষ জন্মে। সকল মানুষ মানুষের মত হয় না। পশু পক্ষী ইতর প্রাণী ভোজন শয়ন করিয়া যেমন জীবন যাপন করে, সেইরূপ অনেক মানুষই ভোজন শয়ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। বীরবল সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি মানুষের মত মানুষ ছিলেন। যে সময়ে পাঠশালা এবং [illegible] শিক্ষার সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, যে সময়ে বিবাহে উৎসবে সমবেত বালক-মণ্ডলী ছড়া-কাটাকাটি কিংবা কবিতার লড়াই করিত, জামাই ঠকান ছড়ার যখন বাড়াবাড়ি ছিল, সেই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে বীরবলের জন্ম হয়। বীরবল স্বনামধন্য প্রখ্যাতনামা মহাপুরুষ। তাঁহার প্রকৃত নাম মহেশদাস শর্ম্মা।—বিদ্যাসাগর বলিলে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝায়, সেইরূপ তৎকালে বীরবল বলিলে এক মাত্র মহেশদাসকেই বুঝাইত। বিদ্যাসাগর যেমন উপাধি, বীরবলও তেমনই উপাধি। এই উপাধি সম্রাট আকবরশাহ কর্ত্তৃক মহেশদাসকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বীরবল প্রতিভাশালী পুরুষ-শার্দ্দূল। ইনি কোন জনপদের বা কোন রাজ্যের অধীশ্বর না হইলেও স্বকীয় শক্তিতে এবং কার্য্যক্ষমতায় ভারত-বিখ্যাত হইয়া

গিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট তিনি পরিচিত। প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ। পরিতাপের বিষয়, ঈদৃশ মহাত্মার বাল্য-জীবন মানব-সমাজের অনধিগম্য।

বীরবল স্বভাব-কবি, তিনি সংস্কৃত এবং পারস্য-ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার ভাষার ঝঙ্কার যে শুনিত সেই বিমুগ্ধ হইত। দিল্লীশ্বর আকবর সাহ হিন্দু মুসলমানকে প্রীতির সূত্রে বন্ধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এবং ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ কৃতাঞ্জলিপুটে দিল্লীশ্বরের জয়গাথা গান করিত, অবনত মস্তকে তাঁহাকে কুর্ণিশ করিত। দিল্লীশ্বরও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত এবং গুণবান লোকদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, হিন্দুদিগের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে ভালবাসিতেন। কেবল ভালবাসিতেন এমন নহে, তিনি নিজেও হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং হিন্দুরমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। এই সময়ে কবিবর মহেশদাস শর্ম্মা সম্রাট-কুল-তিলক আকবর সাহের দরবারে যাতায়াত করিতেন। সম্রাট আকবর সাহ মহেশদাসের কবিত্বের এবং প্রত্যুৎপন্ন মতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ সভাসদ্ রূপে গ্রহণ করেন এবং ক্রমে তাঁহার কবিত্বগুণে এবং রহস্যালাপে মুগ্ধ হইয়া "রায়কবি" উপাধি দান করেন। তখনকার সময়ে এই সম্মানসূচক উপাধি লাভ সামান্য কবিত্ব বা সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক ছিল না। তখনকার দিল্লীদরবার, স্বদেশ বিদেশের শিক্ষিত গুণবান্ ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তখন সঙ্গীতাচার্য্য তানসেন, ঐতিহাসিক আবুল ফজল, বীরবর ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ ও রাজা টোড়রমল্ল, গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী ও নানা গুণসম্পন্ন রাজা পত্রদাস, রাজা রামদাস প্রভৃতি ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র গুণবান্ ও ভাগ্যবান কৃতীপুরুষ দ্বারা রাজ-সভা সমলঙ্কৃত ছিল। তথায় কোন নূতন লোকের তথায় প্রবেশ করা সুকঠিন ব্যাপার ছিল। সেই সময় মহেশদাস কবিত্ব প্রভাবে প্রথমতঃ আমির ওমরাহদিগকে, পরে সম্রাট্কে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া দরবারে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহেশদাস সর্ব্বদা রাজ-দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। সুযোগ পাইলেই সম্রাটের মনোরঞ্জনকারী কবিতা পাঠ করিতেন এবং চুটকী গল্প বলিতেন। ইহাতেই সম্রাট প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক "রায়-কবি" উপাধি প্রদান করেন। এই সময় হইতেই মহেশ-দাসের ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন। ক্রমেই তিনি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শেষে সম্রাটের বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, রায়কবি মহেশদাস সঙ্গীত বিদ্যায়ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্রাটের সঙ্গীত শ্রবণে ইচ্ছা হইলে তানসেন এবং রায়কবি তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেন। সম্রাট সঙ্গীতও শুনিতেন এবং তাঁহাদের সহিত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত জটিল বিষয়েরও আলোচনা করিতেন! "রায়কবি" সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী এবং প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। অতি গুরুতর এবং জটিল বিষয়েরও তিনি সরল মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার সরলতা, প্রভুভক্তি ও ন্যায়নিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। সম্রাট তাঁহার গুণে বিমোহিত হইয়া তাহাকে অন্যতম প্রধান অমাত্যের পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

কথিত আছে সম্রাট্ আকবরের এক সান্ধ্য তর্কসভা ছিল। তাহাতে নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ হইত। বলা বাহুল্য, সেই সান্ধ্য সভাতে অতি সামান্য বিষয় হইতে গুরুতর বিষয়ের পর্য্যন্ত মীমাংসা হইয়া যাইত। সেই সভাতে একদিন মুসলমানগণ স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মের পুষ্টিসাধন জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, "রাজা যখন সকল পার্থিব বিষয়ের নেতা, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাসনভারও রাজারই হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত।" তখন রায়কবি মহেশদাস বলিলেন, "ধর্ম্ম কিছুতেই রাজার শাসনের অধীন নহে। রাজাই সম্যক্ রূপে ধর্ম্মানুশাসনের অধীন। যেহেতু রাজা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নহেন; কেবল ধর্ম্মের রক্ষক ও পালক।" ইহাতে উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উপাসক সহৃদয় সম্রাট্ আকবর "রায়কবির" উপর যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে স্বকীয় পরীষ-

রক্ষকদের অগ্রণী করিয়া লইলেন। তখনই কথা উঠিল :—

"বাহিরে দেবতা ভিতরে সয়তান,
আকবরের দরবারে নাহি পায় স্থান॥"

বাস্তবিকও মহেশদাস খাঁটি মানুষ ছিলেন। তাঁহার নিকট ছল চক্রান্ত প্রতারণা স্থান পাইত না। তিনি প্রাণ বিনিময়ে প্রভুর উপকার করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। অনেক সময়ে ভীষণ সঙ্কটে মহেশদাস সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজা "বীরবল" উপাধি এবং দশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া জায়গীর দান করেন। ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাটের রাজ-প্রাসাদের সন্নিকটে বীরবলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাসাদ অতীব সুন্দর ও অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক চিত্রে সুশোভিত। এই প্রস্তর-গৃহের কারুকার্য্য অতি মনোহর। যে সমস্ত চীনের কারিকর গজ-দন্তের উপরে মনোমুগ্ধকর সুচিক্কণ কারুকার্য্য করিয়া থাকে, তাহারাই এখানে এমন সুন্দর দৃশ্য নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গৃহটী রত্নের আধার রূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। এরূপ নয়ন-মনোহর গৃহ ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতেও বিরল।

জগতে পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ, নীচাশয়, পাপমতি লোকের অভাব নাই। "রায়কবি" মহেশদাসের ঈদৃশ উন্নতি দর্শনে কতিপয় লোক অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে এক কাজি সাহেবই অগ্রণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদায়ই বীরবলকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতেন। সুযোগ পাইলেই সম্রাটের নিকট তাঁহার প্রতিকূলে নানা অপ্রীতিকর কথার অবতারণা করিতেন। সম্রাট আকবর কাহারও 'কান-কথা' বা গুপ্ত মন্ত্রণা শুনিতে পারিতেন না। তিনি স্বজাতির এবং স্বজনের বাক্য উল্লঙ্ঘন করা অনিষ্ট-জনক মনে করিয়াও সহসা কোন অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন করিতেন না। সম্রাট একদিন দরবার ভবনে সুখোপবিষ্ট হইয়া রাজশক্তির বুদ্ধিমত্তার অদ্ভুত কৌশল বিস্তার করিতেছেন, এমন সময় সহসা বীরবলকে আসন হইতে উঠাইয়া তদীয় আসনে কাজি সাহেবকে বসাইলেন এবং কাজি সাহেবকে কহিলেন "কাজি সাহেব! আপনি বীরবলের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। আপনি এখন বলুন :—

১। ঈশ্বরের নিকট নাই কি?
২। ঈশ্বর না করেন কি?
৩। ঈশ্বর এখন কি করিতেছেন?"

প্রশ্ন শুনিয়াই কাজি সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। একটুকু ভাবিয়া বলিলেন, "প্রশ্ন কঠিন নয়, তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন একটুকু দেখিয়া শুনিয়া উত্তর দেওয়া সঙ্গত; তজ্জন্য সাত দিনের অবকাশ চাই।" বাদসাহ কাজি সাহেবকে সাত দিন সময় দিলেন। কাজিসাহেব বাড়ীতে গিয়া নানা কেতাব খুলিয়া চারি দিন কাটাইলেন। কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পঞ্চম দিনে বীরবল এক ফকিরের সাজ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জন্য কাজি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "ভিক্ষা চাই" "ভিক্ষা চাই" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাজি সাহেব বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন এবং বিদায় করিয়া দিতে ভৃত্যকে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন ফকির কহিলেন—

"ফকির চিনে না গায়, ফকির চিনে না মায়,
ফকির চিনে না দেশে, ফকির চিনে না খেসে,
ফকির চিনেনা বজ্জাত লোকে, ফকির চিনেনা ছিঁনে জোঁকে।

ফকিরের কথা শুনিয়া কাজি সাহেব বিস্মিত হইলেন। ফকিরের সাহায্যে চিন্তার লাঘব হইবে আশায় ফকিরকে নিকটে আনিয়া কহিলেন, "ফকির! আমি একটা গুরুতর বিষয়ের চিন্তাতে নিমগ্ন আছি। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি আমার চিন্তার উপশম করিতে পারিবে কি?" ফকির কহিলেন, "আমি আপনার চিন্তার লাঘব করিতে পারি কি না, চিন্তার বিষয়টা না জানিলে, কিরূপে বলিব? আপনার চিন্তার বিষয়টী কি জানিতে পারিলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি।" কাজি মনে মনে ভাবিলেন, চারি দিন কেতাব উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ত কিছু মিলিল না। আচ্ছা দেখি ফকির কি বলে!"—এই ভাবিয়া প্রশ্ন তিনটী ফকিরের নিকট প্রকাশ করিলেন। শুনিবামাত্র ফকির

হাসিয়া বলিলেন—"হুজুর, এই সকল প্রশ্নের উত্তর ত অতি সহজ, আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলে দেখিবেন, আপনার ইজ্জত এখন হইতে আরো অধিক হইবে।" কাজি সাহেব বলিলেন—"পরামর্শটা কি শুনি?" ফকির বলিলেন, "আপনি আমাকে গোলামের পোষাক পরাইয়া এখনই সঙ্গে লইয়া চলুন। বাদসাহকে বলুন যে "আপনি যে তিনটী প্রশ্ন দিয়াছেন, তাহার উত্তর অতি সহজ। আমার সঙ্গের গোলামই তাহার উত্তর দিতে পারিবে।"

কাজি সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। উত্তরের কথা জানিয়া না লইয়াই অন্দর মহলে গিয়া নিজের পোষাক (ঘাগরীওয়ালা জামা) পরিধান করিলেন। গোলামের পোষাক (মাত্র কমুইর এবং উরুর ঊর্দ্ধাংশ আবরণাত্মক জামা) হস্তে, পান চিবাইতে চিবাইতে হাস্তবদনে বাহিরে আসিলেন। জামা ফকিরকে দিলেন। ফকির হাসিতে হাসিতে তাহা পরিধান করিয়া কাজি সাহেবের সঙ্গে চলিলেন। কাজি সাহেব দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়াই ঘণ্টা বাজাইলেন। বাদসাহের নিকট কাজি সাহেবের উপস্থিতি-সংবাদ পৌছিল। আমীর, ওমরাহ, পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতি সভাসদগণ সভাস্থ হইলেন। বাদসাহ দরবারে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং কাজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সময়ে আপনার উপস্থিত হইবার কারণ কি?" উত্তরে কাজি সাহেব বলিলেন—"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সাত দিনের মোহালত লইয়াছিলাম। দেখিলাম, প্রশ্ন কঠিন নহে। অধিক চিন্তা করিবার দরকার নাই। চারি দিন গত হইয়া গিয়াছে। এখনই উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।" বাদসাহের হুকুমে মন্ত্রী, অমাত্য সদস্যগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রহরীগণ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইল। বাদসাহের দক্ষিণ দিকে কাজি সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গীয় গোলাম বেশধারী ফকির বাদসাহের সম্মুখে দরবার বাহিরে জানু পাতিয়া করযোড়ে রহিল। বাদসাহ কাজি সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

"কাজি সাহেব! একে একে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে আরম্ভ করুন।" কাজি সাহেব একটু রোষকষায়িত নেত্রে বাদসাহ সাহেবকে বলিলেন—"হুজুর! আপনি দুনিয়ার মালিক। আমি ধর্ম্মরাজ্যের পরামর্শদাতা এবং সংসার-রাজ্যের বিচারকর্ত্তা। আমাকে এমন 'ইল্‌চি' (প্রশ্ন) দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর আমার গোলামই দিতে পারে।" বাদসাহ বুঝিলেন, কাজি সাহেব অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছেন। সম্মুখস্থ লোকটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"তুমি কি কাজি সাহেবের গোলাম?" উত্তরে গোলামের বেশধারী বীরবল বলিলেন—"হুজুর! আমি এখন কাজি সাহেবের গোলাম।" বাদসাহ বলিলেন—"তুমি কি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে?" গোলাম বলিল, "হুজুর, প্রশ্ন কি জানিতে পারিলে বলিতে পারি, উত্তর দিতে পারিব কি না?" বাদসাহ প্রশ্ন বলিলেন এবং গোলাম বেশধারী বীরবল তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

১ম প্রঃ। ঈশ্বরের নিকট নাই কি?

উঃ। ঈশ্বরের নিকট নাই—অবিচার।

২য় প্রঃ। ঈশ্বর না করেন কি?

উঃ। তাঁহার জন্য একটী শরীর প্রস্তুত করেন না।

৩য় প্রঃ। ঈশ্বর এখন কি করিতেছেন?

গোলাম বলিল, "হুজুর, এই প্রশ্নের উত্তর গোলামের জিহ্বায় আসে না। আমার মুনিব সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন।" একথা শুনিয়া কাজি সাহেব বেহুস হইয়া পড়িলেন। সকলে অবাক! বাদসাহ হুকুম দিলেন—"হেকিম ডাক!" হেকিম আসিলেন। কাজি সাহেবকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। চিকিৎসার যোগ্য কোন পীড়ার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। চক্ষুর পলক মিটি মিটি করে, যথানিয়মে শ্বাস-ক্রিয়া চলে, কেবল কথা কন না। বায়ুবৃদ্ধি অনুমানে মস্তকে ও চক্ষে গোলাপজল ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কাজি সাহেব চক্ষু মেলেন না, কথাও কন না। বাদসাহ হেকিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন ব্যারাম ত নয়?" হেকিম বলিলেন, "ব্যারামের কোন লক্ষণইত দেখি না।" অমনি

বাদসাহ দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, "জলদি কাজি আর গোলামকে পরদার আড়ালে নিয়া একের পোষাক অন্যকে পরাইয়া দুরস্ত করিয়া আমার সম্মুখে আন। আমি বিচার করিব।" হুকুম প্রাপ্তি মাত্র দ্বারবান উভয়কে পরদার আড়ালে নিয়া একটুকু তদ্বির অর্থাৎ চিমটি দ্বারা কাজি সাহেবের চৈতন্য জন্মাইয়া গোলামের পোষাক কাজিকে, কাজির পোষাক গোলামকে পরাইয়া উভয়কে বাদসাহ সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিল। বাদসাহ কাজির পোষাকধারী গোলামকে বলিলেন,—"তুমি ত এখন গোলাম বেশধারী নও; মুনিবী পোষাক পরিধান করিয়াছ, এখন তৃতীয় প্রশ্নের (ঈশ্বর কি করিতেছেন?) উত্তর দাও।" উত্তরে গোলাম (ছদ্মবেশধারী বীরবল) বলিল—"হুজুর! ঈশ্বর এখন ইহাই ত করিতেছেন—মুনিবকে গোলাম বানাইতেছেন, গোলামকে মুনিব বানাইতেছেন।" দরবার উচ্চহাস্য এবং 'বাহবা বাহবা' রবে পূর্ণ হইল। কাজি সাহেব মুখ লুকাইয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া চলিয়া গেলেন। সকলেই কাজি সাহেবকে ছি ছি করিতে লাগিল। পরে সম্রাট বীরবলকে চিনিতে পারিলেন ও শিরোপা দান করিলেন। সম্রাট আকবর বীরবলের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। আকবর সাহ মুসলমান এবং বীরবল হিন্দু হইলেও পরস্পর অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মিত্রতা অপার্থিব ছিল।

দুঃখের দুঃসহ পীড়নে ব্যক্তিমাত্রেই অভিভূত। রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত এই পীড়ন এড়াইতে পারে না,—অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে না। একদিন এই দুঃখে অভিভূত হইয়া সম্রাট আকবর সাহ দরবার-মন্দিরে আসিয়া বলিলেন—"সভাসদ্‌গণ! তোমরা সকলেই আমার প্রিয়, আজ আমি তোমাদের নিকট একটী প্রিয় বস্তু চাহিতেছি। আশা করি তাহা দান করিয়া আমাকে সুখী এবং কৃতার্থ করিতে তোমরা কেহই কুণ্ঠিত হইবে না।" সভাসদ্‌গণ সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"সম্রাটের নিকট আমাদের অদেয় কিছুই নাই। বিশেষতঃ সম্রাটের অপ্রাপ্য প্রিয় বস্তুও জগতে কিছুই হইতে পারে না। আদেশ প্রাপ্তি মাত্র আমরা সকলেই তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" সম্রাট আকবরসাহ কহিলেন—"সভাসদ্‌গণ! দুঃখের সময়ে সুখ পাই এবং সুখের সময়ে দুঃখ পাই এমন একটী বস্তু আমাকে সংগ্রহ করিয়া দাও। আমি উপযুক্ত পুরস্কার দিব।" সম্রাট আকবর সাহের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই একে অপরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেহই কোন উত্তর দিলেন না। সভাস্থ সকলেই নীরব। বিরাট জনসঙ্ঘ আজ নিস্তব্ধ, সকলেই চিন্তাকুল। সম্রাট এই নিস্তব্ধতার মধ্যে উত্তর পাইবার আশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বীরবল সেই নীরবতা ভেদ করিয়া, যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "হুজুর! সেই দ্রব্য ক্রয় করা বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য। অনুমতি হইলে আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।" উত্তরে সম্রাট কহিলেন—"তাহা যে বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য তাহা আমি জানি। এখন তুমি কত টাকা চাও রাজা?" বীরবল বলিলেন—"একলক্ষ আসরফী (স্বর্ণমুদ্রা)।" সম্রাট আকবর সাহের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহা আনীত ও বীরবলকে প্রদত্ত হইল। রাজা বীরবল অভিবাদন পূর্ব্বক একমাসের সময় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইয়া গেল। রাজা বীরবল নির্দ্দিষ্ট দিনে দরবার-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাট আকবরসাহ বড় আনন্দের হাসি হাসিতেছেন। দূতমুখে দাক্ষিণাত্য বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সদর্পে আস্ফালন করিতেছেন। ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া রাজা বীরবল দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—"জাঁহাপনা! আপনার প্রিয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।" সম্রাট আহ্লাদে হস্ত প্রসারণ করিলেন, রাজা বীরবল প্রেমোৎসাহিত চিত্তে সম্রাট আকবরের দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলিতে একটী অঙ্গুরী পরাইয়া দিলেন। সম্রাট আকবর সাহ অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"এয়্‌ছা দিন নেহি রহেগা।" তাঁহার রহস্যালাপ এবং দর্প আস্ফালন প্রশমিত হইয়া গেল। এই অবস্থায় কতক্ষণ অবস্থিতির পর

স্বর্ণের অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ করিয়া কহিলেন—"এয়ছা দিন নেহি রহেগা।" দেখিতে দেখিতে মৌনভাব দূর হইয়া গেল। উভয়ে রাজ্য শাসন-সংক্রান্ত আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সভাসদ্‌গণ বুঝিল, রাজা বীরবল সম্রাটকে যে সুবর্ণ-অঙ্গুরীয়ক দিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—"এয়ছা দিন নেহি রহেগা।" ইহাতেই সম্রাটের ভাবান্তর সংঘটিত হইতেছে। অতঃপর সম্রাট রাজা বীরবলের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। উঠিয়া যাইবার কালে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দানের কথা তুলিয়া কহিলেন—"বীরবল! আমি তোমাকে আর পুরস্কার কি দিব? আমিই তোমার হইলাম।"

এরূপ আত্মদর্শন ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় সচরাচর দেখা যায় না। তাই বলিতে হয়, বীরবল কেবল কবি বা বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ভারত-মাতার তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন একজন সুসন্তান ছিলেন। বীরবলের প্রচলিত বহু গল্প, বহু রহস্যের কথা, মুখে মুখে প্রচলিত আছে। তাহার সকলগুলি সংগ্রহ করা সহজ নহে। আমরা এখানে তাহার কয়েকটী মাত্র তাঁহার জীবনাখ্যানের সহিত সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।

এক দিন সভায় বসিয়া বাদসাহ কৌতুক করিয়া বলিলেন, "দেখ, কাল আমি এক বড় মজার স্বপ্ন দেখিয়াছি;— যেন আমি ও বীরবল দুইজন কোথায় বেড়াইতে যাইতেছি। পথের সম্মুখে দুইটা প্রকাণ্ড হ্রদ, একটা বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, ও একটা মধুতে পরিপূর্ণ। বীরবল সেই বিষ্ঠা-কুণ্ডে গিয়া পড়িয়াছে; আর আমি পড়িয়াছি সেই মধুর কুণ্ডে, দুইজনে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি এমন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।" এই অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্যে সভা মুখরিত করিল। কিন্তু বীরবল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা! গতরাত্রে আমিও ঠিক ঐ স্বপ্নটা দেখিয়াছি। তবে আমি আরো একটু বেশী দেখিয়াছি।" বাদসাহ বলিলেন—"বেশীটা কি শুনি?" বীরবল বলিলেন, "জাঁহাপনা যাহা যাহা বলিয়াছেন—আমিও ঠিক তাহাই দেখিয়াছি, তাহার পর দেখিলাম, দুইজনেই হ্রদ হইতে উঠিয়াছি, আপনি আমার গা চাটিতেছেন আর আমি আপনার গা চাটিতেছি।"

একদিন বাদসাহ সভায় বসিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা এরূপ চারি জন লোক খুঁজিয়া লইয়া আইস, যাহাদের একজন হইবে মাতার স্বামী, একজন ভগ্নীর স্বামী, একজন হইবে কন্যার স্বামী ও একজন হইবে স্ত্রীর স্বামী।" এই অভিনব হুকুম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যথাস্থানে বসিয়া রহিল। কিন্তু বীরবল "যো হুকুম" বলিয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া তখনই অনুসন্ধানে চলিলেন। বহু বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া এক বাড়ীতে এক ১৫ বৎসরের স্ত্রী ও ৬০ বৎসরের স্বামী দেখিতে পাইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "এই লোকটাই প্রকৃত পক্ষে কন্যার স্বামী।" তাহার পর আর এক বাড়ীতে এক ৩২ বৎসরের স্ত্রী ও ১২ বৎসরের স্বামী পাইলেন। তখন তাহাদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন। বীরবল দুইটী লোক আনিয়াছেন দেখিয়া বাদসাহ বলিলেন—"আমি চার জন আনিতে বলিয়াছিলাম দুই জন আনিয়াছ যে?" বীরবল যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন, "হুজুর, চারিজনই এখানে উপস্থিত! এই দেখিয়া লউন।" এই বলিয়া কন্যার স্বামী ও মাতার স্বামী প্রত্যেককে দেখাইয়া ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, ভগ্নীর স্বামী অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিতে তাহাদের আনা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া আনি নাই। আর স্ত্রীর স্বামী এই অধম আপনার নিকটে দণ্ডায়মান।" বীরবলের এই প্রকার রহস্যে বাদসাহ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

এক দিন বাদসাহ সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, সংসারে অন্ধ অধিক না চক্ষুষ্মান্ লোকই অধিক বল দেখি!" অনেকেই এক বাক্যে বলিল, "চক্ষুষ্মান্ লোকই অধিক।" কিন্তু বীরবল তাঁহার প্রকাণ্ড মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলেন, "না, সংসারে অন্ধের ভাগই অধিক।" বাদসাহ বলিলেন— "সে কি বীরবল, অন্ধের ভাগ বেশী! বল কি?" বীরবল আপন কথাই

বজায় রাখিয়া বলিলেন—"হাঁ জাঁহাপনা, দোয়াত কলমসহ আমার সঙ্গে একটী লোক দিন, আমি এখনই অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ লোকের তালিকা করিয়া আপনাকে দেখাইতেছি।" এই বলিয়া লেখাপড়া জানা একটী লোক ও কতকগুলি পাট লইয়া বীরবল হাটের মাঝখানে বসিয়া দড়ি পাকাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকট দিয়া যে যায়, বীরবলকে দড়ি পাকাইতে দেখিয়া সে-ই বলে, "এ কে গো? এখানে বসে কি হচ্ছে?" বীরবল তখনই সঙ্গের লোকটীকে বলেন, "লেখ, এ অন্ধ।" আর যে কেহ বলে, "বীরবল যে? আজ এখানে বসে দড়ী পাকাবার কারণ কি?" বীরবল বলেন, "এর চোক আছে, লেখ।" এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লিখিয়া বাদসাহের নিকট হাজির করিলেন। মিলাইয়া দেখা গেল চক্ষুষ্মান্ লোক অপেক্ষা অন্ধের সংখ্যা চতুর্গুণ। বীরবলের এই কাণ্ডে বাদসাহ হাসিয়া আকুল হইলেন।

একদিন নিশাকালে সভায় গিয়া বাদসাহ নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এই আকাশে যতগুলি নক্ষত্র আছে, তোমরা কেহ যদি গণিয়া তাহার সংখ্যা বলিতে পার, আমি তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।" এই কথায় সেই অসংখ্য তারকা-মণ্ডিত উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া সকলেই অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু বীরবল একবার মাত্র আকাশ পানে চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, এই ক'টা তারা গণনা করা আমাদের পক্ষে বেশী কথা নয়। আমি গণিয়া দেখিলাম—আপনার অঙ্গে যতগুলি লোম আছে, আকাশে ঠিক ততগুলি তারা আছে। আমার কথায় যদি অবিশ্বাস হয় আপনি স্বয়ং গণিয়া মিলাইয়া লইয়া আমাকে পুরস্কার দিতে আজ্ঞা করুন।" বীরবলের কথায় বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিতে আজ্ঞা দিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকানাই দত্ত।

কতবার

তুমি তো আমারে ডেকেছিলে হায়
পশেনি শ্রবণে মোর,
ধূলায় লুটান পরাণে ছিল গো
মোহের স্বপন ঘোর

ওগো, দুরলভ চির সাধনের ধন,
বারে বারে তুমি করেছ চেতন;
এসেছিলে তুমি ধরা দিতে হায়!
কতরূপে কতবার,
দ্বার হতে আমি ফিরায়ে দিয়েছি
কতবার কতবার।

ওগো, এসেছিলে তুমি দীন অভাগার,
মুছাইয়া দিতে আঁখি-জল-ধার,
সেতো অনাদরে ফিরায়ে দিয়াছে
কতবার কতবার;
তুমি তো এসেছ জীবনের মাঝে
কতভাবে কতবার।

তুমি আসিয়াছ সখা সুহৃদের বেশে,
কাছে দাঁড়ায়েছ সুমধুর হেসে,
আবার এসেছ পরের মতন
নানা বেশে বার বার;
আমি তো চিনিনি' অবহেলে হায়
ফিরায়েছি বার বার।

কত কোলাহল মাঝে নীরব নিশীথে,
দিয়াছ আশীষ কত মা প্রভাতে,
ফিরায়েছি আমি চাই নাই ফিরে
সে যে হায় কতবার;
তুমি তো আমারে চেয়েছিলে কাছে
কতরূপে কতবার।

ওগো, তুমি তো আমার এ বন্ধ-দুয়ারে
আঘাত করেছ কত বারেবারে,
ক্ষীণ ঘুম মোর চেয়েছ ভাঙ্গিতে
শত ভাবে শত বার,
অনাথের নাথ! অনাথের দ্বারে
এসেছিলে বার বার।

ওগো, যে বিপদ আমি আপনি গড়িয়া,
আঁধারে আঁধারে মরি গো ঘুরিয়া
তুমি এসেছিলে আপনার হাতে
নিয়ে যেতে পরপার
আমি তো তোমারে ফিরায়ে দিয়েছি
কতবার কতবার।

প্রভু, এমন করিয়া ভিখারীর মত,
দীনের দুয়ারে হয়েছিলে নত,
কাঙ্গালের মত এ হৃদয় দান
চেয়েছিলে কতবার,
হে মোর দেবতা! আমি যে তোমারে
ফিরায়েছি বার বার!

শ্রীসুধাসিন্ধু সেনগুপ্তা।

উপবাস দ্বারা রোগ চিকিৎসা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্থূলতা হ্রাসের জন্য উপবাস—প্রায় সকলেই জানেন যে, খাদ্যের পরিমাণ বিশেষতঃ স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে শরীরের মধ্যে চর্ব্বি জন্মে; এই চর্ব্বি রক্ত-স্রোতের সহিত শরীরে অধিক মাত্রায় প্রবাহিত হওয়ায় তাহা স্নায়ু ও কোষগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে জমিয়া থাকে এবং ইহা হইতেই মাংসেতে চর্ব্বির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, মানুষ যখন অনাহারে মরিতে থাকে, তখন সে ক্রমে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় কঙ্কালসার হইয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই এই অনুমান করা যায় যে উপবাসই স্থূলতা হ্রাস করিবার প্রধান ঔষধ। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, খাওয়ার যতই 'ধরাকাট' কর না কেন, যাহার মোটা হইবার 'আড়া', সে মোটা হইবেই—একথা কিন্তু সম্পূর্ণ ই ভ্রমাত্মক। যিনি যতই মোটা হউন না কেন উপবাস দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার স্থূলতা হ্রাস পাইবে। কত দিন উপবাস করিলে শরীরের ওজন কত কম হইবে ইহা সামান্য পাটীগণিতের সাহায্যেই বাহির করা যাইতে পারে। একদিন উপবাসে এক পাউণ্ড করিয়া যদি শরীরের ওজন কম হইতে থাকে তাহা হইলে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পাউণ্ড ওজন হ্রাসের জন্য কত দিন উপবাস দিতে হইবে তাহা সহজেই বাহির করা যাইতে পারে। কোন কোন অতি স্থূলকায় ব্যক্তির দুই পাউণ্ড বা ততোধিক পরিমাণে শরীরের ওজন একদিন উপবাসে কমিতে থাকে। তাঁহারাও হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন যে কতদিনে তাঁহাদের শরীরের ওজন কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনের সমান হইবে।

কিন্তু অনেকে এইরূপ হিসাব করিবার পর যখন দেখেন যে তাঁহাদের এত অধিক দিন উপবাস দিতে হইবে, তখন তাঁহারা বড়ই ভয় পাইয়া যান। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা যে এতদিন উপবাস দিবেন তাহাতে কি তাঁহাদের শরীরের কোন ক্ষতি হইবে না, কি অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন না? কিন্তু যাঁহারা, উপবাসে যে কি শারীরিক পরিবর্ত্তন হয়, সে বিষয় অবগত আছেন তাঁহাদের আর এরূপ ভয় পাইবার কারণ নাই। যতদিন পর্য্যন্ত হাড়ের উপর মাংস আছে বা হাড়ের উপর চর্ব্বি আছে, বুঝিবে ততদিন পর্য্যন্ত অনাহার বশতঃ মৃত্যু হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত না শরীর কঙ্কাল সার হয়, সে পর্য্যন্ত অনাহারে মৃত্যু হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত শরীরতত্বের এই একটী অদ্ভুত ব্যাপার যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে রস গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে এবং সেই জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর

পরিপুষ্টিজনক খাদ্য বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষয়ের কোনই আশঙ্কা নাই। এমন কি, যে সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ অনাহারে মরিয়াও যায় সে সমস্ত ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কের কিছুই নষ্ট হয় না। চর্ব্বির ১০০ ভাগের ৯৭ ভাগ, মাংস-পেশীর ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ, যকৃতের ১০০ ভাগের ৫৬ ভাগ, প্লীহার ১০০ ভাগের ৬৩ ভাগ, রক্তের ১০০ ভাগের ১৭ ভাগ নষ্ট হয়। কিন্তু স্নায়ুমূলগুলির কিছুই নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যেগুলি জীবনী-শক্তির পক্ষে যত বেশী প্রয়োজনীয় সেইগুলি তত কম ক্ষয় হয়। যদি শরীরে কোনও অনাবশ্যক পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে শরীরের কোন জিনিষের বিনাশের পূর্ব্বে এইগুলিই দূরীকৃত ও বিনষ্ট হইবে। রোগের সময় খাদ্যাভাব বশতঃ যে দুর্ব্বলতা হয় তাহা নহে, রোগের বিষের জন্যই দুর্ব্বলতা বোধ হয়। খাদ্যাল্পতার জন্য শরীর শীর্ণ হয় না; শরীর মধ্যে যে বিষ বর্ত্তমান আছে তাহাই শরীরকে শুষ্ক ও ক্ষীণ করিয়া ফেলে। এই বিষটী বাহির হইয়া গেলেই রোগ সারিয়া যায়।

এই সমুদায় হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উপবাসই স্থূলতার সহজ ও যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা। উপবাসের প্রথম কয়েক দিন বেশ ক্ষুধা বোধ হইবে, কিন্তু তারপর ক্ষুধা চলিয়া যাইবে এবং যতদিন উপবাস করিলে পর আবার শরীর স্বাভাবিক হইবে, ঠিক তত দিন পরে ক্ষুধা ফিরিয়া আসিবে, নাড়ী স্বাভাবিক হইবে, শরীরের তাপও স্বাভাবিক হইবে, শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইবে ও মুখের দুর্গন্ধ চলিয়া যাইবে। এই সমস্ত চিহ্নগুলি যখন দেখা যাইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে উপবাস ভঙ্গ দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ সময়ে যদি উপবাস ভঙ্গ না দেওয়া হয় তাহা হইলে শরীরের ক্ষতি হইবে। এরূপ অবস্থায় যদি খাদ্য গ্রহণ না করা হয় তাহা হইলেই অনাহার বলিতে হইবে। রোগমুক্তির জন্য আবশ্যকীয় কয়েক দিন উপবাস করার পর উপবাস করিলেই অনাহার (starvation) করা হইবে। এই দুইয়ের ভিতর পার্থক্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া রাখা উচিত।

শীর্ণতার জন্য উপবাস—যদি স্থূলের পরিবর্ত্তে রোগী কৃশ ও শীর্ণ হয় তাহা হইলেও উপবাস করা বিধিসঙ্গত কি না,—এই প্রশ্ন সাধারণতঃই উঠিতে পারে।

সাধারণ চিকিৎসকগণ বলিবেন যে এরূপস্থলে উপবাসের বিধান দেওয়া মারাত্মক ও অনিষ্টকারক। তাঁহারা আরও বলিবেন যে যখন শরীর অপরিপুষ্ট তখন তাহার উপর আবার শরীরের ওজন হ্রাস করান কি যুক্তিসঙ্গত? হাঁ, কোন কোন রোগীর খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য-বশতঃ শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রায় অধিক স্থলেই উপযুক্ত পরিপাকশক্তির অভাবই শীর্ণতার প্রধান কারণ। পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইলে পরিপাকের যন্ত্রগুলিকে বলিষ্ঠ ও রোগশূন্য করা আবশ্যক এবং পরিপাকযন্ত্রগুলিকে বিশ্রাম দিলেই তাহারা স্বভাবতঃ তাহাদের পূর্ব্বেকার শক্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিবে। অপর পক্ষে, অধিক পরিমাণে খাদ্য উদরসাৎ করিলে সেগুলি উপযুক্তরূপে পরিপাক হইবে না এবং উপকারের পরিবর্ত্তে বরং অপকারই হইবে।

রোগী যতই শীর্ণ হউক না, কিছু অল্প সময়ের জন্য তাহাকে উপবাস দিতেই হইবে। এইরূপ উপবাস দিলে পরিপাক যন্ত্রগুলি বিশ্রাম দ্বারা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তৎপরে কিছু কিছু দুগ্ধ খাইতে দিবে বা প্রথম ফলমূল খাইতে দিয়া তার পর দুগ্ধ খাইতে দিবে। শেষোক্ত খাদ্য প্রণালীটী পূর্ব্বোক্ত খাদ্যপ্রণালী অপেক্ষা উত্তম। ইহার পর আস্তে আস্তে খাদ্য পরিমিত করিয়া দিতে পারিলেই রোগীর ওজন বৃদ্ধি হইবে ও রোগীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে। আমরা বাহুল্যভয়ে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

গর্ভাবস্থায় উপবাস—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের আহার সম্বন্ধে আমাদের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ধারণা আছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে কেবলই অধিক আহার করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। তাহাদের দুই জনের শরীরের পোষণ করিতে হইবে এই ধারণায় তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় আহার করিতে বলা হয় এবং তাহারাও সকলের কাছে এইরূপ কথা শুনিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সমুদায় ধারণা বিশেষ

নির্দ্দিষ্টতারই পরিচয় দেয়। ধর, যে সন্তানটী জন্মিবে তাহার ওজন পাঁচ সের। তাহা হইলে মাসে প্রায় আধ সের বা দিবসে প্রায় এক কাঁচ্চা শিশুটী বাড়িতে থাকে এবং এতটুকু ক্ষতিপূরণের জন্য গর্ভিণীকে দিনে প্রায় আধ সের বা এক সের অতিরিক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ অস্বাভাবিক ভোজনের ফলে সন্তান প্রসবের সময় গর্ভিণীর অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা বোধ হয় এবং তাহার শরীরে চর্ব্বি-জাতীয় পদার্থের আধিক্যবশতঃ শরীর নরম হইয়া পড়ে; এমন কি সময় সময় গর্ভিণী সন্তান প্রসবের পরই জরাক্রান্ত হয়। কিন্তু যদি তাহার শরীরগ্রন্থিগুলি নরম না হইয়া বেশ শক্ত হয় এবং তাহার পেশীগুলি বেশ বলিষ্ঠ হয় তাহা হইলে গর্ভিণীকে আর গর্ভকালীন বেদনা অধিক অনুভব করিতে হয় না।

সামান্য ও সহমত উপবাস দিলে আসন্নপ্রসবা গর্ভিণী-রও উপকার হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় যদি মাথায় শ্লেষ্মা বোধ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শরীরে অনেক অনাবশ্যক পদার্থ সঞ্চিত আছে এবং অনেক অনুপযুক্ত ভাবে পরিপাকপ্রাপ্ত পদার্থও জমিয়া আছে। এইরূপ স্থলে উপবাস করাই প্রশস্ত উপায়। উপবাস দিলেই শরীর পুনরায় সুস্থ ও লঘু হইবে। ইহাতে কিছু পরিমাণে শরীরের ওজন হ্রাস হইতে পারে বটে, কিন্তু উপবাস দ্বারা যে শরীরের ময়লা নিষ্কাষিত হইয়া যায় এবং শরীর 'ঝরঝরে' হয় তাহা কি কম লাভের কথা? যাহাই হউক, শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে, শরীরে যাহাতে স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য, ওজন লইয়া আমাদের বিশেষ কিছু ফল হইবে না। কিন্তু গর্ভাবস্থায় বেশী দিন উপবাস দিলে ক্ষতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। গর্ভাবস্থায় উপবাসের তত আবশ্যক নাই। কিছুদিন কেবল ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকিলেই গর্ভ কালীন যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। ফলমূল ভক্ষণের এই সুবিধা যে, ফলমূল ভক্ষণ করিলে অন্ত্রগুলি পরিষ্কার থাকে এবং অন্ত্রগুলি পরিষ্কার থাকিলেই প্রায় অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যায়। এইরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিবার পর যখন রোগ আরোগ্য হইয়া যায় তখন আবার দুগ্ধাদি পান করিলে দেখা যায় যে প্রসূতির ওজন বৃদ্ধি এবং তাহার শরীরে পুনরায় নব বল ও নবীন স্বাস্থ্যের সমাগম হইতেছে।

বৃদ্ধদিগের উপবাস—অনেক সত্তর আশী বৎসরের বৃদ্ধদিগকেও উপবাস দ্বারা রোগবিমুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার ডিউই (Dewey) অনেক বৃদ্ধের কথা লিখিয়াছেন যাহারা উপবাস দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও রোগীর ষাট বৎসরের অধিক বয়স হইলে অতি সাবধানে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। ষাট বৎসর একাদিক্রমে এক নিয়মমত কার্য্য করায় তাহার অভ্যাসগুলি প্রায় মজ্জাগত হইয়া যায় এবং এরূপ অবস্থায় এত কালের অভ্যাসের ব্যতিক্রম হইলেই কুফল ফলিতে পারে; এমন কি, শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। অল্প সময়ব্যাপী উপবাস করিলে বা কেবল ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া থাকিলেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। ইহার সহিত প্রচুর পরিমাণে জলপান করিলে দীর্ঘকাল উপবাস করার প্রায় সমস্ত ফল পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ লোকেরা সাধারণতঃই অতি মাত্রায় ভোজন করেন। স্যার হেন্‌রি টম্‌সন্ সাহেবও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধদিগের পথ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিতে তাঁহার মত দক্ষ লোক ইংলণ্ডে খুব কমই ছিল। তিনি বলেন,—যতই মানুষ বৃদ্ধ হইতে থাকে, ততই তাহার খাদ্যের প্রয়োজন কম হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, যখন মানুষ বৃদ্ধ দশায় উপনীত হয় তখন ত সে আর বাড়িতে থাকে না বরং তাহার শরীরের ক্ষয়ই হইতে থাকে। অপর পক্ষে বৃদ্ধাবস্থায় পাকাশয়ের আর তদ্রূপ অগ্নিবল থাকে না; পাকরসগুলিরও পূর্ব্ববৎ শক্তি থাকে না। সেইজন্য বৃদ্ধগণের পরিমিত ও সাদাসিদে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ও দিবসের মধ্যে বেশী বার করিয়া অল্পে অল্পে ভক্ষণ করাই বিধেয়। ইহার দ্বারা পাকাশয়ের পরিশ্রমেরও লাঘব হয়; এবং ভুক্ত দ্রব্যও শীঘ্র শীঘ্র পাকাশয় ত্যাগ করে।

সেই জন্য যখন কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পীড়িত হন, তখন তাঁহার অল্প সময়ের জন্য উপবাস করা উচিত।

তৎপরে ফলমূল ও দুগ্ধাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই ফলমূলের রসের সহিত যে লবণ-জাতীয় অংশ থাকে তদ্দ্বারা মাংসগ্রন্থি গুলির মধ্যে যে ধাতব পদার্থ থাকে তাঁহার অধিকাংশই জান্তব পদার্থে পরিণত হয়। বৃদ্ধ বয়সের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে, এই সময়ে শরীরের জান্তব পদার্থগুলি ধাতব পদার্থে পরিণত হইয়া যাইতে থাকে এবং এই জন্যই শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ফল ভক্ষণ করিলে মানুষের শরীরের জান্তব পদার্থ বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য ফল ভক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল পুনরায় নবীন ও সবল হইয়া উঠে।

বালক বালিকাদিগের উপবাস—সাধারণ লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে. বালকবালিকাগণ যত ইচ্ছা তত খাইতে পারে এবং তাহাতেও তাহারা অসুস্থ হয় না। এ কথা কতকটা সত্য। বাস্তবিক যদি বালকবালিকাগণ মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করে এবং তাহাদের কোষ্ঠ সাফ থাকে তাহা হইলে তাহারা এত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াও যে সুস্থ থাকিতে পারে তাহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, বালকবালিকা-গণের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বড় কম নয় এবং বার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে যে কত সহস্র বালকবালিকার মৃত্যু হইতেছে তাহাই বা কে না জানে? কোন পৈতৃক ব্যাধি না থাকিলে বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক বালিকাগণের খুব স্বাস্থ্যবান্ ও বলিষ্ঠ হওয়াই উচিত। তাহাদের খাদ্যের গুণ ও পরিমাণের দোষ হইতে তাহাদের অনেকের রোগ জন্মিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, আমাদের যে ভুল ধারণা আছে যে, ছেলেদের বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন, সেই ধারণা হিসাবে কার্য্য করাতে ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি হয় এবং এরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করাতেই বালকবালিকাগণের জ্বর, হাম, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং কাসি প্রভৃতি পীড়া হয়।

উপযুক্ত সাবধানতার সহিত ছেলেমেয়েদের উপবাসের ব্যবস্থা দিলে তাহাদের প্রায় সমস্ত রোগই আরোগ্য হয়। পরিণত বয়স্ক লোকদিগের যেমন বেশী দিন উপবাস দিলে রোগ আরোগ্য হয়, সেইরূপ ছেলে মেয়েদের অল্প কয়েক দিন উপবাস দিতে দিলেই সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ইহার কারণ এই যে, বালক-বালিকাগণের ক্ষতিপূরণের শক্তি অধিক। উপবাসের সহিত তাহাদের অন্ত্রধৌতি করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগের উপবাস—শিশুদিগের অধিকাংশ ব্যাধিই আহারের দোষ হইতে হইয়া থাকে। অধিক আহার বা সময়-অসময়ে যখন তখন ক্রন্দন মাত্র আহার দেওয়ার জন্য তাহাদের পাকস্থলীর বিশ্রাম ঘটে না এবং এই জন্য ভুক্তদ্রব্য নিয়ম মত পরিপাক পায় না। ইহার ফলে শিশুদিগের দুধ-তোলা, পেটের অসুখ, রিকেট্‌স্, সর্দ্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্ ইত্যাদি রোগ এবং সহজেই জীবাণু দ্বারা আক্রমণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা নানা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্য শিশুদের পীড়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইবা মাত্র তাহাদের আহার বন্ধ করিবে। কেবলমাত্র গরম জল বা পার্ল বার্লি সিদ্ধ করিয়া জল খাইতে দিবে। এই প্রকার ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাতে শিশুদের অধিকাংশ রোগ উপশম হইয়া থাকে। সময় সময় দুই তিন দিন পর্য্যন্তও এইরূপ ব্যবস্থার আবশ্যক হয়।

অন্যান্য রোগে উপবাস—আমরা কেবল দুই চারিটী রোগের কথা উল্লেখ করিলাম এবং কোন্ রোগীর কিরূপ উপবাস করা আবশ্যক সে সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম; কিন্তু উপবাস দ্বারা এতদ্ব্যতীত আরও অনেক রোগ সারিতে পারে। সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ বা পাকাশয়ের রোগ অতি সহজেই কেবল মাত্র উপবাস দ্বারাই আরোগ্য হইতে পারে। নিউমোনিয়া, পুরাতন মাথাধরা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত ও টাইফয়েড জ্বরও উপবাস দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। কেবল ক্ষয়রোগেই উপবাস দ্বারা ভাল ফল পাইতে দেখা যায় নাই। আর সমস্ত ব্যাধিই উপবাস দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে রোগীর বল ও রোগবিশেষে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা।

লঙ্ঘন দিবার যোগ্য পাত্র।

প্রভূত শ্লেষ্মপিত্তাস্র মলাঃ সংসৃষ্ট মারুতাঃ।
বৃহচ্ছরীরা বলিনো লঙ্ঘনীয়া বিশুদ্ধিভিঃ॥

যে সকল ব্যক্তির কফ, পিত্ত, রক্ত ও মল পদার্থ অধিক এবং যাহারা সংসৃষ্টবাত, দীর্ঘদেহ ও বলবান, তাহারাই বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন এই চারি প্রকার সংশোধনের দ্বারা লঘূকরণ যোগ্য।

যেষাং মধ্যবলা রোগাঃ কফপিত্তসমুদ্ভবাঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারহৃদ্রোগবিসূচালসকজ্বরাঃ॥
বিবন্ধ গৌরবোদ্গারহৃল্লাসারোচকাদয়ঃ।
পাচনৈস্তান্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রায়েণাদাবুপাচরেৎ॥ ৬

যে সকল ব্যক্তির বমন, অতিসার, হৃদ্রোগ, বিসূচিকা, অলসক, জ্বর, বিবন্ধ, গৌরব (গাত্রগুরুতা) উদ্গার, হৃল্লাস ও অরোচকাদি রোগ সকল মধ্যবল এবং কফ পিত্ত হইতে উৎপন্ন, প্রাজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমে পাচন দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করিবেন।

অতএব যথোদ্দিষ্টা যেষামল্পবলা গদাঃ।
পিপাসানিগ্রহৈস্তেষামুপবাসৈশ্চ তাঞ্জয়েৎ॥ ৭

উপর্য্যুক্ত রোগ সকল যদি অল্প বলবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পিপাসানিগ্রহ ও উপবাস দ্বারা তাহাদের শান্তি করিবে।

রোগাঞ্জয়েন্মধ্যবলান্ ব্যায়ামাতপমারুতৈঃ।
বলিনাং কিং পুনর্যেষাং রোগাণামবরং বলম্॥

বলশালী ব্যক্তিদিগের যদি উপরোক্ত রোগ সকল মধ্যবলবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে ব্যায়াম, আতপ ও মারুত দ্বারা চিকিৎসা করিবে, আর যদি উহাদিগের অল্পবল রোগ হয়, তাহা হইলে যে এই ব্যায়ামাদি দ্বারা শান্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ॥ ৪

ক্ষয়জ, বাতিক, ভয়-ক্রোধ-কাম-শোক ও শ্রমজ জ্বর ব্যতীত সকল জ্বরে প্রথমেই লঙ্ঘনের উপদেশ আছে।

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকো রসঃ।
পাচনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণজ্বরে॥ ২

উপবাস, স্বেদ, কাল, যবাগূ, তিক্তরস ও পাচন নবজ্বরে অপরিপক্ক দোষ সকল পরিপাক করে এজন্য নবজ্বরে সর্ব্বপ্রথমেই উপবাস দেওয়ার বিধি।

শোথাধিকারে—

তথামজং লঙ্ঘন পাচনক্রমৈরিতি॥ ৪

অনন্তর আমজ শোথের প্রতিকার করিতে হইলে প্রথম উপবাস, পরে পাচন ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

গ্রহণ্যধিকারে—

শরীরানুগতে খামে রসে লঙ্ঘনমাদিশেৎ। ৫

আম রস সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে প্রথম উপবাস, পরে পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইত্যাদি

(চরক-সংহিতা)

স্বাস্থ্য-সমাচার।

স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসু

প্রকৃতির রাজ্যে যেমন গিরি গুহা কানন প্রান্তরে কত শত ফুল মানব চক্ষুর অন্তরালে প্রতিদিন ফুটিয়া উঠিয়া আবার আপনিই ঝরিয়া পড়িতেছে, সংসার-উদ্যানেও তেমনই কত শত জীবন-ফুল আপন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়া আবার আপনা আপনিই ঝরিয়া পড়িতেছে! হয়তো জগতের লোক তাহা লক্ষ্য করিল না, হয়তো মুষ্টিমেয় আত্মীয়স্বজনগণের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে তাহার সুবাসটুকু পৌঁছিল না; কিন্তু এই জীবন-কুসুম কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নয়, উদ্যান-রক্ষকের চরণ-ধূলির তলে তাহার চরম সার্থকতা সুনিশ্চিত। বিগত ৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার এমনই একটী জীবন-ফুল এই পৃথিবী হইতে অকালে খসিয়া পড়িয়াছে। তাহার

সৌন্দর্য্যের পবিত্র জ্যোতিঃ জগৎকে মোহিত করিয়াছিল না সত্য, অগণিত মানব-কণ্ঠ-নিসৃত তাঁহার প্রসংশাগীতি দিগন্ত মুখরিত করে নাই সত্য, কিন্তু স্বর্গ-সুলভ মৃদুমধুর যে সৌরভটুকু তাঁহার সরল স্বভাব হইতে বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিয়াছেন তাঁহারাই সম্যক উপভোগ করিয়া বিমলানন্দ লাভ করিয়াছেন। চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার কিরণ-রশ্মি সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত না করিলেও গৃহস্থিত উজ্জ্বল আলোক-মালার মত তিনি তাঁহার ঘরখানি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরলোকগতা কুমুদিনী বসু ১২৭৪ সনের আশ্বিন মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্ধ অবস্থিত। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে সহস্র সহস্র নরনারী প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরে এই তীর্থস্থলে আসিয়া পাপক্ষয় কামনায় ব্রহ্মপুত্র-জলে অবগাহন করিয়া থাকে। কুমুদিনীর জনক শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ত্রিপুরার রাজ-কবি পদে বৃত হইয়া দীর্ঘকাল ত্রিপুর-রাজ-দরবারের গৌরব ও শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি এখনও রাজ-সরকার হইতে পেন্সন-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কুমুদিনী পিতামাতার প্রথম সন্তান এবং পিতার কবিত্ব শক্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। অতি শৈশবকাল হইতেই তিনি বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করেন। বালিকা কবির ক্ষুদ্র অর্ঘ্য কবিতাদেবীর পূজামন্দিরে স্থানও প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "সাধারণী" পত্রিকায় কুমুদিনীর রচিত অনেক কবিতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সাহিত্যজগতে তাঁহার কাব্যসাধনার প্রথম উপহার "লহরী" নামক কবিতাগ্রন্থ। শারীরিক অসুস্থতার দরুণ তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সম্যক ফলবতী হইতে পারে নাই, তথাপি অবসর সময়ে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিতেন তাহারই কতকগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "আভা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সারস্বত মন্দিরে তাঁহার জীবনের শেষ অর্ঘ্য "অমরেন্দ্র" নামক উপন্যাস। বৎসরেক পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আজীবন সাধনা সিদ্ধির পথে সম্যক অগ্রসর না হইতেই জীবন-পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িল। তাঁহার অনেক আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, অনেক পূজার অর্ঘ্য সারস্বত মন্দির-দ্বারে ব্যর্থ ব্যাহত হইয়া আজও ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে, দেবতার চরণতলে তাহা কোন দিন স্বার্থকতা লাভ করিবে কিনা দেবতাই জানেন।

আজ আমরা তাঁহার সারস্বত-সাধনার কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব না, তাঁহার মধুর ও পবিত্র চরিত্রের যে শোভন সৌন্দর্য্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কর্ম্মনিষ্ঠ উপাসনাশীল তাঁহার মহজ্জীবনের যে বিমল সৌরভ চারিদিক আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কুমুদিনী হিন্দুঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং শৈশবেই তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৮৬ সনের ১৪ই ফাল্গুন ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি আমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন। আশৈশব জ্ঞানলাভ-স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল, সুতরাং বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ না হইলেও ঘরে বসিয়া সুশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ উদারচেতা পিতামাতার শিক্ষাধীনে তিনি প্রভূত বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি শিক্ষিত এবং উদারভাবাপন্ন পরিবারে বিবাহিত হইয়াছিলেন। শ্বশুরগৃহে তাঁহার বিদ্যা-অর্চ্চনার কোন ব্যাঘাত তো হইতই না পরন্তু সকলেই তাঁহার জ্ঞানালোচনা ও সাধন ভজনের সহায়তা করিতেন এবং আমিও যথাসাধ্য গ্রন্থাদি ক্রয় ও অন্য উপায়ে তাঁহার সুশিক্ষালাভের সর্ব্ববিধ সুযোগ এবং সুবিধা করিয়া দিতে তৎপর থাকিতাম। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সনে আমি ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া আগরতলা যাই এবং সে বারে একাদিক্রমে প্রায় দশ বৎসর কাল তথায় অবস্থান করি। মহারাজার বিস্তৃত লাইব্রেরী আমারই কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল; সুতরাং লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি

পাঠ করিবার পক্ষে কুমুদিনীর বিশেষ সুবিধাই ছিল। এইরূপ অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার জ্ঞানলাভ-স্পৃহা সম্যক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার কতক অধিকার জন্মিয়াছিল। নিয়ত আলোচনা ও অধ্যয়ন দ্বারা সংস্কৃতশাস্ত্রে এবং উপনিষদে ও পুরাণ ইতিহাসে তাঁহার গভীর জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই জ্ঞানলাভ স্পৃহা তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষত্বরূপে লক্ষিত হইয়াছে। ভক্ত কবি জীবনের আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

"প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক সবার।"

এই মহৎ আদর্শকে জীবনে সম্যক লাভ করা কুমুদিনীর আজীবন সাধনা ছিল। জীবনের প্রারম্ভে তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদুক্ত "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" তাঁহার জীবনের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। ধর্ম্মলাভের জন্য আকুল চেষ্টা, জীবনকে ভগবানের সেবার জন্য নিয়োজিত করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদর্শকে জীবনে আয়ত্ত করিবার জন্য আপ্রাণসাধনা তাঁহার প্রকৃতিতে যেমন লক্ষিত হইত, এ সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। সংসারের সর্ব্ববিধ কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও চিত্ত ভগবানেই সমর্পিত রাখিতে তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। হিংসা, দ্বেষ, বাসনা, দ্বন্দ্বের আবেষ্টনের ভিতরে অবস্থান করিয়াও তিনি নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে ভাল করিয়া আসেন নাই, যাঁহারা তাঁহার পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা কুমুদিনীর জীবনের এই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই এই শোভন দৃষ্টান্তের অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কুমুদিনীর জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব—তাঁহার চরিত্রের অসাধারণ সরলতা। তাঁহার সহিত যাঁহারা আলাপ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে ক্ষণকালের জন্যও আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে তাঁহার প্রকৃতি শিশুর ন্যায় সরল ছিল, তাহাতে যেন সংসারের কোন আবিলতা ছিল না, কুটিলতার স্পর্শ যেন তাঁহার নির্ম্মল ধবল শিশু-প্রকৃতিকে কলুষিত করিতে পারে নাই। সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়াও তিনি তাঁহার প্রকৃতির এই অনাবিল সরলতাটুকু হারান নাই। সরলতা ও কোমলতা তাঁহার প্রকৃতির ভূষণ ছিল। ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ দ্বারা তাঁহার চরিত্রের অন্তর্নিহিত অন্যান্য মহৎগুণনিচয় সম্যক উপলব্ধ না হইলেও ক্ষণকালমাত্র পরিচয়েই তাঁহার চরিত্রের সরলতা ও মধুর প্রকৃতি সকলের সমক্ষেই প্রতিভাত হইত।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্য কুমুদিনীর জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি সধবা থাকিয়াও আজীবন নিরামিষ ভোজিনী ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে এক কি দেড় ঘণ্টা কাল উপাসনা করিয়া উপনিষদ্, গীতা, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা কুমুদিনীর জীবনের দৈনিক ব্রত ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে উপাসনা ও কীর্ত্তন, এই নিয়মের অন্যথা হইতে পারিত না। শরীরের সুস্থাবস্থায় গভীর রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিশ হইতে ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত নাম জপ করিতেন।

শরীর প্রায়ই অসুস্থ থাকিত বলিয়া লেখাপড়ার কাজ রীতিমত করিতে পারিতেন না, তথাপি অবসর সময়ে সাহিত্য আলোচনা করিতেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "ভারত-মহিলাতে" এবং "সেবকে" তিনি মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা যে কোন মাসিক পত্রের গৌরব বর্দ্ধন করে। গত ভাদ্রের "ভারত-মহিলাতে" কুমুদিনীর লিখিত সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার এবং ভূতপূর্ব্ব স্বারস্বত-পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় ২৫এ ভাদ্র তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "ভারত-মহিলায়" এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি; বাঙ্গালার পুরমহিলা ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতায় এই পরিমাণ উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ ইহা বস্তুতই আনন্দের বিষয় ও গৌরবের কথা—

পুরমহিলা কেন, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞ পুরুষ লেখকও আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতে পারেন।" বাস্তবিক কুমুদিনীকে হারাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

কুমুদিনীর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। কোন গ্রন্থ একবার পাঠ করিলে জীবনে তাহা ভুলিতেন না। নয় কি দশ বৎসর বয়সের সময় কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া কুমুদিনী তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীকে শুনাইতেন, জীবনে ঐ গ্রন্থদ্বয় আর কখনও পাঠ করেন নাই অথচ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "মহাভারত" ও "রামায়ণের" অনেক কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল। তাঁহার বয়স যখন মাত্র ১২ বৎসর তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঢাকা জজ-কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, মেঘনাদ বধ কাব্য তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ। বাস্তবিক কুমুদিনী অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আধ্যাত্মিক জীবনে কুমুদিনী কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গুরুদেব মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একটী বাক্য দ্বারাই সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায়। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কুমুদিনীকে গভীর ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতে দেখিয়া তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে গোস্বামী মহাশয় উক্ত শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, "শাস্ত্রাদিতে গার্গীর নাম শুনিয়াছ ত? ইনিও সেইরূপ," এই বলিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানাইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে দর্শন করিতেন, তাঁহার এই একটী মাত্র কথার দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

কুমুদিনীর ধর্ম্মময় জীবন-কাহিনী নানা ঘটনা-পরিপূর্ণ, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করা অসম্ভব। বিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি ধর্ম্মসাধন উদ্দেশ্যে গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সময় সুদীর্ঘ কেশদাম স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিতে আরম্ভ করেন। পরে সেই ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও তিনি জীবনের কার্য্যদ্বারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার দেহ মন সমস্তই ভগবানে সমর্পিত। একবার ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া তিনি গভীর সমাধিযুক্ত হন, আমার কনিষ্ঠ সহোদর মিঃ ডি, এন, বসু এম, এ, ব্যারিষ্টার তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল। সকলে চলিয়া যাওয়ার অনেক পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেও সে তাঁহাকে আনিতে অসমর্থ হয়, পরে আমাদিগকে সংবাদ দিলে আমরা যাইয়া ধরাধরি করিয়া লইয়া আসি। কুমুদিনী জীবনে স্বর্ণাভরণ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলিতেন, "নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিলে শরীর যেমন পবিত্র বোধ হয়, গৈরিক বসন পরিধান করিলে কিছু না কিছু ধর্ম্মভাব আপনা আপনি স্ফুরিত হইয়া উঠে; তেমনই স্বর্ণাভরণ পরিলে অহঙ্কারের ভাব মনের ভিতর আপনা আপনি জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক।" আমার অনেক অনুরোধে সোনার দুগাছি বালা ভিন্ন আর কোন অলঙ্কার কখনও ব্যবহার করেন নাই। শাঁখাই তিনি পছন্দ করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অথচ গভীর পতিভক্তি যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই মোহিত হইয়াছেন। বিশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি ঠিক হিন্দু-বিধবার আচার ও নিষ্ঠা আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন কিন্তু তাঁহাতে সংসারের কোনও রূপ আবিলতা ছিল না। তিনি বলিতেন, "বিবাহের প্রকৃত অর্থ আত্মায় আত্মায় যোগ।" তাঁহার 'অমরেন্দ্র' গ্রন্থে তিনি এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা 'অমরেন্দ্র' উপন্যাস পাঠ করিলেই বুঝিবেন যে নলিনীর ব্রহ্মচর্য্য, গিরিবালার পতিভক্তি, সুশীলার উচ্চ ধর্ম্মভাব এবং প্রফুল্লের প্রগাঢ় প্রেম, এ সকল তাঁহারই নিজ জীবনের আদর্শ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তিনি সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্তা যোগিনীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন।

ফলিত জ্যোতিষে তাঁহার কিছু কিছু অধিকার ছিল।

তিনি নিজের হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এ সময় তাঁহার একটী 'ফাঁড়া' আছে। আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি 'অমরেন্দ্র' গ্রন্থে ইহার বহু উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন—পরলোকগত আত্মা এবং মহাপুরুষগণ সময় সময় স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া থাকেন। আমি কাশিমপুর ষ্টেটের ম্যানেজার থাকা কালে, গত বৎসর কুমুদিনী বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী একখানা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিতেছেন যে তাঁহার মৃত্যুরেখা উঠিয়াছে। কুমুদিনী স্বপ্নাবস্থাতেই উত্তর করিলেন যে, তিনি মরিবেন তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু তিনি যে একখানা পাঠ্যপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তিনি পুস্তকখানা লিখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্বে তিনি গেণ্ডারিয়াতে তাঁহার কোনও সতীর্থার নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না, কিন্তু তাঁহার মরিবার কোন লক্ষণই আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁহার জীবনলীলার শেষ হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে কুমুদিনীর রচিত কোনও গ্রন্থের সমালোচনা করিবার প্রয়াস পাইব না, কিন্তু তিনি কিরূপ শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার একটুকু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। ১২৯৩ সনে তাঁহার রচিত "লহরী" প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সনের ৩রা মাঘ সঞ্জীবনী লিখিয়াছিলেন, "বালিকা কুমুদিনী যেমন গভীর ভাবপূর্ণ দার্শনিক কবিতা লিখিতে পারেন এমন কবিতা আর কোন স্ত্রীলোকের হাত হইতে বাহির হয় নাই। স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনা করিতেছি কেন, দুইজন কবির কবিতা ভিন্ন আর কোথাও তেমন উচ্চ অঙ্গের কবিতা পাঠ করি নাই" ইত্যাদি। 'আভা' সম্বন্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন, "সমুচ্চ কল্পনা, ভাবের প্রগাঢ়তা, রুচির প্রবিত্রতা, বর্ণনার সুদূরগামী ঝঙ্কার, ভাষার সুধামধুর প্রবাহ, এবং সর্ব্বোপরি অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জগতের অভিমুখে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ এই কাব্য-গ্রন্থখানির প্রত্যেক পদ্যেই পরিলক্ষিত হইল। পদ্যের অবিরাম মধুর উচ্ছ্বাসময় প্রবাহে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মজগতের দার্শনিক তত্ত্ব প্রকটন অতি অল্প কাব্যগ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। Tennyson এবং Wordsworthএর কথা তুলিয়া তুলনায় সমালোচনা করার উৎকট প্রয়াসে এখানে আমরা প্রবৃত্ত হইব না, কিন্তু Subjection of Women নামক গ্রন্থকর্ত্তা সুবিখ্যাত John Stuart Millএর উক্তির জয়ধ্বনি করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, শিক্ষা পাইলে নারী-জাতির প্রতিভা কত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে, কত কোমল ভাষায় উচ্চ তত্ত্বের পরিস্ফুট চিত্র আঁকিতে পারে, 'আভার' প্রত্যেকটী পদ্যই তাহার অকাট্য প্রমাণ।" 'অমরেন্দ্রের' কথা অধিক আর কি লিখিব; দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাকে যে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। তাই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থখানি গৃহে গৃহে পঠিত হয় ইহাই ইচ্ছা করি।" কুমুদিনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ এম্,এ মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, "কুমুদিনী পুণ্যবিজিত গতি লাভ করিয়াছেন; দেহত্যাগও পূত-জীবনের অনুরূপই হইয়াছে। আমরা একটী রত্ন হারাইলাম; তুমি একটী সৎসঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ। ইঁহার পবিত্র স্মৃতির আরাধনা ভিন্ন ইঁহার জন্য আর কি করিবার আছে?" বাস্তবিক এমন রমণীরত্ন সংসারে অতি বিরল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

বসন্তোৎসবে

কুহু কুহু কুহু,
কোকিল কুহরি গেল—"বসন্ত আগত,
পুলক অবহুঁ।"
আম্র-মঞ্জরীর গন্ধে বন-পথ দিয়া
ভ্রমর ব্যাকুল
প্রিয়ারে জানায়ে গেল—"এল মধুমাস
অন্ত শীতশূল।"

বাতাস কহিয়া গেল কুঞ্জে কুসুমেরে—
"সখি, মুখ তোল,
অতিথি এসেছি আমি শুভ বার্ত্তা লয়ে,
খোল দ্বার খোল।"
হেমন্ত-শাসন অন্তে হাসে দিক্‌বধূ
বালার্কে সম্ভাষি,
আকাশে বাতাসে ভাসে কত কথা গান
কত হাসাহাসি!

কুহু কুহু কুহু,
শঙ্খ ফুকারিয়া গেল চটুল সারথি
মুহু মুহু মুহু।
বিমনা বিরহী ফেলে আকুলিত শ্বাস
প্রিয়া-স্পর্শ স্মরি,
বিদগ্ধা মানিনী বালা তুলিছে বল্লভে
আলিঙ্গনে পীড়ি।
প্রিয়া-অঙ্গ-সঙ্গ-লুব্ধ কুহরে কপোত
ঘন বন-ছায়,
গজবধূ বল্লভেরে উৎক্ষেপি সলিল
সোহাগ জানায়।
সন্ধ্যায় তিমির-মগ্ন মৌন নদী-তটে
বিরহ বিধুর
চক্রবাক্ কুহরিছে স্মরিয়া প্রিয়ার
কণ্ঠ সুমধুর!

কুহু কুহু কুহু!
মুঞ্জরিত বন-ভূমি পূর্ণ গুঞ্জরণে
উল্লাস অবহুঁ।
জলে স্থলে আকাশেতে কুহকী কে কোথা
করে মন্ত্র পাঠ,
ভুবন ভরিয়া জাগে নব শোভা গীতি,
নব প্রেম ঠাট।
জরা জীর্ণ বসুধার অঙ্গে অঙ্গে জাগে
তারুণ্য নবীন,
প্রীতি-কালিন্দীর ধারা কি আবীরে আজ
মেহালি রঙ্গীন!

হে হৃদয়-রাজ মম! আজি এ মধুর
ফাল্গুন-প্রভাতে
আমারে ডাকিয়া লহ বসন্ত-উৎসবে
তোমার দোলাতে।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম কথা

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রথম কথাটা বলিবার পূর্ব্বে এই শাস্ত্রটা কি জানা প্রয়োজন। আমরা অঙ্ক কসি, ভূগোল পড়ি। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি অঙ্ক-শাস্ত্রটা এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি সংখ্যার যোগ বিয়োগ ভাগ প্রভৃতি শিক্ষা দেয় এবং পৃথিবীর কোন্ স্থানের অবস্থা কি প্রকার, কোন্ সাগর কোন্ মহাসাগর কোথায় অবস্থিত তাহা ভূগোল পাঠে জানা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয় এ সব লইয়া নয়। রাত্রির নির্ম্মল আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞান তাহাদেরই পরিচয় আমাদিগকে দেয়। আমরা প্রতিদিনই দেখি, সূর্য্য প্রাতে পূর্ব্ব আকাশে উঠিয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমে অস্ত যায়। শীতকালে সূর্য্য দক্ষিণ ঘেঁসিয়া আকাশের উপর দিয়া চলে, দিন ছোট হয়। গ্রীষ্মকালে তাহা প্রায় মাথার উপর দিয়া চলিয়া অস্ত যায়, তখন দিনগুলি বড় হয়। তার পরে রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, দ্বিতীয়ার সেই ক্ষীণ রেখার মত চাঁদখানি দিন দিন বড় হইয়া সন্ধ্যার সময়ে ক্রমেই আকাশের উপরে দেখা দিতেছে। তার পর একদিন সেটি সোনার থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ হইয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যাবেলায় যখন চাঁদ না থাকে, তখনও আকাশে দেখিবার জিনিসের অভাব হয় না। হীরক-বিন্দুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত নক্ষত্র আকাশকে ছাইয়া থাকে। কোনোটি উজ্জ্বল, কোনোটি ম্লান, কোনোটি ছোটো, কোনোটি বড়। কোনোটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে, কোনোটি নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া

আছে। কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটি দীর্ঘ মালার আকারে আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে, কতকগুলি একত্র হইয়া হয়ত একটি ত্রিভুজের আকার গ্রহণ করিয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হয় না কি, আকাশের এই আলোক-বিন্দুগুলি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? এরা কোথা হইতে আসিল? আমাদের সূর্য্যটাই বা কি এবং চন্দ্রই বা কি? জ্যোতির্বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নেরই উত্তর দেয়, কেবল তা নয়, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, যার মাটিতে শস্যাদি বুনিয়া খাদ্য উৎপন্ন করি, যাহার ধূলা মৃত্তিকার সহিত আমাদের আজন্ম সম্বন্ধ, জ্যোতির্বিজ্ঞান তাহারো জন্ম-কথা আমাদিগকে বলিয়া দেয়।

শিশুপুত্র মাতাপিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কতই না প্রশ্ন করে। একটি ফুল দেখিলে সেটা কি এবং কোথা হইতে আসিল জানিতে চায়, একটি পাখী উড়িয়া গেলে, সেটি কোথায় চলিল জানিতে চায়। জ্ঞানের যখন উদয় হয় তখন এই প্রশ্নগুলি শিশুর মনে আপনিই জাগিয়া উঠে। মানবজাতি এখন যেমন জ্ঞানী, অতি প্রাচীন কালে সে প্রকার জ্ঞানী ছিল না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহু চিন্তা করিয়া এবং বহু অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আর নূতন করিয়া আমাদের জানিতে হইতেছে না, পূর্ব্ব পুরুষদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পাইয়া আমরা যেমন জ্ঞানী হইয়াছি, খুব অতীত যুগের মানুষেরা সে প্রকার জ্ঞানী ছিল না। তাহারা জ্ঞানে আমাদের শিশুর মতই ছিল, তাহারা প্রকৃতির মধ্যে যে সকল বস্তু ও যে সকল ঘটনা দেখিত, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত। কিন্তু এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার মত লোক ত তখন ছিল না, কাজেই নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া এক একটা উত্তর দাঁড় করাইত।

সকল শাস্ত্রেরই গোড়ার খবর জানিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন মানব-জাতির প্রশ্ন ও তাহার উত্তরেই শাস্ত্রের মূল-পত্তন হইয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তির পত্তনও ঠিক এই প্রকারেই হইয়াছিল। দূর অতীত যুগে মানুষের মনে যে দিন প্রথম জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল তখন তাহারা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিত, এরা কে? কোথা হইতে এদের জন্ম? তাহাদের যে-টুকু জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞানের সাহায্যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিত। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা সম্বন্ধে যে কত গল্প কত অদ্ভুত সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। আফ্রিকার গভীর অরণ্যের অসভ্য অধিবাসিগণকে প্রশ্ন কর, তাহারাও চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর উৎপত্তি ও চলাফেরা সম্বন্ধে এক একটা অদ্ভুত গল্প বলিবে। মানুষের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, সে কখনই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতিতে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে, সে তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুরূপ সেগুলির ব্যাখ্যা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানের তো অন্ত নাই। কাজেই মানুষ যতই জ্ঞানী হইতেছে, ততই প্রকৃতির ঘটনা সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রশ্ন তাহার মনে হইতেছে, এবং নূতন নূতন ভাবের প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। যেখানে উত্তর মিলিতেছে না, সেখানে মানুষ কেবল অবাক্ হইয়া প্রকৃতির কার্য্য দেখিতেছে। এই প্রকার অবাক্-করা অনেক ঘটনা আজও নানা শাস্ত্রে আছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও অনেক আছে। মানুষ যতই প্রকৃতির কার্য্য ভাল করিয়া দেখিতেছে, নিত্য নূতন ঘটনা দেখা দিয়া ততই তাহাকে বিস্মিত করিতেছে। এই বিস্ময়ের শেষ কখনই হইবে না। বিধাতার সৃষ্টি যেমন অনন্ত, সৃষ্টির রহস্যও তেমনি অনন্ত। এক মুষ্টি তণ্ডুল যে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, দেহের মর্ম্ম স্থানে একটু মৃদু আঘাতে যাহার মৃত্যু ঘটে, এবং অতি সামান্য কারণে যাহার বুদ্ধি লোপ পায়, বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির এই কীটানুকীট মানুষের কি সাধ্য যে অনন্ত আকাশ-জোড়া সৃষ্টির মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে? জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতে সৃষ্টি যে কত বিশাল, তাহার কার্য্য যে কত সুনিয়মে চলিতেছে, তাহাই আমাদিগকে জানাইয়াছে। আদিম মানব যে দিন প্রথম চিন্তা করিবার শক্তি পাইয়াছিল তখন সে যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আকাশে স্থূলভাবে দেখিয়া অবাক্ হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল, এখনকার পরম জ্ঞানী সুসভ্য মানুষও প্রকৃতিকে অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া ঠিক সেই রকমই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রকে যাঁহারা প্রথমে নিয়মিত ভাবে দেখিয়া উহাদের রহস্য জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা মনে করিলে ক্যাল্‌ডিয়ান্‌ জাতি এবং আমাদেরি অতি প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষদের উল্লেখ করিতে হয়। ক্যাল্‌ডিয়ান্‌দিগের মেষ পালন করাই ব্যবসায় ছিল। তাহারা যে প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে বাস করিত তখন এখনকার মত বড় বড় সহর ছিল না, তাহারা বনে বনে মাঠে মাঠে মেষ চরাইত, এবং রাত্রিতে মেষগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। মেঘশূন্য আকাশের তলে শয়ন করিয়া যখন তাহারা নক্ষত্রগুলিকে দেখিত তখন তাহাদের মনে কত কথারই উদয় হইত!

কতকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টিকে তাহারা মানুষের, সিংহের বা ভেড়ার আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত এবং সেই অনুসারে কোন স্থানের নক্ষত্রসমষ্টিকে সিংহ রাশি, কতকগুলিকে মেষরাশি বা বৃশ্চিকরাশি নাম দিত। আমরা যখন মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকি, তখন মেঘের কতই আকৃতি পরিবর্ত্তন দেখি। এখনি যে মেঘখণ্ডকে মানুষের মত দেখিতেছিলাম, পরক্ষণে তাহা হয় ত ঘোড়ার মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। রাত্রির আকাশের তলে শুইয়া ক্যাল্‌ডিয়ানেরা এই রকমেই নক্ষত্রের সমষ্টিতে নানা মূর্ত্তির কল্পনা করিত। মেঘ ক্ষণে ক্ষণে আকার পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু নক্ষত্রেরা আমাদের কাছে প্রায় নিশ্চল, এ জন্য সেই অতি প্রাচীন যুগে আকাশের নানা স্থানের নক্ষত্রে ক্যাল্‌ডিয়ানেরা যে আকৃতি কল্পনা করিয়াছিল, আজও আমরা আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার পরিচয় পাইতেছি। আজও তাহাদেরই কল্পনা অনুসারে আমরা আকাশের স্থানবিশেষের নক্ষত্রগণকে মেষরাশি, বৃষরাশি, সিংহরাশি ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

আমাদের এই ভারতবর্ষেও এক সময়ে খুব বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। এখনো তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দুদের যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ সকলই তিথি নক্ষত্র অনুসারে করিতে হয়, এই কারণে গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যের গতিবিধির সহিত বিশেষ পরিচয় স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। আজকাল বড় বড় দূরবীণের সাহায্যে এবং আরো অনেক যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রদের গতিবিধি দেখা চলিতেছে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই সকল যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও নানা জ্যোতিষিক ঘটনা সম্বন্ধে যে প্রকার হিসাবপত্র করিতেন, তাহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক!

আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় অধিক। সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। চাঁদেও আমরা তাই দেখি। তা'ছাড়া ইহারা নিয়তই স্থান পরিবর্ত্তন করে। অর্থাৎ চাঁদকে আজ সন্ধ্যার সময়ে যে সকল নক্ষত্রের কাছে দেখিলে, কা'ল সন্ধ্যার সময়ে তাহাকে আর সে সকল নক্ষত্রের কাছে দেখিতে পাইবে না, নক্ষত্রদের ভিড় ঠেলিয়া সে যেন শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কেবলি পূর্ব্বদিকে ছুটিয়া চলে। সূর্য্যের অবস্থাও তাই। আজ আকাশের সীমায় যে গাছটির মাথা হইতে সূর্য্য উদিত হইল, এক মাস পরে যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে ঠিক সে স্থান হইতে সূর্য্যের উদয় হইতেছে না; হয় বামে না হয় ডাহিনের আর একটা গাছের মাথা হইতে সূর্য্য আকাশে উঠিতেছে দেখিবে। কিন্তু নক্ষত্রদের এ রকম স্থান-পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। আজ যে চারিটিকে একস্থানে একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজ রচনা করিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে, সে চারিটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইবে বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যের যে দূরত্ব তাহার একটুও পরিবর্ত্তন হইবে না। চন্দ্র সূর্য্য এবং আমাদের পৃথিবীর মত আর যে কয়েকটি ছোটো জ্যোতিষ্ক আছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, আকাশের সকল নক্ষত্রই আমাদের কাছে প্রায় নিশ্চল। জগদীশ্বর ছোট বড় নক্ষত্রকে বসাইয়া সমগ্র আকাশে যে একটি ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন, সে ছবির পরিবর্ত্তন নাই। কেবল চন্দ্র সূর্য্য ও আমাদের পৃথিবীর মত ক্ষুদ্র ছয় সাতটি গ্রহ ঐ ছবির উপর দিয়া চলা-ফেরা করে।

আকাশে যে এই অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়, তাহারা কত বড় শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, ইহাই আমাদের নিকটে খুব বড় বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্য আবার এই পৃথিবী হইতেও অনেক বড়। এক কোটী তিন লক্ষ পৃথিবী জোড়া দিলে তবে একটা সূর্য্য হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের বৃহৎ উদরের ভিতরে এক কোটী তিন লক্ষ পৃথিবী অনায়াসেই লুকাইয়া থাকিতে পারে। আলোক-বিন্দুর মত যে নক্ষত্রদিগকে আমরা আকাশে দেখিতে পাই, তাহাদের কোনটিই সূর্য্য অপেক্ষা ছোটো নয়, বরং অনেকেই শত শত গুণ বড়। পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। এজন্য এত বড় জিনিষ হইয়া সূর্য্য আমাদের কাছে ছোটো। দূরের পাহাড়, দূরের গাছ বাড়ী ছোট দেখায়;—সূর্য্যকেও ঐ কারণে ছোটো দেখায়। নক্ষত্রেরা আবার সূর্য্য হইতেও অনেক দূরে আছে, এইজন্য এগুলি এত ছোটো হইয়া দাঁড়ায় যে আমরা কেবল তাহাদের আলোই দেখিতে পাই, অবয়ব দেখিতে পাই না। যাহাদের আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না, এ রকম নক্ষত্রও আকাশে অনেক আছে। সেগুলি পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে তাহাদের আলো পর্য্যন্ত আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না।

নক্ষত্রগণ পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, তাহার একটু আভাস দেওয়া যাউক। কোনো স্থানে শব্দ করিলে সেই শব্দ দূরে গিয়া পৌঁছিতে যে একটু সময় লয়, তাহা আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই। খোলা মাঠে ফুটবল খেলা হইতেছে, দূরে দাঁড়াইয়া যিনি খেলা দেখেন, তিনি বেশ বুঝিতে পারেন বলটিকে পা দিয়া মারা হইল এবং তাহা লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু শব্দ তৎক্ষণাৎ কাণে পৌঁছিল না, দূরত্ব অনুসারে দু'সেকেণ্ড বা এক সেকেণ্ড পরে শব্দ শুনা গেল। শব্দ যেমন এক স্থান হইতে দূরবর্ত্তী কোনো স্থানে পৌঁছিতে সময় লয়, আলোকও তেমনি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে পৌঁছিতে সময় লয়। ঘরের এক কোণে আলো জ্বালাইলে তাহা অন্য কোণে পৌঁছিতে সময় ব্যয় করে, কিন্তু সে সময়টা অতি সামান্য। আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। আমাদের সূর্য্য যে দূরে আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া আলো আট মিনিটে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এমন নক্ষত্র অনেক আছে, যাহার আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল বেগে ছুটিয়াও দুই শত বা চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না। এখন বিবেচনা কর, নক্ষত্রেরা কত দূরে আছে। যে নক্ষত্রটি আমাদের খুব নিকটে তাহারই আলো পৃথিবীতে আসিতে চারি বৎসর চারি মাস সময় লয়। উত্তর আকাশে ধ্রুব তারাকে আমরা অনেকেই দেখিয়াছি, এই তারাটির উদয়াস্ত নাই। ইহার আলো পৃথিবীতে আসিতে সাতচল্লিশ বৎসর ক্ষেপণ করে। আকাশে যে কতকগুলি তারা সজ্জিত হইয়া কাল-পুরুষের (Orion) রচনা করিয়াছে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার নিকটে একটা খুব উজ্জ্বল তারা আছে; তারাটির নাম সিরিয়াস (Sirius)। ইহা এত দূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক পৃথিবীতে আসিতে পথের মাঝেই সাড়ে আট বৎসর কাটাইয়া দেয়। উত্তর আকাশে Arctaraus নামে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। ইহার আলো এক শত বাইট বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছায়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাসি যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রটি যে আলোক ত্যাগ করিয়াছিল, এখন তাহারই ধারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায়, যে রাজ্যে নক্ষত্রদের বাস তাহা কত বৃহৎ! আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর চারিদিকে কোটী কোটী মাইল দূরে হাজার হাজার সূর্য্যের সমান যে অসংখ্য নক্ষত্র রহিয়াছে জ্যোতি-র্বিজ্ঞান তাহাদেরি সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। আমাদের সূর্য্য এই সকল নক্ষত্রদেরই মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। আমাদের পৃথিবী ইহারি চারিদিকে ঘুরিতেছে;—তা'ছাড়া বুধ, শুক্র, মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি আরো অনেক গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার এই সকল গ্রহকে ঘেরিয়া উপগ্রহেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের ন্যায় একটা ছোটো নক্ষত্রকে ঘেরিয়া যদি এতগুলা গ্রহ উপগ্রহ থাকে, তবে অনন্ত আকাশের কোটী কোটী বড়

নক্ষত্রকে ঘেরিয়া যে কত কোটী কোটী গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘুরিতেছে তাহার সংখ্যাই হয় না। জ্যোতিষ্কদের রাজ্য কত বড় এবং তাহাতে কত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র আছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!

এই সকল গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র ছাড়া আকাশের আরও অনেক জ্যোতিষ্ক আছে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নীহারিকা (Nebula) বলিয়া থাকেন। নির্ম্মল রাত্রিতে এগুলিকে খুব পাতলা সাদা মেঘের মত দেখা যায়। আকাশের দুই একটা স্থানে খালি চোখেও ইহাদিগকে দেখা যায়, তা'ছাড়া অপর স্থানে দেখিতে হইলে দূরবীণ দিয়া দেখিতে হয়। আকাশের নানা স্থানে ক্ষুদ্র মেঘের টুক্‌রার ন্যায় প্রায় কুড়ি হাজার নীহারিকার কথা জানা গিয়াছে। দূর হইতে মেঘের টুক্‌রার ন্যায় দেখা গেলেও এগুলি আকারে অত্যন্ত বড়। ইহাদের এক একটিই আকাশের কোটী কোটী মাইল স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। অতি দূরে এইপ্রকারে যে প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, তাহারি মৃদু আলো দেখিয়া আমরা তাহাদের কথা জানিতেছি।

ধূমকেতুগণ অনন্ত আকাশের আর এক শ্রেণীর অধিবাসী। ইহাদের অনেকগুলিই আমাদের পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহদের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত! দীর্ঘকালের শেষে হঠাৎ এক দিন ইহারা দেখা দেয়, যতই আমাদের কাছে আসিতে থাকে তাহাদের পুচ্ছ ততই দীর্ঘ হইতে থাকে,—তা'র পরে একটু একটু করিয়া পুচ্ছ গুটাইতে গুটাইতে তাহারা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়। ১৮১১ সালে যে বড় ধূমকেতুটিকে আমরা দেখিয়াছিলাম তাহার কথা বোধ হয় সকলেরই মনে আছে। শেষ রাত্রিতে যখন সেটি পূর্ব্বাকাশে উদিত হইত তাহার পুচ্ছটি মধ্য আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িত। এটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসর অন্তর এক একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ শেষ করে। এখন সে দূরে চলিয়া গিয়াছে, পঁচাত্তর বৎসর পরে আবার দেখা দিবে। যাহারা দুই শত, আড়াই শত বৎসর অন্তর এক একবার দেখা দেয়, এ রকম ধূমকেতুও আছে। আবার এমন ধূমকেতুও অনেক রহিয়াছে যাহারা একবার মাত্র সূর্য্যকে ঘুরিয়া চিরদিনের মত সূর্য্যের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

উল্কাপাত আমরা সকলেই দেখিয়াছি। আকাশ নির্ম্মল; সহস্র সহস্র নক্ষত্র আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; এই প্রকার রাত্রিতে প্রায়ই দেখা যায়, অসংখ্য নক্ষত্রদের মধ্যে হইতে যেন একটি নক্ষত্র খসিয়া দ্রুতবেগে এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এই প্রকারে ধাবমান জ্যোতিষ্কদিগকে উল্কাপিণ্ড বলে। বলা বাহুল্য ইহারা নক্ষত্র নয়। নক্ষত্রেরা এক একটা মহা সূর্য্য, ইহারা ঐপ্রকারে খসিয়া পড়িতে পারে না। উল্কাপিণ্ডগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারের জিনিস, ইহারা দলে দলে এবং কখন কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মহাকাশে পরিভ্রমণ করে। কাজেই ছোটো হইলেও এগুলিকে অনন্ত আকাশের ক্ষুদ্র অধিবাসী বলিয়া মানিতে হয়। মহাকাশে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহারা যখন পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবী ইহাকে টানিয়া মাটিতে ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কদাচিৎ দুই একটাই মাটিতে পড়ে; কারণ পৃথিবীর টানে আমাদের আকাশের বায়ুর ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে বায়ুর ঘর্ষণে সেগুলি এত গরম হইয়া পড়ে যে, পথের মাঝেই তাহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

আমাদের দেশে প্রায় ত্রিশ কোটী লোকের বাস। মানুষের পরমায়ু বড়ই অল্প. এক শত বৎসর পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেই বাঁচে। সুতরাং বলা যাইতে পারে আশী বা নব্বই বৎসর পরে এই ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে একটিও জীবিত থাকিবে না। তখন আবার এক দল নূতন ত্রিশ কোটী লোক দেখা দিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রতি এক শত বৎসর অন্তর এক এক দল সম্পূর্ণ নূতন লোক আমাদের দেশে আসিতেছে। মনে করা যাউক, আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের জন্ত এক একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা যাইতেছে। এপ্রকারে

একশত বৎসর পরে আমাদের ভারতবর্ষের উপরে নিশ্চয়ই ত্রিশ কোটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে; এবং অন্যের সংখ্যা একশত বৎসর অন্তরে ত্রিশ কোটী করিয়া বাড়িয়া হাজার বৎসর পরে এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে তখন মাটির উপরে আর ঘর বাড়ী নির্ম্মাণের স্থান থাকিবে না, সকলই স্মৃতিস্তম্ভে ভরিয়া উঠিবে। অনন্ত আকাশে যে কোটী কোটী নক্ষত্র এখন উজ্জ্বল হইয়া আলোক বিতরণ করিতেছে, তাহাদেরও জন্ম মৃত্যু আছে। মানুষ আশী, নব্বই বা এক শত বৎসর বাঁচে, নক্ষত্রেরা হয় ত কোটী বৎসর বাঁচে। কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন তাহাদের এত উজ্জ্বলতা এবং এত প্রতাপ একবারে লয় প্রাপ্ত হইবে; তখন অনুজ্জ্বল অবস্থায় ঘোর অন্ধকারে বিচরণ করা ব্যতীত তাহাদের আর উপায় থাকিবে না। আমাদের এই যে সৃষ্টি, তাহা দুই কোটী বা দশ কোটী বৎসরের নয়, অনন্তকাল ধরিয়া শত শত সূর্য্যের ন্যায় এই সকল নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু ঘটিতেছে। কাজেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়, এখন যতগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের তুলনায় অনেক অধিক মৃত নক্ষত্র আকাশে আছে। আকাশের এই অধিবাসীদের তাপ নাই, আলোকও নাই, ভূতের ন্যায় অন্ধকারে ছুটাছুটি করিয়াই তাহারা সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাইবে। আমাদের এই অনন্ত আকাশ কেবল কোটী কোটী উজ্জ্বল নক্ষত্রেরই লীলাভূমি নয়। অসংখ্য প্রেত-জ্যোতিষ্কেরও ইহা বিচরণ-ক্ষেত্র।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল, তুমি মহীয়ান্,
তবু তোমা প্যানে ধায় ব্যাকুল পরাণ।
লোকে বলে সূর্য্যমুখী সূর্য্য-সোহাগিনী,
তারা ত জানেনা মোর গোপন কাহিনী!
কি মোহ-মন্ত্রের বলে, আমার জীবন চলে
পরে কি বুঝিবে, আমি নিজে না বুঝিনি?
আমি ক্ষুদ্র ধূলিকণা তুমি ধরাধর,
তোমাতে আমাতে প্রভু, অনেক অন্তর।
অনন্ত যোজন দূরে, তুমি ঊর্দ্ধে সুরপুরে,
আমি ফুটি ক্ষুদ্র ফুল মাটির উপর!
অতৃপ্ত তৃষিত আঁখি, সারাবেলা চেয়ে থাকি
তবু ত মেটেনা আশা; বিরহে তোমার—
জগৎ আমার চো'খে শূন্য অন্ধকার।
তুমি রবি অর্দ্ধ প্রাণ বিশ্বজগতের,
তোমারি করুণা মাগি, দিবস রয়েছে জাগি,
চরাচর অনুরাগী তোমারি প্রেমের!
হে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়! কি বুঝিবে তুমি,
কি মধুর দিব্য সুখে মগ্ন আছি আমি!
সাধকে কি সিদ্ধি তরে, ইষ্টদেবে পূজা করে?
সুধু কি পূজায় প্রীতি হয়নাক তার?
আমি জানি চিরশান্তি পূজাতে আমার।
জাননা আমারে তুমি? জানাতে না চাই,
আমি যেন যুগে যুগে এই সুখ পাই।

শ্রীস্বরূপা দেবী।

আফ্রিকায় সংকট

(৯)

বিপদের বন্ধু।

একদিন প্রাতঃকালে হেন্‌রী তাহার গৃহে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে, এমন সময় একজন কাফ্রি বণিক আসিয়া তাহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, রেভারেণ্ড ভিলেণ্টের বাসা কোথায় এবং তাঁহার ছেলের নাম হেন্‌রী কি না? ভৃত্যের নিকট প্রকৃত সংবাদ অবগত হইয়া, বণিক হেন্‌রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। ভৃত্য ভিতরে গিয়া সংবাদ দিল।

হেন্‌রী বাহিরে আসিয়া তাহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল, সেই ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া হেন্‌রীর হাতে একখানি পত্র প্রদান করিল।

* [illegible] উদ্ধৃত।

পত্রের উপরে মেরীর হাতের লেখা। হেন্‌রী তাহাকে বসিতে বলিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল এবং চেয়ারে বসিয়া পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি এই :—

প্রিয় হেন্‌রী,

আমাদের দুঃখের কথা আর তোমাকে কি বলিব! আমরা যে কোথায় আছি তা জানি না। চার মাস হয়ে গেল এখানে এসেছি। তিন মাস বৃষ্টি গিয়েছে। তারপর সকলেই রুগ্ন,—খাদ্য অভাবে শীর্ণ। চলিবার শক্তি নাই, বাঁচিবারও উপায় নাই। বাবা এই বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন, কি করিয়া দেখিব! দেহে শক্তি নাই যে কিছু করি। সকলেরই এই অবস্থা। একবার বিপদ হতে রক্ষা করেছিলে। যদি এই পত্র পাও, একবার চেষ্টা করে দেখো, যদি আর একবার মৃত্যু হতে রক্ষা করিতে পার। আর লিখিতে পারি না।

তোমার চিরদিনের

মেরী।

মেরীর পত্র পাঠ করিয়া হেন্‌রী স্তম্ভিত হইল! পত্রখানা প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে লেখা। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া হেন্‌রী সেই কাফ্রি বণিককে সে স্থানে যাওয়ার পথ জিজ্ঞাসা করিল। বণিক বহুকষ্টে একটা পথ বলিয়া দিল। সে পথে কিছুদূর জাহাজে গিয়া তারপর হাঁটিয়া গেলে ১৪।১৫ দিনে পৌঁছান যেতে পারে। হেন্‌রী সে ব্যক্তিকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

তারপর হেন্‌রী পিতার নিকট গিয়া মেরীর পত্রখানি তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন,—এবং জিজ্ঞাসা করিলেন পত্রখানা কেমন করিয়া আসিল। হেন্‌রীর নিকট সকল সংবাদ অবগত হইয়া তিনি বলিলেন, "এমন নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ কি কত্তে হয়, এমন স্থানে গিয়ে পড়েছেন যে পালিয়ে বাঁচবার পথ নাই! এখন তুমি কি কর্ব্বে বল? সে জঙ্গলে তুমি কোথায় তাঁদের সন্ধান পাবে?"

হেন্‌রী। বাবা, সন্ধান পাই আর না পাই একবার চেষ্টা করে তো দেখা উচিত?

ভিন্সেন্ট। বাবা, তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তুমি সেই অজ্ঞাত জঙ্গলে বন্যজন্তুর মুখে অথবা অসভ্য জাতির হাতে প্রাণ হারাবে, আর ফিরবে না, তখন আমার কি হবে?

হেন্‌রী। বাবা, তুমি বিশ্বাসী, এমন কথা কেন বলছ? যে বিপন্নদিগের উদ্ধার সাধন কত্তে যায়, ভগবান তো তাকে রক্ষা করেন! আমি আবার ফিরে আসব। তুমি আশীর্ব্বাদ ক'রে আমাকে বিদায় দাও, ভগবান আমাকে রক্ষা কর্ব্বেন।

ভিন্সেন্ট্। তোমাকে সেই রাত্রে তো বিনা ওজরে ছেড়ে দিয়েছিলাম,—এ যে অজ্ঞাত অতলস্পর্শ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া, এমন অবস্থায় তোমাকে কেমন করে ছেড়ে দিই!

হেন্‌রী। বাবা, মা যদি এই রকম বিপদে প'ড়ে তোমার সাহায্য চাইত, তুমি কি না গিয়ে পাত্তে? তুমি তখন যা কত্তে, আমাকে তাই কত্তে দাও।

এই কথা শুনিয়া ভিন্সেন্ট্ গম্ভীর হইলেন, এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হেন্‌রী, আর আমি তোমাকে বাধা দিব না, যাও তুমি সব যোগাড় যত্ন ক'রে নিয়ে তাদের উদ্ধার কত্তে যাও; ভগবান তোমাকে রক্ষা কর্ব্বেন।" এই বলিয়া তিনি হেন্‌রীর মাথায় হাত দিলেন।

হেন্‌রী ধীরে ধীরে তাহার গৃহে গিয়া, কি কি সঙ্গে লইবে এক টুকরা কাগজে তাহার একটা তালিকা করিল। তারপর পিতাকে সেই তালিকা দেখাইল; তিনি আরও কোন কোন বস্তু, ঔষধ ও পথ্য তাহাতে যোগ করিয়া দিলেন। হেন্‌রী তাহার "বয়" এবং অন্যান্য চাকরদের সাহায্যে তালিকার বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া প্যাক্ করিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত দিন গত হইল। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পিতাপুত্রে নানা বিষয়ক কথাবার্ত্তা হইল। উভয়ে সেই জীবনের উন্নত লক্ষ্য, ভগবানের ইচ্ছা পালন, প্রাণ দিয়া অপরের কল্যাণ সাধন প্রভৃতি অতি নিগূঢ় বিশ্বাসের কথায় তন্ময় হইয়া বহুক্ষণ প্রার্থনায় যাপন করিলেন। অবশেষে উভয়েই অন্তরে বিশ্বাসের নির্মল শান্তি এবং নির্ভরের অটল শক্তি অনুভব করিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

এ দেখে রাত্রি ৩ টার সময় উঠিয়া, হেন্‌রী পিতার নিকট গেল। পিতাও জাগিয়া সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। উভয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। পিতা পুত্রের জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তৎপর কিঞ্চিৎ আহার করিয়া, পিতাকে নমস্কার করিয়া হেন্‌রী যাত্রা করিল।

হেন্‌রী ও তাহার 'বয়' অশ্বপৃষ্ঠে ৫।৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট জাহাজের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে। হেন্‌রী অশ্বদ্বয়কে ছাড়িয়া দিয়া, অতি সত্বর ভৃত্যসহ বস্তুগুলি জাহাজে উঠাইল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

সাত দিন পরে হেন্‌রী এক স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করিল। সকলেই তাহাকে সেই অজ্ঞাত স্থানে নামিতে বারণ করিল। কিন্তু সে নীরবে ভৃত্যসহ সেই স্থানে নামিয়া পড়িল। এবং জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বেই দুইটি অশ্বের পৃষ্ঠে জিনিষ পত্র উঠাইয়া দিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিল। সে অতি ভীষণ জঙ্গল! সেখানে কখনও কোন মানুষ পদার্পণ করিয়াছে কি না সন্দেহ। বহু কষ্টে, পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া হেন্‌রী চলিতে লাগিল।

হুগো ও মেরী এবং তাহাদের সঙ্গীগণ জীবিত আছে কি না, মেরীর সঙ্গে দেখা হইবে কি না, যে স্থানে তাহারা আছে, সে স্থানে পৌঁছিতে পারিবে কি না—এই রূপ চিন্তায় হেন্‌রীর হৃদয় আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিকে এই চিন্তা, অপর দিকে পদে পদে, অসভ্যদিগের আক্রমণের ভয়, হঠাৎ তাহাদিগের বিষাক্ত তীরে কাহার প্রাণ যাইবে! হেন্‌রী ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এইরূপে ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত্রি ভ্রমণের পর, হেন্‌রী একস্থানে একটী রুমাল দেখিতে পাইল। সে ব্যগ্রভাবে রুমালখানি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল, যদি, তাহাতে কোন অক্ষর লেখা থাকে, যদি কিছু অনুমান করিবারও সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিধায় সেই রুমাল খানিতে কিছুই লেখা ছিল না। রুমালখানা কেহ কয়েকদিন হইল সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে, বেশীদিন হয় নাই এবং নিকটেই মানবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে হেন্‌রীর কোন সন্দেহই রহিল না। নীরবে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, তাহার 'বয়'কে উৎসাহিত করিল। এবং উভয়ে সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বিপন্ন ফরাসী-উপনিবেশের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

উত্তর দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হেন্‌রী সুসভ্য মানবের গমনাগমনের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাইল। তাহার হৃদয় আশায় নাচিয়া উঠিল! হয়ত এতদিনে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে। আহার বিশ্রাম ভুলিয়া হেন্‌রী অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রায় অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল—অদূরে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ — বৃক্ষোপরি জীর্ণ পতাকা উড়িতেছে, কিন্তু সব নীরব!

পনের মিনিটের মধ্যে হেন্‌রী সেই উপনিবেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল,—সবই শ্রীহীন, চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ, প্রাঙ্গণে কয়েকটি সমাধি-স্তূপ, দুই চারিটি গৃহ হইতে ক্ষীণ কাতর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে! হেন্‌রী ভাবিল—"এ কোথায় আসিলাম—এই কি মেরীদের উপনিবেশ? হঠাৎ কঙ্কাল-মূর্ত্তি মেরী একটি গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই মূর্ত্তির উপর দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র হেন্‌রী চমকিয়া উঠিল,—তবে কি ভূত আছে! ক্ষণকাল হেন্‌রী নিস্পন্দ! মেরী হস্ত সঞ্চালন করিয়া অতিকষ্টে হেন্‌রীকে কাছে ডাকিয়া বসিয়া পড়িল। এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "সকলকে আহার দিয়া বাঁচাও, প্রাণ যায়!"

হেন্‌রী কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার একটি ব্যাগ খুলিয়া ব্র্যাণ্ডি ও জল বাহির করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া দিল, এবং বয়ের সাহায্যে চা প্রস্তুত করিয়া, লঘুপাক বলকারক খাদ্য ও পানীয় খাওয়াইয়া, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকলকে উঠিয়া বসিতে সমর্থ করিয়া তুলিল। কেহই বেশী কথা বলিল না, দু'একটি কৃতজ্ঞতা সূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকলেই

অশ্রুপাত করিতে লাগিল। রাত্রে আহার করিয়া, ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া সকলে শয়ন করিল।

হেন্‌রী প্রাতঃকালে সকলের পূর্ব্বে উঠিয়া চা, রুটি মাখন, বিস্কিট, ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সকলকে জাগাইল এবং আহার করিতে অনুরোধ করিল। সকলেই অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া, বহুদিন পরে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া নবজীবন লাভ করিল। সকলেই একবাক্যে হেন্‌রীকে পরিত্রাতা বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ডুপ্রে হেন্‌রীর মাথায় ও পৃষ্ঠে হাত দিয়া হৃদয়ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আহারাদি শেষ হইলে হেন্‌রী তাঁহাদের ইতিহাস জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল এবং সকলেরই পরিচয় লইল। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, গত ২।৩ দিনের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয় নাই,— হেন্‌রী তখনি বয়ের সাহায্যে গর্ত্ত খনন করিয়া মৃতদেহ সকল সমাধিস্থ করিল, তাহাদের ক্যাপটেন্ প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপে দুই দিন গেল। তখন ভবিষ্যতের চিন্তায় সকলেই অস্থির হইলেন। ইহার পরে কি হইবে? একটা কিছু উপায় তো করিতে হইবে! হেন্‌রী কর্ত্তৃক আনীত খাদ্যে আর কত দিন চলিবে? কোথায় যাইবে, কোন্ পথে যাইবে, এই চিন্তায় ও আলোচনায় দিনরাত্রি কাটিতে লাগিল।

কথায় কথায় জনের কথা উঠিল। ডুপ্রে ব্যতীত সকলেই বলিলেন,—"সে পাষণ্ডের কথা আর কি বলিব? যেদিন আমাদের হাতে মাত্র ৫০টি গুলি ছিল সেদিন সে-সমস্ত গুলি এবং একজন লোক সঙ্গে লইয়া পশু শিকার করিতে গেল, সকলে তার পানে চেয়ে রয়েছি, সে আর ফিরিল না, সেই দিন হ'তে আমাদের আহার বন্ধ, শিকার বন্ধ। সে স্বার্থপর, সে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।" এই কথা শুনিয়া জনের প্রতি হেন্‌রীর অত্যন্ত ঘৃণা হইল—"ছিঃ, কি কাপুরুষ!"

সকালে ও সন্ধ্যায় সকলে মিলিত হইয়া আহার ও নানা প্রকার প্রসঙ্গ হয়, কি প্রকারে কোন নিরাপদ স্থানে যাওয়া যায়। হেন্‌রী প্রত্যহ শিকার করিয়া সকলের জন্য প্রচুর মাংস সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং অসভ্যদিগের নিকট হইতে নানা সংবাদ জানিতে চেষ্টা করে। এইরূপে কয়েক দিন গেল।

একদিন হেন্‌রী শিকার অন্বেষণে বহু দূরে গমন করিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, একজন শ্বেতকায় মৃতের ন্যায় একটি বৃক্ষতলে পড়িয়া আছে। সে নিকটে গিয়া দেখিল, সে ব্যক্তি আর কেহই নহে, সেই জন্! হেন্‌রী তাহার অবস্থা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে কি ঔষধ ও একটু জল বাহির করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল এবং চোখেমুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে জন্ উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল। হেন্‌রী তাহাকে আরও কিছু বলকারক ঔষধ খাওয়াইয়া, সে এবং তাহার "বয়" উভয়ে ধরিয়া জনকে সেই উপনিবেশে লইয়া গেল। আহারাদি করিয়া জন্ একদিনেই সারিয়া উঠিল। সে বলিল যে, সে পথ ভুলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তাই এতদিন ফিরিতে পারে নাই; পথের সন্ধান পাইয়া ফিরিতেছিল, একটা সাপে দংশন করায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার অলীক কথা কেহই বিশ্বাস করিল না।

দু'দিন গত হইতে না হইতেই, জন্ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, হেন্‌রীকে কি প্রকারে দূর করিবে, অথবা ধ্বংস করিবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। হেন্‌রীর অবর্ত্তমানে সকলের নিকট তাহার নিন্দা করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাহার মতে সায় দেয় না দেখিয়া, সে মহা মুস্কিলে পড়িল। অবশেষে সে ডুপ্রের সহিত পরামর্শ করিল যে, সে দেশে গিয়া যথেষ্ট অর্থ ও লোকজন লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এবং তাঁহাদের কোন কষ্ট রাখিবে না; তখন মেরী নিশ্চয়ই তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে। কয়েক দিনের মধ্যে স্থির হইল, ফরাসীগণ হেন্‌রীর সহিত আরও উত্তর পশ্চিমে গমন করিয়া কোন সভ্য জাতির সন্নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিবে। এদিকে জন একাকী স্বদেশে যাওয়ার দিন স্থির করিল। কেহ বারণ করিল না।

একদিন অপরাহ্ণে জন্ রওনা হইল; হেন্‌রী কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গিয়া সন্ধ্যার সময় বিদায় গ্রহণ

করিল। বিদায় লইয়া হেন্‌রী কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, তাহার মাথার পাশ দিয়া সন্ সন্ শব্দে ছুটি গুলি চলিয়া গেল! হেন্‌রী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল জন্ দ্রুতগতি চলিয়া যাইতেছে। হেন্‌রী বলিল—"অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ, লুকিয়ে থেকে গুলি কর্‌লে!" এই বলে সে ফিরিয়া আসিয়া জনের কথা সকলকে বলিল। সকলেই জন্‌কে ধিক্কার দিতে লাগিল।

তারপর হেন্‌রীর সাহায্যে সকলে পুনরায় যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

ঢাকা হিন্দু-বিধবাশ্রম

অনাথনাথ ভগবানের কৃপায় আমাদের বিধবাশ্রমটী দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ভগবানের কৃপা মাত্র সম্বল করিয়া নিতান্ত দীন ভাবে যখন আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল তখন আমরাও আশা করিতে পারি নাই যে এই অল্প সময় মধ্যে ইহা দেশের শাসনকর্ত্তার সম্মানিতা পত্নী ও গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের বহু সদাশয় নরনারীর সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিবে। দুইটি মাত্র বিধবা ও তাহাদের একজনের একটি বালিকা কন্যা লইয়া আশ্রম প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, এখন আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা ষোলটি। প্রথম-প্রবিষ্ট বিধবাদ্বয় এবং তৎপর প্রবিষ্ট আর একটি বিধবা শিক্ষা লাভ করিয়া এখন গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সসম্মানে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। দুইটি বিধবা শীঘ্রই ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে আশ্রমসংসৃষ্ট বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৭৭৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, এজন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আশ্রমের জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী ও একজন মেট্রন নিযুক্ত হইয়াছেন। আশ্রমে প্রবেশার্থিনী সকল স্ত্রীলোককে আশ্রমে গ্রহণ করা সকল সময় সুবিধা হয় না। এইরূপ একটি বিধবাকে শুশ্রূষা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য আমরা কলিকাতা লেডি ডফারিণ হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি; তিনি সেখানে এক বৎসর কার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সন্তোষজনক মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আর একটি স্ত্রীলোককে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতা প্রেরণ করিয়াছি, তিনিও পড়াশুনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি।

মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ার একটি সুন্দর বাড়ীতে এখন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই বাড়ীতে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। স্থানাভাবে নূতন আবেদনকারিণীদিগকে গ্রহণ করা কঠিন হইয়াছে। এইজন্য আশ্রমের একটি নিজস্ব বাড়ী করিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। বাড়ীর জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। তন্মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিলে আর কুড়ি হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন, এরূপ আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। আমাদের পক্ষে কুড়ি হাজার টাকা সংগ্রহ করা স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু ভগবান অনেক স্বপ্নকেই সফল করিতেছেন, তিনি তাঁহার সদাশয় পুত্রকন্যাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া এই স্বপ্নকেও সফল করিবেন, এই আশা করিতেছি।

আশ্রমের অর্থাভাবের কথা বলাই বাহুল্য। আশ্রমের নিয়মিত আয় যৎসামান্য। অনিশ্চিত দানের উপরই প্রধান ভাবে নির্ভর করিতে হয়। আমাদের পাঠক পাঠিকা এই আশ্রমটির প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন, এই নিবেদন। গত বৎসর আমাদের আবেদনে অনেকেই দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌবাসিনী শ্রীমতী কমলা ওহদেদার মহাশয়ার অনুগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি সুদূর প্রদেশে বাস করিয়াও আশ্রমে মাসিক ৩৲ তিন টাকা চাঁদা দিতেছেন, এবং ভারত-মহিলার জন্য দুইজন গ্রাহিকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিতা হইয়াও তিনি যে এই প্রকার অনুগ্রহ করিতেছেন তজ্জন্য আমরা

তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহার যেরূপ শক্তি সকলেই কিছু কিছু করিলে আশ্রমের যথেষ্ট হয়. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দুর সমষ্টিই বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি করে।

দুই তিনটি মহিলা এ বৎসর পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে আশ্রমে ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা এজন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেকট্রেস্ মাননীয়া মিস্ গ্যারেট মহোদয়াকে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশ্রমের প্রতি তাঁহার যত্ন ও প্রীতির সীমা নাই। তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়াছি, এবং সর্ব্বপ্রকারে তিনি আশ্রমটির কল্যাণ সাধনে মনোযোগিনী আছেন।

মাননীয় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রিয়তমা গুপ্ত আশ্রমের একজন শ্রেষ্ঠ হিতৈষিণী। বহু পরিশ্রমে শিল্প শিক্ষাদান ও নানা উপায়ে আশ্রমবাসিনীগণের কল্যাণ চেষ্টা করিয়া সম্প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আশ্রমের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাননীয়া শ্রীমতী নির্ম্মলা দাস, বলিতে গেলে, আশ্রমের প্রাণ। তাঁহারই স্বার্থত্যাগ ও দক্ষতা গুণে আশ্রম সুপরিচালিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। ভগবান অচিরে তাঁহাকে নিরাময় করুন, এই প্রার্থনা।

ঢাকা বিভাগের কমিশনার সাহেবের পত্নী জানুয়ারী মাসে আশ্রম পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"অদ্য আমি বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিলাম। আশ্রমবাসিনীগণ সকলেই সুখে আছে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি। আশ্রমের সর্ব্বত্র অতি সুন্দর রকমের পরিচ্ছন্নতা বিরাজিত। বিধবাগণ সূচীকর্ম্ম ও অন্য প্রকার কার্য্যে অতি সুন্দর দক্ষতা লাভ করিতেছে।"

বনলতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন অপরাহ্নে সার রিচার্ডের বাড়ীর উদ্যানে আমিয়াস ও সার রিচার্ড বেড়াইতে বেড়াইতে আমিয়াসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। আমিয়াস রোজ-সল্টার্ণ ও তাঁহার দাদা এবং নিজের সম্বন্ধে সমস্ত কথাই সার রিচার্ডকে খুলিয়া বলিয়াছেন। সার রিচার্ড বলিলেন, "এই ঘটনায় তোমার ব্যবহার অতি প্রশংসনীয়, তোমার দাদাও জ্যেষ্ঠের উপযোগী কাজই করিয়াছেন। এখন মনে বল সঞ্চয় কর, আর ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, যেন মানুষের মতন মানুষ হইতে পার।"

আমিয়াস বলিলেন, "আমি খুব বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাকে মানুষ হইতে সাহায্য করিবেন।"

সার রিচার্ড। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তোমার জন্য আমার যে ভাবনা ছিল তুমি নিজেই তাহা দূর করিলে। দেখ আমিয়াস, ভাল জিনিস বিকৃত হইলে তাহা অতি কদর্য্য হয়। নারীর ভালবাসা মানুষের আত্মাকে স্বর্গে উন্নীত করে, তাহাই আবার বিকৃত হইলে মানুষকে নরকে টানিয়া নেয়। বড়ই সুখের বিষয়, তুমি ঠিক পথ অবলম্বন করিতে পারিয়াছ।

আমিয়াস। আমি কি তা হইলে আগামী কল্য আয়র্লণ্ডে যাত্রা করিতে পারি?

সার রিচার্ড। হাঁ, উইণ্টারের নামে আমি চিঠি দিতেছি, বায়ু অনুকূল থাকিলে আজ রাত্রেই তোমার জাহাজ ছাড়িবে।

আমিয়াস বলিলেন, "উইণ্টার? তাহার সঙ্গে ত আমার সদ্ভাব নাই; কাপ্তান ড্রেক ও আমাদিগকে মাগেলান প্রণালীতে অতি কাপুরুষের ন্যায় ছাড়িয়া যাওয়ার পর হইতে আমি তাহার উপর সকল শ্রদ্ধা হারাইয়াছি।"

সার রিচার্ড। কর্ত্তব্যের নিকট ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার স্থান নাই; কিন্তু তোমাকে তাহার অধীনে থাকিতে হইবে না। লর্ড ডিপুটির হাতে এই চিঠি

থাকা দিও, তিনি তোমাকে কাজ দিবেন—খুব কঠিন কাজই পাইবে।

আমিয়াস। আমিও এর বেশী আর কিছু প্রার্থনা করি না।

সার রিচার্ড। বেশ, বেশ, ভাল করিয়া কাজ করিলে তার পুরস্কারই হইতেছে আরো অধিক কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া। সামান্য বিষয়ে যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে পারিয়াছে, গুরুতর বিষয়েও তাহার উপর আস্থা রাখা যায়। ঈশ্বরবিশ্বাসী মাত্রেরই এই আদর্শ অনুসারে চলা কর্ত্তব্য। অলস লোক আমি দু চক্ষে দেখিতে পারি না।

তাঁহারা এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময়ে সার রিচার্ডের ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছে। লোকটার চেহারা বড় বদ্। তাহাকে কত বারণ করিলাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া কিছুতেই যাইবে না।"

সার রিচার্ড তাহাকে ভিতরে আনিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে লোকটাকে ভিতরে আনিতে আমার ভয় হয়।"

আমিয়াস বলিলেন, "তুমি ভয় করিতে পার, কিন্তু সার রিচার্ড ভয় করেন না!"

সার রিচার্ড। কেনরে, লোকটার কি শিং আছে?

ভৃত্য। আজ্ঞে না; তবে ওর চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়। লোকটার সমস্ত দেহ অসভ্যদের ন্যায় চিত্রাঙ্কিত, চেহারাও খুব জবরদস্ত।

আমিয়াস বলিলেন, "আচ্ছা তুমি দাঁড়াও, আমি দেখিতেছি।"

সার রিচার্ড। হাঁ আমিয়াস, তুমিই যাও; ততক্ষণ আমি এই চিঠিটা শেষ করি। আমিয়াস বাহিরে গিয়া দেখিলেন, ভৃত্যের কথা সত্য; সুদীর্ঘ যষ্টি হস্তে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রাঙ্কিত এক প্রকাণ্ড জোয়ান।

আমিয়াস তাহাকে বলিলেন, "তোমার হাতের এই প্রকাণ্ড লাঠিটা রাখিতে রাখ। আর খৃষ্টানের মত কথা কহ—আমি আশা করি তুমি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী।"

আগন্তুক। আজ্ঞে হাঁ, আমি খ্রীষ্টান, আমার গায়ে উল্কি দেখিয়া আমাকে অখ্রীষ্টান মনে করিবেন না। আমি দলপতি হারাইয়া এখন বিপন্ন বটে, কিন্তু আমি চোর বদমায়েস নই। আমি আপনাদের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসি নাই—আমি সাহায্য লাভের যোগ্যও নই। আমার একমাত্র প্রার্থনা, সার রিচার্ডের সঙ্গে দুটি কথা কহিব।"

আমিয়াস আগন্তুকের কথায় একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইবে?

"আজ্ঞে আমি পেষ্টো বন্দর হইতে আসিয়াছি, ক্লভেলি সহরে আমার মাকে দেখিতে যাইব—জানিনা তিনি এখনও জীবিত আছেন কি না?" ভৃত্যেরা তখন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি ক্লভেলির লোক! এতক্ষণ তা বল নাই কেন?" একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ক্লভেলিতে তোমার মা আছেন? তাঁর নাম কি?"

"সুসান ইউ।"

"কি? যে বৃদ্ধা ক্লভেলির উত্তরপাড়ার সেই পুরাতন বড় বাড়ীটার একটা ঘরে থাকিত?"

আগন্তুক। 'থাকিত' বলিতেছ কেন? এখন কি তবে নাই?"

ভৃত্য। তিন দিন হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

আগন্তুক নীরবে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। তারপর স্পেনদেশীয় ভাষায় বলিল, "যাহা ঘটে তাহা ভালর জন্য ঘটে।" আমিয়াস কৌতুহলের সহিত বলিয়া উঠিলেন "তুমি তবে স্পেনীয় ভাষা জান?"

আগন্তুক। মহাশয়, পাঁচ বৎসর স্পেন সমুদ্রে বাস করিয়াছি, বাধ্য হইয়াই শিখিতে হইয়াছে। সবে দুদিন হইল এদেশে আসিয়াছি। সার রিচার্ডের সহিত যদি সাক্ষাৎ হয় তবে সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারি; শুনিলে আপনারও কৌতুহল পূর্ণ হইবে।

আমিয়াস। চল, এখনই তুমি সার রিচার্ডের সাক্ষাৎ পাইবে। (ক্রমশঃ)